শ্রীগৌর পার্ষদ
ও
গৌড়ীয় আচার্য্যগণের
চরিতাবলী
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় আচার্য্যগণের চরিতাবলী

প্রাক্তন শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পিত

ডাঃ শম্ভুনাথ দাসাধিকারী (শীল)

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রকাশক ঃ
শ্রীভক্তিভূষণ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রথম-সংস্করণ
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথিপূজা বাসর
২২ হৃষীকেশ ৫৩৩ শ্রীগৌরাব্দ
১৯ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান

'গ্রন্থবিভাগ'
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ- শ্রীমায়াপুর, জেলা-নদীয়া, পঃ বঃ।
পিন-৭৪১৩১৩ ☎ (০৩৪৭২) ২৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কোলকাতা-২৬
☎ (০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষা ঃ — ৫০০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন
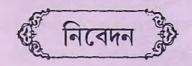
স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ব্রজে মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলালা এবং ব্রজাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দররূপে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা পরিকরই তাঁহার শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরলীলায় গৌরপরিকর। কৃষ্ণভক্তে যেমন কৃষ্ণগুণ সকলই সঞ্চারিত হয়,—গৌরভক্তেও তদ্রূপ গৌরগুণ সঞ্চারিত।

'বৈষ্ণবের গুণ-গান করিলে জীবের ত্রাণ
শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে।'

এজন্য গৌরগতপ্রাণ আচার্য্যগণের ও তাঁর পার্ষদগণের পরম উদার চরিতাবলী পুনঃ পুনঃ আস্বাদনের প্রয়োজন, যার ফলে আমরা তাঁহাদের আনুগত্যে হৃদয়ের সকল গ্লানি, সঙ্কীর্ণতা দূর করতঃ জীবনকে ধন্যাতিধন্য করিতে পারি। সেই উদ্দেশ্যে **"শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় আচার্য্যগণের চরিতাবলী"** শিরোনামায় গ্রন্থটি প্রকটিত হইলেন। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদগণের চরিতকথা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত চরিতকথার প্রত্যেকটি বর্ণ ভক্তিরসে সংসিক্ত-পরিপ্লুত। এই সকল চরিত-সুধা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন ব্যতীত আমরা কখনই পরমার্থ-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিব না।

এই গ্রন্থরাজের প্রারম্ভ হইতে ৭০৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে চরিত্রগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্যমঠের পারমার্থিক বার্তাবহ 'গৌড়ীয়' (বাংলা) হইতে সংগৃহীত। পরবর্তী চরিতাবলীর বেশির ভাগ অংশ আমাদের মঠের একনিষ্ঠ সেবক ডাঃ শম্ভুনাথ দাসাধিকারী (শীল) 'দি গৌড়ীয়' (ইংরাজী) হইতে ভাষান্তর করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি পূজাকালে তত্তদ্ভক্তের চরিতামৃত আস্বাদন সৌভাগ্য লাভ করিয়া আশা করি পাঠক-

পাঠিকাগণ হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। এই সমস্ত বিশেষ তিথিতে তাঁহাদিগকে স্মরণ করা, তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা এবং তাঁহাদের গুণগাথা কীর্ত্তন করা ভজনের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই কার্য্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইলেন।

'প্রেস'কে জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর "বৃহৎ মৃদঙ্গ" বলিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।'—উপদেশ-বাক্য পালন তথা প্রচার-কার্য্যে এই বৃহৎ মৃদঙ্গের সেবা অতুলনীয় ও অভাবনীয়।

এই গ্রন্থরাজের প্রকাশনার কার্য্যে যাঁহারা সহায়তা করেছেন, তাঁহারা গুরু-গৌরাঙ্গের বিশেষ কৃপাভাজন হইবেন। তাঁহাদের সেবাকার্য্যের উৎসাহ ও উদ্যম উত্তরোত্তম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—এই আশা রাখি।

—শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী
(আচার্য্য ও সাধারণ সম্পাদক)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

উপক্রমণিকা
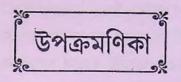
Lives of great men all remind us,
we can make our lives sublime.

—*Longfellow*

—মহতের জীবনী আমাদিগকে ইহাই মনে করাইয়া দেয় যে, আমরাও আমাদের জীবনকে বিস্ময় শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে পূর্ণ করিতে পারি।

বঙ্গকবিও গাহিয়াছেন,—

মহাজ্ঞানী মহাজন
যে পথে ক'রে গমন
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে
স্বীয়কীর্ত্তি ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হ'ব হে অমর।।

স্বয়ং ভগবানও নিজ ভক্তকে সর্বদাই বড় করিয়াছেন 'আমাপূজাপেক্ষা ভক্তপূজা বড়'—'তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনং'। এই সমস্ত মহাজনগণের চরিতাবলী-সম্বলিত এক গ্রন্থ প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন হইতেই মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ বোধ করিতেছিলেন।

অনেক গুণের আকর ভগবানের মত ভক্তগণের সদ্‌গুণাবলীর শেষ নাই। তবে জাগতিক জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা যদি ভক্তগণের চরিতাদি বুঝিতে চেষ্টা করা হয়, তবে তাহা স্ব-কপোল-কল্পিত, কাল্পনিক, আজগুবি ইত্যাদি মনে হইতে পারে। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'। যতদিন না কেহ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, ততদিন অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত ভগবানের ও ভক্তগণের অলৌকিক অচিন্ত্যলীলা আমাদিগের উপলব্ধিতে আসিবে না।

রাজা অম্বরীষের চরণে মহর্ষি দুর্বাসার অপরাধ স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুও ক্ষমা করিতে পারেন নাই; মাধাইয়ের শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। উভয়ক্ষেত্রেই যাঁহার চরণে অপরাধ, তাঁহার দ্বারাই অপরাধ-ক্ষালন করানো হইয়াছিল।

ভক্ত-জীবনীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা লক্ষিত হয়। সেই সমস্ত ঘটনা প্রাকৃত বলিয়া মনে হইতে পারে। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'। ভগবানের ন্যায় ভক্তগণও অচিন্ত্যশক্তির অধিকারী।

গ্রন্থটিতে যে সমস্ত চরিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি সবই সাধারণভাবে শ্রীচৈতন্যমঠের পত্রিকা ইংরাজী 'দি গৌড়ীয়' হইতে ভাষান্তর করিয়া ও বাংলা 'গৌড়ীয়' হইতে উদ্ধৃত; কিছু কিছু অন্যত্র হইতেও সংগৃহীত বা তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সঙ্কলিত।

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সরবরাহ করিয়া প্রভূত সহযোগিতা করিয়াছেন। শ্রীরামানন্দ দাসাধিকারী প্রভূত উদ্যোগ সহকারে গ্রন্থটি কম্পোজ করিয়াছেন, শ্রীবিমলকৃষ্ণ দাসাধিকারীও তাঁহাকে সহযোগিতা করিয়াছেন। গ্রন্থটি যাতে নির্ভূলভাবে প্রকাশিত হয়, সে জন্য ডঃ দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রুফ দেখিয়া সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্বাদে ভূষিত হইবেন।

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের আচার্য্য ও সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ গ্রন্থটি প্রকাশনায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইতেছে।

— সঙ্কলক

উৎসর্গ

যাঁহার প্রেরণায় ও অহৈতুকী কৃপাশীর্বাদে অভিষিক্ত হইয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়াস, সেই প্রাক্তন শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজের শ্রীকরকমলে ইহা অর্পিত হইল।

— সঙ্কলক
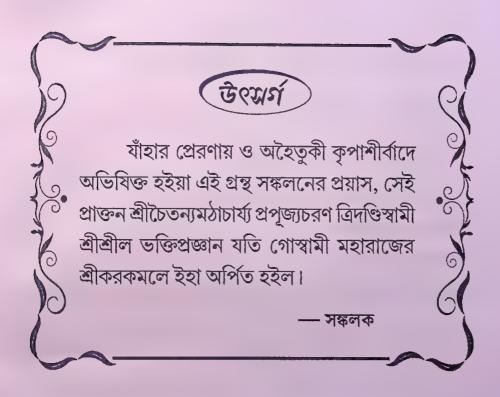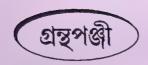
১। শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৩। 'দি গৌড়ীয়'—মাসিক ইংরাজী পত্রিকা

৪। 'গৌড়ীয়'—বাংলা মাসিক পত্রিকা

৫। ভক্তিরত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

৭। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন

৮। সজ্জনতোষণী

৯। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ

১০। লর্ড শ্রীচৈতন্য এণ্ড হিজ মিশন—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

১১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—শ্রীহরিদাস দাস

১২। অন্যান্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত কিছু কিছু গ্রন্থাবলী

সূচীপত্র

অ

অচ্যুতানন্দ ১০৯১-১০৯৪

অদ্বৈত আচার্য্য ৭২৩-৭৩৯

অভিরাম গোপাল ঠাকুর ৯১৪-৯১৭

ঈ

ঈশ্বর পুরীপাদ ৭১৬-৭২২

ঈশান ঠাকুর ৯০৮-৯১০

উ

উদ্ধব দাস ৯৯৫-৯৯৬

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ৯২২-৯২৪

ক

কবি কর্ণপুর ১০৪৩-১০৪৫

কমলাকর পিপ্পলাই ৯২৯-৯৩১

কালিয়া কৃষ্ণদাস (কালা কৃষ্ণদাস) ৯৩২-৯৩৩

কালিদাস ৯৫০-৯৫৪

কাশীশ্বর পণ্ডিত ৮২৭-৮২৯

কূর্ম্ম বিপ্র ১০৩৭-১০৩৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১০৮৪-১০৮৬

কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ১১১৭-১১২১

গ

গঙ্গাদাস পণ্ডিত ৭৪৫-৭৪৭

গঙ্গামাতা গোস্বামিনী ৯৬৪-৯৬৯

গদাধর দাস ৮১৫-৮১৭
গদাধর পণ্ডিত ১৩৫-১৪১
গোপীনাথ পট্টনায়েক ১০৩১-১০৩৪
গোপালগুরু গোস্বামি ২৭৪-২৮১
গোপালভট্ট গোস্বামি ৫৮৮-৬২৫
গোবিন্দ দাস ৮০৪-৮০৭
গোবিন্দ ঘোষ ৮৪৭-৮৪৯
গোবিন্দ কবিরাজ ৯৩৯-৯৪৪
গৌরকিশোর প্রভু ৬৮৩-৬৯৩
গৌরীদাস পণ্ডিত ১৬৬-১৭০

চ

চন্দ্রশেখর আচার্য্য ৭৪০-৭৪৪
চাঁদকাজী ১০৫৮-১০৬২

ছ

ছোট হরিদাস ৮৮১-৮৮৫

জ

জগদানন্দ পণ্ডিত ৭৫৪-৭৫৭
জগদীশ পণ্ডিত ৮৩০-৮৩৪
জগন্নাথ মিশ্র ৭১০-৭১৫
জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ১১১২-১১১৬
জগাই-মাধাই ১০৬৩-১০৬৮
জ্ঞান দাস ১০৯৭-১০৯৮
জয়দেব ৯০০-৯০৭
জীব গোস্বামি ৫০৭-৫৮৭
জাহ্নবাদেবী ১৭১-১৭৪

ঝ

ঝড়ু ঠাকুর ৯৫৫-৯৫৮

দ

দময়ন্তী ৮২২-৮২৪
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্ট ৮৩৯-৮৪৩
দেবানন্দ পণ্ডিত ৮৩৬-৮৩৮
দেবকীনন্দন দাস ৯৪৫-৯৪৬
দামোদর পণ্ডিত (দামোদর ব্রহ্মচারী) ৯৯৭-১০০২

ধ

ধনঞ্জয় পণ্ডিত ১৯৪-১৯৫

ন

নন্দন আচার্য্য ৭৫৮-৭৬৩
নরহরি সরকার ঠাকুর ১৭৫-১৮৭
নিত্যানন্দরায় ৭৬-১১৭
নরোত্তম ঠাকুর ১০৯৯-১১০১

প

পরমানন্দ পুরী ৭৮৯-৭৯৪
পরমেশ্বরী দাস (শ্রীপরমেশ্বর দাস) ৯১৮-৯২১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ৭৪৮-৭৫৩
পুরুষোত্তম দাস ৯২৫-৯২৮
প্রতাপরুদ্র দেব ১০১১-১০১৭
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (শ্রীনৃসিংহানন্দ) ১০০৩-১০০৬
প্রদ্যুম্ন মিশ্র ৮৯৭-৮৯৯

প্রবোধানন্দ সরস্বতী ৭৬৭-৭৭০
প্রকাশানন্দ সরস্বতী ৮৮৬-৮৮৮

ব

বলদেব বিদ্যাভূষণ ৯৭৬-৯৯৪
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ৮৮৯-৮৯৩
বল্লভাচার্য্য ৮৪৪-৮৪৬
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ১৯৬-২০২
বংশীবদনানন্দ ঠাকুর ৯১১-৯১৩
বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ৬৯৪-৭০৯
বাসুদেব ঘোষ ১৮৮-১৯৩
বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ৮৫৩-৮৫৭
বাসুদেব বিপ্র ৮৫০-৮৫২
বিজলী খাঁন (পাঠান-বৈষ্ণব) ৯৫৯-৯৬১
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ৯৭২-৯৭৫
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী ১১৮-১৩৪
বীরচন্দ্র প্রভু ১০৯৫-১০৯৬
বুদ্ধিমন্ত খান ৮২৫-৮২৬
বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১০৭৮-১০৮০

ভ

ভগবান্ আচার্য্য ৯৪৭-৯৪৯
ভবানন্দ রায় ৭৬৪-৭৬৬
ভট্টচৈতন্য দাস ১০৮৭-১০৯০
ভূগর্ভ গোস্বামি ২৬৫-২৭০
ভক্তিবিনোদ বিভু ৬৮৩-৬৯৩
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১১২২-১১২৯

ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১১৩০-১১৪৫
ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ ১১৪৬-১১৬৭

ম

মধু পণ্ডিত ১০৫৬-১০৫৭
মহেশ পণ্ডিত ৮৩৫
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র ১০৪৬-১০৪৮
মাধব ঘোষ ৮৪৭-৮৪৯
মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ১-৭৫
মাধবী দেবী ৮৯৬
মীনকেতন রামদাস ৯৬২-৯৬৩
মুরারি গুপ্ত ৭৭৪-৭৭৮
মুকুন্দ দত্ত ৮০৮-৮১৪

র

রঘুনন্দন ঠাকুর ২৮২-২৯০
রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ১০৭৬-১০৭৭
রঘুনাথদাস গোস্বামি ৬২৬-৬৫৮
রঘুনাথভট্ট গোস্বামি ৪৯৩-৫০৬
রঘুপতি উপাধ্যায় ৯৩৭-৯৩৮
রঙ্গপুরী ৭৯৫-৭৯৬
রাঘব পণ্ডিত ৮১৮-৮২১
রামচন্দ্র কবিরাজ ১১০৮-১১১১
রামচন্দ্রপুরী ৭৯৭-৮০৩
রামানন্দ রায় ২৩২-২৬৪
রসিক রায় জীউ ৯৭০-৯৭১
রূপ গোস্বামি ২৯১-৪০৪

ল

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ১০৫১-১০৫৫
লোকনাথ গোস্বামী ১০৬৯-১০৭৫
লোচন দাস ঠাকুর ১০৮১-১০৮৩

শ

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ১০০৭-১০১০
শিবানন্দ সেন ৭৭৯-৭৮৮
শিখি মাহিতি ৮৯৪-৮৯৫
শ্যামানন্দ প্রভু ১১০২-১১০৭
শ্রীধর ঠাকুর ৭৭১-৭৭৩
শ্রীনিবাস-আচার্য্য ৬৫৯-৬৮০
শ্রীবাস পণ্ডিত ১৪২-১৬৫

স

সদাশিব পণ্ডিত ১০৩৫-১০৩৬
সনাতন গোস্বামি ৪০৫-৪৯২
সনোড়িয়া বিপ্র ১০৩৯-১০৪২
স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি ২০৩-২৩১
সারঙ্গ দাস ঠাকুর ৬৮১-৬৮২
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ১০১৮-১০৩০
সীতা ঠাকুরাণী ১০৪৯-১০৫০
সুন্দরানন্দ ঠাকুর ২৭১-২৭৩
সুবুদ্ধি রায় ৯৩৪-৯৩৬

হ

হরিদাস ঠাকুর ৮৫৮-৮৮০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী-জিউ

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে' গাহিয়াছেন,—

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।।
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার।।
যাঁ'র শিষ্য প্রভু আচার্য্যবর গোসাঞী।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই।।
'ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার।'
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ, আ ৯।১৫৫-১৫৭, ১৬০)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন,—

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, আ ৯।১০)

শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপে স্বীয় আবির্ভাবলীলা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী-প্রমুখ গুরুবর্গের অবতার প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে যখন পৃথিবী বিষ্ণুভক্তিশূন্য এবং রজস্তমোগুণাদি-দ্বারা আচ্ছন্ন; যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের নৃত্যাদিতে আবিষ্ট ছিল; সেই সময় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু পৃথিবীতে সম্ভাষণযোগ্য লোকের একান্ত অসদ্ভাব, এমন কি, সন্ন্যাসীর সজ্জায় সজ্জিত 'জ্ঞানী', 'যোগী', 'তপস্বী'-আখ্যায় আখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তির অভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখে বনবাসী হইবার সঙ্কল্প করেন। এইরূপ জগতের দুঃখে দুঃখী শ্রীল পুরীগোস্বামীপাদ ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়দেশে শ্রীশান্তিপুরে আগমন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হ'ন এবং

তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি প্রদান করেন। শ্রীমাধবপুরী 'পাণ্ডরপুরী'-বাসী স্ব-শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত সেই সময় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহে শ্রীশচীমাতার পাচিত অপূর্ব মোচার ঘণ্ট ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী জগতের কৃষ্ণবহির্মুখতার ভয়াবহ অবস্থা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্য কিরূপ প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সেই ইচ্ছা-শক্তি-সঞ্চারের লীলা করিয়াছিলেন, তাহার একটি অপূর্ব্ব বিবরণ শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রদান করিয়াছিলেন,—

যে-সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার।।
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য-কৃপায়।
প্রেমসুখ-সিন্ধুমাঝে ভাসেন সদায়।।
নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।।
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য।।
পথে চলি' যাইতেও আপনা' আপনি।
নাচেন পরমরঙ্গে করি' হরিধ্বনি।।
কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়।।
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গাধারা বহে যেন—অদ্ভুত কথন।।
কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ-রসে ক্ষণে হয় দিগ্‌বাস।।
এইমত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তি-শূন্য লোক দেখি' বড় দুঃখী।।

তা'র হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন, এই তাঁ'র মতি।।
কৃষ্ণ- যাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন।।

* * *

যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত।।

* * *

বিষ্ণুমায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুনে।।
লোক দেখি' দুঃখ ভাবে' শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা'রে করি।।
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'।।
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণ-ভক্তি শুনি যথা।।
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী' খ্যাতি য'ার।
কা'র মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার।।
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে'।
ত'ারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে।।
দেখিতে, শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে "বনে বাস গিয়া করি।।
লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব'-নাম না শুনি জগতে।।
অতএব এ-সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে।।

এতেকে সে বন ভাল এসব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে।।
এইমত মনোদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে।।
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি' সকল-সংসার।
অদ্বৈত-আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার।।
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দৃঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে' সদায়।।
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত।
ভক্তি বাখানের মাত্র—গ্রন্থের যে মত।।
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়।।
দেখিয়া অদ্বৈত তা'ন বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ।।
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'ন প্রেমানন্দ-জলে।।
অন্যোঽন্যে কৃষ্ণকথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ।।
মাধবপুরীর প্রেম —অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ।।
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার।।
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়।।

তাঁ'র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ, অ ৪।৪০২-৪১২, ৪১৬, ৪১৯-৪৪০)

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ-লীলাকালে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত মিলন হয়।

মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ।।
নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' আপনা পাসরি'।।
'ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার।।
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি শিষ্যগণে।।
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যোঽন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন।।
বালু গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে।।
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত, ধন্য হেন মানে।।
কম্প,অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাই।
দুই দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞী।।
নিত্যানন্দ বোলে,—"যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ।।
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন।।"

মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি' কোলে।
উত্তর না স্ফুরে,—কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে।।
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হইতে নিত্যানন্দে বাহির না করি।।
ঈশ্বরপুরী,ব্রহ্মানন্দপুরী-আদি যত।
সর্ব্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত।।
সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেমা কাহারো শরীরে না দেখেন।।
সভেই পায়েন দুঃখ দুর্জ্জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমেণ দেখিয়া।।
অন্যোঽন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোঽন্যে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ।।
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে।।
মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন।।
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে, কান্দে, হৈ হৈ করে হায় হায়।।
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, অট্ট অট্ট হাসে।।
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি' শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে কীর্ত্তন।।
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে।।
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ।।

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে।।
মাধবেন্দ্র বোলে,—"প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা।।
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।
যে-সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়।।
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে।।"
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি।।
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।
এই মত অন্যোঽন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবারাতি।।
কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ।।
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে।।
অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে?

(শ্রীচৈঃ ভাঃ, আ ৯।১৫৮-১৯২)

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন শেষোক্ত দুইটি পদে যে রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তিমূল। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপানুগ-গণের জন্য আরও পরিস্ফুটভাবে তাহাই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীমুখপদ্ম-বিনির্গত ও শ্রীরূপপ্রভুর 'শ্রীপদ্যাবলী'-ধৃত —"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ"-শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরলীলার মধ্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপ্রভুপাদ 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে'র কথিত ঐ পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত জীবনে ভগবদ্‌বিরহ-দুঃখের তীব্রতানুভূতি থাকিলে ভগবদ্‌বিরহে প্রাণ সংরক্ষিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অপ্রাকৃত অন্তর্দশায় নিরন্তর অপ্রতিহত প্রেমানন্দে অবস্থান-কালে সুদুঃসহ ভগবদ্‌বিরহ-সত্ত্বেও প্রেমানন্দ-সেবার পুষ্টি ও বৃদ্ধিহেতু প্রাণ-ধারণ সম্ভব হয়। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আ ৯।১৯২, 'অনুভাষ্য')

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তা'র যোগ, তবে না হয় বিয়োগ,
বিরহ হইলে কেহ না জীয়য়।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, ম ২।৪৩)

পূর্ব্বে যখন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীব্রজমণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনে আসিয়া শৈল পরিক্রমা করিলেন এবং 'শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে' স্নান করিয়া সন্ধ্যাকালে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া সহজ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড-হস্তে শ্রীল পুরীপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তৎসম্মুখে উক্ত দুগ্ধভাণ্ড স্থাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"পুরীপাদ! তুমি এই দুগ্ধ পান কর। তুমি কেন মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া আহার করিতেছ না? কি ধ্যানে মগ্ন আছ?"

বালকের সৌন্দর্য্য শ্রীপুরীপাদের চিত্ত হরণ করিল। তাঁহার মধুর-বাক্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্ত দূর হইল। শ্রীল মাধবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, তুমি কে? কোথায়ই বা তোমার বসতি? আমি উপবাসী আছি, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?" গোপ-বালক বলিলেন,—আমি গোপ, এই গ্রামে বাস করি। আমার গ্রামে কেহ

উপবাসী থাকিতে পারে না। কেহ অন্ন ভিক্ষা করিয়া ভোজন করে, কেহ-বা দুগ্ধ পান করে। অযাচক ব্যক্তিকে আমি নিজেই আহার প্রদান করিয়া থাকি। স্ত্রীগণ জল নিতে আসিয়া তোমাকে অনাহারী দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আমাকে দুগ্ধ দিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাকে এখনই গো-দোহন করিতে যাইতে হইবে, সুতরাং আমি আর এখন অপেক্ষা করিতে পারি না। পুনরায় আসিয়া আমি এই ভাণ্ড লইয়া যাইব।"

ইহা বলিয়া গোপ-বালক অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর চিত্ত বালকের সৌন্দর্য্যে ও বচন-মাধুর্য্যে চমৎকৃত হইল। তিনি সেই বালকের ধ্যান করিতে করিতে দুগ্ধ পান করিলেন এবং দুগ্ধভাণ্ড ধৌত করিয়া বালকের প্রতীক্ষায় কেবল পথের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিলেন। শেষ-রাত্রে তন্দ্রাতুল্য সহজ-সমাধিতে সেই বালককে সম্মুখে দেখিলেন। বালক যেন শ্রীপুরীপাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে এক কুঞ্জসমীপে লইয়া গেলেন এবং তাহা দেখাইয়া বলিলেন,—"আমি এই কুঞ্জে বাস করি; শীত, বৃষ্টি ও বাতাগ্নিতে বহু দুঃখ পাইতেছি। তুমি গ্রামের লোককে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহিরে আনয়ন কর এবং শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া তথায় একটি মঠ নির্ম্মাণপূর্বক আমাকে স্থাপন কর। বহু শীতল জলে আমার শ্রীঅঙ্গ মার্জন কর। আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। 'কবে আসিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র আমার সেবা করিবে' এই আশায় আমি এতদিন এখানে রহিয়াছি। তোমার প্রেমবশে আমি তোমার সেবা অঙ্গীকার করিয়া ও সকলকে দর্শন দান করিয়া সকলের উদ্ধার সাধন করিব। আমার নাম—শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ, তাঁহার পুত্র শ্রীবজ্র, যাঁহাকে পাণ্ডবগণ শ্রীদ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরার রাজা করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিপতি। পরে ম্লেচ্ছ-ভয়ে এক সেবক শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বত হইতে আমাকে এই কুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সেই সময় হইতে আমি এই কুঞ্জে বাস করিতেছি।"

এই সকল কথা বলিয়া সেই বালকরূপী শ্রীগোপাল অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শ্রীমাধবপুরী স্বপ্ন-সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াও আমি

চিনিতে পারিলাম না'—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে প্রেমাবেশে ভূবিলুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু, শ্রীগোপালের আজ্ঞা-পালনের জন্য সুস্থির হইয়া প্রাতঃস্নান-পূর্ব্বক গ্রাম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সকল লোককে একত্রিত করিয়া তাহাদের গ্রামের ঈশ্বর শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারীকে কুঞ্জ হইতে আবিষ্কার করিবার জন্য প্ররোচনা করিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অধ্যক্ষতায় গ্রামবাসিগণের সমবেত যত্নে কুঞ্জ কর্ত্তিত ও দ্বার কৃত হইলে, মৃত্তিকা ও তৃণে আচ্ছাদিত শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হইলেন। মহা-মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র করিয়া 'মহাভারী ঠাকুর' শ্রীগোপালদেবকে শ্রীপুরীপাদ পর্ব্বতোপরি লইয়া গেলেন এবং একটি মর্ম্মর-সিংহাসনে ঠাকুরকে স্থাপন করিলেন। 'শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে'র জল, নানাপ্রকার পূজোপকরণ, নৈবেদ্য ও নানা বাদ্যভাণ্ডযোগে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকোৎসবের আয়োজন হইল। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং নানাভাবে শৃঙ্গারাদি করিয়া স্বহস্তে ভোগারাত্রিক-সম্পাদন ও স্তব-বন্দনাদি করিতে করিতে আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপর গ্রামের সকলের প্রদত্ত উপকরণে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন, রোটিকা-প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া 'অন্নকূট-মহোৎসব' সম্পাদন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ।।
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।।
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁহার হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল।।
ইহা অনুভব কৈল মাধব-গোসাঞি।
তাঁ'র ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই।।

* * *

দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার।।

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল।।

*　　　*　　　*

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর।।
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
দশ সহস্র গাভী গোপালের হৈল।।
গৌড় হৈতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোসাঞি রাখিল তা'রে করিয়া যতন।।
সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয়,—পুরীর আনন্দ বাড়িল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, ম ৪/৭৫-৭৮, ৮৬-৮৭, ১০১-১০৪)

এইভাবে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ দুই বৎসর শ্রীগোপালের সেবা করিবার পর ভক্তবৎসল শ্রীগোপাল শ্রীপুরীপাদের নিকট পুনরায় স্বপ্ন-সমাধিযোগে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পুরীপাদ! নিদারুণ গ্রীষ্মে আমার শরীর অত্যন্ত তপ্ত হইয়াছে, তুমি আমার অঙ্গে মলয়জ চন্দন লেপন কর, তাহা হইলে আমার তাপ-নিবৃত্তি হইতে পারে। তুমি স্বয়ং অবিলম্বে শ্রীনীলাচলে গমন করিয়া চন্দন লইয়া আস। অন্যের দ্বারা এইকার্য্য হইবে না।"

শ্রীপুরীপাদ এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং প্রেষ্ঠ অভিষ্টদেবের আজ্ঞা-পালনের জন্য অবিলম্বে 'পুরী'র পথে গৌড়ে আগমন করিলেন। 'শান্তিপুরে' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দীক্ষামন্ত্র-প্রদানপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে 'রেমুণা'য় আসিয়া শ্রীগোপীনাথ দর্শণ ও প্রেমবিহ্বল হইয়া তথায় নৃত্যগীত করিলেন। শ্রীগোপীনাথের সেবা-সৌষ্ঠব-দর্শনে আনন্দিত হইয়া শ্রীল পুরীপাদ শ্রীগোপীনাথের সেবককে ভোগের প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্দেশ্য—স্বীয় শ্রীগোপালদেবকে ঐরূপ ভোগ প্রদান করিয়া শ্রীগোপালের সুখোৎপাদন করিবেন। পূজারী শ্রীগোপীনাথের 'অমৃতকেলি' ক্ষীরভোগের মহিমা খ্যাপন ও

প্রশংসা করিলে, শ্রীল পুরীপাদের শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরভোগের অনুরূপ ভোগ শ্রীগোপালকে প্রদান করিবার ইচ্ছায় ঐ ক্ষীর-প্রসাদ অযাচিতভাবে পাইবার জন্য ইচ্ছা উদিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই অতি দৈন্যভরে উহাকে জিহ্বাবেগ মনে করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগোপীনাথের ভোগারতি দর্শন করিয়া শ্রীল পুরীগোস্বামী স্থান ত্যাগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

অযাচিত-বৃত্তি পুরী —বিরক্ত, উদাস।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস।।
প্রেমামৃতে তৃপ্তি, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হইল, তাহে মানে অপরাধে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, ম ৪/১২৩-১২৪)

শ্রীল পুরীপাদ রাত্রিতে গ্রামের শূন্য হট্টে বসিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে পূজারী শ্রীগোপীনাথের শয়ন দিয়া নিজে শয়ন করিলে স্বপ্নমধ্যে পূজারীকে শ্রীগোপীনাথ শ্রীপুরীপাদের জন্য অপহৃত ক্ষীর অবিলম্বে তাঁহাকে হাটে নিয়া প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। পূজারী নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীগোপীনাথের ধড়ার আঁচলতলে শ্রীগোপীনাথের অপহৃত সেই ক্ষীর প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষীরহস্তে শ্রীপুরীপাদকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষীর প্রদান করিলেন। পূজারীর মুখে শ্রীগোপীনাথের ঐরূপ ক্ষীরচৌর্য্য-লীলা-শ্রবণে পুরীর অদ্ভুত প্রেমোদয় হইল। ঐরূপ অদ্ভুত প্রেম-দর্শনে পূজারী শ্রীপুরীপাদকে শ্রীকৃষ্ণবশকারী মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। শ্রীল পুরীপাদ প্রেমাবেশে শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীগোপালের ইন্দ্রিয়োৎসব বিধানের জন্য সেই ক্ষীর ভক্ষণ করিলেন এবং পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বহির্বাসে বাঁধিয়া রাখিলেন। প্রতিদিন উহার এক একটি খণ্ড ভোজন করিয়া পুরী অত্যদ্ভুত প্রেমে আবিষ্ট হইতেন।

এদিকে 'শ্রীগোপীনাথ শ্রীপুরীপাদের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছেন', লোকে এই কথা পূজারীর নিকট শুনিয়া পুরীকে ভক্ত-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিবেন এবং লোক-সংঘট্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া শ্রীল পুরীপাদ সেই রাত্রি-শেষেই শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্র শ্রীপুরীর আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইল।

শ্রীনীলাচলে বহু লোক আসিয়া শ্রীপুরীপাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত।।
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, ম ৪/১৪৬-১৪৭)

শ্রীল পুরীপাদ শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে শ্রীগোপালের মলয়জ চন্দন শ্রীঅঙ্গে ধারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে ভক্তগণ নানাভাবে চন্দন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের আরাত্রিক যে শ্রীকর্পূরের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেই শ্রীকর্পূর ও মলয়জ চন্দন শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ রাজপাত্রগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রীপুরীগোস্বামীর সহিত একজন বিপ্র, একজন সেবক, তাঁহাদের পথের খরচ এবং ঘাটোয়ালগণ যাহাতে পারের পয়সা গ্রহণ না করে, তজ্জন্য শ্রীপুরী গোস্বামীর হস্তে পরোয়ানা প্রদান করিলেন। শ্রীমাধবপুরী সেই চন্দন ও কর্পূর লইয়া 'রেমুণা'য় উপস্থিত হইলেন। সেইরাত্রে শ্রীগোপাল স্বপ্নযোগে শ্রীপুরীগোস্বামীকে দর্শন দান করিয়া বলিলেন,—"মাধব! আমি তোমার আনিত কর্পূর ও চন্দন সমস্তই পাইয়াছি। তুমি চন্দন ঘষিয়া কর্পূরের সহিত শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন কর। শ্রীগোপীনাথ ও আমার একই অঙ্গ। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে চন্দন প্রদান করিলেই আমার তাপক্ষয় হইবে। ইহাতে তুমি দ্বিধা ভাবিও না। আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন কর।"

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালের এই আজ্ঞা শ্রীল পুরীপাদ শ্রীগোপীনাথের সেবকগণকে জ্ঞাপন করিলেন। সমগ্র গ্রীষ্মকালে চন্দন-সম্ভার নিঃশেষিত হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীল পুরীপাদ 'রেমুণা'য় অবস্থান করিলেন এবং গ্রীষ্মান্তে নীলাচলে আসিয়া চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে এই প্রসঙ্গ বলিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ, করহ বিচার।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর।।

দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁ'রে দেখা দিল।
তিন বারে স্বপ্নে আসি' যাঁ'রে আজ্ঞা কৈল।।
যাঁ'র প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিল।।

যাঁ'র লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি'।।
কর্পূর-চন্দন যাঁ'র অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল।।
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পা'বে, ইহা জানিয়া গোপাল।।

মহাদয়াময় প্রভু—ভকতবৎসল।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সফল।।
পুরীর প্রেমপরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেমে চিত্তে লাগে চমৎকার।।

পরম বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্য-বার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গহীন।।
হেনজন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি' বুলে চন্দন মাগিঞা।।
ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিঞা না খায়।
হেন-জন চন্দনভার বহি' লঞা যায়।।
মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর।
'গোপালে পরাইব'—এই আনন্দ প্রচুর।।
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিঞা।
তাহাঁ এড়াইল রাজপত্র দেখাঞা।।

ম্লেচ্ছদেশে দূর পথ, জগাতি অপার।
কেমতে চন্দন নিব, নাহি এ বিচার।।
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি দান দিতে।
তথাপি উৎপাত বড় চন্দন লঞা যাইতে।।
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব-আচার।
নিজ দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার।।
এই তা'র গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁ'রে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে।।
বহু পরিশ্রমে চন্দন 'রেমুণা' আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল।।
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, ম ৪।১৭১-১৮৯)

শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীপ্রভু শৃঙ্গাররস-তরুর মূল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীঅমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্ত-মূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গাররসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর 'দক্ষিণ-দেশ' ভ্রমণসময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ" এই অপূর্ব্ব শ্লোক রচনাদ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরা-রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে 'দীন-দয়ার্দ্রনাথকে' এই ভাবে ডাকিবেন। **জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।** শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,

—'হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর শ্রীউদ্ধব-দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গার রসতরুর মূল—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী—তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাহার মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাহার শাখা-প্রশাখা।"

যে-স্থানেই বিপ্রলম্ভ-ভাগবত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় আছে, সেইস্থানেই অতি অবশ্য শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধ অবস্থিত জানিতে হইবে। আত্মগোপনকারী অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-প্রেমবিকারময় শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্য শ্রীমথুরাবাসী সানোড়িয়া বিপ্র তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি।।
কৃষ্ণপ্রেমা তাহাঁ, যাহাঁ তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, ম ১৭।১৭২-১৭৩)

শ্রীল পুরীপাদের অন্তর্দ্ধান-লীলা—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁ'র স্থান।।
পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন।।
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁ'রে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে।।
"তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?"

শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর, পাপী' বলি' ভর্ৎসনা করিল।।
"'কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন-দুঃখে মরোঁ,এই দিতে আইল জ্বালা।।
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হ'বে অসদগতি।।
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে।।"

এই যে মাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার 'বাসনা' জন্মিল।।
শুষ্ক ব্রহ্মোতে নাহি কৃষ্ণের 'সম্বন্ধ'।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ।।
ঈশ্বরপুরী করে, শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন।।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।।
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'।।
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব-নিন্দাকর।।

মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে।।
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তেঁহো করিলা অন্তর্দ্ধান।।

অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।

এই ত' শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম করে উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহ, ভক্তের ভাববিশেষ।।
পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, অ ৮।১৬-৩৪)

শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্যলীলা-প্রকটনকারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু যে-ভাবে শ্রীমাধবপুরী গোস্বামি-প্রভুর আরাধনা-দিবসের সম্মান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন সবিস্তার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে।।
দৈবে সেই পুণ্যতিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা।।
শ্রীগৌরসুন্দর সব পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্যদিনে।।
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য-গোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন, তা'র অন্ত নাই।।
নানাদিক্ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে।।
মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতি প্রীতি সবাকার।
সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার।।
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি' সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিবার।।
নিত্যানন্দ-প্রভুবর সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার।।

কেহ বলে,—“ আমি সব ঘষিব চন্দন।”
কেহ বলে,—“মালা আমি করিব গ্রন্থন।।”
কেহ বলে,—“ জল আনিবারে মোর ভার।”
কেহ বলে,—“ মোর দায় স্থান-উপস্কার।।”
কেহ বলে,—“মুঞি যত বৈষ্ণবচরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন।।”
কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে।।
কতজনে লাগিলা করিতে সংকীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কতজন।।
আর কতজন ‘হরি’ বলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আর কতজনে।।
কতজন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহ বা হইলা তিথিপূজার আচার্য্য।।
এইমত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ।
সবেই করেন কার্য্য যা’র যেন মন।।
খাও, পিও, লেহ, দেহ আর হরিধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি।।
শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল।।
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
অদ্বৈতভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম।।
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি’ বুলেন হরিষে।।
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর দুই চারি।
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি।।

ঘর পাঁচ দেখে ঘট, রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি।।
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত ।
ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলাপাত।।
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।।
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া-পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হৈল বিদ্যমান।।
পটোল, বার্ত্তাকু, থোর, আলু, শাক, মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ।।
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি-দুগ্ধ।
ক্ষীর, ইক্ষুদণ্ড,অঙ্কুরের সনে মুদ্গ।।
তৈল-লবণ, ঘৃত কলস দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লিখিবারে পারি কত।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ, অ ৪।৪৪১-৪৬৮)

সবে করে 'জয় জয়' মহা হরিধ্বনি।
'বল বল, হরি বল' আর নাহি শুনি।।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সবার সুন্দর-বক্ষ—মালায় পূর্ণিত।।
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সবেই নৃত্য-গীত করে প্রভু-বিদ্যমান।।
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন।।
নিত্যানন্দ—মহামল্ল প্রেমসুখময়।
বাল্যভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়।।

বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য-গোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন—তা'র অন্ত নাই।।
নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস।।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে ।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে।।
সর্ব্ব পারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা' লইয়া।।
মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন।।
এইমত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া।।
তবে শেষ আজ্ঞা মাগি' অদ্বৈত-আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য।।
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু, চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব ভক্তগণ।।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয়।
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয়।।
দিব্য অন্ন, বহুবিধ পিষ্টক, ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা, আইর রন্ধন।।
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্বভক্ত লৈয়া।।
প্রভু বলে,—"মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ, অ ৪।৪৯২-৫০৮)

বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের মূলপুরুষ শ্রীবল্লভাচার্য্য ও শ্রীবল্লভাত্মজ ভাগবতবর শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী-প্রমুখ গুরুবর্গকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধরের একান্ত নিজ-জন প্রেমিক-কুল-শিরোমণি শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে নানাপ্রকার অমূলক ও ঐতিহাসিক অসঙ্গতিপূর্ণ সমৎসর-উক্তিসমূহ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের তথাকথিত প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রেম-ভক্তি-রসের আদিসূত্রধার শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামিপাদকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যের মূলে যে একটি অসৎ অভিসন্ধির ইতিহাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহা পুষ্টিমার্গীয় একশ্রেণীর সাহিত্য আলোচনা করিলে প্রত্যেক সুধী পাঠকই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ পূর্ব্বে বাল-গোপাল-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, পরে শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর কৃপায় চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইলে শ্রীশ্রীল পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর নিকট কিশোর-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। (১) ইহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র (অন্ত ৭।১৪৫-১৬৭) পাঠকগণ অবগত আছেন। ১৪৩৪ বা ১৪৩৫ শকাব্দায় (১৫১২-১৩ খৃষ্টাব্দে) ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর পিতৃদেব শ্রীবল্লভের সহিত শ্রীবল্লভ ভট্টের আবাসস্থলী 'আড়াইল' গ্রামে পদার্পণ করিয়া স্বগোষ্ঠী শ্রীবল্লভাচার্য্যের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯।৮৪-১১২) (২) সেই সময় শ্রীবল্লভাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগোপীনাথ

---

(১) বল্লভ ভট্টের হয় বাৎসল্য-উপায়ন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন।।
পণ্ডিতের সনে তাঁ'র মন ফিরি' গেল।
কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন দিল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অ ৭।১৪৪-১৪৫)

(২) 'শ্রীবল্লভাচার্য্যজীকী নিজবার্ত্তা' নামক পুস্তকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের 'আড়াইল' গ্রামে পদার্পণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ আমেদাবাদের শেঠ মঙ্গলদাস গিরিধর দাসের কন্যা সরস্বতীর নিকট হইতে পাওয়া যায়। ১৯৫৯ সম্বতে চারিটী হস্তলিখিত পুঁথির সহিত মিলাইয়া এই পুস্তক সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রিত হয়। তৎপরে আমেদাবাদ

মাত্র দুই তিন বৎসর বয়স্ক বালক, দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্‌ঠলের জন্ম হয় নাই। শ্রীগোপীনাথ ১৪৩২ শকাব্দে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) ও শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ ১৪৩৭ শকাব্দে (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। [৩] (শ্রীচৈঃ চঃ অনুভাষ্য, ম ১৮।৪৭; ম ১৯।১০৮) অন্য বিবরণ অনুসারে শ্রীবল্লভাচার্য্যের দুই পুত্রই তখন অল্পবয়স্ক

'বীরবিজয়' প্রেস হইতে ১৯৭৯ সম্বতে মণীলাল ছগনলাল এই গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ইহার পর ১৯৯০ সম্বতে উক্ত প্রেস হইতেই লল্লুভাই ছগনলাল দেসাই উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'আড়াইলে' বিজয়ের বার্ত্তা এইরূপ সংক্ষেপে লিখিত আছে,—"বংগদেশতে কৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবন আবত অড়েলমে আপকো নিবাস সুনিকে শ্রীআচার্য্যজীকে পাস আয়ে তিন্‌কে শরীরমে শ্রীকৃষ্ণকো নিবাস দেখী শ্রীআচার্যজীনে বিনকো অসমর্পিত বস্তুমেসুঁ সামগ্রী দে জিমায়ে যে কছুক দিন আপ্‌কে পাস রহে পাছে কৃষ্ণচৈতন্য অপ্‌নে স্থল শ্রীবৃন্দাবন গয়ে।" (১৯৯০ সম্বৎ সংস্করণ, ৫৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীর শিষ্য পণ্ডিত গদাধরদাস দ্বিবেদীর নামে আরোপিত "সম্প্রদায়-প্রদীপঃ" নামক সংস্কৃত-গদ্যে লিখিত একটি পুস্তকে (রচনা-কাল ১৬১০ সম্বৎ বা ১৪৭৫ শকাব্দা বলিয়া কথিত) আড়াইল-গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদার্পণের কথা এইরূপ লিখিত আছে,—"একদা পূর্ব্বং গঙ্গাতীরে বসতঃ শ্রীবল্লভস্য গৃহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যৈঃ সমাগতম্। তমদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্টা শ্রীবল্লভেনোক্তম্—'ইমে কৃষ্ণচৈতন্যাঃ', ইত্যুক্ত্বা নমস্কৃতাঃ। তৎসময়ে মধ্যাহ্ন-ভোগানন্তরং ভগবতি শয়নং গতে সতি স্বধর্ম্ম-পত্নীং শ্রীবল্লভোঽব্রবীৎ—ভোঃ! মদাজ্ঞয়া ত্বমস্মৈ সুপক্কমন্নং ভোজয়। পত্নী প্রাহ—অনিবেদিতং কথং দেয়ম্? তদা শ্রীবল্লভেনোক্তম্—দেয়মেব, অস্য হৃদয়স্থঃ শ্রীকৃষ্ণো ভোক্ষ্যত্যেব।" (৮০ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে (আড়াইল গ্রামে) বাসকারী শ্রীবল্লভের গৃহে একদা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আগমন করিলেন। তাঁহাকে প্রথমবার মাত্র দেখিয়া শ্রীবল্লভ বলিলেন, —'ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। এই বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। সেই সময়ে মধ্যাহ্ন-ভোগের পর শ্রীভগবানের শয়ন হইলে শ্রীবল্লভ নিজ পত্নীকে বলিলেন,—'ওগো! আমার আজ্ঞায় তুমি ইঁহাকে সুপক্ক অন্ন ভোজন করাও।' পত্নী উত্তর করিলেন,—'অনিবেদিত অন্ন কিরূপে দিব?' তখন শ্রীবল্লভ বলিলেন,—'দিতেই হইবে। ইঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণই ভোজন করিবেন।' (মেবারের অন্তর্গত কাঁক্‌রোলী 'বিদ্যাবিভাগ' হইতে প্রকাশিত)।

(৩) শ্রীযদুনাথজীকৃত 'শ্রীবল্লভদিগ্‌বিজয়' গ্রন্থের পূর্ব্বযাত্রাবচ্ছেদে, শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের আবির্ভাব কাল ও "শ্রীবল্লভাচার্যজীকী চৌরাশি বৈঠককে চরিত্র" পুস্তকে (আমেদাবাদ

ছিলেন এবং শ্রীবল্লভাচার্য্য দুই পুত্রকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই (?) পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ ম ১৯।১০৮)

যে রূপেই হউক, সেই সময় বা পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য ও তৎপুত্রগণ সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বল্লভ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পুস্তকে শ্রীবল্লভাচার্য্য ও শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের সদোপাস্য শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামি-প্রভু হইতে গৌড়ীয় গুরুবর্গের, এমন কি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করা হইয়াছে, তাহার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পরস্পর অসঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

১। "শ্রীগুসাঁইজীকে (শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীর) ২৫২ বৈষ্ণবকী (২৫২ জন বৈষ্ণব-শিষ্যের) বার্ত্তা" নামক পুস্তকে * শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রভুকে শ্রীবল্লভ-ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীর দ্বারা নিযুক্ত শ্রীনাথজীর পূজক ও

বীরবিজয়-প্রেস-সংস্করণ, ২২৭ পৃষ্ঠা) গোবিন্দস্বামিকৃত শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীর যে জন্মপত্রিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে ১৫৭২ সম্বৎ, ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের পৌষী কৃষ্ণা নবমী শুক্রবারে দিবা দণ্ড ২১।২৫ পল সময়ে শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। "শ্রীবল্লভাখ্যান তথা মূলপুরুষ" নামক গুজরাটী ভাষায় লিখিত গ্রন্থেও (১৯৫৫ সম্বৎ, গোবর্দ্ধনদাস লক্ষ্মীদাস, মুম্বাই সংস্করণ) ঐ তারিখ দৃষ্ট হয়। 'নির্ণয়সাগর প্রেস' হইতে মূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা বি-এ, এল্-এল্-বি, ভকীল, হাইকোর্ট, কর্ত্তৃক প্রকাশিত (সম্বৎ ১৯৮৪) 'অণুভাষ্যে'র সংস্করণের ভূমিকায়ও উক্ত সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"Sri Vitthalesvara Dikshita was born at Charanata near Allahabad on the 9th day of the dark half of Margasirsha, 1572 Samvat. Vallavacharya in his later life adopted Adel as his permanent residence, and therefore Vitthalesvara passed his childhood there".

* ১৯৮৮ সংবতে মুম্বাই লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত বল্লভ-সম্প্রদায়ের রামদাসজীর সম্পাদিত পুস্তকের ৫০৪ পৃষ্ঠায় ২৫১ বার্ত্তায় 'মাধবেন্দ্রপুরী' প্রবন্ধ।

শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উহাতে এইরূপ এক গল্পের অবতারণা দৃষ্ট হয়। "শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তিনি আড়াইলে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী প্রত্যহ বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইতেন এবং শ্রীল পুরী গোস্বামীর নিকট শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ প্রত্যহই তাঁহার পাঠ্যপুস্তক রাখিয়া আসিতেন ও গৃহে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেন। একদিন শ্রীল মাধবেন্দ্র শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তুমি আমার নিকট পুস্তক রাখিয়া যাও, কিরূপে পাঠ শিক্ষা করিতে পারিবে?" শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ পুস্তক ব্যতীতই পাঠ বলিতে সমর্থ জানাইলে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথকে পাঠ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অপেক্ষাও দশগুণ অধিক সুন্দর করিয়া পাঠ বলিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। রাত্রিকালে শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের অদ্ভুত শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী নিদ্রিত হইয়া পড়িলে শ্রীনাথজী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নিকট স্বপ্নযোগে বলিলেন,—"আমি শ্রীগিরিরাজে প্রকট হইয়াছি, আমার সেবা আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না, আমার সেবা শিক্ষা দিবার জন্য আমি আমার আর একটি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিঠ্‌ঠলনাথজী-রূপে প্রকট হইয়াছি, যদি তোমার আমার সেবাপ্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের শরণ গ্রহণ কর। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি শেষ রাত্রে বিচার করিলেন,—"কোন্ সময় রজনী প্রভাত হইবে? কোন্ সময়ই বা বিঠ্‌ঠলনাথ পড়িতে আসিবেন?" অন্যদিন শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ পড়িতে আসিলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথকে বলিলেন,—"আপনি পূর্ণ পুরুষোত্তম হইয়াও কেবল আমার মত সেবা-বিমুখ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই আমার নিকট পাঠ অভ্যাসের লীলা করিতেছেন। এক্ষণে আমাকে গুরুদক্ষিণা দিন। আপনি আমাকে আপনার সেবক করুন। তখন শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী শ্রীল মাধবেন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনি আমার বিদ্যা-গুরু। আপনাকে কিরূপে আমার সেবক বা উপদেশ প্রদান করিতে পারি?" ইহাতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের প্রতি শ্রীনবনীতপ্রিয়াজীর আজ্ঞা হইল, —"তুমি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে তোমার সেবক কর।" তখন শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে শ্রীনাথজীর সেবায় নিযুক্ত করিলেন এবং বাঙ্গালী

সেবকদিগকে শ্রীমাধবেন্দ্রের নিকট রাখিলেন। * শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি শ্রীনাথজীর নিকট যে কিছু দ্রব্য ভেট আসিত ও অতিরিক্ত থাকিত, তাহা সমস্তই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। এইরূপ কিছুদিন গেলে শ্রীনাথজী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে দক্ষিণদেশ হইতে মলয়জ চন্দন আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র চন্দন আনিবার জন্য দক্ষিণদেশে গমন করিলে বল্লভাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী বাঙ্গালী সেবকগণকে তাড়াইয়া দিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী দক্ষিণদেশে গমন করিয়া শ্রীহিমগোপালজীকে (?) দর্শন করিলেন। তখন শ্রীহিমগোপালজী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে তাঁহারই শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিবার আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহাকে আর চন্দন লইয়া ব্রজে যাইতে হইবে না, এইরূপ আদেশ করিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীহিমগোপালজীর শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন এবং তথায়ই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন।”

এই গল্পের কিয়দংশ যে মাৎসর্য্যমূলে কল্পিত হইয়াছে, তাহা বল্লভ-সম্প্রদায়ের স্ব-বিরোধী উক্তি ও ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হয়। বল্লভ-সম্প্রদায়ের একাধিক গ্রন্থে বিঠ্ঠলের আবির্ভাব ১৪৩৭ শকে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর যখন আড়াইলে পদার্পণ করেন, তখন শ্রীবিঠ্ঠলের জন্মই হয় নাই, জন্ম হইয়া

---

* আবার “শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা” নামক পুস্তকে (আমেদাবাদ সংস্করণ, ১৯৯০ সংবৎ, ২২ প্রসঙ্গ, ৪১ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে যে, শ্রীবল্লভাচার্য্য ১৫৭৬ সংবতে (১৪৪১ শকাব্দে) অব্যবহিত পরেই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীর প্রধান সেবাধ্যক্ষ করেন। তখন বিঠ্ঠলনাথের বয়স ৪ বৎসর মাত্র। কারণ বিঠ্ঠলের জন্ম ১৫৭২ সংবৎ, শকাব্দ ১৪৩৭। ‘৮৪ বৈঠক’, শ্রীযদুনাথকৃত ‘বল্লভদিগ্‌বিজয়’ (পূর্ব্বযাত্রাবচ্ছেদ) ও ‘বল্লভাখ্যান’ দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরে ১৪৩১ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে রেমুনায় শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণের নিকট শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্তৃক শ্রীগোপাল আবিষ্কার ও শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শ্রীবিগ্রহ-স্থাপন, অন্নকূট-মহামহোৎসবাদির কথা এবং শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের রচিত ও তাঁহার অপ্রকটকালে শ্রীপুরীপাদের দ্বারা কীর্ত্তিত “অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ” শ্লোক কীর্ত্তন করেন (শ্রীচৈঃ চঃ ম ৪।১৮-১০৮)। শ্রীবিঠ্ঠলনাথের জন্মের ছয় বৎসর বা ততোঽধিক কাল পূর্ব্বে ঐ সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

থাকিলেও শ্রীবিঠ্‌ঠল তখন হয় ত' নিতান্ত শিশু। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের তিরোভাবের ৩২ বৎসর পরে বিঠ্‌ঠলনাথের জন্ম হয়। সুতরাং শ্রীবল্লভ-ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের সহিত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রভুর সাক্ষাৎকার করাইয়া শ্রীল পুরীগোস্বামীকে শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্য করাইবার অবৈধ চেষ্টা কেবল পারমার্থিক অপরাধ নহে, উহা ঐতিহাসিক আত্মহত্যা। শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের প্রপূজ্য পিতৃদেব শ্রীল বল্লভ ভট্টের পরাৎপর গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদ অর্থাৎ শ্রীবল্লভাচার্য্যের শ্রীগুরুদেব—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু। শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর গুরুদেব—শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। শ্রীবিদ্যানিধির গুরুদেব—শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রভু। পূজনীয় পিতৃদেবের সদোপাস্য পরাৎপর গুরুদেবকে নিম্নে টানিয়া আনিয়া যে-সকল শিষ্যব্রুব অতিবাড়ি-সম্প্রদায় নিজের গুরুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার দুরাশায় জঘন্যতম কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের সেই সকল চেষ্টা হয় উন্মত্ততার অভিব্যক্তিবিশেষ, অথবা পাষণ্ডিতার পরাকাষ্ঠা। এতদ্ ব্যতীত ঐ কল্পিত গল্পে শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীর ন্যায় মহাভাগবতবরকে পূর্ণ পুরুষোত্তম বিষয়-বিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করায় অতিবাড়ী শিষ্যগণ অহংগ্রহোপাসক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

২। 'চৌরাশি বৈঠক্‌কে চরিত্র'-গ্রন্থে * আর একটি অদ্ভুত উপন্যাস সৃষ্ট হইয়াছে —একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য কোকিলাবন হইতে 'শেষশায়ী' প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া 'ভাণ্ডীর বনে' উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে সাত দিন শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করিলেন। তথায় শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শ্রীব্যাসতীর্থস্বামীর একটি গাদি ছিল। শ্রীব্যাসতীর্থ শ্রীবল্লভ ভট্টের নিকট আসিয়া বলিলেন,—এ স্থানে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের একটি বড় গাদি আছে এবং আমি সেই গাদির মহান্ত। আমার এক লক্ষ সেবক আছে। বড় বড় রাজা আমার শিষ্য এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীও আমার একজন শিষ্য। তাঁহারই শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আমার নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকা আছে। আমি এই সকলই আপনাকে দান করিব। আপনিই আমার গাদীতে বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি এই গাদীতে সুখে বিরাজ করুন। ইহা শুনিয়া শ্রীবল্লভ-ভট্ট

---

* আমেদাবাদ 'বীরবিজয় প্রেস' হইতে লল্লুভাই ছগনলাল দেসাই কর্তৃক প্রকাশিত "চৌরাশি বৈঠক্‌কে চরিত্র" বৈঠক ২১মী, 'শ্রীভাণ্ডীরবনকী বৈঠক্‌কো চরিত্র' ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা।

বলিলেন,—'আমি আগামী কল্য আপনার কথার উত্তর দিব।' শ্রীব্যাসতীর্থ যখন নিজ আশ্রমে ফিরিলেন, তখন প্রায় অর্দ্ধরাত্র হইল। সেই সময় বল্লভাচার্য্যের চারিজন দূত মুদ্‌গর-হস্তে ব্যাসতীর্থের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। ইহাতে শ্রীব্যাসতীর্থ ঐরূপ অকস্মাৎ প্রহৃত হইবার কারণ প্রহারকারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে উহারা বলিল,—'আমরা আচার্য্যজীর (শ্রীবল্লভাচার্য্যের) দূত। তুমি আচার্য্যজীকে তোমার গাদীতে বসাইতে চাহিতেছ! ইহা তোমার পক্ষে কতদূর ধৃষ্টতা! তোমার এরূপ কি যোগ্যতা আছে যে, তুমি শ্রীআচার্য্যজীকে তোমার গাদীতে বসাইতে পার? যদি এখনও ভাল চাও, তবে আচার্য্যজীর পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ কর। নতুবা তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিব।' পরদিন প্রাতঃকালে মহান্ত শ্রীব্যাসতীর্থ বল্লভভট্টের পদানত হইয়া অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীব্যাসতীর্থকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্যনামধৃক্ গদাধর দাস দ্বিবেদীর 'সম্প্রদায়-প্রদীপে' শ্রীব্যাসতীর্থের নামে আর একটি গল্প রচিত হইয়াছে,—

দক্ষিণাপথে মায়াবাদিগণের অবস্থানের কথা জানিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্য 'বিদ্যা-নগরে' উপস্থিত হইলেন। তথায় কৃষ্ণরায় নামে একজন নৃপতি ছিলেন। সেই স্থানে মায়াবাদ-মতান্ধকার-বিনাশক শ্রীব্যাসতীর্থ নামে একজন যতি ছিলেন। রাজা কৃষ্ণরায় তাঁহার সভায় মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদিদিগের বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন। দুই পক্ষে ৬ দিন যাবৎ বিবাদ চলিতে থাকিলে লোকমুখে রাজ-সভায় বিদ্যা-বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্য স্বয়ং রাজসভা-দ্বারে উপস্থিত হইলে রাজকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সভায় সমাগত হইলেন। ঐ তর্ক-সভায় মায়াবাদীর নিকট তত্ত্ববাদিগণ পরাজিত হইলেন। তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য বলিলেন, —'রে মায়াবাদিন্! আমাকে জয় করিতে পারিলেই তোমার জয়।' শ্রীবল্লভাচার্য্য অনায়াসে মায়াবাদীকে জয় করিলেন।

রাজা শ্রীবল্লভকে কনক-কলস-জলে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে বহু উত্তম দ্রব্য দিতে চাহিলে তিনি তাহা উভয়পক্ষকে বিতরণ করেন। অনন্তর শ্রীব্যাসতীর্থ শ্রীবল্লভাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন, —"যদি বল্লভাচার্য্যের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমাদের সম্প্রদায় রক্ষা হইতে পারে। তাহা হইলে আমি ইহাকে

সন্ন্যাস প্রদান করিয়া সম্প্রদায়ের আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতাম।” (এই কনকাভিষেকের বিস্তৃত বিবরণ ‘শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা’ ৪ বার্ত্তা, ৯ম পৃষ্ঠায় এবং ‘কনকাভিষেকের ইতিহাস’ নামক গুজরাটী গ্রন্থে বর্ণিত আছে।)

ইত্যবসরে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াচার্য্য দ্রবিড়দেশীয় শ্রীবিল্বমঙ্গল স্বপ্নে শ্রীবল্লভ আচার্য্যকে দর্শন দান করিয়া বলিলেন,—“তুমি ব্যাসতীর্থের শিষ্য হইও না। আমি তিরোভূত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতেছি। সাত শত বৎসর অতীত হইল। ইতোমধ্যে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে সাতশত আচার্য্য প্রকট হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের সর্ব্বশেষরূপে অবস্থিত আছি। যখন ভগবদাজ্ঞায় রুদ্র শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে ভক্তিমার্গ হইতে বিচলিত করিল, তখন আমি শ্রীভগবৎসমীপে গমন করিবার প্রার্থনা জানাইলাম। তৎকালে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই যুগে শ্রীবল্লভ-নামে এক ব্যক্তি আমার মুখাগ্নির অবতার-স্বরূপ হইবে। আমি বল্লভরূপে চতুর্লক্ষ জীবকে ভক্তিপথ দ্বারা উদ্ধার করিব। তাঁহার আত্মজরূপে ৩২ লক্ষ জীবকে উদ্ধার করিব। আর অন্যান্য বহু জীবকে তৎপুত্রাদিরূপে উদ্ধার করিব। তাঁহাকে সমগ্র বিষ্ণুস্বামি-মত উপদেশ করিয়া ও তাঁহার মত শ্রবণ করিয়া পরে আমার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।”

১৬৫৮ সংবতে শ্রীবিঠ্ঠলনাথের ষষ্ঠ পুত্র শ্রীযদুনাথজী-কৃত (জন্ম ১৬১৩ সম্বৎ) “শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ঃ” গ্রন্থের ২য় অবচ্ছেদে মাধ্ব-যতি শ্রীব্যাসতীর্থের প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে,—

“মাধ্বমস্করী ব্যাসতীর্থঃ সমেত্য প্রাহৈনং ‘ভবান্ মদাদেশং স্বীকৃত্য মৎ-সিংহাসনমারুহ্য মন্মার্গপ্রচারকো ভবতু’। বল্লভো যথেশ্বরেচ্ছা ভবিষ্যতি তথা করিষ্যামীত্যাহ। ততো ভগবান্ তস্যামেব নিশ্যাহ ভবান বিষ্ণুস্বামিমতা আচার্য্যো ভবতু ব্যাসতীর্থকথিতং মা স্বীকরতু।”

‘অর্থাৎ মাধ্ব-সন্ন্যাসী ব্যাসতীর্থ উপস্থিত হইয়া ইহাকে বলিলেন,—“আপনি আমার আজ্ঞা-স্বীকার-পূর্ব্বক আমার গদীতে আসীন হইয়া মদীয় মত-প্রচারক হউন।” শ্রীবল্লভ বলিলেন,—“ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব।” অনন্তর ভগবান্ সেই রাত্রিতেই শ্রীবল্লভকে বলিলেন,—“আপনি বিষ্ণুস্বামি-মতের আচার্য্য হউন, ব্যাসতীর্থের বাক্য স্বীকার করিবেন না।”

“শ্রীবল্লভাচার্য্যকী নিজবার্ত্তা” পুস্তকের চতুর্থ বার্ত্তায় ৫-১১ পৃষ্ঠায়ও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের বিদ্যানগরে শ্রীকৃষ্ণদেবরায় রাজার আশ্রয়ে অবস্থান-

কালে একদিন রাত্রে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী শ্রীব্যাসতীর্থ শ্রীবল্লভ আচার্য্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে 'তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার জন্য নানাভাবে প্ররোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য্য বিচার করিয়া পরে উত্তর প্রদান করিবেন এরূপ বলায় শ্রীব্যাসতীর্থ স্থান ত্যাগ করেন। (এই স্থানে ব্যাস-তীর্থকে প্রহারের প্রসঙ্গ নাই)।

ঐ রাত্রিতেই শ্রী...ষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীবিল্বমঙ্গলও শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিকট সশরীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামীর লিখিত একটি পত্র শ্রীবল্লভের হস্তে প্রদান করিয়া জানান যে, তাঁহাকে (শ্রীবল্লভকে) অনেক সাম্প্রদায়িক কার্য্য করিতে হইবে। আদি-বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে। উহাকে রক্ষা না করিলে জগতের মঙ্গল হইবে না। তাহাতে শ্রীবল্লভাচার্য্য বলিলেন,—"বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটী উত্তম পক্ষ, সেটীই গ্রহণ করা উচিত। তাহার সম্বন্ধে চিন্তার কোনও কারণ নাই।" শ্রীবিল্বমঙ্গল আরও জানাইলেন যে, তিনি শ্রীভগবদ্ আদেশে এই সকল কথা শ্রীবল্লভ-ভট্টকে জ্ঞাপনার্থ সে-স্থানে বায়ুরূপে সাতশত বৎসর অবস্থান করিতেছেন। ইহা বলিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল অন্তর্হিত হইলে শ্রীবল্লভাচার্য্য শয়নার্থ গমন করিলেন। তখন শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি কখনও মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকার করিও না।" তৎপর দিন প্রাতেঃ শ্রীবল্লভাচার্য্য বিদ্যানগরে সমস্ত মতবাদিগণের নিকট হইতে বিজয়পত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সকল গল্প শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরুবর্গকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে মাৎসর্য্যমূলে কল্পিত হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, গুণ্ডামির কথাও একশ্রেণীর তথাকথিত পুষ্টিমার্গীয়গণের ভক্তিগ্রন্থে ইতিহাসরূপে মুদ্রিত অক্ষরে প্রচারিত হইতে পারে! ইহা দ্বারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার ন্যায় লোকমান্য আচার্য্যকে পর্য্যন্ত গুণ্ডার দলের প্রশ্রয়দানকারী বলিয়া অন্যায়ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ভক্তিশাস্ত্রে বলেন,—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতি যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।

(শ্রীভঃ সঃ, ২৬৫ অনুচ্ছেদ-ধৃত স্কান্দ-বাক্য)

শ্রীব্যাসতীর্থ শ্রীব্যাসরায়-মঠীয় যতি ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় শ্রীমধ্ব হইতে চতুর্দ্দশ অধস্তন। কোনও মতে ইঁহারই শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ। তদনুগত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। শ্রীব্যাসতীর্থের রচিত গ্রন্থাবলী— (১) 'ন্যায়ামৃত', (২) 'তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা', (৩) 'তর্কতাণ্ডব', (৪) 'ভেদোজ্জীবন', (৫-৭) 'খণ্ডনত্রয়-মন্দারমঞ্জরী' ও (৮) 'তত্ত্ববিবেক- মন্দার- মঞ্জরী'। শ্রীব্যাসতীর্থ কৃত 'ন্যায়ামৃত'-গ্রন্থ শুদ্ধ বৈদান্তিক-সমাজে নিখিল- প্রতিপক্ষ-খণ্ডনকারী, পাশুপতাস্ত্র-তেজোনিস্তেজঃকারী, পরমতেজোবান্, পরম শক্তিশালী, বিষ্ণুভক্ত-রক্ষাকারী ও সাক্ষাৎ বিষ্ণুহস্তস্থ সুদর্শনের ন্যায় বিরাজমান। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীব্যাসতীর্থ এই 'ন্যায়ামৃত'-গ্রন্থের দ্বারা নিঃশেষে মায়াবাদি- সম্প্রদায়ের সমস্ত বিচার খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন। এইরূপ আচার্য্য-কেশরী মহাভাগবতবর শ্রীব্যাসতীর্থকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের অনুগতাভিমানী গুণ্ডা-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ প্রহার (?) করিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা দ্বারা বল্লভ-সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহা হইলে কি ঐ সকল ব্যক্তি মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের দ্বারা নিযুক্ত গুণ্ডাবিশেষ? নতুবা এইরূপ জগদ্‌বিখ্যাত আচার্য্য ও মহাজনের প্রতি তাহাদের আক্রোশ কেন?

শ্রীবল্লভ-ভট্ট অতি বাল্যকালে শ্রীব্যাসতীর্থের প্রশিষ্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট বেদাধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। * (শ্রীবল্লভদিগ্‌বিজয় ও 'নিজবার্ত্তা', ২২শ বার্ত্তা, ৪১ পৃষ্ঠা) আবার, পূর্ব্ব-কথিত অন্য বিবরণ অনুসারে

* শ্রীযদুনাথজী-কৃত (১৬৫৮ সম্বৎ) "শ্রীবল্লভদিগ্‌বিজয়" গ্রন্থের ১ম অবচ্ছেদে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামি-প্রভুকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈষ্ণবশাস্ত্র-শিক্ষার শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষির অবতার বলা হইয়াছে। যথা—"মাধবযতীন্দ্রাদ্ বৈষ্ণবশাস্ত্রাণি সমগ্রহীৎ। * * আদ্যো মাধ্ব-সম্প্রদায়ী মাধবেন্দ্রযতিঃ শাণ্ডিল্যাবতারঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১০।১২) বলেন,—"আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ। তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ।।" শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্। পূজয়েদ্ বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ।।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট পূর্ব্বে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া পরে পুরীপাদকেই (!) শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন! (শ্রীবিঠ্ঠল-নাথের ২৫২ বৈষ্ণবের বার্ত্তা, ২৫১ বার্ত্তা, ৫০৪ পৃষ্ঠা)।

এইরূপ কতপ্রকার অসামঞ্জস্যকর ইতিহাস ও কল্পিত গল্প যে এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে-স্থানে এ সকল ইতিহাস পূর্ব্ব মহাজনগণকে হেয় (?) করিবার উদ্দেশ্যে কল্পিত হইয়াছে, তাহা যে অত্যন্ত জঘন্যতম মৎসরতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 'বল্লভদিগ্বিজয়', 'সম্প্রদায়-প্রদীপ', 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা' প্রভৃতি পুস্তকের বর্ণনানুসারে লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গলের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীবল্লভ-ভট্টকে কৃপা করিয়াছিলেন জানা যায়। যদিও ইহাকে আধ্যক্ষিক ঐতিহাসিকগণ অন্য চক্ষে দেখেন (কারণ, শ্রীবিল্বমঙ্গলের আবির্ভাবের কাল শ্রীবল্লভের জন্মের কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে), তথাপি ইহাতে ভগবদ্ভক্তগণের আপত্তির কারণ হয় না; কিন্তু যেস্থানে পূর্ব্ব মহাজনগণকে ঐতিহাসিক কালের গণ্ডী অতিক্রম করাইয়া নীচে টানিয়া আনিয়া শিষ্যত্বে পরিণত করিবার বা গুণ্ডাদ্বারা প্রহার করাইবার গাঁজাখুরি গল্পের সৃষ্টি হয়, সেস্থানে তত্ত্ববিদ্‌গণ সেইরূপ মাৎসর্য্যমূলক দুরভিসন্ধির প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

সম্প্রতি 'ব্যাসযোগ-চরিতম্'-নামক একটি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ ব্যাসতীর্থের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের সাক্ষাৎকারকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। 'নির্ণয়সাগর প্রেস' হইতে প্রকাশিত 'অণুভাষ্যে'র সংস্করণের (ইং ১৯২৬) ভূমিকায় মিঃ এম্, টি, তেলীবালা লিখিয়াছেন,—
"The author of a recently discovered work 'Vyasayoga-charitam', from Vyasa-Raya-Matha, does chronicle the fact that Vallavacharya was honoured by the king

---

জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তি।" অতএব 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈষ্ণবশাস্ত্র-শিক্ষাগুরুকে শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী নিজ শিষ্য করিয়াছিলেন'—এইরূপ উক্তি ইতিহাস ও পরমার্থ উভয় বিচার হইতেই সম্পূর্ণ অলীক। "শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ঃ" শ্রীবিঠ্ঠলনাথের পুত্র শ্রীযদুনাথের লিখিত; তাহাতে শ্রীশাণ্ডিল্য-ঋষির অবতার শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবল্লভাচার্য্যের শাস্ত্র-শিক্ষাগুরুরূপে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব অন্যান্য কল্পিত উক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

Krishnadeva Raya, under the presidentship of the then famous Madhva-Swami Vyasa-Tirtha."

'ব্যাসযোগ-চরিতে' উদ্ধৃত বিবরণে মাধ্ব-স্বামী শ্রীব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বের কথা উদ্ধৃত হওয়ায় তাঁহারই অধিক সম্মানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীব্যাসতীর্থ 'ন্যায়ামৃত'-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিবার পর মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈত-সিদ্ধিতে' 'ন্যায়ামৃত' খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরামাচার্য্য তীর্থ 'তরঙ্গিণী' গ্রন্থে অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্মানন্দ গিরি 'তরঙ্গিণী' খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু 'তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে'র শ্রীবনমালা মিশ্র ব্রহ্মানন্দের মতবাদ নিঃশেষিতরূপে খণ্ডন করেন। 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা' গ্রন্থে (২৯শ প্রসঙ্গ, ৫২ পৃষ্ঠা) দৃষ্ট হয় যে, প্রয়াগে উক্ত মধুসূদন সরস্বতীর সহিত বল্লভাচার্য্যের সাক্ষাৎকার হইলে তিনি সরস্বতীর গীতা-ভাষ্যোক্ত মঙ্গলাচরণ ও তৎকৃত ''ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থের সিদ্ধান্ত শ্রবণে আনন্দিত হ'ন। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীব্যাসতীর্থের প্রতিপক্ষ কেবলাদ্বৈতবাদীকে পরাভূত করিয়া থাকিলে তিনি কেবলাদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতীর সিদ্ধান্তে আনন্দ লাভ কি রূপে করিলেন? কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতমত তত্ত্ববাদী শ্রীব্যাসতীর্থ নির্ম্মমভাবে খণ্ডন করেন বলিয়াই পরবর্ত্তী বল্লভী-সম্প্রদায় শ্রীব্যাসতীর্থকে প্রহার করিবার গল্প সৃষ্টি ও তাঁহার নামে নানাপ্রকার কথা রচনা করিয়াছেন।

গদাধর দাস দ্বিবেদীর 'সম্প্রদায়-প্রদীপে'র ৩য় প্রকরণের শেষে লিখিত হইয়াছে,—''বিষ্ণুস্বামিন উপসম্প্রদায়শ্চৈতন্যঃ" (৪৮ পৃঃ, কাঁকরোলি সংস্করণ) অর্থাৎ 'শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুস্বামীর একটি উপ-সম্প্রদায়-বিশেষ।' ঐ পুস্তকেরই চতুর্থ প্রকরণে ৫৯ ও ৬২ পৃষ্ঠায় ও 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা' গ্রন্থের ৪র্থ প্রসঙ্গ ১০ পৃষ্ঠায় শ্রীবল্লভাচার্য্যকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ানুবর্ত্তী বলা হইয়াছে। শ্রীব্রজনাথের রচিত ''পূর্ব্বগুরু শংসন-বিবরণে" ও শ্রীযদুনাথের সংস্কৃত 'শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয়ে' শ্রীদেবতনু-আদি-বিষ্ণুস্বামী, শ্রীরাজগোপাল-দ্বিতীয়-বিষ্ণুস্বামী (যাঁহার প্রশিষ্য শ্রীবিল্বমঙ্গল) ও আন্ধ্র-বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয়-বিষ্ণুস্বামীর পর্য্যায়ে বালভট্ট, প্রেমাকর, লক্ষ্মণভট্ট প্রভৃতির অভ্যুদয়ের কথা জানা যায়। লক্ষ্মণভট্টেরই পুত্র শ্রীবল্লভ-ভট্ট তৃতীয়-বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়া প্রচারিত। সায়ন-মাধবের 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে'র অন্তর্গত রসেশ্বর-দর্শন ব্যতীতও বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা ও

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকায় বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তের বাক্য ও সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। নীলাচলে বৈষ্ণব-সভায় শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্ত-খণ্ডনপর নিজ-কৃত শ্রীভাগবত-টীকা শ্রবণ করাইতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বামি-বিরোধি-মতকে 'বেশ্যার মত' বলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই কৃপোপদেশ শ্রীবল্লভাচার্য্য মস্তকে বরণ করিলেও তাঁহার তথা-কথিত শিষ্যাণুশিষ্য-সম্প্রদায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই কৃপা-শাসনকে কি গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার লাঘবকর মনে করিয়াছেন? আর "শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীল শ্রীধরস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া তাঁহাকে 'জগদ্‌গুরু' বলিয়াছেন" বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব 'বিষ্ণুস্বামীর উপসম্প্রদায়ভুক্ত'—এইরূপ এক অতিব্যাপ্তি-দোষযুক্ত অভিনব অভিসন্ধিমূলক মত প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন?

শ্রীবল্লভাচার্য্যের '৮৪ বৈঠক্‌কে চরিত্র' পুস্তকের ১০ নং বৈঠকে ১১৭ পৃষ্ঠায় (বীরবিজয় প্রেস, আমেদাবাদ সংস্করণ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অপেক্ষা শ্রীবল্লভ-ভট্টের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিম্নলিখিত একটি গল্পের অবতারণা দৃষ্ট হয়। শ্রীব্রজমণ্ডলে মানসী-গঙ্গার তীরে শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁহার বৈঠকে এক সময় সাতদিন শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরও একটী ভজনস্থলী ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তথায় ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তথায় এক সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, প্রত্যহ সোয়ালক্ষ নাম-কীর্ত্তন সমাপ্ত না করিয়া অন্য কোন লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। একদিন সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যানাম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে জানাইলেন যে, মানসী-গঙ্গায় শ্রীবল্লভাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিকট আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন! তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে বলেন,—"আপনি এখানে কতদিন হইল আসিয়াছেন?" তখন শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,—"আমি এখানে ছয় মাস কাল যাবৎ বাস করিতেছি। পুরাণে কথিত আছে যে, মানসী-গঙ্গা ক্ষীরময়ী। শ্রীমানসী-গঙ্গা স্বপ্নযোগে আমাকে বলিয়াছেন যে, এই স্থানে বল্লভাচার্য্য আসিবেন। তাঁহার কৃপায় তোমার মনোরথ-সিদ্ধি হইবে। তুমি আমার দুগ্ধময় স্বরূপ দর্শন করিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে

বলিলেন,—"আপনার মনোরথ এখনই সিদ্ধি হইবে।" এই বলিয়া নিজের কমণ্ডলুর জল বৈষ্ণবগণের চক্ষে নিক্ষেপ করিলে তাঁহাদের দিব্য-চক্ষুঃ লাভ হইল এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত সকলেই মানসী-গঙ্গায় দুগ্ধময়-স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

উক্ত পুস্তকের ৪ নং বৈঠকে ১০৮-১১০ পৃষ্ঠায় ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নামেও এক গল্প সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় জন্মে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শিষ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর স্ব-সেবিত শ্রীশালগ্রাম-শিলাকে বংশী, চূড়া প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত করিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীগোপালভট্ট তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নিবেদন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগোপাল ভট্টকে স্বপ্নে জ্ঞাপন করেন যে, "একমাত্র বল্লভাচার্য্যের শরণাগত হইলে শ্রীগোপালের মনোরথসিদ্ধি হইতে পারে।" ইহাতে শ্রীগোপাল-ভট্ট বল্লভাচার্য্যের নিকট নিজ-মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করিলে তিনি শ্রীগোপাল ভট্টের শালগ্রাম হইতে শ্রীরাধারমণ মূর্ত্তি প্রকট করাইয়া তাঁহাকে দর্শন করাইয়াছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের এই প্রভাব দেখিয়া শ্রীগোপালভট্ট তাঁহার নিকট শ্রীগুরূপদেশ প্রার্থনা করেন ও বলেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য্য সাক্ষাৎ পূর্ণ পুরুষোত্তম। তখন বল্লভাচার্য্য গোপলভট্টকে বলিলেন,—এই জন্মে তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেরই শিষ্য থাকিবে। জন্মান্তরে তুমি পুষ্টিমার্গে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে এই শ্লোকটীও বলেন,—

"জন্মান্তরসহস্রেষু তপোধ্যানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে।।"

অর্থাৎ সহস্র সহস্র জন্মে তপঃ, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে মানবগণের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয়।

পরজন্মে পুষ্টিমার্গের সহিত সম্বন্ধ হইলে শ্রীগোপালভট্টের নাম 'শ্রীগোপাল নাগা' হইয়াছিল।

এই সকল গাঁজাখুরি গল্প কি স্ত্রীলোকগণের মনোরঞ্জনার্থ পুষ্টিমার্গীয় ভুঁইফোড় কথক-সম্প্রদায় পরবর্ত্তিকালে রচনা করিয়াছেন?

শ্রীবল্লভের পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথজী মথুরায় শ্রীরূপের সহিত শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর পূজা বিধান করিয়াছিলেন, 'আড়াইল'-গ্রামে যে শ্রীবল্লভাচার্য্য

সবংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ষালন জল পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন; নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের শাসন অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া যে শ্রীবল্লভাচার্য্য আত্ম-শোধন করিয়াছিলেন, সেই বল্লভাচার্য্যের যে-সকল অতিবাড়ী শিষ্যব্রুব-সম্প্রদায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিজ-জনকে হেয় করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের মাহাত্ম্য-বুদ্ধির চেষ্টা করে, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীবল্লভ-ভট্টের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে। ঐতিহাসিক বিচারের দিক্ হইতেও এই সকল উক্তির অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

আমরা শ্রীরাধারমণ ঘেরার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট "শ্রীরাধারমণের সেবা-প্রাকট"-নামক যে প্রাচীন-গ্রন্থ দর্শন করিয়াছি, তাহাতে শ্রীশালগ্রাম হইতে শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের প্রাকট্যের কাল ১৫৯৯ সম্বৎ দৃষ্ট হয়। বল্লভ-সম্প্রদায়ের 'ঘরুবার্ত্তা' শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়-পুস্তকে বল্লভাচার্য্যের তিরোভাব ১৫৮৭ সম্বতে লিখিত আছে, অর্থাৎ শ্রীবল্লভাচার্য্যের তিরোভাবের ১২ বৎসর পর শ্রীরাধারমণ বিগ্রহের প্রাকট্য হইয়াছিল। অতএব শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের প্রাকট্য কিছুতেই শ্রীবল্লভ আচার্য্যের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না।

বল্লভ-সম্প্রদায়ের "সম্প্রদায়-প্রদীপ" প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত শ্রীবল্লভভট্টের কেবলমাত্র 'আড়াইল' গ্রামে ও নীলাচলে সাক্ষাৎকার হয়। ব্রজমণ্ডলে সাক্ষাৎকারের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি কোন প্রামাণিক গ্রন্থে, এমন কি, শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়াদি পুষ্টিমার্গীয় প্রাচীন গ্রন্থেও নাই। যখন শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীবল্লভভট্ট 'চার্ণাটে' ছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল হইতে ফিরিয়া অসেন, তখন শ্রীবল্লভ-ভট্ট আড়াইল-গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন।

যিনি নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত-শিরোমণিগণেরও অর্চ্চনীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম, যিনি মূল-আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একান্ত নিজজন, যিনি "ভক্তিরসের আদি সূত্রধার", যিনি 'ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর', যিনি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের পরমগুরু ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের লীলাভিনয়কারী, যিনি শ্রীবল্লভাচার্য্য ও তৎপুত্র শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীর শ্রীগুরুপাদপদ্মগণেরও সদোপাস্য, সেই নির্ম্মৎসর ভগবৎ-পার্ষদবরের পূর্ব্বগুরু হইতে তাঁহার শ্রীচরণে এরূপ অপরাধ করায় সেই অপরাধের বীজ পুষ্ট হইয়া তথাকথিত পুষ্টিমার্গে গৃহব্রত প্রাকৃত-সাহজিয়-ধর্ম্ম ও অবৈধ

বিলাস-ব্যসনের বিষবৃক্ষ ফল-মূলে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সেই অপরাধ ক্রমে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে। * বস্তুতঃ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগৃহীত শ্রীবল্লভাচার্য্য বা শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথের অনুকম্পিত শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী কখনই এইরূপ অপরাধের প্রশ্রয় দান করেন নাই বলিয়াই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

একদিন শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বৃদ্ধ বয়সে নিজগণ-সহ শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর সেবা-সৌষ্ঠব-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমথুরার 'সাতঘরা'-নামক পল্লীতে শ্রীবিঠ্ঠল-নাথের ভবনে এক মাসকাল অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীগোপালের দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর শ্রীগোপালের সেবা-দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া 'গোপালরাজ-স্তোত্রে' এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন,—

কলিতবপুরিব শ্রীবিঠ্ঠলপ্রেমপুঞ্জঃ
পরিজন-পরিচর্য্যা-ধৈর্য্যপীযূষপুষ্টঃ।
দ্যুতিভরজিত-মাদ্যন্মন্মথোদ্যৎসমাজঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ।।
বিবিধ-ভজনপুষ্পৈরিষ্টনামানি গৃহ্ণন্
পুলকিততনুরিহ শ্রীবিঠ্ঠলস্যোরুসখ্যোঃ।
প্রণয়মণিরসং স্বং হন্ত তস্মৈ দদানঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ।।

(শ্রীগোপালরাজ-স্তোত্র, ১৩-১৪)

শ্রীগোপালরাজ যেন শ্রীবিঠ্ঠলনাথের মূর্ত্তপ্রেমরাশি; তিনি সেবকরূপ পরিজনগণের পরিচর্য্যা ও স্নেহামৃত-দ্বারা পুষ্ট, তিনি স্বীয়কান্তি-পুষ্পদ্বারা আনন্দ-যুক্ত নবীন মদনদেবসমূহকে পরাজিত করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনশৈল-পীঠে অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন।

---

* গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।।
(শ্রীচৈঃ চঃ অ ৮।৯৭)

যিনি শ্রীবিঠ্ঠলনাথের বিবিধ ভজনরূপ পুষ্পের সহিত নিজ নামসমূহ গ্রহণ (শ্রবণ) করিয়া রোমাঞ্চিতাঙ্গ হ'ন, তাঁহাকে নিজ প্রণয়রূপ-মণিহার প্রদান করেন, সেই শ্রীগোপালদেব শ্রীগোবর্দ্ধন-পীঠে সুষ্ঠুভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন।.

শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ-কালে গাঠুলীতে গমন করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ-সেবা-দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হন।

বিঠ্ঠলের সেবা—কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ।।
শ্রীবিঠ্ঠলনাথ ভট্ট বল্লভ-তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি—কহিলে না হয়।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।৮০৪-৫)

পুষ্টিমার্গীয় লেখক ও শ্রীবল্লভাচার্য্য-কৃত শ্রীব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য 'অণুভাষ্যে'র সম্পাদক হাইকোর্টের উকিল মূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা বি-এ, এল্-এল্-বি, নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত (১৯৮৪ সম্বৎ) উক্ত গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"During his stay in Jagannatha, Vitthalesvara came in contact with the immediate followers of Chaitanya, living there. It is possible that the composition of Swaminyastaka (স্বামিন্যষ্টক), Swaministotra (স্বামিনী-স্তোত্র) and several other minor stotras, in which the Eternal Consort Radha of Sree Krishna is extolled, date from this period; or their composition may be due to the direct or indirect influences of Chaitanya-Saints. There is no stotra or writing of Vallabhacharya to our knowledge where Radha is extolled in the strain in which Vitthalesvara has done.

* * * *

His commentary on Krishnapremamrita (কৃষ্ণপ্রেমামৃত)

and Sringara-rasa-mandana (শৃঙ্গার-রস-মণ্ডন) may be due to Chaitanya-mould of thought."

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের দক্ষিণ তটে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামী প্রভুর উপবেশন-স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রভুকে এই শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ডেই শ্রীগোপালদেব এক গোপ-বালক-মূর্ত্তিতে দুগ্ধ দান করিবার ছলে দর্শন দিয়াছিলেন এবং পরে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে উদ্ধার করিবার আদেশপ্রদানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারা প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড আনোর বা শ্রীঅন্নকূট-গ্রামের দক্ষিণে শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিকটে অবস্থিত। যে-স্থান হইতে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কুঞ্জ কাটিয়া শ্রীগোপাল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেইস্থানে বর্ত্তমানে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অলিন্দাকার গৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগমনে তদীয় এক শিষ্য ইংরাজী ১৯৩২ সনের ১৮ই অক্টোবর তারিখে এই স্থান দর্শন ও বন্দনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রবেশ-দ্বারে একটি প্রস্তরফলকে এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্রীনাথজীকো আপ্নমঃ সম্বৎ ১৫৩৫

বৈশাখ বদি ১১ ধনিষ্ঠা

নক্ষত্রমে জন্ম

বারান্দায় আর একটি প্রস্তরফলকে হিন্দি ভাষায় যাহা লেখা আছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এই—"পুরুষোত্তমজী মহারাজের (বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের) আজ্ঞায় বৈষ্ণব গোবিন্দ দাস গরসোলা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সম্বৎ ১৭২১। এই স্থানে শ্রীগিরিরাজের অংশ দৃষ্ট হয়।

শ্রীগোবিন্দকুণ্ড হইতে পুছরী হইয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিতের গুহার পার্শ্বদেশ দিয়া যতিপুরা হইয়া তথায় শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপরে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালজীর শ্রীমন্দিরের ভগ্নাবশেষকে নিম্নপ্রদেশ হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গাঠোলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। আনোর বা অন্নকূট গ্রামের পশ্চিমে ও শ্রীগোবর্দ্ধনের অপরপার্শ্বে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রকাশিত শ্রীগোপালপুরা-গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে

ব্রজবাসিগণ এ স্থানে শ্রীগিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করিয়াছিলেন। এ স্থানে শ্রীগিরিরাজের শ্রীমুখারবিন্দ বিরাজমান। শ্রীঅন্নকূট-গ্রামের সাদু পাঁড়ের গৃহের নিকটে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলায় শ্রীকৃষ্ণের দধিকটরা ও কমল-চিহ্ন আছেন। শ্রীগোপালজীর প্রকটের স্থানের পার্শ্বেই শ্রীঅন্নকূট-স্থান।

স্থানীয় প্রাচীন ব্রজবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যায় যে, যতিপুরার পূর্ব্বনাম শ্রীগোপালদেবের নামানুসারে 'গোপালপুর' ছিল; পরে শ্রীভগবানের নাম অপেক্ষা তাঁহার ভক্তবর শ্রীমাধবেন্দ্র যতির প্রতিষ্ঠা (যিনি প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্রও ভিক্ষুক নহেন) অধিক হওয়ায় ঐ স্থানের নাম 'যতিপুরা' হইয়াছে। যে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরী তাঁহার দুই জন গৌড়দেশীয় বৈরাগী শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোপাল-দেবের সেবা করাইতেন, সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও শ্রীগিরিরাজের উপর দূর হইতে দৃষ্ট হয়। পরে শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথ শ্রীগোপালদেবের প্রদত্ত স্বপ্নাদেশে পূরণমল নামক এক ক্ষত্রিয় শেঠ তৎসংলগ্ন স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ মন্দির দূর হইতে যুগ্ম শ্রীমন্দিরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। একটি মূল-মন্দির ও আর একটি শয্যা-মন্দির। আওরঙ্গজেব এই মন্দিরের চূড়া বিনষ্ট (?) করিলে পরে বল্লভ-সম্প্রদায়ের দ্বারকেশ মহারাজ (প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে) চূড়া সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এখন উক্ত মন্দিরের চূড়া নূতন-প্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীগোপালদেব শ্রীগোবর্দ্ধননাথ নামেও অভিহিত হইতেন। পরে 'শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথজী' বা সংক্ষেপে 'শ্রীনাথজী' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রাণধন শ্রীগোপালদেব (নামান্তর শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথ বা শ্রীনাথজী) পরবর্ত্তিকালে ম্লেচ্ছ-উপদ্রবের ভয়ে শ্রীবল্লভাচার্য্যের অধস্তনগণের দ্বারা উদয়পুর-রাজধানীর মধ্যে 'সিংহার'-নামক স্থানে নীত হইয়াছেন।

স্থানীয় ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার পর শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার পর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারা গিয়াছিল, তিনি শ্রীনামভজনকে 'বহিঃপ্রবণা ভক্তি' ও লীলাশ্রবণাদিকে 'অন্তঃপ্রবণা ভক্তি' বলেন। শ্রীমনোহর দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীঅনন্তদাসজী বলিয়াছিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগোবিন্দকুণ্ড বল্লভীদের রাজ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা গৌড়ীয়গণকে 'আন-মার্গী' বলিয়া উপহাস করিত। এজন্য তাঁহার গুরুদেব শ্রীমনোহর দাস বাবাজী ছোট ছোট ছেলেদিগকে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তৎপরে

শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইলেন ও তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া জীবিকার্জ্জনের আদেশ দিলেন। ইহাতে বল্লভী গোঁসাইগণ সন্তুষ্ট হইয়া গৌড়ীয়গণকে কিছু স্থান প্রদান করিলেন। কিন্তু বল্লভী গোঁসাই রণছোড়লালজীর পুরোহিত রামস্বরূপ মিশ্রজী যখন শ্রীমনোহরদাসজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তখন বল্লভী সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। রামস্বরূপের জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র পথ পৌরোহিত্য বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া শ্রীমনোহর দাসজী রামস্বরূপকে বল্লভীদের সঙ্গেই মিশিয়া থাকিতে বলিলেন।

শ্রীঅনন্তদাসজী জানাইয়াছিলেন যে, এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী বল্লভীদের সভায় গিয়া পাঠ করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীবল্লভাচার্য্যকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি- প্রভুর শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করায় বল্লভী সম্প্রদায়ের লোকজন ক্ষেপিয়া উঠিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দাসজীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদাস- জীর আশ্রমে মহোৎসব হইলে সেই রাত্রেই কতকগুলি গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"তুমি এত উৎসব দিতেছ, নিশ্চয়ই তোমার নিকট অনেক টাকা আছে, আমাদিগকে সেই টাকা দাও।" শ্রীরামকৃষ্ণদাসজী টাকা দিতে না পারায় গুণ্ডারা শ্রীরামকৃষ্ণদাসজীকে বিশেষভাবে প্রহার করে ও তাহার ফলে রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর প্রাণধন শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল গিরিরাজের উপর বিরাজ করিতেছিলেন। কিন্তু লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন শ্রীগোবর্দ্ধনে আগমন করিলেন, তখন গিরিরাজের উপর আরোহণ করিবেন না, বিচার করিলেন। অথচ কিরূপে শ্রীগিরিধারীর দর্শন প্রাপ্ত হইবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। তখন শ্রীগোপাল ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া 'গাঠোলি'-গ্রামে আগমন করেন। আনোর গ্রামে সংবাদ আসিল, পাঠানগণ সেই স্থান আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছে। শ্রীগোপালের গৌড়ীয় পূজারিগণ এই সংবাদ পাইয়া অনতিবিলম্বে শ্রীগোপালদেবকে গাঠোলি-গ্রামে 'গুলাল-কুণ্ডে'র উপরে লইয়া গেলেন। তখন ঐ স্থান নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল। পূজারিগণ সেই নিভৃত স্থানে শ্রীগোপালের সেবা করিতে লাগিলেন। কথিত হয়, এই সময়ই শ্রীগৌরহরি শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীব্রজধামে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'গাঠোলি' গমন করিয়া

শ্রীগোপালদেবের দর্শন করিলেন। শ্রীগোপাল তিন দিবস কুণ্ডের উপর ছিলেন। পূজারিগণ যখন দেখিলেন যে, যবনগণ আর আসিল না, তখন তাঁহার চতুর্থ দিবসে শ্রীগোপালদেবকে শ্রীগিরিরাজের উপরিস্থিত মন্দিরে লইয়া গেলেন। এই সময় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য দুই জন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহের পূজক ছিলেন।

সে-সময়ে গোপালের সেবা-অধিকারী।
সেই দুই বিপ্র—যারে শিষ্য কৈলা পুরী।।
মাধবেন্দ্র-কৃপাতে গৌড়ীয়া বিপ্রদ্বয়।
বৈরাগ্যে প্রবল, প্রেমভক্তি-রসময়।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।৮১২-১৩)

কথিত হয় যে, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দর লোদীর অনুচরগণ শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীবিষ্ণুমন্দির-সমূহের উপর (?) অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। বিধর্ম্মীর উপদ্রবের ভয়ে 'গৌড়ীয়া' পূজারিগণ শ্রীগোপালদেবকে শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বত উপরিস্থিত মন্দির হইতে তিন মাইল দূরে 'টঙ্কের ঘোণা'-নামক গহন কাননে লইয়া যান ও তথায় গোপনে সেবা করিতে থাকেন। এই সময় কবি কুম্ভনদাস শ্রীগোপালদেবের সঙ্গে ছিলেন। কুম্ভনদাসের ব্রজ-ভাষায় রচিত "ভাবত হৈ তোয় টোডকো ঘনৌ। —তুমি টোডের গহন কাননই ভালবাস"—এই পদে শ্রীগোপালদেবের টোডের বনে অবস্থানের কথা জানিতে পারা যায়। অত্যাচারী সেকেন্দর লোদীর অনুচরগণ শ্রীগোবর্দ্ধন-মন্দির (?) বিধ্বস্ত করিয়া স্থান ত্যাগ করিলে শ্রীগোপালদেব টঙ্কের ঘোণা নামক বন হইতে গিরিরাজের প্রায় এক মাইল দূরে 'শ্যামঢাক'-নামক স্থানে নীত হন এবং তথায় একটী ক্ষুদ্র তৃণ-কুটিরে পূজিত হইতে থাকেন। এই সময় শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। কথিত হয়, তিনি ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের চৈত্রী শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্যামঢাক হইতে শ্রীগোপালদেবকে আনয়ন করিয়া শ্রীগিরিরাজে স্থাপন করেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উপরিস্থিত শ্রীগোপালদেবের মন্দিরটী সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করিলেন, ১৪৪১ শকাব্দা বা ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সংকীর্ত্তন-উৎসব-মুখে শ্রীগোপালদেবকে স্থাপন

করিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের নিম্নে একটী কুটীর রচনা করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে এই স্থানে কৃষ্ণদাস-নামে একজন গুজরাট দেশীয় শূদ্র ব্যক্তি আগমন করে এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হয়। শ্রীবল্লভাচার্য্য কৃষ্ণদাসকে কর্ম্মদক্ষ ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দেখিয়া শ্রীমন্দির সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধনের নিম্নে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া কতিপয় গৃহাদিও নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই স্থানে যতি-শিরোমণি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অবস্থান করিতেন বলিয়া উহা 'যতিপুরা' নামে প্রসিদ্ধ হইল। শ্রীবল্লভাচার্য্য ১৫৮৭ সম্বৎ, ১৪৫২ শকাব্দা বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের অপ্রকটের পর কৃষ্ণদাস শ্রীগোপালের মন্দিরে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হইল। সেই ব্যক্তি মন্দিরের মধ্যে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। গৌড়ীয় পূজারিগণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামি-প্রভুর শিক্ষানুসারে শ্রীগোপালদেবের যাবতীয় প্রসাদ ও অর্থাদি সমস্তই নিঃশেষ বিতরণ ও ব্যয় করিয়া দিতেন, ইহাতে কৃষ্ণদাস অসন্তুষ্ট হইত। কারণ, সে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজ-বিষয়-বর্দ্ধনের চেষ্টায় ছিল। কৃষ্ণদাসের গঙ্গাবাই-নামিকা এক নর্ত্তকীর সহিত অবৈধ-প্রণয় জন্মিয়াছিল। সে আগ্রা হইতে এক নর্ত্তকী আনাইয়া শ্রীগোপালদেবের উত্থানের সময় বৈষ্ণব-কীর্ত্তনকারিগণের পরিবর্ত্তে বারবনিতার নৃত্য-গীত প্রচলন করিবার চেষ্টা করিল। কৃষ্ণদাস অত্যন্ত ধূর্ত্ত-প্রকৃতির বিষয়-লোলুপ ব্যক্তি ছিল। একদিন সে 'আড়াইল'-গ্রামে আসিয়া শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্যের নিকট গৌড়ীয় পূজারিগণের বিরুদ্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। কথিত হয় যে, শ্রীবিঠ্ঠলনাথ ধূর্ত্ত-কৃষ্ণদাসের কথায় সরল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজা টোডরমল্ ও বীরবলকে কৃষ্ণদাসের সহায়তার জন্য পত্র দিলেন। মৎসর কৃষ্ণদাস মথুরায় আসিয়া কতকগুলি দুষ্ট-প্রকৃতির লোক সংগ্রহ করিয়া একটী ষড়যন্ত্র করিল। যখন গৌড়ীয় পূজারিগণ শ্রীগোবর্দ্ধনের উপরে শ্রীগোপালের সেবায় নিরত ছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণদাস পশ্চাৎদিক্ হইতে গমন করিয়া 'রুদ্রকুণ্ডে'র উপর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বাসস্থানে অগ্নিসংযোগ করিল। পূজারিগণ তথায় উপস্থিত হইতে না হইতেই তাঁহাদের বাসস্থান ও গ্রামটী ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। এই অবসরে ধূর্ত্ত কৃষ্ণদাস শ্রীগোপালজীর মন্দির অধিকার করিয়া লইল এবং পূজারিগণকে আর মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিল না, তাঁহাদিগকে লাঠির দ্বারা

তাড়াইয়া দিল ও আহত করিল। পূজারীরা এই সকল কথা শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে জানাইলেন। কিন্তু এই সময়ে শ্রীগৌর-বিরহে তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে বাস করিতেছিলেন। পূজারিগণ মথুরায় আসিয়া রাজ-দরবারে এ-সকল কথা নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণদাস রাজকর্ম্মচারীদিগকে পূর্ব্বেই অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কিছুদিন পরে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ যখন শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রাণধন শ্রীগোপালের সেবা মথুরার রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্তগত হইবে, তখন গৌড়ীয় আচার্য্যগণ শ্রীগোপালের সেবা ও শ্রীমন্দিরের ভার শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীকে প্রদান করিলেন এবং গৌড়ীয়-পূজারিগণেরও বিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কহিতে কি সে-দুই বিপ্রের * অদর্শনে।
কথো দিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে।।
শ্রীদাসগোস্বামি-আদি পরামর্শ করি'।
শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী।।
পিতা শ্রীবল্লভ-ভট্ট—তাঁর অদর্শনে।
কথো দিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে।।
পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়।
সদা সাবধান এবে গোপাল-সেবায়।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।৮১৪-১৭)

গোকুলনাথজীর রচিত "চৌরাশি বৈষ্ণবজী বার্ত্তা" পুস্তকে শ্রীগোপালজীর (শ্রীনাথজীর) মন্দিরের সম্পর্কে উক্ত কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"প্রথমে শ্রীনাথজীর সেবা বাঙ্গালীরাই করিতেন। (প্রথম সেবা শ্রীনাথজীকী বংগালী করতে)। পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দিলেন যে, তুমি গোবর্দ্ধনে থাক, ঠাকুরের সেবায়েৎ হও। তাই কৃষ্ণদাস অধিকারী (সেবাইত) হইলেন। একদিন কৃষ্ণদাস মথুরা যাইতেছিল, যখন সে অড়ীঙ্গে গিয়া পৌঁছিল, তখন পথে অবধূত-দাসের সঙ্গে দেখা হইল। অবধূত-দাস জিজ্ঞাসা করিলেন,

* শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী প্রভুর দ্বারা দীক্ষিত গৌড়দেশীয় বৈরাগী বিপ্রদ্বয় (শ্রীচৈঃ চঃ ম ৪।১০৩-৪)

—"শ্রীনাথজীর সেবা কাহারা করেন?" কৃষ্ণদাস কহিল,—'বাঙ্গালীরা করেন' (তব কৃষ্ণদাস নে কহী জো বংগালী করত হৈঁ)। তখন অবধূতদাস কহিলেন, —'যখন শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে, তখন তুমি বাঙ্গালীদিগকে কেন দূর করিয়া দিতেছ না?' (জো শ্রীনাথজীকৌ অপনৌ বৈভব বঢ়াবনো হৈ তাতে তুম বংগালীন কো দূর ক্যোঁ নাহীঁ করত?)

শ্রীনাথজী স্বয়ং অবধূত-দাসকে কহিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীরা আমাকে বহু কষ্ট দিতেছে। যখন বাঙ্গালীরা শ্রীনাথজীকে ভোগ নিবেদন করেন, তখন তাহাদের শিখার মধ্যে লুক্কায়িত দেবীর যে একটি ছোট মূর্ত্তি থাকে, তাঁহাকে সামনে বসাইয়া তাঁহারা ভোগ দেন। সেই দেবীমূর্ত্তিকে তাঁহারা সর্ব্বদা আপন শিখার মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। এই কথা শ্রীনাথজী অবধূত-দাসকে জানাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণদাসকে বলিলেন,—'বাঙ্গালীদিগকে তাড়াও'। তখন কৃষ্ণদাস বলিল,—'শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর আজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে তাড়াইয়া দি?' তখন অবধূত-দাস কহিলেন,—'তুমি আড়াইলে গিয়া শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর আজ্ঞা লইয়া আইস। যেমন করিয়া হউক এই বাঙ্গালীদের বিতাড়িত কর।'

কৃষ্ণদাস অড়ীং হইতে ফিরিল। সে গোবর্দ্ধনে আসিল ও বাঙ্গালীদিগকে বলিল,—'আমি শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর নিকট আড়াইলে চলিলাম, তোমরা সতর্কতার সহিত শ্রীনাথজীর সেবা করিও।' অন্য সব সেবকগণকেও কৃষ্ণদাস বলিল,—'শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর নিকট একটু কার্য্য আছে, সে জন্য আড়াইলে চলিলাম।' শ্রীনাথজীর নিকট বিদায় লইয়া কৃষ্ণদাস আড়াইলে যাত্রা করিল। কৃষ্ণদাস আড়াইলে পৌঁছিলে শ্রীবিঠ্ঠলনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কৃষ্ণদাস, তুমি কেন আসিয়াছ?' তখন কৃষ্ণদাস বলিল,—'শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে হইবে, বাঙ্গালীরা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু ভেট আসে, সব তাহারা লইয়া যায় এবং নিজ-গুরুদিগকে দেয়' (বংগালীন নে বহুত মাথৌ উঠায়ৌ হৈ জো ভেট আব্‌ত হৈ সো নে জাত হৈঁ সো সব অপনে গুরুন কো দেত হৈঁ)।

তখন গোঁসাইজীও বলিলেন,—'পূর্ব্বদেশ হইতে প্রায় লক্ষ টাকা দিয়া ঠাকুরের সোনার অলঙ্কার ও দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে বাঙ্গালীরা প্রায় এক বৎসরের মধ্যে সব লইয়া গিয়াছে এবং নিজ গুরুদেবকে নিয়া দিয়াছে।' এই কথা বলিয়া শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী কৃষ্ণদাসকে বলিলেন,—'বাঙ্গালীদিগকে আচার্য্যজী (শ্রীবল্লভাচার্য্য) স্বয়ং নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।'

তখন কৃষ্ণদাস শ্রীবিঠ্ঠলনাথকে বলিল,—'শ্রীনাথজী স্বয়ং আজ্ঞা করিতেছেন বাঙ্গালীদের তাড়াও, তখন ইহার উপর আপনি আর কিছু বলিবেন না (শ্রীনাথজী কী আজ্ঞা হৈ জো বংগালীন কোঁ নিকাসৌ তাতে আপ যা বাত মেঁ কছু মতি বোলৌ)। আপনি যদি আমাকে আজ্ঞা দেন, তবে আমিই সব ঠিক করিয়া লইব। যেমন করিয়া বাঙ্গালীদের তাড়াইতে হয়, তাহা আমিই করিয়া লইব।' কৃষ্ণদাস আরও কহিল,—'আপনি দুইখানি পত্র লিখুন, একখানি রাজা টোডরমলকে, আর একটি বীরবলকে।' শ্রীবিঠ্ঠলনাথ উভয়কে পত্র লিখিলেন,—'কৃষ্ণদাস যাহা বলে, তাহাই করিবেন।' পরে কৃষ্ণদাস আগরা আসিয়া টোডরমল ও বীরবলকে পত্র দিল। পত্র পড়িয়া তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে বলিলেন,—'তুমি যেরূপ বলিবে, আমরা সেরূপই করিব।' তখন কৃষ্ণদাস বলিল,—'এখন বাঙ্গালীদের তাড়াইতে আমি মথুরা চলিলাম।'

পথে অবধূত-দাসের সঙ্গে দেখা হইল। অবধূত-দাস বলিলেন,—'কৃষ্ণদাসজী দীর্ঘসূত্রিতা করিতেছ কেন? বাঙ্গালীদের শীঘ্র তাড়াও, শ্রীনাথজীরও ইহাই ইচ্ছা, তাঁহার নিজ-ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে হইবে।' তখন কৃষ্ণদাস বলিল,—'শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর আজ্ঞা লইয়া আসিতেছি, এখন গিয়া বাঙ্গালীদের তাড়াইব।'

সেই সব বাঙ্গালীর বাসস্থান রুদ্রকুণ্ডের তীরে ছিল। কৃষ্ণদাস একদিন বাঙ্গালীদের কুটীরে আগুন লাগাইয়া দিল। আগুন লাগিলে মহা গোলমাল হইল। তখন বাঙ্গালীরা সেবা ছাড়িয়া পর্ব্বতের নীচে দৌঁড়াইয়া আসিল। ততক্ষণে কৃষ্ণদাস আপন লোকজন পর্ব্বতের উপর পাঠাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীরা আসিয়া দেখেন, কৃষ্ণদাস কুটীরে আগুন লাগাইয়াছে। তখন বাঙ্গালীরা কৃষ্ণদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস সকলকেই দুই দুই চারি চারি লাঠি লাগাইয়া দিল। তখন সেই সব বাঙ্গালী সেখান হইতে পলাইয়া মথুরা আসিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট আসিয়া সব কথা বলিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন চুপ করিয়া রহিলেন, বাঙ্গালীদের কহিলেন,—'তোমরা জান আর ইনি জানেন।' তখন বাঙ্গালীরা মথুরায় হাকিমের নিকট গেলেন। কৃষ্ণদাসও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন হাকিম বলিলেন,—'যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, কিন্তু এখন ইহাদিগকে রাখ।' তখন কৃষ্ণদাস কহিল,—'এখন ইহাদিগকে কেন রাখিব। ইহারা আমাদের চাকর ছিল, আমরা ইহাদের উপর সেবার ভার দিয়াছিলাম, ইহারা সেবা ছাড়িয়া কেন চলিয়া আসিল? যদি ইহাদের কুটীর জ্বলিয়াই গিয়াছিল,

তবে না হয় নূতন কুটীর করিয়া দিতাম, ঠাকুরের সেবা ছাড়িয়া ইহারা অন্যত্র গেল কেন? তাই এখন আর ইহাদিগকে রাখিব না। তবে আপনি যখন বলিতেছেন, তখন 'শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীকে লিখিব, তিনি যেমন বলিবেন, তেমনই করিব।'

পরে কৃষ্ণদাস শ্রীনাথ-দ্বারে গেল, আর বাঙ্গালীরা শ্রীকুণ্ডে গেলেন। তখন কৃষ্ণদাস শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীকে পত্র লিখিল। তাহাতে বাঙ্গালীদের তাড়াইবার সংবাদ সবিস্তারে লিখিল, আর জানাইল,—'এখন আপনি যদি একবার আসেন, তবে ভাল হয়।' শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথই শ্রীনাথদ্বারে আসিলেন, তখন সেই সব বাঙ্গালী তাঁহার নিকট আসিলেন। তখন তাঁহারা শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীকে বলিলেন,—'শ্রীবল্লভাচার্য্যজী আমাদিগকে সেবাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণদাস আমাদিগকে তাড়াইল!' তখন শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী বলিলেন,—'তোমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে বলিয়া তোমরা সেবা ছাড়িয়া গেলে কেন? দোষ ত' তোমাদের, তাই এখন আর তোমাদিগকে সেবার কাজে রাখিব না।'

কৃষ্ণদাস অধিকারী পরে একবার আগ্রায় গিয়া এক বেশ্যার নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দশ মুদ্রা দিয়া বলিল,—'রাত্রিতে তোমাদের দলবল লইয়া আমার বাসাতে আসিও।' একপ্রহর রাত্রিতে তাহারা আসিল, নৃত্য-গীত হইল। কৃষ্ণদাস খুব আনন্দ লাভ করিল। বেশ্যাকে একশত টাকা দিয়া কৃষ্ণদাস বলিল,—'তোমার নৃত্য-গীত অতি সুন্দর।' কৃষ্ণদাস তাহাকে পুরবী রাগিনীতে একটি পদ শিখাইল এবং তাহাকে লইয়া নাথদ্বারে গেল। ঠাকুরের উত্থানের সময় কীর্ত্তনীয়াদিগকে কীর্ত্তনের অবসর দেওয়া হইল না, ঐ বেশ্যারই নৃত্য-গীত হইল।

সেই গঙ্গাবাঈর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের গাঢ় প্রীতি ছিল। শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীর তাহা প্রীতিকর ছিল না। একদিন ভোগের সময় ভোগের উপর গঙ্গাবাঈর দৃষ্টি পড়াতে শ্রীনাথজীর সেবা হইল না। নিদ্রিত অন্তরঙ্গ সেবককে শ্রীনাথজী জাগাইয়া কহিলেন,—'আমার খাওয়া হয় নাই।' শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী এই সংবাদ পাইয়া স্নান করিয়া পাক করিলেন ও ভোগ নিবেদন করিলেন। ভোগ অতি অপূর্ব্ব হইল। কৃষ্ণদাস তখন বলিল,—'আপনি নিজেই ভোগ প্রস্তুত করিলেন, আপনি নিজেই তাহা ভোজন করিলেন, ইহাতে উত্তম কেন না হইবে?' শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী সহাস্য-বদনে বলিলেন,—'তোমার জন্যই ত' এই সকল করিতে হইল।'

এই কথাতে কৃষ্ণদাস চটিল। সে তখন শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীকে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর মন্দিরে যাইতে নিষেধ করিল। যদিও শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী শ্রীনাথ-দ্বারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র, তবুও তিনি অধিকারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না, কিন্তু তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। এই সংবাদ বীরবলের কর্ণগোচর হইল। বীরবল কৃষ্ণদাসকে বন্দী করিলেন। শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজী ইহা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। কৃষ্ণদাসকে না দেখিলে তিনি আর ভোজন করিবেন না শুনিয়া বীরবল কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস আসিয়া শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীকে দণ্ডবৎ করিয়া একটি নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহার স্তব করিল।

কৃষ্ণদাস বহু বৎসর ধরিয়া মন্দিরে অধিকার চালাইল। একবার একজন ভক্ত আসিয়া কৃষ্ণদাসকে একটি কূপ খনন করাইবার জন্য তিনশত টাকা দিলেন। কৃষ্ণদাস দুইশত টাকা দিয়া কূপ করাইল, আর একশত টাকা এক বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিল। কূপ সমাপ্ত হইলে একদিন কৃষ্ণদাস তাহা দেখিতে গেল। কূপের মুখে লাঠী ভর করিয়া দেখিতেছে, এমন সময় হঠাৎ লাঠী সরিয়া গেল, কৃষ্ণদাস কূপে পতিত হইল। এই সংবাদ পাইয়া রামদাসজী বলিলেন,—'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ' অর্থাৎ তামসিক প্রকৃতির লোকের অধোগতিই হয়।

"শ্রীবল্লভাচার্য্যকী নিজবার্ত্তা" (আমেদাবাদ সংস্করণ ৩৬-৪০ পৃষ্ঠা) পুস্তকে শ্রীগোবর্দ্ধননাথের বড় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে এইরূপ এক বিবরণ আছে। শ্রীগোবর্দ্ধননাথ তাঁহার বৈভবের বৃদ্ধি সত্ত্বেও পূর্ব্বের অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দিরে অবস্থান দেখিয়া একটি বড় মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার জন্য অম্বালা-নিবাসী পূরণমল নামক এক ধনাঢ্য ও ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয় রাজপুতকে ১৫৫৬ সম্বতে (১৪২১ শকাব্দা, ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ) চৈত্র শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ার রাত্রিতে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। পূরণমল স্বদেশ হইতে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবর্দ্ধন-সমীপে উপনীত হইয়া দেবরাজ-দমন শ্রীকৃষ্ণের (ইন্দ্রের দমনকারী বজ্রের স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি, যাহা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী স্বপ্নাদেশে আবিষ্কার করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত করেন) অনুসন্ধান করিতে করিতে এক ব্রজবাসীর নিকট গিরিরাজের উপর উক্ত শ্রীবিগ্রহের অবস্থানের কথা জানিতে পারিলেন। সেই সময় রামদাস চৌহান নামক এক ব্যক্তি শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীর সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট পূরণমল শ্রীবল্লভাচার্য্যের অধ্যক্ষতায় শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীর তদানীন্তন সেবা হইতেছে এবং শ্রীবল্লভাচার্য্য পৃথিবী পরিক্রমার্থ বহির্গত হইয়াছেন জানিলেন।

আনোর গ্রামের অধ্যক্ষ সাদু-পাড়ে পূরণমলকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। আগ্রার হীরামণি উস্তা নামক এক স্থপতিবিৎকেও এই সময় শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী তাঁহার শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের সাহায্য করিবার জন্য স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পূরণমল ও হীরামণি উভয়ে শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিকট শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথের স্বপ্নাদেশের কথা জানাইলেন। ১৫৫৬ (১৪২১ শকাব্দ, ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ) সম্বতের বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া-তিথি রবিবারে রোহিণী নক্ষত্রে মন্দিরের ভিত্তি খোদিত হইল এবং ইহার ঠিক ২০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৭৬ সম্বৎ (১৪৪১ শকাব্দা, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া-দিবসে শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীকে ছোট মন্দির হইতে বড় নূতন মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিলেন।

অতঃপর শ্রীবল্লভাচার্য্য মর্য্যাদা-পথের বিচারানুসারে সাদুপাড়েকে কতিপয় ব্রাহ্মণ-সেবক সংগ্রহের কথা বলিলে সাদুপাড়ে জানাইলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতিগণ অর্চ্চন-কার্য্যে অভিজ্ঞ নহেন। ইহাতে শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীকুণ্ডে যে-সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহারা আচারবান ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত জানিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া সেবায় নিযুক্ত করিলেন। ত্রৈলঙ্গ-দেশীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের গুরু ও যাঁহার নিকট শ্রীবল্লভাচার্য্য কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীকে তিনি সেবার অধ্যক্ষ করিলেন; শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যগণকে শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীর সেবায় রাখিলেন, নিজ-শিষ্য কৃষ্ণদাসকে মন্দিরের অধিকারী করিলেন এবং কবি ও গায়ক কুম্ভনদাসকে কীর্ত্তন-সেবা প্রদান করিলেন। ১৪ বৎসর কাল বাঙ্গালীরা শ্রীগোবর্দ্ধননাথের সেবা করিলেন। কিন্তু পরে শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী বাঙ্গালীদিগকে সেবা হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য অবধূতদাস ও কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দিলেন। কারণ, বাঙ্গালীগণ সেবার দ্রব্য অপহরণ করিতেন। ইহার পর গুজরাটী ব্রাহ্মণ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। *

* "তব শ্রীআচার্য্যজী মনমে বিচারে জো শ্রীকুণ্ডপে ব্রাহ্মণ রহত হেঁ সো কৃষ্ণচৈতন্যকে সেবক হেঁ তিনকো রাখিয়ে তব আপনে উন বঙ্গালী ব্রাহ্মণকো বুলাইকে সেবাকী আজ্ঞা দীনী তামে মাধবেন্দ্র পুরী মধ্ব-সম্প্রদায়কে আচার্য্য তৈলংগ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচৈতন্যকে গুরু হতে জিনকে পাস শ্রীআচার্য্যজীনে কাশীমে বেদাধ্যয়ন কিয়ো হতো তা সমে ভগবৎসেবা দেবেকী কহী হতী তিনকো মুখিয়া কীয়ে উনকে শিষ্যনকো

শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী কৃষ্ণদাসকে শ্রীগোপালের মন্দিরের অধিকারিকরূপে নিয়োগ করিয়া 'আড়াইলে' প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সে রামদাস চৌহান নামক একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণকে শ্রীগোপালদেবের পূজারিরূপে নিযুক্ত করিল। শ্রীবল্লভাচার্য্যের তিরোভাবের ১০ বৎসর পরে গোপীনাথও শ্রীপুরীধামে অন্তর্হিত হন। পুরুষোত্তমজী নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিলেন। কিন্তু বিঠ্ঠলনাথই শ্রীবল্লভাচার্য্যের গদীর মালিক হইলেন। পুরুষোত্তমজী অল্প বয়সেই স্বধাম গমন করেন। এদিকে কৃষ্ণদাস শ্রীগোপাল মন্দিরের উপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। তখন সে বিঠ্ঠলনাথজীকেও শ্রীগোপাল-মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধা দিবার উপক্রম করিল। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে (?) আকবরের সৈন্যগণ 'আড়াইল'-গ্রাম আক্রমণ করে, তখন বিঠ্ঠলনাথজী 'বান্ধেগড়'-নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। তথা হইতে কিছু দিন পর 'গড্ডা সহরে' গমন করেন। 'গড্ডা'র রাণী দুর্গাবতী বিঠ্ঠলনাথজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু সেখানেও কিছুদিন পরে বিধর্ম্মীর উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী কুটুম্বগণের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিয়া বাস করেন। তখন বর্ত্তমান নূতন গোকুলের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কেবল এই স্থানে শ্রীবল্লভাচার্য্য পূর্ব্বে কিছু ভূমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানেই শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী আসিয়া বাস করিবার অভিপ্রায়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন এবং ঐ স্থানের নাম 'গোকুল' রাখিলেন।

সেবামে রাখে কৃষ্ণদাসজীকো অধিকারী কিয়ে, কুম্ভনদাসকো কীর্ত্তনকী সেবা দিয়ে"— 'শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা' (আমেদাবাদ-সংস্করণ, ১৯৯০ সম্বৎ, ২য়া আবৃত্তি, ২২শ প্রসঙ্গ, ৪১ পৃষ্ঠা)।

শ্রীযদুনাথজী-কৃত শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়-গ্রন্থে তৃতীয় যাত্রা ও পূর্ব্বচরিত্রাবচ্ছেদে পূর্ণমল্ল-ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীর মন্দির এবং সেই মন্দিরে শ্রীবল্লভাচার্য্য-দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধননাথের প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণদাসকে সেবাধিকারী ও মাধব সশিষ্য মাধব নামক বিপ্রকে সেবায় নিয়োগ করিবার কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ততো ব্রজং সমেত্য গিরিরাজমাগতাঃ। তত্র পূর্ণমল্লশ্রেষ্ঠী ভগবতাজ্ঞপ্তো দেবালয়ং কারয়িতুং সমাগতঃ। স আচার্য্যশিষ্যো ভূত্বা মাধব-মাসে শুক্লতৃতীয়ায়ামালয়খাতং সমারেভে।"

"বৈশাখশুক্লাতৃতীয়ায়াং শ্রীমদ্গোবর্দ্ধনধরস্য নূত্নালয়ে প্রতিষ্ঠাপনং কৃতম্। অধিকারী কৃষ্ণদাসঃ সেবায়াং মাধ্বো মাধবঃ সশিষ্যো নিযুক্তঃ।"

কিন্তু কিছুদিন পরেই মহাবনের ভূম্যধিকারীর সহিত বিবাদ সংঘটিত হওয়ায় শ্রীবিঠ্ঠলনাথ মথুরার 'সপ্তঘরা' নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। শ্রীমথুরার প্রসিদ্ধ 'হোলি-দরজা' বা হার্ডিঞ্জ গেট্ হইতে বিশ্রাম ঘাটের দিকে উত্তরদিকে 'তুলসী চবুতরা' নামে একটি মহল্লা আছে। 'তুলসী চবুতরা' দিয়া গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে 'সাতঘরা' নামক একটি পল্লী পাওয়া যায়। শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের সপ্ত পুত্রের নাম হইতে এই মহল্লার নাম 'সাতঘরা' হইয়াছে। 'সাতঘরা' অর্থে সাত ভ্রাতার গৃহ। এই সপ্ত ভ্রাতার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল— (১) গিরিধর, (২) গোবিন্দ, (৩) বালকৃষ্ণ, (৪) গোকুলনাথ, (৫) রঘুনাথ, (৬) যদুনাথ ও (৭) ঘনশ্যাম। এই 'সপ্তঘরা' রাণী দুর্গাবতী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। *

এই 'সাতঘরা' মহল্লায় যে-স্থানে বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহ ছিল, যে-স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার অনুগমগুলীর সহিত একমাস কাল অবস্থান করিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালেও বিঠ্ঠলেশ্বরের সপ্ত পুত্রের যে-সকল সেবা ও গৃহ ছিল, তাহা সকলই বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিধরজীর উপর গৃহকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া 'সপ্তঘরা' হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালদেবের দর্শনার্থ গমন করেন। কিন্তু কৃষ্ণদাসের অসদ্ব্যবহার দেখিয়া বিঠ্ঠলনাথজী মর্ম্মাহত হ'ন। তিনি কৃষ্ণদাসকে ইঙ্গিত করিলে কৃষ্ণদাস শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীকে শ্রীগোপালের মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে গিরিধরজী মথুরার রাজকর্ম্মচারিগণের সহায়তায় মথুরায় 'সপ্তঘরা'র পল্লীতে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন। এই সময়েই শ্রীগোপালদেবের শুভবিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপগোস্বামী

---

* To meet Vitthalesvara's desire Rani Durgavati caused to be built at Mathura the seven House which became ultimately known as "Sat-gara". Vitthalesvara and his seven sons lived at Mathura in this Sat-gara. It was in there Satgara that for about two months or so Sree Nathji was brought on Falgun Krishna 7, 1623 from the Govardhana Hill. (শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যম্,—Introduction by M. T. Telivala, ১৯৮৪ সম্বৎ, নির্ণয়সাগর-যন্ত্র-সংস্করণ)।

নিজগণ-সহ আগমন করিয়া শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্তি আছে,—

তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দরশন কৈল মথুরায় রহিয়া।।
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্ট গোসাঞি, আর লোকনাথ।।
ভূগর্ভ-গোস্বামি, আর শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি।।
শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব, দুই জন।
শ্রীগোপালদাস, আর দাস-নারায়ণ।।
গোবিন্দ ভক্ত, আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস।।
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু রঙ্গে।।
এক মাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ ম ১৮।৪৮-৫৪)

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের (৯৭৪ বঙ্গাব্দ) বৈশাখী শুক্লা-চতুর্থীতে শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর নির্দ্দেশ মত পুনরায় শ্রীগোপালদেবকে শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার কিছুকাল পরেই একটি কূপের মধ্যে পতিত হইয়া কৃষ্ণদাসের অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল।

১৬৪২ সম্বৎ, ১৫০৭ শকাব্দ ও ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে (৯৯১ বঙ্গাব্দ) মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীর স্বধামপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার সপ্তপুত্রই শ্রীগোপালদেবের 'সেবাইত' পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ও শ্রীরূপাদি-গোস্বামিবর্গের বিচার-আচারের বিরুদ্ধে নবীন মতে পূজাদির ব্যবস্থা করেন।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব ব্রজমণ্ডলের বিষ্ণু-মন্দিরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তখন বল্লভাচার্য্যের অধস্তনগণ স্থানীয় ব্রজবাসিগণের সাহায্যে

শ্রীগোবর্দ্ধননাথ শ্রীগোপালজীকে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে (১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ) গুপ্তভাবে গো-যানে করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে ক্রমে আগ্রা, কোটা, বুঁন্দি, যোধপুর, চাঁপা, সেনি, কৃষ্ণগড় প্রভৃতি স্থান হইতে উদয়পুর রাজধানীর মধ্যে 'সিংহার'-নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উদয়পুরের রাণা সুজন সিং শ্রীগোপালদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথজীর সেবার জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিলেন। ক্রমে এই স্থানে বহু লোকের বসতি হইল এবং ইহা একটি নগরে পরিণত হইল। শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী শ্রীগোপালদেব 'শ্রীনাথজী' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং ঐ স্থানের নাম 'শ্রীনাথ-দ্বার' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। ইহার বহুদিন পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইন্দোর রাজ্যের হোলকার উদয়পুর 'নাথদ্বার' আক্রমণ করায় শ্রীনাথজী বা শ্রীগোপাল-দেব 'ঘসিয়ার' গ্রামে নীত হ'ন। ছয় বৎসর পরে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় শ্রীনাথজী শ্রীনাথদ্বারে অধিষ্ঠিত হ'ন। অদ্যাপি শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামি-প্রভুর প্রাণধন ও গৌড়ীয়গণের ঠাকুর শ্রীগোপালদেব শ্রীনাথজী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীনাথদ্বারে অবস্থান করিতেছেন।

'অণুভাষ্যে'র (নির্ণয়সাগর-সংস্করণ, ১৯৮৪ সম্বৎ) ভূমিকায় পুষ্টিমার্গীয় মিঃ তেলীবালা বি-এ, এল্-এল্-বি, নিম্নলিখিত এইরূপ একটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর আবিষ্কৃত শ্রীগোপাল-দেবই পরবির্ত্তকালে বল্লভাচার্য্য ও শ্রীবল্লভের অধস্তনগণের দ্বারা শ্রীনাথজী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

"After the passing away of Vallabhacharya and Gopinatha, some disagreement seems to have arisen between the Bengal Vaishnavas and Vallabha Vaishnavas. So long as Madhabendra-puri was there, no disagreement seems to have arisen. *The image is spoken of as Gopala and described as such in the works of Chaitanya writers*. When Madhabendra-puri went to the south to fetch *Malayagaru* chandana (sandal-wood), he passed away there at an advanced age of about 130 years and the Bengal Vaishnavas used to carry on the worship of Sree Nathji under the control and supervision of Krishnadas Adhikari.

Gopinatha's visit to Gujarat brought him about a lakh of rupees as Seva. The same was dedicated by him to Sree Nathji. Vitthalesvara's frequent visits to Gujarat attracted its rich people to visit the shrine of Sree Nathji and they made rich presents to the Deity. It seems, Bengal Vaishnavas who used to carry on the worship, secretly carried away these presents to their Goswamis who lived at Vrindavan. This created great dissatisfaction among the Vaishnavas of Gujarat. One Anantadasa raised an emphatic protest against this misuse of the offerings to the Deity. He persuaded Krishnadasa Adhikari to put a stop to this and drive out the said Bengali worshippers. Krishnadasa could not do it unless he had the sanction of Vitthalesvara, who at first hesitated, because these Bengalees were appointed by his father. But after some deliberations, Krishnadasa succeeded in obtaining a letter of recommendation to Raja Birbal to help him in his mission. With this letter Krishnadasa saw Birbal, then collected a number of men with him and set fire to the huts of the Bengalees. The moment the latter came to know of this, they came down from the Govardhan Hill where the shrine was situated. At first they offered great resistance to Krishnadasa, but ultimately yielded, and he got exclusive control and possession of the shrine. Raja Birbal was intimate with Giridharaji, the eldest son of Vitthalesvara. Perhaps to establish his absolute control, Giridharaji brougth the shrine of Gopala-Sree Nathji to his own house in Mathura in 1623. From this date the mode of worship was greatly elaborated by Vitthalesvara. *It became the exclusive resort of Vallabha Vaishnavas, and Bengal Vaishnavas began to forget their early connection with it.*"

"The transference of the control of the shrine to Vitthalesvara had very marked results. Emperor Akbar presented the Jatipura village to Vitthalesvara by a special *Firman*. The inner worship became confined to the agnates of Vitthalesvara and their wives and daughters only. Among Brahmanas, Geernaras and Sachoras who early joined the Faith were allowed to take part in the worship. But the mass of Vaishnavas were henceforth excluded from coming into direct contact with the holy shrine, a result which it is doubtful whether Vallabhacharya or Vitthalesvara could have had in their minds, when Vallabhacharya got its exclusive control. His immediate object then was to exclude the Bengalees only. Perhaps it would not be out of place to remark that this was the occasion when Vitthalesvara lost all traces of Chaitanya-thought which he had gained during his visit to Jagannatha in 1616."

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী বজ্রের স্থাপিত শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল শ্রীমূর্ত্তি আবিষ্কার, 'এক মহা ধনী ক্ষত্রিয়ে'র দ্বারা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, শ্রীগিরিরাজের উপরে শ্রীবিগ্রহের পুনঃস্থাপন ও উৎসবাদি-সমাপনের পর গৌড়দেশাগত দুইজন 'বৈরাগী ব্রাহ্মণ'কে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের উপর সেবার ভার প্রদান করেন। এইরূপভাবে দুই বৎসর সেবার পর পুরী গোস্বামি-প্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুকে দীক্ষা দান করিয়া, 'রেমুণা' হইয়া মলয়জ চন্দন আনিবার জন্য পুরীতে গমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দার পূর্ব্বেই এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর শ্রেষ্ঠ শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর-পুরীর নিকট এ-সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাস-লীলার অব্যবহিত পরেই ১৪৩১ শকাব্দার ফাল্গুন মাসে রেমুণায় এই প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃত ও তাঁহার নির্য্যাণকালে উচ্চারিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ!" শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব "শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা"র ২১তম বার্ত্তার

বিবরণানুসারে ১৫৭৬ সম্বৎ অর্থাৎ ১৪৪১ শকাব্দার বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে পূরণমল ক্ষত্রিয়ের নির্ম্মিত নূতন বৃহৎ মন্দিরে শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠার পর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে সেই বিগ্রহ-সেবায় নিয়োগের ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত। বিশেষতঃ "শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিজবার্ত্তা"য় ঐতিহাসিক অসঙ্গতির অভাব নাই। সুতরাং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রমাণই শিরোধার্য্য হইবে। বল্লভী সম্প্রদায়ের লেখকগণ শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীগোপাল-বিগ্রহকে প্রথম হইতেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সম্পত্তিরূপে (?) প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদেরই সাম্প্রদায়িক ইতিহাসে কথিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের বর্ষীয়ান্ শিক্ষাগুরু এবং সর্ব্বনিরপেক্ষ পরমহংসকুল-চূড়ামণিকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের নিযুক্ত পূজারিবিশেষ বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামিপাদ গৌড়দেশীয় দুই বিরক্ত ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের উপরই সেবার ভার স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা বিরক্ত-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সেবা; শৌক্র-পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রাপ্ত গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের সেবা নহে। অন্তিম-কালে ক্রমান্বয়ে কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস অবস্থা-অঙ্গীকারকারী * শ্রীবল্লভাচার্য্যের আত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলনাথ সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ তৎকর্ত্তৃক শ্রীগোপালদেবের সেবার অনুমোদন করিয়াছিলেন। যে মহাধনী ক্ষত্রিয় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই পূরণমল হইলে তাঁহার অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে বল্লভী সম্প্রদায়ের বিচার ভ্রমপূর্ণ। অতএব অন্য কোন মহাধনী ক্ষত্রিয় (শ্রীমথুরাবাসী) হয় ত' শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং পরবর্ত্তিকালে 'অম্বালা'বাসী পূর্ণমল্ল শ্রীবল্লভাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

হাইকোর্টের উকীল তেলীবালা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিবর্গকে ধনলোভী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহা কি "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই নীতির প্রতিধ্বনি? তদানীন্তন শ্রীবৃন্দাবনবাসী যে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিবর্গ কৃষ্ণপ্রীতিমাত্রকাম হইয়া হুসেন সাহ প্রভৃতির মন্ত্রিত্ব-পদ, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া এক এক বৃক্ষের

* শ্রীযদুনাথজীকৃত 'শ্রীবল্লভদিগ্‌বিজয়ে'র উপসংহার দ্রষ্টব্য।

তলে এক এক রাত্রি যাপনকারী ও শুষ্ক-চানা-চর্ব্বণকারী মহা-বিরক্ত-শিরোমণি, দিব্যোন্মাদমত্ত মহাপ্রেমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আধ্যক্ষিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও সমস্বরে যাঁহাদের বৈরাগ্যের প্রশস্তি গান করিয়াছেন, তাঁহারা বিষয়ীর অর্থ, শ্রীবিগ্রহ-সেবার অর্থ ও 'চোরাইমাল' আত্মসাৎ করিয়াছিলেন— এইরূপ বালভাষিত উক্তি পুষ্টিমার্গীয় ব্যবহারজীবীর লেখনীতে কি অভিসন্ধিমূলে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে-কোন সুধী পাঠকই অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। পুষ্টিমার্গীয় এক শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে এইরূপ ইতিহাস, যুক্তি ও সাধারণ-নীতির সহিত অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিপূর্ণ বহু বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, ইঁহারা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির যাজক ও প্রচারক শ্রীশ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের সহিত অবৈধ-প্রতিযোগিতা করিয়া ধন-জনাদি-দম্ভময়ী তামসিকী ভক্তির যাজক গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি-সাধনের জন্যই পরবর্ত্তিকালে তথা-কথিত পুষ্টিমার্গের প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিতানুগ আদি বল্লভাচার্য্য-কথিত পুষ্টিমার্গকে স্বীকার করিয়াছেন।

মিঃ তেলীবালা জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামীর লঙ্ঘনকারী ঔদ্ধত্যপূর্ণ অশ্রৌত মতবাদকে "বেশ্যার মত" বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মে বা শ্রৌতধারায় অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ও প্রীতি নাই, তাঁহাদেরই নিকট এইরূপ উক্তি বিপ্লবময়ী বটে। বস্তুতঃ শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ শ্রীভগবানের এই শাসনকে অবনত মস্তকেই স্বীকার করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে মায়াবাদ-মতান্ধকারে নিমগ্ন থাকিবার লীলা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌরপার্ষদ বা জগদ্‌গুরু-পদবাচ্য হ'ন নাই, তাহা নহে। সেইরূপ শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদও লোকশিক্ষার্থ পূর্ব্বে কোন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-বিচার ও আচার প্রদর্শন করিলেও শ্রীগৌরপার্ষদগণের দ্বারা আচার্য্যরূপেই সম্মানিত হইয়াছেন। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীবল্লভ-ভট্টকে শ্রীশুকদেবের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'ভট্টো বল্লভনামাভূচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ।'

(শ্রীগৌঃ গঃ, ১১০ শ্লোক)

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য-সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্যকে হেয় করিবার চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠল-

নাথজীকে পর্য্যন্ত যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাই অমানী মানদ শ্রীচৈতন্যানুগ-গণের নিত্যসিদ্ধ-স্বভাব। কিন্তু পুষ্টিমার্গীয় সাহিত্যে শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলনাথকে অন্যভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। এমন কি, পরাৎপর গুরু-পাদপদ্মের উপর গুরুগিরি করাইয়াছেন! ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, শ্রীবিঠ্ঠল-নাথের চতুর্থ পুত্র গোকুলনাথজীর সময় হইতেই এই জাতীয় চিন্তাস্রোতঃ ও পুষ্টিমার্গের মধ্যে বিলাস-ব্যসনাদি আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাউস্ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"Of these, the fourth, Gokulnath, is by far the most famous, and his descendants in consequence claim kinsmen. His principal representative is the Gosain at Bombay.

Unlike other Hindu sects, in which the religious teachers are ordinarily unmarried, all the Gosains among the Vallabhacharyas are invariably family men and engage freely in secular pursuits. They are the Epicureans of the east and are not ashamed to avow their belief that the ideal life consists rather in social enjoyment than in solitude and mortification. * * * The scandalous practices of the Gosains and the unnatural subserviency of the people in ministering to their gratification received a crushing expose in a cause celebre for libel, tried before the Supreme Court of Bombay in 1862, from the detailed narrative of which I have borrowed a considerable amount of information.

Gokulnath, who is regarded as the most authoritative exponent of his grand-father's tenets, repeatedly insists in all his works, with the most marked emphasis, in the absolute identity of the Gosain with the Divinity. * * * When to this it is added that the Gosain obtains his position solely by birth, and that no defect, moral or intellectual, can impair his hereditary claim to the adoration of

his followers, who are exhorted to close their eyes and ears to anything that tends to his discredit, it is obvious that a door is opened to scandals of a most intolerable description. By the act of dedication, a man submits to the pleasure of the Gosain, as God's representative, not only the first fruits of his wealth, but also the virginity of his newly-wedded wife; while the doctrine of the Brahma Sambandha is explained to mean that such adulterous connection is the same as ecstatic union with the God, and the most meritorious act of devotion that can be performed. This glorification of immorality forms the only point in a large proportion of the stories in the Chaurasi Varta or 'Accounts of Vallabhacharya's 84 great proselytes."

—'Mathura' by F. S. Growse, 2nd.
Ed. 1880, Pages 262-3, 265-6.

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৩৩৩ সালের (ইং ১৯২৬) অগ্রহায়ণ (ডিসেম্বর) মাসে জয়পুরে শ্রীশ্রীরূপ-প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দজীর দর্শন করিয়া 'চিতোরগড়' হইয়া 'নাথদ্বারে' শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র-প্রাণনাথ শ্রীগোপালদেবের দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে যে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 'গৌড়ীয়' হইতে (৫ম বর্ষ, ২২শ-২৩শ সংখ্যা) উদ্ধৃত হইল।

"আমরা 'চিতোরগড়' হইয়া প্রাতেঃ 'মৌলি'-ষ্টেশনে উপস্থিত হই। মৌলি-ষ্টেশনেরই নামান্তর 'নাথদ্বারা-রোড়'। এই চিতোরগড় পূর্ব্ব-স্মৃতির স্মারক। একদিন উদয়পুরের রাণা এই চিতোরে সূর্য্যবংশোচিত শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মৌলি হইতে মোটর-লরী-যোগে আমরা মধ্যাহ্নে নাথদ্বারাভিমুখে যাত্রা করি। * * *

শ্রীনাথদ্বার গিরিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ও পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত একটি দূর্গম শহর। মৌলি ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মাইল আসিয়াই শ্রীনাথদ্বারার বর্ত্তমান ভূস্বামী শ্রীল

গোবর্দ্ধনলাল গোস্বামী মহাশয়ের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই ভূস্বামিত্ব উদয়পুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গোস্বামীজী একটি 'সামন্তরাজ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীনাথদ্বারায় তাঁহারই শান্তিরক্ষকগণ সেই সকল প্রদেশের শান্তি বিধান করেন। গোস্বামী হুজুরের দুই তিন কোম্পানী সেনাও আছে।

* * * শ্রীনাথদ্বারের সেবা কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নহে, সাধারণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের সকল সেবা অপেক্ষা পারিপাট্যযুক্ত ও সুবৃহৎ। ভারতে এতাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন সেবা অন্য কুত্রাপি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যহ ভোগের জন্য প্রায় ১৫০০ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। প্রসাদ পাকা ও কাঁচা-ভেদে দ্বিবিধ। নানাবিধ ব্যঞ্জন, ডালি, তরকারী, বিভিন্ন অম্লাদি মধুর রস, তদ্ব্যতীত মিষ্টান্ন দ্রব্য, লুচি, পুরি ও ক্ষীরের দ্রব্যসমূহের কোনও প্রকার অসদ্ভাব নাই। গোস্বামী মহারাজের গোশালায় দেড় সহস্র দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি কৃষ্ণ-সেবার্থ যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। গব্যদ্রব্য দ্বারা শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্যময়ী সেবার সুষ্ঠুতা বিহিত হইতেছে। শ্রীমন্দির সর্ব্বদাই জনতা-পূর্ণ। একটি নানা বিপণিবিশিষ্ট বাজারও তথায় দেখিতে পাইলাম। বাজারের মধ্যে একটি সাধারণের পাঠাগার। বহুবিধ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, পার্শী ও ইংরাজী গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রাদিতে পাঠাগারের সকল শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। আমরা গোস্বামী মহারাজের প্রধান কর্ম্মচারী কৃষ্ণদাসজীর সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি বলিলেন,—'আমার নাম কৃষ্ণদাস নহে, আমার পদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণদাস'। জানিতে পারিলাম যে, তিনি শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ-পরিবারভুক্ত না হইয়া শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি এবং সেবার প্রধান কার্য্যকারক। তিনি আমাদিগকে শ্রীগোস্বামী মহারাজের কতিপয় পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীগোস্বামী মহারাজকে আমাদের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। গোস্বামী মহারাজ সচরাচর বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের সহিত আলাপাদি করেন না। তজ্জন্য পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাদের সহিত গোস্বামি-মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন। আমরা পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ও ঐতিহ্য-বিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম। সহসা গোস্বামী হুজুরের আদেশ মত জনৈক পণ্ডিত আমাদিগের কথা শ্রবণ করিতে করিতে গোস্বামী মহারাজের নিকট আহূত হইলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই আমাদিগকে গোস্বামী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার দেওয়া হইল।

মহারাজের প্রাসাদের বিবিধ প্রাকার অতিক্রম করিয়া আমরা দ্বিতলের উপর মহারাজের বসিবার বিস্তৃত হল-গৃহে উপনীত হইলাম। প্রাসাদের স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রহরিসমূহ সুসজ্জিত-অবস্থায় দণ্ডায়মান। আমাদিগের জন্য আসন এবং বিশেষতঃ আমার জন্য স্বতন্ত্র আসন ও পণ্ডিতগণের আসন ব্যতীত গদীর উপর গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিলাম। তিনি আমাদিগকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিলেন। গোস্বামী মহারাজের সহিত আমাদিগরে অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী হরিকথা-মূলে নানাবিধ আলাপ হইল। গোস্বামী মহারাজ বিশেষ বিনয়ী এবং তাঁহার সৌজন্য-দর্শনে আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বহু মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণবোচিত সরলতায় আমাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের কাল উপস্থিত হইতেছে জানিয়া আমরা শ্রীবিগ্রহের দর্শন-প্রার্থী হইলে তিনি আমাদিগকে কতিপয় দিবস শ্রীনাথদ্বারে অবস্থান করিতে বলিলেন। বিশেষতঃ তথায় দিবসত্রয় অবস্থানের জন্য তিনি বারম্বার আমাদিগকে অনুরোধ করিলেও যখন আমরা অন্যান্য তীর্থ-দর্শনের ব্যবস্থানুরোধে তথায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারিব না, শুনিলেন, তখন ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যবস্থা করাইলেন এবং তৎপূর্ব্বেই আমাদিগকে বিচিত্র ও সুরম্য ভগবৎপ্রসাদ-বসনাদি-দ্বারা সমাদর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ও তাঁহার আরও কতিপয় কর্ম্মচারীদিগকে আমাদিগের স্বতন্ত্রভাবে ভগবদ্দর্শন করাইবার জন্য আদেশ করায় আমরা শ্রীমন্দিরের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে তাঁহার অনুগমন করিলাম। মধ্যে মধ্যে পশ্চাদ্দেশের দ্বারসকল রুদ্ধ হইল। সম্মুখস্থিত দ্বারসমূহ ক্রমে-ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। আমরা শ্রীমূর্ত্তির অতি সন্নিকটে একটী বৃহৎ ধূপের নিকটে উপনীত হইলাম। আরাত্রিকের সময় উপস্থিত হওয়ায় বহুবিধ মহিলা-ভক্ত বলপূর্ব্বক উৎকণ্ঠা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তির সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিলে প্রতিহারিসকল তাঁহাদিগের নিকট গোস্বামী মহারাজের কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন এবং আমাদিগের প্রতি করুণ হইয়া সুষ্ঠু-দর্শনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যেই গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সমাগত হইয়া স্বহস্তে আরাত্রিকাদি বিধান করিলেন। আমরা শ্রীভগবদ্দর্শনানন্তর অপর পথ দিয়া ক্রমশঃ মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরে আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীগোস্বামী মহারাজ শ্রীনাথজীর বিচিত্র ও সুপ্রচুর মহাপ্রসাদ ধর্ম্মশালায় প্রেরণ করিলেন। আমাদিগের প্রতি শ্রীগোস্বামী মহারাজের নানাপ্রকার সৌজন্য ও কারুণ্যপূর্ণ ব্যবহারে আমরা শ্রীনাথজীর কৃপা লক্ষ্য করিলাম।

শ্রীনাথজী শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীর উপাস্য-বিগ্রহ। শ্রীবল্লভাচার্য্য-তনয়ের অধিকার-কালে ঐ শ্রীবিগ্রহকে শ্রীমাথুরমণ্ডল হইতে এই পর্ব্বতে স্থানান্তরিত করা হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীনাথদেব দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীমন্মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত শ্রীবিগ্রহ। এক্ষণে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের মহৈশ্বর্য্যময়ী সেবায় সেবিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীবিগ্রহের দর্শন, সম্ভাষণাদি করেন। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত সাদরের দর্শনীয় বস্তু।

শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সাম্প্রত-বিশ্বাসানুসারে শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণের সহিত কথঞ্চিৎ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ষোড়শ-গ্রন্থের অন্তর্গত সন্ন্যাস-লক্ষণ-প্রবন্ধে ভাবযুক্ত সন্ন্যাস স্বীকার করিলেও 'মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য-প্রধান। যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌর ভগবান্'।। —এই সদ্ভাবের সহিত মতভেদ স্থাপন করেন। ইহাদের গৃহস্থ-জনোচিত ব্যবহার শ্রীগৌড়ীয় শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় আদর করেন না; পরন্তু গৌড়ীয় বিদ্ধভক্ত প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় এই সকল চিন্তাস্রোতের বিষময় ফলে জর্জ্জরিত। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত গোপী-গণের উক্তি ["যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ * * গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।" (শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৮)] —যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-বেশে পরিদৃষ্ট হইয়া সেই ভাব পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় মনে করেন যে, বাহ্যজগতে বিরাগ-বিশিষ্ট-বেশের সহিত ভগবদ্দর্শনাদি বিহিত নহে; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের বিচার এই যে, বাহ্যশরীর ও বাহ্য শারীরিক প্রদর্শনী অন্তর্ভাবের সহিত এক নহে। এই ভ্রম হইতেই 'সখিভেকী সম্প্রদায়' বৈরাগ্যচ্যুত হইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় বিষয়লোলুপ হইয়া পড়িয়াছে; 'অন্তর-নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার'—এই কথা বিকৃতভাবে বুঝিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচতা'র বাহ্যানুকরণের নামে কাপট্যের তাণ্ডব-নৃত্যে ব্যস্ত। অন্তর্দ্দশায় ভগবৎসেবা ও বাহ্যদশায় কাপট্যপূর্ণ হরিসেবার অভিনয়—এতদুভয় এক নহে, জানাইবার জন্যই সাধন ও সাধ্য-বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদ ও শ্রীসনাতন-প্রশ্নে আমরা এ সকল বিশেষরূপে অনুশীলন করি। সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তি উভয়ই 'ভক্তি' হইলেও সাধন-বৈচিত্র্য ও সাধ্য-বৈচিত্র্যের ধারণাদ্বয় এক নহে। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-বিচার ও আত্মানুশীলন—এক নহে।

'সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানু-

সারতঃ।।' (শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ১১৮ সং)—এই উপদেশের বিকৃত ভাব বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে প্রবল আছে। এমন কি, বর্ত্তমান কালেও কোনও কোনও সাধু-প্রতিম 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব'-নামে পরিচিত ব্যক্তির এই সকল বিষয়ে ভ্রম হয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালী বিদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ গ্রহণ করায় উহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামিগণের অভিমত। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ভজন-নৈপুণ্যের উহা অভাব-মাত্র। অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ প্রভৃতি কীর্ত্তনমুখে প্রচারিত না হইলে উহা কৃত্রিমতা-মাত্র। তাহা শ্রীগোস্বামিগণের ভজন-প্রণালী নহে।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু 'শ্রীপদ্যাবলী'তে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামি-প্রভুর রচিত নিম্নলিখিত কএকটি শ্লোক আহরণ করিয়াছেন,—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে।।

—শ্রীপদ্যাবলী, ৭৯ সংখ্যা

হে সন্ধ্যা-বন্দন, আপনার মঙ্গল হউক, হে স্নান, আপনাকে নমস্কার। হে দেবগণ, পূর্ব্বপিতৃকুল, আমি তর্পণাদি কার্য্যে অসমর্থ, আপনারা ক্ষমা করুন; আমি যে-কোন স্থানে বাস করিয়া যদুবংশের শিরোভূষণ কংসারিকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সমুদয় পাপ বিনাশ করিব, তাহাই আমি পর্য্যাপ্ত মনে করি, অপর কার্য্যে আমার প্রয়োজন কি?

অনঙ্গরসচাতুরীচপলচারুচেলাঞ্চল-
শ্চলন্মকরকুণ্ডলস্ফুরিতকান্তিগণ্ডস্থলঃ।
ব্রজোল্লসিতনাগরীনিকররাসলাস্যোৎসুকঃ
স মে সপদি মানসে স্ফুরতু কোপি গোপালকঃ।

—ঐ, ৯৬ সংখ্যা

যাঁহার মনোজ্ঞ বস্ত্রের প্রান্তভাগ কাম-ক্রীড়ার নিপুণতা-দ্বারা আন্দোলিত, গণ্ডস্থলের কান্তি দোদুল্যমান মকর ও কুণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত এবং যিনি ব্রজের

মধ্যে সঙ্গহেতু আহ্লাদিত নাগরীসমূহের সহিত রাসনৃত্যে সমুৎসুক, সেই কোন গোপাল আমার মনোমধ্যে এইক্ষণেই স্ফুরিত হউন।

কদা দ্রক্ষ্যামি নন্দস্য বালকং নীপমালকম্।
পালকং সর্ব্বসত্ত্বানাং লসত্তিলকভালকম্।।

—ঐ, ১০৪ সংখ্যা

কদম্ব-পুষ্প-নির্ম্মিত মালিকাধারী, সকল জীবের পালক এবং ললাটে তিলক-দ্বারা শোভমান শ্রীনন্দনন্দনকে কবে আমি দর্শন করিব।

অধরামৃত-মাধুরীধুরীণো হরিলীলামুরলীনিনাদ এষঃ।
প্রততান মনঃপ্রমোদমুচ্চৈর্হরিণীনাং হরিণীদৃশাং মুনীনাম্।।

—ঐ, ২৮৬ সংখ্যা

অধর-সুধার মাধুর্য্যের ভারবাহিকা, শ্রীহরির ক্রীড়ার্থ এই মুরলীর ধ্বনি হরিণীগণের, মৃগনয়না কামিনীগণের ও মুনিগণের তীব্ররূপে মনের প্রমোদ বিস্তার করিল।

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।

—ঐ, ৩৩০ সংখ্যা

অয়ি দীনদয়াল, হে প্রভো, হে মথুরার পালক, আমি কখন আপনার দর্শন-পথে পতিত হইব? হে প্রিয়তম! আমার হৃদয় আপনার অদর্শনে কাতর হইয়া ভ্রান্ত হইতেছে, এখন আমি কি করি?

কলিকাতা 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে'র সংস্কৃত পুঁথির তালিকায় শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামি-প্রভু রচিত বলিয়া 'যুগলাষ্টকম্'-নামে সংস্কৃত-স্তোত্র সম্বলিত, বঙ্গাক্ষরে লিখিত একপত্রাত্মক একটি পুঁথির (৫১৩ নং) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল মাধবেন্দ্রের কৃত শেষোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে বিপ্রলম্ভ-রসে অধিকতর আপ্লুত হইতেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু লিখিয়াছেন,—

এত বলি' পড়ে প্রভু তাঁ'র কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ ক'রেছে আলোক।।
ঘসিতে ঘসিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার।।
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রস-কাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।।
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁ'র কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী।।
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠাজন।।
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধি-প্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ ম ৪।১৯১-১৯৬)

শ্রীভাগবত-পরম্পরা

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো সশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্।
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্য-ফলধারিণঃ।।
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ।।
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য-সখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ।।

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা)

ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী।
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত-বিভু।।

যিনি 'বিষ্ণু-সংহিতা'র রচয়িতা, সেই ব্যাসতীর্থ তাঁহার (পুরুষোত্তমের) শিষ্য, ভক্তিরসের আশ্রয় শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তাঁহার শিষ্য। তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। তাঁহারই ধর্ম্ম-প্রণালী বর্ত্তমানে প্রচলিত হইয়াছে। তিনি প্রীত (দাস্য), প্রেয়ঃ (সখ্য), বাৎসল্য ও উজ্জ্বল-নামক রসময় ফলধারী ব্রজধামস্থিত কল্পবৃক্ষের অবতার। যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁহার শিষ্য। তিনি শৃঙ্গার-রসময় ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু দাস্য ও সখ্য উভয় ফল গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীরঙ্গপুরী বাৎসল্যরস আশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামি-প্রভুর কতিপয় শিষ্যের নাম 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র বিবরণানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামি-প্রভুর শিষ্যরূপে, কেহ কেহ বা লক্ষ্মীপতি-তীর্থের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রের সতীর্থরূপে নির্দ্দেশ করেন; 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' পঞ্চম তরঙ্গ-ধৃত প্রাচীনোক্ত শ্লোক, যথা—"নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি-প্রিয়ম্। মাধ্ব-সম্প্রদায়ানন্দবর্দ্ধনং ভক্তবৎসলম্।।" 'সতীর্থত্বাদি-বিচারও গুরু-বিচার হইতে পৃথক্ নহে; এ জন্য ইতিহাস ও বর্ণনায় ভাষার ভেদ থাকিলেও উভয়ই সমত্বোদ্দেশক।' (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আদি ৯।১৮৭-১৮৮, 'গৌড়ীয়-ভাষ্য')

"তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।।"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব। "সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র। সেই বলরাম—সঙ্গে নিত্যানন্দ।।" (শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৫।৬)। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু রাঢ়দেশে 'একচক্রা'য় মৈথিল-বিপ্রকুলে আবির্ভূত হ'ন। শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীকে ইনি জনকজননীরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। ইনি দ্বাদশ

বৎসর গৃহে অবস্থানের লীলা করিয়া জনৈক অতিথি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ-পরিত্যাগের লীলা করেন। যেই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহাকে অনুচররূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম কেহ কেহ শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইনি বিংশতি বর্ষ তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনামপ্রেম-প্রদান-লীলাকালে শ্রীনবদ্বীপে মিলিত হ'ন।

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি' ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে।।
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্যগোচর।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৯।১০০-১০১)

পশ্চিম ভারতের তীর্থ-ভ্রমণকালে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামি-প্রভুর সহিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর মিলন হয়। শ্রীমাধবেন্দ্র-নিত্যানন্দ-মিলনে যে কি প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়াছিল, তাহাও 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' আদি ৯ম অধ্যায়ে (১৫৪, ১৫৮-১৫৯, ১৮৭-১৮৮) বর্ণিত আছে,—

এই মত নিত্যানন্দ-প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন।।

*　　*　　*

মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ।।
নিত্যানন্দ দেখ' মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' আপনা' পাসরি'।।

*　　*　　*

এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি।।
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।

শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সাক্ষাৎকার-কালে শ্রীগুরুদেবের নিত্যসঙ্গী সেবকবর শ্রীশ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু—ইনি শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার; জগদুপাদান-প্রধানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপী মহাপুরুষ। ইনি শ্রীগৌরহরি হইতে অভিন্ন বলিয়া 'অদ্বৈত' ও ভক্তিশিক্ষক বলিয়া 'আচার্য্য' নামে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমামরকল্পবৃক্ষের স্কন্ধ-দ্বয়ের অন্যতম। "বৃক্ষের উপরে হৈল শাখা দুই স্কন্ধ। এক—'অদ্বৈত' নাম, আর—'নিত্যানন্দ'।।" (শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৯।২১)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন বিষয়-বিগ্রহ অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহ, তেমন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুও বিষয়-বিগ্রহ। তবে ইহারা বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও শ্রীচৈতন্যচরণ-সেবনব্রত আশ্রয়বিগ্রহের লীলাকারী।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী শিষ্য-লীলাভিনয়কারী বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতকে 'গুরুবুদ্ধি' করিতেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর ইঁহো শিষ্য, এই জ্ঞানে।
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে।।
(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৬।৩৯)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে গুরুবুদ্ধি করিলেও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু নিরন্তর নিজকে 'শ্রীচৈতন্যদাস' অভিমান করিতেন,—

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁ'র 'দাস'-অভিমান।।
(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৬।৪১)

আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু-নিত্যানন্দ।।
(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৬।৩৬)

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু শান্তিপুরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপস্থিতিকালে তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদের আবির্ভাব-তিথিতে সর্ব্বস্ব নিক্ষেপপূর্ব্বক যে অপূর্ব্ব মহামহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত',

অন্ত্য ৪।৩৯৮ ও ৪।৪৩৯-৪৪১ সংখ্যক পয়ারে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য-গোসাঞি।।
দেখিয়া তাহান বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়।।
তাঁর ঠাই উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন।।
মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে।।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ও মহাপ্রেমিক ছিলেন। এ জন্য শ্রীগৌরহরি 'বিদ্যানিধি' বা 'প্রেমনিধি' বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রের শিষ্যসূত্রে ইঁহাকে গৌরব প্রদান করিতেন। শ্রীবৃষভানু রাজার অবতার বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরহরি ইঁহাকে 'বাপ পুণ্ডরীক' বলিয়া সক্রন্দন আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু ইঁহাকে শ্রীগুরুরূপে বরণের লীলা প্রকাশ করেন। ইনি শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভুর অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"য় এরূপ দৃষ্ট হয়— "বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ।। স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহকাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্।। 'প্রেমনিধি'-তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধীঃ। মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ। রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ।।"

ইঁহার পিতার নাম—বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। চট্টগ্রামের ছয় ক্রোশ উত্তরে 'হাটহাজারি' থানা আছে। উহার এক ক্রোশ পূর্ব্বে 'মেঘলা'-নামক গ্রামে ইঁহার শ্রীপাটবাটী অবস্থিত।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব-প্রিয়ত্ব পরিস্ফুট আছে। "দামোদর-স্বরূপ বলেন, —শুন ভাই! এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই।। স্বপ্নে আসি' শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে। আর শুনি নাই, সবে দেখিলুঁ তোমাতে।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অন্ত্য ১০। ১৭৫-১৭৬)।

শ্রীঈশ্বরপুরী—ইনি 'কুমারহট্টে' (ই, বি, আর্ লাইনে 'হালিসহরে') বিপ্রকুলে আবির্ভূত ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রিয়তম শিষ্য। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গয়ায় দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা দিবার লীলা করিবার পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপ-নগরে আসিয়া শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের গৃহে কিছুকাল বাস করেন। সেই সময় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থ শ্রবণ করান। "মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে। রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে।।" হাসিয়া বোলেন,—তুমি পরম পণ্ডিত। আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত।। সকল বলিবা,—কোথা থাকে কোন্ দোষ। ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১১।৯৬, ১০৩-১০৪)।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার লীলা করিয়াছিলেন,—"প্রভু বলে,—গয়া করিতে যে আইলাঙ। সত্য হৈল,—ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ।।" আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে। মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে।। পুরী বলে,—'মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা? প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।।' তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ। করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আদি ১৭।১০৪-১০৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীকুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—"সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'। লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আদি ১৭।১০১)

শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের অলৌকিক শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও পাণ্ডিত্যময় শুদ্ধকবিত্ব জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি শ্রীব্রজধাম, শ্রীনবদ্বীপ-ধামাদি অপ্রাকৃত তীর্থে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-ব্যপদেশে ভ্রমণ করিতেন।

শ্রীভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী—শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে পরিপুষ্ট হইয়াছেন। "শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্য-মালী স্কন্ধ উপজিল।।" (শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৯।১১)

শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরিচর্য্যার বিষয় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপদসেবন। স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন।। নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।। তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল,—'কৃষ্ণে তোমার হউক্ প্রেমধন।।" (শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।২৬-২৮)।

শ্রীপরমানন্দ পুরী—শ্রীল পরমানন্দ পুরীগোস্বামী 'ত্রিহুত' প্রদেশে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হ'ন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। "সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। আর নাহি, এক পুরী গোসাঞী সে মাত্র।। দামোদর-স্বরূপ, পরমানন্দ পুরী। সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী।। নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন। প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ।। পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন। * * যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোসাঞীরে। দামোদর-স্বরূপেরে তত প্রীতি করে।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৪৬-৪৯, ৫২)

শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-গোস্বামি-প্রভুর যে কতদূর অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাহা 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' উক্ত হইয়াছে। "পরম-সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া। রাখিলেন নিজসঙ্গে পার্ষদ করিয়া।। নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দ পুরী। রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি'।। মাধবপুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়। শ্রীপরমানন্দ পুরী—প্রেমরসময়।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অন্ত্য ৩।১৭৬-১৭৮)

শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী মঠ ও কূপ করিয়া বাস করেন। কূপে জল ভাল না হওয়ায় মহাপ্রভু বলিলেন,—"জগন্নাথ মহাপ্রভু মোরে এই বর। গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।। প্রভু বলে,—'শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান।। সত্য সত্য হৈব, তা'র গঙ্গাস্নান-ফল। কৃষ্ণে ভক্তি হৈব তা'র পরম নির্ম্মল।।' প্রভু বলে,—'আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। নিশ্চয় জানিহ পুরীগোসাঞীর প্রীতে।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ, অন্ত্য ৩।২৪২, ২৫১-২৫২, ২৫৫)

শ্রীল পরমানন্দ পুরী গোস্বামী ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের অবতার। তৎসম্বন্ধে 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় লিখিত আছে,—"পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।"

শ্রীরঙ্গপুরী—ইনি 'পাণ্ডরপুরে' অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীগৌরহরি তীর্থ-পর্য্যটন-ব্যপদেশে তাঁহার সহিত মিলিত হ'ন। ইনি শ্রীশঙ্করারণ্যের (শ্রীল বিশ্বরূপের) সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে প্রথম জ্ঞাপন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত ইনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-ভবনে শ্রীশচীমাতার পাচিত অন্ন ও অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট-প্রসাদ পাইয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে 'শ্রীচতন্যচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা ৯।২৮২-২৯০, ২৯৫-২৯৬, ৩০০) উক্ত হইয়াছে,—

"তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র। বিঠ্ঠলঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ।। প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন। তাহাঁ এক বিপ্র তাঁ'রে কৈল নিমন্ত্রণ।। বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল।। মাধবপুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গপুরী' নাম। সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম।। শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁ'রে দেখিবারে। বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে।। প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম। অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম।। দেখিয়া বিস্মিত হৈলা শ্রীরঙ্গপুরীর মন। 'উঠহ শ্রীপাদ' বলি' বলিলা বচন।। শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞীর সম্বন্ধ। তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ।। এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন। গলাগলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন।। * * * শ্রীমাধব-পুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী। পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তেঁহো নদীয়া- নাগরী।। জগন্নাথমিশ্র-গৃহে ভিক্ষা যে করিল। অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল।। * * * এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল। প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল।।"

সানোড়িয়া বিপ্র—ইনি শ্রীমথুরাবাসী; 'সানোয়াড়' অর্থাৎ সুবর্ণবণিক্-জাতির যাজক-ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামীর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের 'দ্বাদশ বন' ভ্রমণের কালে শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাকে সঙ্গিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল পুরীগোস্বামীর কৃপায় ইঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়াছিল। শ্রীসানোড়িয়া-বিপ্র সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' (মধ্যলীলা ১৭।১৬৪-১৬৮, ১৯২) এরূপ বর্ণন আছে,—

তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লঞা।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া।।
'আর্য্য, সরল, তুমি—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন?'।
বিপ্র কহে,—'শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী।।
কৃপা করি' তেহোঁ মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা।।

গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা 'গোবর্দ্ধনে' হয়।।

* * *

'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত' ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল।।

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়—ইনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য। (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আদি ৯।১৫৪, 'গৌড়ীয়ভাষ্য')। ইনি 'ত্রিহুত' বা 'মিথিলা' প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হ'ন। ইনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার কৃত কয়েকটি শ্লোক 'পদ্যাবলী'তে (১২৭তম শ্লোকে) দৃষ্টি হয়,—"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।" "কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু। গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম।।" (ঐ, ৯৯তম শ্লোক)

ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত শ্রীগৌরহরি 'আড়াইল'-গ্রামে শ্রীবল্লভ-ভট্টের ভবনে ব্রজভজনের পারতম্য-বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছিলেন।

প্রভু কহেন,—'কহ', তেহোঁ পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা।।
প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে' ইহো,—'কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৯।৯৯-১০০)

শ্রীকেশব-ভারতী—শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণের অন্যতম 'ভারতী-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি 'কাটোয়া'তে শাঙ্করমঠের অধিপতি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মসন্ন্যাসী হইলেও শ্রীমাধব-সম্প্রদায়স্থ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের মন্ত্রশিষ্য ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। ইনি ১৪৩২ শকাব্দায় 'কাটোয়া'য় শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে সন্ন্যাস-প্রদানের লীলা করেন। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য়ও শ্রীশ্রীল কেশব-ভারতীর পরিচয় এরূপ লিখিত আছে,—"মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ। দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূৎ অদ্য কেশবভারতী।।" (৫২ সং)

শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় কীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে ও তৎকালে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন। শ্রীনীলাচলেও তিনি শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।' (শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৯।১৩ 'অনুভাষ্য')। কেহ কেহ বলেন, ইনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দীক্ষিত শিষ্য; কেহ কেহ বলেন, শ্রীল মাধবেন্দ্রের অনুগত।

শ্রীব্রহ্মানন্দভারতী—যে কালে ইনি নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার পরিধেয় বসন মৃগচর্ম্ম-নির্ম্মিত ছিল। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতির জন্য মৃগচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাষায়-বহির্ব্বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে শ্রীনীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। ইনিও শ্রীল মাধবেন্দ্রের অনুগত নয়জন সন্ন্যাসীর অন্যতম।

শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ ও শ্রীসুখানন্দপুরী—ইঁহারা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'-মতে 'অষ্টসিদ্ধি' বা শ্রীমদ্ভাগতোক্ত 'নবযোগেন্দ্রে'র অন্যতম। ইঁহারা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুগত ছিলেন। ''কৃষ্ণানন্দঃ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর-রাঘবৌ। অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ।। পর্য্যুপাধিক্রমাৎ জ্ঞেয়া অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা উর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ। নব ভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবতসংহিতাঃ।। প্রত্যুচুর্জনকং তেহদ্য ভূত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা। প্রভুণা গৌরহরিণা বিহরন্তি স্ম তে যথা।। শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যানন্দভারতী। শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দ-জগন্নাথা হি তীর্থকাঃ।।'' (শ্রীগৌঃ গঃ, ৯৭-১০০ সংখ্যা)। কেহ কেহ শ্রীকেশব পুরীকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের অগ্রজ ভ্রাতা বলেন। কিন্তু ইহার প্রামাণিকতা বিশেষ বিচারাধীন।

শ্রীরামচন্দ্রপুরী—শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য-অভিমানী সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীল পুরী-গোস্বামিপাদকে উপদেশ করিবার দুঃসাহস ও গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁ'র স্থান।।
পুরী-গোসাঞী করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন।।
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁ'রে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে।।

'তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?'
শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর, পাপী' বলি' ভৎর্সনা করিল।।
'কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে।।'
এই যে মাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার 'বাসনা' জন্মিল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্য ৮।১৬-২০, ২৩-২৪)

এদিকে যেমন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীঈশ্বরপুরীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া নির্য্যাণ-কালে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, অপর দিকে নির্ব্বিশেষবাদী গুর্ব্বপরাধী শ্রীরামচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব-নিন্দাকর।।
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজন।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্য ৮।২৯-৩০)

সর্ব্বসদ্‌গুণনিলয় ও সর্ব্বদোষহীন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কোনরূপ ছিদ্র না পাইয়া তাঁহার ভজনপ্রকোষ্ঠে পিপীলিকা-পংক্তি দেখিয়া, তাঁহার মিষ্ট-রসাস্বাদন আশঙ্কা-পূর্ব্বক মিথ্যা নিন্দাবাদ করিয়া রামচন্দ্রপুরী শ্রীগুরুবৈষ্ণব-নিন্দকের অধোগতি লাভ করিয়াছিলেন।

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।।
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তা'র দোষ না লইল।
তা'র ফল-দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্য ৮।৯৭-৯৮)

শ্রীনিত্যানন্দরায়

শ্রীনামাবলী

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন নিজ-প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দকে বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন—'শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত', 'শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র', 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু', 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুবর', 'প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ', 'শ্রীনিত্যানন্দ ভগবান্', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহাপ্রভু', 'শ্রীনিত্যানন্দ মহাবীর', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহাবলী', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহামতি', 'শ্রীনিত্যানন্দ মহাশয়', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহামহেশ্বর', 'শ্রীনিত্যানন্দরাম', 'শ্রীনিত্যানন্দরায়', 'শ্রীনিত্যানন্দসিংহ', 'শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ', 'শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ-গোসাঞী', 'শ্রীনিত্যানন্দ-মহামল্ল', 'মহামল্লরায় নিত্যানন্দ', 'নিতাইচাঁদ', 'নিতাই-ঠাকুর', 'ঈশ্বর-নিতাই', 'অবধূত-চন্দ্র' 'অবধূতবর', 'অবধূতমণি', 'অবধূত-মহাবল', 'অবধূত-মহাশয়', 'অবধূত রায়', 'অবধূতসিংহ', 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রিয়ধাম', 'সংকীর্ত্তনপিতা', 'বিশ্বম্ভর', 'যুগধর্ম্ম-পালক', 'জগৎ-প্রিয়কর', 'শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তম', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ', 'গৌড়েশ্বর' ইত্যাদি। শ্রীনিত্যানন্দের অনন্ত নাম, তথাপি শ্রীব্যাসাবতার তাঁহার প্রভুবরের যে-সকল শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অনুকীর্ত্তন করিতে অধিকতর সুখোদয় ও মঙ্গলোদয় হয়। শ্রীনিত্যানন্দরায়ের শ্রীনাম-কীর্ত্তনে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

পতিতের ত্রাতা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—'মহামল্লরায়' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান সংকীর্ত্তন-সেনাপতি। তিনি মহাবীর, মহাবলী, মহাশয়, মহামতি, মহামহেশ্বর। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম-পতিত দুর্গত দুর্ব্বলতম জীবের বড়ই আশা-ভরসার স্থল। যাঁহাদের কোনপ্রকার যোগ্যতা, দক্ষতা, সাধুত্ব, সুকৃতি কিছুই নাই, তাঁহাদের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশাই সকল সুকৃতির শিরোমণিস্বরূপ। নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের জন্য যে আর্ত্তি, তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্যতীত নির্ঘৃণ্য বিষয়িগণের উপর আর কাহারও এরূপ অহৈতুক-কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় না; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অত্যন্ত পাপী, দুরাচার ও পতিতকে আর কেহই কেশাকর্ষণ করিয়া উদ্ধার করেন

না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত আর কেহই ত্রিতাপের কটাহে পতিত দুর্গত জীবকে উদ্ধার করিয়া নিজ কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণতলে আশ্রয় প্রদান করেন না; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত আর কেহই বিষয়-বাসনাকে তুচ্ছ-বোধ করাইতে পারেন না; 'অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী' মহামায়ার দুর্গ হইতে উদ্ধার করিয়া, বিষয়ের মোহ কাটাইয়া শ্রীনামের হাটেতে অধিকার, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার ও শ্রীযুগল-সেবায় অধিকার প্রদান করেন না। শ্রীনিতাই ঠাকুর পতিতের প্রতি এতটা উদার! এজন্যই শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জীবের শিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

'জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে।।'

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৫-২০৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।।
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৮-২১০)

শ্রীমাধব সদাচার, বয়স, বিদ্যা, ধন, কুল, পরাক্রম কিছুরই অপেক্ষা করেন না, কেবল ভক্তির দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হন। তাই দাক্ষিণাত্যের কোন বৈষ্ণবকবি বলিয়াছেন,—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।।

(পদ্যাবলী—৮)

ব্যাধের কি বা সদাচার ছিল, ধ্রুবের বয়সই বা কত হইয়াছিল, গজেন্দ্রের কি বা বিদ্যাবল ছিল, কুব্জার এমন কি সুরূপ ছিল, সুদামা বিপ্রের কি বা ধনবল ছিল, বিদুরের কি বা বংশমর্য্যাদা ছিল, যাদবপতি উগ্রসেনের কি বা পৌরুষ ছিল, কিন্তু শ্রীমাধব তাঁহাদের ভক্তিতেই তুষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহাদের কোনপ্রকার গুণের প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। অর্থাৎ শ্রীহরি একমাত্র ভক্তিবশ; প্রাকৃত গুণে গুণী হইয়াও ভক্তিহীন কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় হইতে পারে না।

অন্যযোগ্যতা না থাকিলেও যদি ভক্তি থাকে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যায়, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, কেহ যদি বৈরানুবন্ধের (নিরন্তর শত্রুভাবের) সহিতও শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করেন, তথাপি তাহার মঙ্গল লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ তরুলতাকে প্রেমদান করিয়াছেন। বালঘাতিনী পুতনাকেও নিজ ধাত্রীর ন্যায় গতি প্রদান করিয়াছেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীল উদ্ধব বলিয়াছেন,—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম্।।

(ভাঃ ৩।২।২৩)

অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুর-ভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণ-বিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূটমিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য (কৃষ্ণের স্তন্যধাত্রী অম্বিকা কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরম দয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব?

কলির জীব এইরূপ শোচ্যতম যে, অনুকূল অনুশীলন করিবার ন্যায় অনুরাগ ত' জীবের নাই-ই; কারণ জীব বিষয়ানুরাগে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট। প্রতিকূল অনুশীলনের অনুকরণ করিলেও অত্যধিক অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনও মঙ্গল লাভ হয় না। কারণ, অনুকরণ করিয়া কেহ অবিচ্ছিন্ন বিদ্বেষী হইতে পারে না এবং উহাতে প্রতিকূলাচরণের স্বাভাবিক তীব্রতাও থাকে না। বেণ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। শিশুপাল ও দন্তবক্র বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্বেষযুক্তই ছিল। কিন্তু বেণের শ্রীভগবানের প্রতি প্রাসঙ্গিকভাবে কেবলমাত্র নিন্দাত্মক-শত্রুতা ছিল, অবিচ্ছিন্ন বৈরভাব হয় নাই। তীব্রধ্যানের অভাবহেতু তাহাতে পাপই প্রতিফলিত হইয়াছিল, এজন্য অতিশয় সামর্থ্যবান্ পুরুষগণও নিজের মুক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরভাবানুষ্ঠানে সাহস করিবেন না। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে হইবে, ইহার অর্থ এই—যে কোন যুক্ততম উপায়েই শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। এজন্যই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা মহাজনগণ বলিয়াছেন, প্রতিকূল-অনুশীলন অনুকরণীয় নহে।

কলিহত জীব অত্যন্ত শোচ্যতম অবস্থায় পতিত। ভক্তিপ্রিয় শ্রীভগবানের সেবা তাহার পক্ষে স্বপ্নতুল্য। তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন,—

দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে-
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে।।

(পদ্যাবলী—৬৪)

হে যাদবেন্দ্র ! আমি পতিত, তোমার "দীনবন্ধু" এই নাম স্মরণ করিয়া আমার উৎসাহ হইয়াছিল; কিন্তু তুমি ভক্তবৎসল, ইহা শুনিয়া সম্প্রতি আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

কৃপা-বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌরভক্তগণ কলিহত জীবের এই হৃৎকম্প বিদূরিত করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, জীব যতই পতিত হউক, যতই ভক্তিবিহীন হউক, তথাপি যদি একবার শ্রীনিত্যানন্দরায়ের শ্রীপাদপদ্মে নিজের পাতিত্যের

কথা প্রাণ খুলিয়া নিবেদন করে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল হয়, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই দুর্ব্বলতম জীবকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক উদ্ধার করেন; ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য, ইহা অর্থবাদ বা কল্পনা নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য; কিন্তু যিনি শ্রীনিত্যানন্দের, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকেই কৃপা করেন। যাহাকে শ্রীনিত্যানন্দ আত্মসাৎ করেন নাই, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে কখনও কৃপা করেন না। এই জন্যই মহাজনগণ শ্রীবৈষ্ণব-চরণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের কৃপাই প্রার্থনা করেন। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।।
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু-বলরাম।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭।৭৮)

আবির্ভাব-তিথি

মাঘী শ্রীশুক্লা ত্রয়োদশী শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পতিতপাবনী আবির্ভাব-তিথিরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার ন্যায় এই তিথিও জগন্মঙ্গল-বিধায়িনী ও পরমার্চ্চনীয়া।

পরম-পবিত্র-তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যাঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।।
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।।
সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।।
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪৪-৪৭)

শ্রীচৈতন্যকে মানিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে বা শ্রীনিত্যানন্দকে মানিয়া

শ্রীচৈতন্যকে না মানিলে ভক্তিবিরোধ হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ।।
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়" তোমার প্রমাণ।।
কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৭)

শ্রীস্বরূপের বন্দনা

শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু শ্লোকপঞ্চকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দরায়ের এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।।
মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।
যস্যাংশাংশাংশ পরমাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১ম পঃ ধৃত শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-কড়চা-বাক্য)

শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীকারণাব্ধিশায়ী, শ্রীগর্ভোদশায়ী, শ্রীপয়োব্ধিশায়ী ও শ্রীশেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিতানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন।

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীবাসুদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার শ্রীসঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান, সেই শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

যাঁহার একটী অংশ-স্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়-রূপ শ্রীকারণাব্ধিশায়ী, আদিদেব পুরুষাবতার, সেই শ্রীনিত্যানন্দরামকে আমি প্রণাম করি।

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দরামকে আমি প্রণাম করি।

যাঁহার অংশের অংশ, তাহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা, পালন-কর্ত্তা বিষ্ণু; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

পরিচয়

শ্রীবলদেবপ্রভু মূলে সর্বপিতা মূল সঙ্কর্ষণ হইয়াও মৈথিল ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত পরম বিরক্তবৈষ্ণববর শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা শ্রীহাড়ো ওঝাকে পিতৃরূপে ও শ্রীহরি-সেবাপরায়ণা শ্রীপদ্মাবতী দেবীকে মাতৃরূপে স্বীকার করিয়া রাঢ়দেশের একচাকা গ্রামে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে অবতীর্ণ হন। মৈথিল ব্রাহ্মণের 'উপাধ্যায়', এই কৌলিক উপাধির অপভ্রংশই—'ওঝাঁ' বা 'ঝাঁ'।

ই, আই, আর লুপ-লাইনে মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় চারিক্রোশ পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান বীরচন্দ্রপুর গর্ভাবাস প্রভৃতি গ্রামই পূর্ব্বে একচাকা বা একচক্র নামে পরিচিত ছিল। শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর নামানুসারে পরবর্ত্তীকালে ঐ স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর হইয়াছে।

এই স্থানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিম রায় নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীমতীর সহিত অধিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ যে, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে শ্রীযমুনার জলে শ্রীবঙ্কিমদেব শ্রীবিগ্রহ ভাসিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই শ্রীবিগ্রহকে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। বীরচন্দ্রপুরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে ভড্ডারপুর নামক স্থানে শ্রীমতী প্রকাশিত হন। স্থানীয় সেবাইতগণ বলেন,—শ্রীবঙ্কিমরায়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া

পরবর্ত্তীকালে তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবামাতা স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীবীরচন্দ্রপুরের সেবাইতগণ শ্রীগোপীজনবল্লভের শাখাবংশ।

শ্রীপদ্মাবতীদেবীও পরমা বৈষ্ণবশক্তিরূপে বৈষ্ণব ও অতিথির সেবায় সর্ব্বক্ষণ তৎপর থাকিতেন। একচাকা গ্রামের কিছুদূরে মৌড়েশ্বর শিব অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষ্ণবসেবার আদর্শ-সংস্থাপনের জন্য শ্রীশিবের নিত্যারাধ্য অভীষ্টদেব মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ মৌড়েশ্বর শিবের পূজা করিতেন। বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত কেহই শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করিতে পারেন না। এই সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা প্রচারের জন্যই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিবপূজা-লীলার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীহাড়াই পণ্ডিতও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডীশ্বর শিবের পূজা করিতেন।

বাল্যলীলা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে সমস্ত রাঢ়দেশে সর্ব্ব-সুমঙ্গল ও অভ্যুদয় লক্ষিত হইতেছিল। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য দেশ হইতে বিদূরিত হইল। দ্বাপরলীলায় শ্রীবলদেব যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কলিযুগেও সেইরূপ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ শ্রীগৌরহরির অগ্রজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যখন শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন, তখন একচাকায় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। ঐ হুঙ্কার শুনিয়া দেশবাসী জনসাধারণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন, 'নিশ্চয়ই বজ্রপাত হইয়াছে'; কেহ বলিলেন, 'শ্রীভগবান্ গর্জ্জন করিয়াছেন'; কেহ বা বলিলেন, 'কোন দৈব-দুর্ব্বিপাক অবশ্যম্ভাবী'। মায়ায় অভিভূত হইয়া নানাপ্রকার লোকে নানারূপ কথা বলিতে লাগিল। কেহই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে চিনিতে পারিল না। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ শিশুরূপে অপর সৌভাগ্যবন্ত শিশুদিগের সঙ্গে কখনও শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অভিনয়, কখনও শ্রীরাম-লীলার অভিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একচক্রাগ্রামে 'বিশ্রামতলা' নামে একটি স্থান আছে। কিংবদন্তী এই যে, এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাল্যকালে সখাগণের সহিত ঐ সকল লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। শিশু কিরূপে ঐ সকল লীলা-কথা অবগত হইলেন, অন্য কোন খেলা না খেলিয়া কিরূপেই বা শ্রীবিষ্ণুর অবতারগণের লীলার অভিনয় করিতে শিখিলেন, ইহা ভাবিয়া শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী বিস্মিত হইলেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীলক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন ও লক্ষ্মণের ন্যায় মূর্চ্ছাভিনয় করিলে

তাহা দেখিয়া সঙ্গের শিশুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহাতে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী বিপদ ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক শিশু হনুমানের-ভাবে গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন করিল ও অন্য শিশু বানর-বৈদ্য সুষেণের ভাবে লক্ষ্মণের নাসিকায় বিশল্যকরণী-প্রদানের ন্যায় অভিনয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ইহা দেখিয়া হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও একমাত্র নয়নমণি ও প্রাণ ছিলেন। মাতাপিতা শ্রীনিত্যানন্দকে অল্প সময়ের জন্যও না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। কি কৃষিকার্য্যে, কি পৌরোহিত্যকার্য্যে, কি অন্যত্র গমনকালে, কি গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকাকালে সর্ব্বদাই হাড়াই পণ্ডিতের প্রাণ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি পড়িয়া থাকিত।

"প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৭৫

সন্ন্যাসীর ভিক্ষা

শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর প্রাণ-পুত্তলী শ্রীনিত্যানন্দ দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ করিলেন। একদিন এক পরিব্রাজক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে একচক্রা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীহাড়াই পণ্ডিত শুদ্ধবৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিলেন। হাড়াই পণ্ডিত অত্যন্ত আনন্দের সহিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা করাইয়া সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সহিত কৃষ্ণকথা আলাপ করিলেন। সন্ন্যাসী অন্যত্র গমন করিতে অভিলাষী হইয়া পরদিন প্রত্যূষে হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন,—"তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে। আমি তীর্থ পর্য্যটন করিব। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রন্ধনাদি কার্য্য করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। এজন্য তোমার এই সুলক্ষণযুক্ত পুত্রটি আমার সঙ্গে থাকিলে আমার পক্ষে ভগবানের নৈবেদ্য-পাকের সুবিধা হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে কিছুদিনের জন্য আমার সঙ্গে দাও। আমি ইহাকে নিজ প্রাণ হইতেও অধিক করিয়া দেখিব এবং তোমার পুত্রও আমার সহিত নানা তীর্থ দর্শন করিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া হাড়াই ওঝার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—সন্ন্যাসীকে দান করিতে হইবে, এই ভয়ে নহে; কিন্তু একমাত্র জীবাতু, যাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া মাতাপিতা বাঁচিতে পারেন না, তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে হইবে,—এই আশঙ্কায় তাঁহাদের

চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রাণ ভিক্ষা করিলেও হাড়াই ওঝা এইরূপ বিহ্বল হইতেন না। তিনি কোটি প্রাণ দিয়া সকল প্রাণের প্রাণ শ্রীনিত্যানন্দরামকে নিজ সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ সংরক্ষণ করিবার জন্যই জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এইরূপ অবস্থায়ও বৈষ্ণববর্য্য হাড়াই পণ্ডিত সদ্বিচার হারাইলেন না। তিনি বিচার করিলেন,—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ পুরাকালে সন্ন্যাসী ভিক্ষুকগণকে প্রাণ দান পর্য্যন্ত করিয়াছেন। দশরথের জীবাতু শ্রীরামচন্দ্রকে যখন বিশ্বামিত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন রাম ব্যতীত রাজা জীবন ধারণ করিতে না পারিলেও শ্রীদশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কটে আমাকে রক্ষা কর।" শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত সহধর্ম্মিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিলেন। শ্রীপদ্মাবতী সত্য সত্যই বৈষ্ণবী শক্তি। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে যে কোনরূপ ভিক্ষা দিতে তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ হইল না। পতিব্রতা জগন্মাতা পতির মুখের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন,—"হে প্রভুবর! আপনার ইচ্ছার অনুসরণ করাই আমার ধর্ম্ম।"

পাঠক! এইরূপ আদর্শ পতি-পত্নী, এইরূপ বৈষ্ণবসেবা-তৎপর বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শের কথা একবার চিন্তা করুন। আমরা অপরের ত্যাগের দৃষ্টান্ত বলিয়া তাহাতে কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারি, কিন্তু নিজের জীবনে যখন সেইরূপ গৃহস্থের কর্ত্তব্য বা মাতাপিতার কর্ত্তব্যের পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন আমরা পশ্চাৎপদ হই, না হয় ভাবের ঘরে চুরি করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করি; কিন্তু গৃহস্থের আদর্শ জীবন ও হৃদয় কিরূপ, তাহা আমাদিগকে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতীদেবী শিক্ষা দিয়াছেন। এইরূপভাবেই সমগ্র প্রাণ দান করিয়া বৈষ্ণবের সেবা করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত যে, "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" এই উপদেশ করিয়াছেন, তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীর চরিত্রে দৃষ্ট হয়। প্রাণ-দানের মত দান নাই; যিনি প্রাণ-দান করেন, তাঁহারই অর্থ, বুদ্ধি বাক্য কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। প্রাণহীন দান কর্ম্মকাণ্ড। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর সমগ্র প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাণ দান করিয়া তাঁহারা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সেবা করিলেন,—ইঁহারই নাম প্রকৃত গৃহস্থের ধর্ম্ম। কোটি কোটি সন্ন্যাসী এইরূপ গৃহস্থের পদরেণু কামনা করেন। পৃথিবীর বিচার ও শ্রীশ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর বিচারের মধ্যে কতটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রাণ-

পুত্তলিস্বরূপ দ্বাদশবর্ষ বালক, যাঁহাকে হাড়াই ওঝা "তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়; ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে। ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে।" —সেই প্রাণপ্রিয়তম বস্তুকে এক অতিথি সন্ন্যাসি-ভিক্ষুকের পাচক-ব্রাহ্মণের কার্য্য করিয়া তীর্থযাত্রা ও পর্য্যটনের ক্লেশ সহ্য করিতে অনুমতি-দানের প্রবৃত্তি পৃথিবীর কোন ধর্ম্মভীরুরই হয় না। একমাত্র পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও বৈষ্ণবসেবায় স্বাভাবিক-প্রীতি ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভয় বা কর্ত্তব্যবোধ এইরূপ চিত্তবৃত্তি প্রকট করিতে পারে না।

শ্রীহাড়াই ওঝা সহধর্ম্মিণীর সানন্দ-সম্মতি লাভ করিয়া সন্ন্যাসীর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দও বৈষ্ণব-সেবা ও তীর্থোদ্ধার-লীলা প্রকট করিবার জন্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই গৃহত্যাগের প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন,—

স্বামীহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হঞা।।
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ।।
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসি-মণি।।
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে।।
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০১-১০৫)

এদিকে অপ্রাকৃত বাৎসল্যরস-রসিক হাড়ো উপাধ্যায় পুত্রের বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া লোকলোচনে জড়সদৃশ পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। অন্ন-জলাদি পরিত্যাগ করিয়া তিন মাস কাটাইলেন। জীবন থাকিল বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ 'শ্রীনিত্যানন্দ-পাগলপারা' হইয়া থাকিলেন।

হাড়াই ওঝার এই বাৎসল্যরস জড়পুত্রাসক্তি নহে। জড়পুত্রাসক্তি তাঁহার এই বাৎসল্যরসের একটী হেয় খণ্ডিত প্রতিবিম্ব। ভগবানের জন্য ভক্তের যে আসক্তি, তাহাই প্রেম। এই প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের আনুগত্যে লাভ হইলে মুক্তিসুখও অতি তুচ্ছ বোধ হয়।

তীর্থপর্য্যটন

শ্রীনিত্যানন্দ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তীর্থের মলিনতা দূর করিলেন ও অতীর্থ স্থান-সমূহকে তীর্থীভূত করিলেন। বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, গোবর্দ্ধন, দ্বাদশবন, গোকুল, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, সিদ্ধপুর, মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চি, কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শন, ত্রিতকূপ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, প্রাচীন সরস্বতী, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, শৃঙ্গবেরপুর, সরযূ, কৌশিকী, পৌলস্ত্যাশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণতীর্থ, মহেন্দ্র-গিরি, হরিদ্বার, পম্পা, ভীমা, গোদাবরী, বেণ্বা, বিপাশা, মাদুরা, শ্রীশৈল প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া ব্যেঙ্কটনাথ, কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম, হরিক্ষেত্র, ঋষভ পর্ব্বত, মাদুরা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, উত্তরা যমুনা, মলয়পর্ব্বত, বদরিকাশ্রম, শম্যাপ্রাস, কন্যাকুমারিকা, অনন্তপুর, গোকর্ণ, কেরল, ত্রিগর্ত্তদেশ, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়ঃস্বিনী, তাপ্তী, রেবা, মাহিষ্মতী, মল্লতীর্থ, সূর্পারক প্রভৃতি স্থান হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশ্চিমভারতে ভ্রমণ-কালে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত অকস্মাৎ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সাক্ষাৎকার হইল। প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-রস-রসিক অনুচরগণের সঙ্গে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমাধবেন্দ্রের মিলনে উভয়ের প্রেমের সমুদ্র অধিকতর উদ্বেলিত হইল। উভয়েরই প্রেমমূর্চ্ছা দর্শন করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্যগণ প্রেম-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে উভয়ে বাহ্যদশায় উপনীত হইয়া পরস্পর গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কখনও বা কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুর নয়নে প্রেমনদী প্রবাহিত হইল, সমস্ত অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হইল, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—

* * যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ।।

নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৬৬-১৬৭)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী প্রভৃতি শ্রীপুরীপাদের শিষ্যবর্গও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র তাঁহার আদর্শ শিষ্যগণকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন; কিন্তু এ যাবৎ তীর্থযাত্রী তথাকথিত সাধুগণের মধ্যে কোথায়ও কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন দর্শন করিতে পান নাই। সকলেই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মকাণ্ডী, জ্ঞানকাণ্ডী অথবা যোগী, ব্রতী, তপস্বী মাত্র। ঐ সকল তথাকথিত সাধুকে অতীব দুঃখের সহিত দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা মনের দুঃখে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীল মাধবেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গানন্দে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকট করিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিপ্রলম্ভপ্রেমের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। মেঘ দেখিলেই তাঁহার কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপন হইত ও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীগোবিন্দের রসে মহামত্ত হইয়া কখনও ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়েন, কখনও বা অট্টহাস্য করেন, কখনও হুঙ্কার, কখনও গর্জ্জন করিয়া থাকেন। শ্রীমাধবেন্দ্রের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের নিগূঢ় কৃষ্ণ-সংলাপ হইল। শ্রীল মাধবেন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের প্রেম দেখিয়া বলিলেন,—

* * "প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা।।
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।
যে-সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়।।

নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৮২-১৮৫)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্গুরুগণের গুরু—সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি হইয়াও লোক-শিক্ষাকল্পে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গুরুবুদ্ধি করিতেন। শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদেরই শিষ্যরূপে, কেহ কেহ বা শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্য এবং শ্রীল মাধবেন্দ্রের সতীর্থরূপে নির্দ্দেশ করেন। সতীর্থবিচারও গুরুবিচার হইতে পৃথক্ নহে। এজন্য ইতিহাস ও বর্ণনায় কোন কোন স্থলে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই একই তাৎপর্য্যপর।

এইরূপে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু পরস্পর শ্রীকৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে দিবারাত্র জ্ঞানহারা হইয়া কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। কিছুদিন পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেতুবন্ধের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ সরযূ দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সেতুবন্ধ হইতে ধনুস্তীর্থে স্নান করিয়া রামেশ্বর ও বিজয়নগর হইয়া মায়াপুরী, অবন্তী ও গোদাবরী দর্শন করিয়া সিংহাচলে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তিরুমলই ও কূর্ম্মস্থান দর্শন করিয়া অবশেষে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনমাত্রে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমমূর্চ্ছা ও সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। কিছুদিবস নীলাচলে অবস্থান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গাসাগর-তীর্থে আগমন করিলেন এবং সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় শ্রীমথুরায় আগমন করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। এইস্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবস্থায় শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশ না জানেন দিবারাতি।।
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২০৫-২০৬)

শ্রীগৌরহরি

যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এইরূপভাবে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ শ্রীনিত্যানন্দকে না দেখিয়া হৃদয়ে দুঃখানুভব করিতেছিলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশকাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ মনে মনে বিচার করিয়াছিলেন যে, যখন মহাপ্রভু নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন, তখনই তিনি শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিবেন। যদিও শ্রীনিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিমান, তথাপি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীসংকীর্ত্তনৈশ্বর্য্য-প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজ প্রেমভক্তি-প্রদানলীলা সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্বশক্তি।
তথাপিহ কারেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি।।
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ।
তান সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস।।
কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে 'অল্পতা' নাহি পায় প্রভুগণে।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২১১-২১৩)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বাদশ বর্ষ গৃহে বাস করিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়া-ছিলেন এবং বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হৃদয়ে জানিতে পারিলেন যে, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন তিনি অতি সত্বর শ্রীমথুরা হইতে অভিন্ন মথুরা শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে মহাভাগবতবর শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীনন্দনাচার্য্য এক আজানুলম্বিতভুজ মহাজ্যোতির্ম্ময় অবধূতকে নিজ গৃহে উপনীত দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে ভিক্ষা করাইয়া নিজ গৃহে রাখিলেন।

স্বপ্নদর্শন

এদিকে অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দের আগমন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইঙ্গিত-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,

—দেখ ভাই, দুই তিন দিনের মধ্যে এই স্থানে কোন মহাপুরুষ আসিবেন। আমি আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। শ্রীল বলদেবের তালধ্বজ-রথ যেন আমার গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই রথের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ, তাঁহার স্কন্ধে হল ও মুষল; তিনি নীলবসন-পরিহিত, বামহস্তে বেত্র নির্ম্মিত কমণ্ডলু। তিনি শ্রীব্রজবাসী, ব্রজবুলিতে সকলকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের?—ই এ মোকাম নিমাই পণ্ডিতকো হ্যায় কিঁ ও নেই?" আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ম্যাঁয় তেরা ভাই হু—আমি তোমার ভাই, আগামীকল্য আমাদের পরস্পর পরিচয় হইবে।" তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দের উদ্রেক হইল এবং তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার অনুকরণে "আমিও যেন তিনিই" এইরূপ বিচার আসিল।

এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবলদেবের ভাবে গর্জ্জন করিয়া 'মদ আন', 'মদ আন' বলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,—"তুমি যে মদ চাহিতেছ, সেই হরিরস-মদিরা একমাত্র তোমার নিকটেই আছে। তুমি যা'কে বিলাইবে, সেই তাহা পাইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের ঐরূপ বাক্যের নিশ্চয়ই কিছু তাৎপর্য্য আছে, ভক্তগণ ইহা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমে বাহ্যদশা লাভ করিলে শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নের তাৎপর্য্য ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতকে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। দুই মহাভাগবত মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপের সর্ব্বত্র তিনপ্রহরকাল অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মহাপ্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন ও জানাইলেন যে, তাঁহারা নবদ্বীপের সর্ব্বত্র কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ, কি পাষণ্ডী সকলের গৃহই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেবলমাত্র নবদ্বীপের বাহিরের গ্রামসমূহ অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই; কিন্তু কোথায়ও শ্রীগৌর-সুন্দরের স্বপ্নদৃষ্ট সেইরূপ কোন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না।

মিলন

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীহরিদাস ও শ্রীবাসের কথা শুনিয়া হাসিলেন ও ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাকে জানান, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দকে জানিতে

পারেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে লইয়া বরাবর শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে শ্রীনিত্যানন্দের অদ্ভুতমূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইলেন, শ্রীনিত্যানন্দও এতদিন পরে প্রাণের প্রভুকে দেখিতে পাইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন ও একদৃষ্টে পরস্পর পরস্পরকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণধ্যানের এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিতে বলিলেন,—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ।।

(ভাঃ ১০।২১।৫)

তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত-বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃত দ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে শঙ্খচক্রাদিলক্ষণযুক্ত নিজ পাদপদ্মের রতি বা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ এই শ্লোক-শ্রবণমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরকে পুনঃ পুনঃ ঐ শ্লোকটি পাঠ করিবার জন্য বলিলেন। কিছুকাল পরে সেই শ্লোক শুনিতে শুনিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাহ্যদশা লাভ করিলেন ও আনন্দ-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মাদ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শ্রীনিত্যানন্দের সিংহনাদ শ্রবণে যেন ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ পুনঃ পুনঃ এইরূপ আছাড় পাড়িল যে, মনে হইল যেন হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকের কথা আর কি, বৈষ্ণবগণেরও ত্রাস উপস্থিত হইল; 'কৃষ্ণ! রক্ষা কর! রক্ষা কর!' বলিয়া সকলে কৃষ্ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, প্রেমাশ্রুতে সমস্ত দেহ বিলিপ্ত হইল, শ্রীগৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘনশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কখনও নৃত্য, কখনও দণ্ডবন্নতি, কখনও লম্ফ এইভাবে প্রেমোন্মাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ

শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে ক্রোড়ে স্থাপন করিলে নিত্যানন্দ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্যদশায় উপনীত হইলে ভক্তগণ আনন্দভরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার বড়ই শুভদিবস। আমি আজ চারিবেদসার প্রেমভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ করিলাম। তুমি মূর্ত্তিমান কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিধন। তিলার্দ্ধকালও যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গ করে, কোটি পাপ থাকিলেও তাঁহাকে আর দুরাচার বলা যায় না। তোমাকে ভজনা করিলেই কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ হয়।"

গুহ্যালাপ

কোন্‌দিক হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভবিজয় হইয়াছে, ইহা শ্রীগৌরসুন্দর জিজ্ঞাসা করলে শ্রীনিত্যানন্দ বালকের ন্যায় সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন,—অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, শ্রীকৃষ্ণের যত লীলাস্থান আছে, সমস্তই দর্শন করিলাম; কিন্তু স্থানমাত্র দেখিয়াছি, কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে পাই নাই। মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ গৌড়দেশে গমন করিয়াছেন। তিনি মাত্র কিছুদিন হইল গয়াতীর্থ করিয়া নদীয়াতে শুভবিজয় করিয়াছেন। পতিতপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের সহিত নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া এই পাতকী এই স্থানে আসিয়াছে।

পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু এইরূপভাবে শ্রীগৌরসুন্দরকে স্তুতি করিলে মহাপ্রভুও বলিলেন,—"আমরা সকলেই মহাভাগ্যবান্; কেননা এই স্থানে মহাভাগবতের আবির্ভাব হইয়াছে।" তখন মুরারিগুপ্ত হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

* * * "তোমরা তোমরা।
উহা ত' না বুঝি কিছু আমরা সবারা।।"

তখন শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত আবার বলিয়া উঠিলেন,—

* * * "উহা আমরা কি বুঝি?
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি।।"

তখন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত বলিলেন,—

* * * "ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত।।"

এইরূপভাবে এক একজন বৈষ্ণব দুই প্রভুর তত্ত্ব নানা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আগামী কল্য পূর্ণিমা-তিথি—ব্যাসপূজার দিন। তুমি কোথায় 'ব্যাসপূজা' করিবে?" তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে হাতে ধরিয়া প্রভুর সম্মুখে আনিলেন ও পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিলেন,—'এই ব্রাহ্মণের গৃহেই ব্যাসপূজা হইবে।'

শ্রীবাস পণ্ডিত সানন্দিত চিত্তে 'শ্রীব্যাসপূজা'র সমস্ত ভার বরণ করিয়া লইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীব্যাসপূজার সংকীর্ত্তন অধিবাস হইল। শ্রীশ্রীনিত্যাই-গৌর শ্রীশ্রীবাসমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন, একমাত্র অনুগত জন ব্যতীত আর কেহই তথায় প্রবেশাধিকার পাইল না। উচ্চ সংকীর্ত্তনের মধ্যে দুই প্রভুকে ভক্তগণ বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কত প্রেমের তরঙ্গ, প্রেমের বিকার, প্রেমের ভাবমুদ্রা প্রকাশিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার ইহা শ্রীগৌর-হরি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ইঙ্গিতে জানাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে স্থির করিয়া সেই রাত্রির মত নিজগৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণও নিজ নিজ স্থানে চলিয়া আসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরেই অবস্থান করিলেন। কিছু রাত্রে শ্রীনিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরদিবস প্রাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামাই পণ্ডিতের মুখে শ্রীনিত্যানন্দের দণ্ড-কমণ্ডলু ভগ্ন করিবার বিষয় শুনিয়া শ্রীবাসগৃহে উপস্থিত হইলেন ও শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমনপূর্ব্বক গঙ্গায় দণ্ড স্থাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে গঙ্গা হইতে উঠাইয়া শীঘ্র শ্রীব্যাসপূজা করিতে বলিলেন। শ্রীব্যাসপূজার আচার্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন। শ্রীবাস দিব্য গন্ধ সহিত একটি সুন্দর বনমালা শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে প্রদান করিলেন ও ঐ মালা শ্রীব্যাসদেবের গলায় পরাইয়া

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীব্যাস-স্তব উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন।

শ্রীবাসপণ্ডিতের বাক্য শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মুখে 'হাঁ, হাঁ' করিলেন বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে কি বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। তিনি মালা হাতে করিয়া পুনঃ পুনঃ চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ! তোমার এই শ্রীপাদ শ্রীব্যাসপূজা করিতেছেন না!" শ্রীবাসের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তৎক্ষণাৎ শ্রীনিত্যানন্দের নিকট গিয়া বলিলেন,—"তুমি শ্রীব্যাসের গলায় মালা পরাইয়া যথাবিধি শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন কর; ইহাতে বিলম্ব করিতেছ কেন?" শ্রীনিত্যানন্দ নিজসম্মুখে শ্রীগৌর-সুন্দরকে দেখিতে পাইয়া অমনি হস্তস্থিত মালাটী শ্রীগৌরসুন্দরের গলায় পরাইয়া দিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে 'ষড়্‌ভুজ-রূপ' প্রদর্শন করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম-মূর্চ্ছা লাভ করিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নিত্যানন্দ! তুমি স্থির হও। যে কীর্ত্তন-প্রচারের জন্য তোমার অবতার, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি প্রেমভক্তিধনের ভাণ্ডারী; তাহা হইতে তুমি যদি লোককে কিছু দাও, তবেই তাহারা প্রেম লাভ করিতে পারে।" শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্যদশা লাভ করিয়া প্রেমক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু সকলকে বলিলেন,—"আজ শ্রীব্যাসপূজা পূর্ণ হইল; তোমরা সকলে হরিকীর্ত্তন কর।" শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর একসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীশচীমাতা নিভৃতে বসিয়া এই সকল রঙ্গ দেখিতে দেখিতে দুই প্রভুকে বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত করিলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীব্যাসপূজার প্রসাদ সকলকে বিতরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-মিলন

শ্রীব্যাসপূজার পর একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামাই পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমনের কথা জানাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিয়া লুকাইয়া রহিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ের ভাব সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন; ভক্তগণ

নানাবিধ সেবা ও স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। রামাই মহাপ্রভুর দ্বারা পুনরায় আদিষ্ট হইয়া সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে লইয়া আসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ পূজা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নানা ভঙ্গীতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাসের নিষ্ঠা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাসের গৃহেই অবস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীবাস-সহধর্ম্মিণী মালিনীদেবী নিজ পুত্রভাবে শ্রীনিত্যানন্দের সেবা করিতেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,—"অজ্ঞাত-কুলশীল শ্রীনিত্যানন্দের সহিত তোমার অত মিশামিশি ভাল নয়; যদি জাতি-কুল রক্ষা করিতে চাও, তবে নিত্যানন্দকে অন্যত্র যাইতে বল।" তখন শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমাকে এইরূপভাবে পরীক্ষা করা তোমার উচিত নহে। নিত্যানন্দ তোমারই দেহ। ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই।

মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে।।
তথাপি মোহার চিত্তে নহিবে অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১৫-১৬)

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বড়ই আনন্দিত হইলেন ও তাঁহাকে অযাচিতভাবে বর দিয়া বলিলেন যে, সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীকেও যদি নগরে নগরে ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের কোনও দিন কোনও প্রকার অভাব হইবে না। শ্রীবাসের বাড়ীর বিড়ালকুক্কর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের সমস্ত ভার শ্রীবাস-পণ্ডিতের উপরই থাকিল।

একদিন শ্রীশচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন,—শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই সাক্ষাৎ ব্রজের কানাই-বলাই। নিতাই শচীমাতাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া অন্নভিক্ষা করিতেছেন। শচীমাতা নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে নিমাইর সহিত একসঙ্গে ভোজন করাইলেন।

একদিন একটি কাক শ্রীবাস-গৃহের বিষ্ণু-পূজার একটি ঘৃতপাত্র মুখে লইয়া পলায়ন করিল। শ্রীবাস পণ্ডিত ইহা শুনিলে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবেন জানিয়া শ্রীমালিনীদেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ঐ কাককে অবিলম্বে ঘৃতপাত্র প্রদানের আদেশ করিলে কাকটি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিল।

অবধূত

একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা গ্রহণ করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্য-জ্ঞানহীন-ভাবে দিগম্বর হইয়া শ্রীগৌর-গৃহের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে যতই ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ ভাবাবেশে কেবল বিপরীত উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দকে কাপড় পরাইয়া দিলেন। শচীদেবী নিত্যানন্দের শিশুভাব দর্শনে হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বর্ষাকালেও শ্রীনবদ্বীপের কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ গঙ্গায় নির্ভয়ে সন্তরণ করিতেন। কখনও প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন চারি দিন অচেতন থাকিতেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যভাবে দিগম্বরবেশে "আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত" বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আগমন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর হাস্য করিয়া নিজ-মস্তকস্থিত বস্ত্র শ্রীনিত্যানন্দকে পরাইয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে দিব্য গন্ধাদি-লেপন ও মাল্য প্রদান করিয়া আসনে বসাইয়া তাঁহার স্তুতি করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের নিকট হইতে এক কৌপীন চাহিয়া লইয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণের মস্তকে বন্ধন করিবার আদেশ দিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণ শিব-ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ শ্রীনিত্যানন্দ-চরণামৃত পান করিলেন।

আজ্ঞা

একদিন অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা'।।

ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮-১০)

জগাই-মাধাই

নবদ্বীপের লোক শ্রীহরিনাম-প্রচারের এইরূপ অদ্ভুত প্রণালী দেখিয়া নানা-প্রকার কটাক্ষ ও কুৎসা করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞাবলে তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীহরিনাম-বিতরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রচার-কার্য্য করিবার-কালে তাঁহারা পথে মহাপাপিষ্ঠ জগাই, মাধাই নামক দুই মদ্যপায়ীকে দেখিতে পাইলেন। ইহারা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্বপ্রকার জঘন্যতম পাপাচরণ করিতেছিল, কেবল বৈষ্ণবের নিন্দারূপ অপরাধ তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। শ্রীনিত্যানন্দ লোকের নিকট হইতে জগাই-মাধাইর সম্বন্ধে সমস্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভাল ভাল লোক সকলেই ঐ দুই মদ্যপের নিকট যাইতে শ্রীনিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদের নিষেধ না মানিয়া 'দুই মদ্যপায়ী যাহাতে শুনিতে পায়'—এইরূপ স্থানে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের নিকট মহাপ্রভুর আজ্ঞা বলিলেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।।
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮৩-৮৪)

ঐরূপ উচ্চ রব শ্রবণ করিয়া দুই মদ্যপায়ী আরক্তলোচনে দুইজন সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ও ক্রোধভরে তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌঁড়াইতে দৌঁড়াইতে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আসিয়া দিবসের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"তুমি কিসের এত বড়াই কর? ধার্ম্মিক লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করান ত' সহজ কথা, যদি জগাই-মাধাইর ন্যায় পাপিষ্ঠকে উদ্ধার করিতে পার, তবেই জানিব তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক।" তখন শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন

"শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহার মঙ্গল চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

আর একদিন শ্রীনিত্যানন্দ নদীয়ানগরে শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়া নিশাকালে যখন মহাপ্রভুর গৃহের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন সেই মদ্যপায়ী জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। অমনি মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে একটী ভাঙ্গা হাঁড়ির টুক্‌রা ছুঁড়িয়া মারিল। ইহা দেখিয়া জগাই মাধাইকে নিবারণ করিল। লোক-পরম্পরায় এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সেই ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িলেন এবং ঐ দুই মদ্যপায়ীকে দণ্ডদানের জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন। তখন পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"মাধাই মারিতে উদ্যত হইলেও জগাই তাহাতে বাধা দিয়াছে। অতএব তুমি কৃপা করিয়া ইহাদিগকে ক্ষমা কর, এই দুইজনের শরীর আমাকে ভিক্ষা দাও।" ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"তুই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া আমাকে কিনিয়া ফেলিয়াছিস্, তোর আজ হইতে প্রেমভক্তি লাভ হইবে।" শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের কৃপায় জগাইর ঐরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাধাইরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ করিল। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমাধাইর সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তাহারা আর কখনও কোনরূপ পাপ করিবে না,—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রীনিতাই-গৌরের চরণে একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করিল। দুই মদ্যপায়ী মহাভাগবত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের কৃপার জয় ঘোষণা করাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশানুসারে মাধাই প্রত্যহ সজল-নয়নে আর্ত্তির সহিত 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, তথায় সমাগত বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও তাঁহাদের নিকট স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দারী সন্ন্যাসি-গৃহে

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করিবার পথে এক সন্ন্যাসীর গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী 'ধন, জন, সুন্দরী কামিনী ও বিদ্যা লাভ হউক'—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—'কৃষ্ণের কৃপা লাভ হউক'—'কৃষ্ণ-ভক্তি হউক'—এই এই প্রকার আশীর্ব্বাদ করাই সন্ন্যাসীর পক্ষে

কর্ত্তব্য ও ইহাই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ।' ইহাতে ঐ সন্ন্যাসি-নামধৃক্ ব্যক্তি নিমাই পণ্ডিতকে একটি নির্ব্বোধ বালক বলিয়া কটাক্ষ করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ দেখিলেন, ঐরূপ ভোগী ব্যক্তিকে সৎকথা বলিলে সে কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিবে না। তিনি ঐ তথাকথিত সন্ন্যাসীকে বাহিরে খুব সম্মান দিয়া বঞ্চনা করিলেন ও বলিলেন,—"আমরা কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য অন্যত্র যাইব। আমাদিগকে কিছু ভিক্ষা দাও।" ঐ সন্ন্যাসীর অনুরোধে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গাস্নান করিয়া তথায় দুগ্ধ, আম্র, কাঠালাদি কৃষ্ণ-নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন।

ঐ ব্যক্তি একজন বামাচারী দারী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ বুঝিতে না পরিয়া ও শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর মতে মত দিতেছেন দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীপাদ, আপনার জন্য কিছু 'আনন্দ' আনিব ?" শ্রীগৌর-সুন্দর 'আনন্দ' শব্দের অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ জানাইলেন যে—বামাচারিগণ মদ্যকে 'আনন্দ' বলিয়া থাকে। ইহা শুনিবা মাত্র শ্রীগৌরসুন্দর 'বিষ্ণু-বিষ্ণু' স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন ও সন্তরণ করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—পতিতপাবন। পতিত দারী সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি তাঁহার গৃহে ভোজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-নিন্দক ও মায়াবাদিগণ অত্যন্ত দাম্ভিক ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া সেইরূপ পতিতপাবন-শিরোমণিরও কৃপা হইতে বঞ্চিত। দারী সন্ন্যাসীর এক জন্মে না হউক, অন্য জন্মেও মঙ্গল হইতে পারে; কিন্তু মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কোন দিন মঙ্গল হইবে না।

ন্যাসী হইয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে।।
বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম্ম।।
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্ম্মে।।

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৯৬-৯৯)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতাদেবীর পাচিত অন্ন ভোজনের পর শ্রীনিত্যানন্দ বালকের আবেশে সমস্ত ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ক্রোধ-লীলা প্রকাশচ্ছলে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

কাজি ও পাষণ্ডী হিন্দু

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিতেন। অহিন্দু কাজি লোক-পরম্পরায় এ-সকল কথা ও স্বয়ং সংকীর্ত্তনের বাদ্য-কোলাহল শ্রবণ করিয়া সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডী হিন্দু-সম্প্রদায়ও কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া নিমাই ও নিতাইকে 'ভণ্ড' প্রভৃতি বলিয়া উক্তি করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, —"নিত্যানন্দের নগর-কীর্ত্তনের আনন্দ-রঙ্গ শীঘ্রই কাজি থামাইয়া দিবে।" এই সকল কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বলিলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ ও সকল বৈষ্ণবের সহিত নবদ্বীপে এক সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করিয়া কাজি-দলন করিলেন।

আর একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নদীয়ায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় মহাপ্রভু শ্রীবাসের ভবনে বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অন্তর্যামি-সূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারে আসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নিজ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ প্রদর্শন করিলেন।

নিমাইর সন্ন্যাস-সঙ্কল্প

নবদ্বীপবাসী পড়ুয়া পাষণ্ডিগণ নানাভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছিল। তাহারা মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার নিন্দা ও নির্য্যাতন করিবার ষড়যন্ত্রাদি করিতেছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল ব্যক্তিরও মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস-লীলা করিবার সঙ্কল্প হিঁয়ালিচ্ছলে ভক্তগণকে জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহই প্রভুর হিঁয়ালি বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের সুন্দর কেশের অন্তর্ধান হইবে জানিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া নিজ সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুও শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কল্পে বাধা প্রদান না করিয়া ভক্তগণের নিকট তাহা জানাইলেন। শ্রীগৌর-বিরহে শ্রীশচীমাতার অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নিস্পন্দ হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীব্রহ্মানন্দের সহিত মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিবার জন্য কাটোয়ায় আসিলেন। যখন নাপিত শ্রীগৌরসুন্দরের চাঁচর-চিকুর কেশে ক্ষুর প্রদান করিল, তখন শ্রীনিত্যানন্দ ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

দণ্ডভঙ্গলীলা

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়া অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গান করিতে করিতে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করিলেন ও শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পথে গোপবালকদিগকে শ্রীবৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া চলিতেছিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষামত বালকগণ মহাপ্রভুকে নবদ্বীপের পথকেই শ্রীবৃন্দাবনের পথ বলিয়া দেখাইয়া দিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীতে পড়িয়া শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে আসিলেন। তথায় নবদ্বীপবাসী ভক্ত ও শ্রীশচীমাতার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে গমনকালে রেমুণা গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কথা ও কটক-নগরে পৌঁছিলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সাক্ষীগোপালের কথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কটক হইতে শ্রীভুবনেশ্বরে শিব দর্শন করিয়া কমলপুরে ভার্গী নদীর তীরে যখন কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে গেলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ডটি রাখিয়া গেলেন। ইত্যবসরে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। এই দণ্ডভঙ্গ-লীলাদ্বারা

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগৎকে জানাইলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে একদণ্ড-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াও প্রকৃত-প্রস্তাবে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের লীলাই করিয়াছিলেন। সেই ত্রিদণ্ডও ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের ধারণের কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ তিনি বর্ণাশ্রমাদির চিহ্নহীন অবধূত পরমহংসগণেরও প্রভু—পরমেশ্বর।

নীলাচলে

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ভক্তগণ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিয়া প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীচৈতন্য-রসোন্মত্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। একদিন সুবর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন ও শ্রীবলরামের গলার মালা লইয়া নিজের গলায় ধারণ করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর একাকী দক্ষিণদেশে গমনের সঙ্কল্প করিলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু কিছুতেই শ্রীগৌরসুন্দর তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অবশেষে শ্রীগৌরসুন্দরের কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র বহন করিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে দিয়া দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন আলালনাথে আসিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে আনিবার জন্য কৃষ্ণদাস বিপ্রকে পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলনে প্রেমের তরঙ্গ পুনঃ প্রবাহিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণদাস বিপ্রকে মহাপ্রসাদাদি-সহ শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া শ্রীশচীমাতার নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল-প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানাইলেন।

শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাস নীলাচলে শ্রীনিত্যানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন।

নিভৃতে পরামর্শ

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার সহিত গোপনে পরামর্শ করিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে অনর্গল প্রেম-ভক্তি প্রচার করিবার আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার প্রচারের সঙ্গিরূপে শ্রীঅভিরাম ও শ্রীদাস গদাধরকে প্রদান করিলেন। তিনি সর্ব্বদা অলক্ষিতে থাকিয়া শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্য দর্শন করিবেন, ইহাও বলিয়া দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের

নিত্য আবির্ভাব-স্থান-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

(১) শচীর মন্দিরে আর (২) নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে
(৩) শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর (৪) রাঘব-ভবনে।।
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব।।

(চৈঃ চঃ অঃ ২।৩৪-৩৫)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় গৌড়দেশে আগমন করিয়া পরিব্রাজক-বেষে সর্ব্বত্র শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

যা'রে দেখে, তা'রে কহে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি।।

* * *

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
—দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ।।

রামচন্দ্র খাঁ

যশোহর জেলায় বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ অত্যন্ত বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডী ছিল। সে বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারিত না। সে মৎসরতাবশতঃ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট একটী যুবতী বেশ্যা পাঠাইয়া ঠাকুরের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার আশা পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু যখন বেশ্যাও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কৃপায় পরম মহান্তী হইয়া পড়িলেন, তখন রামচন্দ্র খাঁর ঈর্ষানল আরও বর্দ্ধিত হইল। একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রামচন্দ্র খাঁর গৃহে আসিয়া তাহার দুর্গামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। রামচন্দ্র খাঁর নিকট বাসস্থান যাজ্ঞা করিলে ঐ দাম্ভিক ব্যক্তি লোকের দ্বারা জানাইল যে, গোশালার ভিতরে দলবল সহ নিত্যানন্দ থাকিতে পারেন, অন্য স্থান হইবে না। ইহা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, রামচন্দ্র খাঁর ঘর বৈষ্ণবগণের যোগ্য নহে, ইহা প্রকৃত সত্য কথা, ম্লেচ্ছ ও গোঘাতকগণেরই ইহা উপযুক্ত বাসস্থান বটে। ইহা বলিয়া 'অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রায়' বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি

ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া সেই স্থান ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। এদিকে পাষণ্ডী রামচন্দ্র খাঁ তাহার ভৃত্যকে আজ্ঞা করিল,—"দুর্গামণ্ডপের যে স্থানে নিত্যানন্দ বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের মাটি খুদিয়া ফেলিয়া দিয়া গোময়-জলদ্বারা তাহার পবিত্রতা বিধান কর।" জগদ্গুরু-শিরোমণির শ্রীচরণে অপরাধের ফল অচিরেই ফলিল। ম্লেচ্ছ রাজার উজীর কর আদায় করিবার জন্য ঐ দুর্গামণ্ডপে বাসা গ্রহণ করিল এবং রামচন্দ্র খাঁকে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত বাঁধিয়া লইয়া গেল। ম্লেচ্ছ উজীর বেনাপোলে তিনদিন থাকিয়া সমস্ত গ্রাম লুটপাট করিল ও রামচন্দ্র খাঁর ঘরের মধ্যে উঠিয়া তিনদিন নিষিদ্ধ মাংস রন্ধন করিল। রামচন্দ্র খাঁর জাতি, ধন, জন—সমস্তই বিনষ্ট হইল।

শ্রীল রঘুনাথ দাস

পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন গৌড়দেশে পানিহাটি-গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে প্রেমের প্লাবন প্রবাহিত করিয়া অপামর সকলকে প্রেমবারিতে অভিষিক্ত করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু পিতার আজ্ঞা লইয়া পানিহাটি-গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীনিত্যানন্দরায় গঙ্গার তীরে একটি বৃক্ষমূলে পীঠোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন ও নিম্নে বহু ভক্ত প্রভুকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণকীর্তন করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল রঘুনাথকে স্নেহময় ডাকে ডাকিয়া বলিলেন,—

* * * "চোরা দিলি দরশন।
আয়, আয়, আজি তোরে করিমু দণ্ডন।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।৪৭)

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীরঘুনাথকে নিকটে টানিয়া আনিয়া স্বীয় কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণকমল শ্রীরঘুনাথের মস্তকে স্থাপন করিলেন ও ভক্তগণকে দধি-চিড়া-মহোৎসবে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ধ্যান-যোগে শ্রীগৌরসুন্দরকে পানিহাটিতে আনয়ন করিয়া শ্রীরঘুনাথদাসের দধিচিড়া-মহোৎসব গ্রহণ করাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের চরণে শ্রীরঘুনাথ শ্রীচৈতন্যচরণ-লাভের প্রার্থনা জানাইলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন যে, মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অলক্ষ্যে মহোৎসবে আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটি-গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীমকরধ্বজ কর প্রভৃতি ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া মাধব ঘোষের গানে নৃত্য করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিলে শ্রীরাঘব পণ্ডিতপ্রমুখ পার্ষদগণ শাস্ত্রবিহিত অভিষেক করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন। 'অসময়ে কদম্বফুল পাওয়া অসম্ভব' পণ্ডিত ইহা করজোড়ে নিবেদন করিলেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় শ্রীরাঘবের গৃহে জম্বীরের বৃক্ষে কদম্বফুল প্রস্ফুটিত হইল। শ্রীরাঘব সেই কদম্বফুলের মালা রচনা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের গলায় পরাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর একটি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দশদিক্ দমনক-পুষ্পের গন্ধে আমোদিত করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জানাইলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব দমনক-পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া নীলাচল হইতে নৃত্য দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ দেহ-গেহ ভুলিয়া কেবল সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন কর।

এতেকে তোমরা সর্ব্বকার্য্য পরিহরি'।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি।।
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৯৮-২৯৯)

গৌড়মণ্ডলে

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তিনমাস কাল পানিহাটিতে অবস্থান করিয়া প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার পরিধানের ইচ্ছা হইল। ইচ্ছামাত্র অগণিত প্রকার অলঙ্কার উপস্থিত হইল। তিনি সেই সকল অলঙ্কার পরিধান করিয়া গোপবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ভক্তগৃহে পর্য্যটন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রচার করিলেন। শ্রীগদাধর দাসের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার পূজিত শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করিলেন, শ্রীমাধবানন্দ ঘোষের দানখণ্ড-লীলা-গানে নৃত্য করিলেন, শ্রীশচীদেবীর দর্শনার্থ শ্রীমায়াপুরে আসিলেন ও তৎপরে খড়দহ হইয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ত্রিবেণীতে স্নান-লীলা প্রকাশ করিয়া নিজ

পার্ষদ ভক্ত শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সেবা অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বত্র শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় তদানীন্তন বণিক্‌কুল অধম ও মূর্খ হইলেও প্রেম-ভক্তি লাভ করিলেন। বিষ্ণুদ্রোহী যবনও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তৎপরে শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সংকীর্ত্তন-বিলাস করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শত শত দুর্জ্জন চোর-দস্যুরও মঙ্গল লাভ হইল।

দস্যুদলপতি-উদ্ধার

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণপুত্র চোর-দস্যুর সেনাপতি হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার দেখিতে পাইয়া ঐ দস্যু-দলপতি ব্রাহ্মণের লোভ হইল। সেই দস্যু শ্রীনিত্যানন্দের অনুসরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন নিশাভাগে দস্যুদলপতি সদলে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। দস্যুগণ মনে করিল—ইহারা শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তাহারা শ্রীনিত্যানন্দের শরীর হইতে এক এক-জন এক একটি অলঙ্কার অপহরণ করিবে। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় অচিরেই দস্যুগণের চক্ষে নিদ্রার আবির্ভাব হইল, যখন কাকরবে পরদিন প্রাতঃকালে দস্যুগণ জাগরিত হইল, তখন তাহারা সসম্ভ্রমে গুপ্তস্থানে অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল ও পরস্পর দোষারোপ করিতে লাগিল। অন্যদিন মদ্য-মাংসের দ্বারা চণ্ডীপূজা করিয়া আবার নানা অস্ত্র-শস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থান বেষ্টন করিল। কিন্তু সেইদিন দেখিতে পাইল ঐ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনেক অস্ত্রশস্ত্রধারী প্রহরী হরিনাম করিতে করিতে সেই স্থান রক্ষা করিতেছে। ইহা দেখিয়া দস্যুগণ বড়ই বিস্মিত হইল। ঐ সকল প্রহরীকে এড়াইবার জন্য তাহারা অন্ততঃ দশদিন আর ঘরের বাহির হইল না। তৎপরে তৃতীয়বার মহাঘোর নিশা দেখিয়া তাহারা শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থানের নিকট আগমন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইবামাত্রই সকলে অন্ধ হইয়া গেল, কেহ আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কেহ উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে, কেহ কাঁটার উপরে, কেহ আস্তাকুঁড়ে পতিত হইল। এমন সময় অত্যন্ত ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় দস্যুগণের কষ্টের সীমা থাকিল না। তখন দস্যু-সেনাপতির হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অচিন্ত্য

ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ হইল। সেই ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে পড়িয়া ক্ষমা-ভিক্ষা ও স্তব করিতে লাগিল। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় দস্যু-সেনাপতির সহিত দস্যুগণের সমস্ত অপরাধ দূর হইল ও প্রেমভক্তি লাভ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দস্যু-সেনাপতির মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। সেই দুস্যপতির প্রভাবে যাবতীয় চোর-দস্যু ধর্ম্মপথে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শরণ গ্রহণ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু-ব্যবহার।।
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ-লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ।।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণা-সাগর।।
অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায়।।
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ-স্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে।।
যোগেশ্বরে-সবে বাঞ্ছা যে প্রেমবিকার।
যে অশ্রু, যে কম্প, যে বা পুলক, হুঙ্কার।।
চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি।।

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৯৭-৭০৩

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন এইরূপ নানা অলঙ্কার গন্ধমাল্য প্রভৃতি পরিধান করিয়া ও তাম্বুলে অধর রঞ্জিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নাম প্রচার করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ব্ব-সহাধ্যায়ী শ্রীনবদ্বীপবাসী এক ব্রাহ্মণের হৃদয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরকে খুব ভক্তি করিতেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ঐরূপ আচার-ব্যবহার দর্শন করিয়া তৎপ্রতি সংশয়যুক্ত হইয়া-

ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন যে, উত্তমাধিকারীর আচরণ সাধারণ বিধিবাধ্য নহে। তাঁহার আচরণ সাধারণের অনুকরণীয়ও নহে। অপরে রুদ্রের কালকূট-পান অনুকরণ করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। উত্তমাধিকারী অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিবার অভিনয় করিলেও উহার নিন্দা করা দূরে থাকুক, তাহাতে হাস্য করিলেও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

পুনরায় নীলাচলে

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের দর্শনের জন্য পুনরায় নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। যদিও শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কেবলমাত্র গৌড়দেশে থাকিয়া প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ আদেশ দিয়াছেন, তথাপি গৌরবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পুনরায় নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে আসিয়া একটি পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করিলেন। তথায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করিলেন—

গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া বলিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, হীরক, রৌপ্যাদি অলঙ্কার, তাহা সাক্ষাৎ নববিধা ভক্তি। অজ্ঞ লোক ইহা ধারণা করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদগণ ব্রজের শ্রীবলদেব ও শ্রীবলদেবের সখাবৃন্দ।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে আধ্যক্ষিকগণের বিচার নিরাস করিয়া এই কয়েকটি মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজ-চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল-চরিত্র প্রভুকে যাঁহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি

কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুকে যোষিৎসঙ্গ দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিক মধ্যে গণন করেন। নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন।"

—সজ্জনতোষণী ৮।৯

শ্রীশিবানন্দ সেন

শ্রীনিত্যানন্দের নীলাচলে গমনের পথে এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীশিবানন্দ সেন ভক্তগণের পথকর প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। শিবানন্দের উড়িষ্যার পথেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। একদিন তিনি সমস্ত ভক্তকে ঘাটে রাখিয়া কার্য্যান্তরে একাকী অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। এদিকে শিবানন্দের অভাবে কাহারও বাসস্থান ঠিক হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাসস্থান না পাইয়া ও অপ্রাকৃত ব্রজগোপালের ভাবে ক্ষুধায় কাতরতার অভিনয় করিয়া শ্রীশিবানন্দকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—'এখনও শিবা ফিরিল না। বাসাও পাইলাম না, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, শিবার তিন পুত্র মরুক।' এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীশিবানন্দ-পত্নী ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অচিরেই শ্রীশিবানন্দ উপস্থিত হইলেন ও পত্নীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন,—"শ্রীশিবানন্দপ্রভুর বালাই লইয়া তোর তিন পুত্র মরুক্, তাহাতে ক্ষতি কি?" শ্রীশিবানন্দ উপস্থিত হইবা মাত্রই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ক্রোধলীলার অভিনয় করিয়া শ্রীশিবানন্দের অঙ্গে পদাঘাত করিলেন। শ্রীশিবানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীপাদপ্রহারকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া বরণ করিলেন। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুকে নির্ব্বাচিত গৃহে আনিয়া স্তব করিয়া বলিলেন,—

আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা।।
'শাস্তি'-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা'।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা?
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু।।

আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম।।

—চৈঃ চঃ অঃ ১২।২৭-৩০

শ্রীটোটাগোপীনাথে

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করিয়া অদ্ভুত প্রেম বিকার প্রদর্শন করিলেন ও তথা হইতে টোটায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত-ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ সমীপে আগমন করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌড়দেশ হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনীত দেবভোগ্য সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি সুন্দর রঙ্গীন বস্ত্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবায় প্রদান করিলেন। এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীগদাধরের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের প্রদত্ত তণ্ডুল ও পণ্ডিতের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ-ভোজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-গদাধরের অবশেষপাত্র লুণ্ঠন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—"তুমি গৌড়দেশে থাকিয়াই আমার মনোঽভীষ্ট প্রচার কর। তথায়ই আমার নিত্যকাল সঙ্গ পাইবে।"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস গাহিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে যে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার।।

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২২০

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।

নিত্যানন্দ-মহিমাসিন্ধু, অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার।।

—চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৫৬-১৫৭

শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাসিন্ধু স্পর্শ করিবার শক্তি ক্ষুদ্র জীবের দূরে থাকুক, স্বয়ং সহস্রবদনও তাঁহার সহস্র শ্রীমুখে অনন্তকাল বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর।।
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার।।
তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁরে পরম সহায়।।
মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।।

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৬-১৯

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

"শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেব তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। শ্রীবলদেব হইতেই মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বিরাজ করেন। তিনি কারণবারিতে ঈক্ষণ করিয়া স্বীয় মহাবিষ্ণু-লীলা প্রকটিত করেন; গর্ভবারিতে উদিত হইয়া সমষ্টি মহাবিষ্ণুর-লীলা প্রদর্শন করেন এবং ক্ষীরবারিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্যষ্টি বিষ্ণুর লীলাদ্বারা জীবসমূহের কল্যাণ বিধান করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শেষশায়ী ভগবান্ রূপে শয্যা, আসন প্রভৃতি দশ প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করেন। অনাদি, সর্ব্বাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ সর্ব্ব-কারণ-কারণ কৃষ্ণ উদার লীলা প্রকট করাইয়া যে কালে কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করিতেছিলেন, সেই কালে শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার প্রেম-

প্রদানলীলার সেবার জন্য স্বীয় শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিত্য আশ্রিত জীব গৌরপার্ষদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কারণবারিতে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ হইতে শ্রীগোলোক বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, জীবশক্তি প্রকটিত যাবতীয় অণুচৈতন্য জীবপুঞ্জ, তথা চতুর্দ্দশ ভুবন সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে জগতের উপাদান-কারণান্তর্যামী শ্রীঅদ্বৈত বিগ্রহ। শ্রীরামনৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতারাবলী তাঁহা হইতে নিত্য প্রকটিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব, সুতরাং যাবতীয় শক্তির প্রভু। সকল শক্তির প্রভু হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সহিত সম্বিচ্ছক্তিমানের সন্ধানপ্রদর্শক অনুগত সেবক। অর্থাৎ তিনি সন্ধিনী-শক্তিমদ্ বিগ্রহ।

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে বিষ্ণুতত্ত্ব আবদ্ধ। তিনি স্বয়ং অভিন্ন-বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও বিষ্ণুপারতম্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবক। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর —শ্রীমহাপ্রভু; নিত্যানন্দপ্রভু সেই মহাপ্রভুর বিভু অর্থাৎ বৈভবপ্রকাশবস্তু। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব নহেন।

মহাবিষ্ণুর মূলকারণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিষয়জাতীয় তত্ত্ব। তিনি আশ্রয়জাতীয় গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন। সেব্যবস্তুকে আলঙ্কারিকগণ বিষয় বলেন, সেবককে আশ্রয় বলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রকৃতির অধীশ্বর। তাঁহার কোন অংশই প্রাকৃত নহে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রকৃতির অতীত উপাদানে নিত্য প্রকটিত। তিনি শক্তিমান্ বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁহার অপ্রাকৃত-শক্তি শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীদ্বয়।

বদ্ধ জীবের ন্যায় অপ্রাকৃত বিষ্ণু বা পার্ষদ-দেহে দেহ-দেহী ভেদ নাই অর্থাৎ যাঁহার দেহ এবং যিনি দেহী তদুভয়ের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রপঞ্চে প্রাকট্য আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য যন্ত্রণাময় নহে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা গোলোকে নিত্য প্রকটিতা। মূলবিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আমাদের ন্যায় জড় দেহ ছিল না এবং তিনি অপর জড় দেহের সহিত প্রাকৃত সম্ভোগ করেন নাই বা তিনি প্রাকৃত বিরহরূপ জড়রসে মগ্ন হন নাই। শ্রীবসুধার তনয় শ্রীক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু শ্রীবীরভদ্রপ্রভু নামে নিত্যকাল প্রসিদ্ধ আছেন। অপ্রাকৃত দৃষ্টি হারাইলে আমরা এই সকল কথা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই। শ্রীগুরুর

কৃপায় অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের অপ্রাকৃত বুদ্ধির জ্ঞেয়-বস্তুরূপে ঐ সকল নিত্য বর্ণন পরিস্ফুট হয়। যে সকল ব্যক্তি প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রাকৃত বদ্ধ মানবের সহিত সমজ্ঞানে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-দর্শনে অসমর্থ। আমাদের বদ্ধ-বিচারে প্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়ের তাণ্ডব-নৃত্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দ-বিধান করিতে কোনকালেই সক্ষম হয় না।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহার নিত্য। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর আবির্ভাব নিত্য। তাহাতে জড়ের গন্ধ নাই।

শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীনিত্যানন্দশক্তি—অনঙ্গমঞ্জরী। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শক্তির সহিত অভিন্ন বলিয়া তিনিও শ্রীবার্ষভানবীর কনিষ্ঠা সহোদরা—শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।”

শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদবৃন্দ

শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের মধুপানকারী পার্ষদগণের চরিত্রও পরমাদ্ভুত ও পরমানন্দময়।

নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দমন।
কারো কোন কর্ম্ম নাই সঙ্কীর্ত্তন-বিনে।
সবার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।।

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭১২-৭১৩

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজরূপে শ্রীবীরভদ্র গোস্বামিপ্রভু শ্রীবসুধাগর্ভসিন্ধুতে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্যষ্টি বিষ্ণু বা শ্রীক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। গোলোকে তাঁহার নিত্যকাল প্রাকট্য আছে। তিনি শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর শিষ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদ-ধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত।।
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তিঁহো মূলস্তম্ভ।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১১।৯-১০

হুগলি জেলার অন্তর্গত ঝামটপুরগ্রাম-নিবাসী শ্রীযদুনাথ আচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুৎ-মালার গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতী ও তাঁহাদের পালিতকন্যা শ্রীনারায়ণীকে শ্রীবীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন। তাঁহাদের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। পালিত পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন। তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপীজনবল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকট লতাগ্রামে ও মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েসপুরে বাস করেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ—এই তিনজন যে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় পুত্র-শব্দে শিষ্যই জানিতে হইবে। যেহেতু তাহাদের গাঁই পৃথক্ পৃথক্। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর বার শত নেড়া ও তের শত নেড়ী—সকলেই সংযত ছিলেন। পরে নেড়া নেড়ীর দলে ব্যভিচার উৎপন্ন হয়, মৎস্যাদি ব্যবহারের প্রচলন হয় ও অনেকেই লোকের ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়ে।

দ্বাদশগোপাল

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ—যাঁহারা ব্রজের সখা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই দ্বাদশগোপাল নামে খ্যাত। তাঁহার সকলেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (১) শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, (২) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, (৩) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৫) শ্রীপরমেশ্বরী দাস, (৬) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৭) শ্রীমহেশ পণ্ডিত, (৮) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, (৯) শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস, (১০) শ্রীপুরুষোত্তম, (১১) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর ও (১২) শ্রীশ্রীধর। ইঁহারাই দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দের গণ অনন্ত।

শ্রীনিত্যানন্দ-জয়

আমরা শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ-গণের শ্রীচরণে তাঁহাদের শ্রীনিত্যানন্দপ্রীতি-সিন্ধুর এক কণিকা প্রার্থনা করিয়া মহাজনগণের অনুসরণে শ্রীনিত্যানন্দের জয় ঘোষণা করিতেছি,—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-ধাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম।।

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়।।
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত।।
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।।

—চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০০-২০৪

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হই পাগল।।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র।।
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইএর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।

এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।।
কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাহিয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার।।
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ, চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার।।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী—পরাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিতা হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীও তদ্রূপ নবধা ভক্তিস্বরূপা।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরগৃহের গৃহিণী। তাঁহার কৃপায় প্রাকৃত স্ত্রী-পুং-বিচারজনিত জড়ীয় ভোক্তৃভোগ্যভাব-প্রধান সংসার বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার-লাভ ও তথায় শ্রীনিত্যানন্দ-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদের শ্রীনামহট্টের সম্মার্জ্জনী-স্বরূপে সেবাধিকার লাভের আর্ত্তি উদিত হয়। কোথায়ও কোথায়ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে বহুবল্লভ শ্রীদ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী 'শ্রীসত্যভামা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতেও বৈশিষ্ট্য আছে। পুরমহিষী শ্রীসত্যভামার গর্ভে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে সেইরূপ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌর-নারায়ণের লীলায় শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপেই পূজিতা হন। শ্রীদ্বারকাপুরীর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বহু বৈধ-পত্নীর পতি, শ্রীমায়াপুরাধীশ শ্রীগৌর-নারায়ণ সেইরূপ বহুবল্লভ নহেন। শ্রীগৌর-নারায়ণ ও শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভর বস্তুতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান হইলেও উভয়ের প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে, লীলার পৃথক প্রকোষ্ঠও আছে।

শ্রীনবদ্বীপে 'শ্রীসনাতন মিশ্র' নামে এক পরম বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। যে-সকল সদ্‌গুণ শ্রীবিষ্ণুভক্তির শ্রীপদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকে, তাহা সমস্তই শ্রীসনাতন মিশ্রে অবস্থিত ছিল। তিনি অতিশয় দয়ার্দ্র চিত্ত, অকপট, উদার, অতিথিবৎসল, পরোপকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ব্যবহারিক ও সামাজিক জগতেও মহাসম্পত্তিশালী সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু লোককে লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করিতেন। শ্রীসনাতন উচ্চ-কুলোদ্ভূত, মহা-আভিজাত্যসম্পন্ন ও সর্ব্বত্র 'রাজপণ্ডিত' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই এক অতি সুশীলা, সুচরিতা, মূর্ত্তিমতী শ্রীলক্ষ্মী-স্বরূপিণী কন্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী। অতি শিশুকাল হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ দুই-তিনবার গঙ্গাস্নান ও শ্রীবিষ্ণুভক্তির আচরণ করিতেন। যখন শ্রীশচীদেবী গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন, তখন সুচরিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ শ্রীশচীমাতাকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতেন। শ্রীশচীদেবীও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে "শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় তোমার

যোগ্য-পতি লাভ হউক"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। শ্রীশচীদেবী মনে মনে অভিলাষ করিলেন যে, ঐ সর্ব্বসুলক্ষণা ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার পুত্রবধূ হউন। রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের অন্তরেও শ্রীনিমাই পণ্ডিতের হস্তে নিজ কন্যা দান করিবার প্রবল ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। শ্রীশচীমাতা ঘটক শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া শ্রীসনাতন মিশ্রের নিকট পুত্রের সম্বন্ধের প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। শ্রীকাশীনাথ শ্রীসনাতন মিশ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা।
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী।।
যেন কৃষ্ণে-রুক্মিণীতে অন্যোঽন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৫৭-৫৯)

ঘটক শ্রীকাশীনাথের এই প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীসনাতন মিশ্র স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই একবাক্যে অতি সত্বর শ্রীবিশ্বম্ভর পণ্ডিতের সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য সানন্দ-অনুমোদন করিলেন। প্রভুর বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া শিষ্যগণ পরমানন্দিত হইলেন। প্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত অনুগত ধনশালী ভক্তবিপ্র পরম সৌভাগ্যবান্ শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ মহাশয় স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। চতুর্দ্দিকে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণঘট, আম্রসার, দীপ, ধান্য, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক-দ্রব্য ও সমস্ত স্থান আলিপনাময় করিয়া সু-বৃহৎ চন্দ্রাতপসমূহের দ্বারা বিবাহ-মণ্ডপ সজ্জিত করা হইল। শ্রীনবদ্বীপে তখন যত বৈষ্ণব, যত ব্রাহ্মণ ও যত সুসজ্জন বাস করিতেন, সকলেই অধিবাসোৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। নবদ্বীপে লক্ষেশ্বরেরও বিবাহের অধিবাস-উৎসব এরূপ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় নাই। পরদিবস বিবাহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইল। অপরাহ্ণে শ্রীবিশ্বম্ভরপ্রভুকে বরোচিত-বেশে সজ্জিত ও দোলায় আরোহণ এবং সর্ব্ব-নবদ্বীপ ভ্রমণ করাইয়া কন্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' মঙ্গলধ্বনি ও স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি হইতে থাকিল। গঙ্গাতীর

দিয়া বরযাত্রা বাহির হইল। সহস্র সহস্র দীপ, নানাপ্রকার অগ্নিক্রিয়া ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে অপ্রাকৃত বরের শোভাযাত্রা গোধূলিকালে শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। শ্রীসনাতন মিশ্র ও তৎসহধর্ম্মিণী জামাতাকে বরণ, আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিলেন। নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া আসনে স্থাপনপূর্ব্বক মহালক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ-স্থানে আনয়ন করা হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মী স্বীয় কান্ত শ্রীগৌরনারায়ণকে সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তৎপরে অপূর্ব্ব বাদ্যভাণ্ড ও জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরনারায়ণ পরস্পর 'পুষ্প-ফেলাফেলি' করিলেন। জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে মাল্য প্রদান করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন।

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে।।
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।।
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প-ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা হই' মহা-কুতূহলী।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১৭৬-১৭৮)

শ্রীসনাতন মিশ্র শ্রীগৌরনারায়ণকে বহু যৌতুকের সহিত নিজকন্যা মহালক্ষ্মীকে সম্প্রদান করিলেন।

বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি' শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১৮৮)

বিবাহের পর শুভরাত্রিতে বাসরগৃহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পুষ্পশয্যায় অবস্থান করিলেন। শ্রীসনাতন-পণ্ডিতের অপ্রাকৃত আনন্দ ও সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন,—

নগ্নজিৎ, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তাঁ'রা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত।।

সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণুসেবার কারণ।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।১৯৫-১৯৬)

তৎপর দিবস অপরাহ্ণে ঈশ্বর-দম্পতি পুনরায় বাদ্যগীতধ্বনি-সহকারে শ্রীশচীদেবীর গৃহে আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত যুগলরূপ-দর্শনে কৃতার্থা হইয়া শ্রীনবদ্বীপের সৌভাগ্যবতী ললনাগণ বলিতে লাগিলেন,—

*   *   *   "এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্ব্বতী।।"
কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হরগৌরী।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি।।"
কেহ বলে,—"এই দুই কামদেব-রতি।"
কেহ বলে,—"ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি।।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এই মত বলে যত সুকৃতি-বনিতা।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২০৫-২০৮)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরনারায়ণের শুভদৃষ্টিপাতে সমস্ত নবদ্বীপ সুখময় হইয়া উঠিল। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিশ্বম্ভরের পরিণয়-দর্শনে জীবের পরমকল্যাণ-লাভের কথা এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই' যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২১৬)

শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণের সহিত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীর সম্মিলনরূপ অপ্রাকৃত বিবাহলীলা দর্শন করিলে সংসারপরায়ণ জীবের সংসার-ভোগবাসনা বিদূরিত হইয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১৬শ অধ্যায়, ২৫ সংখ্যায়) কেবলমাত্র শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়ের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্য কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নাই। শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় ১ম প্রক্রমের ১৩শ ও ১৪শ সর্গে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর সহিত শ্রীগৌর-সুন্দরের বিবাহসম্বন্ধ-স্থাপন ও বিবাহের বর্ণনা আছে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র আদিখণ্ডে বিস্তৃতভাবে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহ-লীলা-বর্ণন এবং গ্রন্থের বহুস্থানে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রসঙ্গ আছে।

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সূত্রখণ্ডের মঙ্গলাচরণে এইরূপ-ভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

নবদ্বীপময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁ'র অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙা পা।।

(শ্রীচৈঃ মঃ—সূত্রখণ্ড, ২২।৩ পৃঃ, গৌরঃ সং)

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর শ্রীল মুরারিগুপ্তের অনুসরণে শ্রীসনাতন মিশ্রের উক্তি এইরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর-হেন পতি পা'ব।
'বিষ্ণুপ্রিয়া'-নাম তা'র যথার্থ হইব।।
শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী।
ঐছন হইব সেই হিয়া অনুমানি।।

(শ্রীচৈঃ মঃ, আঃ ৪০-৪১।৭৯ পৃঃ)

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায়,—

ততো হৃষ্টো দ্বিজশ্রেষ্ঠোবদন্মধুরমা গিরা।
বিষ্ণুপ্রিয়া পতিং প্রাপ্য তব পুত্রং শ্রিয়ান্বিতম্।।
যথার্থনাম্নী ভবতু শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ।
তামুদ্বাহ্য যথা কৃষ্ণো রুক্মিণীং প্রাপ্য নির্বৃতঃ।।

(১ম প্রঃ; ১৩শ সঃ, ১৩-১৪ শ্লোক)

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হৃষ্ট হইয়া মধুরবাক্যে বলিলেন,—"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরমসৌন্দর্য্যশালী আপনার পুত্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া যথার্থনামা হউন এবং শ্রীমদ্বিশ্বম্ভর প্রভু তাঁহাকে (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে) বিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরমপ্রীতি লাভ করুন।"

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ গৌর-নাগরী-মতবাদ ও নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কাল্পনিক বর্ণনার প্রক্ষেপ করিয়াছে। ইহা কোন কোন আধুনিক সাধারণ সাহিত্যিকও স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিচার প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই; অতএব এই দুই গ্রন্থের সিদ্ধান্তের সহিত যদি অন্য কোন শ্রীচৈতন্য-চরিতের বিচার ঐকতানে গ্রথিত দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা শ্রীগৌরজনবিহিত সুসিদ্ধান্ত বলিয়া বিহিত হইতে পারে না। শ্রীল লোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিহারাদি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের বিহার কিছু প্রাকৃত জীবের ন্যায় সম্ভোগচেষ্টা নহে; কিন্তু যদি ইহা গৌরনাগরী-মতবাদী বা প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের সম্ভোগপর অপসিদ্ধান্ত স্থাপনের উপজীব্য হইয়া পড়ে, তবে তাহা নিতান্ত অপরাধময়। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের সম্ভোগমদমত্ত জীবকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের ভাষায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে; যথা—

"জগতে যতেক দেখ, মিছা করি' সব লেখ,
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব, তা' বিনে যতেক সব,
মিছা করি' করহ গেয়ান।।
মিছা সুত, পতি, নারী পিতা, মাতা—যত বলি,
পরিণামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত' কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ—এ মায়া তাঁহার।।
কিবা নারী, পুরুষ, সবারি সে আত্মা এক,
মিছা মায়াবন্ধে রহে দুই।

শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এই কথা না বুঝয়ে কোই।।

* * *

তোর নাম—'বিষ্ণুপ্রিয়া', সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা, দূর কর আন-চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে।।"

(শ্রীচৈঃ মঃ মধ্য ১৫০ পৃঃ, ২৭-২৯।৩৩)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর আরও লিখিয়াছেন,—

আপনে ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ-মায়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত।
দূরে গেল দুঃখশোক, আনন্দে ভরল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত।।
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
'পতি'-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।
পড়িয়া চরণতলে, প্রণতি-মিনতি করে,
"এক নিবেদন শুন, প্রভু।।
মো অতি অধর ছার, জনমিল এ সংসার,
তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি।
এ হেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর,
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি?"

(শ্রীচৈঃ মঃ মধ্য ১৫০-১৫১ পৃঃ, ৩৪-৩৬)

তৎপরে শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণ নিজ নিত্যলক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বলিতে লাগিলেন,—

"শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,
যখনে যে তুমি মনে কর।

আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাঁই,
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়।।"

তখন—

কৃষ্ণ-আজ্ঞাবাণী শুনি', বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি',
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি প্রভু।
নিজসুখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেক তভু।।"

(শ্রীচৈঃ মঃ মধ্য ১৫১ পৃঃ, ৩৮-৩৯)

শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের এই বর্ণনাতে শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলায় কোনরূপ বাধাপ্রদানজনিতা সম্ভোগময়ী ধারণার লেশও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীতে কল্পনা করেন না; বরং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভরের নিজসুখের অর্থাৎ শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভ-লীলার পুষ্টিবিধান করিয়াছেন, ইহাই উপলব্ধি করেন। যাহারা শ্রীলোচন দাসের বর্ণনার কদর্থ করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর প্রতি অতি ভক্তি দেখাইতে গিয়া তাঁহাকে কল্পনাবশে নীলাচলের কাশীমিশ্র-ভবনের গম্ভীরা মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীপাদপদ্মে মহা-অপরাধী, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী ও অতীব নিন্দনীয় প্রাকৃত-সহজিয়া। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলার পরও নীলাচলে থাকিয়া পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর জন্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, এরূপ বর্ণনাদি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত জড়বুদ্ধি লেখকগণের স্ব-স্ব জড়াসক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দুর্দ্দমনীয় রিপুচাঞ্চল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিভিন্ন প্রকার 'গৃহীবাউল'-সম্প্রদায়ের নিমাই-সন্ন্যাসের নানাপ্রকার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কেহ কেহ পরিণত-বয়স্কা ভার্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করায় শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্মলঙ্ঘন ও বনিতার হৃদয়ে দুঃখপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইঁহারা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের উপদেশের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না।

পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে।।
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০৪-১০৫)

শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহত্যাগ-লীলার পরের দৃশ্য শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে এরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

শচীদেবী কান্দে কোলে করি' বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা পড়িয়া।।
অবয়ব আছে—প্রাণ গেল ত' ছাড়িয়া।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমি লোটাইয়া।।

* * *

কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি' পলাইয়া গেলা।
ভকত-সভার প্রেম কিছু না গণিলা।।
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে—হিয়া নাহিত সম্বিৎ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে—উনমত-চিত।।

(শ্রীচৈঃ মঃ মধ্য ১৫২-১৫৩ পৃঃ, ১০-১১, ২১-২২)

বিষ্ণুপ্রিয়া-কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু-পক্ষি-লতা-তরু এ পাষাণ ঝুরে।।
'পাপিষ্ঠ শরীর মোর, প্রাণ নাহি যায়।'
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায়।।
বিরহ-অনল-শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুখায়—কম্প হয় কলেবর।।
কেশ-বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ—রহে ত' ফুলিয়া।।

ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা-চরণ-ধেয়ানে।
সম্বেদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে।।
"প্রভু! প্রভু!" বলি' ডাকে ক্ষণে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-কান্দনাতে সবজন কান্দে।।
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি' হিয়া পুড়িতে লাগিল।।
সবজন বোলে,—"হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে—স্থির কর হিয়া।।
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মাঝ।।"
প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া।
বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া।।
'সন্ন্যাস করিল মো-সভারে দুঃখ দিয়া।
এখানে ছাড়িয়া গেলা নিদারুণ হৈয়া।।
রহিব কেমনে তাঁহা ছাড়িয়া আমরা।
নিদারুণ মো-সভারে ছাড়িলেন গোরা।।
তাঁ'রোধিক দয়াল তাঁহার বড় নাম।
নাম হৈতে তাঁ'রে পাই—এই মুখ্য কাম।।
তাঁ'র বাক্য আছে পূর্ব্ব মো-সভার তরে।
নাম যেই লয়—সে পাইব আমারে।।'
এত চিন্তি' নাম লৈতে বসিলা সভাই।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই।।
কি বালক, বৃদ্ধ কিবা, যুবক-যুবতী।
নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি' গতি।।

(শ্রীচৈঃ মঃ মধ্য ১৫৯ পৃঃ, ১৫, ২৬-৪০)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাঁহার এই লীলার দ্বারা জগজ্জীবকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় শ্রীনামভজনের শিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্য। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর যখন শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলার অব্যবহিত পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর আদেশে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন, তখন শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী ও বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীঈশান প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' (৪র্থ তরঙ্গ) ও 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে এই সকল ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিয়া শ্রীনাম করিতেন (অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চারণান্তে একটী তণ্ডুল রক্ষণ করিতেন; দুইটি নূতন মৃৎপাত্রের একটী শূন্য, অপরটীতে তণ্ডুল থাকিত)। যে কয়টী তণ্ডুল হইত, তাহা রন্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া তাহার কিয়দংশ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদ-গ্রহণকালেও বিপ্রলম্ভের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার দিবারাত্র শ্রীনামভজনে অতিবাহিত হইত।

প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন।
ঈশ্বরীর ক্রিয়া—যৈছে না হয় বর্ণন।।
প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে।।
কনক জিনিয়া অঙ্গ, সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ।।
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়।।
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে, কেনে রাখয়ে জীবন।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ৪।৪৭-৫১)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পর শ্রীনিত্যান্দশক্তি শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলার পরও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীগৌরগৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীগৌরনাম,

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম-সেবা-শিক্ষাদাত্রী আচার্য্যের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর কৃপায় ও আনুগত্যে যেরূপ সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রচার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও কৃপা ও আনুগত্য বরণ করিয়া তাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র ৪র্থ বিলাস, ১৬৭ সংখ্যায় ও শ্রীভক্তিরত্নাকরের ৪র্থ তরঙ্গে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শনার্থ শ্রীখণ্ড হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীবংশীবদন দাসের সহিত শ্রীমায়াপুরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের সাক্ষৎকার হয়। শ্রীবংশীবদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবার্থ শ্রীমায়াপুরে বাস করিতেছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও তচ্ছিষ্য শ্রীবংশীবদনের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী বাৎসল্যানুগ্রহে শ্রীনিবাসের মস্তকে শ্রীচরণ ধারণ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস-লীলার প্রাক্কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু মাতা শ্রীশচীদেবীকে প্রবোধদানচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭)

অর্থাৎ হে মাতঃ! আমি অবিলম্বেই শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতাররূপে সংকীর্ত্তনমুখে অবতীর্ণ হইব। কারণ—"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ।।" শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় দৃষ্ট হয় যে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবিশ্বম্ভরের শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশ ও শ্রীগৌরনামামৃত-কীর্ত্তনের দ্বারা জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন।

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্।।

(৪র্থ প্রঃ; ১৪শ সঃ, ৮ম শ্লোক)

সেই শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সমীপে অবস্থানকালেই (শ্রীমহাপ্রভু) স্বীয় প্রকাশস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া 'ইঁহাতে কৃষ্ণ অবস্থান করেন' এইরূপ উপদেশ করায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই প্রভুর (শ্রীমূর্ত্তির) সেবা করেন।

এই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের প্রায় সমকালেই শ্রীগৌরীদাস-পণ্ডিত নিজগৃহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র-শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন।

ততো নিত্যানন্দগৌরচন্দ্রৌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরৌ।
জয়তাং গৌরীদাসাখ্যপণ্ডিতস্য গৃহে প্রভু।।
তস্য প্রেম্নানিবদ্ধৌতৌ প্রকাশ্য রুচিরাং শুভাম্।
মূর্ত্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতাম্।।
দদতৌ পরমপ্রীতৌ নিবসন্তৌ যথাসুখম্।
তাভ্যাং সহ ভুক্তবন্তাবন্নঞ্চ বিবিধং রসম্।।

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা—৪র্থ প্রঃ, ১৪শ সঃ ১২-১৪)

অতঃপর সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরচন্দ্র—এই প্রভুদ্বয় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শুভবিজয় করিয়া তাঁহার প্রেমে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বশক্তিসমন্বিত স্ব-স্ব রসে পূর্ণ প্রকাশ্য রুচি-বিশিষ্ট সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের সহিত বিবিধ রসযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিতেন এবং পরমপ্রীতিসহকারে তাঁহার গৃহে বাস করিতেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থপাঠ করিয়া আরও কয়েকটী স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।

কাশীশ্বর-প্রতি প্রভু কহয়ে নির্জ্জনে।
"তোমারেই যাইতে হইল বৃন্দাবনে।।"
কাশীশ্বর কহে,—"প্রভু, তোমারে ছাড়িতে।
বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে।।"
কাশীশ্বর-অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ-স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি'।।
প্রভু সে-বিগ্রহ-সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি' কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল।।

'শ্রীগৌরগোবিন্দ'-নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁ'রে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা।।
শ্রীগোবিন্দ-দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।।

(শ্রীভঃ রঃ ২।৪৩৮-৪৪৩)

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীখণ্ডে যে শ্রীগৌর-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে শুভবিজয় করিলে শ্রীল রঘুনন্দনঠাকুর তাহা তাঁহাকে দর্শন করান।

* * *

তেঁহো মহাপ্রভুর অঙ্গনে লৈয়া গেলা।
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে।।

(শ্রীভঃ রঃ ৮।৪৩১-৪৩২)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধরের স্থাপিত শ্রীগৌর-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।

দাস গদাধরের জীবন গোরাচান্দে।
নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।।

(শ্রীভঃ রঃ ৮।৪৫৩)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-সহ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ প্রকট করিয়া প্রাসিদ্ধ খেতুরী-মহোৎসব সম্পাদন করেন। এই শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের কথা শ্রীভক্তিরত্নাকর—১০ম ও ১২শ তরঙ্গে, প্রেমবিলাস—১৯শ বিলাসে ও শ্রীনরোত্তম বিলাস—৬ষ্ঠ বিলাসে বর্ণিত আছে। শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আত্মজ ঠাকুর শ্রীকানাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা প্রকট করেন বলিয়া শুনা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র (ইং ১৮৯৪, ২১শে মার্চ্চ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা প্রকট করেন।

শ্রীরূপানুগ-পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের (?) উপাসনার ছলনা করিয়া যে 'গৌরভজা', 'গৌরবাদী', 'গৌরনাগরী' ও 'থিয়সফি' মতবাদ-মিশ্রিত অভক্তি-মতবাদসমূহ কল্পিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধ শ্রীরূপানুগপথে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন প্রচার এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীপদাঙ্কানুকরণে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরগৃহে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তি বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের অনুজ্ঞায় স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আবির্ভাব তিথির বিষয়ও বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা পুনরায় জগৎকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীগৌরগৃহে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাপ্রকাশ-কারুণ্যের কথা এইরূপ ভাবে জানাইয়াছেন,—

কেহ বলে, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া,
রূপানুগ-পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ত্যজি' 'থিয়সফি' কাম ভজি'
প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি'।।
'আমার গৌরাঙ্গ' লহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁ'র সহ,
নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তাঁ'র সাথ,
নিশ্চয় করিয়া কহি তাই।।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগদ্ভ্রম
বসাইল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন-পথ ধরি', রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি'
ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া।।
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ-গৌরবিণী,
নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলাদেবী ধামহিয়া,
তিন শক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি'।।

গোপী-অনুগত হ'য়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে,
রাধাকৃষ্ণ গৌর-ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলিহত,
ভক্তির নাশক ভক্ত মানে।।
ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ-সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম-পদ স্মরি' মায়াপুরে প্রিয়া-হরি,
বসাইল জানি' নিজ কৃত্য।।

(উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'র পরিশিষ্ট)

এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যে-স্থলে শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের উপদিষ্ট শ্রীআশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার পূজার ছলনা করা হয়, তথায় ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও তন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দরের অবস্থান নাই। শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণু নহেন, বর্ণাশ্রমরত জীব বা 'ভগবদ্ভক্ত', 'তথা-কথিত মহাপুরুষ' বা 'জনৈক সম্প্রদায়াচার্য্য গুরুমাত্র'—এই ভ্রম নাশ করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ত্রিশক্তির অন্যতম ভূশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীগৌরনারায়ণের সহিত খেতুরীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজী গোপীভাব-বিভাবিত বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের সহায়তাকারিণী; পরস্পরের মধ্যে উভয়ের সম্ভোগময় ব্যবহার নাই। শ্রীগৌরনারায়ণের শ্রী-ভূ-নীলারূপিণী শক্তি যথাক্রমে শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীধাম-রূপে প্রকাশিত এবং পরাশক্তি শ্রীরাধিকার স্বাংশপ্রকাশ ও সেবিকা।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত'কার (শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১০।৪৮) ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'কার (৪৩ সংখ্যায়) শ্রীবল্লভাচার্য্যকে একাধারে জনক ও ভীষ্মক এবং তাঁহার কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে শ্রীজানকী ও শ্রীরুক্মিণীর একত্র-স্বরূপে শ্রীলক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আঃ ১৫।৫৯) শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবী শ্রীরুক্মিণীরূপেও বর্ণিতা আছেন। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় শ্রীসনাতন মিশ্রকে শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রীসত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সেই সত্রাজিৎ নৃপ-দুহিতা জগন্মাতা ভূ-স্বরূপিণী শ্রীসত্যভামাস্বরূপে বর্ণন

করিয়াছেন। শ্রীসত্যভামা ও শ্রীরুক্মিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে 'অংশিনী রাধা' বলিয়া শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে যাঁহারা 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ' বলিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়লীলার বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াস-হেতু উভয়স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরত্ব কোথায়ও নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-প্রসঙ্গে যে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্যোঽন্যে সম্ভাষণ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণের লীলাবৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইবার কোন কথা নাই। *

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীগৌর-নারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন; ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু; সুতরাং ভক্ত-বাৎসল্যবিধায়িনী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবিকা—শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা—'সহচরী'—'পরমেশ্বরী' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কৃপা হইলে আমাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হইয়া শ্রীযোগ-মায়াপুরে শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার ও প্রীতিলাভ হয়।

---

* রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাম্।
গত্বান্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ সদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্।।

যিনি নিশাবসানে কোকিল-কুক্কুটপ্রভৃতি পক্ষিগণের কলরব শ্রবণ করিয়া স্বীয় শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত রসকথালাপ দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্যত্র গমন করেন, ভূমির উপর উপবেশন করিয়া সজ্জনগণের সহিত উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করেন এবং জননী প্রভৃতি স্বজনগণ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি স্মরণ করিতেছি।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীস্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং শ্রীল গদাধর দাস প্রভুকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অঙ্গশোভা বলিয়াছেন। অতএব শ্রীল দাস গদাধর প্রভু শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের দ্যুতি-স্বরূপ; এজন্যই তিনি 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর বিভূতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে।
সঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ।।
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণী।
সাদ্য কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্।।

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৫৪-১৫৫ শ্লোক)

পূর্ব্বে যিনি শ্রীরাধিকার বিভূতিরূপা শ্রীচন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে দাসবংশ শ্রীগদাধর। শ্রীব্রজে যিনি শ্রীবলরামের প্রিয়তমা শ্রীপূর্ণানন্দা ছিলেন, তিনি কার্য্যবশতঃ শ্রীদাস গদাধরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীল গদাধর দাস প্রভু শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়গণে গণিত হন। শ্রীগৌর-গণ—শ্রীব্রজের মধুর-রসের রসিক; শ্রীনিত্যানন্দ-গণ—শ্রীব্রজের শুদ্ধভক্তিপ্রধান সখ্যরসের রসিক। শ্রীগদাধর দাস শ্রীনিত্যানন্দ-গণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুর-রস-রসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাঁহার সেবিত শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকাশিত ছিলেন। শ্রীল গদাধর দাস প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া, পরে তথা হইতে কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে শ্রীগঙ্গাতীরে এঁড়িয়াদহ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীল গদাধর দাস প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন।

আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনীলাচলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে প্রবলভাবে ভক্তিপ্রচারের জন্য অনুরোধ করেন, সেই সময় শ্রীল গদাধর দাসকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারকার্য্যের একজন প্রধান সহায়ক-

রূপে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীল দাস গদাধর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গেই থাকিতেন।

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৩-১৪)

শ্রীগদাধর দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে সকলের নিকট শ্রীহরিনাম প্রচার করিতেন। এঁড়িয়াদহ-গ্রামে প্রবল পরাক্রান্ত এক কাজী সর্ব্বদাই হরি- সংকীর্ত্তনের বিদ্বেষ করিতেন। শ্রীগদাধর দাস ঐ কাজীর উদ্ধারের মানসে একদিন রাত্রিকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। যে কাজীর ভয়ে লোক পলাইয়া যাইত, সেই কাজীর ভবনে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপ্রচারকারী শ্রীল গদাধর দাস প্রভু নিশাকালে নির্ভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় অবিরাম হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কাজীর পারিষদগণ এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কাহারও মুখে প্রতিবাদমূলক কোন কথা বাহির হইল না। শ্রীনামপ্রেমোন্মত্ত শ্রীল গদাধর দাস প্রভু তখন কাজীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আরে বেটা কাজী! তুই কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছিস্, শীঘ্র 'হরি' বল্, নতুবা তোর মুণ্ডপাত করিব।" কাজী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন, কিন্তু শ্রীল গদাধরের প্রেমোন্মত্ত অপরূপ-রূপ দেখিয়া অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইয়া গেল। কাজীর বদনমণ্ডল সৌম্যরূপ ধারণ করিল। কাজী অতি বিনয়ের সহিত বলিতে লাগিলেন, "গদাধর! তুমি এখানে কেন? শ্রীগদাধর বলিলেন, "তোমার সহিত কিছু কথা আছে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সকলের মুখেই হরিনাম বলাইয়াছেন, কেবল তুমি মাত্র 'হরি' বলতেছ না। তাই তোমাকে হরিনাম বলাইতে আসিয়াছি, তুমি একবার পরম-মঙ্গল হরিনাম উচ্চারণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।"

কাজী শ্রীল গদাধরের এই সকল বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সেই মহাভাগবতবরের দর্শনে তাঁহার নৈসর্গিক হিংস্র-স্বভাবও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও দ্বেষ তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"গদাধর! তুমি আজ ঘরে যাও, আমি আগামীকল্য

'হরি' বলিব।" কাজীর মুখে এই 'হরি'-শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া শ্রীগদাধর প্রেমসুখে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন ও কাজীকে বলিলেন,—"আর 'আগামীকল্য' কেন বলিতেছ? এই ত' তুমি এখনই হরিনাম উচ্চারণ করিলে। যখন তুমি ভুবনমঙ্গল হরিনাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার আর কোন অমঙ্গল নাই।" ইহা বলিতে বলিতে প্রেমোন্মাদে শ্রীগদাধর কাজীর ভবনে হাতে তালি দিয়া বহু নৃত্য করিলেন এবং কিছুকাল পরে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সাক্ষাৎ "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অধিষ্ঠান", ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীগৌরকৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কি কেহ কখনও শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে পারেন? এজন্যই একদিন শ্রীবল্লভাচার্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।।
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি, এই ত' 'প্রমাণ'।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন।।
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে।।
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৭।১১-১৪)

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর সেনাপতিরূপে চাঁদকাজীর ভবনে উপস্থিত হইয়া কাজীর মুখে হরিনাম বাহির করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভৃত্য শ্রীল দাস গদাধর প্রভুও সেইরূপ স্বীয় গ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত কাজীকে ছলে-বলে-কৌশলে শ্রীহরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। অতএব সত্য-সত্যই শ্রীল দাস গদাধর প্রভু-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

* * *

নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে।।
হেনমত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা।।

যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে।।
হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়।।
হেন জন পাসরিল সব হিংসাধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি—'কৃষ্ণ'-আবেশের কর্ম্ম।।
সত্য কৃষ্ণভাব হয় যাঁহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্র তারে লঙ্ঘিতে না পারে।।
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ।।
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১২-৪১৯)

অশ্রদ্দধানে শ্রীহরিনামোপদেশকে সমগ্র সাত্বতশাস্ত্র ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু নামাপরাধের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীল দাস গদাধর প্রভু কাজীকে হরিনাম প্রদান করিয়া সেইরূপ অপরাধের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকরুণাশক্তি। হরিনাম-বিরোধী কাজীতেও বিশেষ কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া মহতের বিশেষ কৃপার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন; যেমন শ্রীনারদ শ্রীনলকূবর ও শ্রীমণিগ্রীবকে বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীল গদাধর দাস প্রভু নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন। তিনি গোপীভাবে পরানন্দময় হইয়া মস্তকে গঙ্গাজলের কলস ধারণপূর্ব্বক "কে গো-রস কিনিবে গো?"—এই বলিয়া সর্ব্বক্ষণ লোককে ডাকিতেন অর্থাৎ তিনি ব্রজগোপীর ন্যায় দিব্যোন্মাদে সকলকে প্রেমরস বিতরণ করিতে ব্যগ্র থাকিতেন। কখনও বা শ্রীরাধিকার ভাবে প্রমত্ত হইয়া "কে দধি কিনিবে গো?" বলিয়া অট্ট অট্ট হাসিতেন।

"হইলা রাধিকাভাব—গদাধর দাসে।
'দধি কে কিনিবে?' বলি' অট্ট অট্ট হাসে।।

* * *

গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়।।
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে,—"কে কিনিবে গো-রস?"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৩৮, ৩৭২-৩৭৩)

শ্রীল গদাধর দাসের এই অতিমর্ত্ত্য দিব্যোন্মাদের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরবর্ত্তীকালে কতকগুলি মনোধর্ম্মী ব্যক্তি 'সখীভেকী-সম্প্রদায়'-নামে একটী কল্পিত অসৎ-সম্প্রদায় রচনা করিয়াছে। শ্রীল গদাধর দাসের অন্তর শ্রীগোপীভাবে বিভাবিত ছিল। তিনি কৃত্রিমভাবে বাহ্যে সখীর বেশ ধারণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সখীভেকী সম্প্রদায় অন্তরে পূর্ণভাবে পুরুষাভিমান পোষণ করিয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া থাকে। ইহা কোনও শ্রীরূপানুগ-মহাজনের দ্বারা সমর্থিত বা আচরিত পন্থা নহে।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীগদাধরের শ্রীমন্দিরে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন শ্রীগদাধরের দেবালয়ে পরমলাবণ্যময় এক শ্রীবাল-গোপাল মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীবাল-গোপাল মূর্ত্তিকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজের বক্ষের উপরে ধারণ-পূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া গোপাল-লীলায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীমাধবানন্দ ঘোষ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে দানখণ্ড-লীলা কীর্ত্তন করেন, তাহা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে অদ্ভুত নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অননুকরণীয়—অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু কিছুকাল শ্রীল গদাধর দাসের মন্দিরে অবস্থান করিয়া শ্রীমাধবানন্দের মুখে দানখণ্ডলীলা শ্রবণ ও বহু লোককে কৃপা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনাকে 'গোপী' হেন বাসে।।
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবোল' বলায় সবারে।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৩৮১, ৩৯৪)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেইবার শ্রীগৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা করেন, সেইবার তিনি পানিহাটি-গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হন, তখন—

রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর।।
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৯২, ৯৪)

শ্রীপাট এঁড়িয়াদহে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর তথায় তাঁহার সমাধি প্রদত্ত হয়। ঐ সমাধিটি সংযোগী বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কাল্‌নার স্বনাম-খ্যাত শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞায় কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা-নিবাসী পরলোকগত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপনপূর্ব্বক (১২৫৬ সন) 'শ্রীরাধাকান্ত'-বিগ্রহ-সেবার ব্যবস্থা করেন। তৎপুত্র বলাই মল্লিক ১৩১২ সালে শ্রীগৌরনিতাইর একটি সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মন্দিরের সিংহাসনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দবিগ্রহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান, সিংহাসনের নীচে একটি সংস্কৃত শ্লোক খোদিত। একটি গোপেশ্বর শিবলিঙ্গও তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের দ্বারদেশে একটী প্রস্তরফলকে উপরি-উক্ত কথাগুলি খোদিত আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৩৪০ সনে) "দাস গদাধর"-তত্ত্ব নামক একখানি পুস্তিকা সমালোচনার জন্য আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উহাতে ঐ পুস্তিকার লেখক শ্রীল গদাধর দাসের একজন অতিবাড়ী স্তাবকের অভিনয়ে শ্রীল দাস গদাধর প্রভু ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুতে ভেদবুদ্ধি করিয়া পাষণ্ডিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে নানাপ্রকার অসম্মতবাদও প্রচারিত হইয়াছিল। একটির নমুনা এই—"গদাধর পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা দাস গদাধরের আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই;

শেযে যখন বুঝিলেন,—গৌরাঙ্গলীলারসে বঞ্চিত হইতেছেন, তখন গোপেশ্বর শিবের প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আনুগত্যে তাঁহার উপশাখায় বিল্ববৃক্ষ-স্বরূপ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীদাস গদাধরের ভাবাশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্যে আছেন, তাঁহারা পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া দাস গদাধরের আনুগত্য করিলে প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।"

যে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে পূর্ব্ব-মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম স্বীকার করিয়াছিলেন, যিনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের সহায়, যিনি বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষ্টা, যিনি শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নিত্য ভাগবত-প্রচারকারী, এখনও প্রাচীনকাল হইতে যে গদাধর পণ্ডিতের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের বামে নিত্য-পূজিত হইতেছেন এবং তাঁহার সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত ঋতুদ্বীপে চম্পহট্ট গ্রামে দ্বিজবাণীনাথের সেবিত সুপ্রাচীন শ্রীগৌর-গদাধর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন, যে শ্রীমন্মহাপ্রভু "শ্রীগদাধর-প্রাণনাথ" এবং "শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ" নামে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারে'র সময়েও প্রসিদ্ধ ছিলেন, শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী যাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীস্বরূপা বলিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন যে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-প্রচারক শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পরম প্রিয় ও অভিন্নাঙ্গ বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অপরাধ কে করিতে পারে? আমরা দাস গদাধর ও পণ্ডিত গদাধরে ভেদবুদ্ধি করিবার পক্ষপাতী নহি। উভয়েই শ্রীগৌর-পার্ষদ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীব্রজলীলার নিত্য পরিকর। আমরা 'অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়' অবলম্বন করিবার জন্য গুরুবর্গ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হই নাই,—

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ।।
কিম্বা, দোঁহা না মানিয়া হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি', আরে না মানি, এই মত ভণ্ড।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৬)

শ্রী শ্রীবাস পণ্ডিত

[১]

বামন-কৃষ্ণ-দশমী শ্রীল শ্রীবাস ঠাকুরের বিরহ-তিথি বলিয়া কথিত। শ্রীগৌর-হরির শুদ্ধভক্ততত্ত্বের মুখপাত্ররূপে শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীশ্রীপতি ও শ্রীশ্রীনিধি—ইঁহারা চারি ভ্রাতা এবং ইঁহাদের দাসদাসী, গৃহ-পরিকর সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে চির বিক্রিত। শ্রীগৌরসুন্দরই ইঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

সবংশে করেন যাঁ'রা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানেন দেবীদেবা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১১)

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণীর নাম—শ্রীমালিনী দেবী। শ্রীশ্রীবাসেরই কোন ভ্রাতার কন্যা—শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-জননী শ্রীনারায়ণী দেবী। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীহট্টে আবির্ভূত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া সজাতীয়াশয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের গীতি গান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলা পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলার পর তিনি শ্রীনবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া শ্রীকুমারহট্টে গিয়া বাস করেন।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ।
পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদ-প্রিয়ঃ।
স রামপণ্ডিতঃ শ্রীমাংস্তৎকনিষ্ঠসহোদরঃ।।
নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা।
সৈবেয়ং মালিনীনাম্নী শ্রীবাসগৃহিণী মতা।।

(শ্রীগৌঃ গঃ ৯০-৯২)

যিনি পূর্ব্বে শ্রীনারদ মুনি ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরাবতারে ধীমান্ শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত। শ্রীনারদের প্রিয় শ্রীপর্ব্বত মুনিই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীশ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীশ্রীরাম পণ্ডিত। যিনি পুরাকালে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী শ্রীঅম্বিকা-নাম্নী ধাত্রী ছিলেন, তিনিই বর্ত্তমানে শ্রীমালিনী-নাম্নী শ্রীশ্রীবাসের গৃহিণী হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাস তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন, ত্রিসন্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণপূজা ও নিত্য শ্রীগঙ্গাস্নান করিতেন। সেই সময় সমস্ত পৃথিবী কৃষ্ণবহির্ম্মুখতায় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাহাকে 'বৈষ্ণব' বলে, কি উদ্দেশ্যেই বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন,—ইহা লোকে কিছুই বুঝিতে পারিত না। পুত্রৈষণা, ধনৈষণাদি ভোগে প্রমত্ত হইয়া দেহ-গেহারামী ইন্দ্রিয়দাস পাষণ্ডিগণ সর্ব্বজীববান্ধব বৈষ্ণবগণের প্রতি উপহাস করিত। ইহা দেখিয়া দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীশ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় নিজঘরে বসিয়া রাত্রি-জাগরণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। সেই কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া পাষণ্ডি-হিন্দুগণ মনে করিত—শ্রীবাসপণ্ডিত গ্রামকে উচ্ছন্ন করিয়া দিবে। সনাতন-ধর্ম্মবিরোধী অহিন্দু নৃপতি শ্রীবাসের কীর্ত্তনের কথা শুনিতে পাইলে সমস্ত নবদ্বীপ-নগরের অধিবাসিগণের উপর অত্যাচার করিবে। অতএব ঐ ব্রাহ্মণকে অবিলম্বে নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পাষণ্ডি-হিন্দুগণ শ্রীশ্রীবাসের ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পাষণ্ড-দলনের জন্য অচিরেই শ্রীকৃষ্ণকে নবদ্বীপে অবতীর্ণ করাইবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিলেন।

[২]

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের প্রতিজ্ঞা সত্য করিয়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীশচীদেবীর ক্রোড়ে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীশ্রীবাসের অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সুখোল্লাসে প্রমত্ত হইয়া গঙ্গাস্নান, হরিসংকীর্ত্তন ও নানাবস্তু দান করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহধর্ম্মিনী শ্রীমালিনীদেবী শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পত্নীর সহিত সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খৈ, কলা ও নানা ফলাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া শ্রীশচীগৃহে আগমনপূর্ব্বক মাঙ্গলিক কৃত্যের সম্পাদন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবিলাস-লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত ন্যায়ের কূট-ছল জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ভয়ে দূর হইতেই পলায়ন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের উন্মুখমোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তবর শ্রীশ্রীবাস 'নিমাই পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক'—শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। ভক্তপতি মহাপ্রভু শ্রীবাসকে দেখিলে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া ভক্তের সম্মান করিতেন।

ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৬)

পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস নিমাই পণ্ডিতকে অনেক সময় বলিতেন যে, তিনি কেন বৃথা জড়বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন। কৃষ্ণভজনই সমস্ত বিদ্যার সার। তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন যে, যখন বৈষ্ণবগণ তাঁহার শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি ভাগ্যবান্। আরও কিছুকাল তিনি অধ্যাপনা করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অভিগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিবেন।

একদিন নিমাই পণ্ডিত ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া ভুবনমোহন বেশ ধারণপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন। অকস্মাৎ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নিমাইর কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, অধরে তাম্বুল-রাগ, হস্তে পুস্তক দেখিতে পাইয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং নিমাইকে বলিলেন,—

"কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি কার্য্যে গোঙাও ?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও ?
পড়ে কেন লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ?
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত' এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১২।২৫০-২৫২)

ইহা শুনিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত শ্রীবাস ! তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।"

[৩]

ভক্ত-বৎসল শ্রীভগবান্ অচিরেই বায়ুব্যাধিচ্ছলে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীশচীমাতা অপ্রাকৃত পুত্রবাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া নিমাইর ঐ প্রকার অবস্থা-দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং শ্রীশ্রীবাসাদি বৈষ্ণববৃন্দের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া নিমাইর কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন শ্রীনিমাই শ্রীতুলসী পরিক্রমা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাসকে দেখিবামাত্র শ্রীনিমাইর শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপ্ত হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বুঝিতে পারিলেন, ইহা বায়ুব্যাধি নহে—অপ্রাকৃত মহাভাব। এতদিনে শ্রীশ্রীবাসের মনের বাসনা পরিপূর্ণ হইল। তিনি শ্রীশচীদেবীকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান করিয়া নিমাইর মহা-কৃষ্ণপ্রেমপ্রকাশের কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

শ্রীশচীনন্দন নিজগৃহে প্রত্যহ দিবারাত্র শ্রীহরিনামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর উচ্চকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে পাষণ্ডিগণের নিদ্রা-ভোগে বাধা হওয়ায় তাহারা নানাবিধ বিদ্বেষপূর্ণ কটূক্তি করিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি ভক্তরাজ শ্রীশ্রীবাসের বিরুদ্ধেই পাষণ্ডিগণের ক্রোধ ও কটূক্তি অধিক বর্ষিত হইতে লাগিল,—

কেহ বলে,—"কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে?
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া-বামনে।।
মাগিয়া খাইবার লাগি' মিলি' চারি ভাই।
'কৃষ্ণ' বলি' ডাক ছাড়ে—যেন মহা-বাই।।
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়?
বড় করি' ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়?"
কেহ বলে—"আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি' হৈল দেশের উৎসাদ।।
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা।।
শুনিলেক নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ।।

যে-তে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা' সবা' লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত।।
তখনে বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
'শ্রীবাসের ঘর ফেলি' গঙ্গার ভিতর।।'
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে।।"
কেহ বলে,—"আমরা সবার কোন্ দায়?
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব, যেবা আসি' চায়।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।২২৯-২৩৮)

ভগবদ্ভজনকারী কিরূপ বহির্ম্মুখ, সামাজিক, স্বদেশবাসী, স্বগ্রামবাসীর নানাপ্রকার কটূক্তি, অত্যাচার সহ্য করিয়া তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিবেন, তাহার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য শুদ্ধ-ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বহির্ম্মুখ পাষণ্ডিগণের দ্বারা ঐরূপ এক অভিনয় করাইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ শরণাগত ভক্তকে চিরকালই রক্ষা করেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাসের হৃদয় জানিয়া একদিন শ্রীশ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সেই সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীনৃসিংহ-দেবের পূজা করিতেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই দ্বারে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিয়া হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "শ্রীবাসিয়া কি করিতেছিস্! —

কাহারে পূজিস্, করিস্ কা'র ধ্যান?
যাঁহারে পূজিস্, তাঁ'রে দেখ্ বিদ্যমান্।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।২৫৮)

শ্রীশ্রীবাসের সমাধি ভঙ্গ হইল; তিনি দেখিলেন, সম্মুখে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর শ্রীগৌরহরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং বামকক্ষে তালি দিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীবাস বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীশ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আরে শ্রীবাস! তুই এতদিনেও আমার প্রকাশ জানিতে পারিস্ নাই? তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে ও অদ্বৈতের হুঙ্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সপরিকরে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি সাধুজনের রক্ষা ও

দুষ্টের বিনাশ সাধন করিব, তোর কোন চিন্তা নাই। তুই আমার স্তব পাঠ কর।" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমবিহ্বল-চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে মনের সাধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মস্তবের দ্বারা বিশ্বম্ভরের স্তুতি করিলেন। শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীবাসের স্ত্রীপুত্রাদি সকলকে নিজরূপ-প্রদর্শনার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সস্ত্রীক শ্রীশ্রীবাসকে নিজ শ্রীচরণসেবা ও বর প্রার্থনা করিবার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। সপরিকর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতও শ্রীবিষ্ণুর পূজার নিমিত্ত আহৃত গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি যাবতীয় উপকরণের দ্বারা শ্রীবিশ্বম্ভরের শ্রীচরণার্চ্চন করিতে করিতে আত্মনিবেদন করিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে সর্ব্বতোভাবে অভয় প্রদান করিয়া ভক্তিবিরোধী অহিন্দু রাজাকেও গোষ্ঠীসহ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত করাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-কন্যা শ্রীনারায়ণীদেবী তখন মাত্র চারি বৎসরের বালিকা। তাঁহাকেও শ্রীগৌরসুন্দর 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে বলিলে শ্রীনারায়ণীদেবী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবক্তা শ্রীশ্রীবাস দুই বাহু উত্তোলন করিয়া নির্ভীকভাবে উত্তর করিলেন যে,—তিনি সৃষ্টি-সংহারক কালকেও ভয় করেন না, আর যে ঘরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যবসতি, সেই ঘরে তাঁহার ভয় কিসের? এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

চারিবেদে যাঁ'রে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী-দাস।।
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র।।
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে।।
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।৩৩১-৩৩৪)

একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীবলদেবাবেশে "মদ আন, মদ আন" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছিলেন। শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা বহু অনুসন্ধান করিয়াও শ্রীনিত্যানন্দকে পাইলেন না। তখন শ্রীগৌরসুন্দর 'অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব'কে স্বয়ং প্রদর্শন করিবার জন্য সকলকে লইয়া শ্রীনন্দন-আচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন এবং সকলের নিকট শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা-প্রকাশের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিতে বলিলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ইঙ্গিত বুঝিয়া "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ" (ভাঃ ১০।২১।৫) শ্লোকটী পাঠ করিলেন। ঐ শ্লোক পাঠ করিবা মাত্র প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকাশিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর উভয়ে উভয়ের স্তুতি এবং ইঙ্গিতে নানাবিধ সংলাপ করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"যেরূপ শ্রীহরি ও শ্রীহরের পরস্পর পূজা সাধারণের বোধগম্য নহে, তদ্রূপ আমরাও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরস্পর স্তুতি বুঝিতে অসমর্থ।"

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের নিকট শ্রীব্যাসপূজা করিবার প্রস্তাব জানাইলে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাসের গৃহে শ্রীব্যাসপূজা-সম্পাদনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত স্বীয় ভবনে শ্রীব্যাসপূজার সমস্ত আয়োজন ও 'শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি' গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। দ্বাররুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসভবনে শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীব্যাসপূজার আচার্য্য-রূপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের হস্তে মালা প্রদান করিয়া শ্রীব্যাসদেবকে নমস্কারার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের মস্তকের উপর মালা প্রদান করিলে শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দকে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীবাসের নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া তাহা নিজহস্তে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলকেই বিতরণ করিলেন।

[৪]

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীব্রজলীলার বাল্যভাবসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনীদবেী শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি নিজ পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেন—স্বহস্তে শ্রীনিত্যানন্দকে ভোজনও করাইতেন।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীশ্রীবাসের কিরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসকে বলিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া এই অবধূতকে কি জন্য নিজের গৃহে স্থান দিয়াছ? ইহার কি কিছু জাতিকুলের ঠিক আছে? যদি তুমি জাতিকুল রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইতে শীঘ্রই এই অবধূতকে গৃহ হইতে বিতাড়িত কর।" ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"আমাকে এইরূপভাবে পরীক্ষা করার তোমার উচিত নহে। শ্রীনিত্যানন্দ তোমার দ্বিতীয়-দেহ। তোমাকে যিনি একদিনের জন্যও ভজন করেন, তিনি যে-ই হউন, তিনিই আমার প্রাণ। শ্রীনিত্যানন্দ যদি মদিরা পান ও যবনীর সঙ্গও করেন এবং আমার জাতি, প্রাণ, ধন—সমস্ত নাশও করেন, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনষ্ট হইবে না।" শ্রীগৌরহরির পরম গোপ্যধন শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের এইরূপ অচলা শ্রদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীশ্রীবাসকে এইরূপ বর দিলেন,—

যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে।।
বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির।।
নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা' স্থানে।
সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ ৮।২০-২২)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রাত্রিকালটা সকলের কেন বৃথা অতিবাহিত হয়? এখন হইতে প্রত্যেক রাত্রিতে নির্ব্বন্ধভাবে সংকীর্ত্তন-ব্রতের অনুষ্ঠান হইবে এবং তৎপর আমরা সকলে ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীগঙ্গায় অবগাহন করিব। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন শুনিয়া জগজ্জীবের মঙ্গল হউক।" শ্রীবাস-মন্দিরেই প্রতিনিশায় সংকীর্ত্তনের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। কোন কোন দিন শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্যভবনেও সংকীর্ত্তন হইত।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদেশের অনুসরণ করিয়াই গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অভীষ্টানুসারে সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে

শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা-প্রকটমুখে শুদ্ধভক্তগণের সংকীর্ত্তন-প্রচারকেন্দ্র উন্মোচন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্টানুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে সংকীর্ত্তন-নৃত্যপর শ্রীগৌরমূর্ত্তি সংস্থাপন ও সংকীর্ত্তন-প্রচারে মূলকেন্দ্র শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ করিয়া তথায় অনুক্ষণ সপ্ত-জিহ্বান্বিত সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিবার আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরসুন্দর প্রতি নিশায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া এইরূপ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিলে পাষণ্ডিগণ মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইয়া নানাকথা বলিতে লাগিল।

শ্রীহরিবাসর-দিবসে উষাকাল হইতে শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 'গোপাল গোবিন্দ' এই পদ-কীর্ত্তনের ধ্বনি উত্থিত হইল। কখনও বা 'হরি ও রাম রাম'-ধূয়া কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্ভুত ভাবাবেশে বিহ্বল হইতেন। কখনও বা অতিশয় আনন্দভরে 'জিতং জিতং' ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে ভক্তগণও সেই ধ্বনির অনুকীর্ত্তন করিতেন। একমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিতই মহাপ্রভু দ্বার রুদ্ধ করিয়া এইরূপে কীর্ত্তন করিতেন; তথায় নদীয়ার কোনও অভক্ত লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। সহস্র সহস্র পাষণ্ডি-হিন্দু শ্রীবাস-ভবনের বহির্দ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারোন্মোচন করিবার জন্য কলরব করিত। কিন্তু সংকীর্ত্তন-রসে মগ্ন ভক্তগণ উহাদের কলরবে বধির থাকায় পাষণ্ডি-হিন্দুগণের ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। তাহারা নানাপ্রকার কুৎসা করিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর ও শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণকে ভয় প্রদর্শন করিত।

কেহ বলে,—"আরে ভাই, সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল।।
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে।।
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।।
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তা'র সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।।"

কেহ বলে,—"কালি হউক যাইবে দেয়ানে *।
কাঁকালে † বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে।।
যে না ছিল রাজ্য-দেশে, আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন।।
দেবে হরিলেক বৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি' গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়।।
খানি থাক, শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখোঁ অদ্বৈত-আচার্য্য।।"

* * *

পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়।।

* * *

কেহ বলে,—"ভাই! এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল।।
দর্দ্দুরী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি।।
'হই হই, হায় হায়'—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অযশ-কাহিনী।।
মহা-মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায়।।
শ্রীবাস-বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' কালি লৈয়া ফেলাইব স্রোতে।।
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২৪১-২৮৪; ২৬৫, ২৬৭-২৭২)

---

* দেয়ান—ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত।

† কাঁকাল—কোমর।

পণ্ডিত শ্রীবাস এই সকল বহির্ম্মুখ-বাক্যে বধির থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত শ্রীকৃষ্ণরসে অহর্নিশ "জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন।

[৫]

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীশ্রীবাসের গৃহে আগমন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেইদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজের ভক্তভাব সঙ্গোপন-পূর্ব্বক তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণুবস্তু, তাহা অমায়ায় প্রকাশ করিয়া নিখিল আশ্রিত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ-মানসে শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণ অভিষেক-গীত কীর্ত্তন করিয়া পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে প্রভুকে স্নান করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাসের দাসদাসীগণ শ্রীগৌর-হরির স্নানাভিষেক জল আনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় শুদ্ধ-ভক্তাগ্রণীর সেবার ফল। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের এক পরম-ভাগ্যবতী পরিচারিকার নাম ছিল 'দুঃখী'। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর সেই দাসীকে জল আনিতে দেখিয়া "আরও জল আন, জল আন" বলিয়া দুঃখীকে কৃপা করিয়াছিলেন এবং দুঃখীর ভক্তিযোগে মুগ্ধ হইয়া তাহার 'দুঃখী' নাম মোচন করিয়া 'সুখী' নাম রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত 'সুখী'র প্রতি দাসীবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রতিদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নানার্থ গঙ্গাজল-বহনের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রভুকে স্নানাভিষেক করাইবার পর ভক্তগণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে যথাবিধি পূজা ও স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিয়া পণ্ডিতের পূর্ব্ব-ইতিহাস-কীর্ত্তনমুখে বলিলেন যে, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দ পণ্ডিতের স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-শ্রবণমাত্র শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের হৃদয় বিগলিত হইলে তিনি প্রেম-বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবানন্দের নির্ব্বোধ পাষণ্ডী ছাত্রগণ মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমবিকারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে বহির্দ্বারে টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দর সেইদিন প্রত্যেক ভক্তকে ডাকিয়া পৃথক্ পৃথগ্ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যগায়ন শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে আহ্বান করিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দের জন্য প্রভুর চরণে

নিবেদন জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—“মুকুন্দ আমার দর্শন লাভের অনধিকারী। কারণ, মুকুন্দ সকল সম্প্রদায়েই মিশিয়া প্রত্যেকের মতবাদকে সমর্থন করে। যাহারা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী, তাহারা ‘খড়-জাঠিয়া বেটা’-সদৃশ অর্থাৎ তাহারা কখন দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া মৌখিক দৈন্য প্রকাশ করে, আবার পরমুহূর্তেই যষ্ঠি ধারণ করিয়া আমাকে প্রহার করে। তাহারা ‘এক হস্ত পূজ্যবস্তুর পাদদেশে, আর একহস্ত গলদেশে প্রদানে’র নীতি অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের ভক্তির স্থানে অপরাধ আছে। এইজন্য তাহারা আমার দর্শন পাইবে না।” শ্রীগৌরসুন্দরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিজজন শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর জীবশিক্ষাকল্পে শ্রীগৌর-কৃপা-বিরহিত জীবন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারা অত্যন্ত আর্ত্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, ‘তিনি কি কোনও দিন শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিতে পারিবেন?’ তদুত্তরে শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে জানাইলেন,—“কোটিজন্মের পর মুকুন্দের ভক্তি লভ্য হইবে ও আমার দর্শন-লাভ ঘটিবে।” শ্রীমুকুন্দ ‘কোটিজন্ম পরেও শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-লাভ ঘটিবে’ জানিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এক মুহূর্তেই শ্রীমুকুন্দের কোটিজন্ম বিগত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিত্য-নিজজনকে দর্শন দান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই ‘মহা-মহা-প্রকাশলীলা’সমূহ প্রকটিত হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—“নবদ্বীপে শত শত তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী বৃথাই ‘গীতা-ভাগবত’ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন। কেহ বা অযাচক-বৃত্তি, কেহ বা আকুমার ব্রহ্মচারী ও তপস্বী হইয়া বৃথা শরীরকে কর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত স্ত্রীপুত্রদাসদাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া যে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, এমন কি, শ্রীবাসের বাড়ীর দাসদাসী-কুকুর-বিড়াল পর্য্যন্ত যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, বহু শাস্ত্র পাঠ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তপস্বী—কেহই উহার কোট্যংশের একাংশও লাভ করিতে পারেন নাই।”

শ্রীশ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা চারি বৎসরের বালিকা শ্রীনারায়ণীদেবী শ্রীবাসভবনে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজনের অবশেষ-প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য এখনও বৈষ্ণবমণ্ডলে শ্রীনারায়ণী “শ্রীচৈতন্যাবশেষ-পাত্রী” বলিয়া বিখ্যাতা।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের বস্ত্রসীবনকারী যবন-কুলোদ্ভূত দরজীকে পর্য্যন্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজরূপ দর্শন করাইয়া প্রেমাতুর ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য করিয়াছিলেন।

"শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তা'রে করাইল নিজরূপ দর্শন।।
'দেখিনু' 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব-আগল*।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩১-৩২)

শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবালক-ভাবে শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান করিতেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতকে 'পিতা' ও তৎপত্নী শ্রীমালিনীদেবীকে 'মাতা' জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীমালিনীদেবীর স্তন পান করিতেন। অপ্রাকৃত বাৎসল্য-ভাবহেতু শ্রীনিত্যানন্দের দর্শনেই শ্রীমালিনীদেবীর দুগ্ধ ক্ষরণ হইত। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবালক-ভাবে দিগম্বর হইয়া শিরোদেশে বস্ত্র বন্ধন করিয়া সর্ব্ব-অঙ্গনে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া তিরস্কারচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। একদিন একটি কাক শ্রীবাস-মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণের সেবার একটি পিতলের বাটী লইয়া পলায়ন করিল। শ্রীমালিনীদেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরস্কারের ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ কাককে শীঘ্র ঐ বাটী আনিয়া দিবার আদেশ করিলে কাকটী ঐ বাটী আনিয়া শ্রীমালিনীদেবীর নিকট রাখিল।

[৬]

যে-সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া নিজজনগণ-সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় 'গোপাল চাপাল' নামক কোন বাচাল ভট্টাচার্য্য ভবানীপূজার সমস্ত উপকরণ, যথা—কলাপাত, জবাফুল, রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্যভাণ্ডের সহিত রুদ্ধদ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে গৃহে দ্বার উন্মোচন করিয়াই শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ঐ সকল দেখিতে পাইলেন এবং পরিহাসচ্ছলে সকলের নিকট কহিলেন,—"দেখ, দেখ, আমি প্রত্যহ রাত্রিকালে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি। আমার মহিমা দেখ।" নবদ্বীপের শিষ্ট-লোকসকল ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্যদ্রব্য-

* আগল—অগ্রগণ্য।

সকল নিক্ষেপ এবং জল-গোময় দ্বারা সেই স্থান পরিস্কৃত করাইলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীচরণে এইরূপ অপরাধ-ফলে গোপাল চাপালের সর্ব্বাঙ্গে গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইল। 'গোপাল' গঙ্গাতীরে এক বৃক্ষের তলে থাকিয়া ব্যাধিতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিল। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন সহকারে বলিলেন,—

"আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু।।
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হ'বে তোর রৌরবে পতন।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।৫১-৫২)

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবার পর শ্রীনীলাচলাভিমুখে গমনকালে যখন কুলিয়াগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় পুনরায় কুষ্ঠরোগী গোপাল চাপাল মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপালকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীবাসের কৃপায় গোপালের অপরাধ-মোচন হইল।

একদিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতাদি সকলেরই অজ্ঞাতসারে শ্রীবাসের শাশুড়ী সেই ঘরের এক কোণে একটী ডোল মুড়িয়া দিয়া লুকাইয়াছিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দর পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"অদ্য আমার উল্লাস হইতেছে না কেন? কোন বহিরঙ্গ ব্যক্তি কি এখানে লুকাইয়া রহিয়াছে?" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত ঘর অনুসন্ধান করিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং প্রভুকে স্বচ্ছন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন যে, তিনি কিছুতেই আনন্দ পাইতেছেন না। তখন ভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ নিজদিগকে অপরাধী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া লুক্কায়িত-অবস্থায় তাঁহার শাশুড়ীকে দেখিতে পাইলেন এবং তখনই তাঁহাকে অপরের দ্বারা কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অন্যের অগোচরে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তখন মহাপ্রভু উল্লাসভরে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই লীলা দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত জগজ্জীবকে

শিক্ষা দিয়াছেন যে, অকপট হইলেই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করেন। শ্রীশ্রীবাসের পত্নী, পুত্র ও দাস-দাসীকে, এমন কি, তাঁহার গৃহের কুকুর-বিড়ালকে পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু উপযাচক হইয়া নিজপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাসের শাশুড়ীর সরলতার অভাব থাকায় তিনি ভক্ত ও শ্রীভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কন্যা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, মাতা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। মহাভাগবতবরের শাশুড়ী হইলেই যে তিনি ভক্ত-গোষ্ঠীমধ্যে গণ্য হইবেন, তাহা নহে। ভক্তিরাজ্যে দৈহিক ও সামাজিক কোন সম্বন্ধ লইয়া বিচার হয় না।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজলীলাভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কোন্ ভক্ত কোন্ বেষ গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজের শ্রীমহালক্ষ্মী বেষের কথা প্রকাশ করিলেন এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার নাই, ইহা বলিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"আমরা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং আমাদের কিরূপে সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার হইবে?" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিত যোগদান না করিলে তাঁহার নৃত্যই হইবে না। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে সেই অভিনয় আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের বেশে ও শ্রীরামাই পণ্ডিত তাঁহার অনুগ-শিষ্যরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া অভিনয় করিবার ছলে স্ব-স্ব পূর্ব্বপরিচয় ও শ্রীগৌরতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন।

[৭]

একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক মদ্যপের গৃহে মদ্যের গন্ধ পাইয়া শ্রীবলদেবের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং শ্রীশ্রীবাসকে ডাকিয়া সেই মদ্যপের গৃহে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীবাস শ্রীমহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, —"আমার পক্ষেও কি বিধি-নিষেধ আছে?" তথাপি শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"আপনি জগতের পিতা, আপনি লোক-শিক্ষার জন্য বিধি-রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে? আপনার লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া যাহারা আপনার নিন্দা করিবে, তাহাদের জন্মে জন্মে দুঃখ পাইতে হইবে। এইজন্য জীবের প্রতি সদয় হইয়া আপনি আমার প্রার্থনা রক্ষা করুন। যদি আপনি মদ্যপের ঘরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীশ্রীবাসের কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী দেবানন্দ পণ্ডিতকে বিশেষভাবে শাসন করিয়াছিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের মহা-অধ্যাপক, জ্ঞানবন্ত, তপস্বী ও আজন্ম উদাসীন হইলেও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি বহির্ম্মুখ ছাত্রগণের অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়ায় শ্রীমদ্ ভাগবত-পাঠের অনধিকারী হইয়াছিল। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে শাসন করিয়াছিলেন,—

মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যা'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৮)

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় অরোহণ করিয়া নিজ-মুখে নিজতত্ত্ব বর্ণন ও সকলকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন। তখন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীশচীদেবীকে প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরির নিকট প্রার্থনা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন যে, শ্রীশচীদেবীর বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ আছে; সুতরাং তিনি প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। ইহা শুনিয়া মহাবক্তা শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন যে, যদি ঐ কথা পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভক্তগণের প্রাণ বহির্গত হইবে। শ্রীবাসের প্রার্থনানুসারে শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনের উপায় বর্ণন করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিনিশায় শ্রীশ্রীবাসের গৃহে সংকীর্ত্তন করিয়া জগতের চিত্তবৃত্তি শোধন করিতেন। একজন নবদ্বীপবাসী তপস্বী ও পরম সাধুচরিত্র কেবল মাত্র দুগ্ধপায়ী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্য দর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট সানুনয়-প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত উক্ত ব্রহ্মচারীকে নিষ্পাপ জানিয়া গোপনে নিজগৃহের মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরসুন্দর ইহা জানিতে পারিয়া নৃত্যকীর্ত্তনকালে বলিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে উল্লাস হইতেছে না; নিশ্চয়ই বাড়ীর ভিতর কোন বিজাতীয় ব্যক্তি অবস্থান করিতেছে। তখন ভয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, কোন পাষণ্ডি-ব্যক্তি গৃহে নাই; একজন নিষ্পাপ পয়ঃপায়ী সুব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী মাত্র শ্রদ্ধাপূর্ণ-হৃদয়ে নৃত্য দর্শন করিবার জন্য নিভৃতে অবস্থান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে শ্রীশ্রীবাসকে বলিলেন,—"অবিলম্বে উহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দাও। দুগ্ধপায়ী

হইলেই আমার সংকীর্ত্তন-নৃত্য-দর্শনে অধিকারী হয় না। যদি চণ্ডালেও আমার শরণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে অশরণাগত সন্ন্যাসী অপেক্ষা সেই চণ্ডাল আমার অধিক কৃপাভাজন হইতে পারে। তপস্যা, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য—এই সকল অসুরগণও প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব একমাত্র শরণাগতিই আমার প্রাপ্তির উপায়।"

মহাপ্রভুর এই শাসন-তাড়নে উক্ত ব্রহ্মচারীর জ্ঞানোদয় হইল; তিনি নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দর সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারীর মস্তকে পদ-স্থাপন করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে 'শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নাম' পাঠ করিবার আজ্ঞা করিলে শ্রীশ্রীবাস যখন প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনৃসিংহদেবের নাম পাঠ করিলেন, তখন তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহাবেশে আবিষ্ট হইয়া হস্তে গদা ধারণপূর্ব্বক নগরের মধ্যে পাষণ্ডিগণকে প্রহার করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ইহা দেখিয়া নগরবাসী জন-সাধারণের ভীষণ ত্রাস উপস্থিত হইল। প্রভুও লোকের ভয়-ভাব দেখিয়া ক্রোধলীলার সম্বরণ করিলেন এবং শ্রীশ্রীবাস-গৃহেতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গদাটী ফেলিয়া দিলেন।

[৮]

কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশক্রমে তাঁহার শ্রীমুখশ্রুত—

"(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।"

—এই পদ নবদ্বীপে স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা—শ্রদ্ধালু সকলে একত্রিত হইয়া হাতে তালি দিয়া সন্ধ্যাকালে স্ব-স্ব গৃহে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দুর্গোৎসবার্থ ব্যবহৃত মৃদঙ্গ-মন্দির-শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সকলে—

"হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।"

—এই 'ব্রহ্মনাম'-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দৈবক্রমে একদিন কাজি সেই পথ দিয়া গমন-কালে চতুর্দ্দিকে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ প্রভৃতির ধ্বনির সহিত শ্রীহরিনামের কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইল। ইহা শুনিয়া কাজি যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই প্রহার করিতে লাগিল এবং মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া ঘরে ঘরে নানা-প্রকার অনাচার করাইল। কাজির অত্যাচারের ভয়ে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ

কীর্ত্তন-বাদ্যাদি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কেবলমাত্র গোপনে ঐ সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু কাজি দুষ্ট ও বিদ্বেষী অধিবাসিগণের সহযোগে কীর্ত্তনকারিদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া 'হিন্দু'-নামধারী পাষণ্ডী ব্যক্তিগণ উচ্চ-হরিকীর্ত্তনের বিধি কোন শাস্ত্রে নাই,—এইরূপ নানা-কথা বলিতে লাগিল। সজ্জনগণ মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া কাজির ভয়ে তাঁহাদের কীর্ত্তনবিরতি এবং নবদ্বীপ-পরিত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। ঐরূপ কীর্ত্তন-বিরোধের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া ভক্তগণকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তন করিবার আদেশ করিলেন। সেই নগর-সংকীর্ত্তনে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত মনের আনন্দে শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে নৃত্য করিয়াছিলেন।

প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থ বা শুদ্ধ-ভক্তের আদর্শ-স্থাপনকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-ভবনে একটি লীলা প্রকট করিলেন। একদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দের সহিত সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কোন ব্যাধিতে শ্রীবাসের পুত্র পরলোকগমন করেন। ইহাতে শ্রীবাসের অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্র পরলোকগত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন এবং পরম-গম্ভীর ভক্ত ও মহা-তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীশ্রীবাস গৃহের স্ত্রীগণকে এইরূপ বিশেষভাবে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন,—"যাঁহার নাম অন্তিমকালে একবার মাত্র শ্রবণ করিলেই মহাপাতকী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করে, সেই ভগবান্ সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার ব্রহ্মাদি-পরিকরগণের সহিত নৃত্য করিতেছেন; সুতরাং এ সময় যাহার পরলোক-গমন হইয়াছে, তাহার জন্য শোক করা দূরে থাকুক, তাহার ন্যায় ভাগ্য প্রাপ্ত হইলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করা উচিত।" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত আরও বলিলেন,—"যদি বা তোমরা সংসার-ধর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া ক্রন্দন-সম্বরণ করিতে না পার, তবে পরে ক্রন্দন করিও। যদি তোমাদের ক্রন্দন-কলরবে মহাপ্রভু কোনরূপে বাহ্যদশায় উপনীত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি গঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহ-বিসর্জ্জন করিব।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের এই বাক্যে সকলে স্থির হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও পরমানন্দে প্রভুর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-গমনের কথা জানিতে পারিয়া

বলিলেন,—"আজ আমার চিত্তের অবস্থা যেন কিরূপ হইয়াছে। বোধ হয়, পণ্ডিতের ঘরে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।" অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পণ্ডিতের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তির কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' নাম স্মরণ করিয়া বলিলেন,—

"পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে?"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৫২)

—এই বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একাধারে ভক্ত-বিরহ ও সন্ন্যাসলীলার ইঙ্গিত, মর্ম্মী ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন। সকলে মৃতের সৎকারার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের মৃতশিশুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শ্রীবাসের ঘর ছাড়িয়া তুমি কি জন্য চলিয়া যাইতেছ?" সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া মৃতশিশু উত্তর করিল,—"প্রভো! আপনার নির্ব্বন্ধ অন্যথা করিবার কাহারও শক্তি নাই। কে কাহার পিতা? কে কাহার পুত্র? সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তদনুযায়ী দেহ লাভ করিয়া থাকে। আমার যতদিন ভাগ্য ছিল, ততদিন শ্রীবাসপ্রভুর ঘরে ছিলাম; এখন অন্য পুরীতে গমন করিতেছি। এইরূপ কৃপা কর, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্ম কখনও বিস্মৃত না হই। সপার্ষদ তোমার শ্রীচরণে আমার নমস্কার।" ইহা বলিয়া শিশু নীরব হইলে তাঁহার মুখে ঐরূপ তত্ত্বকথা-শ্রবণে শ্রীবাস-গোষ্ঠীর সমস্ত শোক বিদূরিত হইল। শ্রীবাস-গোষ্ঠী শোক-ক্রন্দন করিবার পরিবর্ত্তে প্রেমক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু।।
যেখানে সেখানে, প্রভু, কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৭০-৭১)

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন,—"শ্রীবাস! তুমি ত' সংসারের রীতি জান। এই সকল অনিবার্য্য সংসার-দুঃখ, তোমার কথা কি, যে ব্যক্তি

তোমাকে দর্শন করিবে, তাহারও কখনও অনুভবের বিষয় হইবে না। আমি ও শ্রীনিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র। তোমার কোনও দুঃখের কারণ নাই।”

শ্রীগৌরসুন্দর সকল ভক্তের সহিত শ্রীবাসের পরলোকগত পুত্রকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগঙ্গাতীরে গমন করিয়া মৃতের সৎকার করাইলেন।

[৯]

সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনীলাচল-গমনের পথে শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় কুষ্ঠব্যাধির ভীষণ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত কোন এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, সে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করিয়াছে; সুতরাং তাহাকে অনন্তকাল কুম্ভীপাক-নরকে যন্ত্রণা পাইতে হইবে। সেই কুষ্ঠরোগী নিজের কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিয়া মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করিলে তিনি বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ শ্রীশ্রীবাসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার পরামর্শ দিলেন। কুষ্ঠরোগী শ্রীশ্রীবাসের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপায় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

শান্তিপুরস্থ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ হইতে শ্রীগৌরসুন্দর কুমারহট্টে আগমন করিলেন; তখন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে কুমারহট্টে আসিয়া তাঁহার চিন্তায় রত ছিলেন। অকস্মাৎ নিজ ধ্যানের ফল সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গ-প্রণতঃ হইয়া প্রভুর পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দরের আগমন-সংবাদ-শ্রবণে ক্রমে ক্রমে শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌর-জনগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাসের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বিদূষকের লীলা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ-বিধান করিলেন। শ্রীরামাই পণ্ডিতও শ্রীবাসের অনুগমনে শ্রীমহাপ্রভুর গুণগান করিয়াছিলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত কিছু ব্যবহারিক কথোপকথনছলে বলিলেন,—“পণ্ডিত! আমি দেখিতেছি, তুমি অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য কোথায়ও গমন কর না। কিরূপে তোমার সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ হয়? তোমার ত’ বৃহৎ

পরিবার! ইহাদিগের ভরণ-পোষণে অর্থের প্রয়োজন।" শ্রীবাস পণ্ডিত তদুত্তরে বলিলেন,—"প্রভো! অর্থের চেষ্টা করিবার জন্য কোথায়ও যাইতে আমার চিত্ত অগ্রসর হয় না। যাহার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। যাহা আসিবার, তাহা যে-কোন প্রকারে আসিয়া জুটিবেই।" মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন,—"পণ্ডিত! তাহা হইলে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর।" পণ্ডিত বলিলেন,—"তাহা আমি পারিব না।" প্রভু বলিলেন,—"সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে না, অর্থের জন্যও কাহার দ্বারস্থ হইবে না, তোমার পরিবার-পোষণ কিরূপে হইবে? তোমার কথা ত' কিছুই বুঝিতে পারি না। যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে কোথায়ও না গেলে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্রব্য পাওয়া যায় না। তোমার ঘরে যদি কোন দ্রব্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, আমাকে বল।" মহাপ্রভুর এই কথার উপর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত নিজহস্তে 'এক', 'দুই', 'তিন' বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনটী তালি দিলেন। প্রভুর ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিত বলিলেন,—"আমার এই দৃঢ়তা যে, যদি তিন উপবাসেও আহার না মিলে, তবে গলায় ঘট বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" এই কথা বলিবামাত্রই মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন,—"কি বলিলি, পণ্ডিত শ্রীবাস! তোর কি অর্থের জন্য উপবাস করিতে হইবে? কদাচিৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ভিক্ষা করা সম্ভব হইলেও একান্ত শরণাগত তোর অর্থাভাব হইবে না। তুই কি গীতাশাস্ত্রে কথিত আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিস্? যিনি শরণাগত হইয়া আমার সেবা করেন, আমি মাথায় করিয়া তাঁহার সমস্ত অন্নাদি সংগ্রহ ও তাঁহাকে পোষণ করিয়া থাকি। যিনি আমার চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিয়া দেহ-গেহ-বিস্মৃত হইয়া কাহারও দ্বারে গমন করেন না, তাঁহার নিকট সমস্ত সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—আমার শরণাগত সেবকের সেবা করিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলেও আমার দাস তাহা প্রার্থনা করেন না। আমার সুদর্শনচক্র আমার দাসকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা রক্ষা করে। মহাপ্রলয়েও আমার দাসের বিনাশ নাই। অধিক কি, যে ব্যক্তি আমার দাসের স্মরণ করেন, তাঁহাকেও আমি পোষণ ও পালন করিয়া থাকি। আমি যাহার পোষণকর্ত্তা, আমার সেই শরণাগত সেবকের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা কি? তুই ঘরে বসিয়া আমার গুণগান কর। সকল দ্রব্যসম্ভার স্বতঃই তোর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।" তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া সর্ব্বতোভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিবার আদেশ করিলেন।

[১০]

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিলে প্রতি বৎসরই শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমালিনীদেবী প্রভৃতি পত্নী ও পরিবারবর্গের সহিত শ্রীনীলাচলে গমন করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে নৃত্য, রথাগ্রে নৃত্য, গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনোৎসবে যোগদান, নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি ও বিবিধভাবে সেবা করিতেন। সময় সময় ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্ত-গৃহস্থগণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ করিতেন।

শ্রীনীলাচলে শ্রীরথযাত্রা দিবসে রথাগ্রে শ্রীগৌরসুন্দর উদ্দণ্ড-নৃত্য করিতেছিলেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া যখন আবিষ্টভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাস পণ্ডিতও প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে রাজার অগ্রভাগে থাকিয়া মহাপ্রভুর নর্ত্তনলীলার অনুসরণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অগ্রভাগে দেখিতে পাইয়া হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া একপাশ হইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাস নৃত্যাবেশে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি পুনঃ পুনঃ হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে ঠেলিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীবাসের নৃত্য-সেবায় বিঘ্নহেতু ক্রোধ হইল। শ্রীশ্রীবাস হরিচন্দনকে চপেটাঘাত করিয়া ঐরূপ করিতে নিবারণ করিলেন। হরিচন্দন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীবাসকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যত হইলে মহারাজ প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি পরম সৌভাগ্যবান্; যেহেতু শ্রীগৌরহরির নিজজন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। আমার এইরূপ ভাগ্য নাই। বৈষ্ণবের দ্বারা অপমান বা আঘাতও সৌভাগ্যসূচক। তাহা অপমান নহে, উহাই প্রকৃত গৌরব-লাভ।"

শ্রীরথযাত্রার পরের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অন্বেষণে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে 'হেরিয়া' অর্থাৎ দেখিতে আসেন। এ জন্য উহাকে "হেরাপঞ্চমী" বলে। শ্রীজগন্নাথদেব যখন রথে যাত্রা করেন, সেই সময় তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বলিয়া যান,—"আমি কল্যই ফিরিয়া আসিব।" দুই তিন দিন বিগত হইলেও শ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাবর্ত্তন না করায় প্রেমবতী শ্রীলক্ষ্মীর ক্রোধোদয় হয়। তিনি নিজের দাসীগণের সহিত বিমানে সজ্জিতা হইয়া শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হন। শ্রীলক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রধান প্রধান পরিচারকগণকে বন্ধন করেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এই প্রাগলভ্য

দর্শন করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ব্রজজনের প্রেমসম্পত্তির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"প্রভো! শ্রীলক্ষ্মীর এইরূপ মানের প্রকার আমি কখনও ত্রিজগতে শুনি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে তিনি উৎসাহহীন হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মলিন-বদনে ভূমিতে বসিয়া নখে যাহা-তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে শ্রীগোপীগণের এই প্রকার মান এবং পুরবাসিনী শ্রীসত্যভামারও এই প্রকার মানের কথাই শুনা গিয়াছে। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মানের প্রকার ইহার বিপরীত দেখিতেছি! ইনি নিজের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন।"

শ্রীরাধার সেবক শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবক শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের এই ব্যাপারের প্রসঙ্গ লইয়া পরস্পর সংলাপ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত হাস্য করিয়া বলেন,—"দামোদর! দেখ, আমার শ্রীলক্ষ্মীর কত সম্পত্তি! আর শ্রীবৃন্দাবনের সম্পদ মাত্র পুষ্প, কিশলয়, গিরিধাতু, শিখিপিচ্ছ, গুঞ্জাফল—এই সব। এইরূপ শ্রীবৃন্দাবন দেখিবার জন্য শ্রীজগন্নাথ নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরাচলে গিয়াছেন; ইহাতেই শ্রীলক্ষ্মীর ক্রোধাভিমান হইয়াছে এবং শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণ শ্রীজগন্নাথের দোষভাগী সেবকগণকে বন্ধন ও শাস্তি-প্রদান করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথদেবকে শীঘ্রই প্রত্যর্পণার্থ প্রতিজ্ঞা করিলে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোধোপশম হইয়াছে। তোমার ঈশ্বরী ও তাঁহার অনুচরীগণ গোয়ালিনীর কার্য্য করে। দুগ্ধ আবর্ত্তনপূর্ব্বক দধিমন্থন করিয়া জীবন-ধারণ করে। আর আমার ঠাকুরাণী রত্নসিংহাসনে বসিয়া কত দাস-দাসীগণের দ্বারা নিত্য সেবিত হন।"

শ্রীনারদপ্রকৃতি শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাগমার্গীয় শ্রীগৌরভক্তগণ হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরের ভজন-বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"শ্রীশ্রীবাস! তোমার শ্রীনারদের স্বভাব; তোমাতে ঐশ্বর্য্য-ভাব রহিয়াছে। আর শ্রীস্বরূপ-দামোদর শুদ্ধ-ব্রজবাসী; ইনি ঐশ্বর্য্য জানেন না। শুদ্ধ-প্রেমই ইঁহার জীবন।" তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদরও শ্রীশ্রীবাসের নিকট শ্রীব্রজের মাধুর্য্য-গরিমা বর্ণন করিয়া শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার শ্লোক-কীর্ত্তনমুখে শ্রীবৃন্দাবনস্থ বস্তুর স্বরূপ ও বিচিত্র স্বভাব বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীবাস করতালি বাজাইয়া অট্ট-অট্ট হাস্য ও প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের গুণগান করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ-পূর্ব্বক ভক্তগণকে বলিলেন,—"তোমরা শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণগান পরিত্যাগ করিয়া কি কীর্ত্তন করিতেছ? তোমাদের সকলের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তোমরা স্বতন্ত্র হইয়া জগতের বিনাশ-সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন দশদিক্ হইতে কোটি কোটি লোক 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বা,—

"জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে, প্রভু, তোমার অবতার।।
বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া, প্রভু, করহ কৃতার্থ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।২৭৩-২৭৪)

—এইরূপ বলিতে বলিতে অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লোকের দৈন্যে শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। দয়ার সাগর শ্রীগৌরসুন্দর বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দান করিলেন। তখন কোটিকণ্ঠে সকলে শ্রীগৌরসুন্দরকে 'ভগবান্' বলিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্তব শুনিয়া, সুযোগ বুঝিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিলেন,—"এখন কেন ঘরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলে না? এই বিশাল জনতাকে কে তোমার স্তব শিখাইয়াছে? এখন তোমার হস্তদ্বারা ইঁহাদের সকলের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখ। সূর্য্যের উদয়কে কি হস্তের দ্বারা গোপন করিয়া রাখা যায়? ভক্তজয়-বৃদ্ধিকারী শ্রীভগবান্ এইবার ভক্তের নিকট পরাজিত হইলেন। তাই আমরাও উপসংহারে শুদ্ধভক্তের অগ্রণী শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের জয়গান করিয়া শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর পদানুসরণে বলি,—

"ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।৩৮)

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী ও দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীসুবল সখা। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় বলিয়াছেন,—

সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরদাসপণ্ডিতঃ।।

(শ্রীগৌঃ গঃ—১২৮)

পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাসং গুণান্বিতম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রিয়মহং ভজে।।

(শ্রীভঃ রঃ ৭।৩২৯)

যিনি প্রিয়গণশ্রেষ্ঠ সুবল, তিনিই শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। পূর্ব্বে (শ্রীকৃষ্ণলীলায়) শ্রীসুবলচন্দ্র, সম্প্রতি (গৌরলীলায়) শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয় গুণবান্ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি।

গৌরদাস পণ্ডিত—পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁ'র প্রাণ।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৩০)

গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়।
শ্রীসুবলচন্দ্র যেঁহো গুণের আলয়।।
শ্রীসুবল-গৌরীদাস—বিদিত সর্ব্বত্র।
অভিন্ন-চৈতন্য নিত্যানন্দ-প্রিয়পাত্র।।

(শ্রীভঃ রঃ—৭।৩২২, ৩২৭)

শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত শালিগ্রামে (ই, বি, আর লাইনের মুড়াগাছা স্টেশনের কিয়দ্দূরে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শালিগ্রামবাসী শ্রীকংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—(১) শ্রীদামোদর, (২) শ্রীজগন্নাথ, (৩) শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল, (৪) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৫) শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল ও (৬) শ্রীনৃসিংহচৈতন্য। শ্রীকংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিবংশগণের কেহ কেহ এখনও শালিগ্রামে বাস করেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত বা শ্রীহৃদয়চৈতন্যের বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয়চৈতন্যের শিষ্যশাখাবংশ।

শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—(বড়) শ্রীবলরাম এবং কনিষ্ঠ—শ্রীরঘুনাথ। শ্রীরঘুনাথের পুত্র—শ্রীমহেশ পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ; কন্যা—শ্রীঅন্নপূর্ণা।

বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কাল্না হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বদিকে শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট বর্ত্তমান। শ্রীপাটের দেবালয়ের প্রবেশপথে একটি অপূর্ব্ব তেঁতুল-বৃক্ষ বিরাজিত আছে। কথিত হয়, ঐ তেঁতুল-বৃক্ষের তলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন হইয়াছিল। দেবালয়টি শ্বেত-প্রস্তরমণ্ডিত এবং গৃহের তিনটি প্রকোষ্ঠে— (১) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (২) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, (৩) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, (৪) শ্রীজগন্নাথ, (৫) শ্রীবলভদ্র ও (৬) শ্রীশ্রীরামসীতা সজ্জিত আছেন।

শ্রীল গৌরদাস পণ্ডিত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবার পিতা পরম উদার চরিত্র শ্রীল সূর্য্যদাস সরখেলের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অম্বিকা-কাল্নায় আসিয়া বাস করেন এবং মহাবিরক্তভাবে সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া পরম প্রীতিভরে তাঁহার আরাধ্য হৃদয়দেবতার সেবা করিতে করিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমসেবায় আকৃষ্ট হইয়া একদিন শান্তিপুর হইতে অম্বিকায় আগমন করিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন,—"আমি শান্তিপুরে গিয়াছিলাম। তথা হইতে হরিনদী-গ্রামে আসিয়া নৌকায় চড়িলাম এবং এই বৈঠাদ্বারা নৌকা বাহিয়া গঙ্গা পার হইয়া এখানে আসিয়াছি। এখন এই বৈঠা তোমাকে দিলাম, তুমি ইহা দ্বারা জীবসকলকে ভবনদী পার করাও।" তিনি এই কথা বলিয়া সেই বৈঠা শ্রীল গৌরীদাসকে প্রদান করিলেন এবং কৃপালিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীগৌরীদাসকে সঙ্গী করিয়া লইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত 'গীতামৃত' পণ্ডিতকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল গৌরীদাস প্রভুদত্ত 'গীতামৃত' পরম আদরের সহিত সর্ব্বদা পাঠ করিতেন।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীল গৌরীদাসের জীবনের যথাসর্ব্বস্ব; এক মুহূর্ত্ত অদর্শন হইলেই যেন তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইত। শ্রীল গৌরীদাস সর্ব্বদা শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্যের গুণ-কীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন। তাঁহার এই প্রকার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"তুমি আমার ও আমার ভ্রাতার

(শ্রীনিত্যানন্দের) মূর্ত্তি প্রকট করিবে; আমরা তোমার মনোঽভিলাষ পূর্ণ করিব।" শ্রীল গৌরীদাস এই কৃপাদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিলেন। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শোভা-দর্শনে তাঁহার নেত্র হইতে প্রেমাশ্রুধারা বহির্গত হইতে লাগিল এবং প্রিয়বর্গের সহিত যথা-শাস্ত্রবিধি মতে অভিষেক-ক্রিয়াদি সম্পাদনান্তে শ্রীবিগ্রহযুগলকে সিংহাসনোপরি স্থাপন করিলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ একদিন মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে শ্রীল গৌরীদাসকে বলিলেন,—"ওহে সখা সুবল! তুমি সর্ব্বক্ষণ প্রেমসেবায় বিহ্বল; তোমার প্রেম-সেবার বিষয় অপর কেহই জানিতে পারে না; তোমার কি স্মরণ আছে—আমরা শ্রীযমুনাপুলিনে গোচারণে কত কেলি-কৌতুক করিতাম?" এই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামরূপে দর্শন প্রদান করিলেন। শ্রীল গৌরীদাস তখন তাঁহাদের অপূর্ব্ব শ্যাম-শুক্লরূপ, শিঙ্গা, বেত্র, বেণু, শিখিপিঞ্ছ-সমন্বিত ভুবনমোহন গোপবেশ-শোভা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয় শ্রীগৌরীদাসের পাচিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীল গৌরীদাস রন্ধনান্তে ভোগ নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রহণ না করিয়া মৌন হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া মহাপ্রভুকে কিছু ক্রোধ-ব্যঞ্জক বাক্যে বলিলেন,—"যদি তুমি ভক্ষণ না করিয়াই সুখী হও, তাহা হইলে আমাকে দিয়া রন্ধন করাও কেন?" এই বলিয়াই মৌন-ভাব ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন,—"তুমি আমাদের নিষেধ-সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নানাপ্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি করিয়া থাক; তোমার এত কষ্ট আমরা সহ্য করিতে পারি না; অনায়াসে যাহা পার, তাহাই রন্ধন করিও। আমরা পরম-প্রীতিসহকারে তাহাই গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব।" তখন পণ্ডিত বলিলেন,—"তবে তাহাই করিব, এক শাকান্ন দিয়াই তোমাদের ভোগ প্রদান করিব।" তখন প্রভুদ্বয় তৎপ্রদত্ত ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে শাকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতপ্রভু একদিন শ্রীবিগ্রহযুগলকে অলঙ্কারে ভূষিত করিতে অন্তরে ইচ্ছা করিলেন। অন্তর্যামী প্রভু তাঁহার মনোভাব জানিয়া স্বয়ংই নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া সিংহাসনোপরি অবস্থান করিয়া রহিলেন। শ্রীল গৌরীদাস মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, —'আমি এরূপ অপূর্ব্ব শোভা আর কখনও দেখি নাই। আমার অলঙ্কার পরাইবার

অভিলাষ ছিল; কিন্তু এখন আর কোথায় পাইব।' পণ্ডিতের হৃদয় জানিয়া প্রভু বলিলেন, "পুষ্পের ভূষণে আমার অতিশয় সুখ হয়।" ঐ কথা শ্রবণে শ্রীগৌরীদাস আনন্দ-অন্তরে বিবিধ পুষ্পভূষণে তাঁহাদিগকে ভূষিত করিলেন এবং দর্পণ আনিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখমণ্ডলের সম্মুখে ধারণ করিয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন।

আর একদিন শ্রীল গৌরীদাসপ্রভু প্রাতঃকালে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। শ্রীল গোস্বামি-প্রভু তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগৌরীদাস বলেন,— "শ্রীহৃদয়ানন্দকে চাই।" তচ্ছ্রবণে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু প্রাণে কষ্ট হইলেও তাঁহার প্রাণপ্রতিম শ্রীহৃদয়ানন্দকে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীল গৌরীদাস তাঁহাকে বাসায় লইয়া গিয়া দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন। শ্রীহৃদয়ানন্দের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত তাঁহাকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবাভার সমর্পণ করিলেন।

শ্রীল গৌরীদাসপ্রভু একবার তাঁহার প্রিয় মন্ত্র-শিষ্য শ্রীহৃদয়ানন্দের সহিত এক অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত একদিন তাঁহার অনুগত শ্রীহৃদয়ানন্দকে বলিলেন,—"হৃদয়ানন্দ! প্রভুর (শ্রীমন্মহাপ্রভুর) জন্মোৎসবের সময় আসিয়া উপস্থিত। আমি শিষ্যগণের গৃহ হইতে উৎসবের কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তুমি কিন্তু প্রভুর সেবা-বিষয়ে সাবধান থাকিও।" এই বলিয়া শ্রীগৌরদাস-পণ্ডিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্রীগুরুদেবের (শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের) গৃহে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া অন্তরে চিন্তিত হইলেন। বহু সেবোপকরণ সংগৃহীত হইল, আর মাত্র দুই দিন সময় আছে; উৎসবোপলক্ষ্যে দূরস্থিত ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করা প্রয়োজন, অথচ শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত তখনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। শ্রীহৃদয়ানন্দ তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ করিয়া সর্ব্বত্র উৎসবের নিমন্ত্রণ করিলেন। উৎসবের পূর্ব্বদিন শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত আসিয়া সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে শুনিয়া অন্তরে হৃষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যে ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"হৃদয়ানন্দ! আমি বিদ্যমান থাকিতে থাকিতেই তুমি স্বতন্ত্রাচরণ করিলে? আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই যেখানে-সেখানে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছ; যাহা হউক, তুমি এখানে আর থাকিও না।" এই কথা শুনিয়া শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতঃ হইয়া গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরীদাস উৎসব আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় একজন মহাজন বহু সামগ্রী নৌকায় ভরিয়া শ্রীহৃদয়ানন্দের নিকট জানাইলে শ্রীহৃদয়ানন্দ সেই সংবাদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে জানাইলেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীহৃদয়ানন্দকে সেই সমস্ত সামগ্রী লইয়া উৎসব করিতে আদেশ করিলেন। গুরুদেবের আদেশ পাইয়া শ্রীহৃদয়ানন্দ বৈষ্ণবগণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন-যোগে মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রেমে নৃত্য করিতেছেন—ইহা শ্রীহৃদয়ানন্দ সাক্ষাৎ দেখিলেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সেই সঙ্কীর্ত্তন কোলাহল শুনিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন। তিনি শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-সেবার জন্য বড় গঙ্গাদাসকে (পূজারী) পাঠাইলে, তিনি প্রভুদ্বয় মন্দিরে নাই, সিংহাসন শূন্য—ইহা জানাইলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দের প্রেমে বশীভূত প্রভুদ্বয় গঙ্গাতীরে গিয়াছেন জানিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া যষ্টিহস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীহৃদয়ানন্দ তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ-পতিত হইলেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত তথায় গিয়া প্রভুদ্বয়কে নৃত্য করিতে দেখিলেন। প্রভুদ্বয় ক্রোধাবিষ্ট গৌরীদাস পণ্ডিতকে দেখিয়া সকলের অলক্ষিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত দেখিলেন—প্রভুদ্বয় শ্রীহৃদয়ানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীগৌরীদাস প্রেমে বিহ্বল হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে যষ্টি খসিয়া পড়িল। তিনি শ্রীহৃদয়ানন্দকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"হৃদয়ানন্দ! তুমি ধন্য। আজ হইতে তোমার নাম 'হৃদয়চৈতন্য' হইল। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত হৃদয়ানন্দকে মন্দির-প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন এবং শ্রীমন্দিরে পূজিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীহৃদয়ানন্দ ও বৈষ্ণববৃন্দসহ মহা-মহোৎসব সম্পাদন করিলেন।

উপসংহারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর নিম্নলিখিত পদ আবৃত্তি করিয়া শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে আমরা কৃপা প্রার্থনা করিতেছি,—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি।।
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ করি' প্রাণপতি।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।২৬-২৭)

শ্রীজাহ্নবাদেবী

বৈশাখী শ্রীগৌরনবমী তিথি শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা দেবী ও শ্রীদশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়েশ্বরী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-তিথি বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীল জাহ্নবা দেবী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি; তিনিও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—জগদ্গুরু—প্রেমভক্তির গুরু। তিনি—শ্রীগোপীনাথের প্রিয়তমা। শ্রীজাহ্নবা-দেবী শ্রীপুরীধামে শ্রীটোটা-গোপীনাথের ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের দক্ষিণে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অনুজা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরূপে নিত্য বিরাজিতা। তিনি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীললিতা ও শ্রীবিশাখাদেবীর অতিশয় প্রিয়া। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী যেরূপ শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া অতিশয় সুখী হ'ন, শ্রীরাধারাণীও সেইরূপ অনুজা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন।

আনুমানিক ১৪০৯ শকে শ্রীজাহ্নবাদেবী অম্বিকা-কালনাস্থ শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের পরম সৌভাগ্যশালিনী 'ভদ্রাবতী'-নাম্নী পত্নীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হ'ন। শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী ও তদীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীবসুধা-দেবী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিত্য অপ্রাকৃত শক্তি। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্য্যগণ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীকে জগদ্গুরুর আসন প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণও শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীকে জগদ্গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যখন খেতরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ প্রকট করেন, সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিয়ামকত্বে সেই সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু প্রমুখ জগদ্গুরুগণও তখন শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া আপনদিগকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর তিনি সমগ্র শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের সার্ব্বভৌম শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে স্ত্রীরূপী, গৃহস্থরূপী, বালক বা যুবকরূপী কিংবা কোন অবরকুলে আবির্ভূত মনে করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে, তাহারা কখনও মঙ্গল-লাভের

অধিকারী হয় না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিৎই শ্রীগুরুদেব। তিনি যে-কোন মূর্ত্তিতে, যে-কোন বেষে জগতে অবতীর্ণ হউন না কেন, তাহাতে তাঁহার গুরুত্বের অভাব হয় না। শ্রীহনুমান্ পশুকুলে, শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলি মহারাজ অসুরকুলে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ম্লেচ্ছকুলে, শ্রীল বাসুদেব (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য) বালকরূপে, শ্রীল গোদাদেবী, শ্রীল জাহ্নবা-ঠাকুরাণী, শ্রীল গঙ্গামাতা, শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি স্ত্রীকুলে অবতীর্ণ হইয়াও জগদ্গুরু। শ্রীজাহ্নবাদেবী সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা ব্যতীত বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইতে পারে না। বিষয়-বাসনা বিদূরিত না হইলে শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা লাভ হয় না। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কৃপা না পাইলে শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বে প্রীতি হয় না। ইহাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা-গীতির মধ্যে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু'র মঙ্গলাচরণে গাহিয়াছেন,—

"নিখিল বৈষ্ণব-জন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবাপদে মোরে রাখহ টানিয়া।।"

আবার 'দৈন্যময়ী প্রার্থনা'য় বলিয়াছেন,—

"ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান।।
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম না আছে সম্বল।।
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার।।
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন।।
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী।।

ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবী! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা।।
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব করেছি নিশ্চয়।।
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু।।
কত কত পামরেরে করেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার।।

আবার অন্যত্র লালসাময়ী প্রার্থনা করিতে করিতে গাহিয়াছেন,—

সিদ্ধদেহে নিজকুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে।।
এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার।।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যেরূপ "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।" —ইত্যাদি পদের দ্বারা বুক ফুলাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের প্রভুর মহিমা গান করিয়াছেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগের শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীজাহ্নবার প্রাণ-ধন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গোপীনাথের ভরসা করিয়া দৈন্যময়ী বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন;—

"গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি।।"

* * *

গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন।।

শ্রীল গদাধরের প্রাণনাথ—শ্রীজাহ্নবার প্রাণনাথ শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণে শ্রীল ঠাকুরের এই বিজ্ঞপ্তি-গীতির মধ্যে যে তীব্র আর্ত্তি ও রতিরাসসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়াছে, তাহার একবিন্দুর একটী কণা জীবের হৃদয়ে অকৃত্রিমভাবে সঞ্চারিত হইলে জীব অনায়াসে সংসারসিন্ধু অতিক্রম করিয়া প্রয়োজনবিগ্রহ শ্রীগোপীনাথের নিত্যসেবা-লাভের অধিকারী হইতে পারেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দসখা শ্রীল অভিরাম ঠাকুর শ্রীগৌড়মণ্ডলে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীগোপীনাথের সেবা, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভু শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর (শ্রীজাহ্নবাদেবীর) সহিত শ্রীগোপীনাথর সেবা প্রকট করিয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীল মধুপণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনের প্রয়োজনাধিদেবতা-রূপে শ্রীবার্ষভানবী ও শ্রীজাহ্নবা-অনঙ্গমঞ্জরীর সহিত শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

শ্রীভক্তিরত্নাকরের মতে, অগ্রহায়ণ-মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন।

যথা,—

অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি।
যাতে অদর্শন ঠাকুর শ্রীনরহরি।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯।৫১৩)

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীখণ্ডে শ্রীল সরকার ঠাকুরের বিরহ-উৎসব প্রবর্ত্তন করেন এবং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ও শ্রীবীরভদ্র প্রভু সংকীর্ত্তনে সারা রাত্রি নৃত্য করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশীতে মহামহোৎসব হইয়াছিল। (শ্রীভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত নিত্য গীত হইয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের আরতি-কীর্ত্তনে গাহিয়াছেন,—

"নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।"

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত-আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর।।"

শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিরহী শ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তের চিত্তবৃত্তির পরিচয় এই পদের মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অপ্রাকৃত-কুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরকেই একমাত্র প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দকেই একমাত্র ধন, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকেই বল, শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীপাদপদ্মকেই প্রাণসর্ব্বস্ব ও শ্রীল নরহরিকে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণবিলাসে বিলাসী বিচারে শ্রীহরিভজন করাই বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত ভজনকারিগণের ভজন-চাতুরী।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর কাটোয়া হইতে প্রায় চারি মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে আবির্ভূত হন। শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীমাধবদাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তিন ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীমুকুন্দদাস জ্যেষ্ঠ ও শ্রীমাধবদাস মধ্যম। শ্রীমুকুন্দ দাস সরকার ঠাকুরের পুত্রই শ্রীল রঘুনন্দন দাস। শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি শ্রীখণ্ডবাসিগণকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমকল্পবৃক্ষের 'মহাশাখা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যের কৃপাবতার মহাশাখারূপে জগতে প্রকটিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেম-ফলফুল দান করিয়াছেন।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন।।
এই সব মহাশাখা—চৈতন্যকৃপাধাম।
প্রেমফলফুল করে যাহাঁ তাহাঁ দান।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৮-৮৯)

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীব্রজলীলায় "শ্রীমধুমতী প্রাণসখী" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৭৭ শ্লোক)

যিনি পূর্ব্বে (শ্রীকৃষ্ণলীলায়) শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতা শ্রীবার্ষভানবীর প্রাণসখী মধুমতী, তিনিই এখন শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর।

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীচিরঞ্জীব সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ পদকর্ত্তৃরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীচিরঞ্জীব সেনের সহিত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অন্তরঙ্গ মৈত্রী ছিল। ইহা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় (১৯৭ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়। 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-প্রণেতা কো-গ্রামবাসী শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শ্রীগুরুদেবের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

শ্রীনরহরিদাস—ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল-প্রভাব যাঁহার।।
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু।।

অসংখ্য জীবেরে দয়া কাতর হৃদয়।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সদা অথির আশয়।।
রাধাকৃষ্ণরসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় বলি' যখন যেমন।।

ক্ষণে রাধাকৃষ্ণরসে নির্ম্মল কীরিতি।
শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ড মাঝে যাঁর অবস্থিতি।।
'নরহরি-চৈতন্য' বলিয়া প্রভুর খ্যাতি।
সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি।।

ক্ষণে কৃষ্ণ, ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে।
রাধাকৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে।।
চৈতন্য-সম্মত পথে সে শুদ্ধবিচার।
অতুল সরস ভাব সব অবতার।।

সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পীরিতি।
সকল সংসারে যাঁর নির্ম্মল কীরিতি।।
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধা-প্রিয়সখী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার।।
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমভাণ্ডারে অধিকারী।।

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড ৬৩৬-৬৪৬)

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত-মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে—গুণের নাহি সীমা।।

(শ্রীভঃ রঃ ২য় তরঙ্গ ২২০)

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়ো
রাসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা।
সেয়ং শ্রীসরকারঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিনঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দমহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ডকে।।

যিনি পূর্ব্বে যূথেশ্বরী-সিদ্ধভাবের অনুসরণে শ্রীবৃন্দাবনবিলাসী শ্রীশ্রীরাধা-ঘনশ্যামের রাসোল্লাসরসগতপ্রাণা রসবতী শ্রীমধুমতী, সেই তিনি এখন শ্রীখণ্ড-প্রদেশে শ্রীগদাধরানুগত্যে প্রেমানন্দের মহাসমুদ্র, প্রেমার্থিগণের প্রেমদাতা শ্রীল সরকার ঠাকুররূপে জয়যুক্ত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোরতিকৃপামাধ্বীকসদ্ভাজনং
সান্দ্রপ্রেমপরম্পরাকবলিতং বাচা প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ডচর্চ্চার্চ্চিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদম্।।

যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচুর কৃপারসের উত্তমপাত্র, যিনি কীর্ত্তনে প্রগাঢ় প্রেমধারায় ভরপুর, যিনি (অন্তরে) প্রেমানন্দে প্রফুল্ল, যিনি শ্রীখণ্ডে বাসস্থান করিয়াছেন ও সর্ব্বদা চন্দনলেপচর্চ্চিত, যিনি (পূর্ব্বে) 'মধুমতী'-সংজ্ঞায় প্রখ্যাত, সেই মহাপ্রেমদাতা কোন অদ্ভুত পুরুষবরকে বন্দনা করি।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রতি বৎসরই শ্রীখণ্ডবাসী ও কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের সহিত শ্রীশিবানন্দ সেনের তত্ত্বাবধানে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গমন করিতেন। ইঁহাদিগকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নানযাত্রা দর্শন, গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর নৃত্য ও কীর্ত্তনে অদ্ভুত দক্ষ ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যে সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দ-মাদলে কীর্ত্তন হইত, তন্মধ্যে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় অন্যতম এবং শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দনই সেই সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্যকারী ছিলেন।

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহা, শ্রীরঘুনন্দন।।

শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র কানাই, কানাইর পুত্র মদনরায়। ইনি শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসিগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠকগণের অবিদিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল মুকুন্দ, তৎপুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ও শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব-স্ব সেবা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
'তোমার কার্য্য,—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন।।
রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন।।
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন-জনে।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩০-১৩২)

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ লোক-চক্ষে রাজবৈদ্যের চাকুরী করিতেন বটে, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব-গৃহস্থবেশে মহাভাগবতবর পরমহংস ছিলেন। ইহা সাধারণ লোক সকল বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজসেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২০)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীখণ্ডবাসিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাশাখারূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাদের গুণগান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বা শ্রীখণ্ডের কোন উল্লেখই করেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা এই যে, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীখণ্ডবাসিগণের বিচার অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের বিচার তাহা নহে। শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যে অসূয়ামূলক কোন

শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত-মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে—গুণের নাহি সীমা।।

(শ্রীভঃ রঃ ২য় তরঙ্গ ২২০)

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়ো
রাসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা।
সেয়ং শ্রীসরকারঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিনঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দমহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ডকে।।

যিনি পূর্ব্বে যূথেশ্বরী-সিদ্ধভাবের অনুসরণে শ্রীবৃন্দাবনবিলাসী শ্রীশ্রীরাধা-ঘনশ্যামের রাসোল্লাসরসগতপ্রাণা রসবতী শ্রীমধুমতী, সেই তিনি এখন শ্রীখণ্ড-প্রদেশে শ্রীগদাধরানুগত্যে প্রেমানন্দের মহাসমুদ্র, প্রেমার্থিগণের প্রেমদাতা শ্রীল ..রকার ঠাকুররূপে জয়যুক্ত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোরতিকৃপামাধ্বীকসদ্ভাজনং
সান্দ্রপ্রেমপরম্পরাকবলিতং বাচা প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ডচর্চ্চার্চ্চিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদম্।।

যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচুর কৃপারসের উত্তমপাত্র, যিনি কীর্ত্তনে প্রগাঢ় প্রেমধারায় ভরপুর, যিনি (অন্তরে) প্রেমানন্দে প্রফুল্ল, যিনি শ্রীখণ্ডে বাসস্থান করিয়াছেন ও সর্ব্বদা চন্দনলেপচর্চ্চিত, যিনি (পূর্ব্বে) 'মধুমতী'-সংজ্ঞায় প্রখ্যাত, সেই মহাপ্রেমদাতা কোন অদ্ভুত পুরুষবরকে বন্দনা করি।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রতি বৎসরই শ্রীখণ্ডবাসী ও কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের সহিত শ্রীশিবানন্দ সেনের তত্ত্বাবধানে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গমন করিতেন। ইঁহাদিগকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নানযাত্রা দর্শন, গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর নৃত্য ও কীর্ত্তনে অদ্ভুত দক্ষ ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যে সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দ-মাদলে কীর্ত্তন হইত, তন্মধ্যে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় অন্যতম এবং শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দনই সেই সম্প্রদায়ের প্রধান নৃত্যকারী ছিলেন।

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহা, শ্রীরঘুনন্দন।।

শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র কানাই, কানাইর পুত্র মদনরায়। ইনি শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসিগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠকগণের অবিদিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল মুকুন্দ, তৎপুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ও শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব-স্ব সেবা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
'তোমার কার্য্য,—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন।।
রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন।।
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন-জনে।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩০-১৩২)

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ লোক-চক্ষে রাজবৈদ্যের চাকুরী করিতেন বটে, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব-গৃহস্থবেশে মহাভাগবতবর পরমহংস ছিলেন। ইহা সাধারণ লোক সকল বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজসেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২০)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীখণ্ডবাসিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাশাখারূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাদের গুণগান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বা শ্রীখণ্ডের কোন উল্লেখই করেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা এই যে, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীখণ্ডবাসিগণের বিচার অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের বিচার তাহা নহে। শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যে অসূয়ামূলক কোন

প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ থাকিতে পারে না। যদি শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত বা শ্রীখণ্ডবাসিগণের সহিত ঐরূপ অপ্রীতিকর ভাব থাকিবে, তাহা হইলে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের একনিষ্ঠ শিষ্য শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র প্রশংসা করিতেন না। যে-গ্রন্থে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই এবং যিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্য প্রিয়পার্ষদের গুণবর্ণনে বিমুখ, সেই শ্রীচৈতন্যভাগবত ও তল্লেখক ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করিতেন না,—

বন্দিব শ্রীবৃন্দাবন দাস একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত-গীতে।।

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড ৩৫)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণের নামোল্লেখ নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নামোল্লেখ নাই; কিন্তু শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ও অনেক পরবর্ত্তী কালের রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকরাদিতে আছে। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, কোন অপ্রীতিকর কারণে নির্ম্মৎসর শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণ ঐ সকল শ্রীগৌরপার্ষদের নামোল্লেখ করেন নাই। কোন কোন লেখক ও পদকর্ত্তা পরবর্ত্তী ব্যাস বা গ্রন্থকারগণের জন্য কিছু কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যান। ইহা লীলা-লেখকগণের একটি লীলা-চমৎকারিতা বা বৈশিষ্ট্য। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীগৌরসুন্দরের পরিচয়-বর্ণনে কোন কারণে সেই শ্রীগৌরপার্ষদের নামোল্লেখ না করিলেও ইঙ্গিতে শ্রীল সরকার ঠাকুরের শ্রীগৌরপার্ষদত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি' চামর ঢুলায়।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।৪৫)

এই চামর-ব্যজনকারী শ্রীগৌরপার্ষদই শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বৃহদ্ব্রতীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীঘনশ্যাম দাস 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' লিখিয়াছেন যে, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর স্বয়ং বৃহদ্ব্রতীর

লীলাপ্রদর্শন করিলেও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে অনুরোধ করাইয়া বিবাহ করাইয়াছিলেন (শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ৮৮৩)। ইনি যেরূপ বঙ্গভাষায় ও ব্রজবুলিতে সমধুর পদ রচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ সুললিত ও সহজ সংস্কৃতভাষায়ও ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল সরকার ঠাকুরের রচিত 'শ্রীভজনামৃত' নামক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদৃত। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন,—শ্রীল সরকার ঠাকুর বিরচিত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে গঠিত ৪৯টী শ্লোক-সমন্বিত 'গৌরাঙ্গাষ্টক-মালিকা' নামে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে (বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৪০।১৫-৩৬ পৃঃ ও বঙ্গশ্রী ১৩৪০, ৫৭৪-৫৭৫ পৃঃ)। আবার কেহ কেহ শ্রীল সরকার ঠাকুরকে 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' ও 'ভক্তামৃতাষ্টক' নামক সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা বলিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে স্থাপিত ছয়টি শ্রীবিগ্রহের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীবিগ্রহ শ্রীল সরকার ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচারিত।

শ্রীল সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা ও লীলা সম্বন্ধে যে-সকল পদ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত হইল,—

(১)

শ্রীনবদ্বীপবাসিভক্তগণস্যোক্তিঃ।

আওর গৌর পুনহি নদীয়াপুর
হোয়ত মনহি উলাস।
ঐছে আনন্দকন্দ কিয়ে হেরব
করবহি কীর্ত্তন-বিলাস।।
'হরি হরি' কব হাম হেরব সো মুখচাঁদ।
বিরহ-পয়োধি কবহুঁ দিন পঙরব
টুটব হৃদয়ক বাঁধ।। ধ্রু ।।
কুন্দন-কনক-পাঁতি কব হেরব
যজ্ঞ কি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি' 'হরি হরি' বোলব
নটন ভকতগণ-মাঝ।।

এত কহি' নয়ন মুদি' রহু সব জন
গৌর-প্রেমে ভেল ভোর।
নরহরি দাস-আশ কব পূরব
হেরব গৌরকিশোর।।

(২)

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণবমুখে, আঁখি দেখি' পরতেখে,
না ভজিলাম গোরা-অবতার।।
আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দৈন্যভাব প্রকাশিয়া,
রোদন করয়ে আৰ্ত্তনাদে।
বুঝাইলুঁ অনুক্ষণ, না বুঝে পামর মন,
মলুঁ মলুঁ দারুণ বিষাদে।।
ভাবিতে সে সব সুখ, অন্তরে পরম দুঃখ,
অন্নজল খাঙ কোন্ লাজে।
ও রসে না কৈলুঁ রতি, অভিমানে খাইলুঁ মতি,
কি শেল রহল হৃদি-মাঝে।।
কে আছেন এমন হেন, উদ্ধারে পতিত জন,
পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া।
চিন্তায় আকুল মন, নরহরি অনুক্ষণ,
প্রেমসিন্ধুর উদ্দেশ না পাইয়া।।

(শ্রীপদকল্পতরু)

শ্রীগৌরলীলাত্মক পদ রচনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীল সরকার ঠাকুর শ্রীব্রজলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ আছে। কেহ কেহ শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীরায়শেখর (নামান্তর কবিশেখর বা কবিশেখর রায়) রচিত বলিয়া একটি পদের উল্লেখ করেন,—

গৌরাঙ্গ-জন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী-রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত অনেক পদ কাহারও কাহারও মতে 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, উভয়ের পদই এক ভণিতায় লিখিত। আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীল সরকার ঠাকুরের কিছু কিছু পদ চণ্ডীদাসের ভণিতাতেও চলিতেছে। শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপদামৃতসমূহে শ্রীনরহরি-ভণিতায় কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই।

কোথায়ও কোথায়ও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরলীলার বিষয়ে বঙ্গভাষায় ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে কেহ কেহ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত নিম্নলিখিত পদটী প্রমাণরূপে উল্লেখ করেন,—

গৌরলীলা-দরশনে, ইচ্ছা হয় বড় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি।।
এ-গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ।।
গৌর-গদাধর-লীলা, আর্দ্র করয়ে শিলা,
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন।।
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি',
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।

নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা।।

কেহ কেহ বলেন, "এ-গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে"—এই উক্তির দ্বারা শ্রীল সরকার ঠাকুর ইঙ্গিতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের ভণিতায় কতগুলি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ পদও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তীকালে রচনা করিয়া থাকিবে। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের নামোল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তীকালে গৌরনাগরীবাদ সমর্থন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর কোনদিন গৌর-নাগরীবাদের প্রচার করেন নাই। তাঁহার 'শ্রীভজনামৃত' নামক সিদ্ধান্তগ্রন্থই ইহার প্রমাণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১০ম ও ১১শ বর্ষে (১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দ) উক্ত 'শ্রীভজনামৃত'-গ্রন্থ আস্বাদবিস্তারিণী-ভাষাটীকার সহিত প্রকাশ করেন। 'শ্রীভজনামৃতে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আস্বাদবিস্তারিণী-ভাষা-টীকার সহিত নিম্নে প্রকাশিত হইল। 'শ্রীভজনামৃতে' ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সম্পূটিত রহিয়াছে।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রাণসর্ব্বস্বমীশ্বরম্।
সর্ব্বাবতারকরুণা-নিঃসীমকরুণং প্রভুম্।। ১।।
শুকদেবং নমস্যামি ভক্তিশাখামহাফলম্।
বিহরন্তং কৃষ্ণরসপ্রেমসিন্ধৌ জড়ং মুনিম্।। ২।।
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংবৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি।। ৩।।
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতর-মধ্যমাঃ।। ৪।।
পূর্ব্বপক্ষ-সহস্রাণি করিষ্যন্তি জনে জনে।
তেষাং প্রভোর্ধ্যানবলাৎ সিদ্ধান্তানতিনির্ম্মলান্।। ৫।।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ব্যাসেন চ মহাত্মনাম্।
কৃত্যান্ পরমহংসানাং সর্ব্বশাস্ত্রবিচারিতান্।। ৬।।

দাসো নরহরির্মূর্খঃ সিদ্ধান্তানতিদুষ্করান্।
কথং কুর্য্যাদিতি মৃষা বিতর্কং মা কৃথা বুধাঃ।। ৭।।
নির্গুণঃ সগুণো বাপি মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
কৃষ্ণভক্তিবিচারেঽস্মিন্ কঃ সমর্থোঽস্তি ভূতলে।। ৮।।
অকস্মান্নিদ্রিতঃ স্বপ্নে কথয়ামি কথামিমাম্।
পূর্ব্বপক্ষাংশ্চ সিদ্ধান্তাংস্তত্রৈব বিমৃষাম্যহম্।। ৯।।
হৃদি প্রসন্নতা জাতা সুধাসিন্ধুমিবাশ্রিতঃ।
সময়েঽস্মিন্ গৌরচন্দ্রঃ প্রাদুরাসীৎ স্মিতাননঃ।। ১০।।
সার্ব্বভৌমকরালম্বী সাধু সাধ্বিতি সম্মুখে।
এবমেবং যদ্ব্রব্যষি জাগৃহীতি ব্রুবন্ যযৌ।। ১১।।
তত উত্থায় শয্যায়াং ধ্যাত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
আত্মানং দুর্গতং শোচ্যং ত্যক্ততচ্চরণাম্বুজম্।। ১২।।
মেনে ধন্যমিবাত্মানং প্রভোঃ সকরুণং বচঃ।
স্মৃত্বা চ মহদৈশ্বর্য্যং ন জানে কিমভূত্তদা।। ১৩।।

তেনৈককারুণ্যবলেন চিত্তে
বভূব কর্ত্তুং রচনং সুবুদ্ধিঃ।
বিমৃষ্য গদ্যেন চ কোমলেন
মূর্খেণ ধন্যং ভজনামৃতং কৃতম্।। ১৪।।
যে যে মহান্তঃ কিল হংসভূতা
জগৎপবিত্রীকরণার্থমাগতাঃ।
তে তে তদুচ্ছিষ্টনিষেবিণো মে
কর্ত্তুং বিশুদ্ধং রচনং প্রবীণাঃ।। ১৫।।

আস্বাদবিস্তারিণী-ভাষা-টীকা। শ্রীচৈতন্যচরণকমল-ভৃঙ্গায় শ্রীখণ্ডবাসি-শ্রীনরহরিসরকারঠক্কুরায় নমঃ।।

সর্ব্বাবতারকরুণাপেক্ষা অসীমকরুণাময় মহাপ্রভু, পরমেশ্বর ও আমার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।। ১।। শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের

ভক্তিশাখার মহাফলস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসসমুদ্রে জড়বন্মগ্নপ্রায় বিহারকারী শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি।। ২।। এই কলিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের ও শ্রীনিত্যানন্দের অবতার গুপ্ত হইলে বৈষ্ণবগণ সদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন এবং উত্তম, কনিষ্ঠ, মধ্যম লোকসকল কালে কালে দিনে দিনে সন্দিগ্ধহৃদয়-প্রায় হইয়া পড়িবেন।। ৩।। অনেকে সময়ে সময়ে অনেক প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া বৈষ্ণবদিগকে ব্যস্ত করিবেন। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ ভক্ত-হৃদয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে না; কিন্তু তার্কিক ও সন্দিহান ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার তর্কাশ্রয় করিয়া তাঁহাদের চিত্তের শান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং তাহা নিবারণ করাই উচিত।। ৪।। প্রভুর ধ্যানবলে, অতি নির্ম্মল সিদ্ধান্তসকল দুষ্কর হইলেও সমাস অর্থাৎ সংক্ষেপে এবং ব্যাস অর্থাৎ বিস্তারপূর্ব্বক আমি খণ্ডবাসী মূর্খ দাস নরহরি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। মহাত্মা বৈষ্ণবগণেরই এই সকল সিদ্ধান্ত, ইহাতে সর্ব্বশাস্ত্র-বিচারিত পরমহংসগণের কৃত্য-সকল নির্ণীত হইয়াছে।। ৫-৬।। হে পণ্ডিতগণ! মূর্খ নরহরি এরূপ গূঢ় বিষয়ে কিরূপে বিচার করিতে যোগ্য হইবে—এরূপ বৃথা তর্ক করিবেন না; কেননা ইহলোকে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিচারে নির্গুণ বা সগুণ, মূর্খ বা পণ্ডিত—কেহই সমর্থ হন না। সেই শ্রীগৌরকৃপাবলেই আমি এই সকল সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিব।। ৭-৮।।

কৃপার প্রকার বলিতেছেন। আমি নিদ্রিত ছিলাম। না জানি, কি কারণে আমি স্বপ্ন দর্শন করতঃ এই সকল পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত বিচারপূর্ব্বক বলিতেছিলাম। সেই সময়ে অকস্মাৎ স্বপ্নে হৃদয়ে প্রসন্নতা জন্মিল, যেন আমি সুধাসিন্ধু আশ্রয় করিয়াছি। মধুর হাস্যের সহিত শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীসার্ব্বভৌমের কর অবলম্বন-পূর্ব্বক আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন,—"ওহে নরহরি! তুমি উত্তম সিদ্ধান্ত করিতেছ। যাহা যাহা স্বপ্নে বলিতেছ, তাহা জাগ্রত হইয়া প্রকাশ কর।" এই বলিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র অদর্শন হইলেন।। ৯-১১।।

সেই সময় আমি শয্যা হইতে উঠিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধ্যান করিলাম। শ্রীচরণের অদর্শনে আপনাকে শোচ্য জ্ঞান করিলাম। কিন্তু ক্ষণমাত্র দর্শনপ্রযুক্ত আপনাকে ধন্য বলিয়া মানিলাম। প্রভুর সকরুণ বাক্য ও মহদৈশ্বর্য্য স্মরণপূর্ব্বক আমার সে সময় যে দশা হইল, তাহা আমি জানি না।। ১২-১৩।। সেই কারুণ্য-বলেই আমি মূর্খ হইয়াও কোমল-গদ্যভাষায় বিচারপূর্ব্বক এই 'ভজনামৃত' রচনা করিলাম। এস্থলে কোমল-ভাষায় রচনার কারণ এই যে, কঠিন সংস্কৃতে রচনা

করিলে সাধারণের বোধগম্য হয় না। শ্রীনরহরি ঠাকুর আপনার দৈন্য প্রকাশ করিলেও সরস্বতী তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। শ্রীল নরহরি একজন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত ছিলেন। বালকের ন্যায় সরল সংস্কৃত রচনা করিয়া সকলের উপকার ও নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন।। ১৪।। পরমহংস মহান্তসকল জগৎ পবিত্র করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রসাদসেবী আমি। তাঁহারা আমার রচনাকে বিশুদ্ধ করিতে প্রবীণ।। ১৫।।

'শ্রীভজনামৃত'-গ্রন্থের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ভাষা-টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রকট হইয়া স্বীয় জনগণসঙ্গে শুদ্ধভক্তি শিক্ষাষ্টকাদি দ্বারা প্রচার করিয়া জগতে বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে সেই অপূর্ব্ব শুদ্ধধর্ম্ম প্রাকৃত ব্যক্তিগণদ্বারা দূষিত হইয়া অন্যাকারে প্রচারিত হইতে লাগিল। শ্রীমহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল সরকার ঠাকুর সেই ঘটনায় দুঃখ-প্রাপ্ত হইয়া এই 'ভজনামৃত' গ্রন্থ প্রভুর আদেশক্রমে রচনা করেন। তাঁহার ভজনশিক্ষা এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বময় চরিত্রের দ্বারা ও শিক্ষাষ্টক দ্বারা যে শ্রীহরিনাম-প্রণালী জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই জীবের (বিশেষতঃ কলিজীবের) একমাত্র ভজন। সাধুগুরু আশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিরপরাধে সেই নামরস ভজন করিবে। ভজনের ক্রমও শিক্ষাষ্টক ও উপদেশামৃতাদিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভজন-সাধন-সময়ে যেরূপ সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিবার বিধি আছে, তাহা স্পষ্টরূপে এই গ্রন্থে বলিলেন। স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ—এই তিন অবস্থাক্রমে অধিকার অনুসারে ভজন দ্বারা উন্নতি হয়। অপরাধ-ত্যাগের জন্য সাধুসঙ্গ এবং অন্যসঙ্গ-ত্যাগ যেরূপে করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখাইলেন। নাম-ভজনে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-চরিতগত রসের আশ্রয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবতার অপ্রকট হইলে যে-সকল বঞ্চনা জগতে উদিত হইবে, তাহাতে সাধকের নিশ্চয় পতন হইবে। সেই সকল বঞ্চনা হইতে ভজন-প্রয়াসীর সতর্ক হওয়াও ভজনাঙ্গ, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। শিক্ষাষ্টকামৃতে যাহা কিছু বাকি ছিল বা অস্ফুট ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই 'ভজনামৃত'-গ্রন্থখানি ভজনপ্রয়াসিগণের কণ্ঠহার-স্বরূপ।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর যেরূপ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলার সহিত নিত্য গীত হন, শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরও সেইরূপ শ্রীগৌরলীলার নিত্য সহচররূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌর-আরতির মধ্যে এই পদ গাহিয়াছেন,—

নরহরি আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসুঘোষ আদি গায়।।

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ উভয়-গণেই গণিত।

অতএব দুইগণে দুঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৫)

অর্থাৎ যেরূপ শ্রীল অভিরাম ঠাকুর ও শ্রীল দাস-গদাধর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়-গণে গণিত, সেইরূপ শ্রীল মাধব ঘোষ ও শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরও উভয়-গণে গণিত। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের অন্য দুই ভ্রাতা শ্রীল গোবিন্দঘোষ ও শ্রীমাধবঘোষ ঠাকুরও পরমপ্রণয়ী শ্রীগৌরভক্ত ছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর।।
যাহারে কহেন—"বৃন্দাবনের গায়ন"।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাপ্রিয়তম।।
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেবে—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৫৭-২৫৯)

শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের বর্ণানুসারে শ্রীমাধবঘোষ ঠাকুর শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর মহাপ্রিয়তম এবং "বৃন্দাবনের গায়ক" বলিয়া অভিহিত ছিলেন। ইঁহাদের কীর্ত্তনে স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ

'গৌড়ীয়'-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমাধব, শ্রীবাসুদেব ও শ্রীগোবিন্দ—ইঁহারা শ্রীব্রজের মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহের কায়ব্যূহ।"

শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অতি প্রিয়তম শ্রীগোপীনাথ অদ্যাপি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দাঁইহাট ও পাটুলির নিকটে অগ্রদ্বীপে বর্ত্তমান এবং এরূপ শুনা যায় যে, শ্রীগোপীনাথ পিতৃশ্রাদ্ধরত সন্তানের ন্যায় ভক্তের অপ্রকট-তিথিতে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের তত্ত্বাবধানে এই সেবা চলিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের বারদোলের সময় অপর এগারটী শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীগোপীনাথও কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আনীত হন এবং দোলের পরে পুনরায় অগ্রদ্বীপে গমন করেন।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরকে যথাক্রমে শ্রীব্রজের 'কলাবতী', 'রসোল্লাসা' ও 'গুণতুঙ্গা' সখী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কলাবতী-রসোল্লাসা-গুণতুঙ্গা ব্রজে স্থিতাঃ।
শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্য তা মতাঃ।।
গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবো যথাক্রমম্।

(শ্রীগৌরঃ গঃ ১৮৮ শ্লোক)

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল বাসুদেব ঘোষের মাতুলালয় শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামে ছিল। কোন কারণে শ্রীবাসুদেব ঘোষের পিতা কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন। পরে তথা হইতে তিন ভ্রাতাই শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলার পর প্রভুর বিরহে ব্যথিত হইয়া শ্রীমাধবঘোষ দাঞীহাটায় ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ তমলুকে (?) যাইয়া বাস করেন। ইনি শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুসরণে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃতপানে।
পদ্যে প্রকাশিব বলি' ইচ্ছা কৈল মনে।।

শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে—গুণের নাহি সীমা।।"

(পদসমুদ্র)

ইঁহারা তিন ভ্রাতাই পদকর্ত্তা ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে পদকর্ত্তা হিসাবে শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরই অধিক বিখ্যাত। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীগোবিন্দঘোষ ঠাকুর ও শ্রীমাধবঘোষ ঠাকুরের পদের সংখ্যা অধিক পাওয়া যায় না। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের যে সকল পদ পাওয়া যায়, তাহা সবই শ্রীগৌর-বিষয়ক। তাঁহার পদসমূহ অতিশয় সরল, সুমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। এই জন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।১৯)

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়ে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণে সত্য সত্যই কাষ্ঠ-পাষাণও দ্রবীভূত হয়। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথের আঙ্গিনায় শিশুরূপী শ্রীবিশ্বম্ভরের অভূতপূর্ব্ব নৃত্যলীলা শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের পদে অপরূপ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।।
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে,—'বিশ্বম্ভর, আমি না দেখিনু'।।
'মায়ের অঞ্চল ধরি' চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি' হয় জগ-মনোলোভা।।

নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্বন্ধে আরও কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইল,—

(১)

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন।।
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
নদীয়ানগরে দণ্ডকমণ্ডলু-কর।।
কেহো বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব-লীলা প্রকাশ করিলা।।
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা-অবতার।
'হরে কৃষ্ণ' নাম গৌর করিলা প্রচার।।
বাসুদেব ঘোষ বলে করি' যোড় হাত।
সেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ।।

(২)

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গচাঁদ পরাণ আমার।।
বিষ্ণু-অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব শুক নারদ লইয়া জনা চারি।।
সেতুবন্ধ কৈলা তুমি রাম-অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে।।
কলিযুগে কীর্ত্তন করিয়া সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ।।
কিবা গুণে পুরুষ নাচে, কিবা গুণে নারী।
গোরা-গুণে মাতিল ভুবন দশ-চারি।।
না জানিয়ে জপ তপ এ বেদ-বিচার।
কহে বাসু,—গৌরাঙ্গ, মোরে কর পার।।

'নদীয়ানগরে দণ্ডকমণ্ডলু-ধর', 'শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা-অবতার'—এই সকল উক্তি দ্বারা নদীয়ানাগরী ও গৌরনাগরী মত সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের একটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

সিন্ধুড়া

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীবের চির পুণ্যফলে, বিহি আনি' মিলাইলে,
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু।। ধ্রু ।।
দিগ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহুঁ গোরারায়,
ধরণীতে পড়ে মূরছিয়া।
প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইরে করি' কোলে,
কান্দে চাঁদ-বদন হেরিয়া।।
নব-কঞ্জারুণ আঁখি, প্রেমে ছল ছল দেখি',
সুমেরু বাহিয়া মন্দাকিনী।
মেঘ-গভীর-স্বরে, 'ভাই ভাই' রব করে,
পদভরে কম্পিত মেদিনী।।
নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমাশ্রয়,
হেন দয়া জগতে বিদিত।
নিজ-নাম-সংকীর্ত্তনে, উদ্ধারিলা জগ-জনে,
বাসু কেনে হইল বঞ্চিত।।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের পদাবলীতে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বহু গৌরনাগরী-পদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কখনই বিপ্রলম্ভরসিক শ্রীগৌরভক্ত শ্রীল বাসুদেবের পদ নহে বা হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ সতর্কতার সহিত ঐগুলি বর্জ্জন করিবেন। শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীরথাকর্ষণকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যে সাতটী সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতেন, তন্মধ্যে একটিতে

শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর প্রমুখ তিন ভ্রাতা মূলগায়করূপে কীর্ত্তন করিতেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহার নর্ত্তক হইতেন।

গোবিন্দ-ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাহাঁ গায়।।
মাধব, বাসুদেব ঘোষ,—দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।৪২-৪৩)

প্রতি বৎসরই শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর প্রভৃতি তিন ভ্রাতা শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনানন্দ বর্দ্ধন করিতেন। গৌড়ে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নর্ত্তনে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীবাসুঘোষ ও শ্রীমাধব শ্রীনিত্যানন্দের সেবা করিতেন।

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর-বৃন্দাবন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৩৩)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময়।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।৩১)

বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট-থানা ও কৈচর-ডাকঘরের অন্তর্গত শীতলগ্রাম। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া-লাইট্ রেলে কাটোয়া এবং তথা হইতে ৯ মাইল দূরে কৈচর-ষ্টেশন। ইহারই এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে শীতলগ্রাম অবস্থিত। এই শীতলগ্রামেই শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত আবির্ভাব-ভূমি চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। ইনি তথা হইতে শীতলগ্রামে ও সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেন। এরূপ কথিত হয় যে, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তন-বিলাস করিয়া শীতলগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন এবং তথা হইতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান মেমারী-ষ্টেশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক তথায় সহযাত্রী শিষ্যকে সেবাপ্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। এজন্য সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামকেও লোকে 'শ্রীল ধনঞ্জয়ের পাট' বলিয়া থাকেন। কিন্তু অধুনা এই গ্রামে শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শনই নাই। বস্তুতঃ শীতলগ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত জলন্দি-গ্রামে দেবসেবা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতল-গ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা প্রকাশ করেন। বহুকাল পূর্ব্বে

'বাজারবন কাবাশী' গ্রামের মল্লিক বাবুরা শ্রীবিগ্রহের একটি পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান। প্রবেশপথে বামদিকে একটি তুলসী-বেদী,—উহাই শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। পশ্চিমদ্বারী গৃহমধ্যে শ্রীল ধনঞ্জয়-সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর ও শ্রীদামোদর-বিগ্রহ আছেন। শুনা যায়, শ্রীল ধনঞ্জয়ের বংশ নাই। শ্রীসঞ্জয় নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম—শ্রীরামকানাই ঠাকুর। শ্রীসঞ্জয়ের শ্রীপাট—বর্দ্ধমান জেলার প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বে লোকনগর ডাকঘরের অন্তর্গত জলন্দি গ্রামে। ঐ স্থানে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা আছে। বর্ত্তমান বোলপুরের অতি নিকটে মুলুকগ্রামে উক্ত রামকানাইয়ের শ্রীপাট। কেহ কেহ বলেন, সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। শীতল-গ্রামে এক্ষণে যাঁহারা সেবাইত আছেন, তাঁহারা শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর। শ্রীল ধনঞ্জয়-শিষ্য শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্থাপিত প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর-জীউ এক্ষণে শ্রীগোপাল রায় চৌধুরীর ভবনে আছেন।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্যপ্রিয়পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁ'র স্মরণেই মাত্র।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৬৯)

আষাঢ়ী কৃষ্ণা পঞ্চমী শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি। সেই পতিত-পাবনী তিথিতে আমরা শ্রীশ্রীরূপানুগসাধুজনের আনুগত্যে শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর শ্রীনাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা কীর্ত্তন-মুখে স্মরণ করিয়া পবিত্র হইবার আশা পোষণ করিতেছি।

শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু পতিতগণের প্রতি অহৈতুক-কৃপাময় বা ভক্তজনে মৈত্রী-লীলা-প্রকটকারী। জগাই-মাধাই-এর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকালে, কাজীদলনকালে নগর-কীর্ত্তনে এবং শ্রীশ্রীধরের প্রতি ও রামকেলিতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রকাশলীলাকালে শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত এক সময় অহৈতুকী কৃপা করিয়া কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে গমন করেন। দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ইঁহার পাঠকালে শ্রীবাসপণ্ডিত প্রেমে আপ্লুত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে দেবানন্দের পাষণ্ডী ছাত্রগণ শ্রীবাসকে সাধারণ-শ্রেণীর ভাবুক মনে করিয়া তাড়না করে। বহু দিন পরে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ পথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে ক্রোধাবেশে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিল না। এইরূপ দেবানন্দের প্রতিও অহৈতুকী কৃপা বিতরণপূর্ব্বক বৈষ্ণবের 'পতিতপাবন'-নামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিবার জন্য শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু একদিন অকস্মাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। 'ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তিধর' বৈষ্ণবতেজঃ-পুঞ্জময়-শরীরধারী শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামীকে দর্শন করিয়া দেবানন্দের হৃদয় বিগলিত হইল। দেবানন্দ অকৈতব প্রীতির সহিত শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সেবা করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীল বক্রেশ্বর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন,

সেই সময় দেবানন্দ হস্তে একটি বেত্র গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্যান্য ব্যক্তিগণকে দূরে রাখিয়া শ্রীবক্রেশ্বরের প্রেম-নৃত্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। যখন শ্রীল বক্রেশ্বর প্রেমাবেশে ভূতলে পতিত হইলেন, তখন দেবানন্দ শ্রীল বক্রেশ্বরকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বরের শ্রীঅঙ্গের ধূলি বিশেষ যত্নের সহিত দেবানন্দ স্বীয় অঙ্গে লেপন করিয়াছিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বরের সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দের সমস্ত অপরাধ বিদূরিত হইল—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুতে তাঁহার বিশ্বাস হইল। শ্রীল বক্রেশ্বরের সদ্‌গুণে দেবানন্দের শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য অনুরাগ হইল। দেবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইয়া অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ।।
প্রভু বলে,—"তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর।।"
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি।।
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন, নাচিতে বক্রেশ্বর।।
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেইস্থান সর্ব্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৯২-৪৯৬)

দেবানন্দের প্রতি শ্রীল বক্রেশ্বরের কৃপা-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিব্যাখ্যা করিবার জন্য কৃপোপদেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৭)

শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত পুর্ব্বে শ্রীধাম-নবদ্বীপবাসী ছিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলায় তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে নিত্য নৃত্য ও প্রভুর সেবা করিবার লোভে পুরীতে স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন।

পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর।।
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস।।
ইত্যাদিক প্রভুসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি' প্রভুর করেন সেবন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১২৫-১২৭)

শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু শ্রীক্ষেত্রসন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে শ্রীল বক্রেশ্বর প্রমুখ যে-সকল ভক্ত নিত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অন্যত্র জানাইয়াছিলেন,—

পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর হরিদাস।।
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর।।
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।২৫২-২৫৪)

নীলাচলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজপুরোহিত শ্রীকাশী মিশ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। কথিত হয় যে, পরে সেইস্থান শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত লাভ করেন এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় তথায় "শ্রীশ্রীরাধাকান্তবিগ্রহ" স্থাপিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর নৃত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বক্রেশ্বর-পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁ'র নৃত্য।।
আপনে মহাপ্রভু গান যাঁ'র নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে।।
"দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ, চন্দ্রমুখ!
তা'রা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ।।"
প্রভু বলেন, "তুমি মোর পক্ষ—এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১৭-২০)

নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনের যে চারিটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের চারিজন নৃত্যকারী মহান্তের অন্যতম ছিলেন—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত। অন্য তিনজন মহান্ত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস।

* * *

চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা।
এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়ে।
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়ে।।
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর।।
মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দরশন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন।।
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।
সবে কহে,—"প্রভু করে আমারে দরশন।।"
চারিজনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।২২৬-২৩১)

রথযাত্রার সময় যে চারিটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভাগ করিয়া দিতেন, তাহাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবক্রেশ্বরকে এক সম্প্রদায়ের প্রধান নর্ত্তক করিতেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ যে সম্প্রদায়ের মূল-গায়ক হইতেন, শ্রীল বক্রেশ্বর সেই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপ্ত-সম্প্রদায়ে নিজগণকে বিভক্ত করিয়া 'বেড়া'-সংকীর্ত্তন করিতেন। উক্ত সাত সম্প্রদায়ে সাতজন নৃত্য করিতেন; তন্মধ্যে শ্রীল বক্রেশ্বর এক সম্প্রদায়ের প্রধান নর্ত্তক ছিলেন। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য নির্য্যাণলীলার প্রাক্কালে শ্রীহরিদাসের অঙ্গনে আসিয়া মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত তথায় প্রধান নর্ত্তক ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ঠাকুর হরিদাসকে সমুদ্রোপকূলে কীর্ত্তনমুখে সমাধিপ্রদান করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিয়াছিলেন। কখনও কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল বক্রেশ্বরের নৃত্যে স্বয়ং কীর্ত্তন করিতেন এবং শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-প্রমুখ গায়কগণ তাঁহার দোহার করিতেন।

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে।।
প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৪।১০০-১০১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সেই সময় পণ্ডিত বক্রেশ্বর মহাপ্রভুর সঙ্গিগণের অন্যতম ছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে ভিক্ষা করাইতেন।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুকে 'বিষ্ণুতত্ত্ব' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন,—

ব্যূহস্তূর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বর-পণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজ-নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ।।

* * *

স্বপ্রকাশ-বিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ।।

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—৭১, ৭৩)

যিনি চতুর্ব্ব্যূহ-অনিরুদ্ধ, তিনি শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। ইনি শ্রীকৃষ্ণাবেশজনিত নৃত্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখোৎপাদন করিতেন। স্বপ্রকাশ-ভেদে শশিরেখা ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভুকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুইভাগে কড়চা রচনা করেন। একভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর কণ্ঠে অন্তঃপন্থা সমর্পণ করিয়াছেন; তাহাই শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু তাঁহার গ্রন্থে সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' ও 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে' তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীমদ্ বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুকে বহিঃপন্থা অর্পণ করেন। শ্রীল বক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু শিষ্য-পারম্পর্য্যে সেই ধন বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু-রচিত 'স্মরণক্রমপদ্ধতি' বা 'সেবাস্মরণপদ্ধতি' এবং শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের রচিত 'শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি' শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নিকট পরিচিত। উভয় 'পদ্ধতি'-গ্রন্থেই ভজন ও অর্চ্চনের পদ্ধতি মন্ত্রাদির সহিত লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া সাধারণ্যে এই গ্রন্থ-প্রচার বিশেষ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীধ্যানচন্দ্রের 'পদ্ধতি'-গ্রন্থ দৃষ্টে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে অর্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণরস-প্রকাশনপরং গানাবলীভূষিতং
বৃন্দারণ্যসুখ-প্রচারজনিতং স্তম্ভাদিভাবান্বিতম্।
শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভো রসমিলন্নৃত্যাবতারাঙ্কুরং
শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিতং দ্বিজবরং চৈতন্যভক্তং ভজে।।
নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা।
বিপ্রলব্ধাত্বমাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা।।

*   *   * অসৌ গৌররসে পুনঃ।
বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতিমাপন্না হি কলৌ যুগে।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর-রসের প্রচার-বিষয়ে সর্ব্বদা তৎপর, শ্রীগৌরবিহিত গীতদ্বারা (যাঁহার শ্রীবদন) অলঙ্কৃত, শ্রীবৃন্দাবনের বিশ্রম্ভসেবাসুখ-আবেশহেতু স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক-ভাবাবিষ্ট, শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-রসাবেশে আদি-নৃত্যাবতার, বিপ্র-শ্রেষ্ঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতকে আমি ভজনা করি। শ্রীব্রজে অতীব উল্লাসে নিত্য অবস্থিত হইয়া শ্রীতুঙ্গবিদ্যা বিপ্রলব্ধা-নায়িকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত থাকেন। * * * ইনি কলিযুগে পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় 'বক্রেশ্বর' এই নামে বিখ্যাত আছেন।

উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত। ইনি সপ্তদশ শক-শতাব্দের শেষভাগে 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়'-নামক এক শ্রীগৌরলীলাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামি

[১]

আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা। সেই তিথিই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য বা শ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌর-সুন্দরের অত্যন্ত মর্ম্মী, তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ, প্রেম-রসের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামি-প্রভু পূর্ব্বাশ্রমে 'শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য'-নামে বিদিত ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনবদ্বীপ-লীলা করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে অবস্থান করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিলে শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য বিরহোন্মত্ত হইয়া শ্রীকাশীধামে গমনপূর্ব্বক 'শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতী' নামক সন্ন্যাস গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা প্রকট করেন। শ্রীচৈতন্যানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যকে বেদান্ত অধ্যয়ন করাইলেন এবং তাহা সমস্ত লোককে অধ্যয়ন করাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা দর্শন করিয়াই শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; কোন প্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কেবল 'নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিব'—এই উদ্দেশ্যেই তিনি বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত-চিত্তে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করেন। এই জন্যই তিনি বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের বিধি-অনুসারে কেবল শিখাসূত্র ত্যাগ করিলেন, কিন্তু উক্ত সন্ন্যাস-বিধির অনুযায়ী যে যোগপট্ট-গ্রহণের প্রকরণ, তাহা স্বীকার করিলেন না। সন্ন্যাসের যোগপট্ট-প্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর 'স্বরূপ'-উপাধির পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসোপাধি 'তীর্থ' হয়। 'স্বরূপ'-উপাধিটি ব্রহ্মচারীর নাম। অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজাহোম, শিখামুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাস-কৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাস নাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-সূচক নাম 'স্বরূপ' রহিয়া গেল। শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামি-প্রভু গীতশাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে নিত্যসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ দক্ষ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের সঙ্গীত-বিদ্যায় ঐরূপ অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে 'দামোদর'-নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর'-নামসহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত

'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'শ্রীদামোদর-স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীত-দামোদর' নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রের একটী মৌলিক গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর গুণবর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

* * *

"প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর।।
'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁ'র নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে।।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।।
'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁ'র আজ্ঞা দিলেন তাঁ'রে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে।।
পরম বিরক্ত তিঁহ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।।
'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে।।
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না দিল, নাম হৈল 'স্বরূপ'।।
গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে বিহ্বলে।।
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে।।
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ।।
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে।।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।।
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান শ্রবণ।।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ।।
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে—বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি।।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম।।”

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১০২-১১৭)

শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীল দামোদর-স্বরূপ শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে আগমন করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক এই শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিলেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ দ্বিতীয়-স্বরূপকে ভূমি হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন ও দুইজনেই দুইজনের অঙ্গ-স্পর্শে প্রেমাবেশে অচেতন

হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে স্থির হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গাঢ় প্রীতিভরে শ্রীদামোদর-স্বরূপকে বলিলেন,—"তুমি যে নীলাচলে আগমন করিবে, ইহা আমি অদ্য স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি। ভালই হইয়াছে; আমি অন্ধ ছিলাম, তোমার আগমনে যেন দুইটি নয়ন পাইলাম।" শ্রীল স্বরূপ বলিলেন,—"প্রভো! আমি তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম, ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার শ্রীচরণে আমার প্রীতির লেশমাত্রও নাই, তাই তোমাকে ছাড়িয়া এই পাপী দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। আমি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই বলিয়াই আমার গলায় কৃপাপাশ বন্ধন করিয়া তোমার শ্রীচরণতলে পুনরায় লইয়া আসিয়াছ।"

শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীস্বরূপকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীপরমানন্দপুরীরও শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকে নির্জ্জনে একটি বাসাঘর প্রদান করিলেন এবং জলাদি-পরিচর্য্যার জন্য একজন সেবক দিলেন।

[২]

শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে শ্রীল স্বরূপের সহিত শ্রীরাম-রায়ের মিলন হইল। রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে শ্রীগৌরপার্ষদগণ যখন নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দামোদর-স্বরূপ ও নিজসেবক শ্রীগোবিন্দকে মালাপ্রসাদ সহ ভক্তগণের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। শ্রীরথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভারতী, শ্রীপুরী ও শ্রীস্বরূপ দামোদরকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা প্রকট করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ জল আনয়ন করিয়া ইঁহাদের সেবার সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনকালে একটি ঘটনা হইল। এক গৌড়ীয়-ভক্ত স্বহস্তস্থিত ঘটের জল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগলে নিক্ষেপ করিয়া সেই শ্রীচরণধৌত জল স্বয়ং পান করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন। যদিও সেই সুবুদ্ধি সরল গৌড়ীয়-ভক্তের শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণামৃত পান করিবার লালসা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু

অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি জগদ্‌গুরু আচার্য্যের লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য বাহ্যে মহারোষ প্রদর্শন করিলেন এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, তোমার গৌড়ীয়-ভক্তের ব্যবহার। শ্রীভগবন্মন্দিরে আমার পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই জল লইয়া পান করিয়াছে। এই সেবাপরাধে (?) আমার কোথায় গতি হইবে! 'তোমার গৌড়ীয়া' আমার এইরূপ দুর্গতি করিল!' তখন শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু সেই গৌড়ীয়-ভক্তের ঘাড়ে হাত দিয়া গুণ্ডিচা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সেই ভক্ত পুনরায় গুণ্ডিচায় প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। 'তোমার গৌড়ীয়া' বাক্যের দ্বারা মহাপ্রভু নিখিল বৈষ্ণব সমাজকে ইহাই জানাইলেন যে, সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবই শ্রীদামোদর-স্বরূপের অধীন; শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু গৌড়ীয়গণের নেতা। এ জন্য তিনি 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েশ্বর' বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিখ্যাত। গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনের পর শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে লইয়া মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীস্বরূপের উচ্চকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন।

স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৪১)

শ্রীরথযাত্রার কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান কীর্ত্তনীয়াই ছিলেন—শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীস্বরূপের গানে শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে 'তাণ্ডব নৃত্য' করিতেন এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্তের ভাবানুযায়ী সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভুর নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমানন্দ বিধান করিত,—

"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি' গেনু।।"

শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু যখন এই ধূয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর সানন্দে মধুর নৃত্য করিতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে শ্রীগৌরসুন্দর

নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, আর সকল ভক্তই শ্রীজগন্নাথাভিমুখী হইয়া নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমহাপ্রভুর নয়ন ও হৃদয় শ্রীজগন্নাথে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি শ্রীহস্তযুগলে গীতের অভিনয় করিতেছেন। শ্রীগৌর যখন পশ্চাতে চলিতেছেন, শ্রীশ্যাম তখন স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আবার শ্রীগৌর যখন অগ্রভাগে চলিতেছেন, তখন শ্রীশ্যাম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্যামসুন্দরকে স্বীয় মনোরথে স্থাপন করিয়াছেন। এই সময় শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতিসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
স চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।।

(কাব্যপ্রকাশে ১ম উঃ, ৪র্থ অঙ্ক-ধৃত, সাহিত্য-দর্পণে
১ম পঃ ও পদ্যাবলীতে ৩৮০ অঙ্ক-ধৃত বচন)

একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর ব্যতীত এই শ্লোকের অর্থ আর কেহই জানেন না। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপের সহিত দিবারাত্র একান্তে বসিয়া এই শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁ'র কায়, বাক্য, মন।।
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হঞা করে গান আস্বাদন।।
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা।।
অঙ্গুলিতে ক্ষত হ'বে জানি' দামোদর।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর।।

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্।।”

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৬৩-৬৭)

শ্রীস্বরূপের কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ভাববৈচিত্র্যসমূহ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইত।

[৩]

শ্রীরথযাত্রার পরে হেরা-পঞ্চমীর দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে গুণ্ডিচায় শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রসবিশেষ শ্রবণের জন্য চিত্ত ধাবিত হইলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীল স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“স্বরূপ! শ্রীজগন্নাথদেব যদিও দ্বারকায় বিহার করেন, তথাপি বৎসরের মধ্যে একবার তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে। শ্রীসুন্দরাচলের উপবনসমূহ শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায়। এ জন্যই শ্রীজগন্নাথদেব বাহ্যে রথযাত্রার ছল করিয়া নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন ও তথায় বিবিধ পুষ্পোদ্যানে অহর্নিশ নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কি জন্য শ্রীলক্ষ্মী-দেবীকে সঙ্গে লইয়া যান না?” শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—“প্রভো! ইহার কারণ শ্রবণ করুন। শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই। এই লীলায় একমাত্র শ্রীব্রজগোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের সহায়। গোপী ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিতে পারেন না।” তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীস্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“যদি লক্ষ্মীদেবীর সেই লীলায় অধিকার না থাকে, তবে তিনি এত রোষ প্রকাশ করেন কেন?” শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—“প্রেমবতীর ইহাই স্বভাব যে, তিনি কান্তের ঔদাস্যলেশও সহ্য করিতে পারেন না। তাহাতে তাঁহার ক্রোধাভিমান হয়।”

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের মধ্যে যখন এইরূপ সংলাপ হইতে-ছিল, তখন সুবর্ণের চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করিয়া ছাত্র, চামর, ধ্বজা, পতাকা, তাম্বূলসম্পূট, ঝারি, নানাবিধ বাদ্য ও দেবদাসীগণের নৃত্য, শত শত দাসী, বহু পরিবার ও ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া ক্রোধাভিমানিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তঃপুর হইতে সিংহদ্বারে বিজয় করিলেন। শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণ শ্রীজগন্নাথের প্রধান প্রধান

সেবককে বন্ধনপূর্ব্বক ঈশ্বরীর সমীপে আনয়ন করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর দাসীগণের ঐরূপ ঔদ্ধত্য দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ মুখে হস্ত প্রদান করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অগ্রণীরূপে শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু বলিলেন,—“এইরূপ মানের প্রকার আমরা ত্রিজগতে আর কোথাও শুনি নাই বা দেখি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহহীনা হন, তিনি ভূষণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মলিনবদনে ভূমিতে বসিয়া নখে যাহা-তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে গোপীগণের এই প্রকার মান এবং পুরবাসিনী সত্যভামারও এইরূপই মানের প্রকার শুনিতে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন!” শ্রীমহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদরকে ব্রজের মানের প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীস্বরূপের মুখে ব্রজের নিগূঢ় প্রেমতত্ত্বসমূহ-শ্রবণের লীলা করিলেন। শ্রীরাধার ভাবব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রীগৌর-সুন্দর আনন্দাবেশে শ্রীস্বরূপকে আলিঙ্গন ও পুনরায় প্রশ্ন করিয়া শ্রীরাধার বিলাসাদি ভাবের বিষয় শ্রবণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদরকে বলিলেন,—“শুন দামোদর, আমার লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি দেখ; ইহা কত বিপুল! আর বৃন্দাবনের সম্পত্তি দেখ; তাহা অতি যৎসামান্য। কেবল পুষ্প, কিশলয়, গিরিধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাফল—এই সব। শ্রীজগন্নাথ ঐরূপ বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য গিয়াছেন শুনিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মনে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; এত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন বৃন্দাবন গেলেন! শ্রীজগন্নাথদেবকে উপহাস করিবার জন্যই লক্ষ্মীদেবী এত ঐশ্বর্য্যের সজ্জাপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণকে বলিতেছেন,—‘তোমাদের ঠাকুরের নির্বুদ্ধিতা দেখ। তিনি এত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পত্রফলমূলের লোভে সুন্দরাচলে গিয়াছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুকে শীঘ্র আমাদের ঈশ্বরীর নিকট আনিয়া দেও।’ এই বলিয়া শ্রীলক্ষ্মীর দাসীগণ শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে বন্ধন ও তাহাদিগকে লক্ষ্মীর নিকট আনিয়া দণ্ডবন্নতি, মিনতি ও ধনদণ্ডাদি করাইতেছেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীস্বরূপ দামোদরকে পরিহাস করিয়া আরও বলিলেন,—“তোমার ঈশ্বরী ও তাঁহার অনুগতা গোপীগণ দুগ্ধ আবর্ত্তন ও

দধিমন্থন করে, আর আমার ঈশ্বরী রত্নসিংহাসনে বসিয়া শত শত দাসদাসী দ্বারা সেবিত হন।” শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস ও শ্রীস্বরূপের স্ব-স্ব-ভজন-বৈশিষ্ট্যের কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীশ্রীবাসকে বলিলেন, —“শ্রীবাস, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর; শ্রীবৃন্দাবনের সম্পত্তি তোমার মনে পড়িতেছে না! মহাবৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য শ্রীবৃন্দাবনের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম—‘শ্রীবৃন্দাবনধাম’। সেই শ্রীবৃন্দাবনে চিন্তামণিময় ভূমি, চিন্ময়রত্নের ভবন, চিন্ময় অলঙ্কার, চিন্ময় পরিচারিকাগণ, চিন্ময় কল্পবৃক্ষলতাকীর্ণ সহজসিদ্ধ বন নিত্য বিরাজিত; তথায় কাহারও ফল-পুষ্প ব্যতীত অন্য কোন ধন-যাচ্ঞার অভিলাষই নাই। ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয় করিয়া তথায় অনন্তকোটি মাধুর্য্যবতী লক্ষ্মী বিরাজমানা; সেই বৃন্দাবনে কান্তা—শ্রীব্রজলক্ষ্মী শ্রীগোপীগণ, কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য, কৃষ্ণ-বংশী প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দজ্যোতিঃ অনুভূত! অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য।”

শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবারসের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপপ্রভুও ব্রজরস-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ‘বল, বল’ বলিয়া শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখের সম্মুখে কান পাতিয়া রাখিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইল।

[৪]

শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য নীলাচলে নিত্য বসতি করিলেন। যমেশ্বর-টোটায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীপুরীগোস্বামী, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকাশীশ্বর—এই সকল ভক্তের সহিত প্রভু শ্রীনীলাচলে বাস করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিতেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি শ্রীস্বরূপ-দামোদরের সখ্য-প্রীতি ছিল। শ্রীবিদ্যানিধি নীলাচলে আগমন করিলে শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণ-কথারঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিজয়া দশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রায় প্রধান সঙ্গী হইলেন—শ্রীপুরী গোস্বামী ও শ্রীস্বরূপ দমোদরপ্রভু। কিন্তু সে-বৎসর প্রভুর আর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না, পুনরায় তিনি নীলাচলে আসিয়া একাকী শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরের বৎসর শ্রীরথযাত্রার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রভুর সঙ্গে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার জনৈক সঙ্গী এক ভৃত্যকে প্রদান করিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ যখন প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া বিরহ-ব্যাকুল-চিত্তে প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-প্রভু সকলকে নিবারণ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীদামোদর-স্বরূপ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুকে শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের নিকট আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন-বার্ত্তা গৌড়ে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চারিত 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটির গূঢ় মর্ম্মার্থ একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুই অবগত ছিলেন। সেই শ্লোকের অনুরূপ ভাব-দ্যোতক পদাবলী গান করিয়া শ্রীল স্বরূপ-দামোদর শ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোষ-বিধান করিতেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই মনোগত ভাব অবলম্বন করিয়া 'যঃ কৌমারহরঃ'-শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক একটি শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া তাহা স্বীয় ভজন-কুটীরের চালাতে রাখিয়া দিলেন। একদিন শ্রীরূপ সমুদ্র-স্নান করিতে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিলেন এবং কুটীরের চালায় শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকটি দেখিয়া পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপকে চাপড় মারিয়া বলিলেন,—

"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে?"

অতঃপর সেই শ্লোক লইয়া শ্রীস্বরূপকে দেখাইলেন এবং অজ্ঞতার ভাণে রহস্যপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপকে শ্রীরূপ-কর্ত্তৃক নিজ মনোভাব-অবগতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"তুমি শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছ, নতুবা তোমার

হৃদয়ের ভাব-দ্যোতক 'যঃ কৌমারহরঃ'-শ্লোকের এই অর্থ কিছুতেই অনুভূতির বিষয় হইতে পারে না। যখন এই শ্লোক দেখিতে পাইলাম, তখনই মনে করিয়াছি —শ্রীরূপ নিশ্চয়ই তোমার কৃপায় অভিষিক্ত হইয়াছে। ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুকে তদ্রচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং"-শ্লোক পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিলেন; কিন্তু শ্রীরূপ সম্ভ্রম-বশতঃ মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপ-কৃত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া সকলের চিত্তকে চমৎকৃত করিলেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।১১৪)

[৫]

শ্রীপুরুষোত্তমে পরম-বৈষ্ণব সুপণ্ডিত শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন। তিনি অত্যন্ত সরল, গোপাবতার ও সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত ছিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সহিত তাঁহার সখ্য-ব্যবহার ছিল। তিনি একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন; কিন্তু তাঁহার পিতা শতানন্দ খাঁন অত্যন্ত বিষয়ী ছিলেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া শ্রীভগবান্ আচার্য্যের নিকট আগমন করিলে শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-প্রভুকে বলিলেন,—"গোপাল কাশী হইতে বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার নিকট শারীরক-ভাষ্য শ্রবণ করি।" ইহাতে আচার্য্যের প্রতি প্রেম-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—

"বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে।।

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে।।
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁ'র।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁ'র।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।৯৪-৯৬)

নিখিল-বৈষ্ণব-জন-গুরু শ্রীদামোদর-স্বরূপ-প্রভু এইরূপ তীব্রভাবে মায়াবাদ মতবাদ গর্হণ করিয়াছিলেন এবং শুদ্ধ কৃষ্ণভজনেচ্ছু ব্যক্তি অসুরমোহনাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-ভাষ্যকে কিরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করিবে, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মায়াবাদ-হলাহল অতিশয় তীব্র। তাহা কোনরূপে কর্ণপুটে প্রবেশ করিলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীভগবান্ আচার্য্য বলিলেন,—"আমাদের কৃষ্ণ-নিষ্ঠ চিত্তকে মায়াবাদ-ভাষ্য কিছুতেই ফিরাইতে পারিবে না।" তাহা শুনিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভু বলিলেন,—

* * "তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে।।
জীব-জ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মনঃপ্রাণ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।৯৮-৯৯)

শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভুর এই কথা শুনিয়া শ্রীভগবান্ আচার্য্য লজ্জা ও ভয় পাইয়া মৌন হইলেন এবং গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

[৬]

যখন শ্রীগৌরসুন্দর জীব-শিক্ষার জন্য নিজ-ভক্ত ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ছোট হরিদাস গভীর দুঃখে তিনদিন উপবাসী ছিলেন, সেই সময়ে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিদাসকে পুনরায় প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন-প্রাপ্তির আশা ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন না পাইয়া ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ করিলে শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু ত্রিবেণীর প্রভাবে ছোট হরিদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব-প্রাপ্তির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-প্রভুকে তাঁহার অন্তরঙ্গ-নিজজন জানিয়া সমস্ত ভক্তি-সিদ্ধান্তের পরীক্ষকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কাব্য—যাহা কিছু কেহ রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইতে আসিতেন, তাহা প্রথমেই সকলকে শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিকট শুনাইতে হইত। শ্রীস্বরূপের অনুমোদন ও তাঁহার নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শুনিতেন। কারণ, কোনপ্রকার রসাভাস বা সিদ্ধান্ত-বিরোধ শ্রীমন্মহাপ্রভু সহ্য করিতে পারিতেন না; তাহাতে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইত; এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিষয়ই পূর্ব্বে শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে শুনাইতে হইবে।

শ্রীভগবান্ আচার্য্যের পরিচিত পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক ব্রাহ্মণ-কবি একটি নাটক রচনা করিয়া প্রথমে সেই নাটক শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে শুনাইলেন। আচার্য্যের সঙ্গে অনেক বৈষ্ণবও সেই নাটক শুনিয়াছিলেন। সকলেই সেই নাটককে 'পরমোত্তম' বলিয়া প্রশংসা করিলেন এবং তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ইহাতে শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর নিকট ঐ কবির কাব্যের প্রশংসা করিয়া প্রথমে শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে ঐ নাটক শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতে শ্রীস্বরূপ-দামোদর বলিলেন,—

* * "তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার।।
'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।।
'রস', 'রসাভাস' যা'র নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার।।
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অহঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার।।
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার!
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার।।

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যা'র হয় প্রাণ-ধন।।
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'।।
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যা'র মুখবন্ধে।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১০১-১০৮)

তথাপি শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভুকে ঐ নাটক শ্রবণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। দুই-তিনদিন অনুরোধ করিবার পর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু নাটক-শ্রবণে সম্মত হইলেন। সমস্ত বৈষ্ণবের সহিত ঐ নাটক-শ্রবণ-কালে কবি যখন নিম্নলিখিত নান্দী-শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদর কবিকে উহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন।

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১১২)

কবি উক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—"শ্রীজগন্নাথদেব সুন্দর-দেহ, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই দেহের দেহী; অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ দারুময়ী প্রতিমা, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রতিমার প্রাণ-স্বরূপ। সহজ জড়বস্তু দারুময়ী শ্রীজগন্নাথ-প্রতিমাকে চেতন করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

এই সিদ্ধান্ত (?) শ্রবণ করিয়া সকল শ্রোতার হৃদয়ই আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!

পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়!
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ-সমান।।
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে তা'র এই গতি!
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'!
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ'।।
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ।।
কাহাঁ পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য' কৃষ্ণ 'মহেশ্বর'।
কাহাঁ 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর'!"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১১৭-১২২, ১২৬)

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীমাধবগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর এইরূপ কৃপাশাসনপূর্ণ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সভাদসদ্গণ স্তম্ভিত হইলেন এবং উক্ত প্রাকৃত কবিরও ইহাতে লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি যেন 'হংসের মধ্যে বকে'র ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন। কবির দুঃখ দেখিয়া শ্রীস্বরূপপ্রভু পরম সদয় হইয়া উক্ত কবির মঙ্গলের জন্য পুনরায় উপদেশ করিলেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ।।
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩৩)

শ্রীস্বরূপ-দামোদরপ্রভু কবির সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ-বিচার নির্দ্দেশ করিয়া পরে মূর্খ ও বিদ্বেষীর কৃষ্ণ-নিন্দোক্তি প্রভৃতি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসেবিকা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-রূপিণী শুদ্ধা সরস্বতী কিরূপে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের নিন্দোক্তি হইতে প্রদর্শন করিলেন। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত বুদ্ধিভ্রষ্ট ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিয়া যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, শুদ্ধা সরস্বতী সেই-সকল শব্দেরও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাপর তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিদ্বেষী জরাসন্ধ ও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে-সকল নিন্দোক্তিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণস্তুতিপর-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর উক্ত কবির রচিত নাটকের নান্দীশ্লোকে ব্যবহৃত শব্দসমূহের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের স্তুতিপর ব্যাখ্যা করিলেন এবং কবিকে বলিলেন,—"তোমার পঠিত অর্থে নিন্দা ও অপরাধ উপস্থিত হয়, কিন্তু শুদ্ধা সরস্বতীর অর্থ শ্রবণ কর। তাহা শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের স্তুতিপর ব্যাখ্যাই করিতেছেন,—

জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ'।
কিন্তু ইহাঁ দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ।।
তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুইরূপ হঞা।।
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা-শক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছেপ্রাপ্তি।।
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার।।
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব-দেশের সব-লোক নারে আসিবার।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা।।
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলুঁ বিবরণ।
এহো ভাগ্য,—তোমার যৈছে করিলা বর্ণন।।

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তা'র 'মুক্তি'র কারণ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১৪৮-১৫৫)

শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর কৃপাদৃষ্টি যাঁহার প্রতি বর্ষিত হয় এবং যে-ব্যক্তি তাঁহার সেই কৃপাশাসনকে অবনত মস্তকে বরণ করেন, তাঁহার মঙ্গল লাভ অবশ্যম্ভাবী, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কবি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েশ্বর প্রভুর কৃপা-শাসন বরণ করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন ও কৃপালাভ করিলেন। তদবধি কবি সমস্ত ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ভক্তসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

[৭]

শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু যখন তাঁহার বিষয়ী পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গ সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগের লীলা প্রদর্শন করিয়া নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরঘুনাথের উৎকণ্ঠা-দর্শনে কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন,—

"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে।।
তিন 'রঘুনাথ'-নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২০২-২০৩)

শ্রীল রঘুনাথ সেই হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলে "স্বরূপের রঘু" বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীস্বরূপের শ্রীপাদপদ্মে একদিন নিজ কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরঘুনাথ অনেক সময়ই শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিজ বক্তব্য নিবেদন করিতেন। শ্রীস্বরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট "শ্রীরঘুনাথের কি কর্ত্তব্য" বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে শ্রীদামোদর-স্বরূপকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার জন্য শ্রীরঘুনাথকে আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন,—

'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব শিখ' ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে।।
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৪)

এই উক্তি দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীদামোদর-স্বরূপ-প্রভুকেই শ্রীমাধব-গৌড়ীয়গণের নিত্যপ্রভু বা গুরু এবং সমগ্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীল দামোদর-স্বরূপের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গসেবা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"মনে মনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই 'অন্তরঙ্গসেবা'। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী প্রভু শ্রীব্রজলীলায় শ্রীললিতাদেবী। তাঁহার গণ-মধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীদাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজসেবা করিতেন।"

শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিরূপে অনুভব করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক-সেবা করিতেন। শ্রীস্বরূপের অনুরোধক্রমে শ্রীরঘুনাথ সেই শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবিন্দ-প্রদত্ত সন্দেশ সমর্পণ করিলেন। যে-সকল মহাপ্রসাদান্ন অবিক্রীত অবস্থায় থাকিয়া পর্য্যুষিত হইয়া যাইত, পসারিগণ সেই প্রসাদান্ন সিংহদ্বারে গাভীগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিত। তৈলঙ্গী গাভীগণও দুর্গন্ধে যাহা ভক্ষণ করিতে পারিত না, সেই পর্য্যুষিত ও কর্দ্দমাক্ত মহাপ্রসাদান্ন রাত্রিকালে ঘরে আনয়ন করিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-উচ্ছিষ্ট চিদ্‌বস্তু-জ্ঞানে শ্রীরঘুনাথ প্রত্যহ গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর-প্রভু শ্রীরঘুনাথকে উহা ভোজন করিতে দেখিয়া তাহা যাচ্ঞা করিয়া লইয়া ভোজন করিলেন,—

স্বরূপ কহে,—"ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি।
আমা-সবায় নাহি দেহ',—কি তোমার প্রকৃতি?"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৩২০)

শ্রীগোবিন্দের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও একদিন—
"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?"

—এই বলিয়া এক গ্রাস গ্রহণ করিলেন; তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদর-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্ত ধারণ করত নিবারণপূর্ব্বক "তোমার ইহা যোগ্য নহে" বলিয়া দ্বিতীয় গ্রাস প্রভুর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। এই আদর্শের দ্বারা শ্রীমাধব-

গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণপ্রীতির জন্য বৈরাগ্য-আচরণের অভ্যাস থাকিলেও শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিদ্-উপকরণের দ্বারাই সেবা করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে বৈরাগ্য অভ্যাস করাইতে হইবে না কিংবা শ্রীএকাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে উপবাসী রাখিতে হইবে না অথবা তাঁহারা প্রকট-লীলায় লোকশিক্ষাকল্পে যে-সকল বৈরাগ্যের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপভাবে তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে না; তাহা করিলে মহা-পাষণ্ডিত্ব ও অপরাধের উদ্ভব হইবে,—ইহাই শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য।

শ্রীনীলাচলে শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপনপূর্ব্বক ভক্তগণেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীদামোদর-স্বরূপের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—

"দামোদর-স্বরূপ—প্রেমরস-মূর্ত্তিমান্।
যাঁ'র সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান।।
'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য',—এই তা'র চিহ্ন।।
সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—'আমি তোমার ঋণী'।।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব—প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান।।
তেঁহ যাঁ'র পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলুঁ এ সব শিক্ষণ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৭।৩৮-৩৯, ৪২, ৪৪-৪৫)

শ্রীবল্লভভট্টের প্রতি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রীতি উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে কৃত্রিম ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীগদাধরের প্রেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীগদাধর ভীত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণের দ্বারা সন্ত্রস্ত শ্রীগদাধরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীগদাধরকে বলিলেন,—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাকে ঐরূপ উপেক্ষা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি কেন প্রভুর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বল নাই, ভীতপ্রায় হইয়া সকল সহ্য করিয়াছ?" শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রিয়তম প্রভুর সর্ব্ববিধ স্নেহ-অত্যাচার সহ্য করাই কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীস্বরূপকে জানাইলেন।

[৮]

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও কোনরূপ অপরাধজনক বিচার ও আচার সহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভক্তের সাময়িক ত্রুটী-বিচ্যুতির প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণ বা ভক্তগণের আবদার রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট যত্নাগ্রহের আদর্শ তাঁহাতে দৃষ্ট হইত। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণের জন্য চেষ্টা তথা শ্রীল রামরায়ের স্বজনরক্ষার্থ শ্রীমহাপ্রভুর ঔদাসীন্য-পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ, শ্রীজগদানন্দের হৃদয়ে দুঃখ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীল জগদানন্দ-প্রদত্ত শয্যায় শয়ন করাইবার চেষ্টা প্রভৃতি শ্রীমাধবগৌড়ীয়েশ্বরের মহোদার হৃদয় ও ভক্ত-পক্ষপাতিত্বের সাক্ষ্য দান করে।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে সাত-সম্প্রদায়ে 'বেড়া'-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুর স্বয়ং নৃত্য করিবার অভিলাষ হইলে শ্রীল স্বরূপ-দামোদরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী উৎকল-সঙ্গীতের পদ গান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

"জগমোহন পরি মুণ্ডা যাউ"

—এই কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত সাত্ত্বিকবিকারসমূহ প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাতে নির্যাণলীলা প্রকট করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবকগণের অগ্রগণ্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনির্যাণোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীল হরিদাসের নির্যাণোৎসবের জন্য পসারিগণের নিকট 'আঁচল পাতিয়া' শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন পসারিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঝুড়িসমেত সমস্ত প্রসাদ-প্রদানে উদ্যত হইলে তাহা বহন করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কষ্ট হইবে জানিয়া শ্রীস্বরূপ-

গোস্বামি-প্রভু পসারিগণকে নিষেধ করিলেন এবং প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া ঐ মহোৎসব-কার্য্যের ভার স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বিরহোৎসবে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বৈষ্ণবগণকে স্বহস্তে শ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলে প্রভুকে বিরত করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীজগদানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীশঙ্করকে লইয়া প্রসাদ পরিবেশন করিলেন।

শ্রীজগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য 'গেরুয়া ওয়াড়' দিয়া তোষক ও বালিশ নির্ম্মাণ করিয়া উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য শ্রীগোবিন্দকে প্রদান করিলেন এবং শ্রীস্বরূপকেও তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীগোবিন্দ তদ্দ্বারা প্রভুর শয্যা রচনা করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক ঐরূপ তোষক ও বালিশ-নির্ম্মাণকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক কদলী-পত্রে শয়ন করিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীজগদানন্দের হৃদয় ব্যথিত হইবে বলিয়া প্রভুকে জানাইলে প্রভু আপনাকে 'বিরক্ত যতি'-অভিমানে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সেবা-চতুর শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু কদলীর বহু শুষ্কপত্র আনয়ন করিয়া নখে চিরিয়া চিরিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিলেন এবং তাহা প্রভুর বহির্বাসে ভরিয়া তোষক নির্ম্মাণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অনেক চেষ্টা ও অনুরোধের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীজগদানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রীমথুরায় চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর নিকট ইহা জানাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীস্বরূপের অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দকে ডাকিয়া শ্রীমথুরায় তাঁহার কর্ত্তব্যোপদেশ জানাইলেন।

[৯]

একদিন শ্রীকাশী মিশ্রের ভবনে তিন দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রিকালে শ্রীস্বরূপ, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি বিশ্রামার্থ গমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরার মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুর শ্রীনামসংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর গৃহের দ্বার উন্মোচন করিলেন; দেখিলেন, তিন দ্বার পূর্ব্বের ন্যায়ই বন্ধ আছে, কিন্তু প্রকোষ্ঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীস্বরূপ অত্যন্ত চিন্তিত

হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ব্যাকুল চিত্তে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে একস্থানে অচেতনাবস্থায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভূমিতে বিকলভাবে গদগদ-বচনে লুণ্ঠন করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন; তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু ভক্তগণ-সহ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে বহুক্ষণ পরে প্রভু বাহ্যদশায় অবতরণ করিলেন এবং প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ সমুদ্রতীরে চটকপর্ব্বত দর্শন করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন-জ্ঞানে পর্ব্বতাভিমুখে মহাভাবাবেশে শ্রীমদ্ভাগবতের 'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো' (শ্রীভাঃ ১০।২১।১৮) শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে ধাবিত হইলেন এবং অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকট করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ উচ্চসংকীর্ত্তন ও প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে জল সেচন করিলেন। প্রভু অর্দ্ধ-বাহ্যদশা লাভ করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর নিকট স্বীয় ভাবসমূহ ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভুরও সেই সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভুকে সেই সেই ভাবানুকূল এক সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে বলিলে শ্রীস্বরূপ—

"রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।।"

(শ্রীগীতগোবিন্দ ২।২)

—পদটী কীর্ত্তন করিলেন। ঐ গান-শ্রবণে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে থাকিলেন, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইল। প্রভুর অত্যন্ত ভাববিহ্বলতা দেখিয়া শ্রীস্বরূপ ঐ গান হইতে বিরত হইলেন।

একদিন শ্রীল শিবানন্দ সেন শ্রীপরমানন্দ-পুরীদাস-পুত্র সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বালককে 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রদান এবং শ্রীশিবানন্দও তজ্জন্য বহুবার যত্ন করিলেও বালক কিছুতেই 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করিলেন না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"আমি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইলাম, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালককে গ্রহণ করাইতে পারিলাম না,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!" তখন শ্রীল স্বরূপ শ্রীপুরীদাসের মৌন-অবস্থানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে বলিলেন,—"তুমি ইহাকে শ্রীকৃষ্ণনাম-মন্ত্র উপদেশ করিয়াছ; সেই মন্ত্র বালক অপরের সম্মুখে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। বালক মনে মনে ঐ মন্ত্র নিশ্চয়ই জপ করিতেছে, মুখে উচ্চারণ করিতেছে না,—ইহাই ইহার মনঃকথা বলিয়া আমি অনুমান করি।" শ্রীস্বরূপের অনুমান যে সত্য, তাহা আর একদিনের ঘটনায়ই প্রকাশিত হইল। একদিন সেই সপ্তবর্ষ-বয়স্ক বালক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জয়সূচক একটী শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলেন।

[১০]

দিবারাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে প্রমত্ত থাকিতেন এবং প্রেমাবেশে নানা-প্রকার প্রলাপ করিতেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথায় অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবোপযোগী সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীল স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছিলেন। প্রভুকে শয়ন করাইয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামরায় স্ব-স্ব স্থানে গমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্দ্ধ-রাত্রে উচ্চনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণবেণুগান প্রবিষ্ট হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারোদ্‌ঘাটন না করিয়াই তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভাবাবেশে বাহিরে আসিয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে—যে-স্থানে তৈলঙ্গী গাভীগণ থাকে, তথায় আসিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া শ্রীস্বরূপকে ডাকিলেন। শ্রীস্বরূপ প্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া গাভীগণের মধ্যে কমঠাকারে অচেতনাবস্থায় প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীস্বরূপ অনেক চেষ্টা করিয়া প্রভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং উচ্চ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চৈতন্য বিধান করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীস্বরূপের নিকট নিজের অবস্থা বর্ণন করিলেন এবং কৃষ্ণধ্বনি-শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই ভাবানুরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন,—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যং রূপং
যদ্‌গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।।"

(শ্রীভাঃ ১০।২৯।৪০)

শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখে এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপী-ভাবাবিষ্ট হইয়া চিত্রজল্পোক্তিসমূহ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচাই'।
আপনে নাচয়ে,—তিনে নাচে একঠাঞি।।
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে, যেন হঞা 'বামন'।।
বায়ু যৈছে সিন্ধু-জলের হরে এক 'কণ'।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন।।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহাঁ তা'র পাইবেক অন্ত?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ'।।
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তা'র ছোঁয়ে এক 'কণ'।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৮।১৮-২৩)

একদিন শারদীয়া জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আই-টোটা হইতে সমুদ্র দেখিতে পাইলেন এবং উহাকে শ্রীযমুনা মনে করিয়া সমুদ্রের জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। ভাসিতে ভাসিতে প্রভু কণারকের দিকে চলিলেন। কোন ধীবর একটী বৃহৎ মৎস্য ভাবিয়া প্রভুকে জালের দ্বারা টানিয়া দেখিতে পাইল যে, এক মহাপুরুষ অচেতনাবস্থায় তাহার জালের মধ্যে বদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুকে স্পর্শ করিবামাত্র

সেই ধীবরের প্রেমাবেশ হইল। ধীবর ইহাতে ভীত হইয়া মনে করিল যে, তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। ইহা মনে করিয়া সে যখন ওঝার অনুসন্ধানে যাইতেছিল, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানাভাবে অন্বেষণ করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রমুখ ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে তীরে আসিতে আসিতে ধীবরকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। জালিয়াকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, সেই জালিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জল হইতে তীরে তুলিয়াছে। শ্রীস্বরূপ ভীত ধীবরকে বলিলেন,—"আমি বড় ওঝা, আমি ভূত ছাড়াইতে জানি।" ইহা বলিয়া মন্ত্র পড়িয়া ধীবরের মস্তকে শ্রীস্বরূপ-প্রভু তাঁহার শ্রীহস্ত প্রদান করিলেন এবং তিন চাপড় মারিয়া বলিলেন, —"তোমার ভূত পলাইয়াছে।" জালিয়া কিছু স্থির হইলে শ্রীস্বরূপ বলিলেন, —"তুমি যাঁহাকে ভূত জ্ঞান করিয়াছ, তিনি ভূত নহেন; তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে ঝম্প দিয়াছিলেন। তাঁহার স্পর্শমাত্র তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়াছে।" অতঃপর শ্রীস্বরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চৈতন্য-সম্পাদনার্থ যত্ন ও নানাভাবে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধবাহ্যদশায় আনয়ন করিলেন এবং সেই দশায় প্রভু নানাপ্রকার চিত্র-জল্পোক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বাহ্যদশায় আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কেন আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছ?" তখন শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং প্রভুও স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎপরে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া আসিলেন।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীশান্তিপুর হইয়া শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট একটী প্রহেলিকা প্রেরণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে ঐ প্রহেলিকার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় অবতারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও লীলা-সঙ্গোপনের আভাস ইঙ্গিতে প্রদান করিলেন। শ্রীস্বরূপের হৃদয় বিমর্ষ-ভারাক্রান্ত হইল এবং সেইদিন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহদশাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহবিধুর হইয়া পরম-প্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ-নিজজন শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর সহিত কখন শ্রীজয়দেব-কৃত 'শ্রীগীতগোবিন্দ', কখনও 'শ্রীমদ্ভাগবত', কখন শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটক',

কখন শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন। শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মহিমা ও বিপ্রলম্ভ-প্রেম-পরাকাষ্ঠার গীতি-সমূহ কীর্ত্তন করিতেন।

[১১]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র ভক্তগণের মধ্যে কেবলমাত্র সাড়ে তিনজন 'শ্রীমতীর গণ' বলিয়া খ্যাত—

প্রভু লেখা করে যাঁ'রে **রাধিকার** 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন।।
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায়-রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁ'র ভগিনী—অর্দ্ধজন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অ ২।১০৫-১০৬)

শ্রীমুরারি গুপ্ত ও শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু স্ব-স্ব-কৃত সূত্রে যথাক্রমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদি ও শেষ লীলা গ্রন্থন করিয়াছেন। শ্রীল মুরারি গুপ্ত ঠাকুরের কড়চা-অনুসারে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল লোচনদাস প্রভৃতি শ্রীগৌরজনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বিপ্রলম্ভময়ী অন্ত্যলীলা শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ও 'শ্রীস্বরূপের শ্রীরঘুনাথ' কড়চা-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সম্প্রদায়ের ভজন-রাজ্যের উপজীব্য-স্বরূপ হইয়াছে। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

'স্বরূপ-গোসাঞি', আর রঘুনাথ-দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ।।
সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে।।
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা গ্রন্থন।।
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তা'র বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৪।৭-১০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুইভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্যভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস-গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাসগোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপন্থা শ্রীমদ্ বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন।" (শ্রীজৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ)

শ্রীশ্রীল স্বরূপ-গোস্বামি-প্রভুর কৃপায়ই শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারের মূল-প্রয়োজন ও গূঢ়-কারণ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার কৃপায়ই শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব, শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ গৌড়ীয়-ভক্তগণ অবগত হইয়াছেন। শ্রীস্বরূপ দামোদরের কৃপায়ই জীব স্ব-স্ব নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল স্বরূপের কৃপায়ই শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়ের গূঢ়ভাব সমগ্র গৌড়ীয়-সমাজের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে ও হইতে পারে। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীল রঘুনাথের কণ্ঠে শ্রীগৌরসুন্দরের গূঢ় অন্ত্যলীলা কড়চার আকারে সংরক্ষণ না করিলে জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের মূল-প্রয়োজনের বিষয় কেহই জানিতে পারিতেন না। যদিও শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীল বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', শ্রীল লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের অতিমর্ত্ত্য চরিত-কাহিনী প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি শ্রীস্বরূপের কড়চা —যাহা শ্রীরঘুনাথের কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর কৃপায় গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃত হইয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-পূর্ণ ভজন-ধারার বৈশিষ্ট্য প্রকট করিয়াছে। শ্রীস্বরূপ ও 'শ্রীস্বরূপের রঘু'র এই কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-চরিত জীবের অবগতির বিষয় হইত না। শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ যে-সকল সিদ্ধান্ত জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ় সিদ্ধান্ত। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামরায়ের শ্রীমুখে যে-সকল নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীরামরায়ের অভিন্ন মিত্রবর শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু সেই সকল সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্যলীলার কড়চার মধ্যে প্রকাশ করিয়া সিদ্ধান্তকে লীলাদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের কিঙ্কর শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের, সেই কার্য্য নিজ।।
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার।।
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ।।
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি-দিনে।।
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি'।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি'।।
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪।১০৩-১০৫, ১০৮-১১০)

শ্রীল স্বরূপগোস্বামি-প্রভুর কড়চা-ধৃত নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রারম্ভে উদ্ধার করিয়াছেন,—

রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।।

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ।।
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে।।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।।

যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর, তিনিই শ্রীব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার দ্বিতীয়-স্বরূপিণী শ্রীললিতাদেবী। শ্রীল কবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-মতে ইনি শ্রীবিশাখাদেবী; যথা,—

কলামশিক্ষয়দ্রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্।।

(শ্রীগৌঃ গঃ, ১৬০ শ্লোক)

যিনি পূর্ব্বে শ্রীব্রজে 'শ্রীবিশাখাদেবী'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীরাধিকাকে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় তত্তদ্ভাব-বিলাসী 'শ্রীস্বরূপগোস্বামী' নামে পরিচিত।

আমাদের পূর্ব্বগুরুবর্গ সকলেই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের গণে যাঁহারা গণিত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-ভজনে প্রবিষ্ট।

শ্রীরামানন্দ রায়

শ্রীপুরীধাম হইতে পশ্চিমে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে 'ব্রহ্মগিরি' বা 'আলালনাথ'-নামক এক সুপ্রাচীন দিব্যস্থান বিরাজিত। সত্যযুগে আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা এইস্থানে শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়াছিলেন। এইজন্য এইস্থানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে বহু নারায়ণ-পরায়ণ সিদ্ধ-মহাপুরুষ দক্ষিণদেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করেন। ইঁহারা ''দিব্যসূরি''-নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল দিব্যসূরি বা ভগবৎপার্ষদগণকে তামিলভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আল্‌বর্' বলা হয়। শ্রীব্রহ্মার ভজনসিদ্ধিস্থান ব্রহ্মগিরি নির্জ্জনতায় ও পবিত্রতায় শ্রীহরিসেবার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণ-দেশের মধ্যযুগীয় কতিপয় দিব্যসূরি বা আলোয়ার ঐস্থানে চতুর্ভুজ শ্রীজনার্দ্দন মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক-বিধিতে শ্রীঅর্চ্চা-অবতারের আরাধনা করিতেন। আল্‌বর্ বা আলোয়ারগণের নাথ বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণ 'আল্‌বর্‌নাথ' বা 'আলোয়ারনাথ'-নামে খ্যাত হ'ন এবং ব্রহ্মগিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের নামানুসারে 'অল্‌বর্‌পত্তনম্', 'অলারপাট্‌না', 'অলারপুর', 'অল্‌বর্‌পুর' প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে। অল্‌বর্‌নাথ বা আলোয়ারনাথের অপভ্রংশই 'আলালনাথ'।

এই আলালনাথের অনতিদূরে 'শ্রীভবানন্দ রায়' নামক এক পরম ভাগবত ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে, যে-সময় শ্রীগৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে আমরা শ্রীআলালনাথে গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগত কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তি জানাইয়াছিলেন যে, আলালনাথ হইতে এক মাইল দূরে 'বেণ্টপুর'-নামক স্থানে শ্রীভবানন্দের গৃহে শ্রীরামানন্দ রায় আবির্ভূত হ'ন এবং অদ্যাপি সেইস্থানে শ্রীভবানন্দ রায়ের বংশীয় অধস্তনগণ 'চৌধুরী পট্টনায়ক' পদবী-বিভূষিত হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রায় রামানন্দের আবির্ভাবস্থান ও শ্রীআলালনাথ দর্শনার্থই প্রতি বৎসর শ্রীব্রহ্ম-গিরিতে আগমন করিতেন।

শ্রীভবানন্দ রায় পূর্ব্বলীলায় পাণ্ডুরাজ ছিলেন। শ্রীভবানন্দের পঞ্চপুত্র। তন্মধ্যে শ্রীরামানন্দই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যখন নীলাচলে রায় শ্রীভবানন্দের প্রথম মিলন হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—

আলিঙ্গন করি' তা'রে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন।।
(১) রামানন্দ রায়, (২) পট্টনায়ক গোপীনাথ।
(৩) কলানিধি, (৪) সুধানিধি, (৫) নায়ক বাণীনাথ।।
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ-সহ মোর দেহভেদ মাত্র।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩২-১৩৪)

শ্রীরামানন্দ রায় উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিশ্বস্ত শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিৎ, কবি, পণ্ডিত, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ ও মহাভাগবতোত্তম ছিলেন। শ্রীল রামানন্দের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কও রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজকোষের কিছু অর্থ নষ্ট করিয়া যুবরাজের অপ্রীতিভাজন হ'ন ও দণ্ডিত হইবার জন্য হত্যামঞ্চে নীত হ'ন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীগোপীনাথকে ক্ষমা করেন। শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক শ্রীমহাপ্রসাদাদি আনয়ন করিয়া নানাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

শ্রীনবদ্বীপের বিদ্যানগর-পল্লীর মহেশ্বর বিশারদের পুত্র পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমের সহিত নীলাচলে শ্রীরায় রামানন্দের বিশেষ সৌহার্দ্দ হয়। পূর্ব্বে নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য—যিনি পরে 'শ্রীদামোদর-স্বরূপ'-নামে বিখ্যাত হ'ন, তাঁহার সহিত শ্রীরায়-রামানন্দ একাত্মা ছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য—উভয়েই পূর্ব্বাশ্রম নবদ্বীপ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়া শ্রীক্ষেত্রসন্ন্যাসিরূপে বাস করেন এবং শ্রীরায় রামানন্দের সহিত নিত্য-বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'ন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন শ্রীরায় রামানন্দের মহিমাও তাঁহার হৃদয়ে অনুভবের বিষয় হইল। তিনি পূর্ব্বে শ্রীরায় রামানন্দের বাক্য ও চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিহাস

করিতেন এবং আপনাকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসকারী বিষয়-ত্যাগী স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ ও শ্রীরামানন্দকে করণকুলে উদ্ভূত শূদ্র বিষয়ীজ্ঞানে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরায়-রামানন্দের অর্থাৎ মহা-ভাগবতোত্তমের স্বরূপও তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য এইরূপ বিশেষ-ভাবে অনুরোধে করিলেন,—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে।।
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে।।
শূদ্র বিষয়ীজ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁ'রে অবশ্য মিলিবে।।
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁ'র সম।।
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা।।
অলৌকিক বাক্য-চেষ্টা তাঁ'র না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁ'রে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।।
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁ'র তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁ'র যেমন মহত্ত্ব।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।৬১-৬৭)

প্রায় ১৫১২ খৃষ্টাব্দের কথা। শ্রীচৈতন্যদেব জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন করিয়া তৎপরদিবস ভাবাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে গোদাবরী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীযমুনা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তীরে বনদর্শনে শ্রীবৃন্দাবন-জ্ঞানে তথায় কিছুকাল নৃত্যগীত

করিয়া, গোদাবরী পার হইয়া গোষ্পদতীর্থে আসিয়া স্নান করিলেন। ঘাট ছাড়িয়া কিছুদূরে তীরে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় এক রাজপুরুষ গোদাবরীর পশ্চিমতটে (বর্ত্তমান কভুর) নানাবাদ্য-মুখরিত শোভাযাত্রার সহিত দোলায় আরোহণপূর্ব্বক গোষ্পদতীর্থের দিকে আগমন করিতেছিলেন। ঐ রাজপুরুষের পরিকররূপে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণও তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান-তর্পণাদি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বুঝিতে পারিলেন—ঐ রাজপুরুষই "রাজমহেন্দরীর * রাজা" শ্রীরামানন্দ রায়। যদিও শ্রীরামানন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ ব্যাকুল হইল, তথাপি তিনি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যসমকান্তি, অরুণ-বসনধারী, সুবলিত-প্রকাণ্ডদেহ, কমলনয়ন, এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী মূর্ত্তিদর্শনে শ্রীরামানন্দ রায় চমৎকৃত হইলেন এবং সেই সন্ন্যাসীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত শ্রীরামরায়কে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক হইলেও তিনি বাহিরে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক শ্রীরামরায়কে উত্থাপন করিয়া তাঁহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে অতি দৈন্যভরে বলিলেন,—"আমি অতিশয় মন্দপ্রকৃতির শূদ্র, আপনার দাসানুদাস।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। উভয়ে ভূমিতে পতিত হইলেন। উভয়ের শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার ও উভয়ের শ্রীমুখে গদ্‌গদ্‌স্বরে "শ্রীকৃষ্ণ"-শব্দ প্রকাশিত হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হইলেন। শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী সন্ন্যাসী কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন, আর শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাগম্ভীর হইয়াই বা কেন সন্ন্যাসীর স্পর্শে এরূপ উন্মত্ত ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়ের সঙ্গী ব্রাহ্মণ-

* বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী-নগর—গোদাবরীর উত্তর-তটে অবস্থিত। শ্রীরামানন্দ রায়ের সময়ের রাজধানী বিদ্যানগর—গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে ছিল। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাবরী-নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে অবস্থিত ও তৎকালে 'রাজমহেন্দ্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল। কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশে উৎকলিঙ্গ বা উৎকল-দেশ। উৎকলিঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণ-প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহেন্দ্রী। বর্ত্তমানকালে রাজমহেন্দ্রী-নগরের স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

গণকে বিজাতীয় (অভক্ত) লোক জানিয়া স্বীয় ভাবাবেগ সম্বরণ করিলেন; উভয়ে সুস্থ হইয়া সেইস্থানে উপবেশন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে শ্রীরামরায়ের সাক্ষাৎকারের জন্য তথায় আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। শ্রীরামরায় আপনাকে দৈন্যভরে 'রাজসেবক', 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম', 'অস্পৃশ্য' প্রভৃতি বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন এবং পতিতপাবন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিজের কোন কার্য্য না থাকিলেও পামর ও পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা শ্রীরামানন্দ রায় স্তুতিমুখে বলিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীরূপ-দর্শনে ও আচরণফলে বহির্ম্মুখ কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণেরও চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তাঁহাদের মুখে 'কৃষ্ণ' ও 'হরি'-নাম প্রকাশিত এবং অঙ্গে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইল। একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের প্রভাব ব্যতীত এইরূপ ঘটনা আর কোথায়ও সম্ভব নহে, ইহা শ্রীরামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন।

শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন দেখিয়া প্রভু নিজ-দৈন্যমুখে ও রায়ের প্রশংসাচ্ছলে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন; এমন সময় একজন বৈদিক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাম-রায়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামরায়ও দৈন্যভরে ও সসম্ভ্রমে প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

* * "আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে।।
দিন পাঁচ-সাত রহি' করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৫১-৫২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। তিনি সন্ধ্যাস্নান করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীরায়-রামানন্দ এক ভৃত্যের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে সাধ্য-নির্ণয়ের শ্লোক পাঠ করিতে বলিলে শ্রীরামানন্দপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ সজ্জনসামান্যধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মার্পণ, পরে আসক্তিশূন্য কর্ম্ম,

পরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অবশেষে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিকেই 'সাধ্যতত্ত্ব' বলিয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে ভক্তি-সম্বন্ধে উচ্চ-অধিকার বর্ণন করিতে বলিলে রায় প্রথমেই শুদ্ধা কৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, তৎপরে সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং অবশেষে কান্তভাবগত-প্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও শ্রীরায়-রামানন্দপ্রভু বিবিধরূপে প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কান্তপ্রেমকে 'সাধ্যাবধি' বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীরামরায় শ্রীরাধিকার প্রেম বর্ণন করিলেন। পরে শ্রীরামরায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা-ক্রমে শ্রীল রামানন্দপ্রভু প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ়-ভাবময় স্বকৃত একটি সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলেন। এই সঙ্গীতটি অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি উজ্জ্বলতম রত্ন ও প্রাচীনতম ব্রজবুলি-পদ। শ্রীরায়-রামানন্দ কেবল যে সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় কবি ছিলেন তাহা নহে, তিনি ব্রজবুলি-পদাবলী-সাহিত্যেও অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত কবিসম্রাট্।

ঐ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপর্য্যন্তই সাধ্যাবধি, ইহা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার শ্রীরাম-রায়কে বলিলেন,—"সাধনদ্বারাই সাধ্যবস্তু লাভ হয়। এখন সেই সাধ্যবস্তু পাইবার উপায় বল।" শ্রীরামরায় বলিলেন যে, তাঁহার মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বক্তা, আবার তিনি স্বয়ংই শ্রোতা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা-রূপ পরম-সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবার উপায়—একমাত্র শ্রীব্রজসখীর আনুগত্য। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতাস্বরূপিণী এবং সখীগণই সেই লতার পল্লব-পুষ্প-পত্র। শ্রীরাধিকার পদাশ্রয়পূর্ব্বক লতাতেই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সেচন করিলে অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। গোপীনাথের বিন্দুমাত্রও নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাই। যাঁহার শ্রীগোপীভাবামৃতে লোভ হয়, তিনি বেদ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। শ্রীগোপীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভ অসম্ভব।

এইরূপে উভয়ে প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণালাপে রাত্রি যাপন করিতেন। শ্রীরামরায় অত্যন্ত দৈন্যসহকারে অন্ততঃ দশ দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"দশ দিনের কি কথা, যাবজ্জীবন আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। নীলাচলে তুমি ও আমি একসঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কথায় কাল কাটাইব।" সন্ধ্যাকালে শ্রীরামরায় পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দুইজন নির্জ্জনে বসিয়া প্রশ্নোত্তরমুখে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রীরামরায় উত্তরদাতা।

প্রভু—কোন্ বিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

রায়—শ্রীকৃষ্ণভক্তিই পরা বিদ্যা। তাহা অপেক্ষা আর অন্য কিছু 'বিদ্যা'-পদবাচ্যই নহে। আর সকলই অবিদ্যা।

প্রভু—জীবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কি?

রায়—'শ্রীকৃষ্ণের দাস', এই পদবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

প্রভু—জীবের প্রধান ধন কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমিকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

প্রভু—কোন্ দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতম?

রায়—কৃষ্ণভক্তের বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ।

প্রভু—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত কে?

রায়—কৃষ্ণপ্রেমিকই মুক্ত-শিরোমণি।

প্রভু—কোন্ গান জীবাত্মার সহজধর্ম্ম?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাগানই শুদ্ধ জীবাত্মার সহজধর্ম্ম।

প্রভু—জীবের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি?

রায়—শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত আর কোনও মঙ্গল নাই।

প্রভু—একমাত্র নিত্যস্মরণীয় কি?

রায়—শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাই একমাত্র নিত্য-স্মরণের বিষয়।

প্রভু—একমাত্র ধ্যানের বিষয় কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র ধ্যেয়।

প্রভু—সমস্ত ত্যাগ করিয়া জীবের কোথায় বাস করা কর্ত্তব্য?

রায়—শ্রীভগবানের নিত্যলীলাস্থানই জীবের একমাত্র বাস্তব্য।

প্রভু—একমাত্র শ্রেষ্ঠ শ্রবণের বিষয় কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-লীলাই একমাত্র শ্রোতব্য।

প্রভু—একমাত্র কীর্ত্তনীয় কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই একমাত্র কীর্ত্তনীয়।

প্রভু—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর গতি কোথায়?

রায়—মুক্তিকামী স্থাবরদেহ ও ভোগকামী দেবতার দেহ লাভ করিয়া থাকে।

প্রভু—জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনের বৈশিষ্ট্য কি?

রায়—অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় জ্ঞানী শুষ্কজ্ঞানরূপ তিক্ত নিম্বফল ভোজন করে, আর ভক্ত রসজ্ঞ কোকিলের ন্যায় প্রেমাম্র-মুকুল আস্বাদন করেন।

এইরূপে কয়েক দিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণালাপের পর শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-স্বরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্বয়ং প্রভুকেই সেই রূপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন,—"প্রভো! তোমাকে আমি প্রথমে একটি সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিলাম; এখন তোমাকে শ্যামবপুরূপে দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটি কাঞ্চন-পুত্তলিকাও দেখিতেছি। সেই পুত্তলিকার গৌরকান্তিদ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত রহিয়াছে। আবার তোমার বামনেত্র নানাভাবে চঞ্চল। প্রভো! তোমার ঐরূপ চমৎকার ভাবের কারণ কি, তাহা অকপটে বল।" প্রভু বলিলেন,—"যাহাদের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়-প্রেম, সেই সকল মহাভাগবতোত্তমের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন না হইয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের মূর্ত্তিই স্ফূর্ত্তি হয়।"

এইরূপ উক্তি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভু ঐরূপে আত্মগোপন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরামরায় অনুযোগ করিলেন। তখন প্রভু রায়কে স্বীয় শ্যাম ও গৌর-রূপ প্রদর্শন করিলে শ্রীরামানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সমস্ত গূঢ়-কারণই অবগত করাইলেন এবং সেই গূঢ়-ভজনকথা অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের সহিত গোদাবরী-তটে দশ রাত্র কৃষ্ণকথা-রঙ্গে যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদায় গ্রহণ করিবার কালে শ্রীরামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাইবার আজ্ঞা করিলেন,—

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি' তাঁহা আসিব অল্পকালে।।
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২৯৬-২৯৭)

শ্রীরাম-রায়ের মিত্রবর শ্রীল স্বরূপদামোদর-প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার কড়চার মধ্যে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোদাবরীর সপ্তশাখার তীরে তীরে পুনরায় বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং নানাপ্রকার ইষ্ট-গোষ্ঠী করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের নিকট সমস্ত তীর্থযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', ও 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' পুঁথিদ্বয়—যাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরায়-রামানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, —"তুমি যে-সব সিদ্ধান্ত ও রসবিচারের কথা বলিয়াছিলে, এই দুই পুস্তকে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।" শ্রীরাম-রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গ্রন্থদ্বয় আস্বাদন করিলেন এবং দুইটি পুঁথিই নকল করিয়া রাখিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকাশী মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। এই সময় শ্রীভবানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া প্রণতঃ হইলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীভবানন্দের সম্মুখে শ্রীরাম-রায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—

"রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায়।।
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।৫২-৫৩)

শ্রীভবানন্দ রায় অকপট-দৈন্যভরে আপনাকে 'শূদ্র', 'বিষয়ী', 'অধম' প্রভৃতি বলিয়া প্রভুপদে সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদন-পূর্ব্বক স্বীয় আত্মজ শ্রীবাণীনাথকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য সমর্পণ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীরামানন্দ শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া মিলিত হইবেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীভবানন্দকে জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীবাণীনাথকে নিজের সমীপে রাখিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজধানী কটক হইতে শ্রীরামানন্দাদি পরিকরগণের সহিত পুরীতে আগমন করিলেন। শ্রীরামানন্দ রায় পুরীতে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ গমন করিলেন। শ্রীরাম-রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতঃ হইয়া জানাইলেন যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা অর্থাৎ রাজকার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণের কথা জ্ঞাপন করিলে রাজা তাহাতে সানন্দে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, —যিনি শ্রীচৈতন্যের চরণ ভজন করেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই; সুতরাং শ্রীরামানন্দকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দিয়াও তিনি তাঁহাকে পূর্ণ বেতন প্রদান করিবেন। শ্রীরাম-রায়ের নিকট রাজার প্রশংসা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীরামানন্দের ন্যায় মহাভাগবতের সেবা করায় রাজার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

এদিকে শ্রীপুরুষোত্তমে সমাগত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীরামানন্দ রায় মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি না, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামরায় অচিরেই শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইবেন বলিয়া জানাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের পূর্ব্বেই কেন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাম-রায়কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামানন্দ রায় বলিলেন যে, তাঁহার পদদ্বয় রথমাত্র, কিন্তু হৃদয়ই সারথি; সারথি রথকে যেস্থানে লইয়া যায়, তথায়ই জীব-রথী গমন করে। প্রভুর আদেশে শ্রীরাম-রায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেলেন।

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিবার জন্য শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ব্যবহার-চতুর রাজমন্ত্রী

শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রভুপদে প্রেমভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের নিকটই সন্ন্যাসীর এই উভয়-সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করিলে শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'বিধিনিষেধাতীত ঈশ্বর' বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু আপনাকে বিধি-বাধ্য বলিয়া ছলনা করিবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে শ্রীরামানন্দের অত্যন্ত আগ্রহে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—এই বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের এক কিশোরবয়স্ক পুত্রের সহিত মিলিত হইতে পারেন, এইরূপ অভিমত জানাইলেন। শ্যামবর্ণ কিশোর রাজপুত্রের দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপন হইল। ইহার কয়েক দিবস পরে 'বলগণ্ডি'- উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিলে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র একাকী বৈষ্ণব-বেষ ধারণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-সম্বাহনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চারি বৎসর শ্রীনীলাচল-লীলার দুই বৎসর দক্ষিণ-দেশে গমনাগমন করিলেন; আর দুই বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরায়-রামানন্দের চেষ্টায় বহির্গত হইতে পারেন নাই। অবশেষে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু রেমুণা (অথবা ভদ্রক?) হইতে শ্রীরামানন্দকে বিদায় দিলেন। এই সময় শ্রীরামানন্দের যে প্রভু-বিচ্ছেদের দৃশ্য, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন।।
রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৫৪-১৫৫)

সে-বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। গৌড়দেশে রামকেলীতে গিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে অঙ্গীকার ও শ্রীরঘুনাথ দাসকে শিক্ষা দিয়া নীলাচলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শরৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায়

শ্রীবৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপের সঙ্গে নিভৃতে যুক্তি করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও আর একটি ব্রাহ্মণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি স্থানে নিজজনগণকে শিক্ষা ও বহু লোককে উদ্ধার করিয়া ঝারিখণ্ড দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন শ্রীরায়-রামানন্দ কটক হইতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন।

একদিন শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরূপপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীরূপ 'শ্রীললিতমাধব' ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' রচনা করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীরূপ ও শ্রীরাম-রায়ের মধ্যে নাটক-সম্বন্ধে বিবিধ সংলাপ হইল। শ্রীরাম-রায় সহস্রমুখে শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে, ইহা প্রভুর সমীপে বলিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং পরম স্নেহ-কৃপাভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপা যাচ্ঞা করিয়া শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিলেন,—

''সবে কৃপা করি' ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর।।
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন'।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁ'র সম।।
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তাঁ'র রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি।।''

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।১৯৯-২০১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে শ্রীরায়-রামানন্দ ও শ্রীসনাতনের একই প্রকার অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের কথা জানাইলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ বিষয়ীর প্রায় থাকিয়াও যেরূপ অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্যের শিক্ষক-শিরোমণি, শ্রীল সনাতনপ্রভু এক-এক বৃক্ষের তলে এক-এক দিন শয়ন ও শুষ্ক চানারুটি চিবাইয়াও সেইরূপই যুক্ত-বৈরাগ্য-শিক্ষকের আদর্শ; অর্থাৎ উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপোষ্টা।

সমগ্র শ্রীগৌরভক্তের মধ্যে কেবল সাড়ে তিনজন "শ্রীমতীর গণ" বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীরায়-রামানন্দ তাহার অন্যতম,—

প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার "গণ"।
জগতের মধ্যে পাত্র—'সাড়ে তিনজন'।।
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁ'র ভগিনী—অর্দ্ধজন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১০৫-১০৬)

বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র —এই তিনজনের জন্যই শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া স্বমুখে জানাইয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য,—

তুমি, সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায়।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২০২)

শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-বিশ্বে শ্রীরায়-রামানন্দের মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একটি লীলা করিলেন। এক সময় শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট হইতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন। একমাত্র শ্রীরায়-রামানন্দই শ্রীকৃষ্ণকথা জানেন। যদি প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তিনি শ্রীরায় রামানন্দের নিকট গমন করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীরামানন্দের গৃহে গমন করিয়া জানিলেন যে, শ্রীরামানন্দ রায় দুইজন কিশোরবয়স্কা পরমসুন্দরী দেবদাসীকে নির্জ্জন-উদ্যানে লইয়া গিয়া স্ব-রচিত নাটকের গীত ও নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেছেন। আত্মারাম বিদ্বৎসন্ন্যাসি-শিরোমণি বিজিতবেগ শ্রীরামানন্দ-গোস্বামি-প্রভুর মাংসদর্শন ছিল না। তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত চিদানন্দময় সিদ্ধদেহে শ্রীগোপীভাবে রাগাত্মিকা ভক্তি যাজন করিয়া নিজেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-কৈঙ্কর্য্য করিতেছিলেন,—

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব'।।

সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ।।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাবভক্তি-প্রেম-সীমা।।
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁ'র মন?

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১৯-২১, ২৬)

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আগমন-সংবাদ শুনিয়া শ্রীরামানন্দ রায় সভাগৃহে আগমন করিলেন; কিন্তু মিশ্র এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং শ্রীরামানন্দ রায়ের ভৃত্যের নিকট শ্রীরামানন্দের ঐ সকল আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে অন্তরে অশ্রদ্ধালু হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামানন্দের সহিত বিশেষ কিছু আলাপাদি না করিয়া নিজগৃহে চলিয়া আসিলেন। অন্যদিবস মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে আসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রের শ্রীরামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মিশ্র শ্রীরামানন্দের ঐরূপ আচরণের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—

"রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন।।
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি।।
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তা'র দর্শন-স্পর্শন।।
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তা'রে করায় শিক্ষণ।।
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন।।

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তা'তে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার।।
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।।
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ।।
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস।।
হৃদ্রোগ-কাম তাঁ'র তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয়।।
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়।।
যে শুনে, যে পড়ে, তাঁ'র ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি।।
তাঁ'র ফল কি কহিমু, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁ'র কায়।।
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তা'তে 'প্রাকৃত' নহে মন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৩৭-৪৭, ৪৯-৫১)

শ্রীরামানন্দ—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তিনি সিদ্ধপ্রায় শরীরে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার অপ্রাকৃত দেহে কোনরূপ প্রাকৃত-বিকার নাই। তুমি যদি সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে চাহ, তাহা হইলে পুনরায় শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট গমন কর। আমিও রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনি। তুমি আমার নাম করিয়া বলিও যে, আমি তোমাকে তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি।

মিশ্র পুনরায় শ্রীরামানন্দ রায়ের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-অনুসারে সকল কথা বলিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র বলিলেন যে, বিদ্যানগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিতে চাহেন। শ্রীরামানন্দ কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে রায় ও মিশ্র উভয়েই কৃষ্ণ-কথায় আত্মহারা হইলেন। মিশ্র এবার শ্রীরামানন্দের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নান-ভোজনান্তর পুনরায় মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। তখন মহাপ্রভু মিশ্রকে তাঁহার কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে,—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা।।
রামানন্দ রায়-কথা কহিলে না হয়।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময়।।
আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি' না জানিহ মোরে।।
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র।।
মোর মুখে কথা ইঁহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার?"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৭০-৭৪)

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের মুখে শ্রীল রামানন্দের মহত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের আরও প্রশস্তিগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

* * "রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি'।।
মহানুভবের এইমত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়।।

* * *

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৭৭-৭৮, ৮০)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

এই সব গুণ তাঁ'র প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে।।

* * *

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ-শূদ্রদ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ।।
'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা'।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৮১, ৮৪-৮৫)

এস্থানে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীরায়-রামানন্দকে 'নীচ' বা 'শূদ্র' বলেন নাই। নীচ ও শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোত্তমা প্রীতি আছে, তিনিই জগদ্গুরু—ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীরায়-রামানন্দ অবরকুলে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরায়-রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরুগণেরও শ্রীগুরুপাদপদ্ম; ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর উপদেষ্টৃ-শিরোমণি—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলা দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

অন্য সময়ে শ্রীবল্লভ-ভট্টের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আত্মদৈন্যমুখে শ্রীরাম-রায়ের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রামানন্দ রায়—কৃষ্ণরসের 'নিধান'।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।।
তা'তে প্রেমভক্তি—'পুরুষার্থ-শিরোমণি'।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি 'সর্ব্বাধিক' জানি।।
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা,—'আশ্রয়' যাহার।।

‘ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত’, ‘কেবল’-ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার।।
‘আত্মভূত’-শব্দে কহে ‘পারিষদগণ’।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন।।
‘মোর সখা’, ‘মোর পুত্র’,—এই ‘শুদ্ধ’ মন।
অতএব শুক-ব্যাস করে প্রশংসন।।
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ ‘শুদ্ধে’র ঐশ্বর্য্য নহে জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে ‘কেবল’-ভাব প্রধান।।
এসব শিখাইলা মোরে রায়-রামানন্দ।
সে-সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ।।
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায়-প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের ‘শুদ্ধ’ ভাব।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৭।২৩-২৮, ৩০-৩১, ৩৫-৩৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং রাত্রিতে শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিতেন। এই দুইজনই তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ।।

* * *

দুইজনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
“প্রভুর অন্তরঙ্গ” বলি’ যাঁ’রে লোকে গায়।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৬, ১১)

রাত্রি হইলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া।।

* * *

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা তা'র গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি', কহে 'হা হা হরি হরি',
ধৈর্য্য গেল, হইলা চপল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৪।৪০, ৪২)

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রোষিতভর্তৃকা গোপীর যে দশ দশা হয়, শ্রীকৃষ্ণবিরহী শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরেও সেই দশ দশা প্রকাশিত হইত। এই দশ দশায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অহোরাত্র ব্যাকুল থাকিতেন। সেই সময় শ্রীরামানন্দ রায় সময়োচিত শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

যদিও শ্রীরায়-ভবানন্দকে 'পাণ্ডুরাজ' এবং তাঁহার শ্রীরায়-রামানন্দাদি পঞ্চপুত্রকে "পঞ্চপাণ্ডব" বলা হইয়াছে, তথাপি কোন কোনও বিচারে শ্রীরামরায় শ্রীব্রজ-লীলার 'শ্রীবিশাখাদেবী' বলিয়া কথিত হ'ন,—

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া।।
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৫।১১-১২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরায়-রামানন্দের শুদ্ধ-সখ্যরসের কথা উক্ত হইয়াছে,—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারিভাবেপ্রভু বশ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২।৭৮)

সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রামরায়।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৯)

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

প্রিয়-নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ।
মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।
অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী।
রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহম্।।
ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকে নানুমন্যতে।
ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্ত্বং পৃথাপতিঃ।।
গোপ্যার্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনো যদ্ রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ।।
অর্জ্জুনীয়াভবত্তূর্ণমর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ।
ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে।।
তস্মাদেতত্রয়ং রামানন্দ-রায়-মহাশয়ঃ।
ব্রজে ভক্তৈঃ সমাসেন কথ্যতেঽথ যথামতি।।

(শ্রীগৌঃ গঃ ১২০-১২৫)

কেহ কেহ বলেন যে, ব্রজের প্রিয়-নর্ম্মসখা শ্রীঅর্জ্জুন ও পাণ্ডব শ্রীঅর্জ্জুন এই উভয়ে মিলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীরামানন্দ-রায়-রূপে প্রকট হইয়াছেন। সুতরাং তিনিশ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদি শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বর্ণন করিতে দক্ষ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—তিনি শ্রীললিতা ছিলেন; আবার কেহ কেহ ইহার অনুমোদন করেন না। ইঁহারা বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীভবানন্দ রায়কে 'পাণ্ডু'-নামে অভিহিত করিয়াছেন, তখন শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীললিতা না হইয়া শ্রীঅর্জ্জুনীয়া বা শ্রীবিশাখাদেবী হইতে পারেন। সেই

শ্রীঅর্জ্জুনীয়া বা শ্রীবিশাখাদেবীতে পাণ্ডব শ্রীঅর্জ্জুন মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা 'শ্রীপদ্মপুরাণে'র উত্তর-খণ্ডে প্রকাশিত আছে। অতএব শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভু এই তিনজনের মিলিত মূর্ত্তি,—ইহা শ্রীব্রজের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন।

* * *

একদিন নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের শ্রীবল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅধরামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরাম-রায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন,—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।।

(শ্রীভাঃ ১০।৩১।১৪)

শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে বীর! তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্তবেণুদ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর-রাগবিস্মারক তোমার যে অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।"

আবার শ্রীরাম-রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আর একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ।।

(শ্রীভাঃ ১০।২১।৯)

হে গোপীগণ! এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে? আর্য্যজনগণ যেরূপ মহৎসন্তানের (কোন ভগবদ্ ভক্তের) জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-সকল নদীর জলে পুষ্ট হইয়াছে, সেই সকল নদী স্ব-স্ব উপরিভাগস্থিত বিকশিত পদ্মনিচয়রূপ রোমসমূহদ্বারা হৃষ্ট হইতেছে এবং যে-তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-রূপ অশ্রু মোচন করিতেছে।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী ও শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি-স্থলে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামে একটি উদ্যান আছে। কথিত হয় যে,

এই স্থানটি শ্রীল রামানন্দ রায়ের স্থান। কেহ কেহ বলেন,—এইস্থানে যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন, তাহা শ্রীল রায় রামানন্দের সেবিত শ্রীবিগ্রহ। এই জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীরায়-রামানন্দ কৃত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' অভিনীত হইত, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। নবরাত্র-যাত্রার সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে প্রেমানন্দে এই জগন্নাথবল্লভে অবস্থান করিতেন। কোন সময় বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রিতে ঐ জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়াছিলেন; তখন শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায় নানা উপায়ে মহাপ্রভুকে বাহ্য-দশায় আনয়ন করেন। শ্রীপুরুষোত্তমে অহর্নিশ মহাপ্রভু তাঁহার সেই পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিত্যসঙ্গিদ্বয়ের সহিত স্ব-রচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'র আস্বাদন করিতেন। শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাসের পদাবলী, শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেইরূপ শ্রীরামানন্দ রায়ের 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটক'ও নিত্য আস্বাদন করিতেন।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২।৭৭)

বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীল রামানন্দের চরিত

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায়

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় লিখিত আছে,—

ততঃ প্রভাতে বিমলে শুভে প্রভু-
র্গায়ন্ হরিং প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ।
যযৌ স কাঞ্চীনগরং জগদ্গুরু-
র্দ্রষ্টুং শ্রীরামানন্দাখ্যরায়ম্।।
স স্বগৃহে কৃষ্ণপূজাবসানে
ধ্যায়ন্ পরং ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনম্।

দদর্শ বারত্রয়মদ্ভুতং মহদ্
গৌরাঙ্গমাধুর্য্যমতীব বিস্মিতঃ।।
উন্মীল্য নেত্রে চ তদেব রূপং
দৃষ্ট্বা পরং ব্রহ্ম সন্ন্যাসবেশম্।
প্রণম্য মুর্দ্ধা বিহিতঃ কৃতাঞ্জলিঃ
পপ্রচ্ছ কুত্রত্য ভবানিতি প্রভো।।
হসন্ প্রভুঃ প্রাহ কথং ন স্মর্য্যতে
শ্রীরাধিকাপাদসরোজষট্পদ।
স্বাত্মানমেবং কথয়ন্ স্বয়ং হরিঃ
স্ববাহুযুগ্মেন তমালিলিঙ্গ।।
বৃন্দাটবীকেলিরহস্যমদ্ভুতং
প্রকাশ্য তস্মিন্ রসিকেন্দ্রমৌলিঃ।
আজ্ঞাপ্য ক্ষেত্রগমনায় সত্বরং
তং সান্ত্বয়িত্বা স যযৌ জনার্দ্দনঃ।।

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্—৩য় প্রক্রম,
১৫শ সর্গ, ১-৫ শ্লোক)

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা হইতে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ মিলনের এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'জিয়ড়-নৃসিংহ' দর্শন করিয়া প্রেমপরবশ-চিত্তে কাঞ্চীনগরে উপনীত হ'ন এবং কাঞ্চীনগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া প্রহরীকে রাজপুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। দ্বারী সংবাদ লইয়া আসিয়া সেই যতিবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবকে জানান যে, রাজপুত্র অন্তঃপুরে শ্রীভগবানের পূজায় অভিনিবিষ্ট আছেন। এই রাজপুত্রই শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র শ্রীরামানন্দ রায়। তিনি শ্রীমহামন্ত্র জপ

করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে তিনি অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করেন। তিনি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণধ্যানে প্রবৃত্ত হ'ন, কিন্তু তখনও শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হ'ন। তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিত্য ধ্যেয় শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যানে চিত্ত সংলগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরই প্রোজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। শ্রীল রামানন্দ রায় ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নয়ন উন্মীলন-পূর্ব্বক দেখেন যে, তাঁহার ধ্যান-দৃষ্ট মহাপুরুষ সশরীরে বিরাজমান। প্রহরিগণের অলক্ষ্যে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দ রায়ের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ধ্যান-মন্দিরে তাঁহাকে দর্শন দান করেন। তখন শ্রীরামানন্দ রায়—

আপাদ-মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর-অঙ্গ দেখি' হিয়ায় উপজিল রঙ্গ।।
বিস্ময় লাগিল, ন্যাসী আইলা কেমতে।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিতে হাসিতে।।
"মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে?
বড়ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে।।"
প্রভু কহে,—"তুমি কেনে না চিন আপনা?
আমারে না চিন, আমি নিতে আইলুঁ তোমা।।"
এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট-অট্ট হাস।
আপনা চিনায় প্রভু, করে পরকাশ।।
যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ-শ্বেতরক্ত-দ্যুতি।
সকল দেখায় এক গৌর-মূরতি।।
কষিত এ দশবাণ কাঞ্চন-বরণ।
তাহা ছাড়ি' হৈলা প্রভু শ্যাম-সুচিক্কণ।।
কানড়া-কুসুমাকৃতি অঙ্গের বরণ।
ময়ূর-শিখণ্ড শিরে—মুরলীবদন।।

নানা আভরণ অঙ্গে, চিকণীয়া কালা।
পীতবস্ত্র পরিধান—গলে বনমালা।।
তাহা দেখি' মহারাজ আনন্দিত-মন।
পুনরপি হৈলা প্রভু গৌর-বরণ।।
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ আর যত লতা-পাতা।
গৌর-অঙ্গ-ছটা ঝলমল করে তথা।।
দেখিয়া জানিল রাজা রামানন্দ রায়।
প্রেমায় বিহ্বল, ধরে নিজ-প্রভু-পায়।।
চরণে পড়িয়া কান্দে, অবশ শরীর।
করে ধরি' লঞা প্রভু ভৈগেলা বাহির।।

(শ্রীচৈঃ মঃ, শেষখণ্ড ১০১-১১৩)

শ্রীল রামানন্দের রচিত গ্রন্থ

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' অথবা 'শ্রীরামানন্দ-সঙ্গীত-নাটক'—যাহা 'রায়ের নাটকগীতি'-নামে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেই গ্রন্থরাজই শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর অসমোর্দ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভ।

"সর্ব্ববিদ্যানদীবিলাসগাম্ভীর্য্যমর্য্যাদাস্থৈর্য্যপ্রসাদাদিগুণরত্নাকরস্য সুরগুরু-প্রণীতনীতি-কদম্বকরম্বিত-মন্ত্রাশ্রবীকৃতপ্রগুণ-পৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দরায়স্য তনুজেন শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতমানসেন শ্রীরামানন্দরায়েণ কবিনা তত্তদ্গুণালঙ্কৃতং 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামক গজপতি-প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং রামানন্দ-সঙ্গীতনাটকং নির্ম্মায় সমর্পিতমভিনেষ্যামি।"

শ্রীসূত্রধারের এই নান্দীপাঠ হইতে জানা যায় যে, শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতৃদেব শ্রীভবানন্দ রায় সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গত ও সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতচিত্ত কবি শ্রীরামানন্দ রায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রিয় 'শ্রীরামানন্দ-সঙ্গীত-নাটক' বা 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নাটকটী শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীল রামানন্দ রায়ের মিলনের পূর্ব্বে গজপতি

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অভীষ্টানুসারে রচিত হইয়াছিল। এই নাটকের মঙ্গলাচরণে এবং প্রত্যেক সঙ্গীতের মধ্যে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কীর্ত্তি, গুণ ও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে সূত্রধার বলিতেছেন,—

"যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবেশিতঃ সেকেন্দরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষ্যতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতির্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ।।
কায়ব্যূহবিলাস ঈশ্বরগিরের্দ্বৈতং সুধাদীধিতে-
র্নির্যাসস্তুহিনাচলস্য যমকং ক্ষীরাম্বুরাশেরসৌ।
সারঃ শারদবারিদস্য কিমপি স্বর্ব্বাহিনী-বারিণো
বৈরাজ্যং বিমলীকরোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশির্জগৎ।।
যদ্দানাম্বুকস্বনির্ম্মিতনদীসংশ্লেষহর্ষাদসৌ
রিঙ্গত্তুঙ্গতরঙ্গ-নিস্বনমিষাৎ প্রস্তৌতি যং বারিধিঃ।
নিত্যপ্রস্তুতসপ্ততন্তুভিরভিস্যূতং মনো নাকিনাং
যেনৈতৎ প্রতিমাচ্ছলেন যদমী মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণম্।।

তেন প্রতিভটনৃপঘটাকালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।"

যাঁহার নাম শ্রবণ করিবা মাত্র 'সেকেন্দর'-নামক ম্লেচ্ছ-নৃপতি ভীতচিত্তে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে এবং কলবর্গভূমিপালকবর নিজ পরিবারবর্গকে সাশ্রুনয়নে দেখিতেছেন, যাঁহার নামমাত্র-শ্রবণে গুর্জ্জরদেশীয় ভূপতি নিজ রাজধানীকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় বোধ করিতেছেন এবং গৌড়দেশীয় ক্ষিতিপাল আপনাকে প্রবল বাত্যাবেগে ঘূর্ণিত সমুদ্রস্থ নৌকায় আরূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বোধ করিতেছেন, যাঁহার কীর্ত্তিরাশি কৈলাসপর্ব্বতের কায়ব্যূহস্বরূপ, সুধাদ্যুতির দ্বিতীয়-স্বরূপ, হিমালয়ের নির্যাস-সদৃশ, ক্ষীরসমুদ্রের ফেনস্বরূপ, শারদমেঘের ন্যায় ও সুরতরঙ্গিণীর পবিত্র-জলধারার ন্যায় জগৎকে নির্ম্মল করিতেছে, যাঁহার দানোৎসর্গ-বারি হইতে জাত নদীসমূহের সঙ্গ লাভ করতঃ সমুদ্র হর্ষান্বিত হইয়া

চঞ্চল উচ্ছলিত তরঙ্গ প্রকাশ করিয়া উচ্চধ্বনিচ্ছলে যাঁহার স্তব করিতেছে, যাঁহার নিত্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা দেবতা-সকল বদ্ধচিত্ত হইয়া প্রতিমাচ্ছলে ক্ষণকালের জন্যও যাঁহার প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করেন না, সেই বিপক্ষ-রাজগণের কালাগ্নি রুদ্র-স্বরূপ শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র শ্রীহরির বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন একটী প্রবন্ধ অভিনয় করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন।

এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আদেশে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' রচিত হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরের উক্তি হইতে জানা যায় যে, এই নাটকটী সম্পূর্ণ মৌলিকবিষয়-অবলম্বনে রচিত। ইহা কোন পুরাতন আদর্শকে অবলম্বন করিয়া তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপে নির্ম্মিত হয় নাই।

মধুরিপুপদলীলাশালি তত্তদ্‌গুণাঢ্যং
সহৃদয়হৃদয়ানাং কামমামোদহেতুম্।
অভিনবকৃতিমন্যচ্ছায়য়া নো নিবদ্ধং
সমভিনয় নটানাং বর্য্য কিঞ্চিৎ প্রবন্ধম্।।

ওহে নটশ্রেষ্ঠ। যাহা শ্রীকৃষ্ণলীলাময় ও যাহা সদ্‌গুণান্বিত হইয়া সামাজিক-দিগের চিত্তকে আনন্দিত করে, এরূপ একটী অভিনব প্রবন্ধের অভিনয় কর। কিন্তু তাহা যেন অন্যান্য কোন পুরাতন প্রবন্ধকে আদর্শ করিয়া তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপে নির্ম্মিত না হয়।

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' পঞ্চ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে 'পূর্ব্বরাগ', দ্বিতীয় অঙ্কে 'ভাব-পরীক্ষা', তৃতীয় অঙ্কে 'ভাব-প্রকাশ', চতুর্থ অঙ্কে 'শ্রীরাধাভিসার' ও পঞ্চম অঙ্কে 'শ্রীরাধা-সঙ্গম' বিষয়বস্তুরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ২১টী সঙ্গীত (সংস্কৃত পদ) আছে। উক্ত সঙ্গীতসমূহ অনেকটা শ্রীজয়দেবের 'শ্রীগীত-গোবিন্দে'র সঙ্গীতের অনুরূপ। প্রত্যেক সঙ্গীতের ভণিতায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীরায়-রামানন্দের নামোল্লেখ আছে; যথা,—

সুখয়তু গজপতিরুদ্রমনোহরমনুদিনমিদমভিধানম্।
রামানন্দ-রায়-কবিরচিতং রসিকজনং সুবিধানম্।।

(১ম অঙ্ক)

গজপতিরুদ্র-মনোহরমহরহরিদমনুরসিকসমাজম্।
রামানন্দ-রায়-কবিভণিতং বিহরতু হরিপদভাজম্।।

(২ অঙ্ক)

সুখয়তু রুদ্রগজাধিপচিত্তম্।
রামানন্দ-রায়-কবিভণিতম্।।

(ঐ)

উদয়তু রুদ্রগজাধিপহৃদয়ে।
রামানন্দ-ভণিতমতিসদয়ে।।

(ঐ)

গজপতিরুদ্রমুদে সমুদিতম্।
রামানন্দরায়-কবিগীতম্।।

(৩য় অঙ্ক)

গজপতিরুদ্রনরাধিপহৃদয়ে বসতু চিরং রসসারে।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং পরিচিতকেলিবিচারে।।

(ঐ)

সুখয়তু রুদ্রগজেশম্।
রামানন্দরায়কৃতমনিশম্।।

(৪র্থ অঙ্ক) ইত্যাদি

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss.-পুস্তকে (Vol. IV, No. 1672) ও Catalogus Catalogorum-এর ১ম খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'শ্রীগোবিন্দবল্লভ'-নামক আর একটী পঞ্চাঙ্ক নাটক শ্রীরায়-রামানন্দের রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

নারায়ণকবি তাঁহার 'সঙ্গীতসার'-নামক পুস্তকে শ্রীরামানন্দ-কবিরায়ের 'ক্ষুদ্রগীতপ্রবন্ধ'-নামক একটী সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে 'চিত্রপদ'-নামক একটি গান উদ্ধার করিয়াছেন। উহার পদে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

"জয়তু রুদ্রগজেশমুদিতরামানন্দ-কবিরায়-কবিগীতম্।"

শ্রীল রামানন্দ প্রভু নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিকজন। সুতরাং তিনি যে "শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটক" রচনা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র অনর্থনির্ম্মুক্ত রাগানুগগণেরই আস্বাদনের যোগ্য।

শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভুর রচিত সংস্কৃত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে'র শ্লোকসমূহ শ্রীলোচন দাসের ভণিতায় বাঙ্গালা-পদে রূপান্তরিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 'অকিঞ্চনদাস'-নামক এক ব্যক্তি উক্ত নাটকের একটি পদ্যানুবাদ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ঐ পুঁথি দৃষ্ট হয় (পুঁথি সংখ্যা ১৫১২)। 'গোপালদাস'-নামক আর এক ব্যক্তির রচিত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে'র একটি অনুবাদের পুঁথিও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক ব্যতীত শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীপদ্যাবলী'তে শ্রীরামানন্দ প্রভুর রচিত একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভুর কৃত বলিয়া 'শ্রীপদ্যাবলী'তে উল্লিখিত আছে এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে।।

যেমত জঠরে যে-পর্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দে গলিত হয়।

নিম্নলিখিত শ্লোকটিও কোথায়ও কোথায়ও শ্রীল রামানন্দ রায়ের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।।

কোটিজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিতমতি যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।

শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর স্ব-রচিত প্রাচীনতম ব্রজবুলী পদটী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্য, ৮ম পরিচ্ছেদ, ১৯২ সংখ্যা) উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র ১৩শ সর্গে এই পদটি উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরও তাঁহার 'পদামৃতসমুদ্রে' ঐ সঙ্গীতটী আহরণ করিয়া তাহার একটী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সঙ্গীতটী এই,—

"পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল।।
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি'।।
এ সখি, সে-সব প্রেম-কাহিনী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরল জানি'।।
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ।।
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সু-পুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি।।"

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' নিম্নলিখিত ২টি পদ ভণিতারূপে দৃষ্ট হয়,—

বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ-রায় কবি ভাণ।।

শ্রীল রায় রামানন্দ-কৃত এই গীতির ভাষ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"শ্রীরামানন্দ রায়ের উক্তি হইতে যে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র অন্তর্গত 'মোহন-মাদনাদি অধিরূঢ় মহাভাবে'র বিলাস-বৈচিত্র্য ও বিলাস-বিবর্ত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিতে প্রাকৃত-সহজিয়া অসমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীরামানন্দের গীতার্থকে কেবল নির্ব্বিশেষবাদে লইয়া যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইবেন, কিন্তু তাহা শ্রীরামানন্দের বক্তব্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রোতব্য বিষয় ছিল না; এই জন্যই ভজনের নিগূঢ় চমৎকারিতা ও অপূর্ব্বতা অর্ব্বাচীন জড়-দার্শনিক-সমাজে প্রচার করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর স্বহস্তে শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণগানরত বদনকমল আবৃত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বাহ্যজগদ্দর্শনশীল জড় দার্শনিকের অনুভূতির দ্বারা এই গীত যে অনুভবনীয় নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'না সো রমণ, না হাম রমণী' এই পদব্যাখ্যার বিবর্ত্ত জড়-বিবর্ত্তবাদীকে গ্রাস করিলে বিষয়-আশ্রয়-রাহিত্যরূপ কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধিকে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলাইয়া পুনরায় জড়ীয়-বিবর্ত্তেই ফেলিয়া দেয়। এস্থলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—'না সো রমণ, না হাম রমণী'—এই বাক্যে বাস্তব সত্যকে ধ্বংস করা হয় নাই, কিন্তু বস্তুতে বস্তুশক্তি-পরিচয়ে যে অশুদ্ধ-দ্বৈতাশঙ্কা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারই নিরসন উদ্দিষ্ট হইয়াছে।"

তিরোভাব-প্রসঙ্গ

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' দৃষ্ট হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে সেই বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাণত্যাগ করেন।

স্থিত্বা তত্র শ্রীময়ো গৌরচন্দ্রঃ
ক্বচিৎ কালং তেন ভূয়োঽধ্বনৈব।
কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতস্থে
বিচ্ছেদার্ত্তাংস্তত্র তাংস্তান্ বিহায়।।
রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়া-
ক্ষীণক্ষীণস্তত্যাজাসূন্ মহাত্মা।
বিচ্ছেদে স্যাদ্ যোগ্যমেতচ্চরিত্রং
প্রেম্নস্তাবত্তাদৃশস্যাস্য নূনম্।।

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করতঃ বিরহার্ত্ত তাঁহাদিগকে (ভক্তবৃন্দকে) পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই (শ্রীবৃন্দাবনে গমনের) পথে শ্রীযমুনা তীরে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা শ্রীল রায় রামানন্দ তাঁহার বিয়োগপীড়ায় পীড়িত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে হইতে (অবশেষে) প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ 'মৃত্যু'-নামক দশা প্রাপ্ত হইলেন। বিচ্ছেদে তাদৃশ প্রেমের ঐরূপ স্বভাবই যোগ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এইস্থানে 'প্রাণত্যাগ' বা 'মৃত্যু'-শব্দে সাধারণ-প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হয় নাই। অপ্রাকৃত বিরহের দশমী দশার নাম—'মৃত্যু'। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদবে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইবার পরেও শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত পুনর্মিলিত হইয়া নীলাচলে বিবিধ লীলা প্রকট করিয়াছেন। 'শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায়'ও ৪র্থ প্রক্রমে ১৫শ সর্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রত্যাগমনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১৫শ সর্গে লিখিত আছে,—

ততো গজপতী রাজা দর্শনার্থং মহাপ্রভোঃ।
সার্ব্বভৌমং সমাহূয় রামানন্দ-সমন্বিতম্।।

(১ম শ্লোক)

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরও শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুর অবস্থানের কথা দৃষ্ট হয়,—

হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি'।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা (প্রতাপরুদ্র) লুটায় ধরণী।।
শিরে করাঘাত করি' হৈল অচেতন।
রায়-রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন।।

(শ্রীভঃ রঃ ৩।২১৭-৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের অত্যল্প দিবস পরেই শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু নীলাচলে গমন করেন; যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে,—

সবে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসেরে দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলা সার্ব্বভৌমের বাটীতে।।
তথায় শ্রীরায়-রামানন্দের গমন।
দোঁহে বসি' গায় গৌরচন্দ্রের গুণগণ।।

* * *

মহা-শোক-সমুদ্রে ভাসয়ে দুইজনে।
শ্রীনিবাসে দেখি' সুখ উপজিল মনে।।

(শ্রীভঃ রঃ ৩।১৫৫-১৫৬, ১৫৮)

উপসংহারে আমরা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর উক্তি আবৃত্তি করিয়া বলিতেছি,—

সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর।।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা—তা'তে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন।।
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁ'র মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৩০৩, ৩০৪, ৩১০)

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি

শ্রীশ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভুর চরিত-বিবরণ তাঁহারই অভিন্ন-সুহৃৎ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর ন্যায় বৈষ্ণব-সাহিত্যে অধিক কিছু পাওয়া যায় না। কারণ, ইঁহারা উভয়েই মহাবিবিক্ত ভজনানন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শ্রীগৌরলীলার প্রেমিক ছিলেন। এমন কি, কথিত হয় যে—শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনের পূর্ব্বেও ইঁহারা দুইজন অভিন্নাত্মরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ব্রজমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের সকলেই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-মকরন্দ-সেবনে প্রমত্ত ছিলেন, তথাপি ভজন-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য-প্রকটনকল্পে পরস্পর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্ম্মৎসর হইয়া তাঁহারা সজাতীয়াশয় সহচররূপ কাহাকে কাহাকেও নির্ব্বাচন করিতেন। যেরূপ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ পরস্পর অভিন্নাত্মারূপে শ্রীব্রজ-ভজন করিতেন, তদ্রূপ শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ প্রভু, পরবর্ত্তীকালে শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রমুখ শ্রীগৌরপ্রণয়িগণ সজাতীয়াশয় সহচররূপে স্ব-স্ব ভজন-বৈশিষ্ট্য-লীলা প্রকট করিয়াছেন। ইঁহারা যে বাহ্যদৃষ্টিতে সকলেই একই ভজনকুটীর বা প্রকোষ্ঠের মধ্যে বাস করিতেন, তাহা নহে; পরন্তু ইঁহারা সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট সঙ্গযোগ্য মিত্রজ্ঞানে পরস্পরের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের এই প্রীতি ও সঙ্গকামনা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবানুগত্যের চমৎকারিতা ও শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিত। এক এক জনে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি দল বাঁধিয়া পরস্পরের মধ্যে মৎসরতা, অসূয়া প্রভৃতির কৃষ্টিসাধন দূরে থাকুক, কল্পনাতেও তাহা তাঁহাদের চতুঃসীমানায় উপস্থিত হইতে দিতেন না।

শ্রীভূগর্ভ ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভু এইরূপ অভিন্নাত্মা নিত্যসুহৃদ্রূপে যখন শ্রীব্রজমণ্ডলে ভজন করিতেন, তখন তাঁহাদেরই অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্য-লীলা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু দৈন্যভরে লিখিয়াছেন,—

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁ'র মুখে অন্য নাই।।

তাঁ'র শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস।।
আচার্য্য-গোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁ'র চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ।।
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন।।
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৬৮-৭২)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর এই দৈন্যোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু ও তাঁহার শিষ্য—শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীশ্রীরূপ-প্রাণেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী ও প্রেমী শ্রীকৃষ্ণদাস প্রমুখ শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীশ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের শেষলীলা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য ও তাঁহার প্রিয়শিষ্য পণ্ডিত শ্রীহরিদাস নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' শ্রবণ করেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দলীলা-বর্ণনে আবিষ্ট হইয়া গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের শেষলীলা অবশিষ্ট রাখিয়া যান। শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীগৌরভক্তগণের সেই লীলা-শ্রবণে যাঁহাদের অভিলাষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীল ভূগর্ভ-গোস্বামি-প্রভু ও তাঁহার শিষ্যগণের নাম বিশেষভাবে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি শ্রীগুরুবর্গ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুকে তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থে যেন তাঁহাদের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা না হয়। ইহা দ্বারা তাঁহারা জীবকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, কোন প্রকার প্রতিষ্ঠাশার লেশ থাকিলেও হরিভজন হয় না। কামিনী-কাঞ্চনকে ফল্গুত্যাগী মায়াবাদিগণও পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতত্ত্বের সর্ব্বাপেক্ষা বিরোধিতত্ত্ব জড়প্রতিষ্ঠাশা। যাহার প্রতিষ্ঠা-কামনা আছে তাহার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি বা অনুরাগ নাই। এ জন্য শ্রীমনঃশিক্ষায় ও

শ্রীব্রজবিলাসাদি স্তবের প্রারম্ভেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু প্রতিষ্ঠাশাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা করিয়াছেন। মহাবিবিক্ত-ভজনানন্দীর লীলাভিনয়কারী শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুকে তাঁহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে নিষেধ করায় আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু বিবরণ পাই না। হয় ত' এই কারণেই শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভুর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' করেন নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর কৃপায় আমরা অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভের কথা কিছু জানিতে পারি। শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য। শ্রীগৌরকথা-কীর্ত্তনেই তিনি অখিল কাল যাপন করিতেন। তাঁহার এক এক জন শিষ্যও মহাভাগবত। শ্রীগোবিন্দদেবের পূজক শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দ সর্ব্বদা শ্রীগৌরলীলাকথামৃতপানে উৎসুক ছিলেন।

শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভু, শ্রীল গোপালভট্ট, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে "ষড়্‌গোস্বামী" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তদ্রূপ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভুও যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম গোস্বামিরূপে তদানীন্তন গৌড়ীয়- বৈষ্ণবসমাজে পূজিত হইতেন। এখনও ষড়্‌গোস্বামীর ন্যায় তাঁহারা আরাধিত হইয়া থাকেন। সংশয় হইতে পারে, গোস্বামিত্ব ছয় জনের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া 'দশ' কিংবা দ্বাদশ গোস্বামী' বলিলে আপত্তি কি ছিল? যাঁহারা শ্রীরূপ-সনাতনের পূর্ব্বেও শ্রীব্রজবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, শ্রীল শ্রীজীব প্রভৃতি ষড়্‌গোস্বামী অপেক্ষাও যাঁহারা অধিক বর্ষীয়ান ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ-গোস্বামিগণে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া কেবল ষড়্‌গোস্বামিরূপে একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হয় কেন? ইঁহার কারণ এই যে, শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপাদি গোস্বামিবৃন্দ বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রচারাদি কার্য্য করিয়া আচার্য্যের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু অন্যান্য গোস্বামীর ন্যায় সিদ্ধান্ত, লীলা বা স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ রচনা না করিলেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতা আচার্য্য ছিলেন। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠেই অবগত হওয়া যায়। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু—

রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন।
ভাগবত-পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁ'র মন।।

* * *

নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১২৬, ১৩১)

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু উভয়েই বিবিক্ত-ভজনানন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল ভাগবতদাস প্রভুকে একসঙ্গে শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১২।৮১)

শাখানির্ণয়-গ্রন্থেও (৩১ সংখ্যা) এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্।
সদা রাধাকৃষ্ণলীলাগানমণ্ডিতমানসম্।।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীব্রজের 'প্রেমমঞ্জরী' বলিয়া গণনা করিয়াছেন,—

"ভূগর্ভ-ঠকুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।"

শাখানির্ণয়েও উক্ত হইয়াছে,—

গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্।
সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্।।
শ্রীল-গোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্।
দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্।।

ভূগর্ভ হইতে উত্থিত অর্থাৎ অতিমর্ত্ত্য সুবিখ্যাত শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু, যিনি সর্ব্বদা মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট, তাঁহাকে বন্দনা করি। তিনি শ্রীল গোবিন্দদেবের সেবাসুখবিলাসী, জীবের প্রতি দয়ালু, প্রেমদানকারী, অতিশয় বিমল চিত্ত ও সর্ব্বদাই আনন্দমূর্ত্তি।

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীরূপের গণ'-রূপে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীমথুরায় শ্রীবিঠ্ঠলের গৃহে একমাস-কাল শ্রীগোপালদেবের দর্শন ও নৃত্যগীতাদি করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দৈন্যবোধিকা প্রার্থনার মধ্যে শ্রীব্রজে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মসেবা লাভ করিতে হইলে যে নয়জন গোস্বামি-প্রভুর কৃপালাভ একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছেন—

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ, না ভজিনু তিল-আধা,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইঁহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ।।

শ্রীনাভাজীকৃত হিন্দি 'ভক্তমাল'-গ্রন্থের "বার্ত্তিকপ্রকাশে" শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

"গুসাই শ্রীভূগর্ভজী" নে ধামনিষ্ঠা দৃঢ়তাপূর্ব্বক বৃন্দাবনবাস কিয়া ঔর অতি অনূপ "শ্রীগোবিন্দ"কুঞ্জ (মন্দির) মেং বিরাজমান হোকর শ্রীগোবিন্দদেবজীকে প্রেমকে সুখ লিয়ে; আপ্ সংসার সেং অতি বিরক্ত, ঔর প্রভুরূপমাধুরীকে অতি হী অনুরক্ত থে; ভক্তভূপোং কে সাথ মেং মিলে হুএ উসী মাধুরী কা স্বাদ লেতে থে। মানসী সেবা হী কা চিন্তবন আপ্কা আহার থা; মন কী বৃত্তিরূপ দৃষ্টি সে গৌরশ্যাম-যুগল-স্বরূপ হী কো নিহারতে রহতে থে।।

আপ্‌কী অগম্য দশাকো মৈংনে অপ্‌নী বুদ্ধিকে প্রমাণ হী ভর অনুমান কর্‌কে কিয়া হৈ; আপ্‌কে হৃদয় মেং অথাহ প্রেমরংগ ভরা থা; উস্‌কো রসরূপ সন্ত হী জান্‌তে থে।।

তাৎপর্য্য—গোস্বামী শ্রীভূগর্ভ সুদৃঢ় ধামনিষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বাস করিয়া অতুলনীয় শোভাসম্পন্ন শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে বিরাজমান হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের প্রেমসুখের জন্য জীবনধারণ করিয়াছিলেন। তিনি সংসারের প্রতি অতিশয় বিরক্ত, কিন্তু শ্রীগোবিন্দরূপমাধুরীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই মাধুরীর আস্বাদন করিতেন। অষ্টকালীয় মানসী সেবা তাঁহার জীবাতু ছিল এবং সর্ব্বক্ষণ তিনি শ্রীশ্রীগৌর-শ্যামের যুগল-স্বরূপের অন্তঃসাক্ষাৎকার করিতেন। তাঁহার ক্রিয়ামুদ্রা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য ছিল। তাঁহার হৃদয় প্রেমরসে ভরপুর ছিল। কেবল শ্রেষ্ঠ সাধুগণই তাঁহার প্রেমরসভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা বুঝিতে পারিতেন।

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজ-জন দ্বাদশ-'গোপালে'র অন্যতম শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের নাম বৈষ্ণবজগতে কাহারও অবিদিত নাই। শ্রীব্রজ-লীলায় যাঁহারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সখা, তাঁহারাই 'গোপাল'-নামে অভিহিত হন। মহাজনগণ শ্রীশ্রীবলদেবের শ্রীনিত্যানন্দ-লীলায় দ্বাদশজন 'গোপালে'র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।২১)

(১) শ্রীল অভিরাম ঠাকুর, (২) শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর, (৩) শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীল কালাকৃষ্ণ দাস, (৫) শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত, (৬) শ্রীল ধনঞ্জন পণ্ডিত, (৭) শ্রীল পরমেশ্বরী দাস, (৮) শ্রীল পুরুষোত্তম দাস বা নাগর-পুরুষোত্তম, (৯) শ্রীল পুরুষোত্তম পণ্ডিত, (১০) শ্রীল মহেশ পণ্ডিত, (১১) শ্রীল শ্রীধর ঠাকুর (খোলাবেচা) ও (১২) শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর—ইঁহারা 'দ্বাদশ-গোপাল' নামে খ্যাত।

"সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁ'র সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ-নর্ম্ম।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।২৩)

শ্রীল সুন্দরানন্দ-গোপাল শ্রীশ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের মর্ম্মী অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভৃত্য। তিনি শ্রীশ্রীবলদেবের ব্রজলীলার নিত্য সহচর। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় শ্রীল সুন্দরানন্দ-গোপালকে ব্রজের শ্রীসুদাম-সখা বলিয়াছেন।

"পুরা সুদাম-নামাসীদ্ অদ্য ঠক্কুর-সুন্দরঃ।"

(শ্রীগৌঃ গঃ, ১২৭)

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তৎকৃত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় ব্রজের শ্রীসুদাম-সখার পরিচয়-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ঈষদ্গৌরঃ সুদামা চ দেহকান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্রপরীধানো রত্নাভরণ-ভূষিতঃ।।
পিতা চ মটুকো নাম রোচনা জননী ভবেৎ।
সুকিশোরবয়োবেশো নানাকেলি-রসোৎকরঃ।।"

(শ্রীরাঃ কৃঃ গঃ লঘু, ৪০-৪১)

শ্রীসুদামের দেহকান্তি মনোহারিণী ও ঈষদ্গৌরবর্ণা। তাঁহার পরিধানে নীলবসন ও তিনি রত্নময় আভরণে বিভূষিত। শ্রীসুদামের পিতার নাম—'মটুক', মাতার নাম—'রোচনা'। শ্রীসুদাম সুন্দর কিশোর বয়সে সুশোভিত ও নানাপ্রকার লীলারসে উৎসুক।

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর যশোহর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুরের অনুগমনে শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকালে শ্রীপাট মহেশপুর-দর্শন, তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণ ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব সহ ভক্তমণ্ডলী অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই বিবরণ ৪র্থ বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র ৪৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মহেশপুর পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে মাজদিয়া (পূর্ব্বে 'শিবনিবাস' নাম ছিল) ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৩ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই গ্রাম পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল; অধুনা যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কোট-চাঁদপুর হইতে নৌকাপথে প্রায় ছয় মাইল অতিক্রম করিয়া মহেশপুরে উপনীত হইতে হয়। পদব্রজে তথায় যাইতে প্রায় নয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়।

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাটে প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্নের মধ্যে একমাত্র শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-পীঠ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঐ ভিটার উপরে শ্রীতুলসী-কানন ও একটি নিম্ববৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে। তৎসংলগ্ন স্থানে জনৈক বাউল স্থানীয় জমিদারগণের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। গ্রামের অন্যত্র শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবা স্থানীয় জমিদারগণের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য জমিদারী ও বৃত্তি আছে; দেবলের দ্বারা পূজা হয়। ঐ স্থানে পৌষী কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব ও তদুপলক্ষ্যে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর বৃহদ্ব্রতীর লীলা করিয়াছিলেন। বীরভূম জেলার মঙ্গল-ডিহি গ্রামে শ্রীল সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি-বংশ আছেন। তথায় শ্রীশ্রীবলরাম জীউর সেবা আছে। সৈদাবাদের গোস্বামিগণ শ্রীল সুন্দরানন্দের শিষ্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। কথিত হয় যে, শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ শ্রীবিগ্রহ সৈদাবাদের গোস্বামিগণ লইয়া যান এবং পরে শ্রীপাট মহেশপুরে বর্ত্তমান শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন।

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোথায়ও মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে, কোথায়ও পৌষী কৃষ্ণ একাদশীতে, আবার কোথায়ও বা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে তিরোভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর পাণিহাটীর চিড়াদধি-মহোৎসবের সময় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬।৬১)। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 'সর্ব্বশেষ ভৃত্য' শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭২৮) বলেন,—

"প্রেমরস-সমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ-প্রধান।।"

শ্রীদেবকীনন্দন দাসের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় দৃষ্ট হয়,—

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটা'ল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে।।

কথিত হয় যে, ইনি প্রেমোন্মত্তাবস্থায় কুম্ভীরকে ধরিয়া আনিতেন, বনের ব্যাঘ্রকে ধরিয়া তাহার কর্ণে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করাইতেন। শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় ইনি বাল্যকালাবধি অবধূত-ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করিতেন।

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি

কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী তিথি শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভুর শিষ্যবর শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামি প্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে আরাধিত হইয়া থাকেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপবাসী শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলায় তাঁহার সংকীর্ত্তনরাসে নৃত্য ও প্রভুর সেবা করিবার লোভে পুরীতে স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বরের প্রিয় ও প্রধান উৎকলবাসী শিষ্যই শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকাশী মিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গদিতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা সম্প্রতি তাঁহারই কণ্ঠে আছে।" (জৈবধর্ম্ম, ৩য় সং—২৬শ অধ্যায়, ৪৪০ পৃষ্ঠা) শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু দুই-ভাগে রসোপাসনার কড়চা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর কণ্ঠে যথাক্রমে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও বহিঃপন্থা সংরক্ষণ করেন; তাহা হইতে একদিকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' প্রকট করেন; অন্যদিকে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু 'স্মরণ-ক্রম-পদ্ধতি' বা 'সেবা-স্মরণ-পদ্ধতি' শিষ্যপারম্পর্য্যে প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামি-প্রভুর রসোপাসনার এক ধারা যেরূপ শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপ্রভু হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুতে প্রবাহিত, তদ্রূপ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামি-প্রভুর রসোপাসনার অন্যধারাও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু হইতে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুতে সঞ্চারিত হইয়াছে। এ জন্যই, শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ একাধিক বার তাঁহার স্বরচিত-গ্রন্থ 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন যে, শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে 'শ্রীনিমানন্দ-সম্প্রদায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর গদিতে জগদ্গুরুরূপে বিরাজমান।' (জৈবধর্ম্ম, ৩য় সং—২৬শ অধ্যায়, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শ্রীমুখে 'জৈবধর্ম্মে'র শ্রীব্রজনাথ যে-সকল রসতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থধৃত

রসতত্ত্ব বিচার হইতে অভিন্ন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল গোপালগুরুকে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ বলিয়াই বিচার করিয়াছেন এবং শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীশ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর গদিতে জগদ্‌গুরুরূপে অবস্থান করায় শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তাহাতে সন্তোষই হইয়াছে, মাৎসর্য্যের উদয় হয় নাই। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিধর্ম্ম-যাজনে আগ্রহশীল সম-সাময়িক শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুকে "শ্রীনিমানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রধানগুরু" বলিয়াই বরণ করিয়াছিলেন।

কোন কোন প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকামী সমৎসর সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, পূর্ব্বাচার্য্যের গদিতে যোগ্য শিষ্য আচার্য্যরূপে উপবেশন করিলে অমনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের আসন-অধিকাররূপ গুর্ব্ববজ্ঞা বা অহংগ্রহোপাসনা হইয়া পড়ে। শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু নিশ্চয়ই অহংগ্রহোপাসনা বা গুর্ব্ববজ্ঞার প্রশ্রয় দেন নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ বিচারের পক্ষপাতিত্ব করেন নাই; বস্তুতঃ শ্রীব্যাসগদি বা শ্রীগুরুগদিতে শ্রীগুরুদেবের কৈঙ্কর্য্য করিবার জন্য যে আচারবান্ স্নিগ্ধ যোগ্য শিষ্য উপবেশন করেন, তদ্দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত-সেবা, সন্তোষোৎপাদন ও ভুবনমঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে।

শ্রীনীলাচলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পুরোহিতবর শ্রীকাশী মিশ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। কথিত হয় যে, পরে সেইস্থান শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত লাভ করেন এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় তথায় শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। কেহ কেহ বলেন,—পুরীর শ্রীরাধাকান্তমঠ শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর দ্বারাই স্থাপিত হয়। শ্রীরাধাকান্ত-মঠের একদিকে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও অন্যদিকে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি-প্রভুর আসন-ঘর এবং তথায় বর্ত্তমানে ঐ শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামীর শ্রীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন। উৎকল-প্রদেশে তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই গৌড়ীয়বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীনীলাচলে শ্রীকাশী মিশ্রের ভবনে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর সহিত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মিলন-প্রসঙ্গ এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"নরোত্তম গেলা কাশী মিশ্রের ভবনে।
শ্রীগোপালগুরু-সহ হইল মিলন।।
তেঁহ নরোত্তম-প্রতি অতি স্নেহ করি'।
সুমধুর বচনে কহয়ে ধীরি ধীরি।।
—'আছয়ে জীবন-মাত্র প্রভুর ইচ্ছায়।
দেখিতে এ-স্থান প্রাণ বিদরিয়া যায়।।
অহে নরোত্তম! দেখ, পরম নির্জ্জনে।
বসিতেন প্রভু একা এই তৃণাসনে।।
এইখানে মহাপ্রভু করিত শয়ন।
শ্রীগোবিন্দ করিতেন পাদ-সম্বাহন।।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ প্রেম এথা প্রকাশিলা।
কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা?'
নরোত্তম দেখি' প্রভু-শয়ন-আসন।
ভূমে লোটাইয়া কৈল অনেক ক্রন্দন।।
শ্রীগোপালগুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায়।
নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায়।।
শ্রীগোপালগুরু কতক্ষণে স্থির হইয়া।
নরোত্তমে স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া।।
যথা যথা প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন হইলা।
সে-সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা।।
শ্রীবক্রেশ্বরের চারু চরিত্র কহিল।
শ্রীরাধাকান্তের পাদপদ্মে সমর্পিল।।"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর—৮।৩৮২-৩৯২)

শ্রীগোপালগুরুর রচিত 'স্মরণক্রম-পদ্ধতি' বা 'সেবাস্মরণ-পদ্ধতি' এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র-কৃত 'শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি'-গ্রন্থ শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের শ্রীহস্তলিখিত এবং শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে সংগৃহীত উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি দর্শন করা হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গদি হইতে ঐ গ্রন্থটী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন প্রাচীন মঠাদিতে এই গ্রন্থটী সংরক্ষিত থাকায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ যে, এই গ্রন্থের সমাদর করিতেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। শ্রীল গোপালগুরুর 'সেবাস্মরণ-পদ্ধতি'তে যে-সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদর্শিত হইল। ঐ গ্রন্থে ভজন-প্রণালী ও পদ্ধতিসমূহ বর্ণিত হওয়ায় মূল-গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশিত নহে।

'সেবাস্মরণ-পদ্ধতি'তে শ্রীল গোপালগুরু-প্রভু নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল বক্রেশ্বর প্রভুকে শ্রীব্রজলীলার শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"বক্রেশ্বরপণ্ডিতঞ্চ বন্দে শ্রীতুঙ্গবিদ্যকাম্।
শ্রীচৈতন্যং শচীপুত্রং বন্দে শ্রীনন্দনন্দনম্।।"

গ্রন্থের স্থানান্তরে তিনি লিখিয়াছেন,—

"বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতিমাপন্না হি কলৌ যুগে।"

শ্রীল গোপালগুরুপ্রভু শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপকে কি-ভাবে দর্শন করিতেন, তাহা তাঁহার 'স্মরণ-পদ্ধতি' গ্রন্থোক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের অর্চ্চন-পদ্ধতির প্রারম্ভের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়,—

"সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং শয়নাদুত্থায় সংস্কৃতশরীরাংশুকঃ সন্ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরাৎপরগুরু-পরমপ্রেষ্ঠগুরু-গোস্বামিচরণান্ ক্রমেণ দণ্ডবৎ প্রণম্য ততঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্য শ্রীস্বরূপ-রূপপ্রমুখ-ভক্তমুখ্যান্ প্রণম্য ততঃ শ্রীচৈতন্যদেবং প্রণম্য শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরাৎপরগুরু-পরমপ্রেষ্ঠগুরু-গোস্বামিক্রমেণ তত্তদাজ্ঞয়া শ্রীচৈতন্যদেবস্য শয়নোত্থানাদি-পূর্ব্বক-পুনঃস্বাপ-পর্য্যন্তং নানোপকরণৈর্বিবিধ-পরিচর্য্যাং বিদধ্যাৎ।"

শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামি-কৃত 'স্মরণপদ্ধতি'র প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ এই,—

(১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; (২) শ্রীব্রজে মাধুর্য্যসেবার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণলীলায় নরলীলার ন্যায় ভীতি-প্রভৃতি ও জীবের সহিত ভেদবিচার; (৩) প্রকটাপ্রকট-লীলা—পারকীয়াত্ব, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীগণের ত্রিমাস-ব্যাপী বিরহ, দন্তবক্র-বধান্তে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন, ধামত্রয়ে লীলার নিত্যতা-প্রমাণ, গোপলীলার অসমোর্দ্ধত্ব, শ্রীবৃন্দাবনের গোলোকত্ব; (৪) রাগানুগা ভক্তির দ্বারা ভজন—কাম-রূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তি; (৫) অধিকারি-বিচার; (৬) সাধকদেহে সেবাপ্রণালী, —বয়স, বেষাদি-বিচার; (৭) বত্রিশ-অক্ষর ষোড়শ-নাম-মন্ত্রোদ্ধার; (৮) সেই মন্ত্রের তন্ত্রোক্ত ধ্যান; (৯) শ্রীগোপাল-মন্ত্রের উপাধার দশাক্ষর মন্ত্র; (১০) কামগায়ত্রী,—ধ্যান; (১১) শ্রীরাধাতত্ত্ব; (১২) শ্রীরাধামন্ত্রোদ্ধার; (১৩) শ্রীগুরু-স্মরণ-ক্রম; (১৪) শ্রীগুরুগায়ত্রী; (১৫) শ্রীগুরুবর্গের স্মরণবিধি; (১৬) শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী; (১৭) উত্থানাদি শয়ন পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ-সেবা; (১৮) সিদ্ধদেহে সখীরূপা শ্রীগুরুর পার্শ্বে শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দের সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরী-সমেত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-প্রণালী; (১৯) শ্রীযুগলমন্ত্র-ধ্যান; (২০) শ্রীযুগল-ধ্যান; (২১) পদ্ম; (২২) অষ্টসখীর পরিচয় ও তাঁহাদের মন্ত্র; (২৩) প্রত্যেক যূথ ও তাঁহার মন্ত্র; (২৪) সিদ্ধদেহে সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্মরণ-ক্রম; (২৫) অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-ক্রম; (২৬) মন্ত্রজপ-ক্রম।

'স্মরণক্রম-পদ্ধতি'-গ্রন্থের উপসংহারে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়,—

> কাষায়ান্ন চ ভোজনাদি-নিয়মান্নো বা বনে বাসতো
> ব্যাখ্যানদথবা মুনিব্রতভরাৎ চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
> কিন্তু স্ফীত-কলিন্দশৈল-তনয়া-তীরেষু বিক্রীড়তো।
> গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি।।

কাষায়বস্ত্র-পরিধান, ভোজনাদির সংযম, বানপ্রস্থাবলম্বন, ব্যাখ্যা অথবা মৌনধারণ প্রভৃতি মুনিগণের নিয়মের আতিশয্যদ্বারা মনোজন্মা কাম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু মহতী যমুনার তীরপ্রদেশে নিত্য বিহারকারী শ্রীগোবিন্দের পাদকমলসেবার কণামাত্র আরম্ভ হইলেই কাম অতি অনায়াসে নিবৃত্ত হয়।

শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে সংগৃহীত শ্রীআদিকন্দদাস-রচিত 'গুরুপ্রণালী'-গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে এইরূপ শিষ্য-পারম্পর্য্যের তালিকা পাওয়া যায়—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু

↓

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

↓

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী

↓

শ্রীধ্যানচন্দ্র মহন্ত গোস্বামী

↓

শ্রীধ্যানচন্দ্র মহন্ত গোস্বামী

↓

শ্রীবলভদ্র মহন্ত গোস্বামী

↓

শ্রীবনমালি-দাস গোস্বামী

↓

শ্রীপ্রভাকর-দাস গোস্বামী

↓

শ্রীসদানন্দ-দাস গোস্বামী

↓

শ্রীকল্পতরু-দাস গোস্বামী

↓

শ্রীপরমানন্দ-দাস-গোস্বামী

↓

শ্রীদীনবন্ধু-দাস গোস্বামী

↓

শ্রীআদিকন্দ-দাস

উক্ত 'গুরুপ্রণালী'-গ্রন্থে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু "শ্রীমঞ্জুমেধা সখী"-রূপে উক্ত হইয়াছেন। যথা,—

(শ্রী) বক্রেশ্বর-সমাখ্যাতো রসরূপ-স্বভাবতঃ।
সিদ্ধাখ্যা তস্য কথিতা তুঙ্গবিদ্যাভিধা তু যা।।

কৃষ্ণপ্রিয়সখীমধ্যে নাম্না তুঙ্গেতি বিশ্রুতা।
পণ্ডিতো ভক্তিযোগেন নিত্যং বক্রেশ্বরং ভজেৎ।।
অস্যাঃ অষ্টসখ্যো মঞ্জুমেধাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ।

তদ্‌যথা—

মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা, মধুসুধা, গুণচূড়া বরাঙ্গনা।।
অনুগোপী শ্রীগোপালগুরুরেব মহোত্তমঃ।
চৈতন্যকৃপয়া তস্যাঃ সিদ্ধাখ্যা মঞ্জুমেধিকা।।

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত উৎকলদেশীয় বৈষ্ণব-কবি ১৬৮০ শকাব্দে (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে) 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়'-নামক অষ্টাদশ সর্গ-সমন্বিত শ্রীগৌরলীলাত্মক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার উপসংহারে (১৮।৬০) * শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম শিষ্যরূপে উক্ত হইয়াছেন এবং উপক্রমের মঙ্গলাচরণে (১।৫) † শ্রীরূপ ও শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতাদি গুরুবর্গের বন্দনা আছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে শ্রীবক্রেশ্বরের প্রধান-শিষ্য শ্রীল গোপালগুরু-গোস্বামিপ্রভুর নামোল্লেখ নাই। খুব সম্ভব, কবি শ্রীল গোবিন্দদেব শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অনুগত শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর শাখাভুক্ত নহেন। তিনি স্বীয় গুরুদেবের নামও গ্রন্থের কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌরমন্ত্র-বিরোধী সম্প্রদায় শ্রীল গোপালগুরুর পদ্ধতি-গ্রন্থে প্রবেশাধিকারের অভাবে আত্মবঞ্চিতই হইয়াছেন। শ্রীল গোপালগুরু তাঁহার গ্রন্থে বহু সনাতন সাত্বত-শাস্ত্র হইতে শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরপূজাপ্রণালী উদ্ধার ও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রাপঞ্চিক

* প্রভোঃ প্রথমশিষ্য ইত্যথ বিমৃশ্য বক্রেশ্বরম্।
নিবেশ্য চ তদাশ্রমে নিজনিজং নিবাসং যযৌ।।

† ততঃ প্রণম্য প্রণয়েন মূর্দ্ধ্না
শ্রীরূপ-বক্রেশ্বর-পণ্ডিতাদ্যান্।

নায়কমাত্র নহেন, তিনি অনাদি ও আদি শ্রীগোবিন্দ সর্ব্বকারণ-কারণ, তদ্রূপ তাঁহার নাম, মন্ত্র ও পূজা-প্রণালীও নিত্য। ইহা শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামি-প্রভু শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উপদেশ-অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'স্মরণপদ্ধতি'-গ্রন্থে তিনি শ্রীল বক্রেশ্বর প্রভুকে শ্রীতুঙ্গবিদ্যা ও শ্রীশচীপুত্রকে শ্রীনন্দনন্দন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত্তীকালের শ্রীখণ্ডের গৌর-নাগরীবাদের ন্যায় কোন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ তিনি প্রচার করেন নাই। কারণ, তাঁহার কণ্ঠে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ ছিল।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুর, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর— তিন ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীল মুকুন্দদাস জ্যেষ্ঠ ও শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ। শ্রীল মুকুন্দদাস সরকারঠাকুরের আত্মজই—শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ইঁহাদিগকে 'শ্রীচৈতন্য-কৃপাধাম' মহাশাখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৮-৭৯)।

শ্রীল মুকুন্দদাস ঠাকুর বৈষ্ণব-গৃহস্থবেশে মহাভাগবতবর পরমহংস ছিলেন। ইনি লোকচক্ষে হুসেন সাহের দরবারে রাজবৈদ্যের কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু ইঁহার অন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে অভিষিক্ত ছিল। স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল মুকুন্দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২০),—

"বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজসেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার, জানিবেক কেবা।।"

একদিন শ্রীল মুকুন্দ বাদশাহকে দেখিবার জন্য রাজপ্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। যখন বাদশাহের নিকট একটী উচ্চ স্থানে বসিয়া শ্রীল মুকুন্দ চিকিৎসার কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় এক রাজসেবক একটী ময়ূরপুচ্ছের বৃহৎ ছত্র আনিয়া বাদশাহের মস্তকের উপর ধারণ করেন। সেই শিখিপিচ্ছ-দর্শনে শ্রীল মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়। ইহাতে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া উচ্চস্থান হইতে ভূতলে পতিত হন। বাদশাহ শ্রীল মুকুন্দকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া রাজবৈদ্যের দেহত্যাগ হইয়াছে বলিয়া বিচার করেন এবং স্বয়ং ভূতলে অবতরণ করিয়া রাজবৈদ্য কোন্ স্থানে ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীল মুকুন্দ বলেন যে, তিনি কোন ব্যথা পান নাই; তাঁহার মৃগীব্যাধি আছে বলিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ঐরূপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু বাদশাহ শ্রীল মুকুন্দের ছলনা ও আত্মগোপন-সত্ত্বেও তাঁহাকে 'মহাসিদ্ধ' বলিয়া ধারণা করেন। এই প্রসঙ্গটী শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভক্তগণ-সম্মুখে বর্ণন করিয়াছিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২১-১২৭ দ্রষ্টব্য)। এই মহাভাগবতবর মহাপ্রেমিক শ্রীগৌরপার্ষদের আত্মজই—শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর। ইনিও পিতার ন্যায় শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলাসহচর ও প্রেমিক মহাভাগবত ছিলেন। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যে শ্রীল মুকুন্দদাস, তৎপুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ও শ্রীমুকুন্দের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই

প্রধান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

"খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিন জন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১২)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুকুন্দ! তুমি ও শ্রীরঘুনন্দন—এই দুই-এর মধ্যে কে পিতা, কেই বা পুত্র? তুমি কি শ্রীরঘুনন্দনের পিতা? অথবা শ্রীরঘুনন্দনই কি পিতা, তুমি কি তাহার পুত্র? ইহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল; আমার সংশয় হইয়াছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুকুন্দ বলিলেন,—"শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র; কারণ, আমাদের সকলের কৃষ্ণভক্তি শ্রীরঘুনন্দনের অনুগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"মুকুন্দ! তোমার এই বিচারই ঠিক; কারণ, যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয়, তিনিই প্রকৃত গুরুজন। বয়সের কম-বেশীর দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ হয় না।"

মুকুন্দ কহে,—"রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তাঁ'র 'পুত্র',—এই আমার নিশ্চয়।।
আমা-সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার, নিশ্চিতে।"
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু,—"কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই গুরু হয়।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১৫-১১৭)

শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তি হইতে আমরা শ্রীমুকুন্দাত্মজ শ্রীরঘুনন্দনের মাহাত্ম্যের দিগ্‌দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারি। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবি-কর্ণপুর গোস্বামী শ্রীল রঘুনন্দনকে "তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখো ভবন্।
চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ।।

(শ্রীগৌঃ গঃ, ৭০ শ্লোক)

অর্থাৎ তৃতীয় ব্যূহ শ্রীপ্রদ্যুম্ন, যিনি প্রিয়নর্ম্মসখারূপে শ্রীব্রজে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন তনু শ্রীরঘুনন্দন।

প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি ও পদকর্ত্তৃগণের বিভিন্ন পদে শ্রীরঘুনন্দনের মহিমা কীর্ত্তিত রহিয়াছে; যথা,—

মুকুন্দদাসং তং বন্দে যৎসুতো রঘুনন্দনঃ।
কামো রতিপতির্ল্লড্ডুং যো গোপালমভোজয়ৎ।।

স চ রঘুনন্দন এষ বরেণ্যো নরহরি-শিষ্যঃ সুকৃতী মান্যঃ।
বাল্যাবধিতঃ সাধুচরিত্রো ভক্তিবিশোধিত-চিত্ত-পবিত্রঃ।।

শ্রীরঘুনন্দন যাঁহার পুত্র, যিনি রতিপতি কন্দর্পস্বরূপ (অর্থাৎ কন্দর্পবৎ কমনীয় রূপবান্), যিনি শ্রীগোপালকে লড্ডুক ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, সেই শ্রীমুকুন্দদাসকে আমি বন্দনা করি। (শ্রীমুকুন্দদাসপুত্র) সেই শ্রীরঘুনন্দন শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। তিনি বরেণ্য, সুকৃতিসম্পন্ন সজ্জনগণের মান্য, বাল্যকাল হইতে সাধুচরিত্র এবং ভক্তিবিশোধিত পবিত্র-চরিত্রবিশিষ্ট।

মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁ'র ভুবনমোহন।।

* * *

বন্দোঁ রঘুনন্দন, মূরতি মদন-সম,
জগৎ মোহিত যাঁ'র নাটে।

একসময় শ্রীখণ্ড-অঞ্চল শাক্ত তান্ত্রিক-পূজার পীঠস্থান ছিল; কিন্তু শ্রীল মুকুন্দদাস, শ্রীল নরহরি ও শ্রীল রঘুনন্দনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড ষোড়শ শতাব্দী হইতে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের একটী বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। শ্রীখণ্ডের প্রচারের কিছু বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব-সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ঐতিহাসিকগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'গৌরনাগরী'-মতবাদ বা 'গৌরবাদী'-মতবাদ উপরি-উক্ত শ্রীখণ্ডবাসী মুখ্য গৌরপার্ষদত্রয়ের অনুসৃত মতবাদ নহে। ইহা পরবর্ত্তীকালে মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের দ্বারা কল্পিত হইয়া উক্ত গৌরপার্ষদত্রয়ের নামের সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীল রঘুনন্দনের শিষ্যাণুশিষ্যগণের নামে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক বহু পদ প্রচলিত আছে। শ্রীল রঘুনন্দনের 'শিষ্য'-নামে পরিচিত 'রায়শেখর' বা 'কবিশেখর রায়ে'র নামে ব্রজবুলিতে অনেক পদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ-সকল পদ্যের মধ্যে সকলগুলিই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের রচিত বলিয়া "শ্রীগৌরনামামৃত-স্তোত্র" ও 'শ্রীশচীসুতাষ্টক'-নামক সংস্কৃত-স্তবের উল্লেখ করেন।

শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ডে নিজ ভজনময় গৃহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। তৎসম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১২৮-১২৯),—

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী, তা'র ঘাটের উপরে।।
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে।।

শ্রীমুকুন্দ, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীনরহরি—এই তিনজনকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ব-স্ব সেবা ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনন্দনকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-সেবা প্রদান করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩১)

'গুণচরিত-মহিমলেশ'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই শ্রীরঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল।

কৃষ্ণাবেশরসানুমোদমধুরো যঃ পঞ্চসংবৎসরাৎ
কৃত্বা তস্য সুবিগ্রহং পরিবরেৎ শ্রীগোপীনাথাভিধম্।
যদ্দত্তং শিশুলীলয়া সুমধুরং ক্ষীরং স আশীর্মুদা
সোঽয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তে শ্রীখণ্ডভূখণ্ডকে।।

যিনি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃকাল হইতে 'শ্রীগোপীনাথ'-নামক শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে পরিক্রমা করিতেন এবং বাল্যলীলায় শ্রীগোপীনাথ যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ

বা প্রসাদরূপে সুমধুর ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরঘুনন্দন 'শ্রীখণ্ড'-নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের মহিমা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

তাঁ'র ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর।।
শ্রীমূর্ত্তিকে লাড্ডু খাওয়াইল যেই জন।
তা'রে অল্পবুদ্ধি করে কোন্ মূঢ় জন?
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর।
কৃষ্ণসঙ্গে যা'র কথা—সে কৃষ্ণ কেবল।।
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যা'র অনুব্রত।
তাহারে কেমন জান, কেমন মহত্ত্ব।।
যাহারে চৈতন্য বৈল,—"মোর প্রাণ তুমি।"
প্রকাশ করিল যা'রে অভিরাম গোস্বামী।।
'মদন' বলিয়া অবতার জানাইল।
চৈতন্যের কোলে সবে তেমনি দেখিল।।
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মনঃ মোহে।
নাহি ভিন্নাভিন্ন—সব সমান-সিনেহে।।
সর্ব্বদা মধুর বাণী বোলয়ে বদনে।
সর্ব্বকাল না শুনিল উৎকট-কথনে।।
চাতুরী, মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য।
রসময় দেহ তা'র—এ সংসারে ধন্য।।
পিতা যা'র মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস।
চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্ম্মল বিশ্বাস।।

(শ্রীচৈঃ চঃ সূত্রখণ্ড, ৬৪৭-৬৫৬)

পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধবদাসের রচিত একটী পদে বাল্যলীলায় শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আরাধ্য শ্রীগোপীনাথজীউকে লাড্ডু খাওয়াইবার প্রসঙ্গটী এইরূপভাবে বর্ণিত আছে,—

প্রকট শ্রীখণ্ড-বাস, নাম শ্রীমুকুন্দ-দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি'।
গেলা-কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি' আনি'।।
"ঘরে আছে কৃষ্ণসেবা, যত্ন করি' খাওয়াইবা,"
এত বলি' মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া,
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রম শিশু-মতি,
'খাও' বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলা অলক্ষিতে।।
আসিয়া মুকুন্দ-দাস, কহে বালকের পাশ,
"প্রসাদ-নৈবেদ্য আন দেখি।"
শিশু কহে,—"বাপ! শুন, সকলি খাইলা পুন,
অবশেষ কিছুই না রাখি'।।"
শুনি' অপরূপ হেন, বিস্মিত-হৃদয়ে পুন,
আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা-অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
পুন আসি' রহে লুকাইয়া।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হইয়া হরিষ-মতি,
গোপীনাথে লাড্ডু দিয়া করে।

'খাও, খাও' বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন
সময়ে মুকুন্দ দেখি' দ্বারে।।
যে খাইল, রহে তেন, আর না খাইলা পুন,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদগদ-স্বরে বলে,
নয়ানে বরিখে ঘন লোর।।
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ লাড্ডু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন-মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধবদাস রস ভণে।।

কথিত হয় যে, শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের দণ্ডবৎপ্রণাম ও শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকের আঘাত অকপট শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক ব্যতীত অপর কেহ সহ্য করিতে পারিতেন না। পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধবদাসের আর একটি পদে বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীখণ্ডে আসিয়া শ্রীরঘুনন্দনের সন্ধান করেন। কিন্তু শ্রীঅভিরাম ঠাকুর প্রণাম করিবেন আশঙ্কা করিয়া শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দনকে লুকাইয়া রাখেন। শ্রীরঘুনন্দন 'বড়ডাঙ্গি'-নামক স্থানে গিয়া শ্রীঅভিরামের সহিত মিলিত হন। তিনি শ্রীঅভিরামের প্রচণ্ড প্রণাম সহ্য করিয়া শ্রীঅভিরামের সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে থাকেন।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের বামে শ্রীগদাধর ও দক্ষিণে শ্রীনরহরি এবং শ্রীরঘুনন্দনকে শ্রীচরণতলে অবস্থিত হইয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখচন্দ্র-সুধা-পানকারীরূপে একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনন্দন শ্রীব্রজলীলার শ্রীপ্রদ্যুম্ন-বিষ্ণু। সমস্ত প্রাচীন পদেই তাঁহার ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীখণ্ডে যখন শ্রীল রঘুনন্দন শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুরের তিরোভাব-মহামহোৎসব শ্রীশ্রীনিবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই সময় সমাগত মহান্তগণ শ্রীল রঘুনন্দনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ইহা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত আছে,—

কেহ কহে,—"শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যা'র।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তা'র।।"
কেহ কহে,—"কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন!
অতি দীনহীন-দুঃখীজনের জীবন।।"
কেহ কহে,—"কি দৈন্য! বিনয় নাই হেন।"
কেহ কহে,—"কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন।।"

*   *   *

কেহ কহে,—"গীতবাদ্য-নৃত্যে মহাধীর।।"

শ্রীল রঘুনন্দনের শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিক ও সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন ও নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতেন। ইহা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' নবম তরঙ্গে বর্ণিত আছে। শ্রীরঘুনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালেও প্রতি বৎসর নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টানুসারে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। রথাগ্রে যে সপ্ত-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতেন, শ্রীখণ্ডবাসীর সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় তাহার অন্যতম। সেই সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন নৃত্য করিতেন।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে (৯।১) লিখিয়াছেন,—

নরহরি-রঘুনন্দন-প্রধানাঃ কতিচন খণ্ডভুবোঽপ্যখণ্ডভাগ্যাঃ।
প্রথমমিমমদৃষ্টবন্ত এতে প্রতিশরদং পুরুষোত্তমং লভন্তে।।

শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি কতিপয় চির-ভাগ্যবান্ শ্রীখণ্ডবাসী প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই; ইঁহারা (ইঁহার দর্শনের পর হইতে) প্রতি বৎসর শরৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া থাকেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (৪।১।৫) লিখিয়াছেন,—

খণ্ডস্থিতাঃ শ্রীরঘুনন্দনাদয়ো গৌরাঙ্গভাবেন বিভাবিতান্তরাঃ।
কুলীনগ্রামনিবাসিনঃ সুখং নৃত্যন্তি গায়ন্তি নমন্তি সন্ততম্।।

(শ্রীনীলাচলে নৃত্যকীর্ত্তনকালে) শ্রীখণ্ডস্থিত শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ-

ভাববিভাবিতান্তর কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ সানন্দে সর্ব্বদা নৃত্য, গীত ও প্রণাম করিয়া থাকেন।

শ্রীল রঘুনন্দনের বংশাবলী শ্রীখণ্ডে বাস করিতেছেন। নিম্নে সেই বংশের তালিকা প্রদত্ত হইল। শ্রীনারায়ণদেব সরকারের পুত্র শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীমাধব ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর। শ্রীমুকুন্দের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুর। শ্রীকানাই ঠাকুরের পুত্র শ্রীমদনরায় ও শ্রীবংশীরায়। শ্রীমদনরায় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীমদনরায়ের পুত্র শ্রীভগবান্ ও অপর চারিপুত্র। শ্রীভগবানের পুত্র শ্রীরতিকান্ত। শ্রীরতিকান্তের পুত্র শ্রীপ্রাণবল্লভ। শ্রীপ্রাণবল্লভের পুত্র শ্রীজয়কৃষ্ণ। শ্রীজয়কৃষ্ণের পুত্র শ্রীকন্দর্প। শ্রীকন্দর্পের পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ। অচ্যুতানন্দের পুত্র নৃসিংহানন্দ। নৃসিংহানন্দের পুত্র ব্রজানন্দ ও ললিতানন্দ। ব্রজানন্দের পুত্র গোপিকানন্দ। গোপিকানন্দের পুত্র যুগলানন্দ। যুগলানন্দের পুত্র গৌরগুণানন্দ। ললিতানন্দের পুত্র প্রেমানন্দ ও কেশবানন্দ। প্রেমানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দ, কিশোরানন্দ ও দ্বারিকানাথ। সর্ব্বানন্দের পুত্র জীবানন্দ। কেশবানন্দের পুত্র কীর্ত্তনানন্দ, রাখালানন্দ ও বনয়ারীনন্দ।

শ্রীরূপ গোস্বামি

[১]

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটীর দ্বারা সুসংক্ষেপে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টের (বাঞ্ছিত বা প্রিয় বিষয়ের) সংস্থাপক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তিসম্পদ্—যাহা জগতে পূর্ব্বে কখনও বিতরিত হয় নাই,—জগজ্জীবকে সমর্পণ করিবার জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই অতি নিগূঢ় ও শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব প্রেমভক্তি শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুই জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' (৯ম অঙ্কে সার্ব্বভৌম-বাক্যে) লিখিয়াছেন,—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে।।

প্রিয়ভক্তস্বরূপ, অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহপাত্রস্বরূপ, প্রেমময়স্বরূপ, নিজাভিন্নরূপ বা স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ, নিজের অনুরূপ, মুখ্য বা অন্তরঙ্গরূপ, স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুতে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন।

ষড়্‌গোস্বামীর নামের মধ্যে শ্রীরূপের নামই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির অসমোর্দ্ধ-মহিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহার 'মুক্তাচরিত'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুন পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাৎ জন্মজন্মনি।।"

আমি দন্তপঙ্‌ক্তিতে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।

শ্রীল সনাতনের পরিচয়-প্রদানকালেও গৌড়ীয়-আচার্য্যগণ পুনঃ পুনঃ 'শ্রীরূপাগ্রজ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কি শ্রীকবিকর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটকে' (৯।৪৫), কি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'স্তবাবলী'তে (স্বনিয়মদশকম্—১; মনঃশিক্ষা—৩) ও 'মুক্তাচরিতে' (৪র্থ শ্লোকে), কি শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'তোষণী'তে (লঘুতোষণীর উপসংহার-শ্লোক), কি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (অঃ ২।১, ৩।১)—সর্ব্বত্রই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীরূপের পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' দিগ্‌দর্শিনীর মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃতসেবিনে।
যদ্রূপাশ্রয়ণাদ্ যস্য ভেজে ভক্তিময়ং জনঃ।।

যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয়ে এই অধম জন ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইয়াছে, সেই স্বনামামৃতসেবী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের অনুগ-পদে অভিষিক্ত হওয়াকেই জীবের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা একমাত্র কাম্য বলিয়া তাঁহার 'স্বনিয়মদশক' ও 'মনঃশিক্ষা'র মধ্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

[২]

আবির্ভাব-কাল

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাবের কাল-সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন বিবরণে চারি বৎসরের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'সজ্জনতোষণী'র ২য় বর্ষে (ইং ১৮৮৫, বাং ১২৯২) ২৫ পৃষ্ঠায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দনির্ণয়" বিবরণে "কোন বৈষ্ণবের দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে যে সকল অব্দাবলী প্রাপ্ত" হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়,—শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভুর আবির্ভাবকাল—**১৪১১ শকাব্দা** (বা ১৫৪৬ সম্বৎ বা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ); প্রকটস্থিতি—৭৫ বৎসর; শ্রীব্রজে বাস—৫৩ বৎসর; গৃহে স্থিতি—২২ বৎসর; অন্তর্দ্ধান—**১৪৮৬ শকাব্দা** (বা ১৬২১ সম্বৎ বা ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ), শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী। এই বিবরণের সহিত শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর শ্রীমদ্

বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত বিবরণ ঠিক একরূপ। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি হইতে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আবির্ভাবকাল ৪ বৎসর পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট হয়; অর্থাৎ আবির্ভাব-কাল—১৪১৫ শকাব্দা (বা ১৫৫০ সম্বৎ বা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ), অপ্রকট—১৪৯০ শকাব্দা (বা ১৬২৫ সম্বৎ বা ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ), শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী। গৃহে স্থিতি, শ্রীব্রজবাস ও প্রকটস্থিতিকালের মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য নাই।

[৩]

শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলন

শ্রীপাট রামকেলি বর্ত্তমান মালদহ-সহর হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। তথায় শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পূত স্মৃতির নিদর্শন অদ্যাপি প্রদর্শিত হয়। (১) **'তমালতলা'**-নামক একটী উচ্চ বেদীর উপর একটী বিস্তৃত তমালবৃক্ষ ও দুইপার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া একত্রে চারিটী কেলিকদম্ববৃক্ষ শোভিত রহিয়াছে। প্রবাদ—এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতনের প্রথম মিলন হয়। (২) **শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব**—ইনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ বলিয়া পরিচিত। (৩) **শ্রীসনাতনকুণ্ড**—ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীললিতাদি সখীর নামে অষ্টকুণ্ড প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে নাতিদূরে (৪) **শ্রীরূপসাগর**। এই দীর্ঘিকা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচারিত। (৫) **বারদুয়ারী**—প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বাদশটী দ্বারবিশিষ্ট একটি বিরাট্ দরবার-গৃহ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ক্রেণ্ট সাহেবের সময় ইহার গম্বুজগুলি সোনার পাতের দ্বারা মণ্ডিত ছিল। প্রবাদ—এইস্থানে দবিরখাস (শ্রীরূপ) কাছারী করিতেন। (৬) **হাওয়াসখানার ঘাট**; প্রবাদ—এইস্থান হইতেই শ্রীসনাতন কারারক্ষককে ৭০০০ মুদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হন এবং রাত্রিতে গঙ্গা পার হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার ছলে কোলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে বাচস্পতি-গৃহে আসিয়া পাঁচদিন অবস্থান করেন। তথা হইতে কুলিয়াগ্রামে আগমন করেন। 'কুলিয়া হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন', যখন এইরূপ কথা হইল, তখন

শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত রত্ন-নির্ম্মিত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন এবং উহার উপর 'নিবৃন্ত পুষ্প-শয্যা' পাতিলেন। যখন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তখন তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইল; তাহাতে শ্রীনৃসিংহানন্দ বলিলেন,—"এবার শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন, শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।" শ্রীনৃসিংহানন্দের ধ্যানের অনুভবই সত্য হইল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্য লোক চলিতে লাগিলেন। প্রভু গৌড়ের নিকট শ্রীগঙ্গাতীরস্থ রামকেলি-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ হুসেনশাহ পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দবিরখাসকে (শ্রীরূপকে) নির্জ্জনে ডাকিয়া হুসেনশাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দবিরখাস বাদশাহকে বলিলেন,—

"যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে, তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা।।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয়।।
মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম।।
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৬-১৭৯)

দবিরখাসের এই উক্তি শুনিয়া বাদশাহ বলিলেন,—

* * "শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাঁ নাহিক সংশয়।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১৮০)

দবিরখাস (শ্রীরূপ) স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অগ্রজ সাকর মল্লিকের (শ্রীসনাতনের) সহিত যুক্তি করিলেন। উভয়েই রাজবেষ গোপন করিয়া অর্দ্ধরাত্রে

প্রথমে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমীপে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের আবেদনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন দান করিলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন অত্যন্ত দৈন্যভরে স্তব করিলেন। সেই স্তব শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দবিরখাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—

* * * ,—"শুন দবিরখাস।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস।।
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।।

* * *

গৌড়-নিকটে আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, 'কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে'।।
ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে।।
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।২০৭-২০৮; ২১২-২১৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মস্তকে সস্নেহে শ্রীহস্ত প্রদান করিলেন; তখন দুই ভ্রাতা প্রভুর শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন ও কৃপালাভের পর ভ্রাতৃদ্বয় বিষয়ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শ্রীল রূপ নৌকাতে ভরিয়া রামকেলি হইতে ফতেয়াবাদে স্বগৃহে বহু ধন লইয়া আসিলেন। সেই ধনের অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ও এক-চতুর্থাংশ কুটুম্বভরণার্থ দান করিলেন এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ ভাবী বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য বিশ্রম্ভ বিপ্রগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন এবং গৌড়ে শ্রীসনাতনের নিকট দশ হাজার মুদ্রা প্রদান করিলেন।

[৪]

শ্রীপ্রয়াগে

শ্রীগৌরসুন্দরের গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গমন ও তথা হইতে শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনে গমনোদ্যোগের কথা শুনিয়া শ্রীরূপ পুরীতে দুইজন দূত পাঠাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ সেই দূতদ্বয় গৌড়দেশে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক শ্রীরূপকে প্রদান করিলে শ্রীরূপ শ্রীসনাতনকে রামকেলিতে এক পত্রের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রার কথা ও অনুজ শ্রীঅনুপমের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং শ্রীসনাতনকে যে-কোন উপায়ে শীঘ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে চলিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীঅনুপমের সহিত শ্রীরূপ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবিন্দুমাধব দর্শনে গমন করিতেন, তখন প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোকসঙ্ঘট্ট ধাবিত হইত। এইরূপ জনতা দেখিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম একটু নির্জ্জনে অবস্থান করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে ভিক্ষার্থ আগমন করিলেন, তখন শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সস্নেহে ভূমি হইতে উঠাইয়া এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিতে করিতে দুইজনকে আলিঙ্গন করিলেন—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্"।।

(ইতিহাস-সমুচ্চয়-বাক্য)

চতুর্ব্বেদপাঠী ব্রাহ্মণ হইলেই যে 'ভক্ত' হইবেন, এরূপ নহে। আমার ভক্ত চণ্ডাল-কুলে আবির্ভূত হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র; ভক্ত মাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া সানুজ অপ্রাকৃত কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ স্ব-কৃত একটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রণাম করিলেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"

শ্রীরূপের শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত এই শ্রীগৌরপ্রণাম-শ্লোকটী সমগ্র শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের নিত্য আরাধ্য শ্রীগৌরপ্রণতিরূপে বৃত হইয়াছে। ইহাতে একাধারে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলা-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', তাঁহার শ্রীরূপ— 'শ্রীগৌর-কান্তি, তাঁহার শ্রীগুণ—'মহাবদান্যতা', তাঁহার শ্রীপরিকর-বৈশিষ্ট্য— 'শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপান্তর্গত পার্ষদবৃন্দ' অর্থাৎ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রামরায়াদি ও তদনুগত সম্প্রদায়, তাঁহার লীলা—'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদান'।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে নিকটে বসাইয়া শ্রীসনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ বলিলেন,—"তিনি এখন রাজবন্দী হইয়া কারাগৃহে আছেন। আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই তাঁহার মুক্তি হইবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতনের বন্ধন-মোচন হইয়াছে। সে শীঘ্রই আমার সহিত মিলিত হইবে।" দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-গৃহেই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম সেইদিন অবস্থান করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদপাত্র প্রাপ্ত হইলেন। ত্রিবেণীর উপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসাঘর ছিল। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম তাঁহারই সন্নিকটে বাস করিলেন।

[৫]

শ্রীবল্লভ ভট্ট

এই সময় পণ্ডিতবর শ্রীবল্লভ ভট্টপাদ আড়াইল-গ্রামে বাস করিতেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের নিকট শ্রীযমুনার অপর পারে প্রায় এক মাইল দূরে অড়েলী বা আড়াইল-গ্রাম। বর্ত্তমান আড়াইল-গ্রাম হইতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক বা গদী প্রায় এক ক্রোশ দূরে। এই স্থানের নাম—'দেওরখ্'। দেওরখ-পল্লী বর্ত্তমানে নিজ আড়াইল না হইলেও আড়াইল-পরগণার অন্তর্গত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন বলিয়া এখনও জনশ্রুতি রহিয়াছে। কাশীর প্রসিদ্ধ শ্রীগোপালজীউ-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মুরলীধর লালজী দেওরখ্-গ্রামস্থ শ্রীবল্লভাচার্য্য-বৈঠকের অধিকারী। 'দেওরখ্'-শব্দটী 'দেব-ঋষি' শব্দের অপভ্রংশ। 'বল্লভী'-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে কথিত আছে যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের সঙ্গলাভের জন্য এইস্থানে দেবতা ও ঋষিগণ অবস্থান করিতেন। এজন্য ঐ স্থানের নাম 'দেওরখ্' হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য প্রভাব ও ত্রিবেণীর উপর তাঁহার অবস্থানের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণদর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট আসিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টপাদকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকথালাপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম উচ্ছলিত হইল। কিন্তু শ্রীবল্লভকে বহিরঙ্গ জানিয়া প্রভু নিজভাব সঙ্গোপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সন্নিধানে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম—দুই ভ্রাতা অবস্থিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টের সহিত নিজ প্রিয়তম শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অমানি-মানদ দুই ভ্রাতাকে যখন শ্রীবল্লভ-ভট্ট আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদিগের অযোগ্যতা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও কুলীন পণ্ডিতাভিমানী শ্রীবল্লভ ভট্টকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে জড়প্রতিষ্ঠা দান করিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—

"ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি-হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ!"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।৬৯)

শ্রীমহাপ্রভুর এই ছলনাময়ী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তরে শ্রীপাদ বল্লভভট্ট বলিলেন,—

"দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই 'অধম' নহে, হয় 'সর্ব্বোত্তম'।।
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" (শ্রীভাঃ ৩।৩৩।৭)

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।৭০-৭২)

শ্রীমহাপ্রভুর পরীক্ষায় শ্রীবল্লভ উত্তীর্ণ হইলেন। ইঁহার বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ নাই, ইনি হরিনাম বিশ্বাস করেন—কেবল কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-অভিমানী নহেন। ইঁহার অনেকটা বৈষ্ণবতার উদয় হইয়াছে; সুতরাং ইঁহার

নিমন্ত্রণ স্বীকার করা যাইতে পারে। শ্রীবল্লভভট্টের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার উদিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টের প্রশংসা ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার গর্হণ করিতে করিতে বলিলেন,—

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।।
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ।।"

(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ৩।১১-১২)

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জনমাত্র। যিনি সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাঁহার দুর্জাতিত্বকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এরূপ চণ্ডালও পণ্ডিতগণের মাননীয়; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন।

শ্রীপাদ বল্লভভট্ট সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরকে ত্রিবেণীর ঘাট হইতে নৌকাতে আরোহণ করাইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীঅনুপম, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুত ও শ্রীবল্লভভট্ট স্বয়ং। শ্রীবল্লভ শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজগৃহে লইয়া আসিয়া স্বহস্তে শ্রীচৈতন্যের পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক সবংশে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিধান করাইলেন এবং গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপের দ্বারা মহাপ্রভুর 'মহা-পূজা' করিলেন।

শ্রীপাদ বল্লভভট্ট শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে অতীব যত্নের সহিত নানাবিধ উপকরণে সেবা করিলেন এবং মহাপ্রভুর অবশেষ শ্রীরূপ-প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুতকে প্রদান করাইলেন। প্রভুর ভোজনের পর শ্রীবল্লভভট্ট, প্রভুকে মুখবাস প্রদান করিয়া শয়ন করাইলেন এবং স্বয়ং প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য 'শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়'-নামক তিরহুট্ * দেশবাসী এক মহাভাগবত বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহার সহিত মহাপ্রভুর অনেক রসালাপ হইল।

---

* বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটী জেলা তিরহুট্ বিভাগের অন্তর্গত।

[৬]

দশাশ্বমেধে দশদিন শ্রীরূপশিক্ষা

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবল্লভভট্টের গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ত্রিবেণীতে লোক-সঙ্ঘট্টের ভয়ে দশাশ্বমেধে গমনপূর্ব্বক শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুতে স্বীয় শক্তি-সঞ্চার করিলেন এবং কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা ও সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত—যাহা শ্রীরামানন্দের মুখে স্বয়ং বক্তা হইয়া শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যতমপাত্র শ্রীরূপকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। শ্রীরূপের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে প্রবীণ ও তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করাইলেন। ইহা শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' (৯।১০৪) বর্ণন করিয়াছেন।

"কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ।।"

কালে শ্রীবৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লোকসমীপে অপ্রকট হইয়া পড়িয়াছিল; সেই শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলা বিশেষভাবে বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

"যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ নাঃ ৯।৭০)

শ্রীরূপ পূর্ব্বেই নিজাভীষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরের গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়রূপে আসক্ত হইলেও গৃহচর্য্যার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে পরিমুক্ত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ রসের ন্যায় স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ ও গাঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীরূপপ্রভু এই কথা তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের (পূঃ বিঃ ১।২) মঙ্গলাচরণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য।।

হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ (দৈন্যোক্তি) আমি ভক্তিগ্রন্থ-রচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীপদকমল বন্দনা করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুতে শক্তিসঞ্চার করিয়া ক্রমান্বয়ে দশদিন প্রয়াগের দশাশ্বমেধ-ঘাটে ভক্তিরসের লক্ষণ-সমূহ সূত্রাকারে বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"ওহে শ্রীরূপ! ভক্তিরসসিন্ধু পারাপারশূন্য ও গভীর; তোমাকে আস্বাদন করাইবার জন্য উহার বিন্দুমাত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীবসমূহ কর্ম্মফলানুসারে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ হয়, শ্রুতি তাহার সহিত অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মার তুলনা করিয়াছেন— "এষোঽণুরাত্মা' (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৯)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০) শ্রুতিগণের দ্বারা শ্রীভগবানের এইরূপ স্তব বর্ণিত হইয়াছে,—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া।।

হে নিত্যস্বরূপ! বস্তুতঃই অনন্ত, নিত্য, শরীরধারী জীবসমূহ যদি সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে অণু, সামান্যতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। জীবগণ বহ্নিরূপ তোমা হইতে বিস্ফুলিঙ্গরূপে জাত বলিয়া তুমি তাহাদের অপরিত্যাজ্য কারণ, নিয়ন্তা ও সর্ব্বত্র অন্তর্যামিরূপে সমভাবে অবস্থিত। অতএব যাহারা জীব ও তোমাকে এক করিয়া জানে, তাহাদের মত মতবাদে দূষিত।

জীব দুইপ্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধগণ স্থাবর-জঙ্গমভেদে দুই প্রকার; যাহারা—অচল, যেমন বৃক্ষাদি, তাহারাই 'স্থাবর' জীব; যাহারা—সচল,

তাহারাই 'জঙ্গম'। জঙ্গম তিন প্রকার—তির্য্যক্-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অতি অল্পসংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর পরিত্যক্ত হইলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য অবশিষ্ট থাকে। বেদনিষ্ঠ দুই প্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী; ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ; কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন 'মুক্ত'; এস্থলে যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই 'মুক্ত' বলা যায়। সেই সকল মুক্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত, তিনিই 'শ্রীকৃষ্ণভক্ত'। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোনই কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেই ভুক্তি বা মুক্তি-কামনার কোন-না-কোন একটীর সহিত সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—'ভুক্তিকামী' এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—'মুক্তিকামী'; তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাহাদের হৃদয়ে এই তিনপ্রকার কামনা থাকে, ততদিন তাহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দান করে না। এজন্য তাহারা সকলেই অশান্ত। সুতরাং একমাত্র নিষ্কাম শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তই পরা শান্তি-প্রাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৪-৫) শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-প্রভুকে বলিতেছেন,—

'প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।'

হে দ্বিজোত্তম! উক্ত ধর্মানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জনই মুমুক্ষু হইয়া থাকেন, সহস্র মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি গৃহাদি অসৎসঙ্গ হইতে মুক্ত হন এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি তত্ত্ব জানিতে পারেন। হে মহামুনে! ঐরূপ কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ।

জীবসমূহ আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা-যোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তিলাভোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যের উদয় হয়, তিনি শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে শ্রদ্ধা, তাহা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবীজ প্রাপ্ত

হইয়া মালী রূপে নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন; বীজ অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎকথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল সেই ক্ষেত্রে সেচন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মালোক অতিক্রমপূর্ব্বক পরব্যোমে উপস্থিত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করে ও তথায় শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। শ্রীকৃষ্ণচরণারূঢ়া ভক্তিলতাতেই প্রেমফল ফলে। এ-যাবৎ মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার সময় জলসেচন ব্যতীত আর একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। কিছুদিন জলসেচন করিতে করিতে লতা যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন বৈষ্ণব-অপরাধরূপ মত্তহস্তী আসিয়া সেই লতার পত্র ছিন্ন, এমন কি, উৎপাটনও করিয়া ফেলে, অথবা প্রখর উত্তাপাদি দ্বারা সেই পত্র শুষ্ক হইয়া যায়। অপক্কাবস্থায় বৈষ্ণব-অপরাধই সাধনপথে সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্ন। অতএব এই সময় সুবিজ্ঞ মালী সাধুসঙ্গে অনর্থবিধ্বংসী হরিকথাশ্রবণরূপ আবরণ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন প্রকারে অপরাধ-হস্তীর উদ্‌গম না হয়। এই সময় আর একটী উৎপাত আছে,—যে-সময় ভক্তিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, সে-সময় যদি ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কাপট্য, জীব-হিংসা-প্রবৃত্তি, জড়ীয় বস্তুলাভের ইচ্ছা, নিজের জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠা-লাভের আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জলসেক লাভ করিয়াও বিপরীত ফলের উদয় করায়; অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাপরাধফলে উপশাখাগুলিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া যায়, আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধিমান্ মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেচন-সময়েই প্রথম হইতে উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে ছেদন করিবেন। তাহা হইলেই মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহা শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইবে এবং সেই লতায় পক্ক প্রেমফল ফলিবে। মালী সেই প্রেমফল আস্বাদন করিতে করিতে লতাকে আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সান্নিধ্য লাভ করিবেন এবং কল্পবৃক্ষের সেবা করিয়া পরমসুখে প্রেমফলরস আস্বাদন করিতে পারিবেন। এই প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট তৃণতুল্য।

ভক্ত্যাভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না; শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-

কামনা ব্যতীত তাহাতে আর অন্য কোন বাঞ্ছা নাই। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি স্বরূপের পূজা-প্রসঙ্গ তাহাতে নাই এবং নির্ব্বিশেষজ্ঞান, স্মৃতিতে উক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম (ভজনীয় পরিচর্য্যাদি নহে) অথবা হঠযোগ, রাজযোগাদিতে সিদ্ধিকামনা বা তপস্যা-ব্রত প্রভৃতি শারীর ও মানস-বৈরাগ্যের আবরণ তাহাতে নাই। এই সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া জীবনযাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই স্বীকারপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করার নামই 'শুদ্ধভক্তি'।

'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।'

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ১ম লহরীধৃত
শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম—'ভক্তি'। এই (স্বরূপ-লক্ষণময়ী) সেবার দুইটি 'তটস্থ'-লক্ষণ, যথা— (১) ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং (২) কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

'মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুতে।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।'

(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)

ত্রিবিধা ভক্তিই সগুণ, এতদ্ভিন্ন নির্গুণ শুদ্ধভক্তি আছে। শ্রীপুরুষোত্তম-স্বরূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের

লক্ষণ। সেই ভক্তি ফলানুসন্ধান-রহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃতভেদলক্ষণ-রহিতা। আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (নৈকট্য), সারূপ্য (সমান রূপতা), একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই। ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

ভুক্তি ও মুক্তি প্রভৃতি কামনা যদি চিত্তে উদিত হয়, তাহা হইলে শত শত সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না। ভুক্তিবাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছা—এই দুইটি পিশাচী; যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের আবির্ভাব হইতে পারে না। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধন ভক্তিতেই ক্রিয়মান হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণপূর্ব্বক 'নিষ্ঠা', 'রুচি', 'আসক্তি', 'ভাব' বা 'রতি',—এই সকল নামে পরিচিত হয়। সাধন ভক্তি হইতেই রতির উদয় হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই 'প্রেমাদি'-নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজ-স্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতোপলত্ব ও উত্তম-মিছরির অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্তই শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত; রতিই সর্ব্বত্র 'স্থায়িভাব'-নামে উক্ত হয়।

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়ীভাবে ঐ সকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। স্থায়ীভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য্য', সাত্ত্বিকভাবও রসের 'কার্য্যবিশেষ' এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকলই রসের 'সহায়'। বিভাব দুইপ্রকারে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে

বিভক্ত—'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', শ্রীকৃষ্ণই 'বিষয়' এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহই 'উদ্দীপন'।

'মুখ্যরস' পঞ্চবিধ— (১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর; (১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক ও (৭) বীভৎস—এই সাতপ্রকার 'গৌণরস'। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমুখ্যরস স্থায়ীভাবেই ভক্তহৃদয়ে থাকে। হাস্যাদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি, 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্ট করিয়া নিবৃত্ত হয়।

কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। পুরীদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বারকায় ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি। এইজন্য তথায় প্রেম—সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা-রতিতে গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও তাহা স্বীকার করেন না।

শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠা ও তাহা হইতে ইতর-বস্তুতে তৃষ্ণাত্যাগ—এই দুইটী শান্ত-রসের গুণ। যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই সকল ভূতেই আকাশের 'শব্দমাত্র গুণ' ব্যাপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে আছে। শান্তরসে এই দুইটি গুণ থাকিলেও মমতা ('আমারই তিনি' এই ধর্ম্মটি) নাই, সুতরাং সেই রসের উপাস্য-বস্তু—'পরব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ইত্যাদি; এই উপাসনা-ক্রিয়াটি—জ্ঞান-প্রধান। 'সেই পরমাত্মাই আমার প্রভু এবং আমিই তাঁহার নিত্যদাস'—এইরূপ মমতা-জ্ঞান যখন তাঁহাতে সংযুক্ত হয়, তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয়; তথাপি তাঁহাতে 'ঈশ্বরজ্ঞান' ও সম্ভ্রমরূপ 'গৌরব' প্রচুরভাবে থাকে। শান্তরসে—'সেবা' থাকে না, দাস্যরসেই সেবা আরম্ভ হয়। দাস্যরসে—শান্তের গুণ ও 'মমতা'—এই দুইটি গুণ দেখা যায়। আবার, সখ্যরসে—শান্ত ও দাস্যরসের গুণ ত' আছেই, তাহাতে বিশ্বাসময় প্রেমও একটু সংযুক্ত। বিশ্বাসের নামই 'বিশ্রম্ভ'; সেই বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্যরসে গৌরব-সম্ভ্রম নাই, সুতরাং সখ্যরসে 'তিনটী' গুণ। দাস্যে যে 'মমতা' ছিল, সখ্যে 'আত্মসম' হইয়া তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বাৎসল্যে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—'পালন'-রূপে পরিণত; বিশেষতঃ সখ্যের অসঙ্কোচ ও অগৌরব-গুণ ও মমতাধিক্যে তাড়ন-ভৎর্সন-ব্যবহার এবং আপনাকে 'পালক'-জ্ঞান ও কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান—এবম্বিধ চারি রসের গুণে 'বাৎসল্য' অমৃত সমান হইয়াছে।

শান্তের 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', দাস্যের 'অতিশয় সেবা', সখ্যের 'অসঙ্কোচসেবা' ও বাৎসল্যের 'মমতাধিক্যে পালন'—এই সকল ভাবে আবার কান্তা-ভাব-গত 'নিজাঙ্গ-দানরূপ সেবা' দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণবিশিষ্ট 'মধুররস' হয়। তাহাতে সমস্ত ভাবেরই সমাহার আছে। এজন্য তাহাতে আস্বাদাধিক্য-ক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়।

হে শ্রীরূপ! আমি ভক্তিরসের এই দিগ্‌দর্শনমাত্র করিলাম। তুমি হৃদয়ে ইহার বিস্তার ভাবনা করিবে। এ-বিষয়ে যত অনুধাবন করিবে, ততই তোমার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি প্রদান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীভক্তিরসসিন্ধুর শেষসীমায় উপনীত হইতে পারে।"

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন ও প্রয়াগ হইতে পরদিবস প্রত্যুষে কাশীতে যাত্রা করিলেন।

শ্রীল শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিবার জন্য আজ্ঞা যাচ্ঞা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া তথা হইতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ করিলেন। শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নৌকায় আরোহণ করিলেন। শ্রীরূপ শ্রীগৌরবিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে দাক্ষিণাত্য-বিপ্র শ্রীরূপকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তৎপরে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম—দুই ভ্রাতা শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

[৭]

শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যখন শ্রীমথুরায় আসিলেন, তখন শ্রীধ্রুবঘাটে শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। হুসেনশাহ সুবুদ্ধি রায়কে জাতিভ্রষ্ট করিয়া দেওয়ায় তিনি কাশীতে আগমন করেন এবং স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের বিচার গ্রহণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা করেন। মথুরায় শ্রীসুবুদ্ধি রায় শুষ্ককাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা হইতে মাত্র এক পয়সার চানা চর্ব্বণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন; বাকী পয়সা দ্বারা দুঃখী বৈষ্ণব দেখিলে ভোজন দান করিতেন এবং গৌড়দেশবাসী কেহ তথায় আসিলে তাঁহাকে দধি-অন্ন-ভোজন ও তৈলমর্দ্দন করাইতেন। শ্রীরূপ গোস্বামি-

প্রভুর সহিত শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। শ্রীরূপ শ্রীসুবুদ্ধি রায়কে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী-দর্শনে অপ্রাকৃত কবি-শিরোমণি শ্রীরূপের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-নাটক-রচনার স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই নাটকের রচনা আরম্ভ করিলেন ও মঙ্গলাচরণের নান্দীশ্লোক তথায়ই রচনা করিয়া ফেলিলেন। সেইবার শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে মাত্র একমাসকাল ছিলেন। শ্রীসনাতনের অন্বেষণে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম—দুই ভ্রাতা গঙ্গাতীরপথে প্রয়াগে আগমন করিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীসনাতন রাজপথ দিয়া শ্রীমথুরায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সহিত শ্রীসনাতনের সাক্ষাৎকার হইল না। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কাশীতে চলিয়া আসিলেন; তথায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন-মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হইল এবং মিশ্রের নিকট শ্রীসনাতন-শিক্ষার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন।

কাশীতে দশ দিন থাকিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন এবং পথে চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটকের ঘটনাসমূহ ভাবিতে লাগিলেন। পথেই কড়চার আকারে কিছু কিছু লিখিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই ভ্রাতা গৌড়দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল।

[৮]

শ্রীনীলাচলে

শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির পর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থ নীলাচলে যাত্রা করিলেন। শ্রীঅনুপমের অন্তর্দ্ধানের জন্য বিলম্ব হওয়ায প্রভুর দর্শনযাত্রী শ্রীশিবানন্দ সেনাদি গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত শ্রীরূপের পথে আর মিলন হইল না; তাঁহারা পূর্ব্বেই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ উৎকলদেশের 'সত্যভামাপুর'-নামক গ্রামে একরাত্র বিশ্রাম করেন। রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, এক দিব্যরূপা নারী সম্মুখে আসিয়া শ্রীরূপপ্রভুকে কৃপাপূর্ব্বক বলিতেছেন,—"আমার সম্বন্ধে নাটকটী তুমি পৃথক্ রচনা করিও। আমার কৃপাতে ঐ নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।" স্বপ্ন দর্শন করিয়া শ্রীরূপ বিচার করিলেন,—'পৃথক্ নাটক করিবার জন্য শ্রীসত্যভামা-দেবীর আমার প্রতি আজ্ঞা হইয়াছে। আমি শ্রীব্রজলীলা ও শ্রীদ্বারকালীলা একত্র

পরিকল্পনা করিয়াছি। শ্রীসত্যভামাদেবীর আজ্ঞানুসারে এখন পৃথক্ পৃথক্ দুই ভাগেই রচনা করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরূপ শীঘ্র শ্রীনীলাচলে আসিলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীল রূপের প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"তুমি যে এস্থানে আসিবে, ইহা প্রভু আমাকে পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছেন।"

শ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহই শ্রীল হরিদাসের নিকট আগমন করিতেন। সেইদিনও অকস্মাৎ প্রভুর আগমন হইলে শ্রীল শ্রীরূপ সমুপস্থিত প্রভুকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীল হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরূপের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া দুইজনকে একস্থানে লইয়া কুশল-প্রশ্ন ও ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। শ্রীরূপকে শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ বলিলেন, —"তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয় নাই। আমি গঙ্গাপথে আসিয়াছি ও তিনি রাজপথে আসিয়াছেন। প্রয়াগে শুনিতে পাইলাম, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন।" প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরূপ শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির বিষয় নিবেদন করিলেন। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী অন্যান্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন। আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীরূপের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীরূপ সকল ভক্তের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং ভক্তগণ শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুকে শ্রীরূপের প্রতি কায়মনে কৃপাবর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,— "তোমাদের কৃপায় শ্রীরূপের এমন শক্তি হউক, যেন সে পৃথিবীতে কৃষ্ণরসভক্তি বিস্তার করিতে পারে।" কি গৌড়ীয়, কি উৎকলবাসী—প্রভুর যাবতীয় ভক্তের নিকটেই শ্রীরূপ প্রীতিভাজন হইলেন। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীল হরিদাসের বাসস্থানে থাকিয়া শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন এবং শ্রীমন্দির হইতে যে মহাপ্রসাদ পাইতেন, তাহা দুইজনকে প্রদান করিতেন।

অন্য একদিন সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের বাসায় আসিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন,—

কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।৬৬)

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র-নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি।।
(যামলবচন)

শ্রীযদুকুমার শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবাসুদেব-তত্ত্ব, অতএব তিনি শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক্; তিনিই শ্রীমথুরা ও শ্রীদ্বারকায় লীলা করেন। যিনি শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন, তিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীসত্যভামাদেবী ও শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়েই যে পৃথগ্‌ভাবে যথাক্রমে 'শ্রীললিতমাধব' ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধব'-নাটক লিখিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন, এই বিচার তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় হইল। সুতরাং পূর্ব্বে একত্র বর্ণিত নাটকদ্বয় এখন পৃথগ্‌ভাবে পরিকল্পনা ও রচনা করিয়া নান্দী, প্রস্তাব ও বিষয়—সমস্তই পৃথগ্‌ভাবে ভাবনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব সমাগত হইল। শ্রীল শ্রীরূপ রথাগ্রে বিপ্রলম্ভ-ভাবান্বিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য ও শ্রীমুখকীর্ত্তিত একটী শ্লোক-শ্রবণে তদ্‌ভাবসূচক একটী শ্লোক সেইস্থানেই রচনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ কবির রচিত একটী সামান্য শ্লোক উচ্চারণ করিয়া দিব্যোন্মাদে নৃত্য করিতেন। শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধে বিরচিত, অথচ শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা এত আদরের সহিত কেন যে উচ্চারণ করিতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেন না। একমাত্র শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু সেই শ্লোকের গূঢ়-তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া উহার ভাবদ্যোতক পদাবলী গান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ বিধান করিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীল স্বরূপগোস্বামিপ্রভুর ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রভুর মনোমত একটী শ্লোক রচনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেন, তাহা এই,—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।।"
(পদ্যাবলী—৩৮২, সাহিত্যদর্পণ—১।২, কাব্যপ্রকাশ—১।৪)

যিনি কৌমারকালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন আমার কান্ত হইয়াছেন; সেই মধুমাসের যামিনীও উপস্থিত; প্রস্ফুটিত মালতী-পুষ্পের গন্ধেও চতুর্দ্দিক্ আমোদিত রহিয়াছে; কদম্বকানন হইতে গন্ধবহ মধুর গন্ধ বিতরণ করিতেছে; সুরতব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও সমুপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

অপ্রাকৃত কবিশিরোমণি শ্রীরূপ উক্ত শ্লোকোচ্চারণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী রচনা করিলেন এবং একটী তালপত্রে উহা লিখিয়া কুটীরের চালায় গুঁজিয়া রাখিলেন। শ্লোকটী এই,—

"প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।।"

(শ্রীপদ্যাবলী—৩৮৭)

হে সহচরি! আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা, আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও ঘটিয়াছে বটে, তথাপি বনমধ্যে ক্রীড়াশীল কৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত কাননের জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন—ইঁহারা অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ-শিরোমণিগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইয়াও অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ মর্য্যাদার অনুরোধে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে গমন করিতেন না। এজন্য স্বয়ং সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব উপলভোগ দর্শন করিয়া প্রত্যহই এই তিনজনের মধ্যে যিনি যখন থাকিতেন, তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়া পরে নিজ বাসস্থানে যাইতেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য নিয়ম ছিল। একদিন শ্রীরূপের বাসস্থানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈবাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং কুটীরের চালের মধ্যে গোঁজা তালপত্রে লিখিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" এই শ্লোকটী দেখিতে পাইলেন; শ্লোক পাঠ করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন। শ্রীরূপ সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলেন। তিনি স্নান করিয়া যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, অমনি প্রেমাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে

দেখিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে চাপড় মারিয়া "তুমি আমার হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়কথা কিরূপে জানিতে পারিলে" ইহা বলিয়া শ্রীরূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই শ্লোকটী লইয়া অজ্ঞতার ভাণে রহস্যপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপকে দেখাইয়া শ্রীরূপ কিরূপে প্রভুর মনোভাব অবগত হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর বলিলেন,—"শ্রীরূপ তোমার হৃদয়ের গুহ্যতম কথা জানিতে পারিয়াছে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার প্রতি তোমার প্রচুর কৃপা রহিয়াছে।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি ইহাকে যোগ্যপাত্র জানিয়া শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক প্রয়াগে উপদেশ করিয়াছি। তুমিও ইহাকে রসের বিশেষ তত্ত্বসমূহ অবগত করাইও।" শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"শ্রীরূপের রচিত এই শ্লোক দেখিয়াই তাহার প্রতি তোমার কৃপার অনুমান করিয়াছি, যেহেতু ফলের দ্বারাই কারণ জানা যায়।"

চাতুর্ম্মাস্যের অন্তে গৌড়ীয়গণ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে থাকিয়া গেলেন। একদিন শ্রীরূপ তাঁহার বাসস্থানে বসিয়া নাটক লিখিতেছিলেন, তখন তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অকস্মাৎ আগমন হইল। শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন। দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আসন গ্রহণ করিলেন। "কি পুঁথি লিখিতেছ?" বলিয়া শ্রীরূপের নাটকের একটি পাণ্ডুলিপির পত্র হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরূপের মুক্তার পঙ্‌ক্তির ন্যায় অতিসুন্দর হস্তাক্ষর-দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মহাপ্রভু অক্ষরের স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং সেই পত্রে লিখিত একটি শ্লোক দেখিয়া তাহা পাঠ করিতেই প্রেমে আবিষ্ট হইলেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।"

(শ্রীবিদগ্ধমাধব ১।৩৩)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; —দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা মুখে নৃত্য করে, তখন বহু বদন-প্রাপ্তির

জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনীরূপে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস অত্যন্ত উল্লাসভরে শ্লোকের অর্থের প্রশংসা করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীরায়-রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত শ্রীল রূপের বাসস্থানে আগমন করিলেন; পথে আসিবার কালে সকলের নিকট শ্রীরূপকৃত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকদ্বয়ের প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীরূপের গুণ-বর্ণনে পঞ্চমুখ হইলেন। শ্রীরূপের বাসস্থানে উপনীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকটী পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। সম্ভ্রমবশতঃ শ্রীরূপ লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। শ্রীল স্বরূপগোস্বামিপ্রভু সেই শ্লোকটী পাঠ করিলে সকল ভক্তই চমৎকৃত হইলেন। শ্রীল রামরায় ও শ্রীল সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, একমাত্র তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার অন্তরের এই মর্ম্মকথা প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব'-নাটকের "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকটী পাঠ করিবার আদেশ করিলে প্রথমে শ্রীরূপ স্ব-কৃত শ্লোক পাঠ করিতে লজ্জাবোধ করিলেন; কিন্তু প্রভুর পুনঃ পুনঃ আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া শ্লোকটী পাঠ করিলেন। যাবতীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীল রায়-রামানন্দ এই শ্লোক-শ্রবণে আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন; সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"নামমহিমাসূচক অসংখ্য শ্লোক শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ মাধুর্য্যদ্যোতক শ্লোক কোথায়ও শ্রবণ করি নাই।" তখন শ্রীল রায়-রামানন্দপ্রভু শ্রীল রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি গ্রন্থ রচনা করিতেছ, যাহার মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের খনি নিহিত রহিয়াছে?" তখন শ্রীল স্বরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীল রামানন্দরায়ের নিকট শ্রীব্রজলীলাত্মক 'শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক' ও শ্রীপুরলীলাত্মক 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীল রামরায় শ্রীরূপকে 'শ্রীবিদগ্ধমাধবে'র নান্দী-শ্লোক পাঠ করিতে বলিলে শ্রীরূপ শ্রীরায়-রামানন্দের 'নান্দী'-শ্লোকটী (১।১) পাঠ করিলেন।

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী।।

এই শ্রীহরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপোৎপাদক বিষয়সংসারমার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসত্তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন। ইহা চান্দ্রীসুধার মধুরিমাজনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদি আশ্রয়বিগ্রহগণের প্রণয়কর্পূর দ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীল রামরায় শ্রীরূপকে তাঁহার নাটকের মঙ্গলাচরণে যেই শ্লোকে ইষ্টদেবের বর্ণন হইয়াছে, সেই শ্লোকটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভুর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীরূপ সঙ্কোচবোধ করিয়া নীরব থাকিলে শ্রীরামরায় বলিলেন, —"বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থের ফল পাঠ করিতে সঙ্কোচ ও লজ্জার কিছুই নাই।" তখন শ্রীরূপ শ্লোকটী (বিদগ্ধমাধবনাটক—১।২) পাঠ করিলেন,—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।"

সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন শ্রীহরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি-লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে পূর্ব্বে কখনও দান করেন নাই, তাহা প্রদান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীল রামরায় 'শ্রীবিদগ্ধমাধবে'র বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীরূপ অতি দৈন্যভরে প্রত্যেকটী অঙ্গের শ্লোক উদ্ধার করিয়া উত্তর দান করিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীরূপের অতিমর্ত্ত্য কবিত্বের প্রশংসা করিয়া দ্বিতীয় নাটকের (শ্রীললিতমাধবের) নান্দী ও স্বাভীষ্ট-দেবতার বন্দনা শ্রবণ করিতে চাহিলেন। শ্রীরূপ রামরায়ের মাহাত্ম্য ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব অতি দৈন্যভরে জ্ঞাপন করিয়া 'শ্রীললিতমাধবনাটকে'র নান্দী-শ্লোক-পাঠান্তে স্বাভীষ্ট-দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা-সূচক শ্লোকটী (১।২) পাঠ করিলেন।

নিজ প্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্মম শচীসুতাখ্য শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু।।

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজপ্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকারকারী, তমঃসমূহ-দূরকারী, জগন্মানস-বশকারী শচীনন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া অন্তরে উল্লসিত হইলেও লোক-শিক্ষাকল্পে বাহিরে রোষাভাস প্রদর্শন করিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন,—

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসবাক্য-সুধাসিন্ধু।
তা'র মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।১৭৯)

ইহার উত্তর শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিলেন,—

* * "রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তা'র মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।১৮০)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমার ইহাতে উল্লাস হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা শ্রবণ করিতেই নিজের লজ্জা ও লোকের উপহাস বরণ করিতে হইবে।" শ্রীরামরায় বলিলেন,—"লোকও ইহা শুনিয়া সুখীই হইবেন; কারণ ইহাতে মঙ্গলাচরণে শ্রীরূপ অভীষ্টদেবেরই স্মরণ করিয়াছে, কোন শাস্ত্র বা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই।" একদিন এই নীলাচলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ ও ভক্তিরসশাস্ত্রের সিদ্ধান্তপরীক্ষকশিরোমণি শ্রীল স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামি-প্রভু বঙ্গদেশীয় গ্রাম্য কবির নান্দীশ্লোকে সিদ্ধান্তবিরোধপূর্ণ কবিত্ব শুনিয়া শ্রীরূপের নাকটদ্বয়ের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'।।

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যা'র মুখবন্ধে।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১০৭-১০৮)

শ্রীরামরায় 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র এক একটী করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ যথাযথ শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়া উত্তর দান করিলেন। শ্রীল রামরায় উভয় নাটকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাগ্রে সহস্রমুখে শ্রীরূপের কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।।
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।১৯৩-৯৪)

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ।।"

(প্রাচীনকবি-কৃত)

অপরের হৃদয়লগ্ন হইয়া যদি তাহার মস্তকই চঞ্চল না করিতে পারে, তবে কবির কাব্যে ও ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরূপের কবিত্বের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"আমার সহিত শ্রীরূপের মিলন হইলে তাহার গুণে আমার চিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত হইল। ইহার অলঙ্কার-সংযুক্ত কাব্য ও মধুর বর্ণন-প্রণালী অতুলনীয়। এইরূপ কবিত্ব ব্যতীত কখনও অপ্রাকৃত রসের প্রচার হইতে পারে না। তোমরা সকলে কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে এইরূপ বর প্রদান কর, যেন সে নিরন্তর ব্রজলীলাপ্রেমরস বর্ণন করিতে পারে। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের ন্যায়ও পৃথিবীতে বিজ্ঞব্যক্তি আর কেহ নাই। তুমি যেরূপ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছ, ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাতেও সেইরূপ দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা বিরাজিত রহিয়াছে। আমি এই ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া

ইঁহাদিগকে ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারার্থ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছি।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে সস্নেহ-আলিঙ্গন দান করিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ-হরিদাসাদি ভক্তগণও শ্রীরূপকে আনন্দভরে আলিঙ্গন দান করিলেন। শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপা ও শ্রীরূপের শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক গুণ-দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

স্বয়ং শ্রীসরস্বতী-পতি শ্রীগৌরসুন্দর, অতিমর্ত্ত্য অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত রস-কলাবিৎ 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটক'-রচয়িতা—যিনি শ্রীব্রজলীলায় 'শ্রীবিশাখা-দেবী' বলিয়া খ্যাত, সেই শ্রীল রায়রামানন্দ, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ ও অপ্রাকৃত-রসসাগর—যিনি ব্রজলীলায় 'শ্রীললিতাদেবী'-নামে খ্যাত, সেই শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাবতীয় রসতত্ত্ববিদ্ ভক্তবৃন্দ যে শ্রীরূপের অতিমর্ত্ত্য কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত কোন প্রাকৃত গ্রাম্য-কবির তুলনাই হইতে পারে না। প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকে শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুর কবিত্বকে গ্রাম্যকবি কালিদাসের কবিত্বের সহিত সমান, কেহ বা স্বল্প ন্যূন বা অধিক বলিয়া দর্শন ও বর্ণন করে। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত কৌস্তুভমণির সহিত যেরূপ প্রাকৃত কাঁচমণি, এমন কি, কোহিনুরেরও তুলনা হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মনখচ্ছটার সহিত কোন গণমতপূজ্য শ্রেষ্ঠ গ্রাম্য-কবির তুলনাই হতে পারে না।

> ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
> জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
> তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
> ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ।।
>
> (শ্রীভাঃ ১।৫।১০)

যে কবিত্ব বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইয়াও অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ও রতির সহিত অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত কামদেবের আরতি করে না, জ্ঞানিগণ সেই কবিত্বকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়াই মনে করে। মানস-সরোবরের কোমল-কমলকাননবাসী রাজহংসসমূহ যেরূপ কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্টগর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভাগবত-পরমহংসগণ, শব্দবিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও হরিকথা-রসহীন তথাকথিত কাব্যকে শুষ্কবোধে পরিত্যাগ করেন। প্রাকৃত কবিও সময় সময় অনুকরণপ্রিয় হইয়া গতানুগতিকভাবে

মঙ্গলাচরণ প্রভৃতিতে শ্রীহরির নমস্কারাদি করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা অব্যভিচারিণী নহে। কখনও পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে মাতাপিতৃরূপে বন্দনা, আবার কখনও তাঁহাদিগের শৃঙ্গাররস বর্ণন ও কুমার-সম্ভবাদিও দর্শন করেন। অপ্রাকৃত কবিশিরোমণি শ্রীরূপের কবিত্ব একায়নস্কন্ধী পরমহংসগণের নিত্য আরাধ্য। কারণ, তাহা অব্যভিচারিণী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারিণী কবিতাময়ী।

[৯]

শ্রীব্রজে গমন ও শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপন

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়দেশ হইতে আগত ভক্তগণ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরূপ শ্রীদোল-যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নীলাচলে অবস্থান করিলেন। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বহু কৃপা ও শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনগমনার্থ আদেশ ও শ্রীবৃন্দাবন হইতে একবার শ্রীসনাতনকে নীলাচলে প্রেরণ করিবার উপদেশ করিলেন। শ্রীব্রজে গমন করিয়া ভক্তিরসশাস্ত্র-রচনা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরের সেবাসংস্থাপন ও অপ্রাকৃত ভক্তিরস প্রচার করিয়া প্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলে শ্রীরূপ স্বীয় মস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ ও প্রভুর ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীল সনাতন পূর্ব্বেই শ্রীব্রজে আসিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গৌড়ে আগমন করিয়া কুটুম্বগণের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন এবং গৌড়ে যে অর্থ গচ্ছিত ছিল, তাহা আনাইয়া কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে শ্রীরূপের গৌড়ে এক বৎসর বিলম্ব হইল। অতঃপর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—দুইভ্রাতা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া মহাপ্রভুর চতুর্ব্বিধ আজ্ঞাসেবা পালন করিলেন।

দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা।।
নানাশাস্ত্র আনি' লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা।।
রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার।।

'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাহাঁ পাইয়ে পার।।
'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব'—নাটক-যুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল।।
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈলা।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৭-১৮, ২২৩-২৬)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রেমামরতরু শ্রীগৌরসুন্দরের শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শাখার বিস্তৃতি ও কার্য্য এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল।।
আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয়।।
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল।।
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার।।
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তিপূজার প্রচার।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৮৬-৯০)

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যখন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিরূপভাবে অষ্টপ্রহর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বৈষ্ণববৃন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন।।

'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্করুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি'।।
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস।।
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে।।
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১২৭-১৩১)

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের এইরূপ অষ্টপ্রহর শ্রীব্রজভজনের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব-আদেশানুসারে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদেশে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন।

[১০]

শ্রীরূপানুগত্ব

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য় শ্রীব্রজবাসাভিলাষী সমগ্র শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়কে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ।।

(মনঃশিক্ষা—৩)

হে মনঃ! তুমি যদি ব্রজভূমিতে প্রতিজন্মে অনুরক্তভাবে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং যদি সেই পরম প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজনবযুবযুগলকে পরিচর্য্যা করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার উপদেশ শ্রবণ কর; এই শ্রীব্রজভূমিতে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু, নিজগণ-সহ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে সর্ব্বদা প্রেমের সহিত সম্যগ্‌ভাবে স্মরণ কর ও প্রণাম কর।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্তবাবলী'র বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ শ্রীরূপানুগত্যের অসমোর্দ্ধ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহ বিশেষভাবে আলোচ্য,—

শ্রীব্রজবিলাসস্তব—৩৮; বিলাপকুসুমাঞ্জলি—১, ১৪, ৭২; স্বনিয়মদশক—১, ১০; শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি—৪৪; প্রার্থনামৃত—উপক্রম-শ্লোক, ২০; শ্রীমদনগোপালস্তোত্র—২১; শ্রীবিশাখানন্দস্তোত্র—১৩৪; প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশক —৪, ১০, ১১, ১৪; অভীষ্টসূচন—১, ২, ১৩।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীগুরুদেবের নমস্কার-শ্লোকে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যপ্রভুর কৃপায় শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতনকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার 'প্রার্থনা'য় এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যা'বে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।।

শ্রীরূপের দুইজন শ্রেষ্ঠ ভৃত্য—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু তাঁহার 'শ্রীমাধবমহোৎসব'-মহাকাব্যের নয়টি উল্লাসের মধ্যে প্রত্যেক উল্লাসের উপসংহারে শ্রীরূপকে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বন্দনা করিয়াছেন। নিম্নে প্রথম উল্লাসের উপসংহার-শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল,—

অমিত-ভবদবাব্ধৌ দহ্যমানং চিরান্মাং
কথমপি কলয়িত্বা পূর্ণকারুণ্যমূর্ত্তিঃ।
নিজসহজজনান্তে স্বীচকারেশ্বরো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে।।

যে কারুণ্যঘনমূর্ত্তি পরমেশ্বর চিরকাল অসীম সংসার-তাপে দহ্যমান আমাকে কোনও প্রকারে উদ্ধার করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং স্বীয় বিশুদ্ধ দাসের শ্রীপাদপদ্মে ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে বা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার অভীষ্টদেব সেই শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে এই শ্রীধাম-বৃন্দাবনে নিরন্তর ভজনা করি।

অবশিষ্ট সানুবাদ ৮টি শ্লোক ২০শ বর্ষ, গৌড়ীয়ের ২য় সংখ্যায় 'শ্রীশ্রীরূপানুগ-ধারা'-প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "শ্রীমদস্মদুপজীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ১৭৮ অনুঃ)—অর্থাৎ আমার জীবাতু বা আশ্রয় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'ললিতমাধব-নাটকে' (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রকট-লীলাবর্ণন) সেইরূপেই সমাপন করিয়াছেন। "তয়োর্নিত্যবিলাসস্ত্বিত্থং, যথা বর্ণিতমস্মদুপজীব্যচরণাম্বুজৈঃ" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ১৮৯ অনুঃ)—অর্থাৎ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আমার একমাত্র আশ্রয়, সেই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যবিলাস এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবের ভৃত্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কোটিকণ্ঠে শ্রীরূপের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে বরণ করিয়াছেন; —

(১)

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরম-করম।।

অনুকূল হ'বে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশিদিনে।।
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

(২)

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ।।
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার।।
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা' প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যা'র, সেই মহাশয়।।
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যা'বে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।।
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে।।

(৩)

এই নব-দাসী বলি' শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হ'বে।।
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ ত্বরায়।।

আনন্দিত হঞা হিয়া আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিবে তৎকালে।।
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া।।
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি।।

(৪)

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা-পানে চাঞা।।
সদয়-হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি'।
কোথায় পাইলে, রূপ, এই নব-দাসী।।
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ-বাক্য শুনি'।
মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি'।।
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্যে নিয়া তবে হেথায় রাখিল।।
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া।।

[১১]

শ্রীগোবিন্দদেব

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (২য় তরঙ্গ, ৪২২-৪৫৩) শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামি-কৃত 'সাধনদীপিকা'র শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহসেবা-প্রকাশ-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবিন্দসেবার অধ্যক্ষ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৫৪)। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণঘেরার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে (ইং ২৭।১১।৪০ তারিখে)

শ্রীনারায়ণভট্ট-কৃত 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু 'ভক্তি-রত্নাকরে' যে 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামি-কৃত। 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থে শ্রীরূপানুগত্যের মহিমা অতি সুন্দরভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

মহাদ্বহিষ্কৃতা যে চ শ্রীরূপস্য কৃপাম্বুধেঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যো রাগাধ্বপান্থিকৈঃ খলু।।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজদ্বন্দ্বং বন্দে মুহুর্মুহুঃ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তন্মতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ।।

যে-সকল লোক কৃপানিধি শ্রীরূপের প্রেমরস-তত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত হইতে বহিষ্কৃত, তাহাদের সঙ্গ রাগমার্গের পথিকগণ অবশ্যই করিবেন না। যাঁহার পদ-যুগলের প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীরূপের সিদ্ধান্তে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, শ্রীরূপের সেই শ্রীপদকমলযুগল আমি বার বার বন্দনা করি।

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে! সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপম্।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং
তস্যাদ্বিতীয়সুতনুং রঘুনাথদাসম্।।

হে রসনে! তুমি সর্ব্বদা 'রূপ' এই নাম কীর্ত্তন কর; হে মন! করুণার মূর্ত্তি শ্রীরূপপ্রভুকে তুমি স্মরণ কর; হে শিরঃ! তুমি কৃপাদৃষ্টিপূর্ণ শ্রীরূপপ্রভুকে নমস্কার কর। তদ্রূপ শ্রীরূপের অদ্বিতীয় দেহ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকেও কীর্ত্তন, স্মরণ ও নমস্কার কর।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাকট্য-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর-ধৃত উক্ত 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ আছে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-পালনার্থ গমন করিলেন, তখন তথায় শ্রীবিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া অন্তরে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। শ্রীরূপ ব্রজের বনে বনে, গ্রামে গ্রামে ও শ্রীব্রজবাসিগণের প্রতিগৃহে তাঁহার অভীষ্টদেহের অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও শ্রীবিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে একদিন শ্রীযমুনার তটে এক বৃক্ষতলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন; এমন সময় একজন পরম

সুন্দর ব্রজবাসী আসিয়া স্নেহভরে শ্রীরূপের বিষণ্ণভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ সেই ব্রজবাসিরূপী পুরুষকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত আদেশের কথা নিবেদন করিলেন। সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজবাসী শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুকে 'গোমাটিলা'-নামক একস্থানে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং সেইস্থান দেখাইয়া বলিলেন যে, প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্লে ঐ স্থানে এক কামধেনু আসিয়া স্বেচ্ছায় দুগ্ধ-বর্ষণ করিয়া যান। উক্ত সুপুরুষ ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীরূপকে বিধান করিবার জন্য বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীরূপ উক্ত ব্রজবাসীর কথা শ্রবণ করিয়া ও রূপ দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে ধৈর্য্যধারণ করিয়া সমস্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন এবং ঐ স্থানেই শ্রীযোগপীঠ ও তথায়ই শ্রীগোবিন্দদেব নিহিত রহিয়াছেন, ইহা ব্রজবাসিগণকে জ্ঞাপন করিলেন। বালক-বৃদ্ধ-যুবা—সকল ব্রজবাসীই একত্র মিলিত হইয়া প্রেমবিগলিত-চিত্তে সেইস্থান পরিষ্কার করিলেন এবং শ্রীবলদেবের কৃপায় শ্রীযোগপীঠের মধ্যস্থিত কোটিমন্মথমোহন শ্রীগোবিন্দ-দেবের শ্রীমুখারবিন্দ-দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। এই বার্ত্তা শ্রীরূপ পত্রীদ্বারা নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরকে জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলবান্ কাশীশ্বরকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট গমন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু শ্রীকাশীশ্বরের বিরহ-ব্যথিত অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবের পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আনিয়া শ্রীকাশীশ্বরকে বলিলেন,—"এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে আমার সহিত অভেদ জানিবে।" শ্রীবিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু একত্রে ভোজন করিলেন। কাশীশ্বর দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবন লইয়া গেলেন। তিনিই শ্রীগোবিন্দের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভু। এতৎপ্রসঙ্গে 'সাধন- দীপিকা'র একটী শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

পদকান্ত্যা জিতমদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিতকমলমণিগর্ব্বঃ।
শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌরগোবিন্দঃ।।

শ্রীপাদপদ্মের কান্তিতে যিনি মদনকে জয় করেন, শ্রীমুখকান্তিতে যিনি কমল ও মণির গর্ব্ব হরণ করেন, শ্রীরূপ যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ আমাকে কৃপা করুন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৯২-১১০ সংখ্যা) উদ্ধৃত 'সাধনদীপিকা'র শ্লোক হইতে আর একটী প্রসঙ্গ জানা যায়। শ্রীবৃহদ্ভানু নামে খ্যাত দাক্ষিণাত্যবাসী, পরমবৈষ্ণব এক ব্রাহ্মণ উৎকল-প্রদেশের শ্রীরাধানগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবিগ্রহ উক্ত বৃহদ্ভানুর গৃহে আগত হইয়া তদ্দ্বারা কন্যারূপে বাৎসল্যরসে সেবিতা হন। শ্রীবৃহদ্ভানুর অপ্রকটের পর লোক-মুখে উৎকলরাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ঐ কথা শুনিয়া স্বয়ং শ্রীরাধানগরে আসিয়া সেই দিব্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যান। রাজা রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিতে পান যে, সেই শ্রীরাধিকা শ্রীমূর্ত্তি অচিরে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীরাধিকা শ্রীজগন্নাথের 'চক্রবেড়'-নামক স্থানে পরমাদরের সহিত প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। সাধারণ লোক এই শ্রীমূর্ত্তিকে শ্রীলক্ষ্মী বলিয়াই পূজা করিতেন। রাজকুমার শ্রীপুরুষোত্তম জানার প্রতি স্বপ্নাদেশ প্রদান করিয়া সেই শ্রীমতী শ্রীমূর্ত্তি বহুলোক সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীগোবিন্দদেবের বামে সংস্থাপিতা হন।

"শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা।
গৌড়-উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা।।"

(শ্রীভঃ রঃ ৬।১০৭)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের আপাতদৃষ্টিতে ভগ্নচূড় বিরাট্ শ্রীমন্দির সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও বিচিত্র ইতিহাস শ্রুত হয়। শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে, উহারই পশ্চিমপার্শ্বে 'গোমাটিলা'-নামক এক উচ্চ স্তূপের উপর শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির স্থাপিত। কথিত হয়, স্বনামধন্য মানসিংহ রক্তবর্ণ জয়পুরী প্রস্তরে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব মূল মন্দিরের ও উপরের পাঁচটী চূড়া ভগ্ন (?) করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রাবণ যেরূপ ছায়াসীতাকে হরণ করিয়াই স্বরূপ-শক্তি শ্রীসীতাদেবীকে কবলিত করিয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপর প্রত্যহ যে প্রোজ্জ্বল আলোক জ্বলিত, তাহা আগ্রার কোন সুদূর প্রাসাদ হইতে দেখিতে পাইয়া বাদশাহ তাঁহার বিলাস-প্রাসাদের উচ্চতা হইতে অন্য-

ধর্ম্মীর মন্দিরের চূড়ার উচ্চতা অধিক, ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাদশাহ শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিতে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের পূজকগণ ইহা চরমুখে জানিতে পারিয়া অবিলম্বে স্ব-স্ব অভীষ্টদেবকে লইয়া বনপথে পলায়ন করেন। এইরূপভাবে শ্রীগোবিন্দদেব জয়পুরে নীত হইলেন। তথায় এখনও শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা হইতেছে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও যে অসমর্থের ন্যায় লীলা করেন, স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও যে রক্ষ্যপ্রায়ের ন্যায় অভিনয় করেন, ইহা কেবল ভক্তগণের সেবাকর্ষণ ও বিমুখ-মোহনের একটি অপূর্ব্ব কৌশলরূপ লীলা-চমৎকারিতাবিশেষ।

শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানকে 'গোবিন্দের ঘেরা' বলে। জগমোহনের দুইপার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। উহার দক্ষিণ দিকের মন্দিরের অভ্যন্তর 'শ্রীযোগপীঠ'-নামে খ্যাত। এইস্থানেই শ্রীগোবিন্দদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কএকটি সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলে একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় স্থানে উপনীত হওয়া যায়; সেইস্থানে প্রদীপের দ্বারা পূজারিগণ শ্রীযোগমায়ার শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের একটি শ্রীচরণ-চিহ্নও আছে। এই ছোট মন্দিরের উত্তর-দিকের ভিত্তিগাত্রে দেবনাগর অক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে,—

"সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্ধ আকবর সাহা রাজশ্রী কর্ম্মকুল শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজবংশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠস্থ মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রীকল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচংদ চোঁপাঙ শিল্পকারি গোবিন্দ দাস দিলবলী কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিমবল।"

অর্থাৎ আকবর বাদশাহের চতুস্ত্রিংশত্তম (৩৪তম) রাজ্যাব্দে মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশীয়, মহারাজ শ্রীভগবান্ দাসের পুত্র, মহারাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠ-স্থানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই নির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রধান ব্যক্তি কল্যাণদাস, শিল্পকারী বা ভাস্কর মাণিকচাঁদ চোঁপাঙ এবং দিল্লীবাসী গোবিন্দদাস কারিকর বা রাজমিস্ত্রী ছিলেন। গণেশদাস বিমবল 'দঃ' এইরূপ সঙ্কেতের দ্বারা বোধ হয়, দস্তখতের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্দিরে ক্ষোদিত যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা অনুমিত হয়, শ্রীগোবিন্দদেব-প্রকাশের বহু বৎসর পরে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল রূপগোস্বামি-

প্রভুর সভায় শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীগোবিন্দৈকপ্রাণ শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে, —(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৩১)

"নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা।।"

শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রভুর কোন শিষ্যের পরিচয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নাই বা শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্ম্মাতারও কোন উল্লেখ নাই।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত (২য় তরঙ্গ ৪৪৯-৪৫৩) 'সাধনদীপিকা'-গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে কৃপাসিন্ধু শ্রীরূপ শ্রীব্রহ্মকুণ্ডের তটের সম্মুখে শ্রীবৃন্দাদেবীকেও প্রকট করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীগোবিন্দ-ঘেরার উত্তর দিকে যে ছোট মন্দিরটি আছে, তথায় শ্রীবৃন্দাদেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে কাম্যবনে বিজয় করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূঃ বিঃ ২।১১১) শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে কিরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা একটি শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ।।

হে সখে! যদি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশী-ঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বাম অঞ্চলে নেত্রকটাক্ষ-বিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ-কিশলয়ে বিরাজিত বংশী ও ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর টীকার প্রারম্ভে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু ইঁহার রচনার কারণ-সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের কোন কবির পঠিত দেববিরুদাবলীর পদ ও অর্থ-লালিত্য-শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে নিজকণ্ঠ হইতে মালিকা প্রদান করেন। 'সর্ব্বেশ্বর

শ্রীগোবিন্দদেব দেববিরুদাবলী শ্রবণে কিরূপে প্রসন্ন হইলেন'—এইরূপ সন্দিহান অবস্থায় একদিন শ্রীল রূপপ্রভু শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি এইরূপ লক্ষণযুক্ত আমার বিরুদাবলী রচনা কর।"

শ্রীল কবিরাজ গেস্বামি-প্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভেই শ্রীবৃন্দাবনের তিন জন অধিদেবতার প্রণামের মধ্যে অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দের প্রণাম এইভাবে করিয়াছেন,—(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।১৬)

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।"

জ্যোতির্ম্ময়-শোভাবিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন; আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

মহাযোগপীঠে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীহরিদাস ও তাঁহার শ্রীগুরুপরম্পরা এবং শ্রীগোবিন্দের অন্যান্য সেবক ও শ্রীগোবিন্দ-পূজকগণের নাম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু অন্যত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন; —

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন।
মহাযোগপীঠ তাহাঁ, রত্নসিংহাসন।।
তা'তে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
'শ্রীগোবিন্দদেব'-নাম সাক্ষাৎ মদন।।
রাজসেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার।।
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন।।
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁ'র যশঃগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ।।

* * *

কাশীশ্বর গোসাঞিঃর শিষ্য—গোবিন্দ গোসাঞিঃ।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁ'র সম নাঞিঃ।।
পণ্ডিত-গোসাঞিঃর শিষ্য—ভূগর্ভ গোসাঞিঃ।
গৌরকথা বিনা তাঁ'র মুখে অন্য নাই।।
তাঁ'র শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।৫০-৫৪, ৬৬, ৬৮-৬৯)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য (১) শ্রীহরিদাস পণ্ডিত; 'বলবান্' শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য (২) শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য (৩) শ্রীচৈতন্যদাস প্রভৃতি শিষ্য কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সময় শ্রীগোবিন্দদেবের একনিষ্ঠ প্রিয় সেবক ছিলেন।

[১২]

শ্রীরূপের অন্ত্যলীলা

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-বিচারে কখনই তাঁহার উপর আরোহণ করিতেন না। বৃদ্ধকালে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনে গমন করিতে অসমর্থতার লীলা প্রকাশ করিলে, অথচ শ্রীগোপালের সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীগোপাল তাঁহার নিজজন শ্রীরূপপ্রভুকে দর্শন প্রদান করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে স্বয়ংই শ্রীমথুরানগরীতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের আত্মজ শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের ভবনে আসিয়া তথায় একমাসকাল তাঁহার সেবা গ্রহণ করিলেন। সেই সময় শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু তাঁহার গণসহ শ্রীগোপালদেবের দর্শন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের নিজগণের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

তবে রূপ গোস্বামি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া।।
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞিঃ, আর লোকনাথ।।
ভূগর্ভ-গোসাঞিঃ, আর শ্রীজীব-গোসাঞিঃ।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞিঃ।।

শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব, দুইজন।
শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ।।
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস।।
এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজসঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহুরঙ্গে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৮।৪৮-৫৩)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অপ্রকট-লীলাবিষ্কার করিলে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌর-বিরহবিধুর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে-সকল লীলা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিতেন, তাহা 'স্তবমালা'র শ্রীচৈতন্যাষ্টকে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর বিরহ-ব্যথিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্তবাবলী'র 'প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক'-নামক স্তবে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

অপূর্ব্বপ্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দৈবাৎ প্রতিপদ-বিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্।।
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে।।

আমার জীবাতু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু অপূর্ব্ব প্রেমসমুদ্রের পরিমল-জলের ফেনসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে যে-প্রকারে সিক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এখন আমি দুর্দ্দৈববশতঃ প্রতিপদে বিপদ্‌রূপ দাবানলের কবলে পড়িয়া আশ্রয়শূন্য হইয়াছি, অতএব এখন আমি শ্রীরূপপ্রভু ব্যতীত আর কাহারই বা আশ্রয় গ্রহণ করিব?

আমার জীবন-স্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।

[১৩]

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'লঘুতোষণী'র উপসংহারে শ্রীরূপের রচিত গ্রন্থাবলীর যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই—

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা।।
স্তবস্যোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।।
বিদগ্ধ-ললিতাগ্রাখ্য-মাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।।

তাঁহাদের মধ্যে অনুজ অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামি কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রসিদ্ধ; যথা,—'শ্রীহংসদূতকাব্য', 'শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ', 'ছন্দোঽষ্টাদশক'। তাঁহার 'স্তবমালা', 'গোবিন্দবিরুদাবলী', 'প্রেমেন্দুসাগরা'দি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে; 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব'-নামে নাটকদ্বয়, দানকেলিভাণিকা, রসামৃতযুগল, মথুরা-মহিমা, নাটকচন্দ্রিকা ও সংক্ষিপ্ত-ভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১।৭৯৬-৭৯৯) শ্রীলঘুতোষণীর এই সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তৎপরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের রচিত গ্রন্থ হইতে তালিকা উদ্ধার করিয়া লঘুতোষণীতে অনুক্ত শ্রীরূপের আরও চারিটি গ্রন্থ, যথা— (১) 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম-তিথিবিধি', (২) 'শ্রীবৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকা', (৩) 'শ্রীলঘুগণোদ্দেশদীপিকা' ও (৪) 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা'র নাম প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারি-সম্বন্ধে শ্রীরাধাদামোদরালয়স্থ গুরু-পরম্পরা দ্রষ্টব্য।

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্ব্বিধিঃ।।

বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা।।
বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।
দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্।।
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।

তাঁহাদের মধ্যে অনুজ শ্রীরূপের প্রণীত গ্রন্থাবলীর কতিপয় বিশিষ্ট নাম, যথা— (১) শ্রীহংসদূতকাব্য, (২) শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ, (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির বিধি, (৪) শ্রীবৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকা, (৫) শ্রীলঘুগণোদ্দেশদীপিকা, (৬) শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রিয়গণের মনোহরা স্তবমালা, (৭) প্রসিদ্ধ শ্রীবিদগ্ধমাধব, (৮) শ্রীললিত-মাধব, (৯) দানলীলাকৌমুদী, (১০) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (১১) শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি, (১২) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, (১৩) শ্রীমথুরামহিমা, (১৪) পদ্যাবলী, (১৫) নাটকচন্দ্রিকা ও (১৬) লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ।

শ্রীভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে উক্ত লঘুতোষণীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীরূপের গ্রন্থাবলীর বিষয় বর্ণন করিয়াছেন,—

শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলাসহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল।।
(১) কাব্য-হংসদূত আর (২) উদ্ধবসন্দেশ।
(৩) কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি বিধান অশেষ।।
গণোদ্দেশদীপিকা (৪) বৃহৎ- (৫) লঘুদ্বয়।
(৬) স্তবমালা (৭) বিদগ্ধমাধব রসময়।।
(৮) ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
(৯) দানলীলাকৌমুদী আনন্দ-মহোদধি।।
'দানকেলিকৌমুদী' বিদিত এই নাম।
(১০) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই অনুপম।।

(১১) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ রসপূর।
(১২) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা-গ্রন্থ সুমধুর।।
(১৩) মথুরামহিমা, (১৪) পদ্যাবলী এ বিদিত।
(১৫) নাটকচন্দ্রিকা (১৬) লঘুভাগবতামৃত।।
বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল।।
অষ্টকাললীলা তা'তে অতি রসায়ন।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন।।
সংক্ষেপে করিল আর বিরুদলক্ষণ।
গ্রন্থের গণনা-মধ্যে না কৈল গণন।।
গোবিন্দবিরুদাবলী লক্ষণ তাহার।
দোঁহে এক এহেতু লক্ষণে এ প্রচার।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৮১১-২১)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দুই স্থানে শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি এইরূপ লক্ষ গ্রন্থ (শ্লোক বা এক পরিমাণ শব্দ-সংখ্যা) রচনা করিয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থমাত্র বর্ণিত হইল,—

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন।।
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব।।
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ-লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী।।
গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন।।

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৩৭-৪১)

রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাহাঁ পাইয়ে বিস্তার।।
'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর।
রাধাকৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে পার।।
'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব'—নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল।।
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈলা।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২২৩-২৬)

১। **শ্রীহংসদূত**—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর লঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীল শ্রীরূপপ্রভুকৃত গ্রন্থ-তালিকার সর্ব্বপ্রথমেই 'শ্রীহংসদূত'-কাব্যের নামোল্লেখ আছে। শ্রীহংসদূত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীল শ্রীরূপের মিলন-লীলার পূর্ব্বে রচিত খণ্ডকাব্য-বিশেষ (মহাকাব্যের একদেশানুসারী ক্ষুদ্রকাব্য) বলিয়া বিবেচিত হয়। এই গ্রন্থের কয়েকটি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি দৃষ্ট হয়; দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত ইহার কয়েকটি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহের ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮ খৃঃ, ৪৪১ হইতে ৫০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'হংসদূতে'র সংস্করণে, ১৪২টি শ্লোক আছে, কিন্তু বসুমতী কার্য্যালয় হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত 'হংসদূতে'র সংস্করণে ১০১টি শ্লোক আছে। বস্তুতঃ সপ্তদশাক্ষর শিখরিণীচ্ছন্দে ১৪২টি শ্লোকেই 'হংসদূত'-কাব্য রচিত। বসুমতীর ভ্রমপূর্ণ সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য নহে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' (দঃ৪লঃ।৪৭; পঃ২লঃ।৭০; উঃ৪লঃ।৭) ও 'শ্রীউজ্জ্বল- নীলমণি'তে (সখী প্রঃ ৫৫; ব্যভিচারী ১৫, ৬২, ৮১, ৯৪; স্থায়িভাব ৬; প্রবাস ৬৪, ৬৫; মুখ্যসম্ভোগ ১৩; গৌণসম্ভোগ ৪) শ্রীহংসদূত হইতে দৃষ্টান্ত-শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীহংসদূত-কাব্যের মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও উপান্ত-শ্লোকদ্বয়ে যথাক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর গুণমহিমা বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার জয়ঘোষণা ও অখিল জগতের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় মধুর রসময় লীলাবলীযুক্ত কাব্য শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে আনন্দ-বিস্তার করুক, ইহাই কাব্যরচনার ফলরূপে প্রার্থনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই,—

দুকূলং বিভ্রাণো দলিত-হরিতাল-দ্যুতিহরং
জবাপুষ্প-শ্রেণীরুচি-রুচিরপাদাম্বুজতলঃ।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঞ্চিতমুখঃ
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ।।

উজ্জ্বল পীতাম্বরধারী, জবাকুসুমদলের কান্তির ন্যায় মনোজ্ঞ শ্রীচরণতল-বিশিষ্ট, মৃদুমন্দহাস্যদ্বারা বিলসিত, পরিপূর্ণ আনন্দঘনমূর্ত্তি, তমালশ্যামলত্বিট্ শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর কীর্ত্তি ও জয়সূচক শ্লোকটি এই,—

প্রপন্নঃ প্রেমাণং ভগবতি সদা ভাগবতভাক্
পরাচীনো জন্মাবধি ভবরসাদ্ভক্তিমধুরঃ।
চিরং কোঽপি শ্রীমান্ জয়তি বিদিতঃ সাকরতয়া
ধূরীণো বীরানামধিধরণি বৈয়াসকিরিব।।

শ্রীভগবানের একান্ত প্রেমবান্, সর্ব্বক্ষণ শ্রীভাগবত শাস্ত্রের ভজনাকারী, আজন্ম জড়বিষয়রসের প্রতি পরাঙ্মুখ, ভক্তিদ্বারা মধুর-স্বভাবসম্পন্ন, 'সাকর মল্লিক' এই উপাধি দ্বারা বিখ্যাত, শ্রীশুকদেবের ন্যায় জ্ঞানভক্তি-বৈরাগ্যশীল মহাপুরুষগণেরও মুকুটমণি, অনির্ব্বচনীয় অনন্ত-গুণে গুণী কোনও শ্রীযুক্ত পুরুষ ধরণীতে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

সর্ব্বশেষ শ্লোকটি এই,—

রসানামাধারৈরপরিচিতদোষঃ সহৃদয়ৈ-
র্মুরারাতি-ক্রীড়ানিবিড়ঘটনারূপসহিতঃ।
প্রবন্ধোঽয়ং বন্ধোরখিলজগতাং তস্য সরসাং
প্রভোরন্তঃ সান্দ্রাং প্রমদলহরীং পল্লবয়তু।।

সহৃদয় অপ্রাকৃত রসিকগণের এইগ্রন্থে কোন অজ্ঞাতদোষ (রসভাবালঙ্কারাদির বিচ্যুতি-লক্ষণ-সংযুক্ত দোষ) অনুভূত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় রসময় লীলাবিষয়ক শ্লোকের দ্বারা গুম্ফিত এই প্রবন্ধ অখিল জগতের বন্ধু ও সেই রস-কেলিকলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে গাঢ় ও সরস আনন্দতরঙ্গ বিস্তার করুক।

এই কাব্যের বিষয়বস্তু—শ্রীমথুরা-গত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-দশা-দর্শনে ব্যথিতা শ্রীললিতাদেবীর যমুনাবিহারী কোনও হংসকে দূত করিয়া শ্রীমতীর দশা জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য আবেদন।

শ্রীগোপীর হৃদয়ানন্দ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের অনুরোধে শ্রীনন্দভবন হইতে শ্রীমথুরায় গমন করিলে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিরহকাতরা হন। বিরহে উৎক্ষিপ্তা হইয়া একদিন শ্রীরাধা সখীগণের সহিত বিরহানল নির্ব্বাপণ করিবার জন্য সুশীতল শ্রীযমুনার তীরে গমন করিয়া পূর্ব্বপরিচিত কুঞ্জভবনাদি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে অধিকতর উদ্দীপ্তা হন ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। সখীগণ শ্রীমতীর এই দশা দেখিয়া নানা উপায়ে শ্রীমতীর প্রাণমাত্র রক্ষা করেন। শ্রীললিতাদেবী যমুনাতীরের দিকে আগমনোন্মুখ একটি শুভ্র হংসকে দেখিতে পাইয়া অসহায়া তাঁহাদিগের একমাত্র সহায়করূপে বিবেচনা করিয়া হংসকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণসভার দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। এই হংসকে সম্বোধন করিয়া শ্রীললিতা প্রিয়তমা শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা মথুরায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য হংসকে অনুরোধ করেন ও সেই প্রসঙ্গেই শ্রীমথুরায় গমনকালে হংস শ্রীকৃষ্ণলীলায় উদ্ভাসিত কোন্ কোন্ স্থান দর্শন করিয়া যাইবেন, তাহাও অত্যন্ত বিরহাসক্তির সহিত বর্ণন করেন। বস্ত্রহরণ-ঘাটের কদম্ববৃক্ষরাজ, রাসস্থলী, শ্রীগোবর্দ্ধন, অরিষ্টাসুরের মস্তক, ভাণ্ডীরবৃক্ষ, ব্রহ্মার স্তবস্থান, কালিয়হ্রদ, শ্রীবৃন্দাদেবী, কেকাধ্বনি-মুখরিত বনসমূহ এবং যাদবগণের রাজধানী মথুরানগরীর শোভা ও ঐশ্বর্য্য বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে মথুরানাগরীগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উল্লাস ও বিহ্বলতা, তথায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া শ্রীললিতাদেবী শ্রীকৃষ্ণ তথায় কিরূপভাবে সেবিত হন, তৎপ্রসঙ্গ এবং শ্রীচরণ-কমল হইতে শ্রীমুখারবিন্দ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপশোভা বর্ণন করেন। মথুরায় যখন কোকিলের মধুর কূজন শ্রুত বা মল্লিকাকুসুমের বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনস্মৃতির উদ্দীপনা হইতে পারে, বিচার করিয়া সেই অনুকূল অবসরেই ব্রজললনাগণের কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করিবার

জন্য হংসকে উপদেশ দিয়া দিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন স্মৃতির উদ্দীপনা করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-বাসকালে যে সমস্ত বস্তু প্রিয়, আকাঙ্ক্ষিত ও কৌতুকের বিষয় ছিল, সেই সকল বস্তুর কথাও স্মরণ করাইয়া দিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী মথুরানগরীতে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের নানাপ্রকার সেবায় মুগ্ধ হইয়া বনের সহজ সম্পত্তি ও বনবাসিনীগণের প্রতি সহানুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন প্রভৃতি বিষয় ও শ্রীরাধার উৎকট বিরহবেদনাময় অবস্থার কথা হংসকে বলিয়া দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবক্রা কুব্জার সৌভাগ্য এবং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণদর্শন-কামনায় পার্ব্বতীর ও শিবের আরাধনা, কখনও কখনও অধিরূঢ়-মহাভাবে আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণকে জানাইবার জন্য হংসের নিকট বর্ণন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত শ্রীউদ্ধব শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীরাধিকার বিরহদুঃখ উপশান্ত হওয়া দূরে থাকুক, কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; বৃহস্পতি-শিষ্য সেই শ্রীউদ্ধব মন্ত্রিত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ও যমের ভগ্নী শ্রীযমুনাও ভ্রাতার ন্যায় নির্দ্দয়া হইয়াছেন। সুতরাং ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপীগণের দুঃখের কথা নিশ্চয়ই জ্ঞাপন করিবেন না। একমাত্র শুভ্র (অকুটিল) হংসকেই দূতরূপে প্রেরণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শ্রীললিতাদেবী অত্যন্ত আর্ত্তান্তঃকরণে শ্রীরাধার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের জন্য হংসের নিকট অনেক প্রকার ঘটনা বলিয়া দিলেন। দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় শ্রীমতী যেরূপ বিলাপ করেন, তাহা সমস্তই হংসের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করিয়া শ্রীললিতাদেবী হংসকে তাঁহাদের 'দরদী' দূত করিবার চেষ্টা করিলেন। কবে আবার শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত দর্শন করিয়া তাঁহাদের নানাবিধ সেবায় অভিষিক্ত হইবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-দ্যোতক অনেক কথা হংসের নিকট বলিলেন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের 'বনমালা', 'মকর-কুণ্ডল', 'কৌস্তুভমণি' ও 'শঙ্খ'—ইঁহাদিগকেও সম্বোধন করিয়া শ্রীললিতাদেবী শ্রীরাধার বিরহব্যথার কাহিনী বলিয়া তাঁহাদিগের সৌভাগ্যের প্রতি শ্লাঘাব্যঞ্জক ও তাঁহাদিগের সহানুভূতি-আকর্ষণ বাক্যসমূহ হংসের নিকট বলিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট মৎস্য-কূর্ম্মাদি শ্রীভগবানের দশাবতারের লীলা ক্রমানুসারে বর্ণনব্যাজে হংসকে শ্রীব্রজগোপীগণের প্রণয়ক্রোধ জ্ঞাপন করিতে বলিলেন।

'হংসদূতে'র ১২৮ হইতে ১৩৭ সংখ্যক ১০টি শ্লোকে অতীব নৈপুণ্যের সহিত শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীললিতাদেবীর মুখে দশাবতারকথাবর্ণনব্যাজে শ্রীনন্দ-নন্দনের সর্ব্বাবতারিত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও শ্লেষে প্রণয়ক্রোধ ব্যক্ত করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শনের সারকথা ও শ্রীব্রজভজনের গূঢ় রহস্য প্রকট করিয়াছেন।

হংস মিশ্রিত ক্ষীর ও নীর হইতে সারবস্তু দুগ্ধগ্রহণবিষয়ে নিপুণ; সুতরাং হংস নিশ্চয়ই ব্রজললনাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক দৌত্যকার্য্য করিবেন,—শ্রীললিতাদেবীর এই আবেদন-বাক্যে কাব্যের বর্ণন সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীহংসদূতের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া নাই এবং উপসংহারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর জয়সূচক যে শ্লোকটী দৃষ্ট হয়, তাহাতেও শ্রীসনাতন 'সাকর মল্লিক'-নামে অভিহিত হওয়ায়, এই গ্রন্থ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মিলনলীলার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ "বিদিতঃ সাকরতয়া" এই পাঠের মধ্যে কিঞ্চিৎ ছল উঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা অনুমান করিয়া বলেন যে, সম্ভবতঃ 'বিদিতঃ সাকরতয়া' পদদ্বয় 'বিদিতঃ সৎকবিতয়া' পদদ্বয়ের রূপান্তর। বস্তুতঃ 'বিদিতঃ সাকরতয়া' * এই পাঠ-সংযুক্ত অনেক হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কয়েকটি মুদ্রিত সংস্করণেও "বিদিতঃ সাকরতয়া" পাঠই দৃষ্ট হয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুর এই শ্লোকটি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের বহু কল্পিত মতবাদকে নিরাস করিয়াছে। যাহারা মনে করে, সাকর মল্লিক পূর্ব্বে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ছিলেন, পরে ঘটনাক্রমে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয় বা দবিরখাস ও সাকর মল্লিক উভয়েই ম্লেচ্ছসঙ্গে থাকিয়া ম্লেচ্ছাচারী বা জাতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের অপরাধপূর্ণ মতবাদ যে সর্ব্বাংশে স্বকপোলকল্পিত, তাহা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর ঐ শ্লোকই প্রমাণিত করে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে'র (১ম খণ্ড) অন্তর্গত 'হংসদূতে'র টীকায় 'সাকরতয়া' অর্থে 'সদ্বংশীয়তয়া' দৃষ্ট হয়।

শ্রীহংসদূতকাব্যটী পাঠ করিলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়কে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ বলিয়া বিচার অধিকতর সুদৃঢ় হয়। শ্রীল সনাতন যে জন্মাবধি জড়রস-বিমুখ ও অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের ভজনকারী, শ্রীকৃষ্ণে একান্ত

---

* কেহ কেহ বলেন,—দবিরখাস— [(ফাঃ) দবীর (= মুন্সী, Secretary) — ই — (আঃ) খাস (= নিজস্ব, Private)] = খাসমুন্সী, Private Secretary ; তদ্রূপ 'সাকরমল্লিক' শব্দের অর্থ—Chief Secretary.

শরণাগত প্রেমবান্ এবং ভাগবতপরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ন্যায় জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য-বীরগণের শিখামণি ছিলেন, তাহা শ্রীরূপের বাক্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। 'বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগরসের পুষ্টি হয় না'—এই ন্যায় ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অতিমর্ত্ত্যা অধিরূঢ়-মহাভাবময়ী সর্ব্বোত্তমা প্রীতির অবস্থা—যাহা শ্রীরাধাভাবকান্তি-বিভাবিত শ্রীশচীনন্দনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাহ্যে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়লীলা প্রকট করিবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া তদ্রচিত উক্ত খণ্ডকাব্যের মধ্যে প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ নিজজন ব্যতীত কোন প্রাকৃত কবি, যতই রসশাস্ত্রাদিতে দক্ষ ও নিপুণ হউন না কেন, কখনই এইরূপ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করিতে পারেন না। কালিদাসাদি গ্রাম্য-কবিগণের কাব্যে এইরূপ আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনসেবাই সখীর একমাত্র অভীষ্টসেবা, স্ব-স্ব সম্ভোগেচ্ছা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ নহে, আশ্রয়বিগ্রহের পক্ষপাতিত্ব, আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রেষ্ঠত্ব, পৌরলীলা হইতে শ্রীব্রজলীলার উৎকর্ষ ও অধিক চমৎকারিত্ব এবং বিপ্রলম্ভভাবে ভজনই যে শ্রীকৃষ্ণভজনের গূঢ় রহস্য, তাহা শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনলীলার পূর্ব্বেই লিখিত শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর শ্রীহংসদূতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীহংসদূতের গোপালচক্রবর্ত্তি-কৃতা ও আনন্দের পুত্র মধুমিশ্র বা পুরুষোত্তম-রচিতা দুইটি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Libraryর Triennial Catalogueএ (Vol. IV., Part-I, Sanskrit A., R. No. 2991) শেষোক্ত টীকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শেষোক্ত টীকার পুষ্পিকা এইরূপ —"ইতি শ্রীমধুমিশ্রবিরচিতা শ্রীরূপসনাতনকৃতস্য হংসদূতস্য টীকা সমাপ্তা।"

২। **শ্রীউদ্ধবসন্দেশ**— শ্রীহংসদূতে যেরূপ নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রধানা সখী শ্রীললিতাদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট মথুরায় যমুনা-সলিল-বিহারী হংসকে দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীউদ্ধবসন্দেশে নায়ক-শিরোমণি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমথুরা হইতে বৃহস্পতিশিষ্য শ্রীউদ্ধবকে দূত করিয়া বিরহবিধুরা গোপীগণের সান্ত্বনার্থ ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য এই গ্রন্থ "শ্রীউদ্ধবদূত" নামেও বিদিত; অথবা শ্রীউদ্ধবের দ্বারা বাহিত শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ বা সংবাদ বলিয়া ইহার নাম—"শ্রীউদ্ধবসন্দেশ" হইয়াছে।

শ্রীঅক্রূরের মুখে কংসের অহঙ্কারদৃপ্ত বাক্য-শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীব্রজ হইতে শ্রীমথুরায় গমনপূর্ব্বক তথায় কিছুকাল অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বিরহব্যাকুলা ব্রজগোপীগণ ও শ্রীনন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া নিজ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের নামকরণ ও বিষয়বস্তু নির্ণীত হইয়াছে,—

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ।।
গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়।।

(শ্রীভাঃ ১০।৪৬।২-৩)

শরণাগত জনগণের সন্তাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদা নির্জ্জনে নিজহস্তে অনন্যচিত্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীউদ্ধবের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—“হে সৌম্য, উদ্ধব! তুমি ব্রজে গমন কর এবং পিতামাতার প্রীতিবিধান ও মদীয়বার্ত্তা দ্বারা ব্রজললনাগণের আমার জন্য যে বিরহব্যথা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিমোচন কর।”

এই গ্রন্থের সূচনা-শ্লোকটী এই,—

সান্দ্রীভূতৈর্নববিটপিনাং পুষ্পিতানাং বিতানৈঃ
লক্ষ্মীবত্তাং দধতি মথুরা-পত্তনে দত্তনেত্রঃ।
কৃষ্ণঃ ক্রীড়াভবনবড়ভীমূর্দ্ধ্নি বিদ্যোতমানো
দধ্যৌ সদ্যস্তরলহৃদয়ো গোকুলারণ্য-মৈত্রীম্।।

শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াভবনের সর্ব্বোপরিভাগে আরোহণ করিয়া পুষ্পিত নব-তরুসমূহের বিস্তারের দ্বারা সৌন্দর্য্যশালিনী শ্রীমথুরা-নগরীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবা মাত্র তাঁহার ব্রজস্মৃতির উদয় হইল, তিনি বিহ্বলচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের প্রীতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপসার এই,—শ্রীব্রজসুন্দরীগণের প্রগাঢ় প্রীতির কথা-স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিহ্বলতা, শ্রীউদ্ধবকেই একমাত্র অন্তরঙ্গ বান্ধবগণের মধ্যে প্রধান ও দৌত্যকার্য্যে উপযুক্ত-জ্ঞানে শ্রীব্রজে বিরহবিধুর ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনাপ্রদানার্থ প্রেরণের সঙ্কল্প, অক্রূরের মুখে কংসের অহঙ্কার-পূর্ণ বাক্য-শ্রবণ-হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় আগমনের কারণ-নির্দ্দেশ, শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, শ্রীরাধা ও শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দের কেবল শ্রীকৃষ্ণের মৌখিক যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যেই অতিকষ্টে বিরহবিধুর জীবনভার-বহন, বিরহসর্পদষ্টা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশরূপ মন্ত্র দ্বারা পুনর্জীবিত করিবার জন্য শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ, শ্রীব্রজবনই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম স্থান, শ্রীব্রজবনের স্থাবর-বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত; গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশাভাসের স্মৃতিতেই যেরূপ ব্যথিত হন, আপনাদের সুমেরুতুল্য ক্লেশেও তাদৃশ দুঃখানুভব করেন না; কোন্ পথে কি কি লীলাস্থান দর্শন করিতে করিতে শ্রীব্রজে যাইতে হইবে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধবকে জ্ঞাপন; শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থানের পরিচয়দানকালে শ্রীকৃষ্ণের তত্তৎস্থানে বিভিন্ন লীলা ও তৎস্মরণে প্রেমবিহ্বলতা, শ্রীউদ্ধবের রথ শ্রীনন্দীশ্বর-পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি অনুমান করিবেন ইত্যাদি বিষয় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্ণন, ব্রজের তরুগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন, ধেনুগণকে কুশল-জিজ্ঞাসা, বৃদ্ধা মাতৃস্বরূপা ধেনুমণ্ডলীর পদে প্রণতিজ্ঞাপন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ হইয়া প্রিয়সখাগণকে আলিঙ্গন, শ্রীনন্দ-যশোদাকে প্রণাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়সচিবরূপে গোপাঙ্গনাগণের নিকট শ্রীউদ্ধবকে পরিচয়প্রদানার্থ উপদেশ, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ধন্যা, শ্যামলা, পদ্মা, ললিতা, ভদ্রা, শৈব্যা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণকে সান্ত্বনাপ্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কৃশীভূতা সহচরীবৃন্দ পরিবেষ্টিতা ব্রজাঙ্গনা-শিরোমণি শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তীমালা প্রদান-পূর্ব্বক চৈতন্যসম্পাদন-জন্য উপদেশ।

গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকদ্বয় এইরূপ,—

গোষ্ঠক্রীড়োল্লসিতমনসো নির্ব্ব্যলীকানুরাগাৎ
কুর্ব্বাণস্য প্রথিত-মথুরামণ্ডলে তাণ্ডবানি।
ভূয়ো রূপাশ্রয়পদসরোজন্মনঃ স্বামিনোঽয়ং
তস্যোদ্দামং বহতু হৃদয়ানন্দপূরং প্রবন্ধঃ।।

অকপট অনুরাগহেতু যাঁহার চিত্ত গোষ্ঠবিহারে সমুল্লসিত, প্রসিদ্ধ শ্রীমথুরা-মণ্ডলে যিনি তাণ্ডব-নৃত্যপরায়ণ, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম শ্রীরূপের আশ্রয়, সেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের এই 'শ্রীউদ্ধব-সন্দেশ'-নামক প্রবন্ধ পুনঃ পুনঃ (সর্ব্ব-ভক্তগণের) হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত করুক।

শ্রীদামাদ্যৈঃ শিশুসহচরৈর্বাল্যখেলামকার্ষীদ্
গোপালীভিঃ সহ যুবতিভিঃ রাসকেলিং চকার।
দুষ্টান্ দৈত্যানপি বহুতরান্ হেলয়া যো জঘান
স শ্রীকৃষ্ণস্তরুণকরুণস্তারয়েদ্বো ভবাব্ধিম্।।

যিনি শ্রীদামাদি বালবন্ধুগণের সহিত শৈশবে ক্রীড়া করিতেন, যিনি তরুণী শ্রীগোপাঙ্গনার সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, যিনি বহুসংখ্যক দুষ্টদৈত্যগণকে অবলীলাক্রমে হনন করিয়াছিলেন, সেই করুণাময় কিশোরবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে ভবসাগর হইতে ত্রাণ করুন।

'শ্রীউদ্ধবসন্দেশ' কোন্ সময়ে রচিত, তৎসম্বন্ধে উপসংহারে কোন শ্লোক গ্রথিত নাই। উপক্রম-উপসংহার-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ বা নমস্ক্রিয়া নাই। উপান্ত-শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীরূপ তাঁহার নাম ও 'স্বামী' শব্দদ্বারা নিজপ্রভু শ্রীল সনাতন বা শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলে উপান্তশ্লোকে 'শ্রীরূপ'-নামটি থাকা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থ সপ্তদশাক্ষর মন্দাক্রান্তা-ছন্দে ১৩১টী শ্লোকে রচিত। ইহা Haeberlin-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে' ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহে' (৩য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৮৮ খৃ), ২১৫-২৭৫ পৃঃ) দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (উঃ ৫লঃ।৭) ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে (নায়িকাভেদ প্রঃ ১৮, ২৯; দূতীভেদ ৩৯; সখী প্রঃ ১৪, উদ্দীপন প্রঃ ৪৯, ৫১; ব্যভিচারী ৫, ৪৩, ৪৬, ৫৯; স্থায়িভাব ৫৩; মান ৪৩; প্রবাস ৬১, ৬২; মুখ্যসম্ভোগ ১৩; গৌণসম্ভোগ ১৭) শ্রীউদ্ধবসন্দেশ হইতে দৃষ্টান্তশ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন।

৩। **শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-মহোৎসব-বিধি**— শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীলঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ'

নামে যাহা অভিহিত করিয়াছেন, তাহাই 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-মহোৎসববিধি' বা 'শ্রীকৃষ্ণাভিষেক' নামে দৃষ্ট হয়। শ্রীবৃন্দাবন হইতে আমরা ইহার হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকটও একটি প্রাচীন পুঁথি দর্শন করিয়াছি। গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকটি এই,—

নত্বা বৃন্দাটবীনাথৌ প্রভূণাং বিনিদেশতঃ।
লিখ্যতে শাস্ত্রলোকাভ্যাং কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ।।

ইহাতে শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণের সহিত 'প্রভূণাং' পদের দ্বারা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বিশেষ আজ্ঞানুসারে রচিত বলিয়া গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার বিবিধগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ও 'পদ্যাবলী'তে (২৩৩ নং পদ্যে—'শ্রীমৎপ্রভূণাম্'; কয়েকটী পুঁথি ও টীকাতে 'শ্রীমৎসনাতনগোস্বামিপাদানাম্') শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে 'প্রভুপাদ', 'প্রভু', শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজ' প্রভৃতি শব্দের বহুবচন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের ১৩৩ সংখ্যা হইতে ২৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে; তথাপি শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপপ্রভুকে 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিমহোৎসববিধি' প্রণয়ন করিবার বিশেষ নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন কেন?—কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন। হয় ত' শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের বিস্তৃতবিধি সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু একটি সংক্ষিপ্তবিধি রচনা করিয়াছিলেন, অথবা শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচিত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির মহাভিষেক-প্রকরণটি বিশেষভাবে বর্ণন করিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের প্রকরণে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,—

(১) শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের নিত্যতা, (২) উৎপত্তি, (৩) ভগবৎপ্রীণন, (৪) অকরণে প্রত্যবায়, (ক) ভোজনে প্রত্যবায়, (খ) উপবাসপূর্ব্বক পূজাবিশেষ মহোৎসবাদি ব্রতত্যাগে প্রত্যবায়, (৫) জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্য, (৬) জন্মাষ্টমীব্রত-নির্ণয়, (ক) রোহিণীযুক্তা জন্মাষ্টমী, (খ) অর্দ্ধরাত্রি-জন্মাষ্টমী, (গ) সপ্তমীবিদ্ধ-জন্মাষ্টমীব্রতনিষেধ, (ঘ) তাহার কারণ, (৭) জন্মাষ্টমীপারণফল-নির্ণয়, (৮) জন্মাষ্টমীব্রতবিধি, (৯) বিশেষ বিধি, (১০) অষ্টমীর প্রভাতকালে সঙ্কল্পমন্ত্র,

(১১) সূতিকাগৃহ-নির্ম্মাণবিধি, (১২) পূজার উপক্রম, (১৩) পূজার মন্ত্র, (ক) স্নানমন্ত্র, (খ) বস্ত্রদানমন্ত্র, (গ) ধূপদানমন্ত্র, (ঘ) নৈবেদ্যদানমন্ত্র, (ঙ) চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র, (চ) সঙ্কল্পমন্ত্র, (ছ) দেবকীপূজামন্ত্র, (জ) শ্রীকৃষ্ণপূজামন্ত্র, (ঝ) অর্ঘ্যদানমন্ত্র, (ঞ) চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র, (ট) সঙ্কল্প, (ঠ) শ্রীদেবকীধ্যান, (ড) উক্ত চন্দ্রার্ঘ্য-দানের মন্ত্র, (ঢ) উক্ত কৃষ্ণার্ঘ্যদানের মন্ত্র, (ণ) উক্ত স্নানমন্ত্র, (ত) পাদ্যাদি-দীপাদি প্রদানমন্ত্র, (থ) নৈবেদ্যদানমন্ত্র, (দ) উক্ত দ্রব্যাদি-প্রদানের মন্ত্র, (ধ) প্রণামমন্ত্র, (ন) প্রার্থনামন্ত্র।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-মহোৎসববিধি'তে যে-সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এতৎসহ সুধী পাঠকগণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত বিষয়সমূহ তুলনা করিয়া দেখিলে উভয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হইবে।

(১) শ্রীজন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিবস সপ্তমীর পূর্ব্বাহ্নকালে স্নানবেদীপরিষ্ক্রিয়া; (২) মঙ্গলবাদ্যগীতপূর্ব্বক অঙ্গনে খাতখনন ও কোণচতুষ্টয়ে কদলী-স্তম্ভরোপণ, চন্দ্রাতপ ও পতাকারোপণ, মাঙ্গলিক দ্রব্যস্থাপন; (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীদিন প্রাতে বৈষ্ণববৃন্দের সহিত বাদ্যাদিময় নৃত্যকীর্ত্তন-সহকারে দীপ ও মঙ্গলঘটাদির দ্বারা সুসজ্জিত স্নানবেদীতে ছত্রচামরাদিতে সেবা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন; (৪) স্বস্তিবচন ও প্রার্থনা; (৫) ভূতশুদ্ধি; (৬) ঘটস্থাপন ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র; (৭) মহাভিষেকবিষয়ে সঙ্কল্প ও প্রার্থনা; (৮) আসনাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন; (৯) পাদ্যাদি দীপান্তমন্ত্র; (১০) বিবিধ বিধানে শ্রীবিগ্রহের স্নানক্রিয়া ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র; (১১) বিবিধ বিধানে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক-বিধি ও তদ্বিষয়ক মন্ত্র; (১২) যজ্ঞসূত্র নিবেদন; (১৩) তাম্বুলাদি নিবেদন; (১৪) পুষ্পমাল্য অষ্টোপচারাদি নিবেদন; (১৫) মহানীরাজন; (১৬) আরাত্রিক-মন্ত্র; (১৭) শ্রীকৃষ্ণস্তব। ইহার পরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

ততঃ স্তবীত গোবিন্দং পৌরাণৈর্বৈদিকৈরপি।
সূক্তৈর্ম্মন্ত্রৈরহস্যৈশ্চ স্তবৈঃ স্তোত্রৈশ্চ ভক্তিমান্।।
দিবসং গময়ন্নেবং হরিপ্রিয়জনৈঃ সহ।
ব্রতাদিপূর্ব্বকং কুর্য্যাদ্ ভবিষ্যোত্তর-দৃষ্টিতঃ।।

নিশীথে ভগবজ্জন্মন্যভিষেকাদিমঙ্গলম্।
গীতনৃত্যাদিভিশ্চাত্র বিদধ্যাজ্জাগরোৎসবম্।।
ততঃ প্রভাতে নিষ্পাদ্য ব্রজেন্দ্রোৎসবমুত্তমম্।
ভক্ত্যা মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বৈষ্ণবৈঃ।।

অনন্তর বৈদিক ও পৌরাণিক সূক্ত, মন্ত্র, রহস্য, স্তব ও স্তোত্রসমূহের দ্বারা ভক্তিমান্ ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিবেন। এইভাবে শ্রীহরিপ্রিয়জনগণের সহিত দিবা যাপন করিবেন এবং ভবিষ্যোত্তর-পুরাণের বিধি-অনুসারে ব্রতাদির আচরণ করিবেন। নিশীথে শ্রীভগবানের জন্মোৎসবে মঙ্গল অভিষেকাদি ও জাগরণোৎসব, গীত-নৃত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। অনন্তর প্রভাতে উত্তম নন্দোৎসব সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত ভক্তি সহকারে মহাপ্রসাদের সম্মান করিবেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু জন্মাষ্টমী ব্রতের অন্যান্য বিধি ভবিষ্যোত্তর-পুরাণ দেখিয়া পালনের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎকৃত মহোৎসববিধিতে অভিষেকের বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও শ্রীভবিষ্যোত্তরের বাক্য (১৫শ বিঃ, ১৩৩ সংখ্যা) অবলম্বন করিয়াই জন্মাষ্টমীব্রতোৎপত্তি-প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভবিষ্যোত্তরে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতের উৎপত্তি, উহা পালনের বিধি ও তৎফল শ্রবণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত-বিধি-প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণজন্মমহোৎসব-বিধিতে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অপেক্ষা অধিক বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণাভিষেকের প্রকরণটি প্রয়োগ-মন্ত্রাদির সহিত বর্ণিত হওয়ায় এই গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণাভিষেক'-নামে অধিকতর পরিচিত।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু এই গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকে এ-জন্যই লিখিয়াছেন,—

ইত্যাদি দৃষ্ট্বা দশমাদ্ব্রজভাবেন সেবিনা।
এষ জন্মতিথিস্নানবিধিঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতঃ।।
য এবং বিধিনা কুর্য্যাত্তস্য সুষ্ঠুফলং শৃণু।
গোবিন্দস্য প্রিয়ো ভূত্বা গাঢ়প্রেমভরান্বিতঃ।।
বৃন্দাবনে সদা তস্য সাক্ষাৎসেবাং সমাচরেৎ।।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে লিখিত বিধি দর্শন করিয়া ব্রজভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মতিথিস্নানবিধি কীর্ত্তিত হইল। যিনি এই বিধিদ্বারা জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে পালন করিবেন, তাঁহার (এই বিধিপালনের) ফল শ্রবণ কর। তিনি শ্রীগোবিন্দের প্রিয় ও গাঢ়-প্রেমপূর্ণ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবার অনুশীলন করিতে পারিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্ত পুঁথির পুষ্পিকা এইরূপ,—

"ইতি কৃষ্ণজন্মতিথিমহোৎসববিধিঃ সম্পূর্ণতামগমৎ। শ্রীরূপগোস্বামিনা কৃতঃ।"

৪-৫। শ্রীশ্রীগণোদ্দেশদীপিকা (বৃহৎ ও লঘু)— ইহা 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা'-নামেও উক্ত হইয়া থাকে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।"

অর্থাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবনই আরাধ্যবস্তু। শ্রীব্রজবধূগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রণালী প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেবাপ্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই বিচারে রাগমার্গের ভজনকারিগণ রাগাত্মিকা শ্রীকৃষ্ণপরিবারবর্গের অনুগ হইয়া তাঁহাদের সেবাপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। সেই সেবাপ্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারগণের যাবতীয় পরিচয় জানা একান্ত আবশ্যক। আমরা স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যজন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরিবারগণের সহিতই আমাদের নিত্যসম্বন্ধ। তাঁহাদের পরিচয় না জানিলে আমাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে পারে না। তবে ইহা সেবোন্মুখকর্ণে অপ্রাকৃত শ্রীগুরুমুখে সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও অনুভব করিতে হয়।

পূর্ব্বে সাধুগণ অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের নামাদি সূত্ররূপে কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা লোকপরম্পরায় ও শাস্ত্রেই আবদ্ধ ছিল। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রীমথুরাপ্রদেশের লোকপ্রবাদ, বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ, আগম ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত সাধুগণের নিকট শ্রুতবাক্য হইতে সুহৃদ্বর্গের সন্তোষবিধান ও রাগের পথকে ক্রমবদ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থে প্রণালীক্রমে গুম্ফিত করিয়াছেন। ইহাতে বিশেষতঃ আদিপুরাণ (বৃঃ ৩০), গরুড়পুরাণ (বৃঃ ২৬), সম্মোহনতন্ত্র (বৃঃ ২৪৭) প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণের উল্লেখ আছে।

এতদ্বিষয়ে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু গ্রন্থারম্ভে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যে সূত্রিতাঃ সতা রত্যা প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রলোকয়োঃ।
ব্যাক্রিয়ন্তে পরিবারাস্তে বৃন্দাবননাথয়োঃ।।
মথুরামণ্ডলে লোকে গ্রন্থেষু বিবিধেষু চ।
পুরাণে চাগমাদৌ চ তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।।
তে সমাসাদ্বিলিখ্যন্তে স্বসুহৃৎপরিতুষ্টয়ে।
আনুপূর্ব্বীবিধানেন রতিগ্রথিতবর্ত্মনঃ।।

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা—৩-৫)

শ্রীব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। সেই পরিবার ও তাঁহাদের শাখাপ্রশাখার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও সেবা-সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

[বৃঃ ১৩]
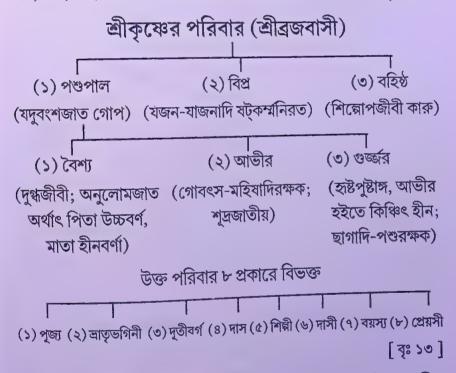
এই গ্রন্থে পরিবারবর্গের পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় ও যূথের পরিচয় ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তাঁহাদের পরিজনগণের বসন, ভূষণ, ছত্র, শয্যা, চন্দ্রাতপ, কুঞ্জ, গৃহ, যান, বাহন, অষ্টসখীর চরিত, সন্ধি প্রভৃতি ছয় অঙ্গ, চতুঃষষ্টি বিদ্যা,

সখীদিগের বিভিন্ন ভাব, দ্বিতীয় মণ্ডল, তাঁহাদের সমাজ প্রভৃতি বহু বিষয়ের পরিচয় ও বিবরণ এবং সম্মোহনতন্ত্রের মতানুসারে শ্রীরাধার আরও দুইপ্রকার অষ্টসখীর নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও তাঁহাদের পরিকরগণের নাম, পরিচয় ও লীলাদি বর্ণন করিয়া শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'র বৃহদ্ভাগের উপসংহারে এইরূপ বলিতেছেন,—

ইত্যেতৎ পরিবারাণাং শ্রীবৃন্দাবননাথয়োঃ।
অসংখ্যানাং গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতম্।।
তল্পান্নপানতাম্বূল-হিল্লোলস্থাসকাদয়ঃ।
অন্যেঽপি যে বিশেষাঃ স্যুঃ স্বয়মূহ্যাস্ত তে বুধৈঃ।।
লুপ্তমাসীৎ কৃপয়া জ্যোতির্ঘটয়েব ভানুমত্যসৌ।
রূপবিষয়াপি দৃষ্টিঃ সরসান্ শব্দানবৈক্ষিষ্ট।।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ২৫০-২৫২)

শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরিকর অসংখ্য। কতিপয় সংখ্যার গণনা করিবার জন্য এই গ্রন্থে দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল। শয্যা, অন্ন, পান, তাম্বুল, হিল্লোল (দোল ও ঝুলন) প্রভৃতি, তিলকরচনাদি ও অন্যান্য আরও যে যে বিশেষ লীলা আছে, সেই সেই লীলার পরিকরগণের নাম ভজনকারী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন শাস্ত্র ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অবগত হইবেন। [শ্রীকৃষ্ণগণের] নাম-রূপাদি-বিষয়ক দৃষ্টি (অর্থাৎ জ্ঞান) একান্ত বিলুপ্ত ছিল। [কিন্তু] শ্রীরূপের দৃষ্টি আলোকরাশির ন্যায় শ্রীভগবৎকৃপাদ্বারা আলোকিত হইয়া সরস শব্দ বা নামসকল দর্শন করিল।

শ্রীবৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকার মঙ্গলাচরণে এই দুইটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দসমন্বিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতম্।।
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকাচরণদ্বয়ম্।
গোপীজনসমাযুক্তং বৃন্দাবনমনোহরম্।।

ভক্তসমূহ-সহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগল ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। শ্রীব্রজবাসিগণের মনোহরণকারী শ্রীগোপীজন-পরিবেষ্টিত শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীরাধিকার শ্রীচরণদ্বয়কে বন্দনা করি।

শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার উপসংহারে গ্রন্থের রচনার কাল-নির্ণয়-সূচক একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

শাকে দৃগশ্বশক্রে নভসি নভোমণিদিনে যষ্ঠ্যাম্।

ব্রজপতিসদ্মনি রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাদীপি।।

১৪৭২ শকাব্দে (= ১৪৭২ + ৭৮ = ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে), শ্রাবণ মাসে, রবিবারে, ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীব্রজপতি শ্রীনন্দ মহারাজের গৃহে 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার লঘুভাগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য ও বয়ঃক্রমাদি, শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যবৃন্দ, সুহৃদ্গণ, সখাগণ, প্রিয়সখাবৃন্দ, প্রিয়নর্ম্মসখাগণ, শ্রীবলদেব, বিটগণ, চেটগণ (তাম্বুলিক, জলসেবক, বস্ত্রসেবকাদি), চেটীগণ (কুরঙ্গী ভৃঙ্গারী, সুলম্বা ও অলম্বিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা ও পূর্ব্বোক্ত চেটগণের পত্নীগণ), চরগণ, দূতগণ, দূতীগণ, শ্রীপৌর্ণমাসী ও শ্রীবৃন্দার বিবরণ, শ্রীনান্দীমুখী ও সাধারণ ভৃত্যগণ, ধেনুগণ, বলীবর্দ্দ, মৃগ, বানর, কুকুর, রাজহংস, ময়ূর, শুকপক্ষী প্রভৃতি পশুপক্ষিগণ; স্থান-বিবরণ,—ঘাট, পর্ব্বত, সরোবর, বৃক্ষ ও তীর্থাদির নাম ও পরিচয় ; শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের নাম, ভূষণসমূহের নাম, প্রেয়সীগণের নাম ও তাঁহাদের যূথ, শ্রীরাধিকার শ্রীকরচরণচিহ্ন, রূপ-লাবণ্য, শ্রীরাধার পূজনীয় আত্মীয়বর্গ ও সখীগণ, প্রিয়সখী, প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণ, শ্রীরাধার মঞ্জরীগণ, শ্রীরাধার উপাস্যদেবতা, সখীদিগের বিশেষ বিবরণ, শ্রীরাধার উপাস্যদেবতা, কিঙ্করীগণ, শ্রীরাধার ধেনুগণ, তাঁহার বৎসতরী (বক্না), বৃদ্ধা বানরী, হরিণী, চকোরী, হংসী, ময়ূরী, শারিকা, শ্রীরাধার ভূষণসমূহ, বসন, পুষ্পবাটিকা, কুণ্ড, রাগ, নৃত্য ও জন্মতিথিনির্দ্দেশ। গ্রন্থের উপসংহারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

ইত্যেতৎ পরিবারাণাং শ্রীবৃন্দাবননাথয়োঃ।

অসংখ্যানাং গণয়িতুং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতম্।।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা—২৫০)

শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অসংখ্য পরিকরগণের সংখ্যা-গণনা-বিষয়ে এই গ্রন্থে কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল।

কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে বৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকার শেষ শ্লোকদ্বয় লঘুগণোদ্দেশদীপিকাতেও দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৭২ শকে (=১৫৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে) রচিত হইয়াছে বলিয়া উপান্ত-শ্লোকে দৃষ্ট হয়। যদি 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' ১৪৭২ শকাব্দে (=১৫৫০ খৃষ্টাব্দে) রচিত হইয়া থাকে, তবে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর ১৫০৪ শকে (=১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীলঘুতোষণী টীকায় বৃহৎ ও লঘু-গণোদ্দেশ-দীপিকার নাম উদ্ধৃত হয় নাই কেন?—এই তর্ক উঠাইয়া কেহ কেহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাকে কোন পরবর্ত্তী লেখকের রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

আবার কেহ কেহ শ্রীবৃহৎগণোদ্দেশদীপিকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম উক্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরূপ আর কোথায়ও,—এমনকি, তাঁহার 'স্তবমালা'র অর্ন্তগত তিনটি 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে'র মধ্যেও স্পষ্টভাবে শ্রীনিত্যানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই,—এই ছল উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকাকে অন্য কোন লেখকের রচিত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে।

এ সম্বন্ধে শ্রৌতপ্রণালীতে নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে বলা যাইতে পারে যে, এই দুইটি যুক্তির কোনটিই বিচারসহ হইতে পারে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপের যে গ্রন্থতালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীজীবের 'লঘুতোষণী'র তালিকাধৃত 'শ্রীহংসদূত' ও 'শ্রীউদ্ধবসন্দেশ'-নামক দুইটি গ্রন্থের নাম, বা সেই দুই গ্রন্থ হইতে কোন প্রমাণ শ্লোক নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপকৃত এই দুইটি গ্রন্থের নাম জানিতেন না, এরূপ হইতে পারে না। কারণ, তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি,—যাহাতে পূর্ব্বোক্ত দুই গ্রন্থের নাম একাধিকবার উল্লিখিত, তাহা হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। যদি বলা যায়, ঐ দুইটি গ্রন্থ শ্রীরূপের শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু উল্লেখ করেন নাই, তবে তাহাও সমীচীন নহে। কারণ, ঐ দুই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির সিদ্ধান্তের অনুরূপ। তাহা না হইলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুই বা কেন ঐ গ্রন্থদ্বয়ের নামোল্লেখ করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীউদ্ধব-

সন্দেশের উপসংহারে (১৩০ শ্লোকে) 'শ্রীরূপাশ্রয়পদ'-শব্দে শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর নাম উল্লিখিত হওয়ায় তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলনের পরেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক পরবর্ত্তী গ্রন্থকারই যে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের সকল গ্রন্থের নাম করিবেন, এরূপ কোন তাম্রশাসন নাই। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপকৃত যে গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের নাম করেন নাই, তাহা অন্য কোন পরবর্ত্তী লেখক উল্লেখ করিতে পারেন।

শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকসমূহে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম নাই, —এই কুতর্কের মূল্যও খুব কম। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামীপ্রভু-কৃত 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর নাম নাই, কিন্তু তাঁহারই রচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর নাম ও তাঁহাদের ব্রজ-পরিকরত্ব-সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথের গ্রন্থাবলীর মঙ্গলাচরণেও স্পষ্টভাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম দৃষ্ট হয় না। শ্রীরূপের শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন নমস্ক্রিয়া নাই, অথচ ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে রচিত 'শ্রীবিদগ্ধমাধব', 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীললিতমাধব' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ বন্দনা আছে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বর্ণিত বিষয় শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশক্তি সঞ্চারেই প্রয়াগে সূত্ররূপে পাইয়াছিলেন এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'র উপক্রমের ২য় শ্লোকে শ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে অত্যন্ত গূঢ় মধুর রসের কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই উজ্জ্বল-নীলমণিতে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইতেছে। ইহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু উক্ত শ্লোকের 'লোচনরোচনী'-টীকাতেও বলিয়াছেন। এইসকল ক্ষেত্রে আধ্যক্ষিক মনীষা প্রবেশ করিতে অসমর্থ। অতএব ঐরূপ কোন ছল উঠাইয়া শ্রীরূপের 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নামোল্লেখ আছে বলিয়া তাহা শ্রীরূপের কৃত নহে বলা আধ্যক্ষিক আত্মহত্যা মাত্র।

কেহ কেহ—'২৪৬ সংখ্যক শ্লোকের পর শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীরাধিকার সখীদের নাম সম্মোহন-তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরূপ অপর কোন গ্রন্থে কোন তন্ত্রের মত উল্লেখ করেন নাই' (?), এইরূপ একটি ছল উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাকে অন্য কোনও ব্যক্তির রচিত বলিয়া স্থাপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীলঘুভাগবতামৃতে'র

কৃষ্ণামৃতের পূর্ব্বখণ্ডের ২৮৪ সংখ্যায় সন্মোহন-তন্ত্র, ২৫, ১৮৩,১৯৭ সংখ্যায় সাত্বত-তন্ত্র, ২১৭ সংখ্যায় ভার্গবতন্ত্র, ২৮৪, ২৮৭ সংখ্যায় তন্ত্র, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর ২।১।১২৯ সংখ্যায় বৈষ্ণব-তন্ত্র ও ১।১।২০, ১।১।২৩, ১।২।৬৮, ১।২।১৪৩, ১।৩।২ সংখ্যায় 'তন্ত্র' এবং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণির শ্রীরাধাপ্রকরণের ৪র্থ সংখ্যায় 'তন্ত্র' হইতে নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রমাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন।

৬। **স্তবমালা**— শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তৎকৃত লঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীরূপের গ্রন্থাবলীর পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে 'স্তবমালা'-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

* * ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা।।
স্তবস্যোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।।

ছন্দোঽষ্টাদশক, উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর (প্রভৃতি) শ্রীকৃষ্ণস্তবের অন্তর্গত বহু সুবিখ্যাত স্তব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৩৯)— "আর বহু স্তবাবলী" বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীজীবপ্রভুদ্বারা সংগৃহীত ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'স্তবমালা'। গ্রন্থ-প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু নিজাভীষ্টদেব শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবসমূহকে মালিকার আকারে গ্রথিত করিবার কথা জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত।।
পূর্ব্বং চৈতন্যদেবস্য কৃষ্ণদেবস্য তৎপরম্।
শ্রীরাধায়াস্ততঃ কৃষ্ণরাধয়োর্লিখ্যতে স্তবঃ।।
বিরুদাবলী ততো নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতি।
ততশ্চিত্রকবিত্বানি ততো গীতাবলী, ততঃ।।
ললিতা-যমুনা-বৃষ্ণিপুরী-শ্রীহরিভূভৃতাম্।
বৃন্দাটবী-কৃষ্ণনাম্নোঃ ক্রমেণ স্তবপদ্ধতিঃ।।

'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-কর্ত্তা, আমার শ্রীরূপ গোস্বামিকর্ত্তৃক রচিত স্তবমালা, ক্ষুদ্র জীব-কর্ত্তৃক(শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু) সংগৃহীত হইল। প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণদেবের, তৎপরে শ্রীরাধিকার, তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের স্তব, তৎপরে বিরুদাবলী ও নানাবিধচ্ছন্দে নন্দোৎসব হইতে কংসবধ পর্য্যন্ত লীলা-সমূহ, তৎপরে চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, তৎপরে গীতাবলী, তৎপরে ক্রমে ক্রমে শ্রীললিতা, শ্রীযমুনা, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণনামের স্তবপদ্ধতি লিখিত হইতেছে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'স্তবমালা'-গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত নিম্ন-লিখিত স্তবসমূহ গুম্ফিত করিয়াছেন,—

(১-৩) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টক [শ্লোক-সংখ্যা—প্রত্যেকটিতে ৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—যথাক্রমে শিখরিণী, শিখরিণী ও পৃথ্বী]; **(৪) (শ্রীকৃষ্ণের) মহানন্দাখ্য স্তোত্র** [স্তবমালার নির্ণয়সাগর সংস্করণে (ইং ১৯০৩) 'আনন্দাখ্য স্তোত্র'। শ্লোক-সংখ্যা—৭, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; **(৫) (শ্রীকৃষ্ণের) লীলামৃতনামদশক** [শ্লোকসংখ্যা—৬, ছন্দ—অনুষ্টুভ্]; **(৬) প্রেমেন্দুসাগরাখ্য শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টোত্তরশত** [শ্লোক-সংখ্যা—৪৫, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; **(৭) শ্রীকেশবাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি)= ৯, ছন্দঃ—পৃথ্বী]; **(৮-৯) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—প্রত্যেকটিতে ৮+১ (ফলশ্রুতি)= ৯, ছন্দঃ যথাক্রমে—স্বাগতা ও মালিনী]; **(১০) শ্রীমুকুন্দাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি)=৯, ছন্দঃ—মালিনী]; **(১১) শ্রীব্রজনব-যুবরাজাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি)=৯, ছন্দঃ—মালিনী]; **(১২) প্রণাম-প্রণয়াখ্য স্তব** [শ্লোক-সংখ্যা—১৪, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; **(১৩) শ্রীহরি-কুসুমস্তবক** [শ্লোক-সংখ্যা—১১, ছন্দঃ—কুসুমস্তবকদণ্ডক (১-১০) ও আর্য্যা (১১)]; **(১৪) গাথাছন্দঃস্তব** (নির্ণয়সাগর সংস্করণ) [শ্লোক-সংখ্যা—১, ছন্দঃ—পঞ্চপাদাত্মক-তোটক-নির্ম্মিত গাথা]; **(১৫) ত্রিভঙ্গীপঞ্চক** [নির্ণয়সাগর সংস্করণে—ত্রিভঙ্গীচ্ছন্দঃস্তব। শ্লোক-সংখ্যা—৫, ছন্দঃ—ত্রিভঙ্গী-মাত্রাবৃত্ত]; **(১৬-১৭) শরণাগতিমূলক ও আশাবন্ধসূচক শ্লোকদ্বয় (নামবিহীন)** [ছন্দঃ যথাক্রমে—মালিনী ও মন্দাক্রান্তা]; **(১৮) শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী** [শ্লোক-সংখ্যা—৩০, ছন্দঃ—মালিনী (১,২,২৯,৩০), চিত্র (৩, ৪), জলধরমালা (৫, ৬), রঙ্গিণী (৭,৮), তূণক (৯,১০), পজ্ঝটিকা (১১-১৪, ২৫-২৮), ভুজঙ্গপ্রয়াত

(১৫-১৬), স্রগ্বিণী (১৭-১৮), জলোদ্ধতগতি (১৯-২০), শালিনী (২১-২২) ও ত্বরিতগতি (২৩-২৪)]; (১৯) শ্রীশ্রী রাধাদামোদরধ্যানাত্মক একটি শ্লোক (নামবিহীন) [ছন্দঃ—শার্দূলবিক্রীড়িত]; (২০) আনন্দচন্দ্রিকাখ্য শ্রীরাধাদশনাম-স্তোত্র [শ্লোক-সংখ্যা—২+২ (ফলশ্রুতি) = ৪, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (২১) শ্রীপ্রেমেন্দুসুধাসত্রাখ্য শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীনামাষ্টোত্তরশত-স্তোত্র [শ্লোক-সংখ্যা—৪২, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (২২) শ্রীরাধাষ্টক [শ্লোক-সংখ্যা—৮ + ১ (ফলশ্রুতি)= ৯, ছন্দঃ—মালিনী]; (২৩) প্রার্থনাপদ্ধতি [শ্লোক-সংখ্যা—৭, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (২৪) চাটুপুষ্পাঞ্জলি [শ্লোক-সংখ্যা—২৪, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (২৫) শ্রীগান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টক [শ্লোক-সংখ্যা— ৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—বসন্ততিলক]; (২৬) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামযুগাষ্টক [শ্লোক-সংখ্যা—৩, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (২৭) শ্রীব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টক [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১(ফলশ্রুতি) = ৯, ছন্দঃ—পৃথ্বী (১-৯)]; (২৮) উক্ত অষ্টকার্থের অনুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-ধ্যানাত্মক একটি শ্লোক [নির্ণয়সাগর সংস্করণে 'শ্রীব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টকে'র অন্তর্গত ও বহরমপুর সংস্করণে উক্ত অষ্টকের বহির্ভূত। ছন্দঃ—মন্দাক্রান্তা]; (২৯) কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্র [শ্লোক-সংখ্যা—৪৫, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্]; (৩০) উৎকলিকাবল্লরী[শ্লোক-সংখ্যা—৭০, ছন্দঃ—উপজাতি (১), শিখরিণী (২, ৩, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬৪), মালিনী (৪, ৩০, ৩৬-৩৮, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৩, ৬০), সুন্দরী (৫, ৬), বসন্ততিলক (১৩, ১৪, ২৮, ৩৪), দ্রুতবিলম্বিত (২৪), হরিণী (২৫, ৫৯), শার্দূলবিক্রীড়িত (২৭, ৪৩, ৪৪, ৬৬, ৬৭), পৃথ্বী (৩৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৬২, ৬৩, ৬৫), মন্দাক্রান্তা (৪০, ৪১, ৪২, ৪৯, ৬১), রথোদ্ধতা (৭), (৩১-৩২) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলা-বর্ণনাত্মক শ্লোকদ্বয় [ছন্দঃ—শার্দূলবিক্রীড়িত (১), স্রগ্ধরা (২)]; (৩৩) শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী [২৮টি বড় বিরুদ+২৯টি ছোট বিরুদ + ৬৭টি পদ্য = ১২৪; অনুষ্টুভ্ (১, ৬৫, ৬৬, ৬৭), আর্য্যা (৮, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৮, ৫৯, ৬১), উপজাতি (৩৫, ৩৯, ৪২, ৫১), দ্রুতবিলম্বিত (১৪), পৃথ্বী (৫, ১৩, ১৯, ৩৬, ৫৬), প্রহর্ষিণী (১১, ৪৭, ৫৫), মালভারিণী (৭), মালিনী (৩, ৬, ৯, ১০, ২৮, ৪৫, ৫৭), রথোদ্ধতা (২৪), শার্দূলবিক্রীড়িত (১২, ২২, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৭, ৫২, ৫৩, ৬০), সুন্দরী বা বিয়োগিনী (১৬, ২৩, ২৭, ৪৬, ৬২), স্রগ্ধরা (২, ৫৪); বিরুদচ্ছন্দঃ—

নানাবিধ]; (৩৪) অষ্টাদশচ্ছন্দঃ বা ছন্দোহষ্টাদশক [মঙ্গলাচরণ-শ্লোক—৪টি। (ক) নন্দোৎসবাদিচরিত ('গুচ্ছক' নামক ছন্দঃ); (খ) শকটতৃণাবর্ত্তভঙ্গাদি (বহরমপুর সংস্করণে 'শকটারিষ্টদৈত্যবধ', 'তৃণাবর্ত্তবধ', 'নামকরণসংস্কার', 'মৃদ্‌ভক্ষণলীলা' ও 'দধিহরণ' এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। 'কোরক' বা 'অখিল' নামক ছন্দঃ); (গ) যমলার্জ্জুনভঞ্জন ('অনুকূল' বা 'আভীর' নামক ছন্দঃ); (ঘ) বৃন্দাবন-গো-বৎস-চারণাদি-লীলা (নির্ণয়সাগর সংস্করণে—'বৃন্দাবনে বৎস-চারণাদি'। 'প্রফুল্লকুসুমালী' ছন্দঃ); (ঙ) বৎসহরণাদিচরিত (নির্ণয়সাগর সংস্করণে 'বৎসচারণাদিচরিত'। ছন্দঃ—অশোকপুষ্পমঞ্জরী-দণ্ডক); (চ) তালবনচরিত ('কলগীত' বা 'মধুভার'-নামক ছন্দঃ); (ছ) কালিয়দমন (ছন্দঃ—অনঙ্গশেখর-দণ্ডক); (জ) ভাণ্ডীরক্রীড়নাদি (দ্বিপদিকা-চ্ছন্দঃ); (ঝ) বর্ষাশরদ্বিহারচরিত (হারিহরিণচ্ছন্দঃ); (ঞ) বস্ত্রহরণ (ইন্দিরাচ্ছন্দ); (ট) যজ্ঞপত্নীপ্রসাদ (ছন্দঃ—মত্তমাতঙ্গলীলাকর-দণ্ডক); (ঠ) শ্রীনন্দাপহরণ (সংফুল্লচ্ছন্দঃ); (ঢ) রাসক্রীড়া (ললিতভৃঙ্গচ্ছন্দ); (ণ) সুদর্শনাদিমোচন (বহরমপুর সংস্করণে 'শঙ্খচূড়বধ' নামে আর একটি ভাগে বিভক্ত। কান্তি-ডম্বরচ্ছন্দঃ); (ত) শ্রীগোপিকাগীত ('মুখদেব' বা 'করহাম্বী' ছন্দঃ); (থ) অরিষ্টবধাদি (গুচ্ছকভেদচ্ছন্দঃ); (দ) রঙ্গস্থলক্রীড়া (ভৃঙ্গার বা সারঙ্গচ্ছন্দঃ)। ছন্দোহষ্টাদশকের অন্যান্য ছন্দঃ ও নির্ণয়সাগর-সংস্করণের পদ্য-সংখ্যা ঃ—আর্য্যা (১, ২, ৫, ৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ৩২, ৩৪, ৪০) মালিনী (৩, ৩৭, ৪৩), শার্দূলবিক্রীড়িত (৪, ১৫, ২২, ২৭, ৩১), পৃথ্বী (৭, ৯, ২১, ২৬, ৩০, ৪৪), রথোদ্ধতা (৮, ১৬, ৩৩), শিখরিণী (১০, ১১, ৪১), মন্দাক্রান্তা (১২, ১৭, ২৫) উপজাতি (১৪), মালভারিণী (২৪, ৩৬, ৩৯), বসন্ততিলক (২৮), শালিনী (২৯, ৩৮), স্রগ্ধরা (৩৫, ৪২)। মোট—১৮টি ছন্দে রচিত ১৮টি স্তব + ৪৪টি পদ্য]; (৩৫) শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণ (টীকার পুষ্পিকা) [বহরমপুর-সংস্করণে 'বিশেষতঃ কাশ্চিৎ' ও নির্ণয়সাগর-সংস্করণে 'লীলান্তরবর্ণনম্'। শ্লোকসংখ্যা—২৮; ছন্দঃ—পৃথ্বী (১), ভুজঙ্গপ্রয়াত (২-২৭), স্রগ্ধরা (২৮)]; (৩৬) পুনর্বস্ত্রহরণ (নির্ণয়সাগর-সংস্করণ) [শ্লোক-সংখ্যা—৩; ছন্দঃ—আর্য্যা (১), কুসুমস্তবকদণ্ডক, শার্দূলবিক্রীড়িত (২)]; (৩৭) শ্রীরাসক্রীড়া [নির্ণয়সাগর-সংস্করণে 'পুনা রাসক্রীড়াবর্ণনম্'। শ্লোকসংখ্যা—১৭; ছন্দঃ—পুজ্ঝটিকা]; (৩৮) স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা [স্তব-শেষে বহরমপুর সংস্করণে 'ইতি বিলাসমঞ্জরী'।

শ্লোকসংখ্যা—৩০; ছন্দঃ—দোধক (১, ২, ৫, ৬), মত্তা (৩, ৪), স্রগ্বিণী (৭, ৮, ১১, ১২), ভ্রমরবিলসিত (৯, ১০), জলোদ্ধতগতি (১৩, ১৪), ভুজঙ্গপ্রয়াত (১৫, ১৬), তোটক (১৭, ১৮) আর্য্যা (১৯, ২০), পুষ্মটিকা (২১, ২২), স্বাগতা (২৩, ২৪) রথোদ্ধতা (২৫, ২৬) লোলা (২৭, ২৮), মালিনী (২৯, ৩০)]; **(৩৯) খণ্ডিতা** (বহরমপুর সংস্করণ) [নির্ণয়সাগর-সংস্করণে ভুলক্রমে 'ললিতোক্ত-তোটকাষ্টকে'র অন্তর্গত। শ্লোক-সংখ্যা—১২, ছন্দঃ—ভুজঙ্গপ্রয়াত (১-১২)]; **(৪০) শ্রীললিতোক্ত-তোটকাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮; ছন্দঃ—তোটক]; **(৪১) চিত্রকবিত্বানি** [শ্লোক-সংখ্যা—১২; চিত্রকবিত্ব—দ্ব্যক্ষরচিত্র (১, ২, ৩), একাক্ষরচিত্র (৪), চক্রবন্ধ (৫), সর্পবন্ধ (৬), পদ্মবন্ধ (৭), প্রতিলোম্যানুলোম্যসম (৮), গোমূত্রিকাবন্ধ (৯), মুরজবন্ধ (১০), সর্ব্বতোভদ্র (১১), বৃহৎপদ্মবন্ধ (১২); ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্ (১-৪, ৭-১১), শার্দূল-বিক্রীড়িত (৫), স্রগ্ধরা (৬, ১১)]; **(৪২) শ্রীগীতাবলী** [মোট ৪২টি গীত + ১০টি অনুষ্টুভ্ বা শ্লোক। গীতাবলীর সমস্ত গীতগুলিই গাথাচ্ছন্দে রচিত। বিষয়—নন্দোৎসবাদি (গীত সংখ্যা—১, ২), বসন্ত-পঞ্চমী (৩), দোলোৎসব (৪-১৬), রাস (১৭-৪২), রাসের অন্তর্গতরূপে—অষ্টনায়িকালক্ষণ ও তদুদাহরণ। নির্ণয়সাগর সংস্করণে ভুলক্রমে 'গীতাবলী'র অন্তর্গত 'রাস' 'পুনা রাসলীলাবর্ণনম্' নামে পৃথক্ করা হইয়ছে।] **(৪৩) শ্রীললিতাষ্টক** [নির্ণয়সাগর সংস্করণে 'শ্রীললিতা-প্রণামস্তোত্র'। শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯; ছন্দঃ—বসন্ততিলক (১-৯)] **(৪৪) শ্রীযমুনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা— ৮ + ১ (ফলশ্রুতি) = ৯; ছন্দঃ—তৃণক (১-৯)]; **(৪৫) শ্রীমথুরাষ্টকস্তব** [শ্লোক-সংখ্যা—৪; ছন্দঃ—স্রগ্ধরা (১, ২), শার্দূলবিক্রীড়িত (৩, ৪)]; **(৪৬) প্রথম শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯; ছন্দঃ—মত্তময়ূর (১-৯)]; **(৪৭) দ্বিতীয় শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি) = ৯; ছন্দঃ—মন্দাক্রান্তা (১-৯)]; **(৪৮) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮+১ (ফলশ্রুতি)= ৯; ছন্দঃ—পৃথ্বী (১-৯)]; **(৪৯) শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক** [শ্লোক-সংখ্যা—৮; ছন্দঃ—মালভারিণী (১), প্রমিতাক্ষরা (২), শিখরিণী (৩), উপজাতি (৪), মালিনী (৫), শার্দূলবিক্রীড়িত (৬), রথোদ্ধতা (৭) আর্য্যা (৮)]।

স্তবমালার অন্তর্গত **'উৎকলিকাবল্লরী'**-স্তবের শেষে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ইহার রচনার তারিখ দিয়াছেন,—

চন্দ্রাশ্বভুবনে শাকে পৌষে গোকুলবাসিনা।
ইয়মুৎকলিকাপূর্ব্বা বল্লরী নির্ম্মিতা ময়া।।

১৪৭১ শকাব্দের পৌষ-মাসে (= ১৪৭১ + ৭৮ = ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে) গোকুলে অবস্থান করিয়া আমি এই 'উৎকলিকাবল্লরী' রচনা করিলাম।

'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী'র রচনা-সম্পর্কে শ্রীল বলদেব বিদ্যভূষণপ্রভুর উক্তি ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীল রূপপ্রভু-কৃত 'সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণে' শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী হইতে বহু বিরুদ উদাহরণ-স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ছন্দোঽষ্টাদশক বা অষ্টাদশলীলাচ্ছন্দঃ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীলঘু-তোষণীর উপসংহারে 'ছন্দোঽষ্টাদশকে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৩৯) শ্রীরূপের গ্রন্থ-তালিকা প্রদান-কালে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ-লীলাচ্ছন্দ, আর পদ্যাবলী।।

'স্তবমালা'-গ্রন্থের শ্রীনন্দোৎসবাদিচরিত' নামক শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনাত্মক স্তবের দ্বিতীয় শ্লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দোৎসবাদয়স্তাঃ কংসবধান্তা হরের্মহালীলাঃ।
ছন্দোভির্ললিতাঙ্গৈরষ্টাদশভির্নিরূপ্যন্তে।।

শ্রীনন্দোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত শ্রীহরির মহালীলাসমূহ সুললিত অষ্টাদশচ্ছন্দে নিরূপিত হইতেছে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ' বলিতে সম্ভবতঃ 'শ্রীনন্দোৎসবাদিচরিত' হইতে 'রঙ্গস্থলক্রীড়া' বা 'কংসবধ' পর্য্যন্ত ১৮টি স্তবকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু-কৃত অন্যান্য স্তবের সহিত 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ'-নামে পরিচিত ১৮টি স্তবও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'স্তবমালা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীল বলদবে বিদ্যাভূষণপ্রভু 'রঙ্গস্থলক্রীড়া'-স্তবের টীকার শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যদ্বিদ্যাভূষণোঽয়ং হরিচরিতভৃতাং ভাষ্যমষ্টাদশানাং
দিব্যদ্ব্যঙ্গ্যং ব্যতানীৎ ফণিপতিগুণিনাং ছন্দসাং সপ্রমাণম্।
তেনাস্মিন্ কৃষ্ণদেবঃ স্বকৃতরুচিধরো রূপদেবশ্চ ভূয়াৎ
সদ্বর্গশ্চাপি তীব্রশ্রমগুণনপটুস্তুষ্টিমানেব সদ্যঃ ।।

যেহেতু এই বিদ্যাভূষণ শ্রীহরিলীলাপূর্ণ, অনন্তগুণবিশিষ্ট অষ্টাদশচ্ছন্দের (অর্থাৎ ছন্দোনামক কবিতাসমূহের) তাৎপর্য্য-সমন্বিত প্রমাণ-সহিত সুভক্তিপর ভাষ্য রচনা করিয়াছে, সে-কারণে [তাহার] প্রচুর শ্রম-অবধারণে নিপুণ, নিজলীলায় রুচিবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নিজ রচনায় রুচিবিশিষ্ট প্রভু শ্রীরূপ এবং স্বপ্রণোদিত রুচিবিশিষ্ট সজ্জনগণও ইহার প্রতি সদ্যই সন্তুষ্ট হউন।

পুষ্পিকাঃ— ইতি কংসবধান্তাঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাঃ সমাপ্তাঃ।
ইত্যষ্টাদশ ছন্দাংসি ব্যাখ্যাতানি।

শ্রীজীবপ্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতশেষে'র ৪র্থ প্রকাশে ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু তাঁহার সাহিত্য-কৌমুদীর নবম পরিচ্ছেদে স্তবমালার অন্তর্গত চিত্রকবিত্বসমূহ লক্ষণ-সহ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীগীতাবলীর সকল গীতগুলির শেষে ভণিতার আকারে 'সনাতন' শব্দ দেখিয়া উহা শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুর রচনা মনে করার কোন কারণ নাই; কারণ, 'গীতাবলী'র টীকার শেষে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইহাকে শ্রীরূপের রচনা বলিয়াছেন,—

গাথাশ্চত্বারিংশদেকাধিকা যো
ব্যাচষ্ট শ্রীরূপদিষ্টাঃ প্রযত্নাৎ।
তস্মিন্ বিদ্যাভূষণে সাধুবর্য্যাঃ
ভাববিজ্ঞাঃ কারুণ্যং কিং ন কুর্য্যুঃ।।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু ৪১টি গাথার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত সংস্করণ-দুইটিতে ৪২টি গাথা বা গীত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপদ্যাবলীতে শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী হইতে ৫৯, ৬০ ও ৬১ সংখ্যক পদ্য, ছন্দোঽষ্টাদশকের অন্তর্গত শ্রীবৃন্দাবন-গো-বৎস-চারণাদি-লীলা হইতে ১০৫ সংখ্যক পদ্য এবং শ্রীমথুরা-অষ্টক হইতে ১২২ সংখ্যক পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর কলিকা-সমূহের সূচী

(১ক) সলক্ষণ চণ্ডবৃত্তের 'নখ'-ভেদ ঃ—

অচ্যুত (৭), উৎপল (৯, কন্দল (১৪, ১৮) কাশ (৫০), গুণরতি (১৩), তিলক (১৭), তুরঙ্গ (১১, ২৮) পল্লবিত (৩০), পুরুষোত্তম (৪৬), মাতঙ্গখেলিত (১০, ১৫), বর্দ্ধিত (১), বীরভদ্র (৩), সমগ্র (৫)।

(১খ) সলক্ষণ চণ্ডবৃত্তের 'বিশিখ'-ভেদ ঃ—

অরুণাম্ভোজ বা অরুণাম্ভোরুহ (২৭), ইন্দ্রীবর (২৫, (কহ্লার বা ফুল্লাম্বুজ (২৯), কুন্দ (৩২, ৩৫), চম্পক (৩১), পঙ্কেরুহ (১৯), পাণ্ডুৎপল (২৩), ফুল্লাম্বুজ বা কহ্লার (২৯), বকুলভাসুর (৩৭), বকুলমঙ্গল (৩৯), বঞ্জুল (২২, ৩৩), সিতরঞ্জ (২১)।

(২) দ্বিগাদিগণবৃত্তকলিকা বা মঞ্জরী ঃ—

কুসুম বা ন-কলিকা (৪৫, ৫৭), কোরক বা দ্বিগাদিকলিকা (৪১), গুচ্ছ বা রাদিকলিকা (৪৩)।

(৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্তকলিকা ঃ—

দণ্ডক-ত্রিভঙ্গী (৪৭), বিদগ্ধত্রিভঙ্গী (৪৪, ৪৯, ৫৫)।

[(৪) মধ্যকলিকা ঃ—

ইহার কোন উদাহরণ শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীতে নাই।]

(৫) মিশ্রকলিকা ঃ—

মিশ্রকলিকা (৫১), সাপ্তবিভক্তিকী মিশ্রকলিকা (৫২)।

(৬) গদ্যকলিকা ঃ—

অক্ষরময়ী (৫৪), সর্ব্বলঘ্বী (৫৬)।

স্তবমালার অন্তর্গত গীতাবলীর রাগ ঃ—

আশাবরী—২, ৫, ১০, ১২, ২৭; কর্ণাট—১৯, ২০, ৩৬; কল্যাণ—২৬; কেদার—২১; গৌড়ী—১১, ২২, ২৮, ৩২; ধনাশ্রী—৬ (মায়ূরভেদ), ৯, ১৫, ১৭, ১৮, ২৪, ২৫, ৪১, ৪২; ভৈরব—১, ১৩, ১৪, ৩০, ৩৫; মল্লার—২৩, ৩৩, ৩৭; রামকেলি—২৯; ললিত—৩১; বসন্ত—৩, ৪, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০; সৌরাষ্ট্রী—৭, ৮, ১৬।

গীতাবলীর ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যক গীতে মাত্র একতালী তালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৭। 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক' * —ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীব্রজলীলাবিষয়ক সপ্তাঙ্ক নাটকগ্রন্থ। পরবর্ত্তিকালে 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'তে অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার যে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ ও অপ্রাকৃত সম্ভোগ-রসের বিভিন্ন লক্ষণসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার অভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার দ্বারা তাহা উক্ত নাটকে বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শ্রীবিদগ্ধমাধব হইতে উদাহরণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,—রাধা প্রঃ ১১, ১৯, ২২; নায়িকাভেদ প্রঃ ২০; দূতীভেদ প্রঃ ৪, সখী প্রঃ ১২, ৪৩, ৪৫, ৫০; উদ্দীপন প্রঃ ১৬, ৪৫, ৪৬; অনুভব প্রঃ ৬৫, ৬৬, ৭০; উদ্ভাস্বর প্রঃ ৮১, ৮৬; সাত্ত্বিক প্রঃ ২৮; ব্যভিচারী প্রঃ ৫, ৭, ২১, ২৯, ৩১, ৪৩, ৫০, ৫৯, ৬৫, ৬৮, ৮৩, ৮৬, ১০২; স্থায়িভাব প্রঃ ৩, ৪, ৯১; পূর্ব্বরাগ প্রঃ ৬, ১৩, ১৪, ১৮, ২০, ২১; মান প্রঃ ৩৭, ৪৯; প্রেমবৈচিত্ত্য প্রঃ ৫৯; গৌণসম্ভোগ প্রঃ ১৫, ১৭।

স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীল রামানন্দ রায় এবং শ্রীল স্বরূপদামোদরাদি শ্রীগৌরনিজজনগণ এই নাটক শ্রবণ করিয়া শ্রীরূপের কবিত্বের অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সপ্তাঙ্ক নাটকের অঙ্কসমূহ যথাক্রমে নিম্নলিখিত নামে উক্ত হইয়াছে,— (১) বেণুনাদ-বিলাস, (২) মন্মথলেখ, (৩) শ্রীরাধাসঙ্গ, (৪) বেণুহরণ, (৫) শ্রীরাধাপ্রসাদ, (৬) শরদ্‌বিহার ও (৭) গৌরী-তীর্থবিহার।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ড-তীরবর্ত্তী ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীগোপীশ্বর শিবের স্বপ্নাদেশে এই নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহা সূত্রধারের বাক্য হইতে জানা যায়,—

'অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন।' —ইহার টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—"শ্রীশঙ্করদেবেনেতি —ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্ত্তিনা গোপীশ্বর-নাম্না।"—(১ অঃ ৪ সং)। এই নাটকের নান্দী ও মঙ্গলাচরণের ইষ্টদেব-বর্ণন-শ্লোক এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগেই আলোচিত

* শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় ১৫৭৯ শকাব্দে (=১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গাক্ষরে লিখিত ৬৬ পত্রাত্মক শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের একটি পুঁথি আছে।

হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকেশিতীর্থে নানা দিগ্‌দেশীয় রসিক সম্প্রদায়ের সমক্ষে এই নাটক শ্রীগোপীশ্বর শিবের আদেশে অভিনীত হয় বলিয়া নাটকের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ শ্রীরূপের নিম্নলিখিত বাক্যটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানারূপ কুতর্ক উপস্থিত করে—

"তদিদানীমেতস্য ভক্তবৃন্দস্য মুকুন্দবিশ্লেষোদ্দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কামপি তস্যৈব কেলিসুধাকল্লোলিনীমুল্লাসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা; মৎকৃপৈব তে সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতীতি।"—(১ অঃ ৭)

এখন এই ভক্তগণের শ্রীমুকুন্দের বিরহের উদ্দীপনহেতু প্রাণ বহির্গতপ্রায়; (অতএব) শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃততরঙ্গিণী প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমার (শ্রীগোপীশ্বরের) কৃপাই গ্রন্থসামগ্রীসংগ্রহে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিবে।

এস্থলে যে 'মুকুন্দবিশ্লেষে'র কথা দেখা যায়, তাহা শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীরূপানুগগণ সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত। এজন্যই ভক্তগণের শ্রীমুকুন্দবিশ্লেষোদ্দীপনার কথা লিখিত হইয়াছে। অথবা গোস্বামি-গণের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থ রচনা করিবার বহুকাল পরে তাহা সংশোধিত করেন; যেমন 'শ্রীমাধবমহোৎসব', প্রভৃতি সংশোধনের কথা শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর পত্রী-মধ্যে (শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৪।১৯) দৃষ্ট হয়। 'শ্রীরসামৃতসিন্ধুশ্রীমাধব-মহোৎসবোত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে'। শ্রীজীব ১৫১৪ শকাব্দে (= ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) উত্তরচম্পূ রচনা শেষ করেন। তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দে (=১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) 'শ্রীমাধবমহোৎসবে'র রচনা-কাল দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ শ্রীমাধবমহোৎসব ও উত্তরচম্পূর সমাপ্তির ব্যবধানকাল (=১৫৯২ খৃঃ—১৫৫৫ খৃঃ) ৩৭ বৎসর। এত দীর্ঘ ব্যবধান পরে শ্রীমাধবমহোৎসব শ্রীজীব-প্রভু দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল; অতএব সংশোধনকালেও গ্রন্থকার ঐস্থলে পূর্ব্বোক্ত অংশ সংযোজিত করিতে পারেন।

এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তির কাল, যাহা গ্রন্থের উপসংহারে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া কোন কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তি বিচার করেন যে, যদি গ্রন্থে লিখিত কালই সত্য হয়, তবে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের বৎসরেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নাটকের ৫ম অঙ্ক পর্য্যন্ত কোন কোন শ্লোক স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর

অপ্রকটের পর গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বর্ণনা কিরূপে ঐতিহাসিক সত্য হয়? এইস্থানে বক্তব্য এই যে, অনেক সময় গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগ এককালে রচিত হইবার পর বিশেষ কারণবশতঃ সুদীর্ঘকালের পরেও অবশিষ্টাংশ রচিত হইয়া গ্রন্থসমাপ্তি হয়। ইহা বহু অতিমর্ত্ত্য বৈষ্ণব-মহাজনের ও লেখকের ব্যবহারে দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালেই 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে'র অধিকাংশ ভাগ রচিত হইয়াছিল এবং তাহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল রায়-রামানন্দাদি ভক্তগণ-সহ স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কবির প্রতি শ্রীল স্বরূপদামোদরের বাক্য হইতেও এই আভাসই পাওয়া যায়। তিনিও "রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে" (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।১০৮),—এই বাক্যের দ্বারা গ্রন্থের আরম্ভের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলাবিষ্কারের বৎসরেই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের রচনা ও সংশোধনাদি সম্পূর্ণ করিয়া পরিশেষে গ্রন্থপরিসমাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ বৃহদ্গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর আরম্ভ করিয়া সেই বৎসরেই সমাপ্ত করা সম্ভব নহে।

"শ্রীস্বরূপের রঘু"র শ্রীমুখে শ্রুত ঘটনা—শ্রীরূপের একান্ত ভৃত্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাকে আধুনিক আধ্যক্ষিক ভিন্নতন্ত্রের ব্যক্তিগণের কল্পনাবিলাসের উপর বিশ্বাস করিয়া 'কবি-কল্পনা' বলা যায় না।

নিম্নে শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণের নাম প্রদত্ত হইল।

পাত্রগণ

শ্রীনন্দমহারাজ—শ্রীব্রজরাজ

শ্রীকৃষ্ণ—নায়ক

শ্রীবলরাম—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ

শ্রীদামা—শ্রীকৃষ্ণসখা

শ্রীসুবল— ঐ

শ্রীমধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য ও বিদূষক

অভিমন্যু—জটিলার পুত্র

সূত্রধার—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু

পারিপার্শ্বিক—শ্রীরূপের শিষ্য

পাত্রীগণ

শ্রীযশোদা—শ্রীব্রজেশ্বরী
শ্রীরাধিকা—নায়িকা
শ্রীললিতা—শ্রীরাধিকার সখী
শ্রীবিশাখা— ঐ
শ্রীবৃন্দা—দূতী
শ্রীপৌর্ণমাসী—শ্রীসান্দীপনি-মুনির জননী ও
শ্রীনারদের শিষ্যা
নান্দীমুখী—শ্রীমধুমঙ্গলের ভগিনী
জটিলা—অভিমন্যুর মাতা
মুখরা—শ্রীরাধিকার মাতামহী, শ্রীযশোদার ধাত্রী
সারঙ্গী—শ্রীরাধিকার সখী
করালা—প্রাচীনা গোপী
করালিকা— ঐ
শ্রীচন্দ্রাবলী—যূথেশ্বরী
পদ্মা—শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী
শৈব্যা— ঐ

শ্রীবিদগ্ধমাধবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। জটিলা-পুত্র অভিমন্যু বা কংসের গোমণ্ডলাধ্যক্ষ গোবর্দ্ধনাদিকে বঞ্চনা করিয়া যূথেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ও শ্রীচন্দ্রাবলীর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রীতিবিধান এবং যোগমায়া দ্বারা মিথ্যা বিবাহকে সত্য বলিয়া প্রতীতি শ্রীপৌর্ণমাসীর মুখে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"তদ্‌বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।" (শ্রীবিদগ্ধমাধব—১।২৪-২৫)।

শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের উপসংহারে তিনটি শ্লোকে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু সজ্জনগণকে এই নাটক অনুশীলনের জন্য আকর্ষণ ও স্বদৈন্য-জ্ঞাপন করিয়া গ্রন্থ-রচনা-সমাপ্তির স্থান ও কাল জানাইয়াছেন,—

রাধাবিলাসবীতাঙ্কং চতুঃষষ্টিকলাধরম্।
বিদগ্ধমাধবং নাম শীলয়ন্তু বিচক্ষণাঃ।।
নন্দসিন্ধুরবাণেন্দু-সংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্।।
শান্তশ্রিয়ঃ পরমভাগবতাঃ সমন্তাদ্
বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্গুণতাং নয়ন্তি।
দোষাবলীমপরিতাপিতয়া মৃদূনি
জ্যোতীংষি বিষ্ণুপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি।।

বিচক্ষণ সজ্জনবৃন্দ শ্রীরাধার বিলাস ও বিচ্ছেদে চিহ্নিত চতুঃষষ্টিকলাযুক্ত শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকের অনুশীলন করুন।

১৫৮৯ সংবৎ গত হইলে শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক শ্রীগোকুলে সমাপ্ত হয়। (১৫৮৯ সং—১৩৫ = ১৪৫৪ শক = ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ)।

আকাশস্থিত স্বল্পালোক-প্রকাশকারী নক্ষত্রগণ যেরূপ রাত্রিকে ভূষিত করে, সেইরূপ শান্তমূর্ত্তি পরমভাগবতগণ দোষসমূহকেও সর্ব্বতোভাবে সদ্গুণত্ব প্রাপ্ত করান।

শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর 'রসকদম্ব'-নামে শ্রীবিদগ্ধমাধবের এক সুললিত পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৮। **শ্রীললিতমাধব-নাটক**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলাবিষয়ক দশাঙ্ক নাটক। যদিও ১ম হইতে ৪র্থ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় মাধুর্য্যময়ী লীলার অবতারণা আছে, তথাপি ৫ম অঙ্ক হইতে ১০ম অঙ্ক পর্য্যন্ত শ্রীদ্বারকালীলা মিশ্রিতভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায় এই নাটক শ্রীদ্বারকালীলা-বিষয়ক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। এই নাটকের নাম 'শ্রীললিতমাধব' হইবার কারণ শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু উপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নাটকে সমুচিতামপীশ্বরঃ স্বৈরমপ্রকটয়ন্নুদাত্ততাম্।
অত্র মন্মথমনোহরো হরি-র্লীলয়া ললিতভাবমাযযৌ।।

এই নাটকে কামদেবের মনোহরণকারী পরমেশ্বর শ্রীহরি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবশতঃ উদাত্ত-নায়কতা প্রকট করিয়া লীলাদ্বারা ললিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই নাটকের ১০টি বিভিন্ন অঙ্ক যথাক্রমে নিম্নলিখিত নামে পরিচিত—(১) সায়মুৎসব, (২) শঙ্খচূড়-বধ, (৩) উন্মত্তরাধিক, (৪) রাধাভিসার, (৫) চন্দ্রাবলী-লাভ, (৬) ললিতোপলব্ধি, (৭) নববৃন্দাবন-সঙ্গম, (৮) নববৃন্দাবন-বিহার, (৯) চিত্রদর্শন ও (১০) পূর্ণ-মনোরথ।

'শ্রীললিতমাধব-নাটক' ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধবে'র ন্যায় শ্রীব্রহ্মকুণ্ডতীর-সমীপস্থ শ্রীগোপীশ্বর শিবের স্বপ্নাদেশেই রচিত হইয়াছে। 'দীপমালিকা-মহোৎসবে' শ্রীগোবর্দ্ধনের আরাধনার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডের তটবর্ত্তী শ্রীমাধবীমাধব মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ঐ নাটক শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন বলিয়া সূত্রধাররূপে নাটকের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

"সন্ততং বৃন্দাটবীনিকুঞ্জবেদিনিবাসদীক্ষারসজ্ঞস্য স্ফুরদুদ্দণ্ডপুণ্ডরীক-মণ্ডলী-মণ্ডিতব্রহ্মকুণ্ডতীরোপান্তস্থলী-মহাভৌমিকস্য ভগবতো গোপীশ্বরতয়া প্রসিদ্ধস্য চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ স্বপ্নাবির্ভূতমাদেশমাসাদ্য দীপাবলীকৌতুকারম্ভে গোবর্দ্ধনারাধনায় রাধাকুণ্ডরোধসি মাধবী-মাধবমন্দিরস্য পূর্ব্বতঃ সঙ্গতানি বৈষ্ণববৃন্দানি স্বপ্রবন্ধেন ললিতমাধবনাম্না নাটকে নাহমুপস্থাতুং পর্য্যুৎসুকোঽস্মি।।"—(১।৩)

এই গ্রন্থের ১ম শ্লোকে 'শ্রীমুকুন্দের কীর্ত্তিচন্দ্রের দ্বারা বৈষ্ণববৃন্দের আনন্দ-বিধান হউক'—এইভাবে বৈষ্ণবগণের প্রীতিকামনা, ২য় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-নমস্কার, ৩য় অনুচ্ছেদের গদ্যে শ্রীগোপীশ্বর শিবের আদেশে নাটক-রচনার বিষয়-নির্দ্দেশ, ৪র্থ শ্লোকে 'শ্রীশচীসুত আমার কল্যাণ বিধান করুন'—এইভাবে শ্রীগৌরকৃপা-প্রার্থনা, ৬ষ্ঠ শ্লোকে অযোগ্যতা জ্ঞাপন ও ৭ম শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর বন্দনা দৃষ্ট হয়।

বক্তুং পারমহংস্যপদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ
সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা।
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়ন্
একঃ সোঽবততার বিশ্বগুরবে পূর্ণায় তস্মৈ নমঃ।।

(শ্রীললিতমাধব—১।৭)

যিনি পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে পরমহংসদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ করিবার জন্য চতুঃসনের মধ্যে তৃতীয় 'শ্রীসনাতন'-নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তিনিই

বৈষ্ণববৃন্দের হৃদয়ে সাঙ্গ ভক্তিরহস্য সঞ্চার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন; আমি সেই পূর্ণস্বরূপ জগদ্‌গুরুকে নমস্কার করি।

এই পদ্যে শ্রীরূপ শ্রীল সনাতনপ্রভুকে "শ্রীচতুঃসনের অবতার শ্রীসনাতন" ও "বিশ্বগুরু" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১ম অঙ্কে শ্রীগার্গী ও শ্রীপৌর্ণমাসীর কথোপকথনের মধ্যে একটি বিশেষ রহস্য শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু প্রকট করিয়াছেন।

"মায়াবিবর্ত্তোঽয়ম্। ন চেদ্বিরিঞ্চের্বরামৃতেন সমৃদ্ধের্বিন্ধ্যনগস্য তপঃপ্রসূনৈ-র্গুম্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতাকারি-মাধুরি-মকরন্দাং রাধিকাবৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্‌জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত।।" (শ্রীললিতমাধব—১।২৫)

অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ-প্রায় ব্যাপার কেবল মায়ার বিবর্ত্তমাত্র। তাহা না হইলে শ্রীব্রহ্মার বরামৃতের দ্বারা সমৃদ্ধ বিন্ধ্যাচলের তপস্যা-কুসুমে গুম্ফিতা শ্রীমাধবহৃদয়-স্নিগ্ধকরী মাধুরীমকরন্দ-স্বরূপা শ্রীরাধারূপা বৈজয়ন্তীকে কিরূপে নীচ ব্যক্তি হস্তে গ্রহণ করিতে পারে?

শ্রীব্রহ্মার বরে বিন্ধ্যাচলের দুইটি ত্রিভুবনবিখ্যাতা কন্যা হইয়াছিলেন। এই দুই কন্যাই মাধুর্য্যশালিনী অষ্টমহাশক্তির (শ্রীরাধা, শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীপদ্মা, শ্রীশৈব্যা, শ্রীশ্যামলা ও শ্রীভদ্রা) মধ্যে নিখিলগুণগ্রামের শ্রীমন্দির বলিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধা ও যূথেশ্বরীরূপে বিখ্যাতা। ব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীযোগমায়া শ্রীচন্দ্রভানু ও শ্রীবৃষভানুর পত্নীদ্বয়ের গর্ভ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির পত্নীর গর্ভে ঐ দুই বালিকাকে স্থাপন করিয়াছেন। পুত্রহারিণী পূতনা সেই বৃষভানুনন্দিনীকে বিন্ধ্যের নিকট হইতে গোকুলে আনয়ন করিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদর্ভগামিনী নদীপ্রবাহে পতিতা হইয়াছিলেন। বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীষ্মক তাঁহাকে লাভ করেন। গোবর্দ্ধনাদি গোপগণের সহিত শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহাদি-প্রায় ব্যাপার মায়ার দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। "পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু দারতা যদেষাং প্রেক্ষণমপি-তাভিরতিদুর্ঘটম্।" (শ্রীললিতমাধব—১।৪৪)

পতিম্মন্য গোপকুমারীগণের যে ভার্য্যাত্ব-প্রতীতি, তাহা কেবল মমতামাত্রেই পর্য্যবসিত, যেহেতু সেই সকল কুমারীর দর্শনও গোবর্দ্ধনাদি গোপের পক্ষে অতিশয় দুর্ঘট।

পঞ্চম অঙ্কে শ্রীনারদের মুখে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু পুরললনা ও ব্রজ-ললনাগণের সম্বন্ধে একটি রহস্য সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—(শ্রীললিত-মাধব, ৫।৫ অনুঃ)

"নন্বেতাঃ পুরব্রজরমণাঃ সমানতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিন্না এব, মধ্যে তু মায়য়া পরমভিন্নাঃ কৃতাঃ, সম্প্রতি ব্রজ এব, তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব বিপ্রয়োগেহপি প্রিয়সঙ্গসুখ-সঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাস্য-পুররমণীষু-চাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্না ইব সম্যগনুভাবয়াংবভূবিরে। কুরুক্ষেত্রে-যাত্রয়োর্বৃত্তবক্ষ্যমাণ-চরিত্রাস্তাঃ খল্বষ্টোত্তরৈকশত-ষোড়শ-সহস্রৈকতত্তস্মাদন্যা এব। তদলং তদ্রহস্যোদঘাটনেন।।"

শ্রীললিতমাধব-নাটকের রচনার কাল ও স্থান-সম্বন্ধে নাটকের উপান্ত-শ্লোকে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

নন্দেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্।।

১৪৫৯ শকাব্দে (১৪৫৯+৭৮ =১৫৩৭ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া ভদ্রবনে এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিলাম।

শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুরের 'রসকদম্ব' নামক শ্রীবিদগ্ধমাধবের বাংলা পদ্যানুবাদের অনুকরণে শ্রীললিতমাধবের 'প্রেমকদম্ব'-নামক একটি বাংলা পদ্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর শ্রীললিতমাধবের কোন পদ্যানুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব নাটকদ্বয়, শ্রীদানকেলিকৌমুদী অথবা শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্রসমূহ মানবজাতির মনীষা দূরে থাকুক, লোকোত্তর পুরুষগণেরও আধ্যক্ষিক বিচারের অতীত-বস্তু। কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত মানব কেবল পাণ্ডিত্য বা আধ্যক্ষিকতাদ্বারা ঐসকল অপ্রাকৃত-শাস্ত্রসিন্ধুর তটদেশও স্পর্শ করিতে পারে না। এজন্যই বহু পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তি শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব-নাটকের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। "কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি'

কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে।।" (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।৬৬),—শ্রীরূপের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত এই বাক্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই বিমূঢ়মতি হইয়াছেন। ইহার সুমীমাংসা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধে ('শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব-নাটকদ্বয়-সম্বন্ধে বক্তব্য') নিবদ্ধ ছিল। উহা ২০শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধাবান্ পাঠকগণ উহা এই প্রবন্ধ-সম্পর্কে পাঠ করিতে পারেন।

'শ্রীললিতমাধবে'র

পাত্রগণ

শ্রীনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, শ্রীমধুমঙ্গল, শ্রীউদ্ধব, শ্রীনারদ, শ্রীগরুড়, শ্রীমাধব, সুনন্দ, অভিমন্যু, শ্রীভীষ্মক, শঙ্খচূড়, নৃপতিদ্বয়, সূত্রধার, শ্রীবিশ্বকর্মা, শরৎ ও সুপর্ণ।

পাত্রীগণ

শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীবৃন্দা, শ্রীরোহিণী, শ্রীপৌর্ণমাসী, শ্রীকুন্দলতা, শ্রীযশোদা, শ্রীমাধবী, শ্রীনববৃন্দা, শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীপদ্মা, শ্রীনান্দীমুখী, শ্রীসুকণ্ঠী, শ্রীতুলসী, শ্রীমালতী, শ্রীপিঙ্গলা, বিন্ধ্যবাসিনী বা একানংশা, কঞ্চুকী, ভার্গবী, জটিলা, শ্রীগার্গী, নটী, বৃদ্ধা, মুখরা, ধাত্রী, বকুলা ও ভারুণ্ডা।

৯। **শ্রীদানকেলিকৌমুদী**—উপরূপকভেদের অন্তর্গত 'ভাণিকা'-নামক শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-রচিত একাঙ্ক নাটক। বিশ্বনাথ-কবিরাজ-কৃত 'সাহিত্য-দর্পণে' (৬,৩০৮-৩১৩) 'ভাণিকা'র লক্ষণ এইরূপ আছে,—

ভাণিকা শ্লক্ষ্নেপথ্যা মুখনির্বহণান্বিতা।
কৈশিকীভারতীবৃত্তিযুক্তৈকাঙ্কবিনির্মিতা।।
উদাত্তনায়িকা মঞ্জুপুরুষাত্রাঙ্গসপ্তকম্।
উপান্যাসোঽথ বিন্যাসো বিরোধঃ সাধ্বসং তথা।।
সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহার ইতি সপ্তমঃ।

'ভাণিকা'-নামক উপরূপকে বসনাদিবেশের সূক্ষ্মতা থাকিবে। উহাতে 'মুখ' ও 'নির্বহণ'-সন্ধি, কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তি, একটিমাত্র অঙ্ক, উৎকৃষ্ট নায়িকা,

উত্তম নায়ক ও সাতটি অঙ্গ থাকিবে। এই সাতটি অঙ্গের নাম—উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহার।

শারদাতনয়-কৃত 'ভাবপ্রকাশন'-নামক নাট্যশাস্ত্র-গ্রন্থে প্রদত্ত লক্ষণের সহিত শ্রীদানকেলিকৌমুদীর অধিকতর সাদৃশ্য আছে। শেযোক্ত গ্রন্থের মতে ভাণিকার বিষয়বস্তু হইবে-শ্রীহরির চরিত; ইহাতে শৃঙ্গাররস অঙ্গী, নৃত্য ও সঙ্গীত অঙ্গ হইবে এবং চতুর পরিহাস-বাক্য থাকিবে।

শ্রীদানকেলিকৌমুদীর ১ম শ্লোকে 'শ্রীরাধার দৃষ্টি বৈষ্ণবগণের কল্যাণবিধান করুন', ২য় শ্লোকে 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ জয়যুক্ত হউক'—এইরূপ উক্তি আছে। ৪র্থ অনুচ্ছেদ হইতে ৭ম অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত সুত্রধার নন্দীশ্বর পর্ব্বতের উপত্যকায় মনোজ্ঞভাবশালী বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রেমবিবশতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৮ম অনুচ্ছেদে 'শ্রীনন্দনন্দনের প্রেমকলহ আত্মারামগণকে ও ব্রহ্মানন্দ হইতে আকর্ষণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ তিরস্কৃত'—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ১০ম অনুচ্ছেদে সূত্রধার নিজাভীষ্টদেবতার অনুসরণপূর্ব্বক ভাণিকার মঙ্গলাচরণের অবতারণা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই,—

নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি।।

(শ্রীদানকেলিকৌমুদী—১১)

যাঁহার শ্রীনাম দ্বারা রসজ্ঞ ভক্তগণ আকৃষ্ট হন, যিনি নিজ চরিত দ্বারা শ্রীনন্দমহারাজের অথবা সাধুবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, যিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য (ভক্তগণের) (আনন্দ-) উৎসব বিধান করেন, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ নিত্য—সনাতন, সেই প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন।

[পক্ষে] যাঁহার জিহ্বা শ্রীনামদ্বারা আকৃষ্ট, যাঁহার চরিত্র সজ্জনগণের আনন্দ বিধান করে, যিনি শ্রীরূপের (আনন্দ-) উৎসব-বিধাতা এবং যিনি 'সনাতন'-নামক বিগ্রহধারী (অর্থাৎ 'শ্রীসনাতন'-নামে প্রসিদ্ধ), সেই (মদীয়) প্রভু জয়যুক্ত হউন।

শ্রীবসুদেব নিজপুত্র শ্রীবলরামের ও মিত্রপুত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করিয়া গর্গের জামাতা ভাগুরিকে প্রতিনিধিরূপে বরণপূর্ব্বক বনের মধ্যে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা তাঁহার সখীগণপরিবৃতা হইয়া গুরুবর্গের

অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তী যজ্ঞমণ্ডপে হৈয়ঙ্গবীন (সদ্য প্রস্তুত ঘৃত) বিক্রয় করিবার জন্য গমন করেন। ইহা পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীপৌর্ণমাসী শ্রীনান্দীমুখীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধনে দানঘাটের রক্ষকরূপে শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সহচরীগণের নিকট শুল্ক দাবী করেন। এই ঘটনা লইয়াই ভাণিকা আরম্ভ হয়। অবশেষে পৌর্ণমাসী মধ্যস্থা হইয়া যথাযোগ্য শুল্কদানের ব্যবস্থা করেন।

এই গ্রন্থের উপান্তশ্লোকদ্বয়ে (১১৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীপৌর্ণমাসীর প্রার্থনা এই,—

সহচরীকুলসঙ্কুলয়া গুণৈরধিকয়া সহ রাধিকয়ানয়া।
ত্বমিহ নর্ম্মসুহৃন্মিলিতঃ সদা ঘটয় মাধব ঘট্টবিলাসিতাম্।।
রাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতিস্ত্যক্তান্যকর্ম্মা জনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়োর্যঃ কর্ত্তুমুৎকণ্ঠতে।
বৃন্দারণ্যসমৃদ্ধিদোহদপদক্রীড়াকটাক্ষদ্যুতে
তর্ষাখ্যস্তরুরস্য মাধব ফলী তূর্ণং বিধেয়স্তয়া।।

হে মাধব! তুমি সহচরীবৃন্দ-পরিবেষ্টিতা গুণপ্রবরা এই শ্রীরাধিকার সহিত নর্ম্মসখাগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা ঘট্টবিলাস কর।

আর একটি প্রার্থনা এই,—শ্রীবৃন্দারণ্যবাসিমাত্রেরই অভীষ্টপূরণবিষয়ে লীলায় (কৃপা-) কটাক্ষপাতকারী হে মাধব! যিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের (অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) সাক্ষাৎ সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তাঁহার (অর্থাৎ সেই শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীরঘুনাথদাসের) মনোরথতরুকে ফলবান্ কর।

শেষোক্ত শ্লোকে "রাধাকুণ্ডতটকুটীরবসতিস্ত্যক্তান্যকর্ম্মা" বাক্যের দ্বারা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু লক্ষিত হইয়াছেন। মূল গ্রন্থের শেষে গ্রন্থের রচনা-বিষয়ে নির্দেশ ও গ্রন্থের নির্ম্মাণকাল-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়,—

গ্রথিতা সুমনঃসুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকা-স্রগিয়ম্।
তস্য মম প্রিয়সুহৃদঃ কুণ্ডতটীং ক্ষণমলঙ্কুরুতাম্।।
গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে।
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা।।

যাঁহার আদেশে সজ্জনগণের সুখদ এই ভাণিকারূপ মাল্য গ্রথিত হইল, সেই আমার প্রিয় বান্ধবের শ্রীকুণ্ডতটপ্রদেশ (ইহা) ক্ষণকালের জন্য অলঙ্কৃত করুক। নন্দীশ্বরে বাসকালে মৎকর্ত্তৃক ১৪৭১ শকে এই ভাণিকা রচিত হইল।

বহরমপুরে মুদ্রিত সংস্করণে 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'র শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুর টীকা বলিয়া যাহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ আছে,—"তস্য প্রিয়সুহৃদঃ শ্রীরাধাকুণ্ডবাসিনঃ শ্রীরঘুনাথদাসস্যেত্যর্থঃ।"

'অঙ্কস্য বামা গতিঃ'—এই নিয়মানুসারে শ্রীদানকেলিকৌমুদীর রচনার সমাপ্তিকাল ১৪৭১ শক বা ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ হয়। অঙ্কের বামা গতির নিয়ম ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থের রচনাকাল ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু দুইটি বিভিন্ন মতে শ্রীল রূপপ্রভুর আবির্ভাব-কাল যথাক্রমে ১৪১১ শক (১৪৮৯ খৃঃ) ও ১৪১৫ শক (১৪৯৩ খৃঃ) হওয়ায় শ্রীদানকেলিকৌমুদীর রচনাকালে শ্রীরূপের বয়ঃক্রম হয় ৬ বৎসর, না হয় ২ বৎসর হইয়া দাঁড়ায়। যদিও ২ বা ৬ বৎসর বয়সে অতিমর্ত্ত্য মহাজন শ্রীরূপের নাটক-রচনা অসম্ভব নহে, [এই প্রসঙ্গে ৭ বৎসর বয়সে শ্রীল কবিকর্ণপূরের আর্য্যা-চ্ছন্দে শ্লোক-রচনার কথা স্মরণীয় (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৬।৭৫)।], তথাপি গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকের টীকায় ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডতটবাসী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামির নির্দ্দেশানুসারে রচিত বলিয়া উক্ত হওয়ায় গ্রন্থরচনাকাল ১৪১৭ শক ধরিলে শ্রীরূপের ২ বা ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভুর প্রাকট্যের পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার বাহ্যবিচারে সম্ভবপর নহে। কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তিকাল ১৪৭১ শক (১৫৪৯ খৃঃ) ধরিলে ১৪২৮ শকে (১৫০৬ খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত শ্রীল দাসগোস্বামির নির্দ্দেশে ভাণিকা-রচনা সম্ভব হয়। ১৪৬৩ শক বা ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীদানকেলিকৌমুদীর কোন কোন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া এই তারিখ অসম্ভব, এরূপ বলা যায় না। হয় ত' শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু ভাণিকা-রচনার সম-সময়ে বা কিঞ্চিৎ পরে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচনা আরম্ভ করিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত রচিত ভাণিকার কিয়দংশ হইতে কোন কোন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা শেষ করিয়া পরে ভাণিকার শেষাংশ-রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীদানকেলিকৌমুদীর মুদ্রিত সংস্করণে মোট ৪১৪টি অনুচ্ছেদ আছে, কিন্তু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ৭, ৫৫, ৭৯ ও সর্ব্বোর্দ্ধে ১১৭ অনুচ্ছেদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'স্বর' শব্দে

'তিন' সংখ্যাকেও (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত— এই তিনটি স্বর) বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ১৪৩১ শক ধরিলে গ্রন্থরচনাকালে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর বয়ঃক্রম ৩ বৎসর হয়।

'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'র

পাত্রগণ

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমধুমঙ্গল, শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীসুবল, শ্রীউজ্জ্বল, সূত্রধার ও নট।

পাত্রীগণ

শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীচম্পকলতা, শ্রীচিত্রা, শ্রীনান্দীমুখী, শ্রীবৃন্দা ও শ্রীপৌর্ণমাসী।

১০। **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু**—শ্রীগৌড়ীয়রস-সাহিত্যকল্পতরুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গলিতফল ও ভক্তিরসের বিজ্ঞানশাস্ত্রই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ও ইহার বিষয়-বিবরণ ১২শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৪৭শ, ৪৮শ ও ৪৯তম সংখ্যায় যথাক্রমে,—৭২৯-৭৩৪, ৭৪৮-৭৫২ ও ৭৬৩-৭৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১১। **শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি**—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুর-রসের বিজ্ঞানশাস্ত্র। ইহার বিশেষ বিবরণ ও বিষয়-বিশ্লেষণ গৌড়ীয়ের ১২শ বর্ষ, ৪০শ ও ৪১শ সংখ্যায় যথাক্রমে—৬১৩-৬১৮, ৬৩৪-৬৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১২। **প্রযুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা**—শ্রীধাম-বৃন্দাবনাদি স্থানে এই গ্রন্থের জন্য আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পুঁথির প্রকৃত সংবাদ কোন স্থান হইতেই পাওয়া যায় নাই। জয়পুরের শ্রীমন্দিরের গ্রন্থাগারেও আমরা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুবর্গের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামি মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথিসমূহের মধ্যেও শ্রীগোস্বামিবর্গের গ্রন্থ আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরঙ্গনাথজীর শ্রীমন্দিরের গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ Govt. Oriental Mss. Library এবং শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের বিভিন্ন শ্রীপাটসমূহ যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তবে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বলা যায় না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর 'ধাতুসংগ্রহে'র মত শ্রীরূপ

গোস্বামিপ্রভুর 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা' সংস্কৃত ব্যাকরণের আখ্যাত বা ক্রিয়াপদ-বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ হইবে এবং ইহাতে ধাতুসমূহের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থের নাম দর্শনে এইরূপ অনুমান হয়।

কোলব্রুব সাহেব তাঁহার 'Miscellaneous Essays' পুস্তকে (Vol. II, P. 48) 'শ্রীচৈতন্যামৃত' নামক একটি বৈষ্ণব-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'-নামক গ্রন্থও বর্ত্তমান লুপ্তপ্রায়। এই গ্রন্থের এক পুঁথি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত 'শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ-সংক্ষেপ' নামক একটি গ্রন্থের ১৬ পত্রাত্মক পুঁথি (পুঁথি-সংখ্যা R. R. 162) আমরা দেখিয়াছি।

১৩। শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু লঘুতোষণীর উপসংহারে যাহাকে 'মথুরা-মহিমা', শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৪০) যাহাকে 'মথুরামাহাত্ম্য' ও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১।৮১৭) শ্রীরূপের ষোড়শ গ্রন্থের অন্যতমরূপে যাহাকে 'মথুরামহিমা' বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাই শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-সঙ্কলিত "মথুরা-মাহাত্ম্য"-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে যে যে বিষয় যে যে শ্লোকসংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, পারম্পর্য্য-ক্রমে তাহার একটি সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

মঙ্গলাচরণ ১-২, শ্রীমথুরার পাপহারিত্ব ৩-১৭, পুণ্যপ্রদত্ব ১৮-৫২, অসংখ্য-তীর্থাশ্রয়ত্ব ৫৩-৫৪, শ্রীমথুরা-বাসের উপদেশ ৫৫-৫৬, অগতি-গতিত্ব ৬৭-৮১, শ্রীভগবৎকৃপালভ্যত্ব ৮২-৮৫, মোক্ষপ্রদত্ব ৮৬-১০২, বিষ্ণুলোক-প্রদত্ব ১০৩-১০৯, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্ব ১১০-১২৭, প্রপঞ্চাতীতত্ব ১২৮-১৩২, মথুরামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য ১৫৮-১৬৪, কালবিশেষে নিবাসাদি-ফল ১৬৫, চাতুর্ম্মাস্যে নিবাসাদি-ফল ১৬৬-১৬৮, ভাদ্র-জন্মাষ্টমীতে নিবাসাদি-ফল ১৬৯-১৭১, কার্ত্তিকে নিবাসাদি-ফল ১৭২-১৯০, কার্ত্তিকে প্রবোধনীতে বিশেষ ফল ১৯১-১৯৫, দ্বাদশীতে নিবাস-ফল ১৯৬-২০০, ভীষ্মপঞ্চকে বিশেষ ফল ২০০-২০১, মধুবনান্তর্গত মধুপুরী-মাহাত্ম্য ২০৫-২১৭, কালবিশেষে (কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমী ও নবমীতে) যাত্রাফল ২১৮-২২৫, শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান-মাহাত্ম্য ২২৬, কার্ত্তিকে

কৃষ্ণজন্মস্থান-দর্শন-মাহাত্ম্য ২২৭, প্রবোধনীতে কৃষ্ণজন্মস্থান-দর্শন-মাহাত্ম্য ২২৮-২৩১, শ্রীকেশবদেবের মাহাত্ম্য ২৩২-২৩৬, শ্রীভগবন্মূর্ত্তি-মাহাত্ম্য ২৩৭-২৪০, কৃষ্ণ-পরিবারগণের মাহাত্ম্য ২৪১, ভূতেশ্বর-মাহাত্ম্য ২৪২-২৪৬, বিশ্রান্তি-তীর্থ-মাহাত্ম্য ২৪৭-২৫৮, শ্রীগতশ্রমদেব-মাহাত্ম্য ২৫৯-২৬০, অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত চতুর্বিংশতি মুখ্য যমুনাতীর্থসমূহ ২৬১-২৯৮, অপর প্রসিদ্ধ তীর্থ-সমূহের মাহাত্ম্য ২৯৯-৩৩৮ (গোকর্ণতীর্থমাহাত্ম্য ২৯৯, কৃষ্ণগঙ্গা-মাহাত্ম্য ৩০০, বৈকুণ্ঠতীর্থ-মাহাত্ম্য ৩০১, অসিকুণ্ড-মাহাত্ম্য ৩০২-৩০৪, চতুঃসামুদ্রিক- কূপ-মাহাত্ম্য ৩০৫, কালিন্দী-মাহাত্ম্য ৩০৬-৩২৩, কালবিশেষে স্নানাদিফল ৩২৪-৩৩৮, মাথুর ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য ৩৩৯-৩৪৩, মথুরাবাসিগণের মাহাত্ম্য ৩৪৪-৩৫৮, দ্বাদশ বনসমূহের মাহাত্ম্য ৩৫৯-৪০৫ (মধুবন-মাহাত্ম্য ৩৬০, তালবন-মাহাত্ম্য ৩৬১-৩৬৪, কুমুদবন-মাহাত্ম্য ৩৬৫, কাম্যবন-মাহাত্ম্য ৩৬৬- ৩৬৯, বহুলাবন-মাহাত্ম্য ৩৭০-৩৭৩, ভদ্রবন-মাহাত্ম্য ৩৭৪, খদিরবন-মাহাত্ম্য ৩৭৫, মহাবন-মাহাত্ম্য ৩৭৬-৩৮০, লোহবন-মাহাত্ম্য ৩৮১, বিল্ববন-মাহাত্ম্য ৩৮২, ভাণ্ডীরবন-মাহাত্ম্য ৩৮৩-৩৮৫, শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য ৩৮৬-৪০৫, শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দের মাহাত্ম্য ৪০২-৪০৫, শ্রীগোবিন্দ-তীর্থ-মাহাত্ম্য ৪০৬-৪০৭, ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য ৪০৮-৪১৫, কেশিতীর্থের মাহাত্ম্য ৪১৬, কালিয়হ্রদ-মাহাত্ম্য ৪১৭-৪২৬, দ্বাদশাদিত্য-তীর্থ-মাহাত্ম্য ৪২৭-৪৩১ (প্রস্কন্দন-ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য ৪২৯-৪৩০, দ্বাদশ বনযাত্রার ক্রম, গোবর্দ্ধনপরিক্রমা, মানসী-গঙ্গাস্নান ও সেই সেই স্থানের কৃত্য ৪৩২-৪৩৮, শ্রীগোবর্দ্ধন-মাহাত্ম্য ৪৩৯-৪৪৭ (শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা-মাহাত্ম্য ৪৪৫-৪৪৬), গোবর্দ্ধনস্থ ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্য ৪৪৮-৪৫১ (ব্রহ্মকুণ্ডের চতুষ্পার্শে ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ও যমরাজের তীর্থসমূহের পরিচয় ৪৪৯-৪৫১, গোবিন্দকুণ্ডের মাহাত্ম্য ৪৫২, মথুরার মহাতীর্থসমূহ (বিশ্রান্তিতীর্থ, গোকর্ণাখ্য কূপ ও দ্বাদশ বনের পরিচয়) ৪৭৮-৪৭৯, মাথুর-দেবতাসমূহ (নারায়ণ, কেশব, স্বয়ম্ভূ, পদ্মনাভ, দীর্ঘবিষ্ণু, গোবিন্দ, হরি, বরাহ) ৪৮০-৪৮২।

গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ,—

শ্রীমথুরায়ৈ নমঃ।।

হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি, ন তু ভক্তিম্।
বিহিততদুন্নত-সত্রাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাম্।।

ধন্যানাং হৃদয়ানন্দং পদং সংগৃহ্যতে মুদা।
মাহাত্ম্যং মথুরাপুর্য্যাঃ সর্ব্বতীর্থশিরোমণেঃ।।

তত্রাস্যাঃ পাপহারিত্বমাদিবারাহে (৫৮ অঃ, ১)

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে ঘোরকিল্বিষৈঃ।।
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনানাং পুরুষাণাং দুরাত্মনাম্।
নরকার্ত্তিহরা দেবি মথুরা পাপঘাতিনী।। ইত্যাদি

গ্রন্থের উপসংহারে এইরূপ শ্লোক ও পুষ্পিকাদি দৃষ্ট হয়,—

গোপালোত্তরতাপন্যামন্যদপ্যস্তি কীর্ত্তিতম্।
তীর্থান্যুক্তানি ভূরীণি পুরাণেষ্বত্র মাথুরে।।
খ্যাতান্যেবাধুনা তেষু লিখিতানীহ কানিচিৎ।।
ইতি শ্রীমথুরামাহাত্ম্যসংগ্রহঃ সম্পূর্ণঃ।।
শ্রীযমুনায়ৈ নমঃ।
অমুনা যুমনা-সখ্যা মথুরায়া মধূদ্বহঃ।
মাহাত্ম্যসংগ্রহেণাদ্য মুদমাপদ্যতাং ময়ি।।
শ্রীবৃন্দাবনেভ্যো নমঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই অনুলিপি গ্রহণ করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় (Notices, 2nd. Series, P. 264, No. 265) 'মথুরামাহাত্ম্যে'র যে পুঁথির শেষাংশ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সহিত উপরি-উক্ত পুঁথির পুষ্পিকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের Noticesএ শ্রীবৃন্দাবনের পুঁথিধৃত শ্রীযমুনা-নমস্কার, উপান্ত শ্লোক ও শ্রীবৃন্দাবন-নমস্কার নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক ও পুষ্পিকা এইরূপ,—

* * গোপালতাপন্যামন্যদপ্যস্তি কীর্ত্তিতম্।
তীর্থান্যুক্তানি ভূরীণি পুরাণেষ্বত্র মাথুরে।।
খ্যাতান্যেবাধুনা তে চ লিখিতানীহ কানিচিৎ।।
ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীমন্মুথুরামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

পুষ্পিকাতে যে 'শ্রীমদ্রূপগোস্বামী' শব্দ প্রযুক্ত আছে, তাহা লিপিকারের বলিয়াই মনে হয়। কারণ, অতিমর্ত্ত্য-দৈন্য-বিগ্রহ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু—যিনি আপনাকে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থে 'বরাকরূপ', 'ক্ষুদ্ররূপ' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তিনি কখনও আপনাকে 'শ্রীমদ্রূপগোস্বামী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যে'র শক বা ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের একটি পুঁথি (No. 3487, folios 2-33) আছে। শ্রীবৃন্দাবনের পুঁথির ন্যায় এই পুঁথির উপান্ত-শ্লোকেও শ্রীযমুনা-নমস্কার ও তৎপরে পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়।

জয়পুরের শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরের পুঁথিশালায় ও শ্রীপাট-গোপীবল্লভ-পুরের শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের পুঁথিশালায় শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু-কৃত শ্রীমথুরামাহাত্ম্যের এবং শ্রীবরাহপুরাণান্তর্গত 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে'র পৃথক্ পুঁথি আছে।

Farquhar সাহেব তাঁহার 'An Outline of the Religious Literature of India' (Oxford, 1920) পুস্তকের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু-রচিত শ্রীমথুরামাহাত্ম্য, শ্রীবরাহপুরাণের ১৫২-১৮০তম অধ্যায়রূপে উহার সহিত পরবর্ত্তিকালে সংযোজিত হইয়াছে। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের এই সকল অনুমান-জাত ভ্রম শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু সঙ্কলিত 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্য'-গ্রন্থ-দর্শনে সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। আধ্যক্ষিক মনীষিগণের কেহ কেহ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র ১১।২৬০ সংখ্যায় 'বারাহে চ শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে' বাক্যের সহিত শ্রীবরাহপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিয়া নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকে। হয় ত' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মঃ ২৫।২০৮) "মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া। লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া।।"—এই উক্তি বুঝিতে ভুল করিয়াও ঐরূপ মতবাদের উদয় হইয়া থাকিবে।

আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় সনাতন শ্রৌত-প্রমাণকে আধুনিক করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহা বিমুখমোহিনী মায়া কখনও তাঁহাদের জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে করাইয়া থাকে। বস্তুতঃ 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্য' বরাহপুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর রচিত পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিতেন না এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের প্রাচীন গোস্বামিগণের গ্রন্থাগারেও বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন পুঁথি দৃষ্ট হইত না। ইহা দ্বারা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর সঙ্কলিত শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য যে শ্রীবরাহপুরাণান্তর্গত শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যের সহিত একীভূত গ্রন্থ নহে, উহা শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর পৃথগ্-ভাবে সঙ্কলিত গ্রন্থ, তাহা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। বরাহপুরাণের ১৫২-১৮০তম অধ্যায়ে শ্রীমথুরা-মণ্ডলের বিবরণ ও মাহাত্ম্যাদি পাওয়া যায়। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে কেবল শ্রীবরাহপুরাণের ঐ সকল শ্লোকই সংশ্লিষ্ট হয় নাই ঐ সকল প্রমাণ হইতে স্থানে স্থানে কতিপয় শ্লোক ও অন্যান্য শাস্ত্রের বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে' যে সকল গ্রন্থের প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা শ্লোকের সংখ্যানির্দ্দেশ-সহ প্রদত্ত হইল—

আদিপুরাণ— ৩, ১৮, ৪২, ৫৩, ৬০, ৬৫, ৬৭, ৮২, ৮৬, ১০৮, ১২৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৫৯, ১৬৬, ২১৪, ২১৯, ২৩২, ২৩৭, ২৫৪, ২৫৯, ২৬১, ২৬৭, ২৭৩, ২৭৯, ২৮১, ৩০০, ৩০৬, ৩২৪, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪৪, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮১, ৩৮২, ২৮৩, ৩৮৬, ৪০২, ৪০৮, ৪১৬, ৪২৭, ৪৩২, ৪৪৫, ৪৪৯; গোপালোত্তরতাপনী—৪৮২; গৌতমীয়তন্ত্র—১১১; নির্ব্বাণখণ্ড—২৪৪, ২৪৮; পাদ্ম—২২৭, ২২৮, ৩৩৪; পাদ্ম (কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য)—১৭২, ১৮৮, ১৯১, ২৩৫; পাদ্ম (নির্ব্বাণখণ্ড)—৫১, ৩২৩, ৩৫৭, ৩৯৪; পাদ্ম (পাতাল-খণ্ড)—১৫, ৪৫, ৫২, ৫৫, ৭৫, ৯৬, ১০৫, ১১৪, ১১৬, ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ৩১৪, ৩২০, ৩৫৫; পাদ্ম (যমুনা-মাহাত্ম্য)—১৪৩, ২৫২; পাদ্মোত্তরখণ্ড—৫০, ৮৪, ১১৩; পুরাণান্তর—২৫৮; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—৩৩০; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—১০৩, ১১০; ভবিষ্যপুরাণ—২০১; (শ্রী)ভাগবত (১ম স্কন্ধ)—৭৮, ৩৯১, ৩৯৪, ৪১৯, ৪৪৭; মথুরাখণ্ড—৭৪, ১০২, ১৫৭; যমুনা-মাহাত্ম্য (যুধিষ্ঠির-মার্কণ্ডেয় সংবাদ)—৩১১; বামন-পুরাণ —৯৮; বায়ুপুরাণ—৮১; বারাহ—৯৫, ১৬৯, ৩০৯, ৪১০, ৪২০, ৪৪১; বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—৩১৩; বিষ্ণুপুরাণ—৭৯, ১৯৬, ২৩৬, ৩২৯; বৃহদ্গৌতমীয় —৩৯৬, ৩৯৭; বৃহন্নারদীয়—৩৩১; গৌরপুরাণ—১০০, ২৫০, ২৭৫, ২৯৯, ৪০৬, ৪২৫, ৪৩১; স্কান্দ—২২৬, ২৫৭, ৩৩৮, ৩৫৩; স্কান্দ (কাশীখণ্ড)—

১৭; স্কান্দ (নির্ব্বাণখণ্ড)—১৩০; স্কান্দ (মথুরাখণ্ড)—৫৪, ৬২, ৬৬, ১১২, ১২৯, ১৩৬, ২০৫, ২১৮, ২৭৬, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৮৮, ৪০৩, ৪৩৯, ৪৪৮।

১৪। পদ্যাবলী—শ্রীরূপগোস্বামী-প্রভু এই গ্রন্থে তাঁহার সমসাময়িক ও সুপ্রাচীন বহু সাধারণ কবি (যথা—অমরু, উমাপতিধর, ক্ষেমেন্দ্র, বাণ, ভবভূতি, ময়ূর, বিশ্বনাথ, শরণ ইত্যাদি) ও মহাজনের রচিত শ্রীহরিসম্বন্ধী ও শ্রীহরিলীলা-বিষয়ক শ্লোক সমাহরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা, তথা বিভিন্ন রসে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা যে অনাদিকাল হইতে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে বৈষ্ণব-মহাজনের কণ্ঠভূষণ, এমন কি, সাধারণ কবিগণেরও কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া বিরাজমান ছিল, তাহা এই গ্রন্থ প্রমাণ করিয়া থাকে। শ্রীরূপপ্রভু শ্রীপদ্যাবলীর ১ম শ্লোকে তাঁহার গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্মুকুন্দ-
সম্বন্ধ-বন্ধুরপদা প্রমদোর্ম্মিসিন্ধুঃ।
রম্যা সমস্ততমসাং দমনী ক্রমেণ
সংগৃহ্যতে কৃতিকদম্বককৌতুকায়।।

প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণে বংশীবাদনপর বনমালী শ্রীরাধাকান্তের বন্দনা (২), তৎপরে ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ (), তৎপরে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের অন্তর্গত শ্লোকাবলী সংগৃহীত হইয়াছে,— (১) শ্রীকৃষ্ণমহিমা (৬-৭), (২) শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-মাহাত্ম্য (৮-১২), (৩) প্রেম-সৌভাগ্য (১৩-১৫), (৪) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য (১৬-৩১) (৫) শ্রীনাম-কীর্ত্তন (৩২-৩৮), (৬) শ্রীকৃষ্ণকথা-মাহাত্ম্য (৩৯-৪৫), (৭) ধ্যান (৪৬-৪৯), (৮) ভক্তবাৎসল্য (৫০), (৯) দ্রৌপদীত্রাণে তদ্বাক্য (৫১), (১০) শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের মাহাত্ম্য (৫২-৫৮), (১১) ভক্তগণের দৈন্যোক্তি (৫৯-৭১), (১২) ভক্তগণের নিষ্ঠা (৭২-৮৫), (১৩) ভক্তগণের সৌৎসুক্য-প্রার্থনা (৮৬-৯৬), (১৪) ভক্তগণের উৎকণ্ঠা (৯৭-১০৯), (১৫) মোক্ষের প্রতি অনাদর (১১০-১১৩), (১৬) শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্ব (১১৪-১১৫), (১৭) নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তি (১১৬-১১৮), (১৮) শ্রীমথুরামহিমা (১১৯-১২৪), (১৯) শ্রীবৃন্দাটবী-বন্দন (১২৫), (২০) শ্রীনন্দ-প্রণাম (১২৬-১২৭), (২১) শ্রীযশোদা-বন্দন (১২৮), (২২) শ্রীকৃষ্ণের শৈশব (১২৯-১৩৪), (২৩) শৈশবে

তারুণ্য (১৩৫-১৩৯), (২৪) গব্যহরণ (১৪০-১৪৫), (২৫) শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন (১৪৬-১৪৭), (২৬) শ্রীনন্দ-যশোদার বিস্ময় (১৪৮-১৫১), (২৭) গো-রক্ষণাদি-লীলা (১৫২-১৫৩), (২৮) গোপীগণের প্রেমোৎকর্ষ (১৫৪-১৫৫), (২৯) শ্রীগোপীগণের সহিত লীলা (১৫৬), (৩০) শ্রীগোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব (১৫৭), (৩১) শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শনে শ্রীরাধার প্রশ্ন (১৫৮-১৫৯), (৩২) সখীর উত্তর (১৬০), (৩৩) শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ (১৬১-১৭৯), (৩৪) অন্য চতুর-সখীর বিতর্ক (১৮০), (৩৫) শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রশ্ন (১৮১-১৮৪), (৩৬) শ্রীরাধার প্রতি সপরিহাস আশ্বাস (১৮৫), (৩৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগকথন (১৮৬-১৯০), (৩৮) শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-কথন (১৯১-১৯৩), (৩৯) শ্রীরাধাভিসার (১৯৪-১৯৬), (৪০) শ্রীরাধার প্রতি সখীবাক্য (১৯৭-১৯৮), (৪১) ক্রীড়া (১৯৯-২০০), (৪২) সখীগণের নর্ম্মোক্তি (২০১), (৪৩) মুগ্ধবালবাক্য (২০২), (৪৪) শ্রীরাধার সহিত দিনান্তকেলি, সখীবাক্য (২০৩), (৪৫) শ্রীরাধার সাভিলাষ-বাক্য (২০৪-২০৭), (৪৬) সখীর পরিহাস (২০৮), (৪৭) অন্যদিন অভিসারিকা, সখীবাক্য (২০৯), (৪৮) পরীক্ষণকারিণী সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২১০-২১১), (৪৯) বাসকসজ্জা (২১২), (৫০) উৎকণ্ঠিতা (২১৩-২১৪), (৫১) বিপ্রলব্ধা (২১৫), (৫২) খণ্ডিতা (২১৬), (৫৩) শ্রীরাধার বাক্য (২১৭-২২১) (৫৪) সায়ংকালে মাধব আগত হইলে সখী-শিক্ষা (২২২), (৫৫) মানিনী (২২৩-২২৪), (৫৬) শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হইলে সখীর বাক্য (২২৫), (৫৭) শ্রীকৃষ্ণের দূতীবাক্য (২২৬-২২৭), (৫৮) দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২২৮), (৫৯) কলহান্তরিতা (২২৯), (৬০) কর্কশ সখীবাক্য (২৩০), (৬১) সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২৩১-২৩৫), (৬২) সখীর অসূয়া-বাক্য (২৩৬), (৬৩) ক্ষুভিত শ্রীরাধিকোক্তি (২৩৭), (৬৪) মানজ্বরকালে চিন্তারতা শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য (২৩৮), (৬৫) তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২৩৯), (৬৬) শ্রীকৃষ্ণবিরহ (২৪০), (৬৭) শ্রীরাধাপ্রসাধন (২৪১), (৬৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য (২৪২-২৪৩), (৬৯) দিনান্তরবার্ত্তা (২৪৪-২৪৬), (৭০) পুষ্পান্বেষণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণকারিণী শ্রীরাধার প্রতি কোন রমণীয় উক্তি (২৪৭), (৭১) শ্রীযমুনাতীরে গতা শ্রীরাধার সহিত সংকথা (২৪৮-২৪৯), (৭২) শ্রীরাধাবাক্য (২৫০), (৭৩) স্বাধীনভর্ত্তৃকা (২৫১), (৭৪) শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন-দর্শন (২৫২), (৭৫) বংশীচৌর্য্য (২৫৩), (৭৬) শ্রীরাধার বাক্য

(২৫৪-২৫৫), (৭৭) সায়ংকালে শ্রীহরির ব্রজে আগমন (২৫৬), (৭৮) কোন গোপীর উক্তি (২৫৭-২৫৮), (৭৯) শ্রীরাধার সৌভাগ্য (২৫৯- ২৬২), (৮০) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীচন্দ্রাবলী-বাক্য (২৬৩), (৮১) শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ (২৬৪-২৬৭), (৮২) নৌক্রীড়া (২৬৮-২৮০), (৮৩) শ্রীরাধার সহিত শ্রীহরির বাকোবাক্য (২৮১-২৮৪), (৮৪) রাস (২৮৫-২৮৯), (৮৫) শ্রীকৃষ্ণবাক্য (২৯০-২৯১), (৮৬) শ্রীব্রজদেবীগণের উত্তর (২৯২-৯২৪), (৮৭) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাঁহাদের প্রশ্ন (২৯৫-২৯৬), (৮৮) শ্রীরাধার সখীর বাক্য (২৯৭-২৯৮), (৮৯) আকাশচারিগণের উক্তি (২৯৯-৩০০), (৯০) জলক্রীড়া (৩০১), (৯১) শ্রীরাধার সখীগণের প্রতি চন্দ্রাবলী সখীর অসূয়াপর বাক্য (৩০২), (৯২) শ্রীরাধার সখীর আকুতিপূর্ণ বাক্য (৩০৩), (৯৩) গান্ধর্ব্বার প্রতি সখীবাক্য (৩০৪-৩০৯), (৯৪) তাঁহার প্রতি কোন রমণীর উক্তি (৩১০), (৯৫) তদ্‌ভক্তার প্রতি সখীর বাক্য (৩১১), (৯৬) চন্দ্রাবলীর প্রতি সখীর বাক্য (৩১২), (৯৭) নিত্য-লীলা (৩১২ক-৩১২গ), (৯৮) শ্রীহরি মথুরায় প্রস্থান করিলে শ্রীরাধার সখীর বাক্য (৩১৩), (৯৯) শ্রীরাধাবাক্য (৩১৪), (১০০) শ্রীহরির মথুরা-প্রবেশ (৩১৫), (১০১) পুরস্ত্রীবাক্য (৩১৬-৩১৮), (১০২) শ্রীরাধার বিলাপ (৩১৯-৩৩৭), (১০৩) মথুরায় যশোদাস্মরণে শ্রীকৃষ্ণবাক্য (৩৩৮), (১০৪) শ্রীরাধা-স্মরণে শ্রীহরির বাক্য (৩৩৯), (১০৫) শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য (৩৪০), (১০৬) শ্রীউদ্ধবের দ্বারা শ্রীরাধার নিকট শ্রীহরির সন্দেশ (৩৪১-৩৪২), (১০৭) শ্রীবৃন্দাবনে গমনরত শ্রীউদ্ধবের বাক্য (৩৪৩-৩৪৬), (১০৮) ব্রজদেবী- কুলের প্রতি শ্রীউদ্ধবের বাক্য (৩৪৭), (১০৯) শ্রীউদ্ধব-দর্শনে সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (৩৪৮), (১১০) শ্রীরাধার প্রতি শ্রীউদ্ধববাক্য (৩৪৯), (১১১) শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য (৩৫০-৩৫২), (১১২) শ্রীরাধার সখীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেশ (৩৫৩-৩৬৪), (১১৩) সখীর প্রণয়যুক্ত ঈর্ষাপূর্ণ জল্পনা (৩৬৫), (১১৪) ব্রজদেবীগণের উৎকণ্ঠার সহিত সন্দেশ (৩৬৬), (১১৫) যথার্থ সন্দেশ (৩৬৭-৩৬৮), (১১৬) দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ (৩৬৯-৩৭২), (১১৭) শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর বিরহগীত (৩৭৩), (১১৮) ব্রজদেবীগণের সন্দেশ (৩৭৪-৩৭৬), (১১৯) সুদামার প্রতি শ্রীদ্বারকেশ্বর-বাক্য (৩৭৭), (১২০) স্বগৃহাদি দেখিয়া সুদামার বাক্য (৩৭৮), (১২১) কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর চেষ্টা

(৩৭৯-৩৮০), (১২২) নির্জ্জনে অনুনয়কারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (৩৮১), (১২৩) সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (৩৮২-৩৮৩), (১২৪) উপসংহারে মঙ্গলাচরণ (৩৮৪-৩৮৭)।

উপসংহারে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু জানাইয়াছেন যে,—

জয়দেব-বিল্বমঙ্গলমুখৈঃ কৃতা যেঽত্র সন্তি সন্দর্ভাঃ।
তেষাং পদ্যানি বিনা সমাহৃতানীতরাণ্যত্র।।

শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছেন; শ্রীজয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ'ও গ্রন্থাকারে প্রচারিত ছিল। কিন্তু যে-সকল কবি ও মহাজনগণের শ্লোক কোন বিশেষ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ ছিল না, সেই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অথবা শ্রুতিধর রসিক ভক্তগণের শ্রীমুখে পরম্পরায় গীত শ্লোক শ্রীরূপপ্রভু প্রণালী-বদ্ধভাবে গুম্ফিত করিয়া 'শ্রীপদ্যাবলী' রচনা করিয়াছেন।

কোন কোন পুঁথিতে ও মুদ্রিত সংস্করণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি সর্ব্বশেষ-শ্লোকরূপে অধিক দৃষ্ট হয়,—

লসদুজ্জ্বলরসসুমনা গোকুলকুলপালিকালিকলিতঃ।
মদভীপ্সিতমভিদদ্যাত্তরুণতমালকল্পপাদপঃ কোঽপি।।

শ্রীপদ্যাবলীতে শ্রীগৌর-নমস্ক্রিয়া নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে শ্রীশ্রীরূপ-গৌর-মিলনের পূর্ব্বে রচিত বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপদ্যাবলীতে 'শ্রীভগবতঃ' নামে 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'র উদ্ধার; 'শ্রীমৎপ্রভূণাম্' নামে শ্রীল সনাতনের পদ্যের উদ্ধার; শ্রীল রঘুনাথ-দাস ও শ্রীল গোপাল-ভট্টের রচিত পদ্যের উদ্ধার; 'আড়াইলে' শ্রুত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের শ্লোকের (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৯৬, ৯৮, ১০৬) উদ্ধার; শ্রীল রায়-রামানন্দ ও শ্রীল কর্ণপূর-রচিত পদ্যের উদ্ধার—প্রভৃতি কারণ শ্রীপদ্যাবলীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলনের পরে রচিত বলিয়া প্রমাণিত করে। বিশেষতঃ শ্রীপদ্যাবলীর ৩৮৩ সংখ্যা-ধৃত "প্রিয় সোঽয়ং" শ্লোকটি যে শ্রীগৌর-কৃপা-প্রাপ্তির পরে রচিত, তাহার অতি সুস্পষ্ট প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৬০-৬২, ৭২, ৭৬; অঃ ১।৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৭, ১১৪, ১১৫, ১১৭) আছে।

১৫। নাটক-চন্দ্রিকা—শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' ও 'শ্রীললিত-মাধব' নামক দুইটি নাটকের লক্ষণ, উদাহরণ ও লক্ষ্য বিষয়ের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য 'নাটক-চন্দ্রিকা' নামক নাট্যশাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'শ্রীললিত-মাধবে' নাটকের প্রায় সকল লক্ষণই বর্ত্তমান থাকায় শ্রীল রূপপ্রভু 'নাটকচন্দ্রিকা'র প্রায় প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ 'শ্রীললিতমাধব' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, শিঙ্গভূপালের রসসুধাকর বা রসার্ণবসুধাকর এবং বিশ্বনাথ-কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্য-শাস্ত্রগ্রন্থের নাম উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদের সহিত মতবিরোধহেতু গ্রন্থের অবতারণার কথা বলিয়াছেন,—

বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্ব্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ম্।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্ বিলিখ্যতে নাটকস্যেদম্।।
নাতীব-সঙ্গতত্বাদ্ ভরতমুনের্ম্মতবিরোধাচ্চ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ।।

ভরতমুনির শাস্ত্র এবং রমণীয় রসসুধাকর-গ্রন্থ দর্শন করিয়া (বিচার করিয়া) এই নাটকের লক্ষণ সংক্ষেপে রচিত হইয়াছে। ভরতমুনির মতের সহিত অনৈক্য এবং বিশেষ সঙ্গতি নাই বলিয়া সাহিত্য-দর্পণের প্রক্রিয়া প্রায়ই গৃহীত হয় নাই।

এই গ্রন্থে নাটক-লক্ষণ; দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য—এই তিন প্রকার নায়ক; খ্যাত, কপ্ত ও মিশ্র—এই তিন প্রকার ইতিবৃত্ত; প্রস্তাবনা, আশীর্ব্বাদ, নমস্ক্রিয়া ও বস্তু-নির্দেশাত্মক তিন প্রকার নান্দী; প্ররোচনা; কথোদ্‌ঘাত, প্রবর্ত্তক, প্রয়োগাতিশয়, উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিত—এই পাঁচ প্রকার আমুখ; সন্ধি; বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং প্রধান কার্য্য ও অঙ্গকার্য্য—এই পাঁচ প্রকার প্রকৃতি; আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম এই পাঁচপ্রকার অবস্থা; মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি—এই পাঁচপ্রকার সন্ধ্যঙ্গ; দ্বাদশটি বীজভেদ; ত্রয়োদশটি প্রতিমুখ-সন্ধির ভেদ; দ্বাদশটি গর্ভ-সন্ধির ভেদ; ত্রয়োদশটি বিমর্শ-সন্ধির ভেদ; চতুর্দ্দশটি নির্ব্বহণ-সন্ধির ভেদ; একবিংশতি সন্ধ্যন্তর; ষট্‌ত্রিংশৎ ভূষণ-ভেদ; চারি প্রকার পতাকাস্থান; বিষ্কম্ভক, চুলিকা, অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার, প্রবেশক প্রভৃতি অর্থোপক্ষেপকসমূহ; স্বগত, প্রকাশ, জনান্তিক, অপবারিত প্রভৃতি নাট্যোক্তি-সমূহ; অঙ্কের স্বরূপ; গর্ভাঙ্কর স্বরূপ; অঙ্কের সংখ্যা; নাটকের রস প্রভৃতি

সামান্য বিষয়ের নির্ণয়; সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষাবিধান; ভারতী, আরভটী, সাত্ত্বতী ও কৈশিকী—এই চারিটি বৃত্তি ও ইহাদের ভেদসমূহ; নর্ম্ম ও উহার ভেদসমূহ; কোন্ কোন্ রসে কোন্ কোন্ বৃত্তি প্রযোজ্য প্রভৃতি বিষয়-লক্ষণ ও উদাহরণ-সহ বর্ণিত হইয়াছে।

নাটক চন্দ্রিকার শেষে কোন উপসংহার-শ্লোক নাই, কিন্তু নিম্নলিখিতরূপ পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়,—"ইতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য-কবিতা-পরিমল-বাসিত-সজ্জন-মানস-কানন-শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবপ্রিয়পার্ষদাগ্রগণ্য-পূজনীয়-শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-প্রণীতা নাটক-চন্দ্রিকা সম্পূর্ণা।"

আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্তলিখিত নাটক-চন্দ্রিকার একটি জীর্ণ পুঁথি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

নাটক-চন্দ্রিকায় যে-সকল গ্রন্থ হইতে উদাহরণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা যে-সকল গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধনীতে শ্লোক-সংখ্যা-সহ তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

অন্যে (২৩৮), আচার্য্যাঃ (৩৩৭), কশ্চিৎ (১৩৮, ২৪৯, ২৬৫, ৪৪০, ৪৪৬, ৪৬১, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৭, ৪৯২, ৪৯৯, ৫২৩, ৫৩১), কংসবধ (৩৯), কেচন (৫৮২), কেচিৎ (৪১, ৩৩৮, ৩৯৬, ৫৮২, ৫৯৫), কেশবচরিত (৩২), কৈশ্চিৎ (৫৫৯-৬০), দশরূপক (৩৩৮), পদ্যাবলী (২০৭ নং পদ্য; ৬২৪), ভরতমুনি (২, ৫৩৬, ৬০৩), ভরতমুনিশাস্ত্র (১), মনীষিভিঃ (২৭৮), মুনি (২৮, ৬৬, ৫৫৯-৬০), রসসুধাকর (১, ৬৪৩, ৬৫০), রসসুধার্ণব (১২), ললিতমাধব (১৭৫ বার উল্লেখিত), বিদগ্ধমাধব (৩৩, ৫৭৭, ৬৪৮), বীরচরিত (২০), সাহিত্যদর্পণ (২), হরিবিলাস (৩০)।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামবিহীন নিম্নলিখিতসংখ্যক শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে,— ১১, ২২, ২৩, ৬০৫, ৬০৭, ৬০৮, ৬১০, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৬, ৬১৮, ৬১৯, ৬২১, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩২, ৬৩৪, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৬।

'নাটকচন্দ্রিকা'য় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের নাম শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও উল্লেখিত হইয়াছে,— দশরূপক (৪।৩।১৫), রসসুধাকর (২।৪।১৯), শিঙ্গভূপাল-কৃত রসার্ণবসুধাকর (২।১৩)।

'নাটকচন্দ্রিকা'য় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের নাম শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতেও উল্লেখিত হইয়াছে,— মুনি (ভরত) (নাঃ ভেঃ প্রঃ ১৪), রসসুধাকর (নায়িঃ, ভেঃ প্র ১৬; উদ্দীপন প্রঃ ২৫, ৩৫, ৩৭, ৫৩, ৫৪; ব্যভিচারি-প্রঃ ৪২), দশরূপক (নাঃ ভেঃ প্রঃ ২৭)।

নাটকচন্দ্রিকায় শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব-নাটক এবং শ্রীপদ্যাবলীর পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরূপের আর একটি নাটকগ্রন্থ 'দানকেলিকৌমুদী-ভাণিকা'র কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, 'নাটকচন্দ্রিকা' শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীললিতমাধব ও পদ্যাবলী-রচনার পরে, কিন্তু 'দানকেলিকৌমুদী', শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-রচনার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৪।৯।২২) ইঙ্গিতে শ্রীনাটকচন্দ্রিকাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে,—"বৃত্তয়োর্নাট্য-মাতৃত্বাদুক্তা নাটকলক্ষণে"। ইহার শ্রীদুর্গমসঙ্গমনা-টীকায় "নাটকলক্ষণে নাটকচন্দ্রিকাখ্যে স্বকৃতে ইতি জ্ঞেয়ম্"— এইরূপ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ১।১৩৫) 'নাটক-চন্দ্রিকা'র ৩১শ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

'শ্রীললিতমাধবে'র টীকায় (কাহারও কাহারও মতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর রচিত) 'নাটক-চন্দ্রিকা' হইতে বহু লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৬। শ্রীসংক্ষেপ- (লঘু-) ভাগবতামৃত—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে যে-সকল সিদ্ধান্ত উপন্যাসাকারে বিস্তৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু তাহাই সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-(বা লঘু-ভাগবতামৃত) গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল-সনাতন-গোস্বামিপ্রভু-কৃত গ্রন্থের প্রতি মর্য্যাদা-স্থাপনকল্পে নিজকৃত গ্রন্থকে দৈন্যবশতঃ 'লঘুভাগবতামৃত'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৪১) ইহা 'লঘুভাগবতামৃত' নামেই উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের ও পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষা-গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে প্রত্যেক স্থাপ্যসিদ্ধান্ত শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্।
যদ্ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে।।

ইদং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-সম্বন্ধাদমৃতং দ্বিধা।
আদৌ কৃষ্ণামৃতং তত্র সুহৃদ্ভ্যঃ পরিবেষ্যতে।।
নির্ব্বন্ধং যুক্তিবিস্তারে ময়াত্র পরিমুঞ্চতা।
প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে।।
যতস্তৈঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ইতি ন্যায়প্রদর্শনাৎ।
শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ।।
কিঞ্চ 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইতি ন্যায়বিধানতঃ।
অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ।।

শ্রীমৎপ্রভুপাদ (শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু) শ্রীমদ্‌বৃহদ্ভাগবতামৃতে যাহা বিস্তৃত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিব। এই ভাগবতামৃত (১) শ্রীকৃষ্ণামৃত ও (২) শ্রীভক্তামৃত ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথমে 'সহৃদয় ভক্তগণকে কৃষ্ণামৃত পরিবেশন করিতেছি। এই গ্রন্থে যুক্তি-বিস্তারের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণাদির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান প্রমাণরূপে শব্দ বা শ্রৌতবাক্যকেই স্বীকার করিয়াছি; যেহেতু মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩) এই সূত্রে শব্দেরই একমাত্র প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই বেদান্তশাস্ত্রেই 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) সূত্রে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া সুস্পষ্টভাবে তর্কের অনাদর করিয়াছেন।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চারিটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কলিযুগপাবনাবতারী, শ্রীকৃষ্ণনামপ্রেম-প্রদাতা ও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনোপাস্যবিগ্রহরূপে বর্ণনের পর তাঁহার প্রণতি ও জয়, শ্রীকৃষ্ণবংশীধ্বনির জয় ও শ্রীকৃষ্ণনামের জয় প্রদত্ত হইয়াছে।

"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে"।
"যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ।।"
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

মুখারবিন্দ-নিস্যন্দ-মরন্দ-ভর-তুন্দিলা।
মমানন্দং মুকুন্দস্য সন্দুগ্ধাং বেণুকাকলী।।
শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা 'হরে-কৃষ্ণে'তি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহবয়াঃ।।

যাঁহার কৃপায় বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচভাব দূরীভূত হয়, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর একান্ত মঙ্গল-বিধানের জন্য নানাবিধ কমনীয় অবতারসমূহ প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। যাঁহার শ্রীমুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটি অক্ষর, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপদ্ম হইতে বিনির্গত মকরন্দদ্বারা পরিপুষ্ট বেণুর কাকলী আমার আনন্দ-বর্দ্ধন করুন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরময় শ্রীকৃষ্ণনামাবলী জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জিত করিতে করিতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন।

এই গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণামৃত" ও "শ্রীভক্তামৃত" নামে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রূপ ও অবতারাবলীর বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় ভাগে তদীয়গণের আরাধনার সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শন করিয়া ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিবরণ "গৌড়ীয়" ১৮শ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যায়, ৭১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীসংক্ষেপ-(লঘু-)ভাগবতামৃত-ধৃত প্রমাণগ্রন্থ-সূচী

[ভঃ উঃ = ভক্তামৃত, উত্তরখণ্ড; কৃঃ পূঃ = কৃষ্ণামৃত, পূর্ব্বখণ্ড]

আদিপুরাণ—ভঃ উঃ ১, ৮, ১০; কূর্ম্মপুরাণ—কৃঃ পূঃ ১৬৭, ২৩২, ২৩৪; কৈশ্চিৎ—কৃঃ পূঃ ৮৬; ক্রমদীপিকাদি (অষ্টার্ণমন্ত্র)—কৃঃ পূঃ ২০৪; গীতা—কৃঃ পূঃ ১৬১, ১৮৬, ২১০, ২১১; গোপালতাপনী—কৃঃ পূঃ ২৪২, ২৮৪; গৌতমীয়াদি তন্ত্র (অষ্টাদশার্ণ মন্ত্র)—কৃঃ পূঃ ২৮৪; গৌতমীয়াদি তন্ত্র (দশার্ণ)—কৃঃ পূঃ ২৮৪; চতুর্ব্বেদশিখা—কৃঃ পূঃ ২৫০; তন্ত্র—কৃঃ পূঃ ২৮৪, ২৮৭; নারদপঞ্চরাত্র—কৃঃ পূঃ ১৬৩; নারায়ণাধ্যাত্ম—কৃঃ পূঃ ২৫২; নৃসিংহতাপনী—কৃঃ পূঃ ১৩৭; পঞ্চরাত্র—কৃঃ পূঃ ২১৭; পদ্মপুরাণ—কৃঃ পূঃ ৩৪, ৪৮, ৫১,

৫২, ৬৫, ৬৯, ৭৮, ৮২, ৮৬, ১০৯, ১২৮, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৩, ১৬৬, ১৯৬, ২০৮, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২৩৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫২, ২৫৬, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৫, ভঃ উঃ—১, ১০; পদ্মপুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ২০, ৭৭, ১৩২; পুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ১৪৫, ২৩১, ২৩২, ২৪২, ২৪৩; পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি—কৃঃ পূঃ ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫; ব্রহ্মতর্ক—কৃঃ পূঃ ২০৮; ব্রহ্মসংহিতা—কৃঃ পূঃ ১৩, ২৭, ২৮, ৩৬, ৪১, ৪৪, ১৮৭, ২১২, ২৩৮, ২৭৭; ব্রহ্মসূত্র—কৃঃ পূঃ ৮, ৯, ১৭৩; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—কৃঃ পূঃ ৪৭, ৭০, ৮৬, ২২৮, ২৩৭, ২৪৩, ২৪৬, ২৮৪, ২৮৫; ভক্তিবিবেকাদি—কৃঃ পূঃ ১৮১; ভাগবত—কৃঃ পূঃ ১, ২, ১৭, ১৮, ২৪, ২৬, ৩০, ৩১, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১৩০, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৮, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৭, ২৭১, ২৭২, ২৮২, ২৮৬, ২৮৭, ভঃ উঃ ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯; ভার্গব-তন্ত্র—কৃঃ পূঃ ২১৭; মৎস্যপুরাণ—কৃঃ পূঃ ৬১; মহাভারত (নারায়ণীয়োপাখ্যান) —কৃঃ পূঃ ৮৩; মহাভারত (শাঃ পঃ মোক্ষধর্ম্ম) - কৃঃ পূঃ ২৯, ৪৮, ১৯৩, ২৪৮, ২৪৯, ২৫১; মহাবারাহ—কৃঃ পূঃ ৫৪, ১৬৩; যামলবচন—কৃঃ পূঃ ২৬৭; রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা—কৃঃ পূঃ ১৩৯; বরাহপুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ২৪২; বায়ু-পুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ৪৩; বাসুদেবাধ্যাত্ম—কৃঃ পূঃ ২৪৮; বাসুদেবোপনিষৎ—কৃঃ পূঃ ২৪৭; বিল্বমঙ্গল—কৃঃ পূঃ ১৪৪; বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—কৃঃ পূঃ ৪৬, ৪৭, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৬, ১০৬, ১০৭, ১১০, ১৪৩, ১৯০, ২৩২, ২৩৩; বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি—কৃঃ পূঃ ৭৮, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭; বিষ্ণুপুরাণ—কৃঃ পূঃ ২৪, ৮৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ২০৮; বিষ্ণুপুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ৪৮; বৃহদ্বামন—কৃঃ পূঃ ২৮৫, ভঃ উঃ ৮; বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণাদি—কৃঃ পূঃ ২৭০; বৃহদ্বৈষ্ণব—কৃঃ পূঃ ২৪৬; শ্রুতি-স্মৃতি-মহাতন্ত্রাদি—

কৃঃ পূঃ ২১৩; সম্মোহন-তন্ত্র—কৃঃ পূঃ ২৮৪; সর্ব্বশাস্ত্র—কৃঃ পূঃ ৪৯; সাত্বততন্ত্র—কৃঃ পূঃ ২৫, ১৮৩, ১৯৭; স্কন্দপুরাণ—কৃঃ পূঃ ১৩০, ১৭৩, ২০৫, ২৩৭, ২৫৬, ২৭৫, ভঃ উঃ ২; স্বামিবাক্য—কৃঃ পূঃ ২৪, ৬৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৫৯, ১৮৪, ভঃ উঃ ৪; স্বায়ম্ভুবাগম (চতুর্দ্দশার্ণ মন্ত্র)—কৃঃ পূঃ ১৬২, ২০৪; হরিভক্তিসুধোদয়—ভঃ উঃ ১; হরিবংশ—কৃঃ পূঃ ১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৫৯, ১৬০।

একাদশ-শ্লোক—শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু—

বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল।।
অষ্টকাল-লীলা তা'তে অতি রসায়ন।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৮ ১৮-১৯)

এই একাদশ শ্লোক 'অষ্টকালিক-শ্লোকাবলী' বা 'স্মরণমঙ্গলৈকাদশম্' নামে কোন কোন পুঁথিতে * দৃষ্ট হয়। বহরমপুর হইতে প্রকাশিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের সংস্করণে এই একাদশটি শ্লোক যথাক্রমে ১ম সর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ১০ম শ্লোক; ২য় সর্গের ১ম; ৫ম সর্গের ১ম; ৮ম সর্গের ১ম; ১৯শ সর্গের ১ম; ২০শ সর্গের ১ম ও ২১শ সর্গের ১ম শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয়। 'স্মরণমঙ্গলে'র শেষের দুইটি শ্লোক, অর্থাৎ ১০ম ও ১১শ শ্লোকের কোন কোন চরণ ও শব্দের সহিত মুদ্রিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ২২শ সর্গের ১ম শ্লোকের কোন চরণের মিল এবং কোন চরণের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের উপসংহারে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভুর নিম্নলিখিত উক্তি হইতেও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র উক্তিকে অনেকে সমীচীন মনে করেন,—

* হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয় Notices of Sanskrit Mss. পুস্তকে (2nd. Series, Vo. I, P.418, No. 414) পঁয়ত্রিশ-শ্লোকাত্মক 'স্মরণমঙ্গলৈকাদশ'-নামক স্তবের একটি পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন। ইহার পুষ্পিকা এইরূপ—"ইতি শ্রীমদ্-রূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োরষ্টকালিক-শ্লোকাবলী-স্মরণ-মঙ্গলং সমাপ্তম্।" বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে ১১ শ্লোকাত্মক ইহার একটি পুঁথি (১১১৬ নং) আছে।

শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততির্ময়েয়ম্।
(শ্রীগোঃ লীঃ ২৩।৫৪)

শ্রীল রূপপ্রভুর প্রদর্শিত পথের অনুসরণে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাসমূহ আমার দ্বারা লিখিত হইল।

সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের গ্রন্থ-সমূহের উল্লেখ-কালে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৪০) গোবিন্দবিরুদাবলী ও তাহার লক্ষণের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও 'স্তবমালা'র অন্তর্গত শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলীর তৎকৃত টীকার উপোদঘাতে বলিয়াছেন,—

অধীত্য বিরুদ্ধাবল্যা লক্ষণং গ্রন্থকৃৎকৃতম্।
এতাং চেৎ পঠতি প্রাজ্ঞস্তদা বোধোঽস্য পুষ্কলঃ।।
সামান্যবিরুদাবল্যা গোবিন্দবিরুদাবলৌ।
যোঽভ্যধায়ি বিশেষস্তৈঃ স তাবদিহ লিখ্যতে।।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন,—

গোবিন্দবিরুদাবলী, লক্ষণ তাহার।
দোঁহে এক, এহেতু লক্ষণে এ প্রচার।।
(শ্রীভঃ রঃ ১।৮২১)

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নমস্ক্রিয়াদ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন,—

প্রণম্য পরমানন্দং বৃন্দারণ্য-পুরন্দরম্।
লিখ্যতে বিরুদাবল্যাঃ সংক্ষেপাল্লক্ষণং ময়া।।
কলিকা-শ্লোক-বিরুদৈর্যুতা বিবিধ-লক্ষণৈঃ।
কীর্ত্তি-প্রতাপ-শৌটীর্য্য-সৌন্দর্য্যোন্মেষশালিনী।।
কলিকাদ্যন্তসংসর্গিপদ্যা দোষ-বিবর্জিতা।
শব্দাড়ম্বর-সম্বন্ধা কর্ত্তব্যা বিরুদাবলী।।
বুৎপন্নঃ সুস্থিরমতির্গতগ্লানির্গলস্বনঃ।
ভক্তঃ কৃষ্ণে ভবেদ্ যঃ স বিরুদাবলি-পাঠকঃ।।
(১-৪ শ্লোক)

শ্রীল রূপপ্রভু এই গ্রন্থে প্রধানতঃ (১) কলিকা, (২) শ্লোক ও (৩) বিরুদের লক্ষণ প্রকার-ভেদ ও উদাহরণ-সহ বলিয়াছেন। তালনিয়ন্তা পদ-সমূহকে 'কলা' ও কয়েকটি কলার সমষ্টিকে একটি 'কলিকা' বলা হয়। কলার পরিমাণ উর্দ্ধে ৬৪টি ও ন্যূনকল্পে ১২টি। কলিকায় সংযুক্ত বর্ণের নিয়ম—মধুর, শ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, শিথিল ও হ্লাদী। এই পাঁচটির প্রত্যেকটি হ্রস্ব ও দীর্ঘবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া দশ প্রকার। কলিকার আদিতে ও অন্তে নায়কের গুণোৎকর্ষসূচক শ্লোক থাকে। গুণোৎকর্ষাদি বর্ণনকে কবিগণ 'বিরুদ' বলেন। বিরুদের কলিকার শেষে 'ধীর', 'বীর' প্রভৃতি শব্দ থাকে। কলিকা, শ্লোক ও বিরুদের প্রকার-ভেদ-সমূহ সংশ্লিষ্ট chartএ প্রদর্শিত হইল।

গ্রন্থের উপসংহার—

রম্যয়া বিরুদাবল্যা প্রোক্ত-লক্ষণ-যুক্তয়া।
স্তূয়মানঃ প্রমুদিতো বাসুদেবঃ প্রসীদতি।।
যঃ স্তৌতি বিরুদাবল্যা সল্লক্ষণ-বিহীনয়া।
পঠন্তমপি তং সাধু নৈবাঙ্গীকুরুতে হরিঃ।।

গ্রন্থের ১১শ শ্লোকে 'কেচিৎ', ৯২তম শ্লোকে 'ভুজগেশ্ব পিঙ্গল' ও ৯৩তম শ্লোকে 'ষন্মুখ'—এই তিনটি গ্রন্থকারের নাম দৃষ্ট হয়।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এই গ্রন্থে 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী' হইতে প্রায় সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী' টীকায়, বিশেষতঃ তাহার উপোদঘাতে 'বিরুদাবলী-লক্ষণ' হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর 'সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ' 'শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী'র অনুসরণে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীগোপালবিরুদাবলী' ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর 'নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী' রচনা করেন।

শ্রীউপদেশামৃত—একাদশ-শ্লোকাত্মক উপদেশগ্রন্থ সাধক-অবস্থা হইতে সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত ভজনের উপদেশ ইঙ্গিত এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় বা সাধারণ সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর কাব্য-নাটক-অলঙ্কারাদি গ্রন্থের যেরূপ ভোগানুসন্ধিমূলক

আদর ও আলোচনার চেষ্টা দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থের প্রতি সেরূপ আদর দৃষ্ট হয় না। এমন কি, কেহ কেহ ইহাকে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বিরচিত গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিতেও সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, ইহাতে ষড়্‌বেগ ও যাবতীয় অন্যাভিলাষকে যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদানমুখে শুদ্ধভক্তির বাস্তব অনুশীলনের উপদেশসমূহ বিবৃত হইয়াছে। ইহার ১ম শ্লোকে ভক্তির প্রতিকূল ছয় বেগ দমনের উপদেশ বা প্রকৃত ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিত্বের স্বরূপ নির্ণয়, ২য় শ্লোকে— (১) অত্যাহার, (২) প্রয়াস, (৩) প্রজল্প, (৪) নিয়মাগ্রহ, (৫) বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ ও (৬) লৌল্য—এই ছয় প্রকার ভক্তি-প্রতিকূল বৃত্তি এবং ৩য় শ্লোকে— (১) উৎসাহ, (২) নিশ্চয়, (৩) ধৈর্য্য, (৪) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন, (৫) অসৎসঙ্গত্যাগ ও (৬) সাধুগণের বৃত্তির অনুসরণরূপ ছয়প্রকার ভক্তি-অনুকূল বৃত্তির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে; ৪র্থ শ্লোকে সাধুর সহিত ষড়্‌বিধভাবে ভক্তিপরিপোষক সঙ্গ; ৫ম শ্লোকে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার ও সঙ্গ; ৬ষ্ঠ শ্লোকে বৈষ্ণবে প্রাকৃতদৃষ্টি নিষেধ; ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী; ৮ম শ্লোকে ভজনপ্রণালী ও ভজনকারীর বাসযোগ্য স্থান ও আচরণ; ৯ম শ্লোকে ভজনস্থান-সমূহের মধ্যে তারতম্য-বিচার ও শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-স্থাপন; ১০ম শ্লোকে ভজনকারিগণের তারতম্য-নির্ণয়ে শ্রীরাধাকুণ্ড-আশ্রয়কারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা; ১১শ শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটি এই,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।

অর্থাৎ যে পণ্ডিত ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ—এই ষড়্‌বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।

শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে সুবর্ণময় হংসমূর্ত্তিধারী ভগবান্ ব্রহ্মার যে উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
বিধিৎসাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেদুদীর্ণাং-
স্তং মন্যেঽহং ব্রাহ্মণং বৈ মুনিং চ।।

(শ্রীমঃ ভাঃ, শান্তিপর্ব্ব, অঃ ৩০৫।১৪,
কুম্ভঘোণ সং, ইং ১৯০৭)

যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, আমি তাঁহাকেই যথার্থ 'ব্রাহ্মণ' ও 'মুনি' বলিয়া মনে করি।

উপদেশামৃত-গ্রন্থ শুদ্ধভক্তিরাজ্যের পথিকগণের অপরিহার্য্য আলোকস্তম্ভ। এই গ্রন্থ যে-স্থানে প্রচারিত নাই, তথায় শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে ও আচরণে নানাপ্রকার অজ্ঞানান্ধকার ও অসামর্থ্যের যবনিকা উপস্থিত হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে এই 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থ আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র ৯ম বর্ষে ইং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে (১৩০৪ বঙ্গাব্দে) শ্রীরাধারমণঘেরার শ্রীরাধারমণদাস-গোস্বামি-বিরচিত 'উপদেশামৃত-প্রকাশিকা টীকা' (সংস্কৃত) ও স্বকৃত 'পীযূষবর্ষিণীবৃত্তি'র (বঙ্গভাষায় তাৎপর্য্যানুবাদ) সহিত প্রচার করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত টীকার উপসংহারে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদ্-গোস্বামি-বনমালিনঃ।
তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুখায়াত্মনিবেদিনঃ।।
স্বস্য ভজনসৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ।
ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুম-নিবাসিনা।।
প্রভোশ্চতুঃশতাব্দে হ দ্বাদশাব্দাধিকে মৃগে।
রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ পীযূষবর্ষিণী।। *
শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রার্পণমস্তু।।

---

* ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামি মহাশয়ের সহিত শ্রীবৃন্দাবন হইতে 'শ্রীপ্রভুনাথ মিশ্র'-নামক এক স্নিগ্ধস্বভাব ব্রাহ্মণ শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে আসিয়া

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামি মহোদয় এই উপদেশামৃতের একটি হস্তলিখিত পুঁথি তাঁহার বংশের প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে অনুলিপি করিবার জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে প্রদান করেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে (ইং ২৮।১০।৪০) এই বর্ষীয়ান পণ্ডিত মহোদয়ের সহিত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে তাঁহার পুঁথিশালায় যখন আমরা সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাদিগকে বলেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে যখন তিনি উপদেশামৃতের পুঁথিটি প্রদান করেন, তখন শ্রীল ঠাকুর উপদেশামৃতের শ্লোকাবলীপাঠে এতদূর চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ঐ পুঁথিটি শিরে ধারণ করত প্রেমে পুলকিত হইয়া ইহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া পুনঃ পুনঃ গদগদবাক্যে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীজগমোহনলাল শ্রীবাস্তব মহাশয়ের দ্বারা পণ্ডিতবর মধুসূদনদাস গোস্বামি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ব্রজভাষায় কৃত অনুবাদের সহিত যে উপদেশামৃত ১৯৮১ সম্বতে (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীউপদেশামৃতকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর বিরচিত গ্রন্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামি মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত গোস্বামি মহাশয় শ্রীউপদেশামৃতকে নিশ্চিতভাবে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুরই রচিত গ্রন্থ বলিয়া জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাটগোপীবল্লভপুরে শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামি মহাশয়ের পুঁথিশালায় শ্রীল রূপপ্রভু-কৃত 'শ্রীউপদেশামৃতে'র একটি পুঁথি আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Notice-এর (Vol. VIII, Calcutta, 1886, No. 2560, P. 13) মধ্যেও ইহাকে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুরই বিরচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন। উক্ত বিবরণানুসারে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রতি শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর ৪৩ শ্লোকাত্মক উপদেশই 'উপদেশামৃত' নামে পরিচিত। মিত্রের বিবরণে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রাপ্ত উপদেশামৃতের ১ম শ্লোক ও শেষ শ্লোকের সম্পূর্ণ মিল আছে এবং উহার পুষ্পিকা এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতমুপদেশামৃতং সমাপ্তম্।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তিনি একদিন অকস্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যোতির্ম্ময় রুক্মবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হন।

মিত্রের বিবরণে প্রথম ও অন্তিম শ্লোক এবং পুষ্পিকামাত্র উদ্ধৃত হওয়ায় অতিরিক্ত শ্লোকগুলির সম্বন্ধে জানা যায় না। শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রাপ্ত পুঁথির বা শ্রীরাধারমণঘেরার মুদ্রিত সংস্করণেও অতিরিক্ত শ্লোক নাই। সর্ব্বত্রই একাদশটি শ্লোক প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রীউপদেশামৃতকে বাস্তব শ্রীহরি-ভজনকারিগণের পক্ষে এতটা অমূল্য সম্পদ্ বিচার করিয়াছিলেন যে, তিনি উপদেশামৃতের কেবলমাত্র পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, 'শ্রীউপদেশামৃতভাষা'-নামে ইহার পদ্যানুবাদ এবং স্ব-রচিত 'শরণাগতি'র 'ভজন-লালসা'-শীর্ষক প্রকরণে ঐ সকল শ্লোকের অনুবাদ সুললিত ত্রিপদীচ্ছন্দে সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিবার জন্য রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র ১০ম ও ১১শ বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১৩০৫-১৩০৬, ইং ১৮৯৮-৯৯) উপদেশামৃতের ২য় ও ৩য় শ্লোক-অবলম্বনে ভক্তির ছয়টি অনুকূল ও ছয়টি প্রতিকূল বিষয় লইয়া ১২টি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপের নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে শ্রীগৌরসুন্দরের নমস্ক্রিয়া আছে,— (১) বৃহৎ-শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (মঙ্গলাচরণ, ১ম শ্লোক); (২) 'স্তবমালা'র অন্তর্গত তিনটি 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক'; (৩) শ্রীবিদগ্ধমাধব (২য় নান্দী-শ্লোক); (৪) শ্রীললিতমাধব (প্রস্তাবনা, ৪র্থ শ্লোক); (৫) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২); (৬) পদ্যাবলী ('শ্রীশিক্ষাষ্টক' ও কোন কোন পুঁথিতে ৯৪, ১৪২, ১৪৩ সংখ্যক পদ্য—'শ্রীভগবতঃ'-নামে উদ্ধৃত); (৭) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত (মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক)।

শ্রীরূপের নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর নমস্ক্রিয়া বা নামোল্লেখ আছে,— (১) হংসদূত (১৪১ শ্লোক—'সাকরতয়া'); (২) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথিবিধি (১ম শ্লোক—'প্রভুণাং বিনিদেশতঃ'); (৩) 'স্তবমালা'র অন্তর্গত 'গীতাবলী' (৪২টি গীতের শেষে 'সনাতন' নাম); (৪) শ্রীললিতমাধব (১।৭—'সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ'); (৫) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৩,৫); (৬) পদ্যাবলী (২৩৩ সংখ্যক পদ্য—'শ্রীমৎপ্রভূণাম্'); (৭) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত (মঙ্গলাচরণ, ৫ম শ্লোক)।

[১৪]

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত গ্রন্থ ও স্তবাদি

উপরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু, শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু, শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের উল্লেখিত যে-সকল গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর নামে আরও বহু গ্রন্থ ও স্তবাদি আরোপিত হইয়া থাকে। Catalogus Catalogorum এ ও অন্যান্য কোন কোন পুস্তকে অন্যান্য গ্রন্থের সহিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল-রঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভু-রচিত কয়েকটি গ্রন্থ ও স্তব ভুলক্রমে শ্রীরূপের নামে আরোপিত হইয়াছে। ঐসকল ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী হইতে শ্রীরূপের নামে যে-সকল গ্রন্থ ও স্তবাদি পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Libraryর Triennial Catalogueএ (vol. IV, Part I, Sanskrit A, Madras, 1927) শ্রীল রূপপ্রভুর নামে নিম্নলিখিত স্তব-সমূহ আরোপিত হইয়াছে।

একান্তনিকুঞ্জবিলাসঃ [R. No. 3177 (b)]—

আরম্ভ ঃ—

ধৃতকনকসুগৌরস্নিগ্ধমেঘৌঘনীল-
চ্ছবিভিরখিলবৃন্দারণ্যমুদ্ভাসয়ন্তৌ।
মৃদুলনবদুকূলে নীলপীতে বসানৌ
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।।

শেষ ঃ—

স্তবমিমমতিরম্যং রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্র-
প্রমদভরবিলাসৈরদ্ভুতং ভাবযুক্তঃ।
পঠতি য ইহ রাত্রৌ নিত্যমব্যগ্রচিত্তো
বিমলমতি স রাধালীষু সখ্যং ভজেত।।

পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োরেকান্তনিকুঞ্জবিলাসে শ্রীরূপকৃতং সম্পূর্ণম্।

পঞ্চশ্লোকী [R. No. 3053 (a-13)]—পুঁথির উপরি-উক্ত বিবরণীতে ইহার প্রথম শ্লোকরূপে শ্রীউপদেশামৃতের "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং" এই পঞ্চম শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইহার শেষ শ্লোকটি এই,—

হা কৃষ্ণ নীরদরুচে তটিদারকান্তা-
পাঙ্গপ্রসাদপরিফুল্লমুখারবিন্দ।
রাগে লসন্তমমুয়াশ্রকবিন্দুজালং
ত্বাং বীজয়ামি ললিতাদ্যনুকম্পয়ৈব।।

পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিতা পঞ্চশ্লোকী সমাপ্তা।

প্রেমান্ধস্তবঃ [R.No. 3053 (u)]—

আরম্ভ ঃ—

কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে।।

শেষ ঃ—

আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেকহতোঽপ্যহম্।
ত্বৎকারুণ্যপ্রতীক্ষোঽস্মিন্ প্রসীদ ময়ি মাধব।।

পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতঃ প্রেমান্ধস্তবঃ সম্পূর্ণঃ।

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা [R. No. 3053 (a-56)]—পুঁথির বিবরণানুসারে ইহাতে অনুষ্টুভ্ছন্দে শ্রীরাধিকা ও শ্রীললিতাদেবীর কথোপকথনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে।

পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতে শ্রীরাধাললিতা-সংবাদে উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা সম্পূর্ণা।

বৈষ্ণবপূজাবিধানম্ [R. No. 3053 (a-48)]—

আরম্ভ ঃ— প্রথমতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণম্, আসনোপরি উপবিশ্য সিদ্ধ-দেহং ভাবয়িত্বা শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, শঙ্খ-প্রক্ষালনম্, শঙ্খে জলং পূরয়িত্বা শঙ্খে তীর্থাবাহনম্।

* * * *

অনেন মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং সংপূজ্য, অনেন মন্ত্রেণ বামহস্তেন ঘন্টা-বাদনং, মূলমন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণায় পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ।

শেষ ঃ— ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

আদৌ চতুঃপাদতলৈকদেশে দ্বির্নাভিদেশে মুকমণ্ডলৈকম্।
সর্ব্বাঙ্গদেশে শুচিসপ্তবারমারাত্রিকং কৃষ্ণমিমং প্রকুর্য্যাৎ।।

* * * *

তদনন্তরং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোপরি শঙ্খমারাত্রিকং কুর্য্যাৎ, শঙ্খস্থ-তোয়ং স্বশিরসি প্রক্ষিপ্য বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপয়েৎ।

পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং বৈষ্ণবপূজা-বিধানাং সমাপ্তম্।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র Notices of Sanskrit Mss. পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠায় শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত 'গঙ্গাষ্টক'-স্তব (No. 1628) ও ৯ম খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় 'সাধন-পদ্ধতি' (No. 2842) নামক দুই পত্রাত্মক একটি পুস্তিকার পুঁথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

স্তবমালার অন্তর্গত শ্রীযমুনাষ্টকের ন্যায় 'শ্রীগঙ্গাষ্টক' তূণকচ্ছন্দে রচিত। ইহা শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর আত্মজা শ্রীগঙ্গাদেবীর স্তোত্র। ইহার আরম্ভ এইরূপ,—

কৃষ্ণপাদপদ্মযুগ্মভক্তিপূরবর্দ্ধিনী
নামকৈকদেশযোগপাপরাশিনাশিনী।
তাপবৃন্দতাপিতান্তরর্থহেতুশোধিনী
মাং পুণাতু সর্ব্বদৈব রোহিণেয়-নন্দিনী।।

শেষ ঃ—

তুষ্টিদেন চাষ্টকেন যে স্তবন্তি চেশ্বরীং
সস্মিতৎ বিহায় সোহপি কালচক্র * শ্বরীম্।
যঃ স্ত * * সদ্বিরক্ত চ * * * নিজেপ্সিতং
নিত্যসিদ্ধহেভাবনিত্যবস্তু-সেবিতম্।।

পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিত-শ্রীনিত্যানন্দসুতা-গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

সাধন-পদ্ধতি ঃ—উক্ত পুঁথির বিবরণানুসারে ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং ইহাতে ১০০টি শ্লোক আছে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাধন-প্রকার-সম্বন্ধে উপদেশ এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু।

আরম্ভ ঃ—

ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুমেবমনুগং শ্রীমচ্ছচীনন্দনং
প্রেষ্ঠং দাসমথ প্রকাশমপি তদ্ধামৈকদেশস্থিতম্।
সংসেব্যেতদনুজ্ঞয়া পরপরাদীংস্তাদৃশান্ ভাবয়ন্
শ্রীচৈতন্যকৃপাগুরূক্তিপশুপী-নাম্না ব্রজং প্রব্রজেৎ।।

শেষ ঃ—

* * * *

ভ্রমরালিদুকূলধারিণী মুদিতা মেহস্তু বিলাসমঞ্জরী।।
পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীরূপগোস্বাম্যুক্ত-সাধনপদ্ধতিঃ।

A. V. Kathvate -এর Report on the search of Sanskrit Mss.- (1904) পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় শ্রীল রূপপ্রভুর নামে আরোপিত 'সাধনামৃত'নামক একটী পুঁথির (No. 314) নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

Rudolf Roth-এর Tubingen Catalogue-এ শ্রীল রূপপ্রভুর নামে আরোপিত 'শিক্ষাদশক' নামক একটী পুঁথির উল্লেখ আছে।

'শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী মাসিক পত্রিকা'র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ৪র্থ ভাগে ও ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১ম ভাগে "শ্রীশ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা উক্তং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ সহস্রনামস্তোত্রম্" প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার প্রারম্ভে ১ম হইতে ১১শ শ্লোক শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর শ্রীল রূপপ্রভু-সমীপে গমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-সহস্র জিজ্ঞাসা এবং তদুত্তরে শ্রীরূপের শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের হেতু ও সহস্রনাম-কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১২শ শ্লোক হইতে ১৩৯ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দরের সহস্রনাম কথিত হইয়াছে।

উক্ত পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২য় ও ৩য় ভাগে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর নামে আরোপিত নিম্নলিখিত স্তব-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল,—

শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টক

আরম্ভ—

শ্রীগৌড়দেশ-সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেতি রম্যে পুরুপুণ্যমযাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।

শেষ—

এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন-পাদপদ্মে সুদুর্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ।।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনাষ্টকং

আরম্ভ—

মুকুন্দমুরলীকল-শ্রবণফুল্লহৃদ্বল্লরী
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।
কলিন্দগিরি-নন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী।।

শেষ—

ইদং নিখিল-নিষ্কুটাবলি-বরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
গুণস্মরণকারি যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।
বসন্ ব্যসনমুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশী রতিমবাপ্য বিক্রীড়তি।।

Madras Govt. Oriental Mss. Library-র পুঁথি হইতে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া কথিত 'শ্রীগদাধর- পণ্ডিতগোস্বামি-দশকে'র প্রতিলিপি গৃহীত হইয়া ২০শ খণ্ড 'গৌড়ীয়ে'র ৪৮-৪৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের পুঁথি-শালায় শ্রীরূপের নামে আরোপিত নিম্নলিখিত দুইটি গ্রন্থের পুঁথি আছে—(১) 'উপাসনাবিধি' (লিপিকাল—১৯১০ সংবৎ, ১৮৫৩ খৃঃ, ৪ পত্র); (২) শ্রীরূপ-মুখবিগলিত 'প্রেমসম্পুট' (লিপিকাল ১৬০৬ শকাব্দ, ১৬৮৪ খৃঃ, ৮ পত্র)।

এতদ্ব্যতীত 'হরেকৃষ্ণমহামন্ত্রার্থনিরূপণ', 'শ্রীতুলস্যষ্টক', 'শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টক', 'শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক', 'শ্রীবৃন্দাবনধ্যান' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ ও স্তব শ্রীরূপের নামে আরোপিত হইয়া থাকে। কোন কোন পুঁথির তালিকায় শ্রীরূপের কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও স্তব ভিন্ন নামে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ তাহাদের স্বকপোল-কল্পিত রূপানুগ-বিরুদ্ধ অসৎ মতবাদকে শ্রীল রূপপ্রভুর নামের সহিত জড়িত করিবার দূরভিসন্ধিমূলে আধুনিক কালে রচিত কয়েকটি বাঙ্গালা পুস্তক তাঁহার নামে আরোপ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর নামেও এইরূপ কয়েকটি পুস্তক আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তিরসের আচার্য্য শ্রীগোস্বামিবৃন্দ যে কখনই এই সকল পুস্তক রচনা করিতে পারেন না, তাহা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

'পঞ্চরসিক' ও সহজিয়া-মতাবলম্বিগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মূল আচার্য্য শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর নামে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রভৃতি আরোপ করিয়া থাকে। প্রকৃত শ্রীরূপানুগগণের দাসগণ তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিবেন।

[১৫]

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর সূচকাবলী

(১)

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।

গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,

জানাইতে হেন আর নাই।।

বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপম,

সর্ব্ব-অবতারী নন্দ-সুত।

তাঁ'র কান্তা-গণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,

তাঁ'র সখীগণ-সঙ্গযূথ।।

রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা।
এমন দয়ালু, ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁ'র পদ করহ ভাবনা।।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজগ্রন্থ করি' যত,
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি।।
রাধাকৃষ্ণ-রস-কেলি, নাট্যগীত পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি'।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী।।
চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ-বিলাপ।
সে-সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ-হিয়ে তাপ।।

(২)

যঙ্ কলি-রূপ শরীর না ধরত।
তঙ্ ব্রজ-প্রেম- মহানিধি-কুঠরিক,
কোন্ কপাট উঘারত।।
নীর ক্ষীর হংসন, পান বিধায়ন,
কোন্ পৃথক্ করি' পায়ত।
কো সব ত্যজি' ভজি' বৃন্দাবন,
মনোরাজি-অরবিন্দ।

সো মধুকর বিনু, পান কোন্ জানত,
বিদ্যমান করি' বন্ধ।।
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন,
কো জানত ব্রজ-নীত।
কো জানত, রাধা-মাধব-ররিত,
কো জানত সোই প্রীত।।
যাকর চরণ- প্রসাদে সকল জন,
গাই' গাওয়াই' সুখ পাওত।
চরণ-কমলে, শরণাগত মাধো,
তব মহিমা উর লাগত।।

(৩)

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন, বচন রসায়ন,
আনন্দহুকে গাগর।।
অতি গম্ভীর, ধীর করুণাময়,
প্রেমভকতিকে আগর।
উজ্জ্বল-প্রেম- মহামণি প্রকটিত,
দেশ গৌড় বৈরাগর।।
সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত-রঞ্জন,
বৃন্দাবন-নিজ-নাগর।
কীরিতি বিমল যশ, গুণ তঁহি মাধো,
সতত রহল হিয়ে জাগর।।

শ্রীসনাতন গোস্বামি

[১]

পূর্ব্বপরিচয়

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক-বর ষড়্গোস্বামী প্রভুপাদগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ।

কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বসম্মানিত বলিয়া তদ্দেশাধিপতি মহারাজ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ 'জগদ্‌গুরু'-নামে খ্যাত ছিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধদেব। ইনিও বেদশাস্ত্রে অসামান্য পণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম 'শ্রীরূপেশ্বর' ও 'শ্রীহরিহর'। প্রথম ভ্রাতা শাস্ত্রে ও দ্বিতীয় ভ্রাতা শস্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া ভার্য্যাসহ পৌরস্ত্যদেশে আগমন করিয়া রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম 'পদ্মনাভ'। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটি-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমুকুন্দদেব। ইঁহার পুত্র শ্রীকুমারদেব। নৈহাটিতে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটি ও বাক্‌লার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি একটী বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভই বৈষ্ণববিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীসনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ সর্ব্বকনিষ্ঠ। কুমারদেবের স্বধামপ্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড়রাজধানীর নিকট কোনও ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-বলে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীসনাতন ও রূপে-গুণে অতুলনীয় শ্রীরূপ গৌড়রাজ-সভায় দুইটী সর্ব্বপ্রধান পদ অধিকার করিয়া যথাক্রমে 'সাকর মল্লিক' ও 'দবিরখাস' উপাধি লাভ করেন। সাকর মল্লিক ও দবিরখাস গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজকার্য্য-পরিচালনের দুইটী হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন।

[২]

আবির্ভাব-কাল

শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দনির্ণয়"-শীর্ষক বিবরণে এবং শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের স্বধামগত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণে ও শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণে একই প্রকার তারিখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবকাল—১৪১০ শকাব্দ, ১৫৪৫ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ; গৃহে অবস্থান—২৭ বৎসর (শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভ এবং গৃহ ও রাজমন্ত্রিত্ব-ত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত); ব্রজে স্থিতি—৪৩ বৎসর; প্রকটস্থিতি—৭০ বৎসর; অন্তর্দ্ধান—১৪৮০ শকাব্দ, ১৬১৫ সম্বৎ, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়,—শ্রীসনাতন অধ্যাপকবর বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্ব্ব-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মান্তিকে আগমনলীলা বাহ্যতঃ প্রকট করিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বশাস্ত্রচর্চ্চায়, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু 'লঘুতোষণী'র উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টামেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ।।
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাম্।।"

যিনি প্রথম বয়সে স্বপ্নে জনৈক বিপ্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বপ্নভঙ্গে জাগরণকালে প্রভাতেও সেই স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—যিনি তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, সেই 'শ্রীসনাতন গোস্বামী' নামে বিখ্যাত মহাজনেরই লিখিত এই গ্রন্থ।

এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ আছে,—

শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁ'র অতিশয় প্রীত।।
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।
শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর।।
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।
প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা।।
পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষচিতে।
মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত-সমুদ্রেতে।।
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিল।
তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৫৩১-৩৫)

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্।।
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্।।"

আমি মদীয় অধ্যাপক বিদ্যাবাচস্পতি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গুরুবর্গকে এবং গৌড়দেশ-বিভূষণ বিদ্যাভূষণপাদকে বন্দনা করিতেছি। আমি রসপ্রিয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও বাক্‌চতুর অধ্যাপক শ্রীরামভদ্রকে বন্দনা করি।

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা-অনুসারে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বরের দরবারে রাজমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা শ্রীল সনাতনের পূর্ব্ব হইতেই ছিল না। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ঐ কার্য্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

সনাতন-রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে।।

গৌড়ের রাজা যবন, অনেক অধিকার।
সনাতন-রূপে আনি' দিলা রাজ্যভার।।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।
এ দুই-প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তাঁ'র।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৫৮১-৫৮৩)

রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালেই শ্রীল সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের চর্চ্চা করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার জন্য সতত ব্যাকুল ছিলেন। সময় সময় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট দৈন্যপত্রী লিখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন সময় শ্রীসনাতনকে একটী শ্লোকে উত্তর প্রদান করেন; সেই শ্লোকটী এই,—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।।"

তাৎপর্য্য এই,—পরপুরুষানুরক্তা রমণী যেরূপ গৃহকর্ম্মসমূহে অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াও সর্ব্বদা অন্তঃকরণে কান্তের স্মরণের দ্বারা নবনবসঙ্গরস আস্বাদন করে, তদ্রূপ রাগমার্গীয় ভক্ত বাহ্যে বিষয়ীর ন্যায় লোকব্যবহার প্রদর্শন করিয়াও অন্তরে অনুক্ষণ নিজ ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গস্মৃতিতে সংলগ্ন থাকেন।

[৩]

শ্রীচৈতন্যের দর্শন-লাভ

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই নিজভৃত্য শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপকে দর্শন দান করিয়া স্বপদান্তিকে আকর্ষণ করিবার জন্য একটী ভঙ্গী করিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন-গমনের ছল করিয়া বিজয়া দশমী তিথিতে নীলাচল হইতে গৌড়দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পানিহাটি, কুমারহট্ট ও কুলিয়া হইয়া মালদহ-জেলার অন্তর্গত রামকেলি-গ্রামে শুভবিজয় করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশের কথা শুনিয়া ও স্বচক্ষে তাঁহার প্রভাব দেখিয়া গৌড়েশ্বর বাদশাহেরও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন রামকেলিতেই অধিকাংশ সময়ই অবস্থান করিতেন। তাঁহারা রামকেলি-গ্রামে অবস্থান করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রচর্চ্চা এবং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে যথাবিহিত সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ বর্ণনা আছে,—

গৌড়ে রামকেলি-গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস।।
ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানাদেশ হৈতে।।
গায়ক-বাদক-নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ।।
নিরন্তর করেন অনেক অর্থব্যয়।
কোনরূপে কারু অসম্মান নাহি হয়।।
সদা সর্ব্বশাস্ত্রে চর্চ্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন-স্থাপন।।
ন্যায়-সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন-রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়।।
ঐছে সবে সর্ব্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা।
সনাতন-রূপ-গুণ গায় সুখ পাঞা।।
সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ।
কর্ণাট-দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ।।
সনাতন-রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে।।
ভট্টগোষ্ঠী-বাসে 'ভট্টবাটী'-নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বমতে অনুপম।।
রামকেলি-গ্রামে সে-সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার-কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া।।
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গণে রূপ-সনাতন।
যেরূপ আদরের, তাহা না হয় বর্ণন।।

নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা' সবারে ভক্তি কত।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৫৮৬-৯৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি-গ্রামে অহৈতুকী কৃপা করিয়া পদার্পণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন রাজপুরুষের বেষ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচন্ন-বেষে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপস্থ হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট অভিগমন করিলেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলে দুই ভাই দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক গলবস্ত্র-কৃতাঞ্জলি হইয়া দৈন্যরোদন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে ভূমি হইতে উঠিতে বলিলেন। তাঁহারা করজোড়ে স্তব করিলেন,—

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয়।।
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে, প্রভু, কহিতে বাসি লাজ।।
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম!
পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার।
আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর।।
জগাই-মাধাই, দুই করিলে উদ্ধার।
তাহাঁ উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার।।
ব্রাহ্মণ-জাতি তা'রা, নবদ্বীপে ঘর।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর।।
সবে এক দোষ তা'র, হয় পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেই তোমার।।

তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন।
সেই নাম হইল তা'র মুক্তির কারণ।।
জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন।।
ম্লেচ্ছ-জাতি, ম্লেচ্ছ-সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।।
মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিঞা।
কু-বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিঞা।।
আমা' উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে।।
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ-বল।
'পতিতপাবন'-নাম তবে সে সফল।।
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন দয়াময়।
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়।।
মোরে দয়া করি' কর স্ব-দয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল।।
ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তত দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ।।
আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ।।
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে।।
ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্।।
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১৮৮-২০৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্যাত্মক স্তুতি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—

* * *

"তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস।।
আজি হৈতে দুঁহার নাম—'রূপ' 'সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।।
দৈন্যপত্রী লিখি' মোরে পাঠা'লে বার বার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার।।
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্বারে।
তোমা' শিখাইতে শ্লোক কহিলুঁ বারে বারে।।
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।।
গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, 'কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে'।।
ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে।।
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।২০৭-২১৫)

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নিজজন 'দুই ভ্রাতা'র বাদশাহ-প্রদত্ত 'দবিরখাস' ও 'সাকর মল্লিক'-নাম মোচন করিয়া যথাক্রমে 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীসনাতন' এই দুই নাম রাখিলেন।

শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত লোকসঙ্ঘট্ট দেখিয়া প্রহেলিকাচ্ছলে ঐরূপ বিপুল লোকসঙ্ঘ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সানুরাগ-নিষেধ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের সেই বিচার অতিশয় সমীচীন বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের এইরূপ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে—রাজমন্ত্রী, হয় রাজপাত্র।।
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন।।
তাঁ'র দৈন্য দেখি' শুনি' পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলুঁ দোঁহারে।।
'উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে।।'
এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁ'রে দিল।
গমনকালে সনাতন 'প্রহেলী' কহিল।।
'যাঁ'র সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ, কোটী।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী।।'
তবু আমি শুনিলুঁ মাত্র, না কৈলুঁ অবধান।
প্রাতে চলি' আইলাঙ 'কানাইর নাটশালা'-গ্রাম।।
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল।।
ভালমত কহিল,—মোর এত লোকসঙ্গে।
লোক দেখি' কহিবে মোরে—'এই এক ঢঙ্গে'।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৬১-৬৯)

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় ৩য় প্রক্রম, ১৮শ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণের সহিত শ্রীরামকেলিতে গমন করিলে শ্রীসনাতন শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনার্থ তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে আগমন করিয়াছিলেন এবং অনুজের সহিত ভূলুণ্ঠিত হইয়া দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক অতি দৈন্যভরে শ্রীগৌর-সুন্দরের স্তুতি করিলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতনের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি সত্য সত্যই ব্রজবাসী, ইহাতে

কোনই সংশয় নাই। আমি তোমার সহিত মথুরায় গমন করিতে ইচ্ছা করি। তুমি শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থসমূহ তথা শ্রীবৃন্দাবনের প্রাকট্য বিধান কর। আমার কৃপায় তোমার সর্ব্বাভীষ্ট ও প্রেমভক্তি লাভ হইবে।" ইহা শুনিয়া শ্রীরূপের সহিত মহাবুদ্ধি শ্রীসনাতন বলিয়াছিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যবসতিস্থান—শ্রীবৃন্দাবন; তথায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল শ্রীরাধার সহিত লীলাবিলাস করেন। আপনার কৃপারূপ অস্ত্রের দ্বারা আমার বিষয়-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সন্নিধানে স্থান প্রদান করুন এবং আমাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া আপনার অভীষ্ট সাধন করুন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা ও শ্রীসনাতনের বাক্যে লোকসঙ্ঘের সহিত শ্রীবৃন্দাবন গমনের সঙ্কল্প-পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-দেশাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন।

[৪]

লোকশিক্ষার্থ বিষয়-ত্যাগের লীলা

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন রামকেলি-গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অবধি বিষয়-ত্যাগের উপায়সমূহ উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহু ধন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় লাভ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন। শ্রীরূপ নৌকাতে ভরিয়া ফতেয়াবাদে স্বগৃহে বহু ধন লইয়া আসিলেন। সেই ধনের অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে, এক-চতুর্থাংশ স্বজনবর্গকে দান করিলেন এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ ভাবী বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন; গৌড়ে শ্রীসনাতনের নিকট দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আসিলেন। তাহা শ্রীসনাতন কোন এক ব্যবসায়ী মহাজনের ঘরে গচ্ছিত রাখিয়া প্রয়োজন-অনুসারে ব্যয় করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তথা হইতে প্রভু বনপথে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন,—ইহা শুনিতে পাইয়া শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সঠিক তারিখ অবগত হইবার জন্য দুইজন দূতকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। শ্রীসনাতন রামকেলিতেই থাকিয়া রাজকার্য্য হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিচার করিলেন যে, 'রাজা যে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন, ইহাই তাঁহার বন্ধনের

কারণ; অতএব যে-কোনরূপেই হউক, রাজার অপ্রীতিভাজন হইতে পারিলেই রাজা তাঁহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিবেন।' এইরূপ বিচার করিয়া তিনি অসুস্থতার ছলে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাসায় বসিয়া থাকিলেন। শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যভাব দেখিয়া তাঁহার অধীন কতিপয় কায়স্থ কর্ম্মচারী তাঁহার পদ পাইবার লোভে রাজকার্য্যে খুব উদ্যম দেখাইতে লাগিলেন। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীসনাতন রাজমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁন্ ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন অসুস্থতার ছল করিয়া স্বগৃহে বিশ ত্রিশ জন ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিত লইয়া শাস্ত্রের বিচার ও সভাতে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ সঙ্গে একজন লোক লইয়া গৌড়েশ্বর বাদশাহ তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীসনাতনকে সুস্থদেহে সভা মধ্যে দেখিতে পাইলেন। বাদশাহকে দেখিয়া সসন্ত্রমে সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও আসনাদি প্রদান করিলেন। বাদশাহ শ্রীসনাতনকে বলিলেন,—"আমি তোমার নিকট বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম। বৈদ্য আমাকে জানাইলেন, তোমার কোন ব্যাধি হয় নাই, তুমি সুস্থই রহিয়াছ। আমার যে কিছু কার্য্য, সমস্তই তোমাকে লইয়া। তুমি সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছ! আমার সমস্ত কার্য্য নষ্ট হইয়া গেল। তোমার মনে কি আছে, তাহা খুলিয়া বল।" শ্রীসনাতন বলিলেন,—"আমাদ্বারা আপনার আর কোন কার্য্য হইবে না। আপনি আর একজন লোকের দ্বারা তাহা সমাধা করুন।" শ্রীসনাতনের এই উক্তি-শ্রবণে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমার বড় ভাই; আমি কিছু রাজ্যপালন করি না। আমি সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধ করিয়া দেশ-বিদেশ ছুটিয়া বেড়াই। গৌড়-চাক্‌লার মধ্যে মৃগয়া করিয়া বহু প্রাণিহত্যা করি। আমার একমাত্র ভরসা—তুমিই। তোমার বড় ভাই আমি যখন কেবল দস্যু-ব্যবহার ও প্রাণিহিংসাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলাম, আর ছোট ভাই তুমিও যখন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে, তখন রাজ্য কিরূপে চলিবে?" ইহা শুনিয়া শ্রীসনাতন রহস্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি গৌড়েশ্বর—স্বতন্ত্রপুরুষ—দণ্ডমুণ্ড-বিধানের কর্ত্তা। যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাঁহাকে তদুচিত ফল প্রদান করুন।" শ্রীসনাতনের এই বাক্যের রহস্য এই,—'রাজা যখন নিজে দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তখন তিনি তাহার ফল গ্রহণ করুন এবং আমার যখন কার্য্যে আলস্য, তখন আমাকেও কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হউক্।' শ্রীসনাতনের উত্তর শুনিয়া

গৌড়েশ্বর স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পাছে শ্রীসনাতন পলায়ন করেন, এজন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন।

[৫]

শ্রীরূপের পত্রী ও বন্ধন-মুক্তি

বাদশাহ উড়িষ্যাভিমুখে অভিযানকালে শ্রীসনাতনকে বলিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় চল।" শ্রীসনাতন বলিলেন,—"আপনি বিষ্ণুবিরোধ-কার্য্যে অভিযান করিয়াছেন, সুতরাং ইহার সহিত আমার সহযোগিতা থাকিতে পারে না।" ইহাতে বাদশাহ শ্রীসনাতনকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন। এদিকে নীলাচল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলে শ্রীরূপের পূর্ব্ব-প্রেরিত দুই চর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ লইয়া শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইল। শ্রীরূপ এই সংবাদ শ্রীসনাতনকে পত্রে লিখিয়া জানাইলেন এবং তৎসঙ্গে ইহাও লিখিলেন,—"আমি ও অনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম; তুমি যে-কোনরূপে তোমার বন্ধনদশা হইতে ছুটিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিও। রামকেলিতে ব্যবসায়ী মহাজনের নিকট যে দশসহস্র মুদ্রা আছে, তদ্দ্বারা শীঘ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে-কোনরূপেই হউক, শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া আসিবে।"

রাজবন্দী শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীরূপের ঐ পত্রী আসিলে শ্রীসনাতন পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং নিজকার্য্যোদ্ধারের জন্য কারারক্ষককে চাটুবাক্যে বলিলেন,—"তুমি একজন জীবন্ত পীর—মহাভাগ্যবান্। তোমার কোরাণ-শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। যদি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তাহা হইলে খোদা তোমাকে সংসার হইতে মুক্ত করিবেন। আমি পূর্ব্বে তোমার অনেক উপকার করিয়াছি; তুমি এখন কিছু প্রত্যুপকার কর। আমি তোমাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব; তুমি তাহা গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার ধর্ম্ম ও অর্থ—দুই-ই লাভ হইবে। কারারক্ষক বলিল,—"আপনাকে ছাড়িয়া দিতে আমার কোনই আপত্তি নাই; কিন্তু আমি বাদশাহকে ভয় করি।" তখন শ্রীসনাতন বলিলেন,—"তোমার কোনই ভয় নাই। বাদশাহ দক্ষিণ-দেশের অভিযানে গিয়াছেন। যদি তিনি সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও,—'সাকর মল্লিক বাহ্যকৃত্য-সম্পাদনের জন্য গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিল; নিকটে গঙ্গা দেখিয়া

সে ঝম্প প্রদান করে। আমি তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সে পদসংলগ্ন লৌহবেষ্টনীর (বেড়ীর) সহিত জলে নিমজ্জিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল, কিছুই সন্ধান পাইলাম না।' তোমার কিছুই ভয় নাই; আমি এই দেশেই থাকিব না। আমি দরবেশ লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।" শ্রীসনাতনের এত আবেদনেও কারারক্ষক যবনের চিত্ত সন্তুষ্ট দেখিতে না পাইয়া শ্রীসনাতন ঐ রক্ষকের সম্মুখে সাত হাজার মুদ্রা রাশি করিয়া রাখিলেন। ঐ স্তূপীকৃত মুদ্রা দেখিয়া কারারক্ষক আর লোভসম্বরণ করিতে পারিল না; শ্রীসনাতনের পদদেশের লৌহবেষ্টনী (বেড়ী) কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে রাত্রে গঙ্গার পার করিয়া দিলেন। শ্রীসনাতন ভৃত্য ঈশানের সহিত দিবারাত্র অবিরাম চলিতে চলিতে 'পাতড়া'-পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক দস্যুদলের নেতা ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীসনাতন সেই ভৌমিককে পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। সেই ভৌমিকের নিকট একজন গণৎকার ছিল। সেই ব্যক্তি কোন্ পথিকের সহিত কি পরিমাণ অর্থ-দ্রব্যাদি আছে, তাহা গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারিত এবং তাহা জানিয়া ঐ ভৌমিক পথিকগণকে প্রাণে বধ করিয়া তাহাদের অর্থ আত্মসাৎ করিত। উক্ত জ্যোতিষী গণনা করিয়া ভৌমিককে জানাইল, শ্রীসনাতনের সহিত আটটী সোনার মোহর আছে। ইহা জানিয়া দস্যুদলপতি শ্রীসনাতনকে বিশেষ আদর-আপ্যায়ন করিল এবং বলিল, —"রাত্রে আপনাকে আমার নিজের লোক দিয়া পার করিয়া দিব। আপনি এখন রন্ধন করিয়া ভোজন করুন এবং অনুগ্রহ করিয়া এই তণ্ডুলাদি রন্ধন-সামগ্রী গ্রহণ করুন।" শ্রীসনাতন নদীতে স্নান করিয়া দুইদিন উপবাসের পর রন্ধন ও ভোজন করিলেন। বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী শ্রীসনাতন মনে মনে বিচার করিলেন,—'এই ভূঞা আমাকে এরূপ সম্মান ও যত্ন করিতেছে কেন? ইহাতে কিছু সন্দেহ হয়। আমার নিকট ত' কিছুই নাই। তবে কি ঈশান আমাকে না জানাইয়া কিছু অর্থাদি লইয়া আসিয়াছে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীসনাতন ভৃত্য ঈশানকে বলিলেন,— "আমার মনে হয়, তুমি কিছু অর্থাদি লইয়া আসিয়াছ।" ঈশান বলিল,—"আমার নিকট সাতটী মোহর আছে।" শ্রীল সনাতন ঈশানকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"তুমি কেন এই কালযম সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ?" অবিলম্বে শ্রীসনাতন ঐ সাত মোহর ভূঞার নিকট স্বহস্তে লইয়া গেলেন ও বলিলেন, —"আমার নিকট এই সাত মোহর ছিল, তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে পর্ব্বত

পার করিয়া দাও। আমি রাজবন্দী; তুমি আমাকে এই পর্ব্বত পার করিয়া দিলে তোমার পুণ্য লাভ হইবে।" তখন ভূঞা হাসিয়া বলিল,—"আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে, আপনার সেবকের অঞ্চলে আটটী মোহর আছে। ভাল হইল, আমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম; নতুবা আমি আপনাদিগকে হত্যা করিয়া ঐ মোহর লইতাম। আমি আপনাদের সাধুতায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি আর আপনাদের মোহর লইব না। পুণ্যের জন্য আপনাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব।" শ্রীসনাতন বলিলেন,—"তুমি এই মোহর না লইলে অন্য কোন লোকে আমাকে বধ করিয়া ইহা লইয়া যাইবে; সুতরাং ইহা গ্রহণ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।" তখন ভূঞা শ্রীসনাতনের সহিত চারিজন 'পাইক' দিল এবং রাত্রিতেই বনপথে পর্ব্বত পার করিয়া দিল। পর্ব্বত পার হইয়া শ্রীসনাতন ঈশানকে বলিলেন,—"আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমার নিকট কিছু অর্থ অবশিষ্ট আছে।" ঈশান অবশিষ্ট এক মোহরের কথা জানাইলে শ্রীসনাতন ঈশানকে ঐ মোহর লইয়া নিজদেশাভিমুখে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং স্বয়ং একাকী হস্তে করঙ্গ ও অঙ্গে ছিন্নকন্থার সহিত নির্ভয়ে চলিতে চলিতে গঙ্গানদী ও গণ্ডক-নদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপর পারে হাজিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীসনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত হুসেন শাহের অশ্ব ক্রয় করিতেন। শ্রীকান্ত উচ্চস্থান হইতে শ্রীসনাতনকে দেখিতে পাইয়া রাত্রিকালে তৎসমীপে আসিয়া শ্রীসনাতনের নিকট সকল কথা শুনিলেন এবং দুই-একদিন তথায় থাকিয়া মলিন বসন পরিত্যাগ ও ক্ষৌরাদি করিয়া ভদ্রবেশ ধারণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ-অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীসনাতন বলিলেন,—"আমি একমুহূর্ত্তও এখানে থাকিব না, আমাকে শীঘ্রই গঙ্গা পার করিয়া দাও; আমি এখনই চলিয়া যাইব।" শ্রীকান্ত অনেক চেষ্টা করিয়া শ্রীসনাতনকে একটী ভোটকম্বল প্রদান করিলেন ও গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

[৬]

শ্রীগৌর-পাদপদ্মে

শ্রীসনাতন কয়েকদিনের মধ্যেই বারাণসী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন হইয়াছে শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন কাশীতে পুঁথিলেখক (বৈদ্য) শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীসনাতন দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে

পারিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরকে বলিলেন,—"দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছে; তাহাকে ডাকিয়া আন।" শ্রীসনাতনের অঙ্গে কোন বৈষ্ণববেষ বা চিহ্ন না থাকায় শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন,—"দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই; একজন দরবেশমাত্র তথায় বসিয়া আছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশানুসারে শ্রীচন্দ্রশেখর সেই দরবেশরূপী সনাতনকেই ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীসনাতনকে অঙ্গনে দেখিতে পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বেগে ধাবিত হইয়া শ্রীসনাতনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীসনাতনও প্রভুর স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইয়া গদ্‌গদ্‌বাক্যে অতি দৈন্যের সহিত বলিলেন,—"আমাকে স্পর্শ করিবেন না; আমি অত্যন্ত নীচ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসনাতন—এই উভয়ের প্রেম-ক্রন্দন দর্শন করিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সস্নেহে নিজসমীপে আসন প্রদান করিয়া স্বহস্তে শ্রীসনাতনের অঙ্গমার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীসনাতন অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিলেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুও দৈন্যভরে বলিলেন,—

* * "তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।।
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ফল,—এই শাস্ত্রের নিরূপণ।।
* * শুন, সনাতন।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিতপাবন।।
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৫৬, ৬০, ৬২)

শ্রীসনাতন বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণকে জানি না, আমার উদ্ধারের হেতু—একমাত্র আপনার কৃপা।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নানুসারে শ্রীসনাতন নিজের বন্ধনমোচনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভুকে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে জানাইলেন যে, তাঁহার দুই ভাই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সহিত তাঁহার প্রয়াগে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তাঁহারা দুইজনেই শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীসনাতন শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীতপন মিশ্র তাঁহার গৃহে শ্রীসনাতনকে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া শ্রীসনাতনের দরবেশের বেষ দূর করাইয়া তাঁহাকে ক্ষৌর করাইবার আদেশ করিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীসনাতনকে ক্ষৌর করাইয়া গঙ্গাস্নান করাইলেন ও পরিধানের জন্য নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। শ্রীসনাতন তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন,—"যদি আমাকে বস্ত্রদান করিতে তোমার একান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার নিজপরিহিত একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রদান কর।" তখন মিশ্র শ্রীসনাতনকে নিজব্যবহৃত একটী পুরাতন বস্ত্র প্রদান করিলে শ্রীসনাতন সেই একখণ্ড বস্ত্রকে দুইখণ্ড বহির্ব্বাস ও তদুচিত ডোর-কৌপীনে বিভাগ করিয়া লইলেন। শ্রীসনাতনের এই ব্যবহারে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয় এক ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের সাক্ষাৎকার করাইলেন। সেই বিপ্র শ্রীসনাতনকে বলিলেন,—"আপনি যতদিন কাশীতে অবস্থান করিবেন, ততদিন কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিলে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।" শ্রীসনাতন সেইরূপ স্থূলভিক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীসনাতনের যুক্তবৈরাগ্য-দর্শনে প্রভুর অপার আনন্দ হইল। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের ভোট-কম্বলটীর দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ভোট-কম্বল-ধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত জানিয়া শ্রীসনাতন উহা অবিলম্বে ত্যাগ করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। যখন শ্রীসনাতন গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে গমন করিলেন, তখন এক গৌড়ীয়া তাঁহার একটি কন্থা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন সেই গৌড়ীয়াকে বলিলেন,—"দেখ ভাই! তুমি আমার একটী উপকার কর। তুমি এই ভোট-কম্বলটী লইয়া আমাকে তোমার কন্থাটী দাও।" ইহাতে গৌড়ীয়া বলিলেন,—"তুমি এরূপ প্রবীণ ব্যক্তি হইয়া কি আমার সহিত রহস্য করিতেছ? তোমার মূল্যবান্ ভোট-কম্বলের পরিবর্ত্তে তুমি কি জন্য আমার ছিন্নকন্থা গ্রহণ করিবে?" শ্রীসনাতন বলিলেন,—"আমি সত্যকথা বলিতেছি, তোমার সহিত একটুও রহস্য করিতেছি না। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই ভোট-কম্বলটী গ্রহণ কর ও তোমার কন্থাটী আমাকে

দাও।” ইহা বলিয়া শ্রীসনাতন কন্থার পরিবর্ত্তে ভোট-কম্বলটী প্রদান করিয়া সেই কন্থা ধারণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে আগমন করিলেন। * মহাপ্রভু ‘সেই ভোট-কম্বল কোথায় গেল’ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসনাতন সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

“সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি’ সদ্‌বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ।।
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস।।”

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯০-৯২)

আচার ও প্রচার একরূপ না হইলে নিজের ধর্ম্মহানি হয় ও লোকের নিকটও উপহাস্যস্পদ হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে অমায়ায় কৃপা করেন, তাঁহাকে নিঃশেষে বিষয়-রোগ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।”

শ্রীসনাতন বলিলেন,—“যিনি আমার কুবিষয়-ভোগ খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় ও কৃপায় আমার শেষ বিষয়রোগ দূরীভূত হইল।”

[৭]

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রচুর কৃপা করিলেন এবং শ্রীসনাতনে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা সমগ্র জীবজগতের

* কেহ কেহ বলেন, প্রয়াগ হইতে মথুরা যাইবার পথে যমুনাতীরে ‘ইটাওয়া’-নামক স্থানে একটী মন্দিরে একখানি কম্বলের পূজা হয়। স্থানীয় পূজারীরা বলেন, ঐ কম্বলটী শ্রীচৈতন্যদেব কোন দরিদ্রকে প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু কাশীতে জনৈক গৌড়ীয়ার কন্থার সহিত যে ভোট-কম্বল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ উহাই সেই কম্বল। উক্ত গৌড়ীয়া পরে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীল সনাতনের মহিমা জানিতে পারিয়া ঐ কম্বলটীকে আদরের সহিত পূজা করেন। সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রীসনাতনকেই শ্রীচৈতন্যদেব মনে করিয়া উহা শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত কম্বল বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ‘সজ্জনতোষণী’, ৪র্থ বর্ষে “ইটাওয়া যমুনাতীর”-শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে এরূপ কোন প্রবাদের উল্লেখ নাই।

কল্যাণের জন্য পরিপ্রশ্ন করাইলেন। পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায়-রামানন্দের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং প্রভুর শক্তিবলেই শ্রীরামরায় প্রভু-প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চার-বলে শ্রীসনাতন প্রশ্ন ও স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার উত্তর-দান করিলেন। শ্রীসনাতন অত্যন্ত দৈন্য ও বিনয়-সহকারে দন্তে তৃণ ও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন করিলেন,—"প্রভো! আমি অতি নীচসঙ্গী, নীচজাতি, পতিতাধম; কুবিষয়-কূপে পতিত হইয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম অতিবাহিত করিয়াছি। আমি নিজের হিতাহিত কিছুই জানি না। আমি গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত এবং উহাকেই সত্য বলিয়া মানি। যখন আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন নিজকৃপাতেই আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন—**আমি কে?** আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপ কেন আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে? আমার কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে? আমি সাধ্য ও সাধন-তত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও অসমর্থ। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা সঞ্চারিত রহিয়াছে। তুমি সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছ। তোমার ত্রিতাপ নাই। তুমি হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি ধারণ করিয়াছ। তথাপি সাধুর স্বভাব এই যে, তিনি সমস্ত বিষয় সুষ্ঠুরূপে জানিয়াও দৃঢ়তার জন্য পুনরায় প্রশ্ন করেন। তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে যোগ্যপাত্র। তোমাকে সমস্ত তত্ত্ব বলিতেছি, ক্রমে ক্রমে শ্রবণ কর। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবের মঙ্গলের দিকে অভিমুখী হইবার প্রথম চেষ্টা। যাহাদের সদ্ধর্ম্ম উদয় করাইবার জন্য দৃঢ়া মতি হয়, তাহাদিগকেই অতি শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'কে আমি?'—এইরূপ প্রশ্ন যখন জীবের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন জীব সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে পারে। এই জড়সম্ভূত দেহটী কি আমি?—তাহা নহে। এই মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ-শরীরটী কি আমি?—তাহাও নহে। প্রকৃত 'আমি'-বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; তাহা শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ—এই দুই-এর মধ্যগত সীমায় অবস্থিত হইয়া জীবের উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, জীব—তটস্থা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ। চিদ্ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের অভেদপ্রকাশ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীবও সচ্চিদানন্দ। জীবের নিত্যসত্তা আছে বলিয়া জীব সৎ। জীব চেতন বস্তু বলিয়া চিৎ এবং

তাহাতে আনন্দধর্ম্ম আছে বলিয়া জীব আনন্দস্বরূপ; এইরূপভাবে জীব শ্রীকৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ; কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহে। জীব অণু-বস্তু; অণু-চৈতন্যধর্ম্মবশতঃ জীব বৃহচ্চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ; অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণ অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-জ্বালানিচয় জীবসমূহের উদাহরণস্থল। তটস্থাশক্তিপ্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট।

'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।' (বৃহদারণ্যক ২।১।২০)

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে।

জীব চিৎকণ বটে, কিন্তু কোন ঐশী শক্তিদ্বারা তাহা অচিৎসম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে। সেই ঐশী শক্তির নাম—'তটস্থা'। নদীর জল ও ভূমি—উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে; অর্থাৎ উভস্থ। উক্ত ঐশী শক্তি তটে স্থিত হইয়া ভূধর্ম্ম ও জলধর্ম্ম—দুই-ই একসত্তায় ধারণ করে; জীব চিদ্ধর্ম্মী বটে, কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড়ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য।

'আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত না থাকিলে জীবের মায়াবন্ধন উপস্থিত হয়। তটস্থশক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিসীমায় অতিস্থিতিকালে মায়াভোগ-বাসনা করায় তাহার মায়াপ্রবেশ হয়। মায়াপ্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণনা। সেই কাল গণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা প্রকাশিত হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা হয়। সেইরূপ অনাদিবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীব কখন সংসার-দুঃখ, কখন সংসার-সুখ লাভ করিয়া থাকে; কখন স্বর্গে, কখন বা নরকে তাহার গতাগতি হয়। এই উভয় দশাই বদ্ধদশা। শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মায়ায় অভিনিবেশবশতঃ জীবের ভয় ও বিপরীত স্মৃতির উদয় হয়। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া অপার করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রকট করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রপ্রদর্শক গুরু ও সাধুরূপে তথা অন্তর্যামী আত্মা-রূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের

প্রাপ্য—শ্রীকৃষ্ণের যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম 'ভক্তি', তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে 'প্রেম'-নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে। তাহার নাম 'প্রয়োজন'।।"

সর্ব্বজ্ঞের এক উদাহরণদ্বারা এই বিষয়টী শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বিবৃত হইয়াছে। এক সর্ব্বজ্ঞ (যিনি সকল বিষয় বলিয়া দিতে পারেন) কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অর্থাভাবে অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি বিপুল পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তোমার গৃহের প্রাঙ্গণেই তোমার পিতার বহু গুপ্তধন প্রোথিত রহিয়াছে। দক্ষিণদিক্ খনন করিও না। তথায় অনেক ভীমরুল আছে। উহারা তোমাকে দংশন করিবে। উহার বিপরীত উত্তরদিকেও কৃষ্ণ-অজগর-সর্প বাস করিতেছে। সে তোমাকে পাইলেই একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, আর ধন পাইতে হইবে না। পশ্চিমদিকেও খনন করিবে না; তথায় স্বয়ং যক্ষ ধন আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে। সে নানা বিঘ্নোৎপাদন করিবে, ধনলাভ আর ভাগ্যে ঘটিবে না; কিন্তু পূর্ব্বদিকের মৃত্তিকা অল্প খনন করিলেই তুমি পিতৃধন লাভ করিতে পারিবে।" এই দৃষ্টান্ত-দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় জীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, দক্ষিণদিক্ কর্ম্মকাণ্ডের দিক্। যাহারা যমের দ্বারা দণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া ফলকামনা করে; তথায় ভোগ-বাসনারূপ ভীমরুলের দংশনে কেবল জ্বলিতে হয়। উত্তরদিক্ জ্ঞানকাণ্ডের সূচক। কৃষ্ণ-অজগররূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয় জীবাত্মাকে গ্রাস করে। পশ্চিমদিক্ যোগমার্গের সূচক। যক্ষরূপী সিদ্ধিকামনা নানাপ্রকার বিভূতি-ঐশ্বর্য্যের লোভে লুব্ধ করিয়া আত্মাকে গ্রাস করে। পূর্ব্বদিকেই ভক্তিপথের সূচক। সেইদিকে প্রেমসূর্য্যের উদয় হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন, "হে সনাতন! দারিদ্র্যনাশ অর্থাৎ সংসারের ক্লেশ হইতে উদ্ধার প্রেমের ফল নহে। যেমন সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়েই চোর, দস্যু প্রভৃতি পলায়ন করে অথবা যেরূপ ধন প্রাপ্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখ বিগত হয়, সেইরূপ প্রেমফল-লাভের আভাসের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় সংসার-ক্লেশ অনায়াসে ও নিঃশেষে বিদূরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও প্রেম—এই তিনটী মহাধন।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সমগ্র বেদে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদ্য ও প্রতিপাদ্য। অনন্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তিবৈভব। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিশক্তি

'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি' ও 'জীবশক্তি'-নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও অচিচ্ছক্তি হইতে জড়জগৎ প্রকটিত।"

[৮]

সম্বন্ধতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি বিভু-সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বাদি, কিশোর-শেখর, চিদানন্দদেহ ও ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি শ্রীগোলোক-ধামে নিত্য-বিরাজমান। ত্রিবিধ অভিধেয়ের দ্বারা সম্বন্ধতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি হয়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের দ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতীতি হয়; অষ্টাঙ্গযোগতত্ত্বে পরমাত্ম-প্রতীতি ও শুদ্ধভক্তিদ্বারা পূর্ণ-ভগবানের দর্শন হয়। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি; পরমাত্মা—কৃষ্ণাংশ-বৈভব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ

(১) **স্বয়ংরূপ;** তাঁহার দ্বিবিধ রূপ, যথা— (ক) **স্বয়ংরূপ**—এক কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন; তাঁহার গোপবেশও গোপ-অভিমান; তিনি 'লীলা-পুরুষোত্তম'-নামেও অভিহিত। (খ) **স্বয়ং-প্রকাশ**; তিনি দ্বিবিধ, যথা—

১। **প্রাভব**; যথা—একই বপুর বহুরূপ, যেমন রাসে ও মহিষী-বিবাহে।

২। **বৈভব**; যথা— (ক) শ্রীবলদেব—তাঁহার ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও সব কৃষ্ণের সমান। (খ) দ্বিভুজ দেবকীনন্দন; (গ) চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন।

(২) **তদেকাত্মরূপ**—ভাবাবেশ ও আকৃতি ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের সহিত একাত্মরূপ। তাঁহার দ্বিবিধ রূপ, যথা—

(ক) **বিলাস**; তাঁহার দ্বিবিধ রূপ, যথা—

১। **প্রাভব**; তাঁহারা চারিটী; যথা—আদি-চতুর্ব্যূহ (ক) বাসুদেব—চতুর্ভুজ, ক্ষত্রিয়-বেশ, ক্ষত্রিয়-অভিমান, পুরে নিত্যাধিষ্ঠান, (খ) সঙ্কর্ষণ, (গ) প্রদ্যুম্ন ও (ঘ) অনিরুদ্ধ।

২। **বৈভব**; ২৪টী মূর্ত্তি; যথা— (ক) প্রাভব-বিলাস-প্রকটিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ (বৈকুণ্ঠে নিত্যাধিষ্ঠান) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই ৪ জন।

(খ) ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া ১২ মূর্ত্তি দ্বাদশ মাসের ও দ্বাদশ তিলকের দেবতা। (গ) প্রত্যেকের পুরুষোত্তম, অচ্যুতাদি করিয়া ৮ জন বিলাস-মূর্ত্তি—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র।

(খ) **স্বাংশ**; তাঁহাদের ষড়্‌বিধ রূপ, যথা—

১। **পুরুষাবতার;** তাঁহারা ৩টী, যথা— (ক) কারণোদকশায়ী—প্রথম পুরুষাবতার, (খ) গর্ভোদকশায়ী—দ্বিতীয় পুরুষাবতার, (গ) ক্ষীরোদকশায়ী—তৃতীয় পুরুষাবতার।

২। **গুণাবতার;** তাঁহারা ৩টী, যথা— (ক) বিষ্ণু, (খ) ব্রহ্মা ও (গ) শিব।

৩। **লীলাবতার;** তাঁহারা ২৫টী, যথা— (ক) মৎস্য, (খ) কূর্ম্ম, (গ) বরাহ, (ঘ) রাম, (ঙ) নৃসিংহ, (চ) বামন, (ছ) পৃথু, (জ) পরশুরাম, (ঝ) ব্যাস, (ঞ) নারদ, (ট) চতুঃসন, (ঠ) যজ্ঞ, (ড) নরনারায়ণ, (ঢ) কপিল, (ণ) দত্তাত্রেয়, (ত) হয়গ্রীব, (থ) হংস, (দ) পৃশ্নিগর্ভ, (ধ) ঋষভ, (ন) ধন্বন্তরী, (প) মোহিনী, (ফ) বলভদ্র, (ব) কৃষ্ণ, (ভ) বুদ্ধ ও (ম) কল্কি।

৪। **যুগাবতার;** তাঁহারা ৪টী, যথা— (ক) শুক্ল (হরি), (খ) রক্ত (হয়গ্রীব), (গ) কৃষ্ণ (শ্যাম) ও (ঘ) পীতবর্ণ (কৃষ্ণ)।

৫। **মন্বন্তরাবতার;** তাঁহারা ১৪টী, যথা— (ক) যজ্ঞ, (খ) বিভু, (গ) সত্যসেন, (ঘ) হরি, (ঙ) বৈকুণ্ঠ, (চ) অজিত, (ছ) বামন, (জ) সার্ব্বভৌম, (ঝ) ঋষভ, (ঞ) বিষ্বক্‌সেন, (ট) ধর্ম্মসেতু, (ঠ) সুধামা, (ড) যোগেশ্বর ও (ঢ) বৃহদ্ভানু।

৬। **শক্ত্যাবেশাবতার;** তাঁহারা ৮টী, যথা— (ক) চতুঃসন, (খ) নারদ, (গ) ব্রহ্মা, (ঘ) পৃথু, (ঙ) শেষ, (চ) অনন্ত, (ছ) পরশুরাম, (জ) ব্যাস।

(৩) **আবেশ;** তাঁহার দ্বিবিধ রূপ, যথা— (ক) **ভগবদাবেশ**, যথা—কপিলদেব ও ঋষভদেব; (খ) **শক্ত্যাবেশ**, যথা—নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা ও সনকাদি।

স্বয়ংরূপ—যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অপরের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে অপেক্ষা করে না, যিনি স্বয়ং ভগবান্‌, সেই শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ংরূপ' পরতত্ত্ব।

তদেকাত্মরূপ—যে রূপ স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহেন, যাঁহাকে স্বয়ংরূপেরই কায়ব্যূহ বলা যাইতে পারে, অথচ যাঁহাকে আকারাদি-গত কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, তাদৃশ রূপকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে।

আবেশ—যাঁহাতে একটি মাত্র শক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই 'আবেশ' বলে; যেমন, নারদে 'ভক্তি'শক্তি, পৃথুতে 'পালন'-শক্তি, চতুঃসনে 'জ্ঞান'-শক্তি ইত্যাদি। মহত্তম-জীবেই এইরূপ আবেশ হইয়া থাকে। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে 'শ্রীভগবান্' বলিয়া অভিমান হয়।

কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে 'শ্রীভগবান্' বলিয়া অভিমান করিতেন; আর ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট জীবের আপনাকে 'ভগবদ্দাস' বলিয়া অভিমান হয়। ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস'-অভিমান করেন।

প্রকাশ—একই স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেক স্থানে প্রকটিত হন এবং ঐ প্রকটিত মূর্ত্তিসকল যদি গুণ-লীলাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে মূলরূপেরই সমান হন, তবে ঐ সকল মূর্ত্তিকে মূলরূপের 'প্রকাশমূর্ত্তি' বলা হয়। ''একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারে ত' ভেদ নাহি, একই স্বরূপ।। মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ।।'' (চৈঃ চঃ আঃ ১।৬৯-৭০)

বিলাস—যিনি প্রায়-মূলরূপে তুল্যশক্তিধর, কিন্তু আকৃতিতে, বর্ণে ও নামে ভেদমাত্র, তাঁহাকে 'বিলাস' বলে। যেমন ব্রজে শ্রীবলরাম ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ। ''একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তা'র নাম।।'' (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।৭৬)

স্বাংশ—যাঁহাতে বিলাস হইতে ন্যূন-শক্তি প্রকাশিত, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে, যেমন মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসমূহ।

প্রাভব ও বৈভব—প্রাভবে প্রভুত্ব এবং বৈভবে বিভুত্ব বর্ত্তমান। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভবপ্রকাশ-মূর্ত্তিসকল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই। তাঁহাদের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ—ব্রজে শ্রীবলরাম, তিনিই মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি নামে, আকৃতিতে ও বর্ণে ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভেদ-বস্তু। তাঁহা হইতেই আদি-চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই প্রাভব-বিলাসচতুষ্টয় ভাবভেদে দ্বারকায়, মথুরায় দ্বিভুজমূর্ত্তিতে এবং পরব্যোমে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণরূপে প্রকটিত। বিশেষ

বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ প্রকাশমূর্ত্তির কথাও শ্রবণ করা যায় এবং ঐ সকল প্রকাশমূর্ত্তিতে আকারগত ভেদও দৃষ্ট হয়; যেমন, দেবকীনন্দনে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। এস্থলে আকার-গত ভেদসত্ত্বেও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনে দ্বিভুজ-মূর্ত্তিও এইরূপ জানিতে হইবে।

অবতারসকল প্রধানতঃ ত্রিবিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। তন্মধ্যে পুরুষাবতার তিনটী; যথা—

১। কারণরূপা প্রকৃতির অন্তর্যামী এবং মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই প্রথম পুরুষাবতার। ইনি পরব্যোমনাথ বাসুদেবের দ্বিতীয়ব্যূহ মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ। মহাবিষ্ণু যে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের দাসতত্ত্বরূপ 'শেষ'-নামক অবতার-বিশেষ। ইনি চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি-তদ্রূপবৈভবের প্রকটকারী এবং মায়াশক্তিদ্বারা চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক দেবীধামের সৃষ্টিকর্ত্তা।

২। সূক্ষ্মসমষ্টি-বিরাটের অন্তর্যামী ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের তৃতীয়ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশ।

৩। স্থূল ও ব্যষ্টি-বিরাটের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মাই তৃতীয় পুরুষাবতার। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেবের চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশ। মহাসঙ্কর্ষণের কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভাব, মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ীর গর্ভোদকশায়িরূপে এবং ক্ষীরোদকশায়িরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবই চরিষ্ণুধর্ম্মের উদাহরণ; সুতরাং বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য গুণাবতারদ্বয় ও সমস্ত দেবগণ তাঁহার অধীন আধিকারিক তত্ত্ববিশেষ। মহাদীপ শ্রীগোবিন্দের বিলাস-মূর্ত্তি হইতে কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতারগণ এবং শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহাদি স্বাংশ-অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত বা দশাগত দীপস্বরূপ শ্রীগোবিন্দের সহিত সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট। বস্তুধর্ম্মে শ্রীগোবিন্দের সহিত অভিন্ন হইলেও ইঁহাদের লীলাগত বৈচিত্র্য আছে।

গুণাবতার তিনটী— (১) বিষ্ণুস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী সত্ত্বগুণদ্বারা পালন করেন বলিয়া তিনি বিষ্ণু। গোবিন্দ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপতা উভয়েই আছে। বিষ্ণু গোবিন্দের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। তিনি মায়াতীত, গুণাতীত, পরমেশ ও মায়াধীশ।

(২) ব্রহ্মার স্বরূপ—গর্ভোদকশায়ীর নাভিকমল হইতে আবির্ভূত, রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা—ব্রহ্মা। ইনি রজোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ।

ব্রহ্মা দুই প্রকার— (ক) কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীব ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য বিধান করেন। এইরূপ ব্রহ্মাতে ঈশ্বরের শক্তি সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাঁহাকে 'আবেশাবতার' বলা যায়। আবেশাবতার ব্রহ্মাতে রজোগুণের যোগহেতু বিষ্ণুর সহিত সাম্য স্বীকার করা যায় না। আর (খ) যে কল্পে তাদৃশ জীব না থাকায় বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হন, সেই কল্পে ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন দর্শন করিতে হইবে। ইন্দ্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সুতরাং আধিকারিক দেবতা-সকল কখনও বিষ্ণু স্বয়ং, কখনও বা তাদৃশ পুণ্যকারী জীবসকল। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। ব্রহ্মাতে জীবের পঞ্চাশৎ গুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আরও পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে বর্ত্তমান আছে। পাতাল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনে সমষ্টি-বিরাট্‌রূপ প্রাকৃত বস্তুসকলই ব্রহ্মার স্থূল শরীর। উহাকেও ব্রহ্মাই বলা যায়। ঐ স্থূলদেহের মধ্যে যিনি সূক্ষ্ম-জীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাকেও ব্রহ্মা বলা যায়। তাঁহার অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু।

(৩) শিবের স্বরূপ—শম্ভু মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। শ্রীশম্ভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একটি ঈশ্বর নহেন। যাহাদের সেইরূপ ভেদবুদ্ধি, তাহারা শ্রীভগবানের নিকট অপরাধী। শ্রীশম্ভুর ঈশ্বরতা শ্রীগোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। শ্রীশম্ভু শ্রীবিষ্ণুর সহ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। মায়া-সঙ্গে বিকার লাভ করায় ভেদ এবং চিদ্বিলাসের আশ্রয়জাতীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব হওয়ায় বিকার-রহিত হইয়া স্বয়ং বিষ্ণুর সহ অভেদ। বিষ্ণুরূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ায় দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও 'দুগ্ধ' পরিচয় ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু কখনই বিকারী হন না। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন গুণাবতার ব্রহ্মা বা শিবতত্ত্ব; মায়া-সংযোগেই ভেদ। মায়ার তমোগুণ, তটস্থা শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প-হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্-গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটী বিকার বিশেষ হয়; সেই বিকার-বিশেষযুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাসস্বরূপ ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ সদাশিব এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। "বৈষ্ণবানাং যথা

শম্ভুঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য্য এই যে, শম্ভু স্বীয় কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া তমোগুণ-সাহায্যে সংহারকার্য্য সমাধা করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকারভেদে ভক্তি-লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দেন। আবার শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ সমাধা করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশৎ গুণ প্রভূত-রূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটী মহাগুণ আংশিকরূপে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং শম্ভুকে ‘জীব’ বলা যায় না। তিনি জীবের ঈশ্বর, তথাপি বিভিন্নাংশগত।

কোনও কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও সংহারকর্ত্তা শিব হন। আবার কোনও কল্পে তাদৃশ জীবের অভাবে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপ ধারণপূর্ব্বক সংহারকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। এই সংহারকর্ত্তা সকলেই গুণাবতার; কিন্তু যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন; তিনি নির্গুণ এবং শ্রীনারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী বা গোপালিনী শক্তি; অতএব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষয়াশ্রয়ের আলম্বনত্বে একত্বহেতু বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন।”

“ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার।।”

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৩১৭)

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমে যুগাবতারের বর্ণন-প্রসঙ্গে যখন সত্যযুগে শুক্লবর্ণ যুগাবতার, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ যুগাবতার, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার ও কলি-যুগে নামপ্রেমপ্রচারক পীতবর্ণ যুগাবতারের কথা কীর্ত্তন করিলেন এবং কলিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অবতারিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগধর্ম্ম নাম-কীর্ত্তন প্রচার করেন বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন, তখন শ্রীগৌরলীলাতত্ত্বজ্ঞ, ভজন-চতুর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীসনাতন স্বয়ং প্রভুর শ্রীমুখ হইতে তাঁহার অবতার-উদ্দেশ্য জানিবার জন্য নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“প্রভো! আমি অতি নীচ, ক্ষুদ্র জীব। কলিতে কোন্ অবতার, আমি কিরূপে জানিব?” তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—“অন্যান্য অবতার যেরূপ শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়, কলিতে অবতারের কথাও সেইরূপ শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা জানা যাইবে। শাস্ত্রালোকেই ভগবজ্ জ্ঞান লাভ হয়। অবতার কখনও নিজেকে ‘আমি অবতার’ এইরূপ বলেন না। তত্ত্বকোবিদ্

মুনিগণ স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা অবতার নির্ণয় করেন।" তখন ভজন-চতুর শ্রীসনাতন স্বয়ং প্রভুদ্বারা প্রভুর লীলা-ব্যাখ্যা-শ্রবণের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—"কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার; আর তটস্থ-লক্ষণ প্রেমানন্দ-সংকীর্ত্তন-কার্য্য। অতএব, কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার কে, তাহা কৃপা-পূর্ব্বক বলুন, আমার সংশয় দূরীভূত হউক।"

ইহা শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতন! তুমি চতুরালি ছাড়। এখন শক্ত্যাবেশাবতারের কথা শ্রবণ কর।" এস্থানে ভক্তের জয় ও ভগবানের পরাজয় হইল। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই প্রসঙ্গ আপাততঃ আবৃত করিবার উদ্দেশ্যে অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"গৌণ ও মুখ্য-ভেদে শক্ত্যাবেশাবতার দুই প্রকার—যাঁহাতে সাক্ষাৎ-শক্তির অবতার, তিনি মুখ্য-শক্ত্যাবেশাবতার ও যে স্থানে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দৃষ্ট হয়, তথায় গৌণ-শক্ত্যাবেশাবতার। স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁহার লীলা-প্রকটনের পূর্ব্বে গুরুবর্গরূপ সেবকগণকে অবতীর্ণ করাইয়া থাকেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা নবনবায়মানা চিন্ময়ী ভৌমলীলা নিরবচ্ছিন্ন গঙ্গাধারার ন্যায় প্রকটিত থাকে। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণজন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া একশত পঁচিশ বৎসর কাল মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত থাকিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলার সঙ্গোপন হয়। লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া প্রথম-ক্ষণান্তে দ্বিতীয়-ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথমক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছে। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্রের ভ্রমণ যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, সেইরূপ কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ড-কিশোরাদি লীলা নিত্যকালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্যাবির্ভাব-সম্বন্ধে অনুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালে নিত্যাবির্ভাবের নাম 'নিত্যলীলা'; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা—নিত্য; চৌদ্দ মন্বন্তরে ও কল্পিত আগম-শাস্ত্র প্রচারপূর্ব্বক অসুরবিমোহন-কার্য্য কোন-না-কোন এক

ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলামণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয়। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডের নিত্যলীলা পরিদৃশ্য হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্যলীলার কথা কীর্ত্তন করেন। সঙ্কর্ষণের চিদ্বৈভব সমস্ত বিষ্ণুধামই শ্রীবিষ্ণুর ন্যায়। সেই ধাম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীহরির সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য প্রকট করেন, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন—পূর্ণতম। দ্বারকা ও মথুরাপুরীদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি পূর্ণতর এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ পুরীদ্বয় অপেক্ষাও স্বল্পরূপে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি পূর্ণ।

পরব্যোমধামে সকল বিষ্ণুবিগ্রহের অনন্ত বৈকুণ্ঠধাম নিত্য বিরাজমান। প্রত্যেক বিষ্ণুবিগ্রহের স্বরূপ যেমন নিত্য, তাঁহার শ্রীধাম, পরিকর ও লীলাদিও সেইরূপ নিত্য। শ্রীধাম ও শ্রীবিগ্রহ—অভিন্ন-শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বিলাসময়। সেই বিষ্ণু ও বিষ্ণুধাম—উভয়ই প্রাকৃতেন্দ্রিয়াতীত বলিয়া ব্রহ্মাদিরও অনধিগম্য। সেই চিজ্জগৎ একটী পদ্মস্বরূপ। সেই পদ্মের মধ্যভাগে কর্ণিকারূপী কৃষ্ণলোক। তাহার চতুর্দ্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ শ্রীধাম— (১) গোলোকাখ্য শ্রীগোকুল, (২) শ্রীমথুরা ও (৩) শ্রীদ্বারকা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই ধামত্রয়ের সম্রাট্। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নরলীলোপযুক্ত অলৌকিক লীলামাধুর্য্যে স্বয়ংই মুগ্ধ। তাঁহার সমস্ত লীলার মধ্যে অপ্রাকৃত নরলীলা ও তাঁহার সমস্ত স্বরূপের মধ্যে অপ্রাকৃত নরবপু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি দ্বিভুজ, চির-কিশোর, মুরলীধর-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়বিগ্রহ এবং তদ্রাশ্রিত শক্তিবর্গ—আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁহারা সকলেই বিষয়ের রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের রূপে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীলক্ষ্মীগণও আকৃষ্ট। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও নিজরূপভোগার্থ নিজেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগা তীব্রা ভক্তি ব্যতীত সেই কৃষ্ণমাধুর্য্যের উপলব্ধি সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিখিল চিন্ময় সদ্‌গুণের সমাশ্রয়। তিনি—অখিলরসামৃতসিন্ধু। ব্রজে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতেই অন্যান্য ভগবত্তত্ত্বের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দমকরন্দ-পানে জড়সুলভ তৃপ্তি নাই। তাহাতে গোপীগণের প্রতিক্ষণে আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন হয়। কামগায়ত্রী সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, এক একটী অক্ষর—শ্রীকৃষ্ণের এক একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।”

[৯]

অভিধেয়-তত্ত্ব

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতনের নিকট এইরূপভাবে সম্বন্ধতত্ত্ব বর্ণন করিয়া সেই সম্বন্ধতত্ত্ব-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অভিধেয়তত্ত্ব-বর্ণনমুখে বলিলেন,—"হে সনাতন! শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রে 'কৃষ্ণভক্তি' 'অভিধেয়' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্—অভেদতত্ত্ব। যে শক্তি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সেবায় নিযুক্ত, সেই স্বরূপশক্তি—মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি ও স্বরূপ-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত। স্বাংশ-অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশবিলাস—চতুর্ব্বূহ ও অবতারগণ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বা শক্তিমত্তত্ত্ব; আর জীব—বিভিন্নাংশ বা শক্তিতত্ত্ব। সেই জীব দুই প্রকার— (১) নিত্যমুক্ত ও (২) নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও মায়া-সম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ধামে শ্রীকৃষ্ণ-চরণোন্মুখ থাকিয়া 'শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ'-নামে পরিচিত। একমাত্র কৃষ্ণসেবা-সুখই তাঁহাদের প্রয়োজন। নিত্যবদ্ধ জীবসকল শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করে; কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষের জন্য মায়াপিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের দ্বারা তাহাদিগকে অতিশয় জর্জ্জরিত করে। তাহারা কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর বিবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে থাকে; —ইহাই জীবের ভবরোগ। এইরূপভাবে সংসারে কখন ঊর্দ্ধে, কখন নিম্নে কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে যদি কখন সাধুবৈদ্যের কৃপা লাভ হয়, তবেই তাঁহার উপদেশমন্ত্রে মায়াপিশাচী পলায়ন করে এবং জীব শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া তাঁহার নিত্যসেবা ও লীলায় প্রবেশ-লাভার্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে গমন করে।

শাস্ত্রে অনেক স্থলে কর্ম্মকে, অনেক স্থলে যোগকে ও অনেক স্থলে জ্ঞানকে 'অভিধেয়' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তথাপি শাস্ত্র সর্ব্বত্র ভক্তিকেই 'সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণভক্তিই পরমপুরুষার্থ প্রেম-লাভের একমাত্র সাক্ষাৎ অভিধেয়; কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব, তাহা গৌণ; কেননা, ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই তাহাদের ফলাদি-প্রদানে যাহা কিছু সামর্থ্য ঘটে। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম্ম ও হঠযোগ

ভুক্তিফল এবং জ্ঞান ও রাজযোগ মুক্তি ও সিদ্ধি-ফল প্রদান করিতে পারে। ভক্তির আশ্রয়েই জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তির উদয় হইলে কোন জ্ঞান-চেষ্টা না করিলেও সেই মুক্তি স্বয়ংই উপস্থিত হয়। অতএব মুক্তি ভক্তির দাসী। ভক্তিমার্গেই একমাত্র নিত্যকল্যাণ লাভ হইতে পারে; তদ্ব্যতীত শুষ্কজ্ঞানে বৃথা পরিশ্রমই সার হয়।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্য-বিস্মৃতির ফলে জীবের যে সংসার-বন্ধন হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার লাভ ও প্রয়োজন-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-সহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি-যাজন। ভক্তিবিহীন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলেও 'রৌরব'-নরক হইতে উদ্ধার লাভ হয় না। যিনি একবারও কায়মনোবাক্যে 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হইলাম' —ইহা বলিয়া আত্মনিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার করেন। দুঃসঙ্গক্রমে জীবের মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি-কামনার উদয় হয়। আবার যদি কোন সৎসঙ্গে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তখন জীব ঐ সকল পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া গাঢ় শুদ্ধভক্তি-যোগে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূরীভূত হয় এবং তিনি কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র ও শক্তিশালী যে, তাহাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবক হইতে অভিলাষ করেন। সংসার-ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভববন্ধ-মোচনের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের ভাগ্যে সৎসঙ্গ-লাভ ঘটে ও সেই সৎসঙ্গফলে শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে। সেইরূপ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদি মহান্ত-গুরুর আবির্ভাবও সর্ব্বপ্রথমে না হয়, তথাপি কৃষ্ণ অন্তর্যামী গুরুরূপে তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন। মহাজনের শ্রীপাদপদ্মরজে অভিষেক ব্যতীত তপস্যা, বৈদিক অর্চ্চনা, সন্ন্যাসাদি ব্রত-পালন, গার্হস্থ্যধর্ম্ম-যাজন, বেদ-পাঠ অথবা জলাগ্নি সূর্য্যের পূজার দ্বারা কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না। ভগবৎ-সঙ্গিগণের সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য যে সর্ব্ব-গুহ্যতম উপদেশ করিয়াছেন এবং 'পরবিধি বলবান', এই ন্যায়ানুসারে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অভিধেয়

হইতে কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বোত্তমতা নিরূপণ করিয়াছেন ও সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে শরণাগত হইবার আদেশ করিয়াছেন, সেই বাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস হইলে তাহা 'ভক্ত্যধিকারদায়িনী শ্রদ্ধা' নামে কথিত হয়। সেই শ্রদ্ধাবন্ত ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে সুদক্ষ হইয়া দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াছেন, তিনি উত্তমাধিকারী; যিনি দৃঢ়-শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যমাধিকারী; যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। কোমলশ্রদ্ধদিগের হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায়। তাহা তিরোহিত হইলেই সাধক মধ্যমাধিকারী হন। সেই মধ্যমাধিকারগত-শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা যখন দৃঢ়ীকৃত হয়, তখনই উত্তমাধিকার-লাভ ঘটে। ইহা শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অধিকারি-বিভাগ। এতদ্ব্যতীত রতি ও প্রেমের তারতম্যানুসারে 'ভক্ত', 'ভক্ততর' ও 'ভক্ততম'—এইরূপ ত্রিবিধ বিভাগ আছে। শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগুণে বিভূষিত। স্ত্রৈণ ও অবৈধ স্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তিগণের অসৎসঙ্গ এবং কৃষ্ণ-বিরোধী মায়াবাদী প্রভৃতির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন মহা-ভাগবতগণের সঙ্গই বৈষ্ণবের আচার। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ঐ দুই প্রকার অসাধুসঙ্গ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আসক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চনভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণাপন্ন হইবেন। শরণাগতির ছয়প্রকার লক্ষণ—(১) কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প, (২) কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল, তাহা অবশ্য বর্জ্জন করিবার জন্য সুদৃঢ়তা, (৩) 'কৃষ্ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, (৪) কৃষ্ণকে একমাত্র পালয়িতৃ-রূপে বরণ, (৫) শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিক্ষেপ ও (৬) আপনাকে অত্যন্ত দীনহীন জ্ঞানে সর্ব্বদা অন্তরে অন্তরে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে দৈন্যার্ত্তি। শরণাগত ব্যক্তি শরীরের দ্বারা শ্রীভগবানের লীলাস্থান আশ্রয়পূর্ব্বক 'হে ভগবন্! আমি তোমার' ইহা মুখে বলিয়া ও মনে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

[১০]

সাধনভক্তি

হে সনাতন! এখন সাধনভক্তির লক্ষণসমূহ শ্রবণ কর। এই সাধনভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মহাধন লাভ হয়। সাধ্য-ভাবভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে পারে, তখন তাহারই নাম 'সাধনভক্তি'। অনুকূলভাবের সহিত

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ 'সাধনভক্তি'র স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ-ত্যাগ ও জ্ঞান-কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদনের দ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ-প্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু। কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত-চিত্তে তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধনভক্তি; তাহা দুইপ্রকার —(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগের উদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজনপ্রবৃত্তি হয়, তাহাই বৈধী ভক্তি। 'শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বদা স্মরণীয়, কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইবে না',—এই দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্রে যতপ্রকার বিধি ও নিষেধ উক্ত হইয়াছে। অসংখ্য বৈধী ভক্তির মধ্যে চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের বিষয় তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি,—

(১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষা অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষা, (৩) গুরুসেবা, (৪) সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা, (৫) সাধুদিগের পথানুগমন, (৬) কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নিজের ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস, (৮) যাহা মাত্র পাইলে জীবন-নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ পরিমাণে প্রতিগ্রহ, (৯) একাদশীর উপবাস এবং (১০) ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্র-বৈষ্ণবের সম্মান—এই দশটী অঙ্গই ভজনের প্রারম্ভরূপ; এবং (১১) সেবাপরাধ ও নামাপরাধকে দূরে বর্জ্জন, (১২) অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগ, (১৩) বহুশিষ্য না করা, (১৪) বহুগ্রন্থের কলা অর্থাৎ আংশিক অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদ-ত্যাগ, (১৫) হানিতে ও লাভে সমবুদ্ধি, (১৬) শোকাদির বশ না হওয়া, (১৭) অন্যদেবতা বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, (১৮) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক গৃহবার্ত্তা না শুনা, (২০) প্রাণি-মাত্রের মনে উদ্বেগ না জন্মান,—এই শেষ দশটী নিষেধ-লক্ষণ-অঙ্গ ব্যতিরেক-ভাবে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই কুড়িটী অঙ্গই ভজনমন্দিরের প্রবেশদ্বার-স্বরূপ; তন্মধ্যে 'গুরুপাদাশ্রয়', 'দীক্ষা' ও 'গুরুসেবা'—এই তিনটী প্রধান অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পূজন, (৫) বন্দন, (৬) পরিচর্য্যা, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্মনিবেদন, (১০) শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য, (১১) গীত, (১২) বিজ্ঞপ্তি, (১৩) দণ্ডবৎ-প্রণাম, (১৪) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান, (১৫) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভক্ত বা ভগবান্ যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া, (১৬) তীর্থে বা ভগবদ্গৃহে গমন, (১৭) পরিক্রমা, (১৮) স্তবপাঠ, (১৯) জপ, (২০) সংকীর্ত্তন, (২১) ভগবৎ-

প্রসাদী ধূপ ও মাল্যের গন্ধ-গ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ-সেবন, (২৩) আরাত্রিক-মহোৎসব-দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, (২৫) নিজ-প্রিয়বস্তু ভগবানকে অর্পণ, (২৬) ধ্যান, তদীয়-সেবন অর্থাৎ (২৭-ক) তুলসী প্রভৃতির সেবন, (২৮-খ) বৈষ্ণবসেবন, (২৯-গ) মথুরায় বাস এবং (৩০-ঘ) ভাগবতের আস্বাদ, (৩১) কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, (৩২) তাঁহার কৃপা-প্রতীক্ষা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত জন্মদিনাদির মহোৎসব, (৩৪) সর্ব্বপ্রকার শরণাপত্তি, (৩৫) কার্ত্তিকাদি ব্রত, —এই পঁয়ত্রিশটী অঙ্গে আর চারিটী অঙ্গ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ দেহে (১) বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, (২) হরিনামাক্ষর-ধারণ, (৩) নির্ম্মাল্যধারণ ও (৪) শ্রীচরণামৃত-পান; —এই চারিটী অঙ্গ অর্চ্চনাদির অন্তর্গত। এই চারিটীর যোগে ঊনচল্লিশ (৩৯)টী অঙ্গ হয়। তাহাতে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবত-শ্রবণ, (৪) মথুরাবাস, (৫) শ্রদ্ধা ও প্রীতি-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিসেবারূপ আর পাঁচটী অঙ্গ পুনরায় যোগ করিতে হইবে। এই পাঁচটী যোগ করিয়া চুয়াল্লিশটী অঙ্গ হয়। এই ৪৪টী পূর্ব্বোক্ত ২০টীর সহিত যোগে মোট ৬৪টী ভক্ত্যঙ্গ হইল। এই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ যজন বা উপাসনা; ইহার মধ্যে কতকগুলি—একেবারে পৃথক্, আর কতকগুলি—মিশ্রভাবাপন্ন।

এই চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবত-শ্রবণ, (৪) মথুরায় বাস এবং (৫) শ্রদ্ধা ও বিশেষ প্রীতির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে কেহ এক অঙ্গ সাধন করেন, কেহ বা বহু অঙ্গ সাধন করেন। নিষ্ঠার ফলে প্রেমের উদয় হয়। অম্বরীষাদি ভক্তগণ বহু অঙ্গ সাধন করিয়াছেন; আবার নববিধা ভক্তির মধ্যে কেবলমাত্র শ্রবণ-ভক্তি-যাজনের দ্বারা শ্রীপরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীবিষ্ণুস্মরণের দ্বারা শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীপাদপদ্ম-সেবনের দ্বারা শ্রীলক্ষ্মী, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীপৃথু মহারাজ, বন্দনের দ্বারা শ্রীঅক্রূর, দাস্যভক্তি দ্বারা শ্রীহনুমান্, সখ্যভক্তি দ্বারা শ্রীঅর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনের দ্বারা শ্রীবলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

একান্ত শরণাগত ভক্ত দেব-ঋষি-পিত্রাদির ঋণে ঋণী নহেন। তিনি বিধিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন; নিষিদ্ধ-পাপাচারে তাঁহার মন কখনও ধাবিত হয় না। অজ্ঞানে দৈবাৎ যদি সাধকের কোন পাপ উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায়ই তাঁহার সম্পূর্ণ পাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরু-রূপে সেই পাপ শোধন করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও আত্মধর্ম্ম ভক্তির

অঙ্গ নহে; তাহাদিগকে ভক্তির অনুগামী পুত্রদ্বয় বলা যাইতে পারে। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও বৈরাগ্যে শ্রেয়োলাভ হয় না। শুদ্ধভক্তে আনুষঙ্গিকভাবেই অহিংসাদি গুণ আছে।

[১১]

প্রয়োজনতত্ত্ব

হে সনাতন! এখন রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির কথা শ্রবণ কর। শ্রীগোপীবৃন্দ, শ্রীনন্দ-যশোদা শ্রীদাম-সুদামাদি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিজনে যে স্বাভাবিকী-রাগময়ী ভক্তি, তাহা আর কোথায়ও নাই; তাহাই 'রাগাত্মিকা ভক্তি'-নামে খ্যাত। উহার অনুগত-ভক্তিকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ ও আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ। সেই রাগময়ী ভক্তির কথা শুনিয়া সুদুর্ল্লভ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির তাহা অনুসরণ করিবার লোভ জন্মে। ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার প্রদান করিয়া থাকে; বস্তুতঃ শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তির কারণ নহে। রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধক-শরীরে কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির আশ্রয় করিয়া ও সিদ্ধস্বরূপে নিত্য-সেবনোপযোগী মানসদেহে তদনুরাগী ব্রজজনের আনুগত্যে সেবা করিয়া থাকেন। রাগানুগ-ভক্ত সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদের কথায় রত থাকিয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করেন। শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে বিশুদ্ধ মনে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিয়া থাকেন।

হে সনাতন! এখন তোমাকে প্রয়োজনতত্ত্ব সাধ্য-প্রেম ভক্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্থায়িভাব বা রতি প্রেমের তরল বা অঙ্কুরাবস্থা; গাঢ় বা পক্কাবস্থার নাম 'প্রেম'। প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থলীয় বিশুদ্ধতত্ত্বস্বরূপ রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে। শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ; রুচির দ্বারা চিত্তকে যে মসৃণ করে, তাহাই ভাবের তটস্থ-লক্ষণ। যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখনই তাহাকে 'প্রেম' বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণে অনন্য-মমতা অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র

মমতার পাত্র, আর কেহই নহে' এইরূপ প্রেম-সঙ্গত-মমতাকে মহাজনগণ 'প্রেমভক্তি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-বলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধন ভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসকল নিবৃত্ত হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়কাল হইতেই শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা স্থূল অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হইলে শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তির প্রতি নিষ্ঠারূপে উদিত হয়; নিষ্ঠাই ক্রমে রুচি হইয়া পড়ে। সেই রুচি হইতে পরে আসক্তি জন্মে। আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ ভাব বা রতির উদয় হয়। সেই রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রেমই সর্ব্বানন্দধাম-স্বরূপ প্রয়োজনতত্ত্ব।

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি,—এই পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি; তাহা হইতে ক্রমশঃ ভাবভক্তি, অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে। যাঁহার হৃদয়ে ভাবভক্তির অঙ্কুর উদিত হইয়াছে, তাঁহাতে নয়প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা— (১) ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের অক্ষোভতা, (২) অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার ব্যতীত ক্ষণমাত্রও কাল বৃথা না যায় এজন্য যত্ন, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, (৪) মানশূন্যতা অর্থাৎ উত্তম হইয়াও আপনাকে অন্তরে হীনজ্ঞান, (৫) আশাবন্ধ অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবাপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃঢ়-আশা, (৬) সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ নিজাভীষ্ট-লাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা, (৭) কৃষ্ণনামগানে সর্ব্বক্ষণ স্বাভাবিকী রুচি, (৮) শ্রীকৃষ্ণগুণ বর্ণনে আসক্তি ও (৯) শ্রীকৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি।

হে সনাতন! তোমাকে ভাবভক্তির লক্ষণ বলিলাম, এখন প্রেমভক্তির লক্ষণ শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিকের বাক্য, অনুষ্ঠান ও মুদ্রা বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও বুঝিতে সমর্থ হন না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকগণ কখন অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনে জাতানুরাগ-বশতঃ উৎকণ্ঠিত-হৃদয় হন, কখনও বা লোকাপেক্ষাশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করিয়া থাকেন।

প্রেমের গাঢ়ত্বের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রেম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও সর্ব্বশেষে মহাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যেরূপ গুড় হইতে খণ্ডসার, তদপেক্ষা শর্করা, তদপেক্ষা সিতামিসরি, তদপেক্ষা শুদ্ধ মিসরি ক্রমে ক্রমে উন্নত, সেইরূপ প্রেমের গাঢ় অবস্থাসমূহের তারতম্য অনুসারে রসাস্বাদনের তারতম্য হয়। অধিকারভেদে রতি পঞ্চপ্রকার— (১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। এই পঞ্চরসেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। অপ্রাকৃত রতিকেই 'স্থায়িভাব' বলে। সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐ সকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য্য', সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকলই রসের 'সহায়'। বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং কৃষ্ণের গুণগণই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব ত্রয়োদশ প্রকার— (১) নৃত্য, (২) বিলুঠিত, (৩) গীত, (৪) ক্রোশন, (৫) তনুমোটন, (৬) হুঙ্কার, (৭) জৃম্ভন, (৮) শ্বাসবৃদ্ধি, (৯) লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, (১০) লালাস্রাব, (১১) অট্টহাস, (১২) উদ্‌ঘূর্ণা, (১৩) হিক্কা। এককালেই সমস্ত অনুভাব-লক্ষণ উদিত হয় না। রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে, সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়।

সাত্ত্বিকবিকার অষ্টপ্রকার— (১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু ও (৮) প্রলয়।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশ প্রকার; যথা— (১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি ও (৩৩) প্রবোধ।

‘ভাব’রূপ অলঙ্কার বিংশ প্রকার; যথা— (ক) অঙ্গজ— (১) ভাব, (২) হাব, (৩) হেলা; (খ) অযত্নজ— (৪) শোভা, (৫) কান্তি, (৬) দীপ্তি, (৭) মাধুর্য্য, (৮) প্রগল্‌ভতা, (৯) ঔদার্য্য, (১০) ধৈর্য্য; (গ) স্বভাবজ— (১১) লীলা, (১২) বিলাস, (১৩) বিচ্ছিত্তি, (১৪) বিভ্রম, (১৫) কিলকিঞ্চিত, (১৬) মোট্টায়িত, (১৭) কুট্টমিত, (১৮) নিৰ্ব্বোক, (১৯) ললিত ও (২০) বিকৃত।

শান্তরসে ‘রতি’ বৃদ্ধি পাইয়া ‘প্রেম’ পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। দাস্যরসে ‘দাস্যরতি’ স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। সখ্যরসে ‘সখ্যরতি’ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাৎসল্যরসে ‘বাৎসল্য-রতি’ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত উন্নত হয়। বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরসাশ্রিত হইয়াও শ্রীসুবল প্রভৃতির সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমান হয়। মধুর-রসে মধুর-রতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রূঢ় ও অধিরূঢ়-মহাভাব কেবলমাত্র মধুর-রসেই বৰ্ত্তমান। দ্বারকায় ‘রূঢ়’ এবং গোকুলেই কেবল ‘অধিরূঢ়’-ভাব দৃষ্ট হয়। অধিরূঢ় মহাভাব দ্বিবিধ— (১) সম্ভোগে মাদন ও (২) বিরহে মোহন। মাদন ও মোহনে নানাপ্রকার ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভোগ অসংখ্য প্রকার। বিপ্রলম্ভ চতুৰ্ব্বিধ— (১) পূর্ব্বরাগ, (২) প্রবাস, (৩) মান ও (৪) প্রেমবৈচিত্ত্য। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণে প্রকাশিত। শ্রীদ্বারকায় শ্রীমহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই—নায়ক-শিরোমণি এবং শ্রীরাধা—নায়িকা-শিরোমণি। নায়করূপী শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য সদ্‌গুণরাশির মধ্যে ৬৪টী প্রধান গুণ। তন্মধ্যে ৫০টী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সৰ্ব্বজীবে ও পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণে বৰ্ত্তমান। এই ৫০টীর উপর আরও ৫টী মহাগুণ পূর্ণরূপে শ্রীবিষ্ণুতে ও আংশিকরূপে শ্রীশিবাদি দেবতাতে বৰ্ত্তমান। বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণে আরও ৫টী গুণ অর্থাৎ ৬০টী গুণ পরিপূর্ণভাবে আছে; আর শ্রীকৃষ্ণে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা আরও ৪টী নিজস্ব অধিক গুণ অর্থাৎ সৰ্ব্বশুদ্ধ ৬৪টী গুণ পরিপূর্ণরূপে নিত্য বৰ্ত্তমান। শ্রীরাধার যে ২৫টী গুণ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরস অভক্তগণের আস্বাদ্য নহে; একমাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তগণই তাহা আস্বাদনের অধিকারী।

[১২]

আচার্য্যপদে স্থাপন

"হে সনাতন! তোমাকে সংক্ষেপে এই প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার বলিলাম। আমি পূর্ব্বে তোমার ভ্রাতা শ্রীরূপকে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীকৃষ্ণরসের কথা বলিয়াছি। তোমার উপর আমি চারিটী কার্য্যের ভার প্রদান করিতেছি; তন্মধ্যে প্রথমটী—জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন, দ্বিতীয়টী—শ্রীমথুরা-মণ্ডলে লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ও স্থান-নিরূপণ, তৃতীয়টী—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-প্রকটন ও চতুর্থ—বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন ও প্রচার। যুক্ত-বৈরাগ্যই জীবের কাম্য ও সাধ্য, ফল্গুবৈরাগ্য সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। জগৎকে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্যবহার করিলে যুক্ত-বৈরাগ্য হয়। জগৎকে মায়াময় মনে করিয়া কৃষ্ণসেবার উপকরণকেও অনিত্য ও মায়াময়-জ্ঞানে পরিহার করিলে শুষ্ক-বৈরাগ্য হইয়া থাকে।"

শ্রীসনাতন পুনরায় পরিপ্রশ্ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে মৌষল-লীলা, কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান, কেশাবতার, মহিষীহরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রবণ করিলেন। মৌষল-লীলাদি আখ্যায়িকা সমস্তই মিথ্যা, উহা অপ্রাকৃত নিত্য-লীলা নহে। মূঢ়মতি, বিষ্ণুবিদ্বেষী, অসুরপ্রকৃতি লোকদিগের মোহ ও ভ্রমোৎপাদনের উদ্দেশ্যে উহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুখে এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীল সনাতন অতি দৈন্যভরে প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন,—"প্রভো! আমি অত্যন্ত নীচ, অতি পামর; আমাকে ব্রহ্মারও অগোচরীভূত সৎসিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করাইয়া আপনি কৃতার্থ করিয়াছেন। আপনি যে সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু শ্রীমুখপদ্ম হইতে প্রবাহিত করিয়াছেন, আমার মন তাহার একবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারে না। যদি প্রকৃতই পঙ্গুকে নৃত্য করাইবার জন্য আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মস্তকে শ্রীচরণ ধারণ-পূর্ব্বক এই বর প্রদান করুন, যেন আপনার কথিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আপনার কৃপাবলে আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ স্ফূর্ত্তিলাভ করে।" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তখন শ্রীসনাতনের মস্তকে হস্তধারণ করিয়া "তোমার এই সকল সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তিলাভ করুক।" বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

শ্রীসনাতনের প্রার্থনামতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ"-শ্লোকের একষষ্টিপ্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'শ্রীনারদ-ব্যাধ-সংবাদ'-

নামক একটি আখ্যায়িকা উল্লেখ করিয়া সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্তুতি করিলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। পুনরায় শ্রীল সনাতন যুক্তকরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"প্রভো! আপনি আমাকে বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমি অতি নীচ, পামর। আমি কোন বিচার জানি না। আমাদ্বারা কিরূপে বৈষ্ণবস্মৃতির প্রচার সম্ভব হইবে? আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক সূত্র করিয়া স্মৃতি-রচনার প্রণালী উপদেশ ও আমার হৃদয়ে স্বয়ং প্রবেশ করেন, তবেই এই অযোগ্যতম অধম-ব্যক্তি বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলন-সেবায় যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে। আপনি ঈশ্বর; আপনি যাহা করাইবেন, তাহাই সিদ্ধ হইবে।" ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে বলিলেন,—"তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিবে, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সেই সেই বিষয়ই স্ফূর্ত্তি করাইবেন। তথাপি আমি তোমাকে কিভাবে বৈষ্ণবস্মৃতির সঙ্কলন করিতে হইবে, তাহারই কতিপয় সূত্রের দিগ্‌দর্শন করিতেছি। সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপদাশ্রয়, শ্রীগুরুর লক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, উভয়ের পরীক্ষা, সেব্যনিরূপণ, সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ, মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্রসিদ্ধ্যাদি, শোধন, দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, প্রাতঃকৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ, চক্রাদি (মুদ্রা-) ধারণ, গোপীচন্দনধারণ, কৃষ্ণার্পিত মাল্যধারণ, তুলসী-আহরণ, বস্ত্রসংস্কার, পীঠসংস্কার, গৃহসংস্কার, কৃষ্ণপ্রবোধন, পঞ্চোপচার, ষোড়শোপচার, পঞ্চাশোপচার, দশোপচার, চতুঃষষ্টি-উপচার, পঞ্চকাল, পূজা-আরাত্রিক-নীরাজনাদি, শ্রীকৃষ্ণের ভোজন, শ্রীকৃষ্ণের শয়ন, শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, শ্রীশালগ্রামলক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিদর্শন, শ্রীনামমহিমা, নামাপরাধ-বর্জ্জন, বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন, শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ, জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ ও বন্দনা, পুরশ্চরণবিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন, অনিবেদিত দ্রব্যত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদিবর্জ্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, মাসকৃত্য, একাদশী প্রভৃতির বিবরণ, জন্মাষ্টমী-পালনবিধি-বিচার, শ্রীএকাদশী, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীবামনদ্বাদশী, শ্রীরামনবমী, শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-তিথিতে বিদ্ধা তিথি পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধা তিথির আরাধন, অকরণে দোষ ও পালনে ভক্তিলাভ, শ্রীমূর্ত্তির প্রাকট্য ও শ্রীবিষ্ণুমন্দিরাদি-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা, সামান্য সদাচার ও বৈষ্ণব-সদাচার, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার, স্মার্ত্তব্যবহার—এই প্রসঙ্গ লইয়া একটী

বৈষ্ণবস্মৃতির সঙ্কলন করিবে এবং সর্ব্বত্র সাত্বতপুরাণের বাক্যসমূহ প্রমাণস্বরূপে প্রদান করিবে।”

এইরূপে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজজন শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে কাশীতে দুইমাস কাল সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত-শিক্ষা দান করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কাশীর শ্রীপ্রকাশানন্দ-প্রমুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিলেন। সেইদিন হইতে কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত হইলেন।

সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে নর্ত্তন।।
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুরী প্রভু করিলা নিস্তার।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৫৮-৫৯)

শ্রীগৌরসুন্দর একে একে সকল ভক্তকে বিদায় দান করিয়া স্বয়ং একাকী ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীনীলাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্রীল সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সমীপে গমনার্থ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর অতি করুণার্দ্রস্বরে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রী ভক্তগণের সুখবিধানার্থ শ্রীসনাতনকে আদেশ করিলেন,—

“কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁ'দের করিহ পালন।।”

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৭৬)

এদিকে শ্রীসনাতন রাজপথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; আর শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম শ্রীসনাতনের অন্বেষণে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপ্রয়াগে আগমন করিলেন। তাহাতে দুই ভাই একদিকে ও আর একভাই অন্যদিকে অন্যপথে যাত্রা করায় ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার হইল না।

শ্রীসুবুদ্ধি রায়—যিনি পূর্ব্বে হুসেন শাহের কার্য্য করিতেন, তিনিও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতনের সহিত

শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের সাক্ষাৎকার হইলে তিনি শ্রীল সনাতনের প্রতি পূর্ব্বাশ্রমোচিত ব্যবহার ও স্নেহ প্রদর্শন করায় শ্রীল সনাতন তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। মহাবিরক্ত শ্রীল সনাতন শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে অহর্নিশ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া লুপ্ততীর্থসমূহ প্রকট করিলেন।

মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে।।
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।২০৭-৮)

শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম শ্রীকাশীতে আসিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন মিশ্রের নিকট শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-সংবাদ শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীরূপ কাশীতে একপক্ষ-কাল থাকিয়া গৌড়দেশ হইয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন এবং তথায় দোলযাত্রা পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপকে শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার আদেশ ও শ্রীল সনাতনকে শ্রীনীলাচলে প্রেরণার্থ আজ্ঞা করিলেন।

[১৩]

শ্রীনীলাচলে শ্রীল সনাতন

শ্রীরূপ নীলাচল হইতে যখন গৌড়ে আগমন করিলেন, তখন শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ড-বনপথে একাকী কোনদিন উপবাস, কোনদিন কিছু সামান্য শুষ্ক মাধুকরী চর্ব্বণ ও বহু কৃচ্ছ্রতা করিয়া পথিমধ্যে অত্যন্ত নির্ব্বেদ ও দৈন্য-নিবেদন করিতে করিতে পুরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঝারিখণ্ডের জলের দোষে ও অত্যন্ত উপবাস হইতে শ্রীল সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে বহির্দর্শনে কণ্ডু (খোস-পাঁচড়া) দৃষ্ট হইল। উহা কণ্ডূয়ন-কালে (চুলকাইবার সময়) তাহা হইতে রস নির্গত হইত। শ্রীল সনাতন লোকশিক্ষার জন্য স্বীয় অপ্রাকৃত দেহে ঐরূপ অসুস্থতার লীলা প্রকট করিয়া কর্ম্মফলবাধ্য ভবব্যাধিযুক্ত জীবকে আত্মধিক্কার

ও নির্ব্বেদ-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অনেকে শ্রীহরিসেবা হইতে অবসর-গ্রহণের সুযোগ ও সমর্থন অনুসন্ধান করিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভু—

নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
"নীচ-জাতি, দেহ মোর—অত্যন্ত অসার।।
জগন্নাথে গেলে তাঁ'র দর্শন না পাইমু।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু।।
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁ'র বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি।।
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে।
তাঁ'র স্পর্শ হৈলে মোর হ'বে অপরাধে।।
তা'তে যদি এই দেহ ভাল-স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয়, আর সদ্‌গতি পাইয়ে।।
জগন্নাথ রথ-যাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁ'র পথ-চাকায় ছাড়িমু এই শরীর।।
মহাপ্রভুর আগে আর দেখি' জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িমু,—এই পরম-পুরুষার্থ।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৬-১২)

শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভু শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকালে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া নীলাচলে আগমন করিলেন এবং শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীল সনাতন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ-দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইলে শ্রীল হরিদাস শ্রীল সনাতনকে জানাইলেন যে, শীঘ্রই শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইবেন। শ্রীজগন্নাথের উপলভোগ দর্শন করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাসের স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় শ্রীসনাতনকে দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইলেন এবং শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য

অগ্রসর হইলে শ্রীসনাতন পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে এইরূপ দৈন্যোক্তি করিলেন,—

"মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডূরসা গায়।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২০)

শ্রীগৌরসুন্দর বলপূর্ব্বক নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তবরকে আলিঙ্গন করিলেন ও সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীসনাতনের সাক্ষাৎকার করাইলেন। মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া একটি উচ্চস্থানে উপবেশন করিলে শ্রীল সনাতন দৈন্যভরে নিম্নে বসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে ব্রজবাসী ভক্তগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীরূপের গৌড়-গমনের ও শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা জানাইলেন। শ্রীসনাতন অতি দৈন্যভরে প্রভুর অযাচিত কৃপার মহিমা বর্ণন করিয়া কনিষ্ঠ অনুপমের শিশুকাল হইতে আজীবন শ্রীরামনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগের উভয়ের জন্য শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ প্রেরণ করিলেন। শ্রীসনাতন অতিশয় দৈন্যভরে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেন না; শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীল সনাতন ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন করিতেন। একদিন অন্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের পূর্ব্বসঙ্কল্প প্রকাশ্যভাবে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসা-স্থানে আসিয়া ভঙ্গীর সহিত জ্ঞাপন করিলেন,—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে।।
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে।।
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম।।
'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।।

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তা'তে কৃষ্ণের চরণ।।
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে।।
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ।।
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পা'বে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন।।
নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান।।
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৫-৫৮, ৬০-৬২,
৬৫-৬৮, ৭০-৭১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীল সনাতন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং জীবশিক্ষার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে ফল্গুদেহত্যাগেচ্ছা-পরিত্যাগের লীলাভিনয় করিলেন। শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন,—

"সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি,—যেন কাষ্ঠযন্ত্র।।

নীচ, অধম, পামর মুঞি, পামর-স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হ'বে লাভ?"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৭৪-৭৫)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

* * "তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে কৈরাছ আত্মসমর্পণ।।
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন'।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন।।
ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব-আচার।।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ।।
নিজ-প্রিয়স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন।
তাহাঁ এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ।।
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ 'ধর্ম্ম' শিখাইতে নাহি নিজ-বলে।।
এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিমু।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিমু?"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৭৬-৮৩)

শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুর দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমতঃ 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' রচনা করাইয়া ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও আচার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুর অদ্ভুত অনুষ্ঠান-দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্র দ্বারা মানসে ব্রজভজন প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন;

চতুর্থতঃ কুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসময় আদর্শ-ভক্তজীবনের দ্বারা শুদ্ধভক্তের অনুসরণীয় বিরক্ত জীবন-যাপন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত প্রিয়ভূমি; শ্রীসনাতনকে সেই ভূমিতে অবস্থান করাইয়া প্রভু তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন।

শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যন্ত্রী ও আপনাকে তাঁহার যন্ত্র-জ্ঞানে প্রভুর স্তুতি করিলেন,—

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে, পুতলী কিবা গায়!
যা'রে যৈছে নাচাও, সে তৈছে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৮৫-৮৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের দেহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার শ্রীল হরিদাসের উপর অর্পণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রস্থান করিলে শ্রীল হরিদাস শ্রীল সনাতনের সৌভাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং স্বাভাবিক দৈন্যের সহিত বলিলেন,—

"আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারতভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল!"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৯৮)

তখন শ্রীল সনাতন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের স্তুতি করিয়া বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণে আপনি মহাভাগ্যবান্। শুদ্ধ-নামকীর্ত্তন-প্রচারের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার; তাহাই তাঁহার নিজকৃত্য। আপনার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সেই নিজকার্য্য করাইতেছেন। আপনি প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়া আচারমুখে শ্রীনামের মহিমা প্রচার করিতেছেন।"

"আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার।।

'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

ক্রমে রথযাত্রার কাল উপস্থিত হইল; গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত নৃত্য-দর্শনে শ্রীল সনাতন চমৎকৃত হইলেন। চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তগণ একত্র মিলিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের সহিত শ্রীসনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

শ্রীল সনাতন নিজগুণে সকলেরই স্নেহপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

সদ্‌গুণে, পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয়—সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১১২)

গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর সঙ্গে দোল-যাত্রাদি মহোৎসব দর্শন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর জ্যৈষ্ঠমাসের নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় শ্রীল সনাতনের প্রতি একটী পরীক্ষা-লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন মধ্যাহ্নে যমেশ্বর শিবের উদ্যানপল্লীতে পদার্পণ করিয়া ভক্তানুরোধে তথায় ভিক্ষা করেন এবং মধ্যাহ্ন-ভিক্ষাকালে শ্রীসনাতনকেও তথায় নিমন্ত্রণ করেন। মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালুকা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হয়; কিন্তু 'শ্রীমন্মহাপ্রভু আহ্বান করিয়াছেন', ইহা অনুভব করিয়া শ্রীসনাতন অত্যন্ত আনন্দিত-মনে উল্লাসভরে সেই তপ্ত বালুকার পথে মুক্তপদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। তপ্ত বালুকায় তাঁহার পদতল দগ্ধ হইতেছিল ও বহু ব্রণ হইল; কিন্তু ইহা কিছুই শ্রীসনাতনের অনুভবের বিষয় হয় নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখানুসন্ধান-স্মৃতিতে বিভোর ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভিক্ষান্তে বিশ্রাম করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীল সনাতন যমেশ্বর-টোটায় আগমন করিয়া শ্রীগোবিন্দ-প্রদত্ত প্রভুর ভিক্ষাবশেষ পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং প্রসাদ-সম্মানের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে উপনীত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীসনাতন কোন্ পথে আসিয়াছেন', জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল শ্রীসনাতন সমুদ্রপথে আগমনের কথা জানাইলেন। প্রভু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তপ্ত-বালুকার মধ্য দিয়া কিরূপে আসিলে? সিংহদ্বারের

শীতল পথে আসিলেই ত' পারিতে। তপ্ত-বালুকার স্পর্শে তোমার পদতলে ব্রণ হইয়াছে; তাই তুমি চলিতে পারিতেছ না!" শ্রীল সনাতন বলিলেন,—"আমি অধিক কষ্ট পাই নাই। ব্রণ হইয়াছে বলিয়া বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। সিংহদ্বারে আমার যাইবার অধিকার নাই। তথায় শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ গমনাগমন করেন। দৈবাৎ স্পর্শ ঘটিলে বিশেষ অপরাধ হইবে।" শ্রীল সনাতনের এইরূপ আদর্শ মানদ-ব্যবহারের কথা-শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভু মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও শ্রীল সনাতনকে বলিলেন,—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ।।
তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ।।
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন?"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১২৯-৩২)

পাঠক! ভক্ত ও ভগবানের এই আদর্শ আচার ও প্রচার হইতে যুগমানব কি মহামূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারে, তাহা গম্ভীরভাবে ভাবিবার বিষয়। শ্রীল সনাতন উচ্চতম কুল ও পাণ্ডিত্যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও মর্য্যাদা-রক্ষণের জন্য কিরূপ আচরণ করিয়াছেন! আর স্বয়ং শ্রীভগবান্ স্বীয় প্রাণাধিক ভক্তের বাহ্যদর্শনে দুঃসহ ক্লেশসত্ত্বেও সেইরূপ আদর্শ আচরণকে কিরূপ বহুমানন করিয়াছেন! শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী কিরূপ অদাম্ভিক ও মানদ হইবেন, তাহার শিক্ষা আচার্য্যের এই আচরণের মধ্যে পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে জাগতিক অভ্যুদয়কামি-সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ-আন্দোলনের আকারে যে-সকল দাম্ভিকতার আদর্শ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে জীবকুলকে সতর্ক করিয়া অমানি-মানদ শ্রীহরিকীর্ত্তনকারিগণের মহীয়ান্ ও মঙ্গলময় আদর্শ-স্থাপন-কল্পে শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানের লীলা। মর্য্যাদা-রক্ষণই শ্রীহরিভজনকারীর ভূষণ। তিনি কখনও দাম্ভিক ও মৎসর নহেন। দৈন্য ও পরদুঃখদুঃখিতাই তাঁহার নিত্যস্বভাব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনের ঐ মানদ-ব্যবহারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত-তনু নিজপ্রেষ্ঠ শ্রীল সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে শ্রীল সনাতনের শ্রীঅঙ্গের কণ্ডূরসার সংস্পর্শ হইল। ইহা দেখিয়া শ্রীল সনাতন অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিয়া দৈন্যময় কাতরোক্তিতে পুনঃ পুনঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবারণ করিলেন।

[১৪]

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীসনাতন

একদিন পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ শ্রীল সনাতনের নিকট আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা সংলাপ করিবার পর শ্রীজগদানন্দকে শ্রীসনাতন বলিলেন,—"শ্রীহরিসেবার অনুপযোগী এই ঘৃণ্য দেহকে শ্রীরথাগ্রে বিসর্জ্জন করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভু তাহা হইতে আমাকে বিরত করিলেন। আবার মহাপ্রভু আমাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করায় আমি আরও অধিক অপরাধে নিমগ্ন হইতেছি! আমার শরীরের কণ্ডূরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে স্পৃষ্ট হয়, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা, লজ্জা ও অপরাধ আশঙ্কা করিতেছি। আমি হিতের জন্য আসিলাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে বিপরীত ঘটিল। এখন কি করিলে হিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করুন।" শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনেই এখন আপনার বাস করা উচিত। আপনি শ্রীরথযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করুন।" শ্রীল সনাতন বলিলেন,—"আপনার এই উপদেশ অতি উত্তম; কারণ, শ্রীবৃন্দাবনই আমার 'প্রভু-দত্ত দেশ', আমি তথায়ই যাইব।"

অন্য একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীল হরিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছিলেন। কিন্তু প্রভু শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সম্মুখে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীল সনাতন অপরাধ আশঙ্কা করিয়া কিছুতেই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্রুতবেগে শ্রীসনাতনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া শ্রীসনাতন পলায়ন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক শ্রীসনাতনকে ধরিয়া আনিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন শ্রীসনাতন নিরুপায় হইয়া দৈন্য সহকারে বলিতে লাগিলেন,—

"হিত লাগি' আইনু মুঞি, হৈল বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহি, অপরাধ করোঁ নিতি নিতি।।
সহজে নীচ-জাতি মুঞি, দুষ্ট, 'পাপাশয়'।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়।।
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডূরসা-রক্ত চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শহ তুমি বলে।।
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশে।
এই অপরাধে মোর হ'বে সর্ব্বনাশে।।
তা'তে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় 'কল্যাণ'।
আজ্ঞা দেহ' রথ দেখি, যা'ব বৃন্দাবন।।
জগদানন্দ-পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ উপদেশ দিল।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৫১-৫৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া শ্রীজগদানন্দের প্রতি ভৎর্সনা-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল?
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি—তা'র গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য।।
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা, করে ঐছে কার্য্য।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৫৮-১৬০)

ইহাতে শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন,—"অহো, পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দের কিরূপ সৌভাগ্য, তাহা আজ বুঝিতে পারিলাম এবং আমি যে কতটা দুর্ভাগা, তাহাও জানিলাম। জগতে শ্রীজগদানন্দের ন্যায় ভাগ্যবান্ আর নাই; কারণ,—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দারস।।
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্।।”

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৩-৬৪)

সাধু পাঠক! আমাদের শ্রীগুরুবর্গ যখন তাঁহার কোন সর্ব্বক্ষণ-সেবাকারী, অন্যাভিলাষ-রহিত, অকপট সেবককে শাসন বা রূঢ়ভাষায় তিরস্কারাদি করেন, তখন আমরা মনে করি—‘ঐ সেবক একেবরেই পতিত হইয়া গিয়াছে; আর যখন আমাদিগকে শ্রীগুরুবর্গ সেইরূপ শাসনাদি করিতেছেন না, তখন আমরা তাঁহাদের অভীষ্টানুযায়ী সেবায় সততযুক্ত রহিয়াছি।’ বস্তুতঃ প্রকৃত শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ সেবকের বিচার শ্রীল সনাতনপ্রভুর ন্যায়ই হইয়া থাকে; আর গুরুপ্রেষ্ঠব্রুব দাম্ভিকগণ আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণব’-বিচারে, শ্রীগুরুদেবের কৃপা-শাসনে অভিষিক্ত প্রকৃত শিষ্যের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া একাধারে শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা হইতে বঞ্চিত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর কিছু লজ্জিত হইয়া শ্রীল জগদানন্দ ও শ্রীল সনাতনের প্রতি স্নেহপ্রীতির বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণন এবং শ্রীজগদানন্দের প্রতি তিরস্কারের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলেন,—

“জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে।।
কাহাঁ তুমি—প্রামাণিক, শাস্ত্রে প্রবীণ!
কাহাঁ জগা—কালিকার বটু নবীন!
আমাকেহ বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি।।
তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তা'রে আমি করিয়ে ভর্ৎসন।।
বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ।।

যদ্যপি কাহার 'মমতা' বহুজনে হয়।
প্রীতি-স্বভাবে কাহাঁ কোন ভাবোদয়।।
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান।।
অপ্রাকৃত-দেহ তোমার 'প্রাকৃত' কভু নয়।
তথাপি তোমার তা'তে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়।।
'প্রাকৃত' হৈলেহ তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নহি 'অপ্রাকৃতে'।।
'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্রজ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম'।।
আমি ত'—সন্ন্যাসী, আমার 'সম-দৃষ্টি' ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় 'সম'।।
এই লাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজধর্ম্ম যায়।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৬-১৭৪, ১৭৬, ১৭৯-১৮০)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—"ইহা আপনার বাহ্য প্রতারণামাত্র; আমরা ইহা স্বীকার করি না।

আমা-সব অধমে যে কৈরাছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৮২)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সহাস্য-বদনে স্বীয় যথার্থ হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

"তোমারে 'লাল্য', আপনাকে 'লালক'-অভিমান।
লালকের নাহি লাল্য-দোষ-পরিজ্ঞান।।
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান।।

মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায়।।
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজয়।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১৮৪-৮৭)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"তুমি ঈশ্বর; দয়াই তোমার স্বভাব। তোমার গম্ভীর হৃদয় ক্ষুদ্র জীবের ধারণার অগম্য। তুমি গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবকে কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলে, তৎফলে তাহার অঙ্গ কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর হইয়াছিল।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"বৈষ্ণবের দেহ কখনই প্রাকৃত নহে। ভক্তের দেহ—অপ্রাকৃত চিদানন্দময়। ভক্ত দীক্ষাকালে যখন শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ আত্মসমর্পণকারীকে আত্মসাৎ করিয়া আত্মসম করিয়া থাকেন। সেই সমর্পিত-দেহ চিদানন্দময়স্বরূপে প্রকাশিত হয় ও সেই অপ্রাকৃত দেহেই বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ ভজন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসনাতনের দেহে কণ্ডু-উৎপাদনের লীলা করিয়া তদ্দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যদি আমি ঘৃণা করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন না করিতাম, তবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী হইতাম। শ্রীকৃষ্ণসেবাময় ভগবৎপার্ষদতনু শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গে প্রথম দিবসেই আমি অপ্রাকৃত চন্দন, কর্পূর, কস্তুরী ও কুঙ্কুম-মিশ্রিত সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইয়াছিলাম।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীসনাতনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সনাতন! তুমি মনে কষ্ট করিও না। তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি বড়ই সুখী হই। তুমি এই বৎসর আমার সহিত অবস্থান কর; পরের বৎসর তোমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইব।"

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন; তাহাতে শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের সমস্ত কণ্ডূ তিরোহিত হইয়া সুবর্ণকান্তি প্রকাশিত হইল।

[১৫]

শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ

শ্রীসনাতন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত নীলাচলে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণকথার সংলাপ করিতেন। দোলযাত্রার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল

সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। বিদায়কালে ভক্ত ও ভগবানের তীব্র বিরহ-দুঃখ উপস্থিত হইল। শ্রীল সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথানুগমনে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-গমনের পথে যে-সকল গ্রাম, নদী ও পর্ব্বতে যে যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই শ্রীল সনাতন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বসঙ্গী শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে লিখিয়া লইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীল সনাতন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত পথের অনুসরণে চলিতে চলিতে প্রভুর লীলাস্থান-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইতেন। এইরূপে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীরূপও গৌড়দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। দুই ভাই ব্রজবাস করিয়া মহাপ্রভুর চতুর্ব্বিধ আজ্ঞা-সেবা পালন করিতে লাগিলেন। নানাদেশ হইতে নানাশাস্ত্র আনয়ন করিয়া তদ্দৃষ্টে লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার করিলেন। শ্রীল সনাতন 'শ্রীভাগবতামৃত'-গ্রন্থ রচনা করিয়া 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'কৃষ্ণ'-তত্ত্ব-বিষয়ক সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিলেন। দশম-টিপ্পনী বা দশম স্কন্ধের টীকায় সিদ্ধান্তসারসমূহ প্রকাশ করিলেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' বৈষ্ণবাচার-সম্বন্ধে বিধিসমূহ শাস্ত্রপ্রমাণবলে প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীমদনগোপালের সেবা স্থাপন করিলেন।

দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা।।
নানাশাস্ত্র আনি' লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৭-১৮)

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিতকে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীল সনাতনের সঙ্গে থাকিতে আদেশ করিলেন এবং শ্রীমথুরাবাসী চোবেগণের শ্রীচরণ বন্দনা করিবার উপদেশ করিলেন; আরও বলিয়া দিলেন,—"দূরে থাকিয়া ব্রজবাসীদের প্রতি ভক্তি করিবে, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে না। কারণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শুদ্ধ বাৎসল্যভাবে যে-সকল আচার করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া ঐশ্বর্য্যভাব-রত ব্যক্তিগণের মনে অশ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে। কিন্তু শ্রীব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এইরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক। তুমি শ্রীসনাতনের সহিত দ্বাদশ বন দর্শন করিবে ও একমুহূর্ত্তও শ্রীসনাতনের সঙ্গ-ছাড়া হইবে না। অধিকদিন তথায় থাকিবে না, শীঘ্রই চলিয়া

আসিবে। যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রজে বাস করা উচিত নহে। তথায় অধিকদিন থাকিলে ব্রজবাসীদিগের আপাতদোষপ্রতিম আচার-বিচার দেখিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। এজন্য ব্রজ-দর্শনপূর্ব্বক শীঘ্রই চলিয়া আসা ভাল। শ্রীগোপালদেবের দর্শনের জন্য শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর আরোহণ করিবে না; কারণ, শ্রীগোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি। শ্রীসনাতনকে বলিও,—"আমিও শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেছি; তথায় যেন আমার জন্য একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া রাখে।"

শ্রীজগদানন্দ শ্রীমথুরায় আসিয়া শ্রীসনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীসনাতন পণ্ডিতকে দ্বাদশবন দর্শন করাইলেন। দুইজনে মহাবন দর্শন করিয়া গোকুলে রহিলেন। শ্রীসনাতনের গুহার মধ্যে শ্রীল জগদানন্দ অবস্থান করিলেন। শ্রীসনাতন মাধুকরী ভিক্ষা করিতেন এবং শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। একদিন শ্রীজগদানন্দ শ্রীসনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীজগদানন্দ যখন রন্ধন করিতেছিলেন, তখন শ্রীসনাতন 'মুকুন্দ সরস্বতী'-নামক এক সন্ন্যাসীর প্রদত্ত বস্ত্র মস্তকে বন্ধন করিয়া শ্রীজগদানন্দের বাসা-দ্বারে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বস্ত্র দেখিয়া উহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদজ্ঞানে শ্রীজগদানন্দের প্রেমাবেশ হইল। 'ঐ বস্ত্র শ্রীসনাতন কোথায় পাইয়াছেন' পণ্ডিত ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসনাতন 'মুকুন্দ সরস্বতী নামক এক সন্ন্যাসী প্রদান করিয়াছেন' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইহা শুনিবা মাত্র শ্রীজগদানন্দের ভীষণ ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি চুল্লী হইতে অন্নের পাত্র উঠাইয়া তদ্দ্বারাই শ্রীসনাতনকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। শ্রীসনাতন অত্যন্ত লজ্জিত হইলে পণ্ডিত পাত্রটী পুনরায় চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া শ্রীসনাতনকে বলিলেন,—"তুমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ; তোমার ন্যায় মহাপ্রভুর প্রিয় আর কেহ নাই। তুমি অন্য সন্নাসীর প্রদত্ত বস্ত্র কেন শিরে ধারণ কর? ইহা কে সহ্য করিতে পারে?" শ্রীসনাতন বলিলেন, —"তোমার ন্যায় শ্রীচৈতন্যের প্রিয় আর কেহ নাই। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তোমাতে এইরূপ নিষ্ঠা দেখিলাম। ইহা তোমারই যোগ্য বটে। তুমি এইরূপ শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা না দেখাইলে আমি কিরূপে শিক্ষা করিব? যে প্রভুপ্রেম দেখিবার জন্য মস্তকে কাষায়-বস্ত্র বাঁধিয়াছিলাম, সেই অপূর্ব্ব প্রেম তোমাতে প্রত্যক্ষ করিলাম। বৈধ-সন্ন্যাসিগণের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের গৈরিক-বসন পরিধান করিবার যোগ্যতা নাই। আমি উহা কোন প্রবাসীকে দান করিব।"

শ্রীল জগদানন্দ শ্রীল সনাতনের সহিত প্রায় দুইমাসকাল শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া যখন নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য শ্রীল সনাতন রাসস্থলীর বালু, শ্রীগোবর্দ্ধনের শিলা, শুষ্ক পক্ক পীলু-ফল, গুঞ্জা-মালা প্রভৃতি শ্রীব্রজের অপ্রাকৃত দ্রব্যসমূহ অতি-অনুরাগভরে প্রদান করিলেন। দ্বাদশাদিত্য-টীলায় একটি 'মঠ' (দেবালয়) প্রাপ্ত হইয়া শ্রীসনাতন উহার সংস্কার সাধনপূর্ব্বক উহাকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচন করিলেন।

এদিকে শ্রীতপনমিশ্রের কাশীধামপ্রাপ্তির পর তাঁহার আত্মজ শ্রীরঘুনাথভট্ট অত্যন্ত উদাসীন হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন। তথায় অষ্টমাস অবস্থান করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের নিকট গমন করিবার আদেশ করিলেন। শ্রীরঘুনাথভট্ট শ্রীব্রজে আসিয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত শ্রীবল্লভ-অনুপমের আত্মজ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীজীবও সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট আগমনপূর্ব্বক বহু ভক্তিশাস্ত্র-রচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পর বিরহব্যথিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে আগমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শ্রীচরণ দর্শনপূর্ব্বক ভৃগুপাতের দ্বারা দেহবিসর্জ্জন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন; কিন্তু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বিরহোন্মত্ত শ্রীল রঘুনাথকে ভৃগুপাত হইতে রক্ষা করিলেন। কারণ, শ্রীল রঘুনাথের শ্রীঅঙ্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাকার্য্যে সমর্পিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনেক মনোঽভীষ্ট সংস্থাপিত হইবে। অতএব শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুকে তাঁহাদের স্নেহের তৃতীয় ভ্রাতা করিয়া নিকটে রাখিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে বিপ্রলম্ভলীলাময়- বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলাসমূহ নিরন্তর শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রীল সনাতনের 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী'-টীকার মঙ্গলাচরণ-পাঠে জানা যায়,—যখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর ন্যায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুও শ্রীল সনাতনের সাহচর্য্য করিয়াছিলেন।

রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টো
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ।
স্যাতামুভৌ যত্র সুহৃৎসহায়ৌ
কো নাম সোঽর্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ।।

(শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, ১৩শ শ্লোক)

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রেমবিশেষদ্বারা পরিপুষ্ট শ্রীল গোপালভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথদাস—এই উভয় বান্ধবই যে-স্থানে সহায়, তথায় এমন কি অর্থ থাকিতে পারে, যাহা সুসিদ্ধ না হয়?

'শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে এইরূপে বন্দনা করিয়াছেন,—

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।"

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীসনাতনপ্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

বস্তুতঃ এইভাবে শ্রীল রূপ, শ্রীল সনাতন, শ্রীল রঘুনাথদাস, শ্রীল রঘুনাথ-ভট্ট, শ্রীল গোপালভট্ট ও শ্রীল শ্রীজীব—এই ষড়্গোস্বামিপ্রভু সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা সংস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সেই মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতে করিতে ১৪৮০ শকাব্দার আষাঢ়ী পূর্ণিমায় অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করেন।

[১৬]

শ্রীসনাতন-সূচক

শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর শিষ্য বলিয়া পরিচিত 'শ্রীরাধাবল্লভদাস'-নামক এক পদকর্ত্তা শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুর 'শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি'-গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ ও 'শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সূচক'-নামক সূত্রাকারে ত্রিপদীচ্ছন্দে শ্রীল সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর চরিত গ্রথিত করিয়াছেন। নিম্নে সেই সূচকটি উদ্ধৃত হইল,—

(১)

“রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
শ্রীরূপে করুণা করি', ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো-অধমে নহিল স্মরণে।।
মোর কর্ম্ম-দড়ি-ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগরে ফেলি'।
আপন করুণা-ফাঁসে, দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি'।।
পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ বাণ।।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি, নাথ, মোরে কর ত্রাণ।।
জগাই-মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
করুণা-আভাস করি' সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার।।
এ দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন।
হেনকালে অন্যজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন।।
রূপের লিখন পে'য়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
শ্রীরাধাবল্লভ-দাস, মনে করে অভিলাষ,
পত্র পে'য়ে করিলা পয়ান।।

(২)

শ্রীরূপের বড় ভাই, শ্রীসনাতন গোঁসাই,
পাৎসার উজির হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্র পে'য়ে, বন্দী হৈতে পলাইয়ে,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা।।
ছিঁড়া কাঁথা অঙ্গে মলি, হাতে নখ, মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হেলে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করে, এক গুচ্ছ দন্তে ধরে,
পড়িলা চৈতন্যপদতলে।।
দরবেশ-রূপ দেখি' প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধে'য়ে।
সনাতনে করি' কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
অধমেরে স্পর্শ' কি লাগিয়ে।।
অস্পৃশ্য পামর, দীন, দুরাচার, বুদ্ধিহীন,
নীচকুলে নীচব্যবহার।
এ হেন পামর-জনে, স্পর্শ' প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার।।
প্রভু কহে—সনাতন, দৈন্য কর কি কারণ,
তব দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া।
কৃষ্ণের করুণা আছে, ভালমন্দ নাহি বাছে,
তোমা' স্পর্শি পবিত্র লাগিয়া।।
ভোট-কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভু-পাশে পুনরাগমন।।

আজ্ঞা দিল রূপ-সনে দেখা হ'বে বৃন্দাবনে,
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে।
গৌরাঙ্গ করুণা করি', রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।।
ছেঁড়া কান্থা, নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ-গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস।
কভু কান্দে, কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা, কভু উপবাস।।
অতঃপর সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।
প্রেমে অশ্রু নেত্রে ভরি', সনাতনের গলে ধরি'
কান্দে রূপ গদগদ বচন।।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে গোঁয়ায় সনাতন।
কতদিনে তাহা ছাড়ি' কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি'
ফল-মূল করয়ে ভক্ষণ।।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, 'রাধাকৃষ্ণ' বলি' কাঁদে,
'হা নাথ, হা নাথ' বলি' ডাকে।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ-সনাতন,
এইরূপে কতদিন থাকে।।
কতদিন অন্তর্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
কৃষ্ণনাম-গানে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
অবসর নহে একতিলে।।
ছাড়ি' ভোগ-অভিলাষ, তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস।

কখনও বনের শাক, অলবণে করি' পাক,
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস।।
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ।
এ রাধাবল্লভ-দাস, মনে করে অভিলাষ,
কতদিনে হ'ব তাঁ'র দাস।।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমনোহর দাসের রচিত নিম্নলিখিত পদটীও গাওয়া যায়,—

"'জয় জয় পঁহু 'শ্রীল সনাতন'-নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু গুণ-গ্রাম।।
তেজল সকল সুখসম্পদ্ অপার।
শ্রীচৈতন্যচরণ-যুগল করু সার।।
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমে করি' বাস।
লুপত-তীর্থ সব করল প্রকাশ।।
শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি'।
করল ভাগবত-অর্থ বিচারি'।।
যুগল-ভজন লীলা-গুণ-নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপম।।
সতত গৌর-প্রেমে গর গর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ।।
বিপুল পুলক-ভর নয়নহি নীর।
'রাই-কানু' বলি' পড়ই অথির।।
ভাব-বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখণ বিহরই যমুনাক তীর।।
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবই মনোহর সোই গোসাঞি।।"

শ্রীশিবানন্দ-সেনাত্মজ শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' লিখিয়াছেন,—

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহা-সর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্।।

(শ্রীচৈঃ চঃ নাঃ ৯।৪৫)

গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ পাতসাহার সভায় বিভূষণমণিস্বরূপ শ্রীরূপাগ্রজ এই শ্রীসনাতন সমৃদ্ধ-রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীনবৈরাগ্য-লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে ভক্তিরসে পূর্ণসরস, বাহিরে অবধূতাকার, শৈবালদ্বারা আচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায় সেই শ্রীসনাতন ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতিপ্রদ ছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুবরকে 'সনাতন-অবধূত'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, নীলাচলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শাকর মল্লিক' ও 'দবিরখাস'কে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিতে বলেন ও শ্রীমথুরায় গমনপূর্ব্বক ভক্তি প্রচার করিবার আজ্ঞা দেন এবং সেই সময়ই তৃতীয় সংস্কাররূপে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নাম বা পদবী পরিবর্ত্তন করেন; যথা—

'শাকর মল্লিক'-নাম ঘুচাইয়া তান।
'সনাতন-অবধূত' থুইলেন নাম।।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৭৩)

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল কবিকর্ণপুর শ্রীল সনাতনকে নিম্নলিখিত-ভাবে শ্রীব্রজপরিকর-মধ্যে গণনা করিয়াছেন,—

যা রূপমঞ্জরী-প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী।
সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ।

সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ।
তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ।।

(শ্রীগৌঃ গঃ, ১৮১-১৮২ শ্লোক)

পূর্ব্বে যিনি শ্রীরূপমঞ্জরীর প্রিয়তমা শ্রীরতিমঞ্জরী ছিলেন, পণ্ডিতগণ নাম-ভেদে তাঁহাকেই 'শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন। তিনি এখন শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নতনু, সকলের আরাধ্য শ্রীল সনাতনপ্রভু। চতুঃসনের অন্যতম মুনিরত্ন শ্রীসনাতনও কার্য্যবশতঃ শ্রীসনাতন-প্রভুতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

[১৭]

অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপের সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিকালে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচার করিয়াছেন। উহা খুব সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল—'অমর'; কেহ বলেন, তিনি তাঁহার সমসাময়িক উৎকলবাসী 'অচ্যুতদাস'-নামক কোন প্রসিদ্ধ কবির কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিয়াছিলেন। অচ্যুতদাসের লিখিত পদে এইরূপ উক্তি আছে,—

"শীরি সনাতন স্বামিঙ্কি চাহিঁণ আজ্ঞা দেলে শচীসুত।
অচ্যুতানন্দঙ্কু তুম্ভে উপদেশ কর হে যাইঁ তুরিত।।
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাইঁ সঙ্গে সুখে ঘেনী গলে।
দক্ষিণ পারুশ বটমূলে বসি কর্ণ উপদেশ দেলে।।
শ্যাম পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যে প্রচার মহামন্ত্রদীক্ষা দেলে।
শ্যামাঞ্জন গঙ্গামৃত্তিকা লগাই কণ্ঠে গলারে বান্ধিলে।।"

উক্ত অচ্যুতদাসের বিষয় "নিরাকার সারস্বত" নামক এক পুস্তকে উল্লিখিত আছে। পুস্তকের নাম দেখিয়া মনে হয়, উহা নির্ব্বিশেষমতবাদিগণের পুঁথি। শ্রীসনাতনের নামের দোহাই দিয়া অনেক নির্ব্বিশেষ-মতবাদ পরিবর্ত্তিকালে প্রচারিত হইয়াছিল। আউল, বাউল, দরবেশাদি সম্প্রদায়ও শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভুর দোহাই দেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর আত্মপরিচয় গোপনার্থ দরবেশের

বেষ ও অহিন্দু কারারক্ষককে বঞ্চনাপূর্ব্বক "দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩) প্রভৃতি উক্তি-অবলম্বনে পরবর্ত্তিকালে কোন কোন নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীসনাতনের দৈন্যোক্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া পণ্ডিতম্মন্য কতিপয় প্রাকৃত জাত্যভিমানী আধুনিক ব্যক্তি শ্রীল সনাতনপ্রভুকে 'জাতিভ্রষ্ট' বা 'নীচজাতি' প্রভৃতি মনে করিয়া অপরাধপঙ্কে নিপতিত হয়। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের দাস ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু 'লঘুতোষণী'-টীকায় সবিস্তারে পূর্ব্ব-বংশপরিচয় বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভু স্বয়ংও 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে'র তৃতীয় শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশবিখ্যাত-বিপ্রকুলাচার্য্য-শ্রীজগদ্গুরুবংশ-জাত-শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশীয়ঃ শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরঃ।" এস্থানে শ্রীল সনাতন শ্রীল রূপকে 'বিপ্রবংশজাত' বলিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামীর নামে আরোপিত 'শ্রীসনাতনাষ্টকে' শ্রীল সনাতনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি "ব্রাহ্মণবংশভূষণ" বলিয়া বন্দিত হইয়াছেন।

"সুদাক্ষিণাত্য-ভূমিদেবভূপবংশ-ভূষণং
মুকুন্দদেব-পৌত্রকং কুমারদেব-নন্দনম্।
সজীব-তাতবল্লভাগ্রজন্মরূপকাগ্রজং
ভজাম্যহং মহাশয়ং কৃপাম্বুধিং সনাতনম্।।"

শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার লীলা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেও বিশ-ত্রিশজন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত রামকেলি-গ্রামে শ্রীল সনাতন প্রভুর গৃহে আগমন করিতেন এবং শ্রীল সনাতন সভাতে বসিয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত বিচার করিতেন। এখনও শ্রীরামকেলিগ্রামে শ্রীশ্রীল সনাতনের গৃহত্যাগলীলার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত শ্রীশ্রীমদনমোহন-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভুর আপনাকে "নীচ-জাতি" প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য শ্রীভক্তিরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে,—

"যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে।।

নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ-ব্যবহার।
এই হেতু 'নীচজাত্যধিক' উক্তি তাঁ'র।।
বিপ্ররাজ হৈয়া মহা-খেদযুক্ত অন্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।।"

(শ্রীভঃ রঃ ১।৬১২-১৪)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাকেই 'নীচ' বলিয়াছেন। শাস্ত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ''হরিভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।" ভগবদ্‌ভক্তের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে ভগবদ্ভজন করিবার জন্য দৈন্যদ্বারা আত্মস্বরূপ গোপন ও বহির্ম্মুখ লোককে বঞ্চনা করেন; যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে 'প্রেমভক্তিহীন মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়াছিলেন এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আপনাকে 'চণ্ডাল' প্রভৃতি বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের পদবী 'দবির-খাস' ও 'শাকর মল্লিক' হওয়ার কারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পিতার নাম ''দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ" এইরূপ লিখিতেন না। 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ কুমারদেব' বা তৎপিতা 'কৃতী মুকুন্দ' কাহারও নামের সহিতই অহিন্দু-নামের কোন সংস্পর্শ নাই। 'দবিরখাস' ও 'শাকর মল্লিক' শব্দদ্বয় কেবলমাত্র গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের নিকট হইতে লব্ধ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের পদবী-মাত্র। যিনি ন্যায় বা যুক্তিতে নিপুণ, তিনিই 'দবির'। রাজব্যবহার-কোষে 'দবির'-শব্দের এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়,—''যুক্তাভিজ্ঞো দবিরঃ স্যাৎ", 'খাস'-শব্দে 'নিজস্ব' বুঝায় অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের নিজস্ব বা খাস মন্ত্রী অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন বলিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নাম 'দবিরখাস'। শ্রীসনাতনের 'শাকর মল্লিক'-উপাধিটীও তদ্রূপ। 'মল্লিক', 'চৌধুরী' প্রভৃতি উপাধি মুসলমান-রাজত্বের কাল হইতে ব্রাহ্মণ-হিন্দুগণ অনেকেই লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা বা তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অহিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। ''মহল্লিক" এই দেশীয় শব্দের অপভ্রংশই ''মল্লিক"। 'মহল্লিক'-শব্দের অর্থ জ্ঞানবৃদ্ধ। শ্রীসনাতনপ্রভু বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন, ইহা 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-কারের ভাষায়ও পাওয়া যায়। রাজ-ব্যবহারকোষে 'শুকুর'-শব্দের

অর্থ 'যিনি সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ'; যথা—'কুশলঃ শুকুরঃ'। কেহ কেহ বলেন, 'শুকুর'-শব্দের অপভ্রংশই 'শাকর'। যাহা হউক, 'শাকর মল্লিক'-পদবী নিপুণতা ও জ্ঞান-বৃদ্ধতার পরিচায়ক।

কোন এক জড়জাত্যভিমানী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, 'শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ অহিন্দুকুলোদ্ভূত শ্রীহরিদাসের সহিত মিশিতেন।' কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠে ঐ ব্যক্তির এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রত্যক্ষভাবে আসিবার পূর্ব্বেও অহিন্দু পীর প্রভৃতির সঙ্গে না মিশিয়া "ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা। ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।।" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭),—এই প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আরও দেখা যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শান্তিপুরের ন্যায় ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানে আভিজাত্যপূর্ণ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত আচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল মুকুন্দকে লইয়া এক পঙ্‌ক্তিতে একসঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন; যথা—

* * * প্রভু বলেন বচন।।

* * *

মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন।।
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৩।১০৫-১০৭)

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন এমন কি, শ্রীল হরিদাসকে ব্রাহ্মণ-শিরোমণিগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিচারে তাঁহাকে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্রও ভোজন করাইয়াছিলেন (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২১৯-২০)।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ শ্রীভগবৎপার্ষদতনু; তাঁহাদিগকে উচ্চ বা নীচ কোন জাতি বা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত জীববিশেষ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন সৎসিদ্ধান্তই শ্রবণ করেন নাই। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসশিরোমণি জগদ্‌গুরুগণেরও শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এক একজন ভক্তের দ্বারা এক একটি মহতী শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপ-দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৬৩১)

শ্রীল সনাতনের নামে কোন কোন আধুনিক প্রাকৃত কবি ‘‘স্পর্শমণি’’ প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যের প্রশংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ ভোগিসম্প্রদায়ের নিকট যে ত্যাগের আদর্শসমূহ চমৎকারিতা উৎপাদন করে, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু সেইরূপ ফল্গুত্যাগের আচার ও প্রচার করেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে যুক্তবৈরাগ্য অর্থাৎ যে বৈরাগ্য শ্রীকৃষ্ণের সেবারসের সহিত নিত্যযুক্ত, সেইরূপ অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য বা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভাব-পরাকাষ্ঠার আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন।

[১৮]

শ্রীমদনমোহনের সেবা-প্রকাশ

‘শ্রীভক্তিরত্নাকর’ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনগোপালের সেবাপ্রাকট্যের ইতিহাস সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকট করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং ‘শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে’ও শ্রীসনাতন তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীমদন-গোপালের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের যে তিন ঠাকুর—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।১৯) এবং যে তিন ঠাকুর গৌড়ীয়গণের সেব্য কামগায়ত্রীর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ-রূপে সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের অধিদেবতা, সেই শ্রীবৃন্দাবনাধিরাজ শ্রীমদনমোহনই শ্রীসনাতনের প্রাণধন এবং শ্রীগোবিন্দই শ্রীরূপের প্রাণেশ্বর। শ্রীভক্তিরত্নাকরের (২য় তরঙ্গ, ৪৫৬-৪৭৩) বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীল সনাতন সময় সময় শ্রীমহাবনে বাস করিতেন। সেই সময় তিনি দেখিতে পান যে, ব্রজবাসী বালকের সহিত শ্রীমদনগোপাল শ্রীযমুনাপুলিনে ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীমদনগোপালকে দর্শন করিয়া শ্রীসনাতনের হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। একদিন স্বপ্নচ্ছলে শ্রীমদনগোপাল শ্রীসনাতনকে বলিলেন যে,

শ্রীসনাতনের পর্ণকুটীরে বাস করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে, সুতরাং তিনি তথায় আগমন করিবেন। রাত্রি প্রভাত হইতেই শ্রীসনাতনের কুটীরে শ্রীমদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীসনাতন মনের আনন্দে শ্রীমদনগোপালের সেবা করিতে থাকেন। কিন্তু মাধুকরী-লব্ধ শুষ্ক রুটী মহারাজকুমার শ্রীমদনগোপালকে ভোগ দিতে শ্রীসনাতনের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। শ্রীসনাতনের সেই দুঃখ-নিবারণের জন্য শ্রীমদনগোপাল স্বীয় সেবার শ্রীবৃদ্ধির একটী উপায় করিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর'-নামক মূলতানদেশীয় এক ধনাঢ্য শেঠ নৌকা করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। ভগবৎপ্রেরণায় তিনি শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে আসিয়া অতি দৈন্যের সহিত শ্রীমদনমোহনের কিছু সেবা প্রার্থনা করেন। শ্রীল সনাতনের অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস সেইদিন হইতেই শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন এবং শ্রীবিগ্রহকে নানা রত্নভূষণে ভূষিত করাইয়া ও নানাবিধ ভোগের সামগ্রী দ্বারা নিত্যভোগের ব্যবস্থা করেন। শ্রীল সনাতন শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীযমুনা তীরবর্ত্তী 'আদিত্যটিলা'-নামক সর্ব্বোচ্চ স্তূপের উপর কুটীর বাঁধিয়া যে-স্থানে শ্রীমদনগোপালের সেবা করিতেছিলেন, সেইস্থানে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীমন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রীযমুনাগর্ভ হইতে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ আদিত্য-টিলাস্তূপের উপর শ্রীমদনমোহনের পুরাতন শ্রীমন্দির এখনও দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট হইবে। উত্তরদিকের নাট্যমন্দিরের দ্বারে 'সম্বৎ ১৬৮৪ বর্ষ, শ্রাবণ' (বা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ) লিখিত অছে। শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-ভূমিতে একটি ছোট রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের ভিতর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সমাধি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তৎসমীপেই 'সনাতন-কূপ'-নামক একটি মিষ্ট জলপূর্ণ কূপ আছে। প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর তিরোধান-দিবসে এইস্থানে মহামহোৎসব হইয়া থাকে। বাদশাহের দৌরাত্ম্যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীমদনমোহনজী প্রথম জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। তৎপর জয়পুরের মহারাজ নিজ শ্যালক করৌলির রাজা গোপালসিংহকে সেই শ্রীমূর্ত্তি প্রদান করেন। এখন করৌলির রাজ-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীমদনমোহনের সেবা হইতেছে। শ্রীশ্রীরাধারমণ-ঘেরার শ্রীবনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 'সেবা-প্রাকট্য'-পুঁথিতে লিখিত আছে,—শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভু ১৫৯০ সম্বতে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া

তিথিতে শ্রীমদনগোপাল-বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন ও 'শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী' নামক এক পূজারীর উপর সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু কখন শ্রীবৃন্দাবনে, কখনও শ্রীগোবর্দ্ধনে, কখনও শ্রীপাবনসরোবরে, কখনও শ্রীমহাবনে, কখনও শ্রীরাধাকুণ্ডে, কখনও ব্রজের বিভিন্ন বনে অবস্থান করিতেন। তিনি প্রত্যহ নিয়ম করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। কথিত হয় যে, বৃদ্ধ বয়সে যখন প্রত্যহ সাতক্রোশ পরিক্রমা করিতে তিনি অসমর্থতার লীলা প্রদর্শন করিলেন, সেই সময় স্বয়ং গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ এক অজ্ঞাত ব্রজবাসী বালকরূপে উপস্থিত হইয়া শ্রীল সনাতনকে একটি শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্কযুক্ত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই গোবর্দ্ধনের চতুর্দ্দিক্ পরিক্রমা করিবার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হন। শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু তাঁহার প্রকটলীলার শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন বিপ্রলম্ভভাবে ব্রজের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন। পাবন-সরোবরের নির্জ্জনবনে যখন শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসে মগ্ন ছিলেন, তখন গোরক্ষকের বেষে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধভাণ্ডহস্তে শ্রীল সনাতনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীল সনাতনের অজ্ঞাতসারে ব্রজবাসীর দ্বারা পাবন-সরোবরের তীরে শ্রীল সনাতনের জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু যখন ব্রজপরিক্রমা করিতেন, তখন প্রত্যেক গ্রামের ব্রজবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীল সনাতনের সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একান্ত আপ্তজন জ্ঞান করিতেন।

[১৯]

শ্রীল সনাতনের রচিত শ্রীগ্রন্থাবলী

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের নাম প্রসিদ্ধ আছে,— (১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাহার 'দিগ্দর্শিনী'-টীকা, (২) শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার 'দিগ্দর্শিনী'-নাম্নী টীকা, (৩) শ্রীলীলাস্তব বা দশমচরিত এবং (৪) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনী 'বৈষ্ণবতোষণী'।

(১) হরিভক্তিবিলাস, আর (২) ভাগবতামৃত।
(৩) দশম-টিপ্পনী, আর (৪) দশম-চরিত।।
এই সব গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি সনাতন।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৩৫-৩৬)

পুনরায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

সনাতন গ্রন্থ কৈলা ভাগবতামৃতে।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।।
সিদ্ধান্তসার-গ্রন্থ কৈলা দশমটিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি।।
হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাঁ পাইয়ে পার।।
আর যত গ্রন্থ কৈলা, তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা-প্রকাশন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৯-২২)

শ্রীভক্তিরত্নাকরে (শ্রীভঃ রঃ ১।৮০৬-১০) দৃষ্ট হয়,—

সনাতন-গোস্বামীর গ্রন্থ-চতুষ্টয়।

(১) টীকাসহ ভাগবতামৃত-খণ্ডদ্বয়।
(২) হরিভক্তিবিলাস-টীকা 'দিক্প্রদর্শনী'।
(৩) 'বৈষ্ণবতোষণী' নাম দশম-টিপ্পনী।।
(৪) লীলাস্তব দশমচরিত যাহে কয়।
সনাতন-গোস্বামীর এই চতুষ্টয়।।

তহা হি—

তয়োর্জ্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতন-নামিনঃ।
সিদ্ধান্তগ্রন্থ-সন্দোহাল্লেখোল্লেখো বিধীয়তে।।
প্রথমদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতম্। (১)

(১) 'অথাগ্রজকৃতেষগ্রং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্' ইতি পাঠান্তরম্।

হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা-দিক্‌প্রদর্শিনী।
লীলাস্তব-টিপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী।।

তাঁহাদিগের মধ্যে 'শ্রীল সনাতন'-নামক জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-রচিত সিদ্ধান্তগ্রন্থসমূহ হইতে তদ্রচিত গ্রন্থমালার নামোল্লেখ করিতেছি। শ্রীল সনাতন-প্রভু-লিখিত— প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডদ্বয়যুক্ত শ্রীভাগবতামৃত, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, তাহার টীকা 'দিক্‌প্রদর্শিনী', শ্রীলীলাস্তব ও 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী'-নামে টিপ্পনী।

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থ রচনা করেন। তাহারই সংক্ষেপ ও সার-অবলম্বনে শ্রীল রূপপ্রভু সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত * রচনা করিয়া দৈন্যবশে 'লঘুভাগবতামৃত'-নাম প্রদান করায় শ্রীল সনাতন-কৃত 'শ্রীভাগবতামৃতে'র নাম 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' হয়। তদ্রূপ শ্রীল সনাতন দশম স্কন্ধের বৈষ্ণবতোষণী-টিপ্পনী রচনা করেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ১৫০৪ শকে বা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল সনাতনের পদাঙ্কানুসরণে 'বৈষ্ণবতোষণী' বা 'লঘুতোষণী'-নামে † দশম স্কন্ধের একটী টীকা রচনা করায় শ্রীল সনাতনের দশম-টিপ্পনী 'বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী'-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী 'লীলাস্তবে'র অপর নাম 'দশম চরিত' বলিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৩৫) শ্রীসনাতনের রচিত 'দশমচরিত'-নামক গ্রন্থের কথা পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'স্তবমালা'র অন্তর্গত যে ৪১টী গীত 'গীতাবলী'-নামে পরিচিত আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই শ্রীসনাতনের নাম কোন-না-কোন আকারে উল্লিখিত থাকায় উহা শ্রীল সনাতনগোস্বামি-প্রভুরই রচিত বলিয়া মনে হয়।

---

* শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্।
যদ্ ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে।।
(শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড, ৫ম শ্লোক)

আমার প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিচরণ শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থে যাহা বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন, আমি এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতেছি।

† * * * বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া।।
(শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর উপসংহার)

তাহাতে নন্দোৎসবাদি-চরিত হইতে আরম্ভ করিয়া দশম-স্কন্ধোদ্ধৃত বিবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গীত আছে। অতএব ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি কর্ত্তৃক উল্লেখিত শ্রীল সনাতন-রচিত 'দশমচরিত'-গ্রন্থ বা 'লীলাস্তব'। কিন্তু শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু স্তবমালার টীকায় ইহাকে শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্তবমালার অন্তর্গতরূপে প্রকাশিত শ্রীগীতাবলীর টীকার উপসংহারে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু বলিতেছেন,—

"গাথাশ্চত্বারিংশদেকাধিকা যো
ব্যাচষ্ট শ্রীরূপদিষ্টাঃ প্রযত্নাৎ।
তস্মিন্ বিদ্যাভূষণে সাধুবর্য্যাঃ
কারুণ্যং কিং ভাববিজ্ঞা ন কুর্য্যুঃ।।"

যে (আমি) শ্রীরূপ-উপদিষ্ট একচত্বারিংশৎটি (৪১টি) গীত ব্যাখ্যা করিল, হে ভাববিজ্ঞ সাধুপ্রবরগণ! আপনারা কি সেই বিদ্যাভূষণকে (অর্থাৎ আমাকে) কৃপা করিবেন না?

লীলাস্তব বা দশমচরিত-গ্রন্থ অধুনা অপ্রাপ্য বলিয়া অনেকে বিচার করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'স্তবমালা'র অন্তর্গতরূপে বহরমপুরের সংস্করণে প্রকাশিত যথাক্রমে "সৌরভসেবিত-পুষ্প-বিনির্ম্মিত", "অপঘনঘটিত", "দামোদর-রতি-বর্দ্ধনবেশে"—এই কয়েকটী গীতের ভণিতায় যে 'সনাতন'-নামের উল্লেখ আছে, তাহা শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার 'পদামৃত-সমুদ্রে' উদ্ধার করিয়া উহার টীকায় এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"পক্ষে, সনাতন-গোস্বামিমিলিত-গিরীশ-সনকাদিভিঃ কৃতবন্দনেত্যর্থঃ"; "সরস্বতী সনাতন-গোস্বামিনং স্তৌতি, সনকেন সনকাদপি বা আদৃতো যঃ সনাতননামা গোস্বামী, তেন বর্ণিতচরিতে"।

অমরকোষের 'পদচন্দ্রিকা' টীকায় রায়মুকুট শ্রীসনাতনের নামে 'যোগশতক-ব্যাখ্যান'-নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা'-টীকা ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়; সুতরাং উহা ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত শ্রীল সনাতনের রচিত নহে। উহা পূর্ব্ববর্ত্তী 'সনাতন'-নামক অন্য কোন ব্যক্তির রচিত হইবে।

India Office Catalogueএ (Vol. VII, PP, 1422-23, No. 1584 and 1570) Eggeling কালিদাসের মেঘদূতের উপরে শ্রীল

সনাতন গোস্বামি-প্রভু রচিত 'তাৎপর্য্য-দীপিকা'-নামক একটি টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। Catalogus Catalogorum-এ Aufrecht শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর নামে 'ভক্তি-বিন্দু' ও 'উজ্জ্বলরসকণা'-নামে দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কোন গ্রন্থ শ্রীল সনাতনের রচিত বলিয়া কোন পূর্ব্বাচার্য্যই উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ Aufrecht-এর ঐ তালিকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু'র ও 'উজ্জ্বল-নীলমণিকিরণে'র সহিত গোলমাল করিয়া শ্রীল সনাতনের নামে ঐ দুইটি গ্রন্থের নাম যুক্ত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Libraryর পুঁথির তালিকায় (A Triennial Catalogue of Mss., Vol. IV., Part-I, Sanskrit A., R. No. 3053, a-47) শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর রচিত বলিয়া 'গোপাল-পূজা'-নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এইরূপ,—

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া।।

* * *

শ্রীকূর্ম্মো দেবতা, অনন্তবীজম্, পৃথিবী শক্তিঃ, আসনে বিনিয়োগঃ।

শেষ ঃ—

অথ নৈবেদ্যম্ বিকচোৎপলসন্নিভাং গ্রাসমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণায় নৈবেদ্যং স্বাহা, শ্রীকৃষ্ণায় আচমনম্, মূলমন্ত্রমষ্টোত্তরং শতং জপেৎ, পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ, প্রদক্ষিণম্।

পুষ্পিকা ঃ— ইতি শ্রীসনাতন-গোস্বামি-বিরচিতা গোপালপূজা সমাপ্তা।

(১) **শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত**—প্রথম ও উত্তর, এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম—'শ্রীভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধার'-খণ্ড এবং উত্তর খণ্ডের নাম—'গোলোক-মাহাত্ম্য-নিরূপণ'-খণ্ড। (১) ভৌম, (২) দিব্য, (৩) প্রপঞ্চাতীত, (৪) ভক্ত, (৫) প্রিয়, (৬) প্রিয়তম, (৭) পূর্ণ ভেদে সপ্ত অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড এবং

(১) বৈরাগ্য, (২) জ্ঞান, (৩) ভজন, (৪) বৈকুণ্ঠ, (৫) প্রেম, (৬) অভীষ্টলাভ (৭) জগদানন্দ ভেদে সপ্ত অধ্যায়ে উত্তর খণ্ড রচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয় এই—জয়প্রদানমুখে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপীবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীমথুরাধাম, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীযমুনা, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীভগবন্নামের মাহাত্ম্য-বর্ণন, গ্রন্থ-বিবরণ, ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা, প্রয়াগতীর্থে মুনির সমাজ, প্রয়াগ-ধামস্থ দ্বিজবরের বিষ্ণুভক্তিলাভ, দক্ষিণদেশীয় রাজার বিষ্ণুভক্তিলাভ, ইন্দ্রের বিষ্ণুভক্তিলাভ, ব্রহ্মলোক-বর্ণন, ব্রহ্মার বিষ্ণুভক্তিপ্রাপ্তি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শম্ভুর মাহাত্ম্য-বর্ণন, শ্রীবৈকুণ্ঠমহিমা, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীহনুমান, শ্রীপাণ্ডবগণ, যাদবগণ, শ্রীউদ্ধবাদি ভক্তগণের মহিমা, শ্রীকৃষ্ণের ভৌমবৃন্দাবন-যাত্রা, শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুনরায় দ্বারকায় আগমন, শ্রীনন্দ-যশোদা-মাহাত্ম্য, শ্রীগোপীপ্রেম, ভগবদ্ ভক্তগণের ভক্তিপ্রাপ্তিতে তৃপ্তি না হওয়ার কারণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধিকার নামোল্লেখ না থাকার কারণ ইত্যাদি। উত্তর খণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এই—সাধনানুযায়ী ধামপ্রাপ্তি, কামরূপদেশবাসী ব্রাহ্মণ-বালকের কামাখ্যা দেবী কর্ত্তৃক উপদেশ, ব্রাহ্মণবালকের গঙ্গাসাগরে ও কাশীতে গমন, কাশীবাসীর আচার-দর্শনে সন্ন্যাস গ্রহণে অভিলাষ, কামাখ্যা দেবী ও শিবের আদেশে সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা-পরিত্যাগ, শ্রীমথুরাভিমুখে গমন, প্রয়াগবাসীর আচরণ-দর্শন, শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের গোপকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার, ব্রাহ্মণ-বালক-সমীপে গোপকুমার কর্ত্তৃক নিজের অনুভূত সাধ্য-সাধনাদি তত্ত্ব-কথন, গোপকুমারের গঙ্গাতীরে গমন, শ্রীক্ষেত্রে গমন, শ্রীবৃন্দাবনে গমন, স্বর্গে গমন ও বামনদেবের দর্শন, মহর্লোকে গমন, জনলোকে গমন, তপোলোকে গমন, ঋষভদেবপুত্র পিপ্পলায়ন কর্ত্তৃক সহজ-সমাধিযোগে ভগবদ্দর্শনার্থ উপদেশ, গোপকুমারের সত্যলোকে গমন, মুক্তি ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-অভিজ্ঞান, কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধি ও ভক্তির লক্ষণগত পার্থক্য, সত্যলোক হইতে পৃথিবীতে পুনরাগমন, পৃথিব্যাদি লোকসমূহের বিশেষ বিবরণ, গোপকুমার কর্ত্তৃক হর-পার্ব্বতী-দর্শন, শিবলোক ও বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্য-বর্ণন, নববিধা ভক্তি, সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, গোপকুমারের ব্রজে আগমন, পুনরায় বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণসহ বৈকুণ্ঠ-গমন, দেবর্ষি নারদের সহিত গোপকুমারের সংলাপ, অবতার-সমূহের বিবরণ, শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব-কথন, ভগবচ্ছক্তি-বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং সকলের অংশী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য, গোপকুমারের অযোধ্যা-

গমন, শ্রীদ্বারকাগমন, শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনাদি নামের তাৎপর্য্য-কথন, শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যপূর্ণ ব্রজলীলাবর্ণন, জীবগণের ক্রমোন্নত অবস্থা এবং সাধনক্রমে চরমে গোলোক-প্রাপ্তি, প্রেমভক্তিলাভের উপায়, গোপকুমারের শ্রীব্রজে আগমন, শ্রীমদনগোপালের দর্শন লাভ, শ্রীগোলোকধাম-দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ, গোপকুমার কর্ত্তৃক শ্রীগোলোকনাথের দর্শন লাভ ও গোলোক-মাহাত্ম্য প্রভৃতি।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণ, যথা—

জয়তি নিজপদাব্জ-প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধমধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ।
গতপরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপা-
দনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্।।

যিনি নিজ শ্রীপাদপদ্মে প্রেম প্রদান করিবার জন্য (গোলোক হইতে ভূলোকে) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ হইতে বা শ্রীচৈতন্যের নিজজন শ্রীরূপগোস্বামী হইতে শ্রীগোপীগণের চরমোৎকর্ষযুক্ত প্রেম-দীনহীন—সকলের অনুভবের বিষয় হইয়াছে, সেই বিবিধ-মাধুর্য্য-বিমণ্ডিত, কৈশোর-লাবণ্যযুক্ত কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ পরমোৎকর্ষে জয়যুক্ত হইতেছেন।

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি
গোপ্যো নিতান্ত-ভগবৎপ্রিয়তা-প্রসিদ্ধাঃ।
যাসাং হরৌ পরমসৌহৃদ-মাধুরীণাং
নির্ব্বক্তুমীষদপি জাতু ন কোঽপি শক্তঃ।।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত প্রীতির পাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহাদের অতুলনীয় কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্যের লেশমাত্রও বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই, সেই শ্রীরাধিকা-প্রমুখ শ্রীগোপীগণ বিশেষভাবে জয়যুক্ত হইতেছেন।

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ।।

নিজভাব হইতে স্বীয় ভক্তগণের তৎপ্রতি বিহিত প্রেম অতিশয় মধুর, ইহা বিচার করিয়া যিনি লোভবশতঃ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কনক-কান্তিবিশিষ্ট, সন্ন্যাসি-বেশধারী, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে প্রসিদ্ধ এই শ্রীশচীনন্দন ভূতলে অর্থাৎ গৌড়ে শ্রীনবদ্বীপে জয়যুক্ত হইতেছেন।

জয়তি মথুরাদেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষু মনোরমা
পরমদয়িতা কংসারাতের্জনিস্থিতিরঞ্জিতা।
দুরিতহরণান্মুক্তের্ভক্তেরপি প্রতিপাদনা-
জ্জগতি মহিতা তত্তৎক্রীড়াকথাস্তু বিদূরতঃ।।

কংসারি শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই সুপ্রসিদ্ধ অনির্ব্বচনীয় ক্রীড়াসমূহের কথা দূরে থাকুক, পাপবিমোচন, মুক্তি ও ভক্তি প্রদান করেন বলিয়া যিনি জগতে পূজিতা, শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়া, তাঁহার জন্ম ও অবস্থান-লীলা-সুশোভিতা, মনোরমা পুরীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, পরমেশ্বরী (অথবা সর্ব্বদা দ্যোতমানা) শ্রীমথুরা পরমোৎকর্ষে জয়যুক্ত হইতেছেন।

জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যমেতন্মুরারেঃ
প্রিয়তমমতিসাধুস্বান্তবৈকুণ্ঠবাসাৎ।
রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপীঃ
স্বরিতমধুরবেণুর্বর্দ্ধয়ন্ প্রেম রাসে।।

যাহা সাধুগণের চিত্ত অথবা বৈকুণ্ঠাবাস অপেক্ষাও শ্রীমুরারির অতিশয় প্রিয়তম, যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাসে প্রেমবর্দ্ধন করিবার জন্য মধুর বেণুবাদন করিতে করিতে ধেনু-সকলকে পালন এবং শ্রীগোপীগণের আনন্দবিধান করেন, এই সেই শ্রীবৃন্দারণ্য পরমোৎকর্ষে জয়যুক্ত হইতেছেন, জয়যুক্ত হইতেছেন।

জয়তি তরণীপুত্রী ধর্ম্মরাজজস্বসা যা
কলয়তি মথুরায়াঃ সখ্যমত্যেতি গঙ্গাম্।
মুরহরদয়িতা তৎপাদপদ্মপ্রসূতং
বহতি চ মকরন্দং নীরপূরচ্ছলেন।।

যিনি শ্রীমথুরার সখীত্ব লাভ করিয়া শ্রীগঙ্গাকে অতিক্রম করিতেছেন, যিনি বারিপ্রবাহচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মসংলগ্ন মকরন্দ বহন করিতেছেন, সেই

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, সূর্য্যকন্যা, ধর্ম্মরাজ-ভগ্নী শ্রীযমুনা জয়যুক্তা হইতেছেন।

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ।
কৃষ্ণেন শক্রমখভঙ্গকৃতার্চ্চিতো যঃ
সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽপ্যবাৎসীৎ।।

শ্রীগোপীবৃন্দ যাঁহাকে 'হরিদাস-শ্রেষ্ঠ' বলেন, ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গকারী শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মতলে সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতসমূহের অধিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন জয়যুক্ত হইতেছেন।

জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তির্যদঙ্ঘ্রিং
নিখিলনিগমতত্ত্বং গূঢ়মাজ্ঞায় মুক্তিঃ।
ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা
জপ-যজন-তপস্যা-ন্যাসনিষ্ঠাং বিহায়।।

মুক্তি গূঢ়ভাবে সমস্ত বেদশাস্ত্রের সার সম্যগ্‌ভাবে বিচার করিয়া জপ, যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও শরণলাভেচ্ছায় একমাত্র যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হইতেছেন।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।

যিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনকারীদিগের, ধ্যানপরায়ণ জনগণেরও অর্চ্চননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজানুষ্ঠান যত্ন নিবারণ করিয়াছিলেন, যিনি কোন প্রকারে একবার মাত্র উচ্চারিত হইয়াই প্রাণিগণকে মুক্তি প্রদান করেন, যিনি একমাত্র পরম-অমৃতস্বরূপ, যিনি আমার জীবন ও ভূষণস্বরূপ, সেই আনন্দ-প্রকাশক শ্রীমুরারির শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

উপসংহার-শ্লোক, যথা—

তস্মৈ নমোঽস্তু নিরুপাধিকৃপাকুলায়
শ্রীগোপরাজতনয়ায় গুরূত্তমায়।
যঃ কারয়ন্নিজজনং স্বয়মেব ভক্তিং
তস্যাতিতুষ্যতি যথা পরমোপকর্ত্তুঃ।।

যিনি স্বয়ং ভক্তিদানপূর্ব্বক (সেবককে) নিজকিঙ্কর করিয়া পরমোপকারী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার (সেবকের) প্রতি অতিশয় পরিতুষ্ট হন, সেই অহৈতুক-কৃপা বিতরণে ব্যগ্র গুরুশ্রেষ্ঠ শ্রীনন্দনন্দনকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের দিগ্‌দর্শিনী টীকার মঙ্গলাচরণ,—

ভক্তির্যা নিখিলার্থবর্গজননী যা ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতে-
রানন্দাতিশয়প্রদা বিষয়জাৎ সৌখ্যাদ্বিমুক্তির্যয়া।
শ্রীরাধারমণপদাম্বুজযুগং যস্যা মহানাশ্রয়ো
যা কার্য্যা ব্রজলোকবদ্‌গুরুতরপ্রেম্নৈব তস্যৈ নমঃ।।

যে ভক্তি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্বর্গাদির জননীস্বরূপা, যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অপেক্ষাও অতিশয় আনন্দপ্রদায়িনী, যাঁহার দ্বারা জীব বিষয়সুখবাসনা হইতে মুক্ত হয়, শ্রীরাধারমণের শ্রীপাদপদ্মযুগলই যাঁহার মহান্ আশ্রয়, যাহা শ্রীব্রজবাসীদিগের সর্ব্বোত্তম প্রেমের অনুসরণেই অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রেম-ভক্তিকে আমি নমস্কার করি।

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃতসেবিনে।
যদ্রূপাশ্রয়ণাদ্ যস্য ভেজে ভক্তিময়ং জনঃ।।

স্বীয় নামামৃত-সেবনরত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি—যাঁহার রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই অথবা যাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুকে আশ্রয় করিয়া লোক ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন।

অভিপ্রেতার্থবর্গাণামেকদেশস্য দর্শনাৎ।
দিগদর্শিনীতিনাম্নীয়ং স্বয়ং টীকাপি লিখ্যতে।।

অভীপ্সিত অর্থসমূহের একদেশের দর্শন হইতে 'দিগ্‌দর্শিনী'-নাম্নী এই টীকাটীও আমি স্বয়ং লিখিলাম।

উপসংহারে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

"স্বয়ং প্রবর্ত্তিতৈঃ কৃৎস্নৈর্মমৈতল্লিখনশ্রমঃ।
শ্রীমচ্চৈতন্যরূপোঽসৌ ভগবান্ প্রীয়তাং সদা।।

সমগ্র ভক্তসমাজের দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া আমার এই লিখন-প্রয়াস। (ইহাতে) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অথবা শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা শ্রীল রূপ-গোস্বামী সতত প্রীত হউন।

(২) **শ্রীহরিভক্তিবিলাস**—এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ও পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ইহা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত গ্রন্থ। প্রথম বিলাসের মঙ্গলাচরণে অর্থাৎ গ্রন্থের সর্ব্বাগ্রে শ্রীভগবৎ-প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষ বিধানের জন্য ভক্তির বিলাস আহরণ করিতেছেন, এইরূপ তাৎপর্য্যাত্মক শ্লোক আছে। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় বিলাসের প্রারম্ভে যে দৈন্যাত্মক মঙ্গলাচরণ আছে, তাহা পাঠে শ্রীল সনাতনের অতিমর্ত্ত্য দৈন্যের কথাই স্মরণ হয়।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচার-প্রবর্ত্তকঃ।।

অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় নীচ ব্যক্তিও সদাচার-প্রবর্ত্তক হইতে পারে, আমি সেই অনন্ত ও অদ্ভুত প্রভাবশালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে 'দিগ্‌দর্শিনী'-নাম্নী একটি সংক্ষিপ্ত টীকাও আছে। তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু টীকাতে টীকাকারের নাম নাই। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করেন।

"করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট-মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিল সেই ক্ষণে।।
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন।।"

(শ্রীভঃ রঃ ১।১৯৭-৯৮)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।৩৫ ও অঃ ৪।২২১) শ্রীহরিভক্তিবিলাস শ্রীল সনাতন-প্রভুর রচিত বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে শ্রীল সনাতনকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের যে-সকল সূত্র বলিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুও তাঁহার 'বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার উপসংহারে শ্রীল সনাতনের সহিত গ্রন্থতালিকার মধ্যে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার টীকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সঙ্কলন-কার্য্যে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু বিশযভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, এজন্য দৈন্যবশতঃ শ্রীল সনাতনপ্রভু তাহাতে নিজনাম উল্লেখ না করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকা সম্পূর্ণভাবে শ্রীল সনাতনেরই রচিত বলিয়া শ্রীল সনাতন তথায় সম্পূর্ণ নীরব আছেন। কেবলমাত্র মঙ্গলাচরণে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—

ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং
দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণম্।
চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে
যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেঽর্থসিদ্ধিঃ।।
লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসস্য যথামতি।
টীকা দিগ্‌দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী।।

সুদুষ্করে কর্ম্মাণি প্রবর্ত্তমানো গ্রন্থকারস্তৎসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগুরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি চৈতন্যেতি।

যিনি শ্রীব্রহ্মাদি গুরুবর্গের বেদাদিশাস্ত্রস্ফূর্ত্তি-বিষয়ে শক্তিপ্রদান করেন, যিনি নিজপ্রেমভক্তি প্রদান করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহার কৃপাপ্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রার্থসিদ্ধি করতলগত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসের একাংশের অর্থবোধ হয়, এরূপ 'দিগ্‌দর্শিনী'-নাম্নী টীকা আমি আমার বুদ্ধি-অনুসারে প্রণয়ন করিতেছি।

গ্রন্থকার অতি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যসিদ্ধিহেতু 'শ্রীচৈতন্য' ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বাগ্রে পরম গুরুস্বরূপ শ্রীমান্ ইষ্টদেবকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক, যথা—

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাদুভিঃ সার্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ।।

বৈষ্ণবগণের পরমানন্দ-বর্দ্ধনার্থ সাধুগণের সহিত বিচার করিয়া সমস্ত শাস্ত্র হইতে আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক সহজে লিখিতে ইচ্ছা করিয়া আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিতেছি।

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ।।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শ্রীভগবানের (শ্রীচৈতন্যদেবের) প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীগোপালভট্ট ভক্তিবিলাস-সমূহ চয়ন করিতেছে।

মথুরানাথপাদাজপ্রেমভক্তিবিলাসতঃ।
জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং তদ্ভক্তাঃ শীলয়ন্ত্বিমম্।।

শ্রীমথুরেশ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমভক্তিবিলাস হইতে এই 'ভক্তিবিলাস' -নামক গ্রন্থ প্রকটিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার ভক্তগণ অনুশীলন করুন।

জীয়াসুরাত্যন্তিকভক্তিনিষ্ঠাঃ শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলেঽত্র।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ।।

একান্ত ভক্তনিষ্ঠ শ্রীবৈষ্ণবগণ এই শ্রীমথুরামণ্ডলে পরমোৎকর্ষে অবস্থান করিতে থাকুন এবং শ্রীবৃন্দাবনে সেই শ্রীল লোকনাথ, শ্রীল কাশীশ্বর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস বিরাজিত থাকুন।

উপসংহার-শ্লোক, যথা—

সদা সদাচারপরাস্তু যে নরা ভবন্তি দামোদরভক্ত্যপেক্ষয়া।
তদীয়পাদাম্বুজধূলিধূসরং কদা ভবেদস্য শিরোঽধমস্য মে।।

শ্রীদামোদরের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভের আশায় যাঁহারা নিরন্তর সদাচার-পরায়ণ থাকেন, অধম আমার মস্তক তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মরেণুতে কবে ধূসরিত হইবে?

শ্রীনন্দসুন্দরমুকুন্দপদারবিন্দ-
প্রেমামৃতাব্ধিরসতুন্দিলমানসা যে।
নানার্থবৃন্দমনুসংদধতে ন চ স্বং
তেষাং পদাব্জমকরন্দমধুব্রতঃ স্যাম্।।

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীমুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমামৃতসমুদ্ররসে যাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ, যাঁহারা নিজের জন্য নানাবিধ অর্থসমূহের অনুসন্ধান করেন না, আমি তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মমকরন্দলোভী ভ্রমর হইব।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য যে-কোন বিষয়ে বিশেষ জানিবার আবশ্যক হইলে, তাহা যথাযথ শাস্ত্র বা শ্রীগুরুমুখ হইতে অবগত হওয়াই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিহিত অপরাপর অনেক সদাচার আছে, অধুনা অনুষ্ঠাতার অভাবহেতু তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল না। ইহাতে প্রায়শঃ সজ্জন ধনবান্ গৃহিগণের করণীয় কৃত্যই প্রদর্শিত হইল। কারণ, ধনী গৃহস্থগণের পক্ষে অর্চ্চনমার্গে নিষ্ঠা না থাকিলে তাহাদিগের মঙ্গল লাভ হয় না। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন মহাত্মগণের সম্বন্ধে কোনরূপ অর্চ্চনাড়ম্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই। একাকী ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, অন্য কোন কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহাদের কোন বাসনা হয় না। বিধি-নিষেধোত্থ পুণ্য-পাপাদি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২০টি বিলাস বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক বিলাসের পৃথক্ পৃথক্ নাম দৃষ্ট হয়। নিম্নে যথাক্রমে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,—

(১) গৌরব-বিলাস, (২) দৈক্ষিক-বিলাস, (৩) শৌচীয়-বিলাস, (৪) শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার-বিলাস, (৫) আধিষ্ঠানিক-বিলাস, (৬) স্নাপনিক-বিলাস, (৭) পৌষ্পিক-বিলাস, (৮) প্রাতরর্চ্চাসমাপন-বিলাস, (৯) মহাপ্রসাদ-বিলাস, (১০) সৎসঙ্গম-বিলাস, (১১) নিত্যকৃত্য-বিলাস, (১২) একাদশীনির্ণয়-বিলাস, (১৩) বিষ্ণুব্রতোৎসব-বিলাস, (১৪) ষাণ্মাসিক-বিলাস, (১৫) দিব্যাবির্ভাব-বিলাস, (১৬) শ্রীদামোদরপ্রিয়-বিলাস, (১৭) পৌরশ্চরণিক-বিলাস, (১৮) শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাববিলাস, (১৯) প্রাতিষ্ঠিত-বিলাস, (২০) প্রাসাদিক-বিলাস।

কেহ কেহ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস' নামক দুইটী গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর রচিত

গ্রন্থের নাম 'শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস' এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামি-রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'। প্রথমোক্ত গ্রন্থটী বৃহৎ এবং শেষোক্ত গ্রন্থটী সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধ। বর্ত্তমানকালে মুদ্রিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রতিবিলাসের পুষ্পিকায়ই এইরূপ দৃষ্ট হয়—"ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তি-বিলাসে" ইত্যাদি। অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বিচার করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুই প্রথমে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস সঙ্কলন করেন এবং বর্ত্তমান শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস শ্রীরূপের শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-রচনার পূর্ব্বেই সঙ্কলিত হইয়াছিল; কারণ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র নাম ধরিয়া প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (পূর্ব্ব বিঃ, ২য় লঃ, ৪২ শ্লোক, ও ঐ, ৯৪ শ্লোক)। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পাদিত হইবার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব'-নামক স্মৃতিপ্রবন্ধ রচনা করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে-সকল গ্রন্থের নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, বর্ণানুক্রমে তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

অগস্ত্য-সংহিতা, অগ্নিপুরাণ (নামান্তর—আগ্নেয় ও বহ্নিপুরাণ), অঙ্গিরস্, অত্রি, অত্রিস্মৃতি, অথর্ব্ব-পরিশিষ্ট, অথর্ব্ববেদ, অন্যে, অন্যত্র, অবন্তীখণ্ড, আগম, আঙ্গিরস-পুরাণ, আদিত্যপুরাণ, আদিপুরাণ, আদিবারাহ, আপস্তম্ব, ইতিহাস-সমুচ্চয়, ইতিহাসোত্তম, ঋক্-পরিশিষ্ট, ঋগ্বেদীয়াশ্বলায়ন-শাখা, কণ্ব, কপিল-পঞ্চরাত্র, কাত্যায়ন, কাত্যায়ন-সংহিতা, কাত্যায়ন-স্মৃতি, কালিকাপুরাণ, কাশীখণ্ড, কাশ্যপ-পঞ্চরাত্র, কূর্ম্মপুরাণ (নামান্তর—কৌর্ম্ম), কৃষ্ণদেবাচার্য্য, কেচিৎ, কৌৎস, ক্রম-দীপিকা, ক্বচিৎ, গরুড়পুরাণ (নামান্তর—গারুড় ও সৌপর্ণ), গার্গ্য, গালব, গৃহ্য-পরিশিষ্ট, গোভিল, গৌতমীয়, গৌতমীয়-তন্ত্র, ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট, জাবালি-সংহিতা, জৈমিনি, জৈমিনি-সংহিতা, জ্ঞানমালা, তত্ত্বসাগর, তত্ত্বসার, তন্ত্র, তান্ত্রিকাঃ, তাপনীয়শ্রুতি, তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্র, ত্রিকাণ্ডমণ্ডল, ত্রৈলোক্য-মোহন-পঞ্চরাত্র, ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্র, দক্ষ, দক্ষস্মৃতি, দেবল, দেবী, দেবী-পুরাণ, দেবীরহস্য, দেব্যাগম, দ্বারকা-মাহাত্ম্য, ধ্রুবচরিত, নন্দিপুরাণ, নরহিংসপুরাণ (নামান্তর—নৃসিংহপুরাণ ও নারসিংহ), নবপ্রশ্ন-পঞ্চরাত্র, নারদ, নারদতন্ত্র, নারদ-পঞ্চরাত্র, নারদীয়-পঞ্চরাত্র, নারদপুরাণ (নামান্তর—নারদীয়), নারদ-স্মৃতি, নারদীয়কল্প, নারায়ণ-ব্যূহস্তব, নিগম, নির্ণয়ামৃত, নৃসিংহ- পরিচর্য্যা-

পঞ্চরাত্র, পদ্মনাভীয়, পদ্মপুরাণ (নামান্তর—পাদ্ম), পরাশর, পরাশর-সংহিতা, পাণ্ডবগীতা, পিতামহ, পুরাণ-সমুচ্চয়, পুরাণান্তর, পুলস্ত্য, পুলহ, পুষ্কর-পুরাণ, পূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতি, পৈঠীনসি, প্রতিষ্ঠানেত্র, প্রপঞ্চসার, প্রভাসপুরাণ, প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্র, প্রহ্লাদ-সংহিতা, বহ্বৃচ-পরিশিষ্ট, বৃহৎ-শাতাতপস্মৃতি, বৃহদ্-গৌতমীয়, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, বৃহন্নরসিংহ-পুরাণ (নামান্তর—বৃহন্নারসিংহ), বৃহন্নারদীয়, বৃহস্পতি, বৌধায়ন, বৌধায়ন-সংহিতা, বৌধায়নস্মৃতি, ব্রহ্মপুরাণ (নামান্তর—ব্রাহ্ম), ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (নামান্তর—ব্রহ্মাণ্ড), ভগবদ্গীতা, ভরদ্বাজ-স্মৃতি, ভবিষ্যপুরাণ (নামান্তর—ভবিষ্য), ভবিষ্যোত্তর, ভাগবত, ভাগবতাদি-তন্ত্র, ভারতবিভাগ, ভোজরাজীয়, মৎস্য-পুরাণ (নামান্তর—মাৎস্য), মনু, মনুস্মৃতি, মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশ, মন্ত্রদেবপ্রকাশিনী, মন্ত্রমুক্তাবলী, মন্ত্রার্ণব, মহাভারত, মহাসংহিতা, মাধবীয়, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, মাকর্ণ্ডেয়, মূলাগম, মৃত্যুঞ্জয়-সংহিতা, যম, যম-স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, যামল, যোগ-বাশিষ্ঠ, যোগসার, যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা, রুদ্র-যামল, লঘুভাগবত, লিঙ্গ-পুরাণ (নামান্তর—লৈঙ্গ), লোকাক্ষি, বরাহপুরাণ (নামান্তর—বারাহ ও বারাহী), বর্ষায়ণি, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ-সংহিতা, বামনকল্প, বামনপুরাণ (নামান্তর—বামন), বায়ুপুরাণ (নামান্তর—বায়ব্য), বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র, বিশ্বামিত্র-সংহিতা, বিষ্ণু, বিষ্ণুধর্ম্ম, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বিষ্ণুপুরাণ (নামান্তর—বৈষ্ণব), বিষ্ণু-যামল, বিষ্ণুরহস্য, বিষ্ণুস্মৃতি, বৃদ্ধ-মনু, বৃদ্ধ-বশিষ্ঠ, বৃদ্ধশাতাতপ, ব্যেঙ্কটাচার্য্য, বৈদিক, বৈশম্পায়ন-সংহিতা, বৈশ্বানর-সংহিতা, বৈষ্ণব-চিন্তামণি, বৈষ্ণব-তন্ত্র (নামান্তর—বৈষ্ণব), বৈহায়স-পঞ্চরাত্র, ব্যাস, ব্যাসস্মৃতি, শঙ্করাচার্য্য, শঙ্খ, শঙ্খ-স্মৃতি, শরৎ-প্রদীপ, শাতাতপ, সারদা, সারদাতিলক, সারদা-পুরাণ, শিবধর্ম্মোত্তর, শিব-পুরাণ, শিব-রহস্য, শিবাগম (নামান্তর—শৈবাগম), শুক্রস্মৃতি, শ্রুতি, ষট্‌ত্রিংশন্মত, সংহিতা, সঙ্গীতশাস্ত্র, সনৎকুমার, সনৎকুমারকল্প, সনৎকুমার-তন্ত্র, সনৎকুমার-সংহিতা, সম্মোহন-তন্ত্র, সম্বর্ত্ত, সম্বর্ত্তক, সারসংগ্রহ, সিদ্ধার্থ-সংহিতা, সুমন্তু, সুমন্তু-স্মৃতি, সৌরধর্ম্ম, সৌর-ধর্ম্মোত্তর, সৌরপুরাণ, স্কন্দপুরাণ (নামান্তর—স্কান্দ), স্মার্ত্তাঃ, স্মৃতি, স্মৃত্যন্তর, স্মৃতি-মহার্ণব, স্মৃত্যর্থসার, হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র (নামান্তর—হয়গ্রীবপঞ্চরাত্র, অশ্বশিরঃপঞ্চরাত্র, হয়শীর্ষ ও হয়শীর্ষীয়), হরিভক্তিসুধোদয়, হরিবংশ, হারীত, হারীত-স্মৃতি।

(৩) লীলাস্তব—এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে 'শ্রীল সনাতনের রচিত শ্রীগ্রন্থাবলী'র অংশটি দ্রষ্টব্য।

(৪) বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টিপ্পনী—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের শ্রীসনাতন কৃত টীকার নাম 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর টীকার নাম 'বৈষ্ণবতোষণী'। শ্রীশ্রীজীবের বৈষ্ণবতোষণী বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীরই সংক্ষেপ। বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ১৪৭৬ শকাব্দে ও সংক্ষিপ্তা বৈষ্ণবতোষণী ১৫০৪ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১।৮০৩) লঘুতোষণীর প্রমাণ-শ্লোকে পাওয়া যায়। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত-লীলাসমূহের গূঢ় তাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্তসার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় যে-সকল কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই, তাহা সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিবার জন্য এই টিপ্পনী রচিত হইয়াছে।

এই টীকার মঙ্গলাচরণ যথা—

শ্রীমন্মদনগোপালং বৃন্দাবন-পুরন্দরম্।
শ্রীগোবিন্দং প্রপদ্যেঽহং দীনানুগ্রহকাতরম্।।

শ্রীবৃন্দাবনেন্দ্র শ্রীমদনগোপালে এবং দীনজনগণের প্রতি করুণার উদ্রেকহেতু কাতর-হৃদয় শ্রীগোবিন্দে আমি প্রপন্ন হই।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ।।

যিনি প্রেমভক্তি প্রদান করিবার জন্য গৌড়-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই করুণাসাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীমাধবপুরীং বন্দে যতীন্দ্রং শিষ্যসংযুতম্।
লোকেষ্বঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণভক্ত্যমরাঙ্ঘ্রিপঃ।।

যিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিরূপ সুরতরুকে অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন, সেই শিষ্যগণ-পরিবৃত-সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রভুকে বন্দনা করি।

শ্রীভাগবতসিদ্ধ্যর্থা টীকাদৃষ্টিরদায়ি যৈঃ।
শ্রীধরস্বামিপাদাংস্তান্ বন্দে ভক্ত্যেকরক্ষকান্।।

শ্রীমদ্ভাগবতে সিদ্ধিলাভ হয়, এরূপ টীকা যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই শুদ্ধভক্তির একমাত্র মর্য্যাদারক্ষক শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদকে আমি বন্দনা করি।

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্।।

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতি-প্রমুখ অধ্যাপকবর্গ এবং গৌড়দেশের ভূষণস্বরূপ শ্রীল বিদ্যাভূষণপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্।।

রসপ্রিয় শ্রীল পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামভদ্র ও উপদেশক শ্রীবাণীবিলাস-প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

নমামি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাস-পণ্ডিতম্।
নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতম্।।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, অবধূত শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর-পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি।

দামোদরস্বরূপাদীন্ বন্দে চৈতন্যপার্ষদান্।
যেষাং পদরজঃস্পর্শাদধমোঽপ্যুত্তমো ভবেৎ।।

যাঁহাদের শ্রীচরণরেণুস্পর্শে অধম ব্যক্তিও উত্তম হয়, সেই শ্রীল দামোদর-স্বরূপাদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদগণকে আমি বন্দনা করি।

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্।।

শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মাশ্রিত, শ্রীবৃন্দাবনে প্রীতিযুক্ত বৈষ্ণবগণকে, শ্রীমৎ-কাশীশ্বর, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাসকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীধরস্বামিপাদৈর্যা ব্যঞ্জিতা ন ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
সেয়ং শ্রীদশমস্কন্ধ-টীকা বৈষ্ণব-তোষণী।।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ যাহা কোথাও কোথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই, তাহাই শ্রীদশমস্কন্ধ-টীকাস্বরূপ 'বৈষ্ণবতোষণী'।

বৈষ্ণবাপরিতোষঃ স্যাদ্ যত্র যত্র ততস্ততঃ।

লেখ্যং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুসারেণৈব কিঞ্চন।।

যাহাতে যাহাতে বৈষ্ণবগণ সম্যগ্‌ভাবে পরিতোষ লাভ করেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্ব্বক সেইরূপভাবে কিছু কিছু লিখিত হইল।

যেষাং প্রোৎসাহনেনাস্মি প্রবৃত্তোঽত্যন্তসাহসে।

তে দীনানুগ্রহব্যগ্রাঃ শরণং মেঽত্র বৈষ্ণবাঃ।।

যাঁহাদিগের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত হইয়া আমি এই অত্যন্ত সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই দীনগণের প্রতি করুণাদানে ব্যাকুল বৈষ্ণবগণ এবিষয়ে আমার একমাত্র আশ্রয় হউন।

রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টো

গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ।

স্যাতামুভৌ যত্র সুহৃৎসহায়ৌ

কো নাম সোঽর্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ।।

শ্রীরাধিকার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদ্বারা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট শ্রীল গোপালভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথদাস—এই উভয় বান্ধবই যে-স্থানে সহায়, তথায় এমন কি অর্থ থাকিতে পারে, যাহা সুসিদ্ধ না হয়?

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ গুণবতোঽখিলম্।

ভূয়াদিদং যদাদেশবলেনৈব বিলিখ্যতে।।

যাঁহার আদেশবলে আমি এই টিপ্পনী লিখিলাম, ইহা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বগুণনিলয় শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর প্রীতির বিষয় হউক।

শ্রীচৈতন্যপাদাম্ভোজগন্ধজ্ঞৈরেব বৈষ্ণবৈঃ।

এষা রসয়িতুং শক্যা সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।।

সেই এই 'বৈষ্ণবতোষণী' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদারবিন্দ-গন্ধঘ্রাণে অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণই আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতঃ কৃতা।

টিপ্পনী দশমস্কন্ধে পূর্ণা বৈষ্ণবতোষণী।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর প্রীতিবিধানহেতু (শ্রীমদ্ভাগবতের) দশমস্কন্ধের 'বৈষ্ণবতোষণী'-নাম্নী টিপ্পনী-রচনা সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীলঘুতোষণীতে উক্ত হইয়াছে—

শাকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা।।

১৪৭৬ শকাব্দে এই শুভদা বৈষ্ণবতোষণী-টিপ্পনী পূর্ণ হইয়াছে; আর ১৫০৪ শকে সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবতোষণী সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামি

পিতৃ-পরিচয়

কলিযুগলপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর ও মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর ষড়্‌গোস্বামির অন্যতম শ্রীশ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভু।

শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি শ্রীগৌরচরিত-লেখকগণ শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীল তপন মিশ্রের আত্মজ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাল্যে শ্রীগৌরকৃপা-লাভ

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সংক্ষেপে একস্থানে শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রভুর এইরূপ পরিচয় দান করিয়াছেন,—

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন।।
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস।।
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন।।
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোন দিনে।।
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা।।
তাঁ'র স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১৫৩-১৫৮)

শ্রীল মুরারিগুপ্ত ঠাকুরও শ্রীল তপনমিশ্র-নন্দন শ্রীল রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের অতি বাল্যকালেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-প্রাপ্তির কথা এইরূপভাবে লিখিয়াছেন,—

এবং ক্রমেণ ভগবান্ কাশীমুপজগাম হ।
বিশ্বেশ্বর-মহালিঙ্গ-দর্শনানন্দবিহ্বলঃ।।
তত্রৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ তপনাখ্যঃ সুবৈষ্ণবঃ।
পশ্যন্ প্রভুং মহাহৃষ্টো নিনায় নিজমন্দিরম্।।
তেন সংপূজিতঃ কৃষ্ণঃ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ।
ভিক্ষাৎ কৃত্বা গৃহে তস্য সুখাসীনো জগদ্গুরুঃ।।
তিষ্ঠেতি ত্বৎসুতেনাপি রঘুনাথেন মানিতঃ।
তস্মৈ মহাকৃপাং চক্রে বালকায় মহাত্মনে।।

(শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা ৪।১।১৪-১৭)

এইরূপে ক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকাশীধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিশ্বেশ্বর-মহালিঙ্গ-দর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন। সেই শ্রীকাশীধামেই 'শ্রীতপনমিশ্র'-নামক কোন সুবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ প্রভুকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্বীয় মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন। জগদ্গুরুর লীলাভিনয়কারী অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীতপনমিশ্রের দ্বারা সম্পূজিত হইয়া তাঁহার গৃহে সুখাসীন হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'তোমরা পুত্র শ্রীরঘুনাথের দ্বারা সম্মানিত হইয়া অবস্থান কর'—এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর সেই মহাত্মা বালককে (শ্রীরঘুনাথকে) মহা-কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীতপন মিশ্র

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি ১৪শ অঃ) দৃষ্ট হয়,—ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ ও অধ্যাপক-লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু ছাত্রের সহিত শ্রীনবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীতপন মিশ্র নামে এক "অতিসারগ্রাহী", "সুকৃতি ব্রাহ্মণ" সাধ্য-সাধনতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সাক্ষাৎকারের অভাবে সংশয়চিত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়াছিলেন। * তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপনমিশ্রকে সর্ব্ব দেশ, কাল ও পাত্রের একমাত্র সিদ্ধিপ্রদ ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ অনুশীলনের উপদেশ প্রদান করেন।

---

* 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনানুসারে পদ্মাবতী-তীরস্থ রামপুর-নামক গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীতপন মিশ্রের মিলন হয়।

শ্রীতপন মিশ্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিবার অনুমতি চাহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রকে সত্বর শ্রীকাশীধামে গমন করিবার আদেশ করেন এবং তথায় প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ও সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-শ্রবণের বিশেষভাবে সুযোগ ঘটিবে বলিয়া জ্ঞাপন করেন। শ্রীতপন মিশ্র ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ সর্ব্ব-কারণকারণ শ্রীভগবান্ বলিয়া স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীতপন মিশ্র তখন হইতেই বিষয়াদিতে নিস্পৃহ হইয়া একান্তভাবে হরিভজনের জন্য নিতান্ত আর্ত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীতপন মিশ্র অতি দৈন্যভরে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে সংসার হইতে উদ্ধার ও সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-বিষয়ে স্বীয় অজ্ঞতা ও নিঃশ্রেয়স-লাভের নিবেদন জ্ঞাপন করিলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীতপন মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীব-মঙ্গলময় এই কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,—

—"বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা।।
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার।।

চারি-যুগে চারিধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজস্থানে চলে।।
কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ।।
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার।।
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।।
শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁ'র মহাভাগ্য।।
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া।।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল।।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র।।
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩২-১৩৪, ১৩৭, ১৩৯-১৪৭)

আবির্ভাব-কাল

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আহৃত ও শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন কড়চার মধ্যে শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-কালাদির বিবরণ একই প্রকার দৃষ্ট হয়,—আবির্ভাবকাল—১৪২৭ শকাব্দা (= ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ); প্রকটস্থিতি—৭৪ বৎসর; শ্রীবৃন্দাবনবাস—৪৫ বৎসর; গৃহে স্থিত—২৮ বৎসর; শ্রীনীলাচলে বাস—১ বৎসর; অন্তর্দ্ধান—১৫০১ শকাব্দা (= ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ)। এই বিবরণের শেষে তিরোভাবের তারিখ 'জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী' দৃষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "ইহা পঞ্জিকাবিরুদ্ধ" বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় আশ্বিন-শুক্ল-দ্বাদশী শ্রীল ভট্টগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১৫৩-৫৮) শ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-কাল "আনুমানিক ১৪২৫ শক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথের গুণাবলী

শ্রীকাশীধামে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে নিত্য ভিক্ষা স্বীকার করিতেন এবং যাঁহার আত্মজ অতি-বাল্যকালেই শ্রীগৌরসুন্দরের

উচ্ছিষ্টপাত্রমার্জ্জন, উচ্ছিষ্ট-ভোজন ও শ্রীপাদ সম্বাহনাদি-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীতপন মিশ্রের ন্যায় মহাভাগবতবর বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও তাঁহার নন্দন শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর গুণাবলীর কথা স্বয়ং শ্রীঅনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন।।
প্রভুর 'শেষান্ন' মিশ্র সবংশে খাইল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭।৯০-৯১)

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল এবং তিনি রন্ধন-বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীকাশীবাসিগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া শ্রীকাশীতেই রাখিয়া যান। কিছুদিন পরে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম কাশীতে আগমন করিয়া শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ এবং শ্রীমিশ্রের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'য় উপদেশসমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বালক শ্রীরঘুনাথের সেই সময় শ্রীল রূপ প্রভুর দর্শন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশসমূহ শ্রবণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল।

শ্রীনীলাচলে গমন

শ্রীল রঘুনাথ বাল্যকালে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভুকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক সেবা করিতেছিলেন। কবে তিনি প্রভুর শ্রীপাদপদ্মান্তিকে অভিগমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তজ্জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণই ব্যাকুল থাকিত। শ্রীল রঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবতীয় কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের জন্য নানাদ্রব্যপূর্ণ 'ঝালি' সজ্জিত করিয়া এবং পথে 'শ্রীরামদাস বিশ্বাস'-নামক জনৈক পুরীযাত্রী রামানন্দী সম্প্রদায়-ভুক্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মান্তিকে উপস্থিত হ'ন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন,—

এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্য।
প্রভুরে দেখিতে চলিলা ছাড়ি' সর্ব্বকার্য্য।।
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁ'র ঝালি সাজাঞা।।
পথে তা'রে মিলিলা বিশ্বাস-রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস।।
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, 'কাব্যপ্রকাশ'-অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক।।
অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রি-দিনে।
সর্ব্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে।।
রঘুনাথ-ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি' বহিয়া চলিলা।।
নানা সেবা করি' করে পাদসম্বাহন।
তা'তে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন।।
"তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ।।"
রামদাস কহে,—"আমি শূদ্র অধম!
'ব্রাহ্মণের সেবা',—এই মোর নিজধর্ম্ম।।
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি—তোমার 'দাস'।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয় উল্লাস।।"
এত বলি' ঝালি বহেন, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রে-দিনে।।
এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাঞা মিললা কুতূহলে।।

দণ্ড-প্রণাম করি' ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'রঘুনাথ' বলি' কৈলা আলিঙ্গনে।।
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৯-১০২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভৃত্য শ্রীল রঘুনাথকে স্বীয় পদান্তিকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিলেন,—

"ভাল হইল আইলা, দেখ 'কমললোচন'।
আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন।।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৩)

স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর নিজসেবক শ্রীগোবিন্দকে বলিয়া শ্রীরঘুনাথ-ভট্টকে একটি বাসস্থান প্রদান ও শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার করাইলেন। এইভাবে শ্রীল রঘুনাথ অনুক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ও উল্লাসে উদ্ভাসিত ও প্রবর্দ্ধিত হইয়া আটমাসকাল প্রভু-সঙ্গে শ্রীনীলাচলে বাস করিলেন। বিচিত্র ভোগরন্ধন-নিপুণ শ্রীরঘুনাথ মধ্যে মধ্যে স্বীয় বাসস্থানে স্বহস্তে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, অন্ন প্রভৃতি রন্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ।
ঘর-ভাত করেন, আর বিবিধ ব্যঞ্জন।।
রঘুনাথ-ভট্ট—পাকে অতি-সুনিপুণ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম।।
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৬-১০৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীল রঘুনাথ শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে অষ্টমাসকাল অবস্থান করিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সংসার-

প্রবেশে অনিচ্ছুক ও অপ্রবিষ্ট সাধককে যোষিৎসঙ্গাদি-দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখস্পৃহামূলে অত্যাহার-প্রয়াস-লৌল্যাদি ভক্তি-প্রতিবন্ধক চেষ্টাসমূহ হইতে সতর্ক থাকিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে শ্রীকাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবসেবার্থ আদেশ এবং শুদ্ধ ভক্ত-ভাগবত-সমীপে শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যার্থ বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি' নিষেধ করিলা।।
বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১১২-১১৩)

এইস্থানে লক্ষ্য করিবার একটি বিশেষ বিষয় আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহারই অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর প্রতি 'ব্রাহ্মণের সহায়' মাতা-পিতার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানের উপদেশ দিয়াছিলেন, পুত্রের নিকট পরমপূজনীয় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে "বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া" বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই; সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার আর এক নিজজন শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুর প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন কেন? —

"বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১১৩)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন,—

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৯।১৪)

তবে কি শ্রীমন্মহাপ্রভু একচক্ষু অথবা আচারহীন প্রচারক? নিজের বেলায় তিনি মাতার প্রতি আসক্ত, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সেই আসক্তি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ এবং যাঁহারা তাঁহার সেবা করেন, কেবল সেই সকল মাতা-পিতাকেই সেবা করিবার জন্য পুত্রগণকে আদেশ প্রদান করেন!

বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দুই নিত্যসিদ্ধ নিজজনের দ্বারা আমাদিগকে এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মাতা-পিতার সদাচার, দেব-দ্বিজে ভক্তি, দান-ধ্যান, পুণ্যকর্ম্ম প্রভৃতির দোহাই দিয়া বিষয়াসক্ত মাতা-পিতার সেবার ছলে বিষয়-ভোগকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিবার যে নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি, সেইরূপ কাপট্য হইতে জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্যই নিজজন শ্রীরঘুনাথের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল উপদেশ। শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবা করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রদান বিষয়াসক্ত, অন্যাভিলাষী বা বৈষ্ণবপ্রায় মাতা-পিতার সেবা-শিক্ষা-প্রচার নহে। শ্রীতপন মিশ্র শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের একান্ত দাস ছিলেন; তিনি মহাভাগবতবর। শ্রীতপন মিশ্রের সহধর্ম্মিণীও শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক-ভক্তিবিশিষ্টা। শ্রীগৌর ভগবানের কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহারা সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীব্রহ্মশিবাদিবন্দ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মের সাক্ষাৎসেবা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিত্যকাল শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের নিজজন। তাঁহারা জাগতিক মাতৃ-পিতৃনামধারিগণের ন্যায় পুত্রে ভোগবুদ্ধিকারী, বিষয়াসক্ত বা বৈষ্ণবের প্রায় নহেন। সুতরাং শ্রীল রঘুনাথ-ভট্টের প্রতি মাতা-পিতার সেবার জন্য আদেশ—শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবক মহা-ভাগবতবর বৈষ্ণবের সেবার ফলে শ্রীগৌরকৃষ্ণচরণ-সেবালাভের আদর্শ জগতে স্থাপন। বহির্ম্মুখ বা ছলভক্ত-সম্প্রদায় জগতে ভক্তাভাস মাতা-পিতার সেবার নামে—বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তির অনুশীলন—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" প্রভৃতি লৌকিক-নীতিবাক্যের আচরণ-ফলে স্বর্গাদি পুণ্যময় অনিত্য কু-বিষয়-ভোগ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে সেরূপ শিক্ষা প্রদান করেন নাই। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা মাতা-পিতার সেবার ফলে অধিকতর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং মাতা-পিতার শ্রীধামপ্রাপ্তির পর শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রয়ে অষ্টকাল শ্রীহরিভজন করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর আদর্শ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু অভক্তিনীতি-বাদিগণকে জানাইলেন,—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী।।
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৫)

সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীনীলাচলে থাকিয়াও শ্রীশচীদেবীর ও ভক্তগণের নিকট শ্রীজগন্নাথদেবের উত্তম উত্তম প্রসাদাদি-প্রেরণ, তাহা স্বয়ং শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত ভক্তবাৎসল্যপ্রেমবশ্যতাই প্রচার করিতেছে। বদ্ধজীবের আসক্তি ও শ্রীভগবানের বা বৈষ্ণবের ভক্তপ্রীতি বাহ্যদর্শনে এক হইলেও উহাদের অন্তরনিষ্ঠা সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রীবারাণসীতে প্রত্যাবর্তন

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরঘুনাথভট্টকে পূর্ব্বোক্ত উপদেশাদি প্রদান করিয়া শ্রীনীলাচলে পুনরায় একবার আসিবার কথা বলিয়া দিলেন এবং স্বীয় কণ্ঠমালা-প্রসাদ শ্রীল রঘুনাথের গলদেশে প্রদান ও আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরঘুনাথকে বিদায় দিলেন। শ্রীরঘুনাথ প্রভু-বিরহে প্রেমে গরগর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীস্বরূপাদি শ্রীগৌরভক্তগণের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীষ্টানুসারে বারাণসীতে আসিলেন। তথায় বৈষ্ণব-পণ্ডিতের নিকট বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ও চারি বৎসরকাল গৃহে থাকিয়া মাতা-পিতার সেবা করিলেন। মাতাপিতার শ্রীধামপ্রাপ্তি হইলে শ্রীল রঘুনাথ বিরক্ত হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও শ্রীল রঘুনাথ আটমাসকাল প্রভুর সমীপে ছিলেন। আটমাস শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে কৃপালিঙ্গন-পূর্ব্বক এইরূপ আদেশ করিলেন,—

"আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে।
তাহাঁ যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে।।
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্।।"
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৪।১২০-১২১)

শ্রীমহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চার ও শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা আলিঙ্গনে শ্রীল রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া শ্রীল রঘুনাথকে "চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা" ও "ছুটা-পান-বিড়া" কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিলে শ্রীল রঘুনাথ সেই মালাকে ইষ্টদেবরূপে রক্ষা করিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে আশ্রয় করিয়া রহিলেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভু অতীব সুকণ্ঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় নিপুণ ছিলেন। সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশানুসারে শ্রীরূপের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় শ্রীল রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে শ্রীল রঘুনাথের অতিমর্ত্ত্য প্রেমাবেশবশতঃ অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার উপস্থিত হইত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের এক-একটি শ্লোক বিভিন্ন রাগরাগিনীতে কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমবিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দই তাঁহার একমাত্র প্রাণধন ছিল। শ্রীগোবিন্দের শ্রীপদারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি অষ্টকাল শ্রীগোবিন্দলীলামৃত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণেই অতিবাহিত করিতেন। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য-শিরোমণি শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট গোস্বামিপ্রভু নিজের কোন ধনাঢ্য শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের ভূষণাদি নির্ম্মাণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণকথা ও পূজাদিতে এইরূপভাবে তাঁহার অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হইত। তিনি কখনও জিহ্বায় গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ পার্থিব শুভাশুভ বিষয়-কথা কীর্ত্তন বা কর্ণে উহা শ্রবণ করিতেন না। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠের লক্ষণ যে অন্যনিন্দাদি-শূন্যতা ও সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদর্শন ও অনুভূতি, তাহাই তাঁহার চরিত্রে পূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট হইত। তিনি শ্রীকৃষ্ণস্মরণের কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত মালা ও প্রসাদ যথাক্রমে গলদেশে সযত্নে ধারণ ও গ্রহণ করিয়া প্রভুর কৃপায় অনর্গল কৃষ্ণপ্রেমে উদ্ভাসিত হইতে থাকিতেন। শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপের অভিন্নবিগ্রহ ও তাঁহারই নিজজন। শ্রীল রূপপ্রভু যখন শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভ-ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলনাথের ভবনে সপরিকরে শ্রীগোপালদেবের দর্শন করেন, তখন শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুও শ্রীরূপের গণের অন্যতম ছিলেন।

শ্রীব্রজলীলার পরিকর

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুর প্রসঙ্গ উল্লেখ না করিলেও তাঁহার 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীব্রজলীলার 'শ্রীরাগমঞ্জরী' ও 'শ্রীরাধাকুণ্ড-কুটীরবাসী' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী।
কৃত-শ্রীরাধিকাকুণ্ডকুটীরবসতিঃ স তু।।

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—১৮৫)

পূর্ব্বে শ্রীব্রজলীলায় যিনি শ্রীরাগমঞ্জরী ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট গোস্বামী হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড-তটস্থিত কুটীরে বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর রচিত কোন গ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায় না। ষড়্গোস্বামীর মধ্যে কেবল শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামিপ্রভু ব্যতীত আর সকলেরই রচিত কোন না কোন গ্রন্থের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-পঠনকেই জীবাতু করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন—শিষ্য করিয়াছিলেন—নিজশিষ্যকে বলিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার গ্রন্থাদি-রচনা সম্বন্ধে কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা শ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু ও তাঁহাদের একান্ত ভৃত্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভৃত্যানুভৃত্য-সম্প্রদায়ের আনুগত্যে শ্রীষড়্গোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি। 'গৌড়ীয়ে' এই ষড়্গোস্বামীর চরিতগাথা আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় তাঁহাদের উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণরূপে কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ।।

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ’-সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।৩৬-৩৭)

শ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর সূচক

জয় ভট্ট-রঘুনাথ গোসাঞি।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি।।
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,
বারাণসে ছিল যা’র বাস।
নিজগৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুইমাস।।
শ্রীচৈতন্য-নাম জপি’ কথোদিন গৃহে থাকি’
করিলেন পিতার সেবনে।
তা’র অপ্রকট হৈলে, আসি’ পুনঃ নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে।।
মহাপ্রভু কৃপা করি’ নিজশক্তি সঞ্চারি’
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গণি’ আসি’ বৃন্দাবন-ভূমি,
মিলিলেন রূপ-সনাতন।।
দুই গোসাঞি তা’রে পাঞা, পরম-আনন্দ হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু, পুলক, কম্প, নানাভাবাবেশ অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণ-কথার উল্লাসে।।
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে, যমুনা-পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেম-সুখে।

শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যা'র মুখে।।
পরমবৈরাগ্য-সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু-পক্ষী পুলকিত, যা'র মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানি।।
শ্রীরূপ-সনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুইজন,
শ্রীগোপাল, ভট্ট-রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে, পড়িলুঁ বিষয়-ভোলে,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ।।

শ্রীজীব গোস্বামি

শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর সর্ব্বভুবনমঙ্গলময়ী বিশ্ব-বৈষ্ণবারাধ্যা তিরোভাব-তিথি বলিয়া খ্যাত। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—''শ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।'' (শ্রীসজ্জনতোষণী, ২য় বর্ষ)। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—''শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সকলে জানেন। মহাপ্রভুর প্রেমভাজন গৌরব-পাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে 'প্রভু' বলিয়া অনেকেই জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্ব্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীজীবপ্রভু। তিনি শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন- ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলাপ্রকটকারী। চিরজীবন চিদ্বিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।'' (গৌড়ীয় —১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'র ''তোষণীর কথা'' শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—''শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণা-বলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীবপ্রভু বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার 'সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগগণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান-মার্গের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজনমার্গের সুগমপথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয় ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়-বৈভব সংরক্ষণ

করিয়াছেন এবং নিজ-গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—১৮শ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)।

বংশ-পরিচয়

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে 'নীচ-বংশজাত', 'নীচ-জাতি', 'নীচ-সঙ্গী' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন*। স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ জগদ্গুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেরূপ 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু যদি কৃপা করিয়া স্বলেখনীর মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-গুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিতেন, তবে জীব এই অপরাধ-পঙ্কেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের স্বকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উপসংহারে স্বীয় বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বপরিচয়

উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃত স্রাবিণী
জিহ্বাকল্পলতাত্রয় মধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ।
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।

---

* সনাতন কহে,—"নীচ-বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম।।
(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২৮)
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজি।।
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১৮৯)

সর্ব্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্ব্বেদৈকবিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্।।
মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বরহরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া।।
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বর-হরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্য্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ।।
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্‌গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্।।
যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ।।
বিহায় গুণশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী।।
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল-মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী।।

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্ব্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্।।
আদিঃ শ্রীল-সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্ব্বেদ্য যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে।।
যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমু বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্ব্বত্র সম্বর্দ্ধিতা।।
যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভাভরমতীত্যেবানয়োর্ভ্রাজতো-
স্তুল্যস্তত্ত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ।।
গোপালবালকব্যাজাদ্‌য়য়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুতগোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া।।
তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্চন্দোঽষ্টাদশকং তথা।।
স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।।
বিদগ্ধললিতাগ্রাখ্যমাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা-দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।।

মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।।
তথাগ্রজকৃতেষ্বগ্র্যং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী।।
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া।।
অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কালেখি সহসা
তথা যদ্বাচ্ছেদি দ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।
অহো কিম্বা যদ্যন্মনসি মম বিস্ফোরিতমভূ-
দমীভিস্তন্মাত্রং যদি বলমলং শঙ্কিতকুলৈঃ।।

কর্ণাটদেশাধিপতি শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার প্রচুরোৎকৃষ্ট-শব্দ-বিন্যাসময়ী, অমৃতনিঃস্যন্দিনী, বেদত্রয়রূপ-কল্পলতার মধুকরী-তুল্যা জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করিত। তিনি রাজমণ্ডলীর পূজাপাত্র ও ভরদ্বাজ-গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কশ্যপোপম সেই নৃপতির এক পরম শ্রীসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশোরাশি চন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করিত। তাঁহার প্রভাব ছিল ইন্দ্রের ন্যায়। সমস্ত রাজবৃন্দ তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল অর্থাৎ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে ‘শ্রীঅনিরুদ্ধদেব’-নামে বিখ্যাত ছিলেন। সেই প্রথিতযশা নৃপতির মহিষীদ্বয় হইতে ‘রূপেশ্বর’ ও ‘হরিহর’ নামে দুইটি গুণনিধি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ নিজ স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে প্রথমটি বহুবিধ শাস্ত্র এবং অপরটি শস্ত্রবিদ্যায় প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিদিনে পিতা (অনিরুদ্ধ-দেব) নিজরাজ্য বিভাগ করিয়া সেই রূপেশ্বর ও হরিহরকে যথাযোগ্যরূপে প্রদান করিলেন। পিতার স্বধাম-প্রাপ্তির পর কনিষ্ঠ হরিহর পূজ্য ব্যক্তিগণের ভূষণস্বরূপ স্বীয় অগ্রজ রূপেশ্বরকে স্বরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীরূপেশ্বরদেব এই প্রকারে শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভার্য্যার সহিত অষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া পৌরস্ত্যদেশে গমন করিলেন। সেইখানে শ্রীরূপেশ্বরদেব সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে সুখে বাস করিয়া ধন্য হইলেন এবং ‘শ্রীপদ্মনাভ’-নামে এক গুণসাগর পুত্র উৎপাদন করিলেন। যাঁহার জিহ্বায় অঙ্গসহিত যজুর্ব্বেদ ও সকল উপনিষদের

বিস্তৃতিশাস্ত্র স্পষ্টরূপে নৃত্যবিলাস করিত, সেই জগন্নাথ-প্রেমে বিগলিত ও উৎফুল্লহৃদয় রাজা শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র শ্রীপদ্মনাভদেবের কথা কাহার না কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে? সেই গুণশেখর যশস্বী শ্রীপদ্মনাভদেব শিখরদেশবাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া শোভাময়ী জাহ্নবীতটে বাস করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজা দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ক্রমে নবহট্টে বাস করিয়াছিলেন। সেই নবহট্টে থাকিয়া তিনি যাগ-যজ্ঞোৎসবাদি দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীবিগ্রহ পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচজন পুত্র জন্মিয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তৎপরে জগন্নাথ ছিলেন দ্বিতীয়। নারায়ণ ছিলেন ধীরস্বভাবের। তদনন্তর উত্তমগুণযুক্ত শ্রীযুক্ত মুরারি জন্মিলেন। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ যশস্বী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবহট্টে শ্রীমুকুন্দদেবের 'শ্রীমান্ কুমারদেব'-নামক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সদ্বংশজাত সেই কুমারদেব বিদ্রোহাচরণবশতঃ বঙ্গদেশস্থ আবাস-স্থানে গমন করিলেন। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনটি পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহলোকে ও পরলোকে বিশেষরূপে সর্ব্বজন-পূজিত করিয়াছিলেন। 'শ্রীল সনাতন' ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অনুজের নাম 'শ্রীরূপ'। আবার তাঁহার (শ্রীরূপের) অনুজের নাম 'শ্রীমদ্ বল্লভ'। ইঁহারা তিনজন বৈরাগ্য-হেতু রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে অতিশয় কৃপা লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-নাম্নী ভক্তিলক্ষ্মীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তি-সাম্রাজ্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। যিনি ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, তিনি ছিলেন আমার পিতা; কিন্তু তিনি গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ করেন। তৎপরে সেই অগ্রজদ্বয় দ্রুত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহারা মথুরামণ্ডলের গুপ্ততীর্থসমূহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই শ্রীকৃষ্ণভক্তিও সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'শ্রীল রঘুনাথদাস'-নামক মহাজন তাঁহাদের মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-রাশিতে সঞ্চরণ করতঃ ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপমার প্রভারাশিকে ম্লান করিয়া শোভাযুক্ত যে শ্রীরূপ-সনাতন, ত্রিভুবনে সজ্জন-শ্রেষ্ঠগণ সবিস্ময়ে শ্রীরঘুনাথকে তাঁহাদের তুল্য তত্ত্ব বলিয়া পূজা করিতেন। সাক্ষাৎ শ্রীযুক্ত গোপাল গোপ-বালকচ্ছলে ক্ষীরপ্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে অনুজ অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামি কর্ত্তৃক

লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ; যথা,—‘শ্রীহংসদূতকাব্য’, ‘শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ’, ‘ছন্দোঽষ্টাদশক’। তদ্ব্যতীত তাঁহার ‘স্তবমালা’, ‘গোবিন্দ-বিরুদাবলী’, ‘প্রেমেন্দুসাগরা’দি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। ঐ সকল ব্যতীত ‘ললিতমাধব’ ও ‘বিদগ্ধমাধব’-নামে নাটকদ্বয়, ‘দানকেলি’-নাটিকা, ‘রসামৃত-যুগল’, ‘মথুরামহিমা’, ‘নাটকচন্দ্রিকা’ ও ‘সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃত’ প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থ। তদ্রূপ অগ্রজ শ্রীসনাতন-লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘শ্রীভাগবতামৃত’, তৎপরে ‘দিগ্‌-প্রদর্শিনী’-টীকার সহিত হরিভক্তিবিলাস, তৎপরে লীলাস্তব, অনন্তর এই দশমটিপ্পনী ‘বৈষ্ণবতোষণী’ তদাজ্ঞায় (আমি) ক্ষুদ্রজীব হইলেও মৎকর্ত্তৃক সংক্ষিপ্তীকৃত হইল। আমি সত্বরতার সহিত এই গ্রন্থে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছি এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা যেখানে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছি, শ্রীল সনাতনপ্রভু তদুভয়ই বিশেষভাবে মার্জ্জনা করিবেন। অহো! তিনি আমার চিত্তে যেরূপ প্রেরণা দান করিয়াছেন, যদি আমি তাহাই মাত্র লিখিয়া থাকি এবং তবে ভীত-জনগণকে ভয় করিবার আমার প্রয়োজন নাই।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর প্রদত্ত উপরি-উক্ত আত্ম-বংশপরিচয়-বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম ‘শ্রীসর্ব্বজ্ঞ’। কর্ণাট-দেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন বলিয়া তিনি ‘জগদ্‌গুরু’ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র ‘শ্রীঅনিরুদ্ধ’। ইনিও যজুর্ব্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম ‘শ্রীরূপেশ্বর’ ও ‘শ্রীহরিহর’। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমজন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয়জন শস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটি ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যাসহ পৌরস্ত্য-দেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম ‘শ্রীপদ্মনাভ’। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের আঠার জন কন্যা ও পাঁচ জন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ‘শ্রীমুকুন্দ’। ইঁহার পুত্র ‘শ্রীকুমারদেব’। নৈহাটীতে ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাক্‌লার

মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে 'শ্রীসনাতন', 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীবল্লভ'—এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে, কুমারদেবের স্বধাম-প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড়-রাজধানীর নিকটে সাকুর্মা-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পূর্ব্বোক্ত দুইজন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক 'সাকর মল্লিক', 'দবির খাস' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।
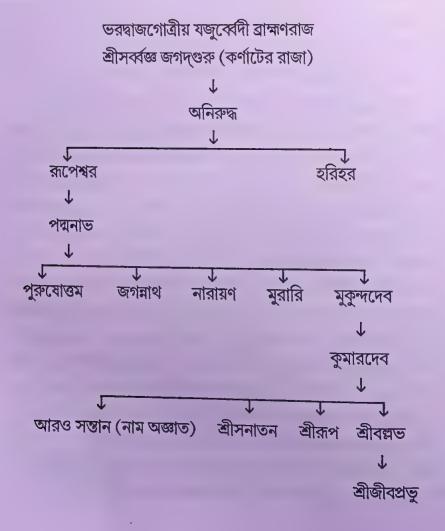
আবির্ভাব-কাল

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় নাই। তবে বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের কয়েকটী তারিখ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ-নির্ণয়' শীর্ষক বিবরণে লিখিয়াছেন,—"আমরা কোন বৈষ্ণবের দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত অব্দগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি অব্দ-সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়।" শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবের অব্দ উদ্ধার করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ-মন্তব্যে লিখিয়াছেন যে,—"এই মতে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।" 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় প্রকাশিত অব্দগুলি এইরূপ,—

জন্ম	১৪৫৫ শকাব্দা।
প্রকটস্থিতি	৮৫ বৎসর।
শ্রীবৃন্দাবনবাস	৬৫ বৎসর।
গৃহে স্থিতি	২০ বৎসর।
অন্তর্দ্ধান	১৫৪০ শকাব্দা।

আবির্ভাব (?) পৌষী শুক্লা তৃতীয়া।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ-মন্দিরের বাহির ঘেরার প্রাচীন পণ্ডিতবর শ্রীবনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি হইতে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর নিম্নলিখিত অব্দসমূহ পাওয়া গিয়াছে,—

"শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর প্রাকট্য—১৫৮০ সং, শ্রীবৃন্দাবনে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থান ও অধ্যয়নাদি—২৪ বর্ষ; ইষ্টলাভ (অপ্রকট)—১৬৬৫ সং; মোট প্রাকট্যকাল—৮৫ বর্ষ।"

সম্বৎ হইতে ১৩৫ বৎসর বাদ দিলে শকাব্দা পাওয়া যায়। অতএব উপরি-উক্ত বিবরণ-অনুসারে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবকাল ১৪৪৫ শকাব্দা ও অপ্রকটকাল ১৫৩০ শকাব্দা।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর স্বধামগত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামী মহোদয়ের সংগৃহীত ও প্রাচীন পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত বিবরণ এইরূপ,—

"শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর প্রাকট্য—১৪৫৫ শঃ; গৃহে অবস্থানাধ্যয়নাদি—২০ বর্ষ; শ্রীব্রজে বাস—৬৫ বর্ষ; অপ্রকট—১৫৪০ শঃ, পৌষী শুক্লা তৃতীয়া; প্রপঞ্চে স্থিতি—৮৫ বর্ষ।"

শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রাপ্ত বিবরণ একই প্রকার দৃষ্ট হয়। কেবল হয় ত' 'পৌষী শুক্লা তৃতীয়া' এই স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ বা লিপিকর-প্রমাদবশতঃ 'তিরোভাব'-স্থানে 'আবির্ভাব' হইয়াছে। পৌষী শুক্লা তৃতীয় তিরোভাব-তিথি বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারের পুঁথির বিবরণে প্রকাশিত শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুর আবির্ভাব-তারিখ গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু ১০ বৎসর বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন, জানা যায়। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' উল্লেখিত আছে,—যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন।

শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ৬৩৮)

শ্রীঅনুপম-চরিত

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর শ্রীমুখে আমরা শ্রীঅনুপমের চরিত এইরূপ শুনিতে পাই,—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ় চিত্তে।।
রাত্রিদিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান।।

আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর।।
আমা-সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি দুইজনে।।

"শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম, বিলাস—প্রচুর।।
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।।"

এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন।।
"তোমা-দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু?
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিমু।।"

এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ!
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দুঁহায় কৈল নিবেদন।।

'রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা।।
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ।।

রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায়।।'
তবে আমি-দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
'সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি' প্রশংসিলুঁ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।৩০-৪৩)

শ্রীঅনুপমের পূর্ব্বনাম—'শ্রীবল্লভ' এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—'শ্রীঅনুপম'। গৌড়ের বাদশাহের কর্ম্ম করায় ইঁহারও 'মল্লিক'-উপাধি হইয়াছিল।

অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ'।
রূপ-গোসাঞির ছোট ভাই পরমবৈষ্ণব।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।৩৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সময় রামকেলিতে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীঅনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম দর্শন লাভ করেন। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে শ্রীঅনুপম শ্রীরূপের সঙ্গী হন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই প্রয়াগে আগমন করিয়া তথায় কোন দাক্ষিণাত্য-বিপ্রের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাঁহার আদেশে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়েই শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সেই সময় সুবুদ্ধি রায় মথুরা-নগরীতে শুষ্ককাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা নিজের ও অন্যান্য বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ-বন পরিভ্রমণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম একমাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রভুর অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে ও তৎপর কাশীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রবণ এবং দশ দিবস পরে গৌড়দেশে যাত্রা করেন। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে উভয়েই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গাতীরে ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীঅনুপমের শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ হয়।

শ্রীজীবের বৈরাগ্য

বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্ত্য গুণগরিমা-দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহ-বিধুর হইয়া উঠে। তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায়—দিবারাত্র প্রেমাশ্রু-সিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনামকীর্ত্তনে

শ্রীজীবপ্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। রাত্রিশেষে স্বপ্নযোগে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজীবপ্রভুকে দর্শন দান করেন। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীশ্রীজীবকে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীশ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্ব্বস্ব হউক। শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমন করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন।

অধ্যয়ন-লীলা

ইহার পর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে,—নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যে সকল চিদ্‌বিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্ব্বভৌম নিজ শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদি-শাস্ত্র-অধ্যয়নকালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজবাস

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত্য স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিচার-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গুরুদ্বয় পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন।

শ্রীরূপ 'শ্রীহংসদূত'-আদি গ্রন্থ কৈলা।
সনাতন 'ভাগবতামৃতা'দি বর্ণিলা।।
'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' করিয়া সনাতন।
শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৭৯১-৭৯২)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—'শ্রীজীব'-নাম।।
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ।।
'ভাগবতসন্দর্ভ'-নাম কৈলা গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার।।
'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজপ্রেমলীলারস সার দেখাইলা।।
'ষট্‌সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা।।
জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।।
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপসনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন।।
আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে।।"
তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞাফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।২২৭-২৩৫)

শ্রীজীবের গ্রন্থ

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃত-পদ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপ্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতির্যদ্যতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা।।

তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী।।
রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ।।

টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ।।
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ।।
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ কর-পদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ।।

পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভা সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ।।
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ।।
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ম্।
হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্।।
ইত্যাদয়ঃ।।

‘শ্রীভক্তিরত্নাকরে’ প্রথম তরঙ্গেও তাঁহার পঁচিশটী গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।

(১) ‘হরিনামামৃত’-ব্যাকরণ দিব্য রীত।।
(২) ‘সূত্রমালিকা’, (৩) ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।
(৪) ‘কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা’-গ্রন্থ অতি চমৎকার।।
(৫) ‘গোপালবিরুদাবলী’, (৬) ‘রসামৃতশেষ’।
(৭) ‘শ্রীমাধবমহোৎসব’ সর্ব্বাংশে বিশেষ।।

(৮) ‘শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ’-গ্রন্থের প্রচার।
(৯) ‘ভাবার্থসূচক চম্পূ’ অতি চমৎকার।।
(১০) ‘গোপালতাপনী-টীকা’, (১১) (‘টীকা) ব্রহ্মসংহিতার’।
(১২) ‘রসামৃতটীকা’, (১৩) ‘শ্রীউজ্জ্বলটীকা’ আর।।
(১৪) ‘যোগসার-স্তবের টীকা’তে সুসঙ্গতি।
(১৫) ‘অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য’ তথি।।
(১৬) ‘পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন’।
(১৭) ‘শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন’ ভিন্ন।।
(১৮) ‘গোপালচম্পূ’—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে।।
(১৯-২৫) সপ্ত-সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি।
তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি।।

(শ্রীভঃ রঃ, ১ম তরঙ্গ ৮৩৩-৮৪১)

সার্ব্বভৌম সম্প্রদায়াচার্য্য

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর রচিত প্রত্যেক গ্রন্থে রচনার তারিখ পাওয়া যায় না, কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু ১৪৭৬ শকাব্দায় ‘বৈষ্ণবতোষণী’ রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ১৫০৪ শকাব্দায় ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামি-প্রভুগণের অপ্রকটের পর সোৎকল-গৌড়-মাথুরমণ্ডলের শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌম আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সকলের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন এবং সকলকে হরিভজন করাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণ-সহ শ্রীব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন এবং শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভ-ভট্টাত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে শ্রীগোপালদেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রকটকালেই ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’-গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি কিছুকাল

পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য', 'ঠাকুর মহাশয়' ও 'শ্রীশ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া স্বকৃত ও গোস্বামি-বর্গের রচিত যাবতীয় গ্রন্থাদি-সহ গৌড়দেশে নামপ্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীরামচন্দ্র সেন ও তদনুজ শ্রীগোবিন্দ সেনকে 'কবিরাজ'-উপাধি প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতেই শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবীদেবী কতিপয় ভক্তসহ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু গৌড়দেশাগত ভক্তগণের প্রসাদসেবা ও বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন।

বেদান্তাচার্য্যশিরোমণি

"বেদান্ত-দর্শন-বিদ্যায় শ্রীজীবের ন্যায় তৎকালে আর কেহ ছিলেন না। কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবল্লভ * নিজকৃত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বৈদান্তিক বিচার উত্থাপন করতঃ তাঁহার মতের অসৌন্দর্য্য প্রদর্শন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যও শ্রীজীবের পরামর্শ-মতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য-বিরচিত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েকটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রপঞ্চো ভগবৎকার্য্যস্তদ্রূপো মায়য়াঽভবৎ।
তচ্ছক্ত্যাঽবিদ্যয়া তস্য জীবসংসার উচ্যতে।।
সংসারস্য লয়ো মুক্তৌ প্রপঞ্চস্য ন কর্হিচিৎ।
কৃষ্ণস্যাত্মরতৌ ত্বস্য লয়ঃ সর্ব্বসুখাবহঃ।।

অন্যত্র চ—

তদিচ্ছামাত্রতস্তস্মাদ্ব্রহ্মভূতাংশচেতনাঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ নির্গতাঃ সর্ব্বে নিরাকারাস্তদিচ্ছয়া।।
বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নেস্তু সদংশা ন জড়া অপি।
আনন্দাংশ-স্বরূপেণ সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণঃ।।

---

* "শ্রীগৌরসুন্দরের সমসাময়িক আদি শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্য, তাঁহার তৃতীয় পুত্র গোকুলনাথেরই অপর নাম—'বল্লভ'; ইনিই পিতাদৃত শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক এক নব্য 'বল্লভী' মতবাদের সৃষ্টি করেন। ইঁহার চেষ্টার ফলেই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগাপালদেব বর্ত্তমান নাথদ্বারে স্থানান্তরিত হন।"

যাঁহারা তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব, তাঁহারা অনায়াসে এই শ্লোক কয়েকটীর অর্থ বিচার-পূর্ব্বক শ্রীজীবের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরামানুজের তুল্য পণ্ডিত ও বেদান্তজ্ঞ পুরুষ। শ্রীজীবের 'ষট্সন্দর্ভ'-গ্রন্থ্ জগতে একটি রত্নবিশেষ। ষট্সন্দর্ভ ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কোন বেদান্ত-বিচারই অজ্ঞাত থাকে না।" (—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২২০-২২১ পৃষ্ঠা)

ভ্রান্ত-ধারণা

স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর বিচারধারা ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিকৃত ও ভ্রান্ত-মত পোষণ করিয়া শুদ্ধভক্তিরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। একদা জড়প্রতিষ্ঠালোলুপ জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন-শিরোমণি শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া শ্রীশ্রীসনাতন-রূপের পাণ্ডিত্যাভাব জ্ঞাপন করিয়া তচ্ছিষ্য শ্রীজীব-প্রভুকেও জয়পত্রী লিখিয়া দিতে বলেন। তাহাতে শ্রীজীবপ্রভু ঐ দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া শ্রীগুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং শ্রীগুরুবর্গের পদ-নখশোভার মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া প্রকৃত শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই শুদ্ধভক্তির বিচারটী হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ ধারণা করিতে না পারিয়া শ্রীজীব- গোস্বামিপ্রভুকে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের মর্য্যাদা-হানিকারক বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কোন কোন আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিক শ্রীনিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ক্রোধলীলা দেখিয়া শ্রীব্যাসাবতারকেও রিপু-বশীভূত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে! শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধেও সেইরূপ ভ্রান্ত- ধারণার উদয় হইয়াছে। লালদাসের 'ভক্তমাল' প্রভৃতি পুস্তকেও এই জাতীয় চিন্তাস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত মৎসর-স্বভাব ব্যক্তি এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছে যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-রচনার সৌষ্ঠব-দর্শনে শ্রীজীবপ্রভুর মৎসরের উদয় হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক

এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল-পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই পুনরায় 'শ্রীচরিতামৃত' প্রকাশিত হইয়াছিল, নতুবা 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। এই অভিসন্ধিমূলক উক্তি যে সর্ব্বপ্রকারে অসত্য, তাহা 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের আর একটি প্রক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিবদমান বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হয়। 'প্রেমবিলাসে' লিখিত আছে যে, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত যে-সকল গোস্বামিগ্রন্থ শ্রীগৌড়দেশে প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে সেই সংবাদ যখন শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিল, তখন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শুনিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। (প্রেঃ বিঃ, ১৩শ বিলাস)। প্রেমবিলাসে ও শ্রীভক্তিরত্নাকরোদ্ধৃত শ্রীজীব গোস্বামি প্রভুর লিখিত তৃতীয় পত্র হইতে জানা যায় যে, এই সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর (শ্রীবৃন্দাবনদাসাদি) আত্মজগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। অবিবাহিত শ্রীনিবাস প্রভু যদি শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথমবার গ্রন্থ লইয়া যাজিগ্রাম পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যখন শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর পুত্র-কন্যাদি হইয়াছে, তখন কি করিয়া চতুর্থ পত্রের শেষে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীনিবাসকে জানান যে, ''ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ''—''এখানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ।।'' (প্রেমবিলাস) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিবাসাদির গোষ্ঠীকে নমস্কার জানাইতেছেন? যাহা হউক, এই সকল পরস্পর- বিবদমান বিবরণ উপরি-উক্ত কিংবদন্তীসমূহকে অভিসন্ধিমূলক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

'ভক্তকল্পদ্রুম'-নামক একটী হিন্দী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময় আকবর বাদশাহের অধীনস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ও রাজপুতনাবাসী সামন্ত-রাজগণের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে এক বিতর্ক উঠে। এই বিরোধ-মীমাংসার জন্য আকবর শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে সাদরে আহ্বান করেন। কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু জানান যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায়ও রাত্রি-যাপন করিবেন না। সামন্তরাজগণ ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আগ্রা হইতেই একদিনেহ শ্রীবৃন্দাবনে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু

শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, শ্রীগঙ্গা শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত ও শ্রীবিষ্ণুশক্তি বটে, কিন্তু শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী; সুতরাং তিনি গঙ্গা হইতে রস-তারতম্যে শ্রেষ্ঠ। বাদশাহ ও সামন্তরাজগণ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে উপঢৌকন গ্রহণ করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। পরে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন যে, যদি তাঁহাদের একান্তই কিছু প্রদান করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বারাণসী হইতে কিছু শাস্ত্র ও পুরাণাদি পুঁথি এবং আগ্রা হইতে কিছু গ্রন্থ লিখিবার কাগজ যেন পাঠাইয়া দেন। আকবর বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ সকলেই সানন্দে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী যে, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুই প্রথমে আগ্রা হইতে তুলট কাগজ আনাইয়া পুঁথি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতিতেই গ্রন্থ লিখিত হইত।

স্বকীয় ও পরকীয়বাদ

কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ প্রাকৃত সহজিয়ার মত এই যে, শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর মতানুযায়ী শ্রীব্রজগোপীগণের পরকীয়-রস স্বীকার না করিয়া স্বকীয়-রসের অনুমোদন করায় তিনি প্রকৃত রূপানুগ নহেন।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্য শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আচরণ ও উপদেশই ঐরূপ যুক্তির অমূলকত্ব প্রমাণ করিতেছে। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ কন্যা পূজনীয়া শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

এই সব নির্দ্ধার করি' শ্রীদাস গোসাঞি।
নিয়ম করি' কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই।।
সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ।
দিবানিশি কৃষ্ণ-কথা সদা অবিরত।।
হেনই সময়ে গ্রন্থ 'গোপালচম্পূ' নাম।
সবে মিলি' আস্বাদয়ে সদা অবিরাম।।

আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ-উল্লাস।
অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ।।
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া।
ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া।।
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া।
বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া।।
গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া।
আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া।।

(কর্ণানন্দ, চতুর্থ নির্যাস)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির 'লোচন-রোচনী'-টীকার অভিপ্রায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'আনন্দচন্দ্রিকা'-টীকায় যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের টীকাতে।
করিল ব্যাখ্যান বহু দুষ্টের নিমিত্তে।।
শ্রীজীবের বাক্য দুরাশয় না বুঝয়।
তত্ত্ববাক্য আনি' সব লীলাতে স্থাপয়।।
শ্রীরূপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী।
তাঁহার কৃপায় স্ফূর্ত্তি হয় যে আপনি।।
হেন শ্রীজীবের বাক্য বোঝে কোন্ জন।
শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব মতে ভিন্ন নন।।
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল।
শ্রীরাধিকাগণ-সহ বহু কৃপা কৈল।।

(শ্রীনরোত্তমবিলাস, গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ৮৮-৯২)

কথিত হয় যে, জয়পুরের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মা দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ পাৎসাহার পরোয়ানা সহ সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরালির দরবারে স্বকীয়া-পরকীয়ার বিচার-প্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য

প্রভুর বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ছয়মাসকাল যাবৎ বিচার করিয়া পরকীয়া-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন এবং কৃষ্ণদেবকে শিষ্য করেন। ১১২৮ সালের বৈশাখ মাসে ইহার মীমাংসা হয়। ঐ বিচারের অজয়পত্র ও ইস্তাফাপত্রের নিদর্শন অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে।

শ্রীরূপশাসনানুগ শ্রীজীবপ্রভু

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহা বহু সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌত-বিচারের দ্বারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীব্রহ্মসংহিতার 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"শ্রীব্রহ্মসংহিতার 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্যঃ' শ্লোকের (৫।৩৭) টীকায় ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকায় এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্য্য-চরণ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা—যোগমায়াকৃতা; মায়িক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপতত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা,—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা কেবল মায়িক প্রত্যয়মাত্র। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। **শ্রীজীব গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য; সুতরাং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান**; অধিকন্তু তিনি—আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোলকল্পিত অর্থ রচনা করতঃ পক্ষ-বিপক্ষভাবে সতর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মতে, অপ্রকট-লীলা ও প্রকটলীলা—পরস্পর অভেদ; কেবল একটি প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি—প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এই মাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহু ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্ল্লভ; আর যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায়

চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায় সেই গোলোক-লীলা দেখিতে পান। সেই অধিকারিদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গোলোকলীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার স্বরূপসিদ্ধির তারতম্যক্রমে স্বরূপ-দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তিচক্ষুশূন্য; তন্মধ্যে কেহ কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ এবং কেহ কেহ বা ভগবদ্-বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরম নাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকটলীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকটলীলায় অপ্রকট-সম্বন্ধশূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারিভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি কর্ত্তৃক জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট-বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই, কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথগ্রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধতা, ফল্গুত্ব, তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড় ভাবিতচক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তুনিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্তদ্দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধতত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মলশূন্য; কেবল তদালোচক ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতি-সমূহ তত্তদধিকারক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টিকলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকারক্রমেই সেই সেই বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যতপ্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ, পরদারভাবটি—যোগমায়া-কৃত, সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক। সে শুদ্ধ-তত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—'পূর্ব্বোক্ত-ধীরোত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপ-পতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ।। তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পামিগ্রাহকো ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ।। লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-

নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি।। তত্র নায়িকাভেদ-বিচারঃ,—নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃতক্ষুদ্র-নায়িকাদ্যনুসারতঃ।।' এই সকল শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদারভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদি-লীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্' এই ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়া-কৃত বিভ্রম-বিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই 'পতি' এবং যিনি রাগদ্বারা পরকীয়া রমণীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তদীয় প্রেম-সর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই 'উপপতি'। গোলোকে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়-স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায় তাঁহাদের উপপত্নীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পরকীয়,—এই উভয়বিধ-ভাবের পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহ-বিধি-বন্ধনরূপ 'ধর্ম্ম' আছে; —কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্য-মণ্ডলরূপ ধর্ম্ম—যোগমায়া দ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা, তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পরকীয়-রসই সর্ব্বরসের নির্যাস; 'তাহা গোলোকে নাই',—এই কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয়। পরমোপাদেয়-গোলোকে পরমোপাদেয় রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নহে। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারত্বরূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোন প্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ', 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ', 'রেমে ব্রজসুন্দরিভির্যথার্ভকঃ প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ' ইত্যাদি শাস্ত্রবচনদ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজধর্ম্ম। কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মী-রূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়াবুদ্ধি প্রবলা থাকায় তথায় দাস্যরস পর্য্যন্তই রসের সুন্দরগতি। কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে শত-

সহস্র-গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয় বিস্মৃতিপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন। স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া'-অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকার-পূর্ব্বক বংশীপ্রিয় সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমান মাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্যরসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই; —ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই; জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি-অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান মাত্র; যথা—'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ' ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান মাত্র নিত্য হইলে, দোষমাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক জগতে প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এই মাত্র ভেদ। বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণজন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপীদিগের পৃথক্ সত্তাগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে, 'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।' এইজন্যই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বলরসে নায়ক দুই প্রকার; যথা—'পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ' ইতি। শ্রীজীব তাঁহার টীকায় 'পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাম্' এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকা-আদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য-উপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরোঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই পরোঢ়াত্ব। বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-সত্ত্বাযুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই স্থানে তাঁহাদের পরকীয়া অবলাত্ব সম্পাদন করে। সুতরাং 'রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মম্' ইত্যাদি সকল

লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিক-চক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয়। সুতরাং গোলোকে পরকীয় ও স্বকীয়-রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ; —ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয়।

পরকীয়সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়সার যে পরকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপ-শক্তিরমণ অর্থাৎ বিবাহ-বিধিশূন্য রমণ, তদুভয়ে একরস হইয়া উভয় বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান। গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত দ্রষ্টৃগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয়। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়া দ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তিকৃত পরমসত্য, সুতরাং পরদারত্বরূপ প্রতীতিও কি যথাবৎ সত্য? তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেইরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা, তাহা অমূলক নয়। কিন্তু জড়বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীজীবগোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়বাদ ও পরকীয়বাদ লইয়া বৃথা জড়বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। যিনি শ্রীজীব গোস্বামীর টীকাসমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকাসকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন, তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না। শুদ্ধবৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই; তাঁহাদের বাক্‌কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি—মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষগত দোষের আরোপ করেন। 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ' এই রাস-পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় 'বৈষ্ণব-তোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাদি চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদদিগের উপদিষ্ট একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই,—ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্বিশেষ দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' এই চারি প্রকার

বিশেষগত বিচিত্রতা দ্বারা সুন্দর এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের রস যোগমায়াবলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরসরূপে প্রতীত এবং এই গোকুলরসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে-সকলই আবার গোলোক-রসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র-ভেদ, তত্তজ্জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিতভাবে গোলোকে আছে, কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্র ব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্ত্তি; সেই সেই স্ফূর্ত্তির কোন্ কোন্ অংশ—মায়িক ও কোন্ কোন্ অংশ—শুদ্ধ, এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তিচক্ষু প্রেমাঞ্জনদ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ বিশদস্ফূর্ত্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্তাদ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষাবঘাতীর নিরর্থক পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফলচেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তিচেষ্টায় অনুভূতি লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়া-প্রতীতিশূন্য শুদ্ধপরকীয়-রস—অতি দুর্ল্লভ। তাহা গোকুললীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভক্তগণ সাধন করিবেন এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পরকীয়-চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত বৈধর্ম্ম্যরূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া সে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা দ্বারা মতান্তর-স্থাপনের যত্ন করিলে অপরাধ হয়।”

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পরিকর

শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর নামোল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু ‘শ্রীগৌরপার্ষদ’ ও ‘শ্রীব্রজলীলার পরিকর’ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন।

"সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ।।"

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ২০৩ শ্লোক)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীব্রজলীলায় 'শ্রীবিলাসমঞ্জরী' বলিয়া খ্যাত। (ঐ ১৯৫ শ্লোক)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীমুক্তাচরিত'-গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যস্যাজ্ঞাসুধয়া প্রবোধিতধিয়া মুক্তাচরিত্রৈর্ময়া
গুচ্ছঃ পুষ্পভরৈর্ব্যধায়ি য ইহ শ্রীরূপসংশিক্ষয়া।
জীবাখ্যস্য মদেকজীবিততনোস্তস্যৈব দৃক্ষট্পদী
ঘ্রাণৈস্তং পরিভূষিতং নু তনুতাং তৎকেলিসীধূৎকধীঃ।।

যে শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-প্রভুর আদেশামৃতে প্রবোধিত-বুদ্ধি আমি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-প্রভুর সম্যক্ শিক্ষানুসরণে মুক্তাচরিত্ররূপ কুসুমসমূহ দ্বারা এই গুচ্ছ অর্থাৎ মুক্তামালা প্রস্তুত করিলাম, আমার একমাত্র জীবন-স্বরূপ সেই শ্রীমজ্জীব-গোস্বামি-প্রভুর শ্রীশ্রীরাধামাধব-কেলি-সুধাপানে অতিশয় উৎসুকমতি নেত্রভৃঙ্গ মুহুর্মুহু এই মুক্তামালার ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া ইহাকে পরিভূষিত করুক।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'স্বনিয়ম-দশকে'র নবম শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে প্রয়াণ অভিলাষ করিয়াছেন,—

"মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ।।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যেরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুকে 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে'রও প্রত্যেক সর্গে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সঙ্গফলেই তাঁহার 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'-গ্রন্থ-প্রণয়নের সামর্থ্যলাভ হইয়াছে, ইহা জানাইয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় একাধিকবার তাঁহার প্রার্থনায় ও বিভিন্ন পদে গোস্বামি-গুরুবর্গের সহিত শ্রীজীবপ্রভুর বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীজীব-প্রভুর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিক্ষাশিষ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র টীকার প্রারম্ভে শ্রীল জীবপ্রভুর এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

যঃ সাংখ্য-পঙ্কেন কুতর্ক-পাংশুনা
বিবর্ত্ত-গর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্।
শুদ্ধং ব্যধাদ্ বাক্সুধয়া মহেশ্বরং
কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ।।

সাংখ্যজ্ঞানরূপ পঙ্কের দ্বারা, কুতর্করূপ ধূলিদ্বারা, বিবর্ত্তরূপ গর্ত্তাভ্যন্তরে লুপ্তদীপ্তি মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি বাণীপীযূষ-বর্ষণদ্বারা শুদ্ধ করেন অর্থাৎ তন্মাহাত্ম্য প্রচুর ভাবে বিস্তার করেন, সেই শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুই আমাদের একমাত্র গতি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে বর্ত্তমান, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শ্রীশ্রীরূপানুগবর পাত্ররাজ ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করিয়াছেন। 'শ্রীজৈবধর্ম্মে'ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"তত্ত্ব-প্রচারের ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল; তিনি সে কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।" (শ্রীজৈবধর্ম্ম, ৩৯ অধ্যায়০। শ্রীসজ্জনতোষণী, ১ম বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১২৮৮) ও ২য় বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১২৯২) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত "শ্রীজীবগোস্বামী" ও "শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্তলিখিত ইংরাজী ভাষায় রচিত শ্রীজীব-প্রভুর একটি চরিত আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহা এখনও মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীসজ্জনতোষণী, ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'ষট্সন্দর্ভ'-নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাদামোদর

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বিবরণ (৪র্থ তরঙ্গ) অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকট করিয়া তাহা শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুকে প্রদান করেন। সেই শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শৃঙ্গার-বটের নিকটে শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরে এখন সেই

শ্রীবিগ্রহের প্রকাশমূর্ত্তি রহিয়াছেন। শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরের একটি কক্ষে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি বিরাজিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিবাদে সেবালয়ের সেই গ্রন্থাগারটী তালাবন্ধ ছিল। সেই সকল গ্রন্থ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না।

স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'সর্ব্বসম্বাদিনী'র প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরকে "স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন এবং কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সুমেধাগণের আরাধ্য, তাহা বিশেষভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের চিৎসমন্বয় করিয়া যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু স্পষ্টভাবে তাঁহার গ্রন্থরাজিসমূহে ও বিশেষতঃ 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৎসর ও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রবর্ত্তক এবং ঐ সিদ্ধান্তকে আধুনিক মত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহেন। বস্তুতঃ ঐ সকল ব্যক্তির স্থূলদর্শিত্বই এইস্থানে অপরাধী। তাঁহারা শ্রীব্রহ্মসূত্রের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ একমাত্র শ্রৌতশব্দপ্রমাণলভ্য স্বতঃসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য অচিন্ত্যতত্ত্বে তর্কের যোজনা করিতে উদ্যত হয় বলিয়া 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-শব্দের 'অচিন্ত্য'-কথাটি ধারণা করিতে পারে না। গত ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে কোন একটি অতি আধুনিক অবতারবাদের আখড়া হইতে প্রকাশিত এক মাসিকপত্রে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তকে আধুনিক মতবাদ এবং কেবলা-দ্বৈতবাদীর অনির্ব্বচনীয় বাদেরই রূপান্তর ও অদ্বৈতবাদেরই নামান্তর বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে বলিতেছেন,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।"

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

ইত্যত্র 'বিষ্ণুশক্তিঃ' বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ পরমপদ-পরব্রহ্ম-পরতত্ত্বাদ্যাখ্যা প্রোক্তা। "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তৎসত্তামাত্রম্" (শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ, ৬ অংশ—৭ অঃ, ৫৩ শ্লোক)। ইত্যত্র,—"প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্তমি"তি। অতঃ স্বরূপস্য কার্য্যোন্মুখত্বেনৈব শক্তিত্বং ন স্বত ইত্যায়াতম্। ততশ্চ বিশেষ্যরূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্‌বিশেষণরূপং কার্য্যোন্মুখত্বং তু শক্তিঃ,—জগচ্চ কার্য্যক্ষমত্বমূলমিতি। তৎক্ষমত্বাদিরূপা নিত্যৈব সা শক্তি-রিত্যবগম্যতে। তথাপি বস্তুতোঽত্যন্তব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ পৃথক্ত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। "বস্ত্বেবাস্তু,—কা তত্র শক্তির্নাম" ইতি মতন্তু ন বেদান্তিনাং মতম্; —সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তি-স্তম্ভাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ। তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুম-শক্যত্বাদ্ভেদঃ,—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।

বিষ্ণুশক্তিই পরা শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি অপরা; ভগবানের কর্ম্মশক্তির নাম অবিদ্যা, ইহাই তৃতীয়া শক্তি। এস্থলে 'বিষ্ণুশক্তি'-পদের অর্থ এই যে, বিষ্ণুর স্বরূপভূতা (পরা) চিৎস্বরূপা শক্তি। এস্থলে পরমপদ পরব্রহ্ম-পরতত্ত্ব-বাচক। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ৬।৭।৫৩ শ্লোকাংশের অর্থ এই যে, "যাহা ভেদরহিত, কেবল-মাত্র তাঁহার সত্তাস্বরূপ।" এস্থলে প্রাগুক্ত স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলেই উহা 'শক্তি'-শব্দে অভিহিত হয়। এই নিমিত্তবৎ স্বরূপ কার্য্যোন্মুখ হইলে উহার শক্তি স্বীকার্য্য, কিন্তু স্বতঃস্বরূপের শক্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। এই নিমিত্ত বিশেষরূপ স্বয়ং তদ্বস্তু শক্তিমৎ, তাঁহার বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্বই শক্তি। এই কার্য্যক্ষমত্বই জগতের মূল, সেই নিত্যা সামর্থ্যাদি-রূপিণীই শক্তি। স্বরূপ শক্তি হইতে অত্যন্ত ব্যতিরেক বিচারদ্বারা উহার নিরূপণ না হওয়ায় বস্তু হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই উহাকে 'স্বরূপশক্তি' বলা হয়। তাহা হইলে তুমি বলিতে পার, তবে উহাকে বস্তুই বল না কেন, আবার শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন কি? তুমি এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু উহা বেদান্তি-অভিপ্রেত নহে। (নৈয়ায়িকেরা পৃথক্ শক্তি স্বীকার করেন না)। বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদি দ্বারা শক্তি-স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়; সুতরাং শক্তি স্বীকার না করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এইজন্য স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও

চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বহু বিচার করিয়াছেন। নিম্নে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"কেচিদ্বদন্তি—অতএকস্যৈব বস্তুনোঽবস্থাভেদেন কারণত্বং কার্য্যত্বঞ্চেত্য-বস্থাভ্যাং ভেদাদ্বস্তুনা ত্বভেদাত্তয়োর্ভেদাভেদৌ। এবং সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং ভেদাভেদাবেব, সর্ব্বত্র হি কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভেদঃ। কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভেদঃ প্রতীয়তে। যথা মৃদয়ং ঘটঃ। যণ্ডো গৌরিতি। (অত্র যুক্তিবিশেষাশ্চ ভাস্করমতাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ।) অন্যে বদন্তি—ন তাবৎ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ, —যত আকারবিশেষরূপায়া এবাবস্থায়াঃ কার্য্যত্বং ন মৃদঃ। তস্যাঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। অতএব নাকারবিশেষবিশিষ্ট্যয়া অপি তস্যাঃ কার্য্যত্বম্। ঘটত্বন্তু বিশিষ্টায়া এব। তৎকার্য্যকরত্ব-তৎপ্রতীতি-তচ্ছব্দপ্রয়োগাণাং তস্যামেব দর্শনাৎ। অতো ঘটস্য কার্য্যত্বং, কার্য্যস্য ঘটত্বং প্রাচুর্য্যাদেব ব্যপদিশ্যতে। তদেবং তদবস্থায়া এব কার্য্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরস্যাস্তদবস্থায়া এব ভবিষ্যতি। ততশ্চ কার্য্যকারণয়োস্ত-দ্রূপাস্থাদ্বয়াশ্রয়স্য বস্তুনশ্চ ভিন্নত্বমেব। তয়োরনন্যত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্ট-বস্ত্বপেক্ষয়ৈব—ন তু প্রত্যেকবস্ত্বপেক্ষয়া। তথা পরস্পরং কার্য্যাণামপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ। তথা ব্যক্তিগতভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকস্য দ্ব্যাত্মকতা। তদাকারদ্বয়াশ্রয়ং বস্ত্বন্তরমস্তীতি ত্রিতয়াভ্যুপগমেঽপি স এব দোষঃ,—অনবস্থাপাতশ্চ,—তস্মাদ্ভেদ এব। তত্ত্বমস্যাদাবভেদনির্দ্দেশস্তু ব্যাখ্যাত এব। অত্র ভেদসিদ্ধান্তে যুক্তিবাহুল্যঞ্চ ন্যায়দর্শনাদৌ দ্রষ্টব্যম্। অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব প্রবর্ত্ততাম। অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (শ্রীব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বা-দ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র বাদর-পৌরাণিক-শৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। **স্বমতে ত্বচিন্ত্য-ভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।**"

কেহ কেহ বলেন, একই বস্তুর অবস্থাভেদে কার্য্যত্ব ও কারণত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং অবস্থাভেদে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইলে সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য্য। সর্ব্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যাত্মকতা দ্বারা অভেদ এবং কার্য্যাত্মকতা ও প্রকাশাত্মকতা দ্বারা বস্তুর ভেদ প্রতীয়মান হয়। যেরূপ মৃত্তিকা ও ঘট এবং বৃষ ও গাভী। (এ-বিষয়ে বিশেষ যুক্তি ভাস্কর মতে দ্রষ্টব্য।) অপর কেহ কেহ বলেন, কার্য্যকারণের ভেদাভেদ নাই; আকারবিশেষরূপ অবস্থারই কার্য্যত্ব, কিন্তু মৃত্তিকার নহে। কারণ, মৃত্তিকা পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু। আকারবিশেষবিশিষ্টা হইলেও মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, অতএব ঘটই কার্য্য, মৃত্তিকা নহে। আকারবিশিষ্ট অবস্থাতেই ঘটকার্য্যকর ঘটপ্রতীতিত্ব এবং 'ঘট'-শব্দপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়—মৃত্তিকায় তাহা হয় না। ঘটত্ব-ব্যাপারটি কার্য্যের, কারণের নহে; কার্য্যত্বাবস্থাতেই কার্য্যত্ব পরিলক্ষিত হয়। কারণত্বাবস্থাতেই কারণত্ব হয়। সুতরাং কার্য্য ও কারণ এবং তদাশ্রয় বস্তু অবশ্যই ভিন্ন, এক নহে। কার্য্যকারণের যে অনন্যত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় বিশিষ্ট-বস্তুগত, কিন্তু সকলপ্রকার বস্তুগত নয়। পরস্পর কার্য্যসমূহেও ভিন্নাভিন্নত্ব প্রতীত হয় না; কেননা, প্রত্যেকটীতেই বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অলৌকিক। কেননা, এক বস্তুর দ্ব্য'ত্মকতা অসম্ভব। যদি বল, দুই আকার আশ্রয় করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করি.লেই ত' দ্ব্যাত্মকতা-দোষ খণ্ডিত হইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কেননা, আবার একটি তৃতীয় বস্তুর অভ্যুপগম স্বীকার করাও দোষাবহ। কেননা, তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অভেদনির্দ্দেশ যে অযৌক্তিক, তাহা ত' বাখ্যাতই আছে। ন্যায়দর্শনাদিতে ভেদসিদ্ধান্তের বহুল যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। যে-সকল যুক্তি ন্যায়দর্শনে দ্রষ্টব্য। অতএব বিশিষ্ট বস্তু-অঙ্গীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ- পদার্থের অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ অভেদবাদ স্বীকার হয়।

অপর কেহ কেহ বলেন,—তর্কের অপ্রতিষ্ঠাহেতু ভেদ ও অভেদে নিখিল-দোষদর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্য ভেদ সাধন করা যেমন দুষ্কর, তেমনি অভেদ সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে যাইয়া ইহারা ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতা-উপলব্ধিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ; মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক মাত্র। গৌতম, কণাদ,

জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্য-মতে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যমতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয়মতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই নির্ণীত হইয়াছে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সনাতনত্ব

অতি আধুনিক অসাম্প্রদায়িক-ব্রুব এক স্বেচ্ছাচারী অসৎ সম্প্রদায় নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্বকেও প্রচ্ছন্ন পৈশুন্য-রোগাক্রান্ত হইয়া "আধুনিক" বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ অস্মদীয় পূর্ব্ব-আচার্য্য বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীল আনন্দতীর্থপাদ তাঁহার ভাষ্যে শ্রীব্যাসদেবের রচিত সনাতনশাস্ত্রসিন্ধু হইতে ব্রহ্মতর্কের যে-সকল প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত অনাদিসিদ্ধ শ্রৌতসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। নিম্নে শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভাষ্যোদ্ধৃত সেই সকল বাক্য উদ্ধৃত হইল,—

অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা।।
স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে।
জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি।।
চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি।
হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তু ত্বভেদতঃ।।
পৃথগ্‌গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্।।
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ।।
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু।
সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে।।
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ।।
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারমং বিনা। ইতি

(ব্রহ্মতর্কে)

জনার্দ্দনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরূপাংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য অভেদ বর্ত্তমান। জীবস্বরূপসমূহ এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (ঐ সকল বিষয়ে) ঐরূপ অভেদ রহিয়াছে। অতএব অভেদহেতু (অংশপ্রভৃতির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু), গুণাদির পৃথক্ অবস্থানের (গুণিপ্রভৃতি হইতে গুণপ্রভৃতির পৃথক্ অবস্থানের) অভাবহেতু এবং অংশিপ্রভৃতি ও অংশপ্রভৃতি—এই উভয়ের নিত্যত্ব-হেতু তাহারা (অংশিপ্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। আর বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিত্বনিবন্ধন এই সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যত্ব, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিত্বনিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতুই জীবসমূহেও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান; যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্বিষয়ে) ভেদ ও অভেদ—উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণ ব্যতীত কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

'অচিন্ত্য' ও 'অনির্ব্বচনীয়' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 'অনির্ব্বচনীয়'-শব্দটি নির্ব্বিশেষবাদমূলক। 'অনির্ব্বচনীয়' অর্থে যাহা বর্ণনা অতীত বা যাহা নির্ব্বিশেষ। কিন্তু অচিন্ত্যবস্তু নির্ব্বিশেষ নহে, তাহা চিৎ-প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। তাহা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ও চিৎসমাধিলব্ধ বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায়। বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের ভূমিকায় তাহার বর্ণন আছে, কিন্তু কুণ্ঠধর্ম্ম বা মায়া কবলিত মনের দ্বারা তাহা চিন্তা করা যায় না। এ জন্যই সাত্বত শাস্ত্র ভগবত্তত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিকে 'অবিচিন্ত্য' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ

এই সিদ্ধান্ত বেদাদি-শাস্ত্রে ও শ্রীব্যাসের বাক্যে অনাদিকাল হইতেই বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রীরূপ-সনাতনাদি অন্তরঙ্গজনের দ্বারা প্রচারিত করাইয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু তাহা বিশেষভাবে বৈদান্তিক বিচার ও শ্রৌত-যুক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রী-শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুইপ্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতমত প্রচার করেন। তাহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। শ্রীনারদ, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীধ্রুব, শ্রীমনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারিপ্রকার। (ক) শ্রীরামানুজ-মতে চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (খ) শ্রীমধ্ব মতে জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (গ) শ্রীনিম্বাদিত্য-মতে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (ঘ) শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্য দাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব।

বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই উপদিষ্ট, বিবর্ত্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদে 'ঈশ্বর বিকারী হন' বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্ত্তন করতঃ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'পরিণাম' ও 'বিবর্ত্ত' শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার ৫৯ সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,—

'সতত্ত্বতোহন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোহন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।।'

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্-বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম—পরিণাম। পরিণাম বিকারমাত্র। দৃষ্টান্ত যথা,—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্য বস্তু নাই, অথচ অন্য বস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত যথা—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই তাৎপর্য্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বরের একটী বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিণামবাদ অগ্রাহ্য। সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটী রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় এবং সেই ভয় হইতে নানাপ্রকার ফলোৎপত্তি হয়। জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে

যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই বিবর্ত্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ-স্থাপন হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, বিবর্ত্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জুসর্পের উদাহরণ লগ্ন হয় এবং তাহাই বিবর্ত্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব-স্বরূপ হইয়াছেন,—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। ব্যাসসূত্রে পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র-প্রভাব-অনুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি তাহা কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানা রত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃত তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে করুন। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ ও চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন। 'বিকারশূন্য'-শব্দ দ্বারা এইরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। 'কেবল নির্ব্বিশেষ' বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধ-স্বরূপমাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপ তিনটী কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।' (তৈত্তিরীয়, ৩।১)

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে,'— এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে,'—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ

ভগবান্ কখনই কেবল নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত আকার।

শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় 'শ্রীভগবৎসন্দর্ভ', ১৬শ সংখ্যায় ভগবত্তত্ত্ববিচারে বলিয়াছেন যে,—

'একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।'

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্য-মণ্ডলস্থ তেজ সূর্য্যমণ্ডল, তাহার বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ-বৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ নিত্য পরমতত্ত্বের একত্বপ্রতিপাদক। পরমতত্ত্বে নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীব-বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব; কেননা, জীব-বুদ্ধি সীমা-বিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তি-সিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত মতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানবযুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষ নয়। অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব। অচিন্ত্যভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। একথা যাঁহাদের মনে থাকে না, তাঁহাদের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা নাই।"

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর রচিত কতিপয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশব্দশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য' ইহা জীবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য পড়ুয়াগণের নিকট "আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান। সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম।।" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৪৭)—এই বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণাক্রমে শ্রীহরিনামাবলি-বলিত শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামিপাদ তাঁহার এই গ্রন্থ-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য মঙ্গলাচরণে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

> কৃষ্ণমুপাসিতুমস্য স্রজমিব নামাবলিং তনবৈ।
> ত্বরিতং বিতরেদেষা তৎসাহিত্যাদিজামোদম্।।
> আহতজল্পিতজটিতং দৃষ্ট্বা শব্দানুশাসনস্তোমম্।
> হরিনামাবলিবলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমাচিন্মঃ।।
> ব্যাকরণে মরুনীবৃতি জীবনলুব্ধাঃ সদাঘসংবিগ্নাঃ।
> হরিনামামৃতমেতৎ পিবন্তু শতধাবগাহন্তাম্।।

কৃষ্ণের উপাসনা-হেতু যেরূপ ভক্তগণ শ্রীমালিকা বিস্তার করেন অর্থাৎ মালিকার প্রত্যেক চিন্ময়তুলীখণ্ড পৃথগ্‌ভাবে বিন্যাস করিয়া তৎসহযোগে নাম-গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমিও তদ্রূপ ভগবন্নামসমূহ সূত্রসাহায্যে গ্রন্থন করিয়া

বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছি। এই নামাবলী সদ্যই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ বিতরণ করিবে অথবা শ্রীমদ্ভাগবতাদি অপ্রাকৃত সাহিত্য-আস্বাদন-সুখ প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্যাকরণগুলি তর্কযোগ্য, বৃথা বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং দুর্ব্বোধ্য মিশ্রজ্ঞান-প্রকাশক জানিয়া বৈষ্ণবদিগের জন্য শ্রীহরিনাম-সমূহে গ্রথিত এই ব্যাকরণ সংগ্রহ করিতেছি। তাদৃশ দুর্ব্বোধ্য ব্যাকরণরূপ মরুপ্রদেশে যাঁহারা প্রকৃত জীবনরূপ জল পাইবার লোভে সর্ব্বদা নানাবিধ ক্লেশে পতিত হইতেছেন, তাঁহারা এই শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ-রূপ সুধা পান করুন এবং শত শতবার অবগাহন করুন।

শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে মোট ৩১৮৬টি সূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,--(১) ১—৪৩ সূত্রে সংজ্ঞাপ্রকরণ; সন্ধিপ্রকরণ ঃ—(২) ৪৪—৯৫ সূত্রে সর্ব্বেশ্বরসন্ধি (স্বরসন্ধি); (৩) ৯৬—১৩০ সূত্রে বিষ্ণুজনসন্ধি (ব্যঞ্জন-সন্ধি); (৪) ১৩১—১৪৮ সূত্রে বিষ্ণুসর্গ-সন্ধি (বিসর্গসন্ধি); বিষ্ণুপদ-প্রকরণঃ—(৫) ১৪৯—২১০—সর্ব্বেশ্বরান্ত পুরুষোত্তমলিঙ্গ (স্বরান্ত পুংলিঙ্গ); (৬) ২১১—২২১—লক্ষ্মীলিঙ্গ (স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ); (৭) ২২২—২৩৯—ব্রহ্মলিঙ্গ (স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ); (৮) ২৪০—২৯৫ সূত্রে বিষ্ণুজনান্ত পুরুষোত্তমলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ); (৯) ২৯৬—২৯৮ সূত্রে লক্ষ্মীলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ); (১০) ২৯৯—৩০২ সূত্রে ব্রহ্মলিঙ্গ (ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ); (১১) ৩০৩—৩১১ সূত্রে বিশেষণ-লিঙ্গ; (১২) ৩১২—৩৬৪ সূত্রে কৃষ্ণনাম-প্রকরণ (সর্ব্বনাম; (১৩) ৩৬৫—৯৪৮ সূত্রে আখ্যাতপ্রকরণ; (১৪) ৯৪৯—১১৪৫ সূত্রে অচ্যুতাদি-অর্থ (লকারার্থ-নির্ভর); (১৫) ১১৪৬—১২২১ সূত্রে আত্মপদ-পরপদ-প্রক্রিয়া (আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ-বিধান); (১৬) ১২২২—১৬৮৬ সূত্রে কৃদন্ত-প্রকরণ; (১৭) ১৬৮৭—২০৫৯ সূত্রে সমাস-প্রকরণ; (১৮) ২০৬০—৩১৮৬ সূত্রে তদ্ধিত-প্রকরণ।

গ্রন্থোপসংহার ঃ—

কৃষ্ণত্রা কৃতমেতত্তস্মাদ্বিফলা ন চাত্র মাত্রাপি।
অপি তু মহাফলযুক্তা তল্লীলাকাব্যবজ্জয়তি।।
যদত্র ব্যক্তমুক্তং ন ভ্রান্তং বা তদশেষতঃ।
জ্ঞেয়ং শোধ্যঞ্চ বিজ্ঞেভ্যো বিজ্ঞশাস্ত্রাবলোকতঃ।।

"ইহা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, অতএব ইহার একটি মাত্রাও বিফল নহে; পরন্তু তাঁহার লীলা ঘটিত কাব্যের তুল্য মহাফলযুক্ত হইয়া জয়লাভ করিতেছেন। ইহাতে যাহা স্পষ্টরূপে কথিত হয় নাই অথবা ভ্রমযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞ-শাস্ত্রানুসারে সুপণ্ডিতগণের নিকট জানিয়া লইবেন এবং শোধন করিবেন।"

হানীয়ং পাণিনীয়ং রসবদরসবৎ কাকলাপঃ কলাপঃ
সারপ্রত্যাগি সারস্বতমপহতগীর্বিস্তরো বিস্তরোঽপি।
চান্দ্রং দুঃখেন সান্দ্রং সকলমবিকলং শাস্ত্রমন্যন্ন ধন্যং
গোবিন্দং বিন্দমানাং ভগবতি ভবতীং বাণি নো চেদ্‌ব্রবাণি।।

[অর্থাৎ হে ভগবতি বাণীদেবি! আপনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কণ্ঠলগ্না, সুতরাং আপনিই কেবল তদীয় অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনে সমর্থা। আপনার আশ্রয়ে যদি শ্রীগোবিন্দকে লাভ করিবার সামর্থ্য না জন্মে, তবে পাণিনি-প্রণীত রসপূর্ণ ব্যাকরণও পরিত্যাগ-যোগ্য, নীরস 'কলাপ' কাক-কোলাহল, 'সারস্বত' সার-শূন্য, 'বিস্তর', অতি-বিখ্যাত হইলেও ব্যাহতজ্ঞান; 'চান্দ্র' দুঃখে জড়ীভূত এবং সমস্ত পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রগুলিও প্রশংসার অযোগ্য।]

ভগবন্নামবলিতা ভগবদ্ভক্তি-তৎপরৈঃ।
বৃন্দাবনস্থ-জীবস্য কৃতিরেষা তু গৃহ্যতাম্।।
ছান্দসাপ্রচরদ্রূপরূঢ়শব্দান্ বিনা ময়া।
অত্রালেখি তদিচ্ছা চেদ্দৃশ্যোঽন্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ।।
হরিনামামৃতসংজ্ঞং যদর্থমেতৎ প্রকাশয়ামাসে।
উভয়ত্র চ মম মিত্রং স ভবতু গোপালদাসাখ্যঃ।।

ভগবদ্-ভক্তি-যাজনকারী ভক্তজনগণ শ্রীবৃন্দাবনস্থ জীবের (শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর) রচিত শ্রীভগবন্নাম-সম্বলিত এই গ্রন্থ গ্রহণ করুন। আমি (গ্রন্থকার) ছান্দস ও অপ্রচরদ্রূঢ় (অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের প্রায় ব্যবহার দেখা যায় না) শব্দ ব্যতীত অন্য (সাধারণ-বোধগম্য) শব্দ দ্বারা এই গ্রন্থ লিখিলাম। যদি কোন শিক্ষার্থীর সেইরূপ রূঢ়শব্দজ্ঞানের বাসনা থাকে, তিনি অন্য গ্রন্থ হইতে তাহা সংগ্রহ করিবেন। যাঁহার নিমিত্ত এই শ্রীহরিনামামৃতসংজ্ঞক ব্যাকরণ-গ্রন্থ আমার দ্বারা প্রকাশিত হইল, ব্যবহারে ও পরমার্থে অথবা প্রকটাপ্রকটাবস্থায় সেই শ্রীগোপালদাস আমার মিত্র হউন।

শ্রীগোপালবিরুদাবলী—শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-রচিত শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী ও সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণ গ্রন্থদ্বয়-অবলম্বনে রচিত শ্রীশ্রীগোপাল-দেবের স্তোত্র-বিষয়ক বিরুদকাব্য। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

গোপাল-সুখদা সেয়ং গোপাল-বিরুদাবলী।
অর্থায় শ্রয়তাং কল্পবীরুদাবলি-কল্পতাম্।।

শ্রীগোপালদেবেরও সুখদায়িকা এই শ্রীগোপাল-বিরুদাবলী পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সাধন করিবার জন্য কল্পলতারাজিবৎ উদিত হউন।

শ্রীগোপালবিরুদাবলীতে মোট ৩৮টী শ্লোক আছে। তন্মধ্যে ১ হইতে ৬ শ্লোক বর্দ্ধিত, ৭ হইতে ১০ শ্লোক বীরভদ্র, ১১ হইতে ১৪ শ্লোক সমগ্র, ১৫ হইতে ২০ শ্লোক অচ্যুত, ২১ হইতে ২৫ শ্লোক উৎপল, ২৬ হইতে ২৯ শ্লোকে তুরঙ্গ, ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোক গুণরতি ও ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক মাতঙ্গখেলিত-নামক বিরুদছন্দে রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোপালচম্পূর সর্ব্বশেষ পূরণেও (উত্তর-চম্পূ, ৩৭শ পূরণ, ১৪৮—১৫৪ শ্লোক) শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বিরুদছন্দে শ্রীশ্রীগোপালদেবের স্তব করিয়াছেন।

উপসংহার ঃ—

সুরারি-হতি-শংসনঃ প্রথিত-কংসবিধ্বংসনঃ
সুধীভবহতৌ বিধির্বিবিধ-কীর্ত্তিভাসাং নিধিঃ।
বিধি-প্রভৃতিবাঞ্ছিতং চরণলাঞ্ছিতং যস্য তদ্
ব্রজস্য নিজবংশজঃ স্ফুরতু নঃ স বংশ-প্রিয়-।।

যিনি অসুর-বিনাশের দ্বারা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, যিনি মহাসুর কংসকেও ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি সুধী ভক্তগণের সংসার নাশ করিয়া পরমমঙ্গল দান করিয়াছেন, যিনি বিবিধ কীর্ত্তিরূপ প্রভার আকর, যাঁহার শ্রীব্রজস্থ শ্রীচরণস্পৃষ্ট রজঃ শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বাঞ্ছা করেন, যিনি ব্রজে গোপ-বংশজ এবং পুরে যদুবংশজ বলিয়া অভিমান করেন, সেই বংশ-প্রিয় (বা বংশীপ্রিয়) শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে তাহাতে অবর্ণিত কাব্যালঙ্কার-গুণ-দোষ-রীতি প্রভৃতি বিষয় বিশ্বনাথ-কবিরাজ-কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থানুসারে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অনুপযোগী বলিয়া এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে, অন্যত্র উক্ত গ্রন্থের প্রক্রিয়াক্রমই যথাযথ অবলম্বন করিয়া ভক্তিপক্ষে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণপদাশ্রয়িরূপশ্রীঃ শশ্বদ্ভুতা স্ফুরতি।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্যস্যাঃ প্রসরন্ জগন্তি পুষ্ণাতি।। ১।।

উজ্জ্বলনীলমণিঃ সোপ্যুদগাত্তস্মাদ্ রসামৃতাম্বুধিতঃ।
ক্ষীরাম্বুধিতঃ প্রকটাং হরিরুচিমপ্যন্যথা ঘটয়ন্।। ২।।

তদমৃতসিন্ধু-বিসৃষ্টং হরয়েঽলঙ্কাররত্নমাকলয়ন্।
সাহিত্যান্বয়ি-দর্পণমপি সঙ্কলিতং করিষ্যামি।। ৩।।

অস্থানে পরিপাতান্ ম্লায়তি সাহিত্যদর্পণঃ সোঽয়ং।
মুরজিতি সমর্প্যমাণঃ স্থানে কান্তিং সদা লভতাম্।। ৪।।

সাহিত্যং নিজবর্ণনমবতংসং কর্ত্তুমীহতে স হরিঃ।
তৎকুর্ব্বন্নহমর্পিতমধিহরি দর্পণ-সমর্পণং কুর্য্যাম্।। ৫।।

রসভৃতবাক্যং কাব্যং রস আত্মা বাক্যমস্য যদ্দেহঃ।
সর্ব্বং রসমদ্ভুততা ব্যাপ্নোত্যত্র হি চমৎকৃতিঃ সারঃ।। ৬।।

তস্মাদদ্ভুত একঃ সর্ব্বত্রাত্মা যথা ব্রহ্ম।
এবং শব্দেনার্থেনাদ্ভুততাস্পৃশি কাব্যতা বাক্যে।। ৭।।

এবং সতি রসমাত্রে বৈশিষ্ট্যাৎ কৃষ্ণভক্তিবিবুধৈঃ।
প্রাকৃতবিষয়া ভগবদ্বিষয়াশ্চাস্মিন্ মতা ভেদাঃ।। ৮।।

পূর্ব্বে পুরুবীভৎসাঃ স্ফুটমপরে সর্ব্বশর্ম্মদাতারঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যঃ পঞ্চমবেদঃ প্রমাণং হি।। ৯।।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রয়ী শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর সেবাসৌন্দর্য্য অদ্ভুত রূপে প্রকাশিত হইয়া (পৃথিবীতে) প্রসারিত হইয়াছে। শ্রীরূপের সেবা-সম্পত্তি হইতে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া অনন্ত বিশ্বকে (ভক্তিদ্বারা) পোষণ করিতেছে।। ১।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আবার শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি উদ্‌গত হইয়া ক্ষীর-সমুদ্র হইতে প্রকটিত ভগবান্ শ্রীহরির (ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর) অঙ্গকান্তিকে যেন ম্লান করিতেছেন।। ২।।

সেই (ভক্তিরস) অমৃতসিন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অলঙ্কাররত্ন শ্রীহরির (প্রীতির) উদ্দেশ্যে সমাহরণ করিতে গিয়া আমি এই সাহিত্য সম্বন্ধীয়-দর্পণও সঙ্কলন করিব।। ৩।।

এই সাহিত্যদর্পণ অস্থানে অর্থাৎ অনধিকারী বা অনীশ্বর ব্যক্তির সমীপে প্রযুক্ত হইলে এই সমস্ত রত্নরাজি ম্লান হইয়া পড়ে; তজ্জন্য এই সাহিত্যালঙ্কার পরিপূর্ণ দর্পণগ্রন্থ শ্রীমুরারিতে সমর্পিত হইয়া যথাস্থানে সর্ব্বদা পরম-শোভা লাভ করুক।। ৪।।

নিজবর্ণনপূর্ণ এই দর্পণসাহিত্যকে শ্রীহরি কর্ণাবতংসরূপে গ্রহণ করিতেও পারেন। আমি এই গ্রন্থকে সেইরূপ ভগবদ্বর্ণন-পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীহরির প্রীতির জন্য সমর্পণ করিব।। ৫।।

রসপূর্ণ বাক্যই কাব্য, রস—কাব্যের আত্মা, যাহা বাক্য, (তাহা) ইহার (কাব্যের দেহ; অদ্ভুততা সকল রসকেই ব্যাপ্ত করে; কেননা, কাব্যে চমৎকারিতাই —সার)।। ৬।।

অতএব ব্রহ্মের ন্যায় একমাত্র অদ্ভুততা সর্ব্বত্র (সকল রসের) আত্মা; এইরূপে শব্দ ও অর্থের দ্বারা অদ্ভুততাবিশিষ্ট বাক্যই—কাব্যত্ব।। ৭।।

এইরূপে রসবিষয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকায় শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিজ্ঞজনগণ প্রাকৃত কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্যের মধ্যে ভেদ স্বীকার করেন।। ৮।।

প্রথমোক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত কাব্য অতীব বীভৎস বা ভীতিপ্রদ, অপর অর্থাৎ অপ্রাকৃত কাব্য সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। পঞ্চমবেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমল প্রমাণ-গ্রন্থ।। ৯।।

'শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ'-গ্রন্থে সাতটি 'প্রকাশ' আছে। ইহার প্রথম প্রকাশে কাব্যস্বরূপনিরূপণ, দ্বিতীয় প্রকাশে বাক্যস্বরূপাদি-নিরূপণ, তৃতীয় প্রকাশে ধ্বনি-নির্ণয়, চতুর্থ প্রকাশে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার-নির্ণয়, পঞ্চম প্রকাশে দোষ-নির্ণয়, ষষ্ঠ প্রকাশে রীতি-নির্ণয় ও সপ্তম প্রকাশে গুণনির্ণয় করা হইয়াছে।

শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ-গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকাশে অভিধামূলা ব্যঞ্জনার উদাহরণ-বাক্যে 'যথা শ্রীগোপালচম্পূমনু' এই বাক্য হইতে এই গ্রন্থ যে শ্রীগোপালচম্পূ-রচনার পরে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীগোপালচম্পূ ১৬৪৯ সম্বৎ বা ১৫১৪ শকাব্দে রচিত হয় বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গ্রন্থোপসংহারে লিখিয়াছেন। অতএব শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ ১৫১৪ শকাব্দের পর রচিত হয়।

শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব ঃ—এই মহাকাব্যে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যে অভিষেকের সুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধারাণীর অভিষেক মধু (চৈত্র) মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অথবা স্বয়ং শ্রীমাধব (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় বলিয়া গ্রন্থের 'শ্রীমাধবমহোৎসব' নামকরণ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে নয়টী উল্লাস বা সর্গ আছে। নয়টী উল্লাসের নাম যথাক্রমে,—(১) উৎসুক-রাধিক, (২) উন্মন্যুরাধিক, (৩) উৎফুল্ল-রাধিক, (৪) উদ্যোত-রাধিক, (৫) উদিত-রাধিক, (৬) উন্নত-রাধিক, (৭) উৎসিক্ত-রাধিক, (৮) উজ্জ্বল-রাধিক ও (৯) উন্মদ-রাধিক।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিকট প্রথম পত্রে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীমাধব-মহোৎসব'-গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—"শ্রীরসামৃতসিন্ধু-শ্রীমাধব-মহোৎসবোত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি।" (শ্রীভঃ রঃ ১৪।১৯)

অর্থাৎ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসব, উত্তরচম্পূ ও শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের শোধন কিছু অবশিষ্ট আছে; বর্ষা আগত হওয়ায় সম্প্রতি তাহা প্রেরিত হইল না, পরে দৈবানুকূলাবস্থায় এই গ্রন্থগুলি প্রেরণ করা হইবে।

গ্রন্থারম্ভে প্রথম উল্লাসে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

জীয়াদ্ বিকীর্ণা কিরণাবলী হরেঃ

শ্রীরাধিকাভাগভিষেক-বারিণা।
আসারিণী যাঽরুচদালি-লোচনৈঃ
সার্দ্ধং ময়ূরৈরিব মেঘসংহতিঃ।। ১।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতয়া প্রসিদ্ধতাং
গতঃ শচীকুক্ষি-সমুদ্র-সম্ভবঃ।
সদ্ভক্তিপীযূষনিধিঃ স্বদীধিতীঃ
স গৌরকান্তির্ব্বিতনোতু মদ্ধৃদি।। ২।।

অঙ্ঘ্রিযুগ্মমিহ সার-সারসস্পর্দ্ধিমূর্দ্ধনি দধাতু মামকে।
যঃ সনাতনতয়া স্ম বিন্দতে বৃন্দকাবনমমন্দ-মন্দিরম্।। ৩।।

যস্য শাসন-বলাৎ কৃতাবিহ
প্রাবৃতং স্বয়মমুষ্য তুষ্যতঃ।
রূপ-নামমহিতস্য মৎপ্রভোঃ
প্রীণতাং করুণয়া হরেঃ প্রিয়াঃ।। ৪।।

প্রশ্রিতোঽয়মনুযাচতে জনস্ত্বং স্বতঃ প্রভু-নিদেশ-ভারতি!
তন্মহামহ-বিভাবি-বৈভবৈরাবিরেধি নবকাব্য-রূপিণী।। ৫।।

পাতু মাং পিতৃতয়া কৃপান্বিত-স্তৎপ্রভুদ্বয়-সহোদর-প্রথঃ।
যো বিভাতি রঘুনাথদাসতাখ্যাতিভির্জগতি সাধুবল্লভঃ।। ৬।।

তন্নিদেশবর-বীর্য্য-সম্পদা সম্মদাৎ প্রববৃতে কৃতাবিহ।
হন্ত! তস্য কৃপয়ৈব সন্ততং যান্তু তোষমপি তে মহাশয়াঃ।। ৭।।

যত্তু পাদ্মমনু সূচিতং বৃহদ্গৌতমীয়মনু মাৎস্যমপ্যনু।
নিশ্চিতং প্রভুবরেণ বর্ণিতং তন্মুদা প্রথয়িতুং মমোদ্যমঃ।। ৮।।

অভিষেকজলধারাসিক্ত শ্রীরাধিকালিঙ্গিতবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তীর্ণ কিরণাবলী জয়যুক্ত হউন। ময়ূরগণ-সহ মেঘমালা যেরূপ লোকলোচনের তৃপ্তি- বিধান করে, তদ্রূপ অভিষেক-বারিসিক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের কিরণাবলীও সখীবৃন্দের নয়নানন্দকর হউক।। ১।।

যিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে প্রসিদ্ধ, শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত ও শুদ্ধ-ভক্তিরসামৃতের সমুদ্রস্বরূপ, সেই গৌরকান্তি শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে স্বীয় কিরণমালা বিস্তার করুন।। ২।।

যিনি 'শ্রীসনাতন'-নামে সর্ব্বজনিবিদিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জে স্বীয় বাস-মন্দির লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করিয়াছিলেন, অন্য কুত্রাপি যান নাই, সেই শ্রীসনাতনপ্রভু তাঁহার সরসিজবিনিন্দিত শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে স্থাপন করুন।। ৩।।

যাঁহার আদেশবলেই আমি এই অপ্রাকৃত গ্রন্থলিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই পরম সন্তুষ্টচিত্ত, অতিশয় কৃপাময়, সর্ব্বপূজ্য মৎপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর করুণাই এই গ্রন্থরচনে আমার একমাত্র সম্বল; অন্য কোন পাণ্ডিত্যবল বা সাধন-বলাদি আমার কিছুমাত্র নাই। এই গ্রন্থ শ্রীহরির প্রিয়জনগণের প্রীতিবিধান করুক।। ৪।।

হে প্রভুনিদেশ-ভারতি! এই বিনীত প্রণত জন আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে যে, কোন প্রকার কষ্টকল্পনা ব্যতিরেকেই আপনি স্বয়ং নব অপ্রাকৃত কাব্যরূপে শ্রীরাধামাধবমহোৎসবোপযোগী গুণরস-ভাবালঙ্কারাদি-বৈভবমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হউন।। ৫।।

শ্রীবল্লভ, যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রভুদ্বয়ের অর্থাৎ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সহোদর বলিয়া বিখ্যাত, যিনি শ্রীরাম-দাস্যে সুদৃঢ়-নিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছেন এবং সাধুজনগণের অতিপ্রিয়, সেই কৃপাময় মৎপিতা শ্রীল বল্লভপ্রভু আমাকে পালন করুন।। ৬।।

মদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর আদেশবর্য্যরূপ সম্পদের বলে ও প্রেরণায় উৎসাহান্বিত হইয়া এই গ্রন্থ-লিখনে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। অহো! তাঁহার করুণা-প্রভাবে তদনুগত মহাশয়গণ নিশ্চয় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন।। ৭।।

এই গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীগৌতমপুরাণ ও শ্রীমৎস্য-পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়; অধিকন্তু মৎপ্রভু শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীদানকেলি-কৌমুদীতে এই অভিষেক-মহোৎসবের কথা বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্য এই বিষয়টী আনন্দের সহিত বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি; কারণ, ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার নহে।। ৮।।

এই গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোক যথা,—

উভয়ভুবনভব্যং যঃ সদা মে বিধাতা
নিধিবদপি যদীয়ং পাদপদ্মং নিষেব্যম্।
অকৃপণ-কৃপয়া স্বপ্রেমদঃ সর্ব্বদা য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে।।

যিনি উভয় ভুবনের অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত ধামের একমাত্র পরম-মঙ্গল-বিধাতা, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পরম-নিধিবৎ সাদরে সেব্য, যিনি স্বপাদপদ্মে প্রেম-প্রদানকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার ইষ্টদেব, সেই শ্রীরূপপ্রভুকে আমি সতত ভজনা করি।

এই গ্রন্থ-রচনার কাল যথা,—

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন্।
স্বমনোরথবন্নব্যং কাব্যমেতদপূরয়ৎ।।

১৪৭৭ শকাব্দে শ্রীজীব (শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু) শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান-পূর্ব্বক নিজ চিত্তবৃত্তির অনুরূপ এই নব কাব্যগ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভুর রচিত অন্য কোন তারিখযুক্ত গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বের তারিখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ, উত্তর খণ্ড ১৬৪৯ সম্বৎ বা ১৫১৪ শকে সমাপ্ত হয়। সুতরাং শ্রীমাধব-মহোৎসব ও উত্তরচম্পূর সমাপ্তির ব্যবধান-কাল ৩৭ বৎসর।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার সমন্বয়, সুসিদ্ধান্ত ও ভাষ্যস্বরূপ 'শ্রীগোপালচম্পূ'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহারই অনুক্রমণিকাস্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যলীলাদি বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সঙ্কল্পের বা কামনার কল্পবৃক্ষস্বরূপ। ইহার নিকটে ভগবৎসম্বন্ধীয় যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে ২৭৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা, ৩১৫ শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের নিত্যলীলা, ১৩১ শ্লোকে সর্ব্ব-ঋতুলীলা বা ছয় ঋতুতে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা এবং ১০ শ্লোকে ফলনিষ্পত্তি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্।। ১।।
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
অনাদিজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব যঃ।। ২।।
নবীননীরদশ্যামং তং রাজীববিলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্।। ৩।।

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে শ্রীরূপ! হে শ্রীসনাতন! হে শ্রীগোপাল-ভট্টপ্রভো! হে পরম বান্ধব শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভো! হে ব্রজজন শ্রীল বল্লভপ্রভো! আপনারা সকলে আমাকে সর্ব্বতোভাবে পালন করুন। ১।।

যিনি শ্রীনন্দ মহারাজের নন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ, ত্রিভুবনের আনন্দবর্দ্ধক এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীবৃন্দের পতি, যাঁহার অঙ্গকান্তি নবঘনের ন্যায় শ্যামল, যাঁহার নয়নগুলি পদ্মের ন্যায় কমনীয়, সেই বল্লবীনন্দন বা শ্রীযশোমতীনন্দন গোপাল-রূপী শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।। ২-৩।।

শ্রীল গোস্বামিপাদ উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

সদ্ভক্তেষ্বতুলং পিতৃব্যযুগলং কৃত্বা মদীয়াং গতিম্।
স্বং দাস্যং দিশদস্তি যৎ প্রভুযুগং তন্মে সদাস্তাং গতিঃ।।
গঙ্গায়াং ককুচঙ্গমুক্ শ্রুতিমদাজ্জাগ্রদ্গতং মাং প্রতি
শ্রীবৃন্দাবিপিনে ত্রয়ীমপি পরাং স্বপ্নাদ্যবস্থং পুনঃ।
যঃ শ্রীমান্ মধুমর্দ্দনঃ সুভগবতাসদ্রূপতা-বিশ্রুতঃ
সংজ্ঞাবান্ লঘুবংশশংসকতয়া বন্দে চ বন্দে চ তম্।।
শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতন-রূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্।।
ইতি সঙ্কল্পকল্পদ্রুম-নাম-কাব্য-মামকস্পৃহাধাম
শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপপূরমপি পূরয়ত্তৎ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণার্পিতমেব মম
সর্ব্বমিতি তদিদমপি তথা ভবেদেবম্।।

সদ্ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা অতুলনীয়, সেই পিতৃব্যযুগল অর্থাৎ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-নামক যে আমার প্রভুদ্বয় আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া আমার সুপথ নিরূপণ করিয়া দেন, তাঁহারা নিত্যকাল আমার একমাত্র গতি হউন।

শ্রীমধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরম রূপবান্ এবং মধুর বংশীধ্বনি করেন বলিয়া "বংশীধারী" নামে বিখ্যাত, যিনি গঙ্গাতীরপ্রদেশে অবস্থানকালে জাগ্রতাবস্থায় আমাকে প্রেমপ্রদায়িনী শ্রুতি ও শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ত্রয়ী পরা শ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীহরিকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

যেরূপ আমার সর্ব্বস্বই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে অর্পিত হইয়াছে, তদ্রূপ আমার বাঞ্ছানুরূপে গ্রথিত এই 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম'-নামক গ্রন্থ, যাহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা-পরিপূর্ণ, তাহাও শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের শ্রীচরণে অর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতার (পঞ্চমাধ্যায়) টীকাঃ—টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণরূপমহিমা মম চিত্তে মহীয়তাম্।
যস্য প্রসাদাদ্ব্যাকর্ত্তুমিচ্ছামি ব্রহ্মসংহিতাম্।।
দুর্যোজনাপি যুক্তার্থা সুবিচারাদৃষিস্মৃতিঃ।
বিচারে তু মমাত্র স্যাদৃষীণাং স ঋষির্গতিঃ।।

যদ্যপ্যধ্যায়শতযুক্ সংহিতা সা তথাপ্যসৌ।
অধ্যায়ঃ সূত্ররূপত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গতাং গতঃ।।
শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যেষু দৃষ্টং যন্মৃষ্টবুদ্ধিভিঃ।
তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম।।

যদ্‌যষ্ছ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তরাদ্বিনিরূপিতম্।
অত্র তৎ পুনরামৃশ্য ব্যাখ্যাতুং স্পৃশ্যতে ময়া।।

যাঁহার কৃপাবলে আমি এই 'শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা'র ব্যাখ্যা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপের মহিমা আমার চিত্তে সতত পূজিত হউক। ঋষিগণের

রচিত স্মৃতিগ্রন্থ সুবিচারপূর্ণ, আপাতদৃষ্টিতে দুর্যোজনাযুক্ত মনে হইলেও যুক্তার্থ-সমন্বিত। অতএব সেই ঋষিগণের গ্রন্থবিচারে ঋষিগণেরও পরমপূজ্য শ্রীরূপপ্রভুই আমার একমাত্র গতি। যদিও এই সংহিতা-গ্রন্থটী একশত অধ্যায়যুক্ত, তথাপি এই পঞ্চম-অধ্যায়ই সূত্ররূপে সমগ্র সংহিতার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে মার্জ্জিতবুদ্ধি বা সুমেধাগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত হন, এই গ্রন্থেও সেই সকল বিষয় দর্শন করিয়া আমার চিত্তে পরমানন্দের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে অর্থাৎ এই গ্রন্থে তাহার পুনরালোচনা করিয়া আমি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছি।

Theodor Aufrecht সঙ্কলিত Catalogus Catalogorum-এ (Vol. II, Page 42) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর ব্রহ্মসংহিতার টীকার নাম 'দিগ্‌দর্শিনী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু টীকার মধ্যে এইরূপ কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

উপসংহার ঃ—

"অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্‌ব্রহ্মসংহিতা।
কৃষ্ণোপনিষদাং সারৈঃ সঞ্চিতা ব্রহ্মণোদিতা।।"
যদ্যপি নানাপাঠান্নানার্থান্ স্মরন্তি নানার্থাস্তে।
তদপি চ সৎপথলব্ধা এবাস্মাভিস্ত্বমী প্রমিতাঃ।।
সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্‌গতিঃ।।

এই শ্রীভগবদ্-ব্রহ্মসংহিতা শত অধ্যায়-সম্পন্না। ইহা শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণোপনিষদের সারসমূহ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশিত।

যদ্যপি নানা অর্থবিদ্‌গণ এই সংহিতার নানাপ্রকার পাঠ ও অর্থাদির পরিচিন্তন করেন, তথাপি আমরা যে এই সিদ্ধান্তসমূহ সৎপথে লব্ধ হইয়াছি, ইহা সুনিশ্চিত।

সাক্ষাৎ সনাতনতনু শ্রীহরির ন্যায় আরাধ্য শ্রীল সনাতন প্রভু যাঁহার অগ্রজ এবং শ্রীবল্লভ যাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা, সেই শ্রীরূপপ্রভুই জীবের (শ্রীজীবগোস্বামীর) একমাত্র আশ্রয়।

দুর্গমসঙ্গমনী—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত টীকার নাম দুর্গমসঙ্গমনী। 'সঙ্গমনী' অর্থে সম্প্রাপিকা বা সেতু। দুর্গম বা দুষ্পার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকে যে সেতুর সাহায্যে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই দুর্গমসঙ্গমনী। দুর্গমসঙ্গমনীর মঙ্গলাচরণ যথা,—

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্‌গতিঃ।।

অথ শ্রীমান্ সোঽয়ং গ্রন্থকারঃ সকলভাগবতলোকহিতাভিলাষপরবশতয়া প্রকাশিতৈঃ স্বহৃদয়দিব্যকমলকোষবিলাসিভিঃ শ্রীমদ্ভাগবতরসৈরেব ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-নামানং গ্রন্থমপূর্ব্বরচনমাচিন্বানস্তদ্বর্ণয়িতব্যস্যৈব চ সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বানস্তদ্ব্যঞ্জনয়ৈব মঙ্গলমাসঞ্জয়তি এবং সর্ব্ব এষ গ্রন্থোঽয়ং মঙ্গলরূপ ইতি চ বিজ্ঞাপয়তি।

যাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন প্রভু সনাতনতনু শ্রীহরির ন্যায় পূজ্য, শ্রীবল্লভ যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেই শ্রীরূপপ্রভুই জীবসদ্‌গতি অর্থাৎ শ্রীজীবের একমাত্র আশ্রয়। অনন্তর সেই শ্রীমান্ গ্রন্থকার শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ভাগবত জনগণের অর্থাৎ শুশ্রূষু ভক্তগণের মঙ্গলবিধান করিবার অভিলাষে স্বীয় হৃৎপদ্মকোষগত শ্রীমদ্ভাগবতামৃতরসসমুদ্রকে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-নামক গ্রন্থমধ্যে সম্পুটিত করিয়া মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক রচনাভঙ্গী-দ্বারা এই গ্রন্থের সর্ব্বোত্তমতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়ত্বের কথা জানাইয়াছেন।

উপসংহার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বপূর্ণঃ স চরতি বিপুলে গোকুলে ব্যক্ততত্ত-
ন্মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবর্য্যঃ স চ পশুপসুতানন্তলক্ষ্মীভিরিষ্টঃ।
শ্রীরাধাবর্গমধ্যে স চ মধুরগুণ-শ্রীধুরাধামধারী-
ত্যস্মিন্ গ্রন্থে রসাব্ধাবভিমতমহিমাধারসারপ্রচারঃ।।
যদপি চ নাতিবিশুদ্ধা তদপি চ সদ্ভিঃ কদাঽপ্যুরীকার্য্যা।
দুর্গমসঙ্গমনীয়ং নৌকেবাস্যামৃতাম্ভোধেঃ।।

শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতত্ত্ব। তিনি বিপুলধাম শ্রীগোকুলে ব্যক্তভাবে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র হইয়াও শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে এবং ব্রজললনাগণের

কান্তরূপে সতত বিলাসবান্। তিনি শ্রীরাধিকা ও তৎসখীবৃন্দের মধ্যে অদ্ভুত মধুর গুণ-রূপ-লীলারসময়বিগ্রহরূপে বিরাজমান। এবম্বিধ নিজ অভিমত ইষ্টদেব-মহিমাসমূহ প্রচুরভাবে এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মৎকৃতা এই টীকা অতি বিশুদ্ধা অর্থাৎ ভাষাপারিপাট্যে অতি সুললিতা না হইলেও সাধুজনগণ ইহা অবশ্য অনুশীলন করিবেন। কারণ, ইহা শ্রীরূপবদন-বিনিঃসৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-উত্তরণের নৌকাস্বরূপ অর্থাৎ এই টীকা অনুশীলন করিলে সুধীজন অবশ্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিবেন, নতুবা তাহা অতীব দুরধিগম্য।

শ্রীলোচনরোচনী—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকার নাম 'লোচনরোচনী'। টীকার মঙ্গলাচরণ যথা,—

> সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
> শ্রীবল্লভোঽনুজ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ।।
> হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ জাতে পুরা দুরালোকে।
> উজ্জ্বলনীলমণৌ মম লোচনরোচন্যসৌ বিবৃতিঃ।।

পুরাকালে শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু যখন সুধীজনগণ কর্ত্তৃক আদরের সহিত আলোচিত হইতেছিল না, তখন শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির এই 'লোচনরোচনী'-নাম্নী বিবৃতি মৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।

উপসংহার ঃ—

> সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
> শ্রীবল্লভোঽনুজ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ।।

অগ্নিপুরাণান্তর্গতা গায়ত্রীব্যাখ্যার বিবৃতি—ইহার মঙ্গলাচরণেও শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর দুর্গমসঙ্গমনী-টীকার মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

অগ্নিপুরাণের ২১৬শ অধ্যায়ের সপ্তদশটী শ্লোক এই গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় সম্পূটিত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ইহার প্রথম শ্লোকের বিবৃতিতে 'উক্ থ', 'ভর্গ', 'প্রাণ', 'গায়ত্রী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে গায়ত্রীর প্রত্যেক পদের অর্থ সরলভাবে ব্যাখাত আছে।

শ্রীগোপাল-চম্পূ ঃ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু গদ্য ও পদ্যাত্মক মহাকাব্য শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূতে তেত্রিশটী পূরণ বা পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোরলীলা এবং উত্তরচম্পূতে সাঁইত্রিশটী পূরণে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রয়াণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিবাহনির্ব্বাহ ও শ্রীগোলোকপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদয় লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বচম্পূর মঙ্গলাচরণ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্।।

গ্রন্থসূচনা ঃ—

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্।
তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া।।
সোঽহং কাব্যস্য লক্ষ্যেণ মনো নির্ম্মামি তাদৃশম্।
তন্মহান্তো যদীক্ষেরংস্তদা হেম্নি চিতো মণিঃ।।
পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী সেয়ং ত্রয়ী ত্রয়ী।
পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থতুল্যা যথেচ্ছং সদ্ভিরীক্ষ্যতাম্।।
শ্রীগোপালগণানাং গোপালানাং প্রমোদায়।
ভবতু সমন্তাদেষা নাম্না গোপালচম্পূর্যা।।
যদ্যপি চিরমন্তর্দ্ধা জাতা শ্রীগোকুলস্থানাম্।
তদপি মহাত্মসু তেষাং ব্যূহসমূহ পুরঃ স্ফুরন্ জয়তি।।

আমি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চয় করিয়াছি, এই কাব্যগ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তা প্রজ্ঞারূপিণী রসনা দ্বারা সেই অমৃতেরই পুনঃ আস্বাদন করিব অর্থাৎ ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, এই 'শ্রীগোপালচম্পূ'-গ্রন্থে সেই কৃষ্ণতত্ত্বই পুনরায় কাব্যাকারে বর্ণিত হইবে। আমি কাব্যরচনাচ্ছলে আমার মনকে আস্বাদনযোগ্য রসনার ন্যায় নির্ম্মাণ করিতেছি। যদি এই গ্রন্থ কোন সৎকাব্যামোদী সুধী ব্যক্তি অবলোকন করেন, তাহা হইলে যথার্থই মণি সুবর্ণখচিত হইল অর্থাৎ এই গোপালচম্পূ-গ্রন্থ সুধীগণের দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্য। এই গোপালচম্পূ পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই বিভাগ আবার

তিন তিন অবয়বে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের তুল্য হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যদৃচ্ছাক্রমে এই গ্রন্থ অনুশীলন করুন। শ্রীকৃষ্ণের গণ ও শ্রীনন্দাদি গোপগণের সম্যক্ আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এই গোপালচম্পূ-নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত থাকুন। যদিও শ্রীগোকুলের শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহুকাল পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তথাপি মহাজনগণের (ভক্তিবিলোচনের) সম্মুখে শ্রীরূপসনাতনাদি ব্রজবাসিগণ নিত্যকালই প্রকটিত থাকিয়া জয়যুক্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূর ৩৩টি পূরণে যে-সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল,—

প্রথম পূরণে—গোলোকরূপনিরূপণ; দ্বিতীয়ে—শ্রীগোলোকবিলাস-বিকাশন; তৃতীয়ে—শ্রীকৃষ্ণজন্ম, শ্রীমধুকণ্ঠ ও শ্রীস্নিগ্ধকণ্ঠের সংলাপারম্ভ; চতুর্থে—শ্রীমন্নন্দনন্দনপর্ব্ব বা শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব; পঞ্চমে—পূতনাবধলীলা; ষষ্ঠে—শকটভঞ্জনাদি বিচিত্র বাল্যলীলা; সপ্তমে—তৃণাবর্ত্তবধ ও মৃদ্ভক্ষণাদি লীলা; অষ্টমে—জননী-কর্ত্তৃক দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুন-মোচন-লীলা; নবমে—গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ; দশমে— শ্রীব্রজ-ধামে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ বাল্যলীলা ও বৎসাসুর-বধ; একাদশে—অঘাসুর-বধ ও ব্রহ্ম-বিমোহন-লীলা; দ্বাদশে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সহচরগণের সহিত গো-চারণ-প্রচার; ত্রয়োদশে—শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন এবং দাবানল-নির্ব্বাপণ। ১ম হইতে ১৩শ পূরণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ পূরণে—শ্রীকৃষ্ণের গর্দ্দভাসুর-বধ; পঞ্চদশে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বানুরাগ-লীলা; ষোড়শে—প্রলম্বাসুর-বধ ও দাবানলসম্বর্ত্ত-নিবর্ত্তন-লীলা; সপ্তদশে—বংশীশিক্ষাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীভিক্ষা; অষ্টাদশে—ইন্দ্র-যজ্ঞভঙ্গ ও গো-গণসহ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজের পূজন; ঊনবিংশে—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব স্তম্ভন এবং গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের গবেন্দ্রপদপ্রাপ্তি; বিংশে—শ্রীমন্নন্দমহারাজের বরুণ-লোকে গমন ও শ্রীগোলোক-দর্শন; একবিংশে—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজগোপীগণের বস্ত্রহরণ ও আকর্ষণ-লীলা; দ্বাবিংশে—যজ্ঞপত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্ন-ভিক্ষা; ত্রয়োবিংশে—শ্রীরাসলীলারম্ভ, প্রথমসঙ্গজনিত বাকোবাক্য ও সঙ্গীতাদি বর্ণন; চতুর্বিংশে—শ্রীরাসলীলাক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীরাধিকার সৌভাগ্য-বর্ণন; পঞ্চবিংশে—গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-স্তম্ভন ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি;

ষড়্বিংশে—শ্রীরাস-বিলাসের বিস্তার; সপ্তবিংশে—জলকেলি, বনভ্রমণ ও শ্রীরাসলীলা-সমাপ্তি; অষ্টাবিংশে—শ্রীকৃষ্ণের অম্বিকাবনে গমন ও বিদ্যাধর-শাপমোচন; ঊনত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জনে কৌতুককেলি-বর্ণন; ত্রিংশে—শঙ্খচূড়বধ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের নির্ল্লজ্জ হোরিকাক্রীড়ন (বসন্তোৎসব); একত্রিংশে—বৃষাসুর-বধ, কুণ্ডদ্বয়-প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের দশমবর্ষীয় নানা-বিচিত্র-লীলা; দ্বাত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের কেশিদৈত্য-বধ; ত্রয়স্ত্রিংশ পূরণে—শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণের সর্ব্বমনোরথ-পূরণ।

১৪শ হইতে ৩৩শ পূরণে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বচম্পূর উপসংহার ঃ—

সম্বৎপঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেষ্বেকভাগ্-
জাতং যর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্।
বৃন্দাকাননমাশ্রিতেন লঘুনা জীবেন কেনাপি তদ্-
বৃন্দাকাননমেব সম্ভৃতিকলাং ধত্তাং সমন্তাদিহ।।
প্রায়ঃ সর্ব্বা হরের্লীলাঃ ক্রমশঃ সূচিতা ময়া।
যথাস্বং লব্ধরুচিভিরুপাস্যন্তাং মহাত্মভিঃ।।

১৬৪৫ সম্বৎ বা ১৫১০ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া একজন অতি ক্ষুদ্র জীব কর্ত্তৃক (দৈন্যোক্তি) এই সমগ্র গোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করুক।

এই গ্রন্থে আমি প্রায় শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকার লীলাই বর্ণন করিয়াছি। মহাজনগণ স্ব স্ব রুচি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলার উপাসনা করুন।

শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূর মঙ্গলাচরণ—

শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্।।
সম্পূর্ণাসীদাশু গোপালচম্পূ-
রেষাং যস্মাদাশয়াদেব পূর্ব্বা।
এষা তস্মাদুত্তরাপ্যুত্তরা স্যা-
দেবং তং কমন্যং ভজেম।।

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন! হে শ্রীশ্রীগোপাল-রঘুনাথ! হে শ্রীবল্লভ! আপনারা সকলে শ্রীব্রজে আমাকে সর্ব্বকাল পরিপালন করুন।

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগোপালচম্পূর পূর্ব্বচম্পূ শীঘ্র সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই প্রারব্ধ উত্তরচম্পূ-রচনাও যাঁহার কৃপাবলেই সমাপ্ত হইবে, সেই অতীব অদ্ভুত প্রভাবযুক্ত মদভীষ্টদেব ব্যতীত আমরা আর কাহার ভজনা করিব?

শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূর ৩৭টি পূরণে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল,—

প্রথম পূরণে—শ্রীব্রজবাসীদিগের অনুরাগসাগরবিস্তার বর্ণন; দ্বিতীয়ে—শ্রীঅক্রূরের ক্রূরতাবিজ্ঞাপনমুখে শ্রীগোপীগণের বিলাপবর্ণন; তৃতীয়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমথুরা-প্রস্থান; চতুর্থে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমথুরাপুরপ্রবেশ; পঞ্চমে—হস্তিমল্লাদির সহিত কংসবধকথা; ষষ্ঠে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীব্রজে শ্রীনন্দ মহারাজের প্রেরণ; সপ্তমে—শ্রীনন্দ মহারাজের শ্রীব্রজপ্রবেশ; অষ্টমে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিবিদ্যাধ্যয়নসমাপন; নবমে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যমালয় হইতে গুরুপুত্রানয়ন; দশমে—শ্রীউদ্ধবের ব্রজগমন-সংবাদ; একাদশে—দূত-ভ্রমে ভ্রমরসম্ভ্রম-নামক শ্রীরাধিকার বিচিত্র ভাব-প্রকাশ; দ্বাদশে—শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীব্রজের বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি-বর্ণন।

১ম পূরণ হইতে ১২শ পূরণে শ্রীউদ্ধব কর্ত্তৃক শ্রীব্রজের আনন্দবর্দ্ধন-নামক প্রথমবিলাস সম্পূর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিলাসে ১৩শ পূরণ হইতে একবিংশতি পূরণ পর্য্যন্ত ৯টি পূরণ আছে।

ত্রয়োদশ পূরণে—জরাসন্ধবন্ধন; চতুর্দ্দশে—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালযবন ও জরাসন্ধের জয়-বিবরণ; পঞ্চদশে—শ্রীবলরামের বিবাহবর্ণন; ষোড়শে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরুক্মিণীপাণিগ্রহণ; সপ্তদশে—সত্যভামাদি সপ্তকন্যার বিবাহবর্ণন; অষ্টাদশে—শ্রীকৃষ্ণের নরকবধ, পারিজাতহরণ ও ষোড়শ সহস্র কন্যাবিবাহ; ঊনবিংশে—শ্রীকৃষ্ণের মহাদেব-বিজয় ও বাণাসুর-যুদ্ধকথা; বিংশে—শ্রীবলদেবের শ্রীব্রজে গমন; একবিংশে—পৌণ্ড্রকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীবলদেবের পুনরায় দ্বারকায় আগমন; একবিংশ পূরণে শ্রীবলদেবের আগমনে আনন্দপরিপূর্ণ গোষ্ঠপ্রকাশ-নামক দ্বিতীয় বিলাস সমাপ্ত হইয়াছে।

উত্তরচম্পূর শেষবিলাসে দ্বাবিংশ পূরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তত্রিংশ পূরণ পর্য্যন্ত ষোড়শটী পূরণ আছে।

দ্বাবিংশ পূরণে—শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক দ্বিবিদদানব-বধ; ত্রয়োবিংশে—শ্রীনন্দ-মহারাজ-সহ ব্রজবাসীদিগের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা; চতুর্বিংশে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনানন্তর ব্রজবাসিগণের পুনরায় শ্রীব্রজে আগমন; পঞ্চবিংশে—শ্রীউদ্ধবের মন্ত্রণা; ষড়্বিংশে—জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধরাজবৃন্দের মোচন; সপ্তবিংশে—রাজসূয়-যজ্ঞ ও শিশুপাল-বধ; অষ্টাবিংশে—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সাল্ববধ; ঊনবিংশে—ভাবি-কথার প্রমাণ-বিস্তার; ত্রিংশে—দন্তবক্রবধ ও শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজাগমন; একত্রিংশে—শ্রীপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকাদি গোপীবৃন্দের বাধা-সমাধান; দ্বাত্রিংশে—বাধা-সমাধানানন্তর বিবাহারম্ভ; ত্রয়স্ত্রিংশে—শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান; পঞ্চত্রিংশে—শ্রীগোষ্ঠমধ্যে সহর্ষে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শুভবিবাহোৎসব; ষট্‌ত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতির পরস্পর মিলনরূপ দিব্য মঙ্গলানুষ্ঠান; সপ্তত্রিংশে—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসুখপূর্ণ শ্রীগোলোক-প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণাগমনে আনন্দপূর্ণ শ্রীব্রজবর্ণন-প্রসঙ্গে এই তৃতীয় বিলাস সমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহার—

প্রাগারব্ধমভূত্তদেতদমলং চম্পূদ্বয়ং যৎকৃতে
তচ্চেদং হৃদি শুদ্ধমাবিরভবল্লোকদ্বয়স্যামৃতম্।
রাধাকৃষ্ণপরস্পরব্যতিকরানন্দাত্মনা যেন তে
যাতা দিব্যগতিং বয়ং সুখময়ং সর্ব্বোর্দ্ধমধ্যাস্মহে।।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেন্দোর্মধুপ-খগ-মৃগাঃ শ্রেণিলোকা দ্বিজাতা
দাসা লাল্যাঃ সুরভ্যঃ সহচরহলভৃত্তাতমাত্রাদিবর্গাঃ।
প্রেয়স্যস্তাসু রাধাপ্রমুখবরদৃশশ্চেতিবৃন্দং যথোর্দ্ধং
তদ্রূপালোকধৃষ্ণক্প্রমদমনুদিনং হন্ত! পশ্যাম কর্হি।।
শ্রীকৃষ্ণ! কৃষ্ণচৈতন্য! সসনাতনরূপক!
গোপাল! রঘুনাথাপ্ত! ব্রজবল্লভ! পাহি মাম্।।

প্রাগারব্ধ পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ এই গ্রন্থদ্বয়-রচনাকালে শ্রীশ্রীরাধামাধব-লীলাকথাবর্ণন-প্রসঙ্গে হৃদয়ে ইহ ও পর এই উভয়লোকে আস্বাদ্য এক অপূর্ব্ব অমৃতরস আবির্ভূত হইয়াছে; তদ্দ্বারাই আমরা গ্রন্থরচনের ফলস্বরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ ও সর্ব্বোর্দ্ধ দিব্যগতি লাভ করিব।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমর, পক্ষী, মৃগাদি প্রাণিগণ; কৃষিকার্য্যাদির অনুষ্ঠাতা লোকসমূহ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি; রক্তক-পত্রকাদি দাসগণ; সুরভী প্রভৃতি লাল্য বা পাল্য সেবকগণ! শ্রীদামাদি সহচরগণ; শ্রীবলদেব, শ্রীনন্দ-যশোদাদি জনক-জনকী; চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ, তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা ও ললিতাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ব্রজসুন্দরীগণের দর্শনের উৎকণ্ঠা আমার কবে অনুদিন বলবতী হইবে? হায়! কবে আমি তাঁহাদের দর্শন পাইব? (পরবর্ত্তী শ্লোকের অনুবাদ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।)

রসিকজনসুখার্থং সাধয়ামাস শশ্বৎ
ক্রমমনু রসপূর্ত্তিং সূদবৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ।
ক্রমমনুরসয়ন্ যঃ পূর্ত্তিমাপ্নোতি পূর্ত্ত্যাং
সফলমিহ পরং স্যাত্তত্তু বৈদগ্ধ্যমস্য।। ১।।

"প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপঞ্চজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো! ।।" ২।।

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩৭)

কাচিৎ কাচিদিতি প্রোচ্য প্রগুপ্তাঃ শ্রীশুকেন যাঃ।
নাম্না তাসাং রহঃকেলিং ব্যজ্য প্রেজতি মন্মনঃ।। ৩।।

ময়া স্বীয়ে কাব্যে নিখিলরসযোগং জ্ঞপয়তা
কৃতং ধার্ষ্ট্যং কষ্টং বত! হরিরমা-হ্রীকৃদসকৃৎ।
বিধাতব্যং ধীরৈর্যদি দৃশি তদা তত্তু ন গিরী-
ত্যমুং চাটুং ভীতঃ প্রকটয়তি সোঽয়ং কবিজনঃ।। ৪।।

অথবা ঃ—

ময়া যন্মৎকাব্যং সরসমিদমিত্থং জ্ঞপয়তা
কৃতং ধার্ষ্ট্যং কষ্টং বত! কুলবধূ-হ্রীকৃদসকৃৎ।

তদস্পৃষ্টাস্তাঃ স্যুর্যদতিকবিধীশ্রীবৃতিবৃতা
জগচ্চিত্তাদ্দূরে রহসি হরিসেবাং বিদধতি।। ৫।।

যেরূপ পাচক মধুরাদি ষড়্‌রসযুক্ত বস্তু প্রস্তুত করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিক ভক্তজনগণের সুখবিধানার্থ নিরন্তর যথানুক্রমে রসপূর্ত্তিসাধন করিয়া থাকেন। রসিক বিজ্ঞজন যদি ক্রমবিপর্য্যয় না করিয়া এই গ্রন্থস্থ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরস আস্বাদন করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য তৃপ্তি লাভ করিবেন এবং এই গ্রন্থ রচনাও সফল হইবে। ক্রমানুসারে আস্বাদনই রসজ্ঞ আস্বাদকের আস্বাদননৈপুণ্যের পরিচায়ক।। ১।।

হে বিভো কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দ-রাশিবর্দ্ধন-কল্পে প্রাপঞ্চিক-লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন।। ২।।

শ্রীশুকদেব (শ্রীমদ্ভাগবতে) 'কোন কোন রমণী' এই কথা বলিয়া যাঁহাদিগকে অত্যন্ত গোপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজললনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় লীলাবিলাসকথা প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয় নিরতিশয় কম্পিত হইতেছে।। ৩।।

'আমার রচিত কাব্যে সমস্ত রসের সদ্ভাব আছে'—ইহা জ্ঞাপন করিয়া আমি ধৃষ্টতা করিয়াছি। হায়! এই ধৃষ্টতা শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সীগণের লজ্জাকর হইয়াছে। তবে ধীর পণ্ডিতগণ যদি এই কাব্য দর্শন মাত্র করেন, তাহা হইলে 'কবি নিজেই ভীত হইয়া চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন' এই বিবেচনায় পাঠ করিতে নিশ্চয় অস্বীকার করিবেন।। ৪।।

অথবা 'আমার রচিত কাব্যে সমস্ত প্রকার রসের সদ্ভাব আছে, ইহা প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা করিয়াছি' এইরূপ উক্তি শ্রবণ অপ্রাকৃত রসজ্ঞগণের পক্ষে কষ্টকর হয়। কারণ, প্রাকৃত কুলবধূদিগেরই এইরূপ শ্রবণে লজ্জা হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত কুলবধূগণকে লজ্জা স্পর্শও করিতে পারে না। মহাজনগণ জগতের সমস্ত প্রকার চিন্তাস্রোতের বহুদূরে অবস্থান করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট ইহা ধৃষ্টতা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না অর্থাৎ এইরূপ বর্ণনাতে কোন-প্রকার দোষ হইতে পারে না।। ৫।।

উত্তরচম্পূর রচনার কাল—

পবনকলামিতি সম্বদ্বিন্দন্ বৃন্দাবনান্তঃস্থঃ।
জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণাঙ্গীচকার বৈশাখে।।
অথবা বিদ্যা-শরেন্দুশাকমিতিপ্রথমচরণঃ প্রচারণীয়ঃ।।

১৬৪৯ সম্বৎ অথবা প্রথমচরণের পরিবর্ত্তে শেষ চরণের অর্থানুসারে ১৫১৪ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া 'জীব'-নামক কোন ব্যক্তি (দৈন্যোক্তি) এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছে।

Catalogus Catalogorum-এ (Vol. I. P. 208 & Vol. II. P. 32) ব্রজরাত্রের পুত্র জীবরাজ-নামক এক ব্যক্তির 'গোপালচম্পূ'-নামক গ্রন্থের (তৎকৃতা 'রসবতী'-নাম্নী টীকার সহিত) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Mss. পুস্তকে (Vol. I, P. 41-42) জীবরাজ-কৃত গোপালচম্পূর বিবরণ আছে।

ষট্‌সন্দর্ভ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পূজিত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসন-অনুসারে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' রচনা করেন। ইহার নামান্তর 'ষট্‌সন্দর্ভ'। তাহা যথাক্রমে এই— (১) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, (২) ভগবৎ-সন্দর্ভ, (৩) পরমাত্ম-সন্দর্ভ, (৪) শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, (৫) শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ও (৬) শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভ। 'তত্ত্ব', 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'—এই চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব, 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়-তত্ত্ব ও 'শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভে' প্রয়োজন-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কাশীতে ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু প্রয়াগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যে-সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সংগৃহীত শ্রীগৌরমুখোদ্‌গীর্ণ সেই সকল সিদ্ধান্ত ও বিচার দাক্ষিণাত্যের কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীব্যেঙ্কটেশ ভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরূপসনাতনের নিকট অধ্যয়ন-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই সার পুনরায় সংগ্রহ করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষের জন্য এক কারিকাগ্রন্থ

রচনা করেন। সেই কারিকা-গ্রন্থকেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তত্ত্বসন্দর্ভ—ইহাই প্রথম সন্দর্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।" (শ্রীভাঃ ১।২।১১) —এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়-অবলম্বনে সম্বন্ধ-তত্ত্বাত্মক প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয় রচিত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভের প্রথম শ্লোকে ইষ্টবস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ বিহিত হইয়াছেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়কে সতত জিহ্বাগ্রে ধারণ করেন অথবা যিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদি-বর্ণনরত, যাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত, উপাঙ্গ—শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি, অস্ত্র—অবিদ্যা-নাশক শ্রীহরিনাম ও পার্ষদ—শ্রীগদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত যিনি সতত বর্ত্তমান, সুমেধা ভক্তগণ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চন করেন।

ইহার দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই বিশেষ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।।

যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ যিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও গৌররূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অঙ্গ-উপাঙ্গাদির বৈভব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগত হইতেছি।

ইহার তৃতীয় শ্লোকস্থ আশীর্নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ, যথা—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্।।

যাঁহারা সপরিকর শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানাইবার জন্য আমাকে এই পুস্তিকা লিখিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, সেই শ্রীমথুরামণ্ডলবাসী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের জয় হউক।

ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-অনুসরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে; এই বিষয়টি অন্য ৫টি সন্দর্ভের প্রথমেও লক্ষিত হয়। তাহা এই,—

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।।
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ।।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন' নামক মদীয় জ্যেষ্ঠ তাতদ্বয়ের বান্ধব—দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালভট্ট একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহাতে কোন স্থানে ক্রমানুসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে যাহা লিখিত ছিল, সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র জীব-কর্ত্তৃক (দৈন্যোক্তি) উক্ত ভট্টপাদের ঐ পূর্ব্বলিখিত বিষয়সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে লিখিত হইতেছে।

এই সন্দর্ভের ষষ্ঠ শ্লোকে অধিকার-নির্ণয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে; —

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজ-ভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ।।

যিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজন করিতে ইচ্ছুক, তিনিই এই গ্রন্থ দেখিবেন, অন্যের দর্শন-সম্বন্ধে শপথ থাকিল।

সপ্তম শ্লোকে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুবর্গকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ-সূচনা প্রকাশিত হইয়াছে—

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম।।

অনন্তর মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থোপদেষ্টা গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' নামক সন্দর্ভগ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি।

অষ্টম শ্লোকে শ্রোতৃবর্গের অনুরাগ-উৎপাদনের জন্য আশীর্ব্বাদমুখে সংক্ষেপে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের কথা উক্ত হইয়াছে,—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম-তৎপাদভাজাম্।।

যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়ানিয়ন্তা পুরুষই নিজ-অংশ—মৎস্যাদি লীলাবতার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার 'নারায়ণ'-নামক রূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণ-সেবী ভক্তগণকে নিজের প্রেম অর্পণ করুন।

শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে নিম্নলিখিত মুখ্য বিষয়-সমূহ বর্ণিত আছে—(১) পরব্যোম ও শ্রীভগবান্, (২) অবতারের কার্য্য, (৩) সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব, (৪) অচিন্ত্য বাস্তব বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানে ও তদ্ভক্তিনিরূপণে বেদপ্রমাণ ব্যতীত প্রত্যক্ষ অনুমানাদি-লব্ধ প্রাকৃত জ্ঞানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও ব্যভিচারিত্ব, (৫) তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ও শব্দের প্রামাণিকতা, (৬) বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব ও তিরোভাব, (৭) শব্দ-প্রমাণের মধ্যে পুরাণই পঞ্চম বেদস্বরূপ, তাহা আবার তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে ত্রিবিধা, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণই অবলম্বনীয়, তদনুকূল হইলেই অন্যান্য পুরাণের প্রামাণিকত্ব, বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতই নির্গুণ অমল পুরাণ এবং তাহাই প্রমাণ-শিরোমণি; (৮) শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য ফল—প্রেম-ভক্তি, (৯) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা, (১০) শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয়, (১১) কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতেরই প্রাধান্য, (১২) শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা না করার কারণ, (১৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-শ্রীশ্রীধরাদি আচার্য্যগণের উপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত, (১৪) শ্রীবেদব্যাসের ভগবদ্দর্শন, (১৫) ভক্তির স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্নত্ব, (১৬) জীবের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা, (১৭) অদ্বৈতবাদী ভক্তগণের মত, (১৮) একজীব-বাদ-খণ্ডন, (১৯) সাধন-ভক্তির প্রয়োজনীয়তা, (২০) নির্ব্বিশেষজ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা, (২১) দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য, (২২) আশ্রয়তত্ত্ব, (২৩) আধ্যাত্মিকাদির আশ্রয়তত্ত্ব-নিরাস, (২৪) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য আশ্রয় ইত্যাদি।

প্রত্যেক সন্দর্ভের উপসংহারে এই অংশটী পরিদৃষ্ট হয়,—

"ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎ-কৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-ভাজন-শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসনভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে 'তত্ত্ব-সন্দর্ভো' নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ।"

কলিযুগপাবন, নিজভজন-বিতরণই যাঁহার অবতারের প্রয়োজন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণের অনুচর এবং এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরমপূজ্য শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনের সদুপদেশ শিক্ষাবাণী যাহার মধ্যে বর্ত্তমান, সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভে 'তত্ত্বসন্দর্ভ'-নামক সন্দর্ভ-গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—মায়াবাদীর নিঃশক্তিক ব্রহ্মের ধারণা ভ্রান্তিমূলক। বস্তুতঃ 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থে সশক্তিক শ্রীভগবানকে উদ্দেশ করে (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১)। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্ত। এই জন্যই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'ব্রহ্মসন্দর্ভ' না বলিয়া 'ভগবৎসন্দর্ভ' নাম করিয়াছেন। ইহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি এই,—

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল-রূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্‌বিবিচ্যতে।।
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ।।

(এই শ্লোকটী পরবর্ত্তী অন্যান্য সমস্ত সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণেই দৃষ্ট হয়।) শ্রীবৃন্দাবন-নিবাসী পরমপূজনীয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সন্তোষ-বিধানার্থ দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু এই শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রচিত গ্রন্থখানি কোথায়ও ক্রম-ভঙ্গভাবে, কোথায় বা ক্রমপর্য্যায়ে এবং কোন কোন স্থানে খণ্ডিতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। সেই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া 'জীব' নামক ক্ষুদ্র আমি (দৈন্যোক্তি) যথারীতি পর্য্যায়ক্রমে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই সন্দর্ভে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে; —(১) ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার, (২) বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-নিরূপণ; (৩) ভগবৎস্বরূপের সশক্তিকত্ব, বিরুদ্ধশক্ত্যাশ্রয়ত্ব; (৪) শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও নানাত্ব স্থাপন; (৫) মায়াশক্তি,

অন্তরঙ্গা শক্তি প্রভৃতি ভেদবৈশিষ্ট্য; (৬) শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্ব্বাশ্রয়তা, সূক্ষ্মস্থূলাতিরিক্ততা, স্বপ্রকাশত্ব, রূপগুণলীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপত্ব, পরিচ্ছদ-সমূহের স্বরূপাংশত্ব; (৭) বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদ বিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য, ভগবত্তায় পূর্ণত্ব, সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তি-বিবরণ, ভগবানের বেদ-ভক্ত্যেকগম্যত্ব।

পরমাত্মসন্দর্ভ—ইহা ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে তৃতীয় সন্দর্ভ। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) পরমাত্মা, তদ্ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য। (২) জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ-স্থাপন, বিবর্ত্ত-সমাধান, জগৎ ও পরমাত্মার অনন্যত্ব; (৩) জগতের সভ্যতা ও শ্রীল শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্ত; (৪) নির্গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বযোজনা; (৫) লীলাবতারসমূহের ভক্তের উদ্দেশে প্রবৃত্তি, ষড়্‌বিধ লক্ষণ দ্বারা শ্রীভগবানেরই তাৎপর্য্যত্ব ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—ইহা ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে চতুর্থ সন্দর্ভ। এই সন্দর্ভে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে,—একই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব প্রতীতিভেদে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ'-শব্দত্রয়বাচ্য। পরমাত্মার স্থান, স্বরূপাদি-নির্ণয়, তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, পরমাত্মার আকার, লীলাবতার-বিচার, শ্রীকৃষ্ণবলরামের বৈশিষ্ট্য, স্বয়ং ভগবত্তা-বিচার, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের কারণ, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-সম্বন্ধে যাবতীয় সন্দেহ-নিরসন ও বিবিধ শাস্ত্রের বিরোধোক্তির সমাধান, শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব, শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব ও বর্ণাশ্রমাতীত ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব; পরব্রহ্মের দ্বিভুজত্ব, স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ; শ্রীবলদেব, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, তাঁহার শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীগোলোকের একত্ব, ভগবৎপরিকরগণের স্বরূপ, যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণপার্ষদত্ব ও গোপাদির নিত্যপার্ষদত্ব, গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ-সম্বন্ধে উক্তির মীমাংসা, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য শ্রীনন্দ-যশোদা-নন্দন, প্রকটা-প্রকটলীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-স্থিতিকাল, শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন, শ্রীমদ্ভাগবতে পুনর্ব্রজাগমনের বিষয় অস্পষ্ট থাকিবার কারণ, অপ্রকটলীলাগত ভাব-বিচার, শ্রীব্রজদেবীগণের স্বরূপ-নির্ণয়, শ্রীরাধার স্বরূপ ও তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষতা ইত্যাদি।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-সিন্ধু মন্থন করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থে যে সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে চিদ্‌বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুগম্ভীর বিচার ও প্রমাণ-যুক্তি প্রভৃতির সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন। বলিতে কি, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচনা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মে প্রবেশাধিকারই হইতে পারে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভবব্যাধির নিদান চিকিৎসার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য হইতেই ক্লেশের উদয়। সুতরাং ভগবৎ-সাম্মুখ্যই আনুষঙ্গিক ক্লেশনিবৃত্তি ও নিত্যানন্দ লাভের একমাত্র পথ। ব্যাধির নিদান-বিচারে বিপরীত চিকিৎসার ন্যায় ভগবদ্বৈমুখ্য-বিপরীত ভগবৎসাম্মুখ্যের উপদেশই ভক্তিসন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তির সুখাত্মকত্ব, ভক্তির পরধর্ম্মত্ব, ভক্তিতাৎপর্য্য ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানাদির নিষ্ফলত্ব, সাধুসঙ্গ ও ভক্তির ক্রমবিচার, দেবতান্তরভজন ও বিষ্ণুভজনের তারতম্য বিচার, শ্রীহরিকীর্ত্তন ব্যতীত কেবল দেহযাত্রাদি-নির্ব্বাহের হেয়তা, সকল যুগেই হরিভজনের কর্ত্তব্যতা, ভূতদ্বেষ ও ভূতনিন্দার গর্হণ, জীবের শ্রেণীভেদ-বর্ণন, ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য-লিঙ্গদ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব-নির্ণয়; চতুঃশ্লোকীতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যুগপৎ সর্ব্বদেশ, সর্ব্বপাত্র, সর্ব্বকাল, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, দ্রব্য ও ক্রিয়ায়, সর্ব্ব ফল ও কারকে, সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ে ভক্তির নিত্যবিদ্যমানতা; ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎসেবা-প্রভাবে সর্ব্বানর্থনাশ, বৈষ্ণবের কুলপাবনত্ব, গর্ভস্থজীবের ভগবৎস্তুতি ও সংসার-প্রাপ্তি-বিষয়ে সিদ্ধান্ত, ভক্ত্যাভাসফলেও বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি, ব্রহ্মবাদী অপেক্ষাও নাম অপরাধীর মহিমা, বৈষ্ণব-অপমানের ফল, ভক্তিশৈথিল্যের কারণ, অজামিলের অন্তিমে নারায়ণস্মৃতি-উদয়ের কারণ, ঐকান্তিক ভাবের লক্ষণ, শ্রদ্ধা সম্বন্ধে বিচার, ভক্তিতে অধিকারী ও অনধিকারী বিচার, অনন্যভক্তের দুরাচারত্বের অভাব, ব্রহ্ম-পরমাত্ম-উপাসনার গর্হণ, জীবের স্বরূপবিচার, ভগবদাশ্রিতজনের সংসার-দুঃখের অভাব, সৎসঙ্গ, সাধুকৃপা, সৎ ও মহতের প্রকারভেদ; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের লক্ষণ-বিচার, শ্রদ্ধা ও ভজনরুচিবর্ণন, শ্রীগুরুস্বরূপ-বিচার, অহংগ্রহোপাসনা এবং ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, আরোপ সিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি এবং সকামা কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্র কামা ভক্তি, ষড়্‌বিধা শরণাগতি, সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য, শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি নববিধা

ভক্তির বিস্তৃত বিচার ও স্বরূপবর্ণন, রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ-বিচার, গোকুল-লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং উপসংহারে শ্রীগুরু ও শ্রীভগবৎ-প্রসাদলব্ধ সাধন-সাধ্যগত রহস্য প্রাণপরিত্যাগেও অপ্রকাশ্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থসমাপ্তিকালে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—"গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে যদেতৎ তৎসর্ব্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ। কৃপাপূরস্পন্দস্নপিতনয়নাম্ভোজযুগলৈঃ রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ।।"—যাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণকমল আমার গুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, আনুগত্য ও সিদ্ধি—এই সর্ব্ববিধরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের নয়নকমলযুগল কৃপাপ্রবাহের ক্ষরণহেতু অভিষিক্ত হইতেছে, সেই অশরণজন-গতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার গতি হউন।

প্রীতিসন্দর্ভ—ইহা ষট্‌সন্দর্ভের ষষ্ঠ সন্দর্ভ। ইহাতে প্রয়োজন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক অন্যান্য সন্দর্ভের ন্যায়। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—"অথ প্রীতিসন্দর্ভো লেখ্যঃ। ইহ খলু শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যং পরমতত্ত্বং সন্দর্ভচতুষ্টয়েন পূর্ব্বং সম্বদ্ধম্। তদুপাসনা চ তদনন্তর-সন্দর্ভেণাভিহিতা। তৎক্রমপ্রাপ্তত্বেন প্রয়োজনং খল্বধুনা বিবিচ্যতে। পুরুষ-প্রয়োজনং তাবৎ সুখপ্রাপ্তির্দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তু সুখত্বং দুঃখ-নিবর্ত্তকত্বঞ্চাত্যন্তিকমিতি এতদুক্তং ভবতি।"—অনন্তর প্রীতিসন্দর্ভ লিখিত হইবে। ভাগবতসন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, তাহা সম্বন্ধতত্ত্ব বা উপাস্যতত্ত্ব। তৎপরে ভক্তিসন্দর্ভে তাঁহার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। সেই ক্রমানুযায়ী এখন প্রয়োজনতত্ত্ব বিচারিত হইতেছে। পুরুষের প্রয়োজন—সুখপ্রাপ্তি ও আনুষঙ্গিকভাবে দুঃখনিবৃত্তি। শ্রীভগবৎপ্রেমেই আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

প্রীতিসন্দর্ভের উপসংহারে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

অত্র বিস্তরশঙ্কাতো যা যা ব্যাখ্যা ন বিস্তৃতা।
সা শ্রীদশমটিপ্পন্যাং দৃশ্যা রসমভীপ্সুভিঃ।।
তদেবমনেন সন্দর্ভেণ শাস্ত্রপ্রয়োজনং ব্যাখ্যাতম্।
তথা চৈবমস্তু।

আলীভিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিতঃ সানন্দমালোকিতঃ।
প্রত্যাশং সুমনঃফলোদয়বিধৌ সামোদমাস্বাদিতঃ।
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্ব্বাতিশায়িশ্রিয়া
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ।।
তাদৃশভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জনশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ।।

এইস্থানে গ্রন্থবিস্তারভয়ে যে যে ব্যাখ্যা বিস্তৃত করা হয় নাই, রসলিপ্সু ব্যক্তিগণ সেই সকল ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টিপ্পনীতে দেখিবেন। এইরূপে প্রীতিসন্দর্ভের দ্বারা শাস্ত্রপ্রয়োজন ব্যাখ্যাত হইল। শ্রীবৃন্দাবনে মধুর-প্রকাশমান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উল্লাস-কল্পবৃক্ষকে পুষ্প-ফলোদয়ের নিমিত্ত সখীগণ পরিপালন ও বর্দ্ধন করেন, আনন্দের সহিত দর্শন করেন এবং আস্বাদন করেন। তাহা সর্ব্বাতিশায়িনী শোভাদ্বারা আমাকে প্রমোদিত করুন। সেইরূপ ভাবময়ী ভক্তির বিস্তারকল্পে এই প্রপঞ্চে যে অবতারী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের শরণ্য, সেই শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

প্রীতিসন্দর্ভে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—পুরুষার্থ-বিনির্ণয়, মুক্তির স্বরূপনির্ণয়, মুক্তির পরমপুরুষার্থতা, প্রীতির পরতমপুরুষার্থতা, বিবিধ প্রকার মুক্তির স্বরূপ, ব্রহ্ম ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, বহিঃ ও অন্তঃসাক্ষাৎকার, পঞ্চবিধা মুক্তির স্বরূপ ও তারতম্য, ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব, মুক্তপুরুষগণের শ্রীহরিভজন, শুদ্ধভক্তের প্রার্থনীয় বস্তু, শুদ্ধভক্তের অন্য কামনার সমাধান, ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ, প্রীতির আবির্ভাবের ক্রম, প্রীতির তারতম্য ও ভেদ, গোপ-গোপীগণের প্রীতির উৎকর্ষ, প্রীতির উৎকর্ষ, প্রীতির রসাবস্থা, দৃশ্য ও শ্রাব্যকাব্যের রসভাবনাবিধি, আলম্বনাদি ভাব ও পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবের দ্বাদশ রসের বিচার এবং সর্ব্বশেষে উজ্জ্বলরসের স্বরূপবিচার।

ক্রমসন্দর্ভ—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-বিরচিত ব্যাখ্যা। গ্রন্থকার ষট্‌সন্দর্ভ রচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমব্যাখ্যা-মুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজননির্ণয়-প্রদর্শনহেতু ইহা সপ্তম সন্দর্ভরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক দৃষ্ট হয়—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ১।।
শ্রীমদ্ভাগবতং নৌমি যস্যৈকস্য প্রসাদতঃ।
অজ্ঞাতানপি জানাতি সর্ব্বঃ সর্ব্বাগমানপি।। ২।।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্ শ্রীমদ্বৈষ্ণবতোষণীম্।
দৃষ্ট্বা ভাগবতব্যাখ্যা লিখ্যতেঽত্র যথামতি।। ৩।।
যদত্র স্খলিতং কিঞ্চিজ্জায়তেঽনবধানতঃ।
জ্ঞেয়ং ন তত্তৎকর্ত্তৃণাং সমাহর্ত্তুর্মমৈব তৎ।। ৪।।
যেষাং প্রোৎসাহনেনাঽস্মি প্রবৃত্তোঽত্যন্তসাহসে।
তে দীনানুগ্রহব্যগ্রাঃ শরণং মম বৈষ্ণবাঃ।। ৫।।

যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি নমস্কার করি।। ১।।

যে একটিমাত্র গ্রন্থের কৃপায় যে-কোন ব্যক্তি অজ্ঞাত আগমসমূহের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন, আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রণাম করি।। ২।।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভসমূহ ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণী অবলোকন করিয়া যাহা চিত্তে স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা মৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।। ৩।।

এই ক্রমসন্দর্ভের মধ্যে যে-সকল প্রমাণ-বাক্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যদি অনবধানবশতঃ কোন-স্থলে স্খলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সমাহরণ-কারী আমারই ভ্রম বলিয়া জানিবেন, তত্তৎ শ্লোকাদির রচয়িতার নহে (গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি)।। ৪।।

যাঁহারা উৎসাহিত করায় আমি এই অত্যন্ত সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, দীনজনের প্রতি কারুণ্যপ্রকাশে ব্যগ্র সেই বৈষ্ণববৃন্দই আমার একমাত্র আশ্রয়।। ৫।।

অথ শ্রীভাগবতলোকহিতাভিলাষপরবশতয়া শ্রীভাগবত-সন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারভমাণো মহাভাগবতকোটিবহিরন্তর্দৃষ্টিনিষ্টঙ্কিত-ভগবদ্ভাবং নিজাবতার-প্রচারপ্রচারিত-স্ব-স্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-দুর্ল্লভপ্রেমপীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-

সহস্রং স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং ভগবন্তং কলি-যুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতসম্বাদেন স্তৌতি। * * অধুনা তু শ্রীমদ্ভাগবত-ক্রমব্যাখ্যানায় তত্রাপি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-নির্ণয়দর্শনায় চ সপ্তমঃ ক্রমসন্দর্ভোঽয়মারভ্যতে।

শ্রীভাগবতনিধ্যর্থা টীকাদৃষ্টিরদায়ি যৈঃ।
শ্রীধরস্বামিপাদাংস্তান্ বন্দে ভক্ত্যেকরক্ষকান্।।
স্বামিপাদৈর্ন যদ্ব্যক্তং যদ্ব্যক্তং চাস্ফুটং ক্বচিৎ।
তত্র তত্র চ বিজ্ঞেয়ঃ সন্দর্ভঃ ক্রম-নামকঃ।।

অনন্তর ভক্তভাগবতজনগণের কল্যাণাভিলাষে 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা নির্ণয় করিয়াছেন, যিনি নিজ ভক্তগণ দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপ ও শ্রীভগবৎপ্রেমসুধা-সরিৎপ্রবাহি সহস্র-ধারায় সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন, যিনি সহস্র সহস্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধিদেবতা, সেই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব'-সংজ্ঞক শ্রীভগবানকে এই কলিযুগে বৈষ্ণবজনগণের উপাস্য সমস্ত শব্দার্থশাস্ত্রতাৎপর্য্য-সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকদ্বারা গ্রন্থকার স্তুতি করিতেছেন। * * সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমব্যাখ্যা ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্ণয়-প্রদর্শনের নিমিত্ত এই 'ক্রমসন্দর্ভ'-নামক সপ্তম সন্দর্ভ রচনা আরম্ভ করিতেছি।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতরূপ গ্রন্থরত্নের অর্থপ্রকাশিকা টীকা প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, সেই ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে আমি বন্দনা করি। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ (তাঁহার টীকাতে) যাহা ব্যক্ত করেন নাই, অথবা কোথায়ও কোথায়ও যাহা অস্ফুটভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের (বিস্তৃত) ব্যাখ্যাই 'ক্রমসন্দর্ভ' বলিয়া জানিবেন।

ক্রমসন্দর্ভের উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় পরিদৃষ্ট হয়,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।। ১।।
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ।। ২।।

এবং সহস্রনামোক্ত-কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
মাং পায়াদপরাধেভ্যঃ স্বপ্রেমাংশেন পুষ্যতু।। ৩।।

শ্রীনাম চিন্তামণিস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপ এবং শ্রীনামী হইতে শ্রীনামের অভেদত্বহেতু শ্রীনাম পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি কনকসদৃশ, যাঁহার অবয়ব সর্ব্বশুভলক্ষণযুক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত, যিনি (লোক-শিক্ষার্থ) সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া শান্ত, সমতাযুক্ত ও শান্তিনিষ্ঠাপরায়ণরূপে সহস্রনামোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে বিখ্যাত, সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আমাকে অপরাধসমূহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া নিজপ্রেমের কিয়দংশ প্রদানপূর্ব্বক পোষণ করুন।। ১-৩।।

ক্রমসন্দর্ভ রচনার কোনও কাল লিখিত নাই।

সর্ব্বসম্বাদিনী—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর রচিত গ্রন্থাবলীর পূর্ণ-তালিকা কোন প্রামাণিক-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।৪২-৪৫) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুকে "যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই।" ইহা বলিয়া কেবল তাঁহার 'শ্রীমদ্ভাগবত-সন্দর্ভ' ও 'শ্রীগোপালচম্পূ' গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীজীব প্রভুর যে সংস্কৃত ও বাংলা পদ্যে গ্রন্থের তালিকা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও তালিকার শেষে 'ইত্যাদয়ঃ' পদ থাকায় সেই তালিকাটীও সম্পূর্ণ নহে জানা যায়। ঐ তালিকায় শ্রীল শ্রীজীব-প্রভুর 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থের কোনও উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ এই 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থেই শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বিশেষভাবে বেদান্তবিচার-অবলম্বনে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্বসম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণের শ্লোক হইতে জানা যায়, এই গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। যথা,—

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্ব্বসম্বাদিনী ময়া।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা বিরচ্যতে।।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া আমি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের 'সর্ব্বসম্বাদিনী' অনুব্যাখ্যা রচনা করিতেছি। বস্তুতঃ এই অনুব্যাখ্যা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের পরিশিষ্ট বা পরিপূরণবিশেষ; যদিও ইহাতে শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রথম চারিটী সন্দর্ভেরই অর্থাৎ তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেরই অনুব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব-সম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণে ক্রমসন্দর্ভের ন্যায়ই স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যদেবের অবতারিত্ব-সম্বন্ধে বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যারূপে গ্রন্থকার দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, শব্দশক্তি-বিচার, স্ফোটবাদ, মহাবাক্যার্থাবগমোপায়, শ্রীভগবৎ-স্বরূপবিনির্ণয়, সর্গাদিবিচার, শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদীর পূর্ব্বপক্ষ এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিচার করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়াছেন।

সর্ব্বসম্বাদিনীর ভগবৎসন্দর্ভের অণুব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিচারিত হইয়াছে,—

শক্তিসিদ্ধান্ত, শক্তি-অস্বীকারে দোষ দ্বিধর্ম্মতা, 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'-সূত্র-ব্যাখ্যা, নির্ব্বিশেষবাদখণ্ডন, ত্রিবিধ ভেদবিচার, ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যতা, শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব, শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রভৃতি।

পরমাত্ম-সন্দর্ভের অণুব্যাখ্যায় অনুভূতি, অহংপ্রত্যয়, জীবের অণুত্ব, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, জীবের ভোক্তৃত্ব, জীবের পরমাত্মত্ব, পরিচ্ছেদাদি মতত্রয়-বিবেচন, ব্রহ্ম হইতে অণুচৈতন্য জীবসমূহের ভিন্নত্ব বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন, পরিণামবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত, চতুর্ব্ব্যূহ-বিচার, সাত্বত-পঞ্চরাত্র-মত-সমর্থন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্বাদিনীতে অবতারতত্ত্বের বিচার, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্বহেতু তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্ব্বগুহ্যতমতা, শ্রীগোপীগণের ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

Catalogus Catalogorum নামক গ্রন্থতালিকা পুস্তকে (Vol I, Page 207) 'মুক্তাচরিত' ও 'স্তবমালা' গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা একমাত্র শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর রচিত 'মুক্তাচরিত'-গ্রন্থই দেখিতে পাই। স্তবমালা—শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর রচিত ও শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা সংগৃহীত স্তবপূর্ণ গ্রন্থ। ইহা শ্রীজীবপ্রভু ঐ গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে উপক্রমে স্বয়ংই বলিয়াছেন। যথা,—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত।।

মদীশ্বর শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, যিনি 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক রচিত স্তবমালা তাঁহারই অনুগত এই জীব (শ্রীজীবপ্রভু) সংগ্রহ করিয়াছে।

(মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত) মাদ্রাজ Government Oriental Manuscripts Library-র পুঁথির তালিকার ৪র্থ খণ্ডের ৪৪৭১-২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীজাহ্নবাষ্টকম্' নামে একটি স্তোত্র (R3053x নং পুঁথি) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তোত্রে আটটী শ্লোকে শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের আত্মজা শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীশ্রীজাহ্নবা-দেবী বা শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে।

আরম্ভ ঃ—

অনঙ্গমঞ্জরীখ্যাতে ব্রজে শ্রীরাধিকানুজে।
সূর্য্যদাসসুতে দেবি জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে।।

উপসংহার ঃ—

পঠেচ্ছ্রীজাহ্নবাদেব্যা অষ্টকং যো জনঃ সদা।
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপং স্যাৎ স বৈ কৃতী।।

পুষ্পিকা ঃ—

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিবিরচিতং শ্রীজাহ্নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

'Notices of Sanskrit Manuscripts'-এর তালিকার ১ম খঃ ২০৭ পৃষ্ঠায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে 'সারসংগ্রহ' নামে একখানি পুঁথির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Aufrecht-এর ৪র্থ খণ্ডের ৩০৩-৩০৫ পৃষ্ঠায় উক্ত পুঁথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

Beginning (প্রারম্ভ) ঃ—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ।।
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।

শ্রীকৃষ্ণচরণং নৌমি শরণং মম সন্ততম্।
হরণং সর্ব্বদুঃখানাং স্মরণং যস্য ত পি।।
শ্রীমুকুন্দপদদ্বন্দ্বং কন্দমানন্দসন্ততেঃ।
তনোতু ময়ি কারুণ্যং স্বমাত্রৈকগতৌ সকৃৎ।।
স্বমনোদ্রঢ়িমৈকার্থলাভায়াস্বাদ্যতে ময়া।
শ্রীরূপকৃতগ্রন্থানাং কোঽপি কোঽপি নবঃ স্ফুটঃ।।
জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপিকাং পুস্তিকামিমাম্।।
শ্রীল-রূপকবীন্দ্রস্য পাদপদ্মমহর্নিশম্।
স্ফুরতাং মানসে সম্যঙ্ মম মন্দস্য দুর্ম্মতেঃ।।

End (উপসংহার) ঃ—

শ্রীমদ্রাধাচরণচরিতানন্দপীযূষধারাং
বারং বারং রসিক-সদসি প্রেমমত্তঃ প্রবর্ষন্।
স্বেশাকুণ্ডে পুনরপি কদা শ্রীমুকুন্দাখ্য আরা-
ন্নেত্রানন্দং প্রভুরনুপমং হা মদীয়ং বিধাতা।।

Colophon (পুষ্পিকা) ঃ—

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিকৃতঃ সারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

এই গ্রন্থ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর লিখিত কিনা, তাহা বিচার্য্য। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকটী—"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা" ইত্যাদি শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিপ্রভুর হরিনামার্থ-নির্ণয়েও দৃষ্ট হয়। (শ্রীচৈঃ শিঃ ৪৬ দ্রঃ)। দ্বিতীয় শ্লোকটী "আদদানস্তৃণং দন্তৈঃ" শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি প্রভুর 'মুক্তাচরিতে'র উপসংহারের প্রথম শ্লোক। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ স্বকীয়বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক পরকীয়-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

Catalogus Catalogorum-এর ৩য় খণ্ড ৩৫ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের শ্রীজীবগোস্বামি-কৃতা টীকার নামোল্লেখ আছে।

আধ্যক্ষিক, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর গ্রন্থাবলী-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক ভ্রমেও পতিত হইয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত (১৯৩৭) M. Krishnamachariar তাঁহার History of Classical Sanskrit Literature পুস্তকের ২৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী"কে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে ধরিয়াছেন। "Indian Culture" (১৯৩৫-৩৮) পত্রিকায় কয়েক খণ্ডে "Theology & Philosophy of Bengal Vaisnavism" শীর্ষক প্রস্তাবসমূহে ষট্‌সন্দর্ভ সম্বন্ধে যে সমালোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে নানাপ্রকার ভ্রম ও আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত প্রবিষ্ট হইয়াছে। ষট্‌সন্দর্ভের প্রারম্ভেই শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু আধ্যক্ষিক পাঠকগণের প্রতি যে শপথ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করায় ঐরূপ বিপত্তি ঘটিয়াছে।

যাঁহারা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথার বা শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর প্রেমসিন্ধুর স্পর্শ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীগৌর-প্রণয়ি-ভক্তের নিকট শ্রীল শ্রীজীব-প্রভুর ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ আলোচনা করিলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

গণধাতুসংগ্রহ—ইহাতে পাণিনীয় ধাতুপাঠের তুল্য অর্থের সহিত দশগণে বিভক্ত ধাতুসমূহের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

আদ্য শ্লোক—

কৃষ্ণলীলাকথাবীজরূপধাতুগণো ময়া।
সংক্ষেপাদুদ্যতে তেন কৃষ্ণো মহ্যং প্রসীদতু।।

আমি (শ্রীজীব) শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনের বীজস্বরূপ ধাতুসমূহের গণপাঠ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আমাকে তাঁহার প্রসাদ প্রদান করুন।

অন্তিম শ্লোক—

ইতি নামামৃতস্যৈষা সংক্ষেপাদ্ধাতুপদ্ধতিঃ।
ময়া কৃতা প্রযুক্তান্যধাতুংস্ত্যক্ত্বা ক্বচিৎ ক্বচিৎ।।

শ্রীনামামৃতের এই ধাতুপ্রণালী আমি সংক্ষিপ্তভাবে প্রণয়ন করিলাম। কোথাও কোথাও প্রযুক্ত অপর ধাতুগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি।

লঘু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা—ইহাতে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীমাধবের উপাসনার বিরোধবাক্য নিরসনপূর্ব্বক তাহারই প্রয়োজনীয়তা স্থাপিত হইয়াছে।

মঙ্গলাচরণ—

সনাতন যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতন।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ।।
ভবিষ্যোত্তর-বারাহ-স্কান্দ-মাৎস্যাদিমিশ্রিতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শশ্বত্তন্ত্রাণি বিবিধানি চ।।
শাস্ত্রাণ্যেতানি শস্ত্রাণি রাধাদামোদরার্চ্চনে।
বাদিনাং বাদহন্তৃনি জয়ন্তি ভুবি সর্ব্বদা।।

যৎ খলু শ্রীরাধিকাসম্বলিতঃ শ্রীকৃষ্ণ উপাস্যতে, তত্র কশ্চিচ্ছাস্ত্র-প্রমাণকত্বং ন মন্যতে। তং প্রতি ইদং ব্রূমঃ। আস্তাং তাবদ্বল্লবীবর্গপ্রধানতয়া শ্রীসন্দর্ভাদৌ নির্ণীতাত্র নির্ণেষ্যমাণা শ্রীরাধাবল্লবীমাত্রঃ স উপাস্যতে; ইত্যত্র শাস্ত্রাণি শৃণু; তত্র তাবৎ পুরাণানি দর্শ্যন্তে।

যাঁহার অগ্রজ ভগবানের সদৃশ শ্রীমান্ সনাতন ও যাঁহার অনুজ শ্রীবল্লভ, সেই শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুই জীবের নিত্য আশ্রয়। ভবিষ্যোত্তরপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতির সহিত শ্রীমদ্ভাগবত ও বিবিধ নিত্যতন্ত্র, এই শাস্ত্রসমূহ শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের অর্চ্চনবিষয়ে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বদা প্রতিবাদিগণের বিবাদনাশক শস্ত্র-স্বরূপ হইয়া জয়লাভ করিতেছেন।

শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন না; তাঁহাদিগকে ইহা বলিতেছি। শ্রীসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধিকাকে গোপীগণের প্রধানারূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা থাকুক। এখানে কেবল 'শ্রীরাধিকা'-নাম্নী গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করা হয়, এই বিষয়ে শাস্ত্র শ্রবণ করুন। সেই বিষয়ে পুরাণের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

উপসংহার—

রাধা বৃন্দাবনে যদ্বত্তদ্বদ্গোপাল ঈর্য্যতে।
নারসিংহাদিকে শাস্ত্রে তদ্যুগ্মং তত্তদীশিতম্।।

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজতে জনেষ্বিতি পরিশিষ্টমৃচস্তথা।।
কার্ত্তিকে ব্রতচর্য্যায়ামতস্তদ্‌যুগ্মদেবতে।
রাধাদামোদরাভিখ্যে বীক্ষ্যেতে লোকশাস্ত্রয়োঃ।।
কিং বহূক্ত্যা কুণ্ডযুগ্মং তয়োর্যুগতয়েক্ষ্যতে।
শাস্ত্রে চ শ্রূয়তে তস্মাৎ কৈমুত্যাদ্ যুগ্মতা তয়োঃ।।
উমামহেশ্বরৌ কেচিল্লক্ষ্মীনারায়ণৌ পরে।
তে ভজন্তাং ভজামস্তু রাধা-দামোদরৌ বয়ম্।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবননিবাসিনঃ কস্যচিজ্জীবস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা সদা দীপ্যমানতা সমাপ্যহতাম্।

শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ শ্রীরাধা, সেইরূপ শ্রীগোপালও কথিত হন। শ্রীনারসিংহাদি শাস্ত্রে সেই যুগলমূর্ত্তি সেই সেই রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। ঋক্-পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে—শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াপরায়ণ এবং শ্রীরাধিকা শ্রীমাধবের সহিত বিরাজিতা থাকেন। অতএব কার্ত্তিকে ব্রতপালন-বিষয়ে 'শ্রীরাধা' ও 'শ্রীদামোদর' নামক যুগ্মদেবতা উপাস্য, ইহা লৌকিক ব্যবহারে ও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অধিক বাক্যের প্রয়োজন কি, কুণ্ডযুগলও তাঁহাদেরই যুগলরূপে গৃহীত হন এবং শাস্ত্রেও শ্রুত হন। অতএব কৈমুত্যন্যায়ানুসারে তাঁহাদের যুগ্মতা সিদ্ধ।

কেহ কেহ শ্রীউমার সহিত শ্রীমহেশ্বর, অপরে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীনারায়ণের ভজনা করেন; তাঁহারা তাহা করুন, কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের ভজন করি।

শ্রীবৃন্দাবননিবাসী 'জীব'-নামক কোনও ব্যক্তির (দৈন্যোক্তি) 'শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা' সর্ব্বদা দীপ্তিলাভ করিতেছেন। এই স্থানে তাহা সমাপ্ত হউন।

শ্রীমদ্‌গোপালতাপনী-টীকা (শ্রীসুখবোধিনী)ঃ—শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীমদ্‌গোপালতাপনীর পূর্ব্বভাগের টীকার প্রারম্ভে কামবীজমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রণতিজ্ঞাপক মন্ত্রের টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকার প্রারম্ভের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অথ "ক্লীংকারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ।।

ইত্যাদিভিঃ শ্রীমতা গৌতমেন ভগবতা স্বীয়তন্ত্রস্য প্রমাণতয়া দর্শয়িতা তদীয়ং পূর্ব্বতাপনী—কাৎ আপো লাৎ পৃথিবী ঈতোঽগ্নির্বিন্দুরিন্দুস্তৎসম্পাতাদর্ক ইতি। ক্লীংকারাদসজদিত্যাদিপ্রতীকময়ী গুর্জরাদিদেশপ্রসিদ্ধ-পরাশরগোত্রাদি-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়প্রাপ্তাথর্ববেদসুপিপ্পলাদশাখাদিপঠিত-গোপালতাপন্যাখ্যা শ্রুতিরিয়ম্। স্বপ্রতিপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণমেব সর্ব্ববেদান্তসম্মত্যা সর্ব্বোত্তমত্বেন প্রতিপাদয়ন্তী নমস্করোতি—সচ্চিদানন্দরূপায়েতি।"

অর্থাৎ শ্রুতিসমূহের শিরোভাগস্বরূপ উপনিষৎ বলেন,—কামবীজ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, 'ল'-কার হইতে পৃথিবী এবং 'ক'-কার হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত উক্তি দ্বারা ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌতমমুনি স্বীয় তন্ত্রের প্রমাণ-প্রদর্শনমুখে পূর্ব্বতাপনী বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, 'ক'-শব্দ হইতে জল, 'ল'-শব্দ হইতে পৃথিবী, 'ঈ'কার হইতে অগ্নি, বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং ইহাদের সমবায়-স্বরূপ সূর্য্যের প্রকাশ হইয়াছে—ইত্যাদি। 'কামবীজ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে' ইত্যাদি শ্রুতির শিরোভাগ উপনিষদের প্রতীক-স্বরূপ গুর্জ্জরাদিদেশ-প্রসিদ্ধ পরাশরগোত্রাদিব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়প্রাপ্ত অথর্ব্ববেদের সুপিপ্পলাদ-শাখাদিতে পঠিত ইহা 'গোপালতাপনী'-নাম্নী শ্রুতি। নিজ প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত বেদান্তমতানুসারে সর্ব্বোত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়া (এই শ্রুতি) সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে 'নমঃ' শব্দযোগে প্রণাম করিতেছেন।

এই টীকার মধ্যে শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত, সাম-কেন-কঠাদি উপনিষদ্সমূহ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীব্রহ্মসূত্র, সনৎকুমার-সংহিতা, শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি বহু সাত্বত-শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর তাপনীর প্রত্যেক মন্ত্রের বিশদ বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব ও তাঁহার রূপ-গুণাদি-মাহাত্ম্য বহু শ্রুতি ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সংহিতাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা সম্যগ্ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকামবীজ ও শ্রীকামগায়ত্রী প্রভৃতি দ্বারা সাবরণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর-তাপনীর টীকার প্রারম্ভেই পূর্ব্ব তাপনীর উপসংহার-তাৎপর্য্য ও উত্তর-তাপনীর প্রতিপাদ্য-বিষয়ের কথা

উক্ত হইয়াছে। যথা—"পূর্ব্বতাপন্যাং তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেব ইত্যুপসংহার-তাৎপর্য্যেণ মহাবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশত্বং যদুক্তং তদেব উত্তরতাপন্যাং প্রকারান্তরেণ বিব্রিয়তে।" অর্থাৎ পূর্ব্ব-তাপনীতে 'অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরদেব'—এই উপসংহার-তাৎপর্য্যপর মহাবাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে তাদৃশ সর্ব্বোত্তমত্বের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকারান্তরে উত্তর-তাপনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরতাপনীতে শ্রীগোপালের পুরীশ্রেষ্ঠ শ্রীব্রজের দ্বাদশ বনের নাম-তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকার উপসংহার যথা—

গান্ধর্ব্বীবরগান্ধর্ব্বগন্ধবন্ধুরশর্ম্মণে।
বৃন্দাবনাবনীবৃন্দনন্দিনে নন্দতাত্মনঃ।।
বিশ্বেশ্বরক-জনার্দ্দনভট্টাভ্যাং বৈদিকাগ্রাভ্যাং তদ্বৎ।
প্রবোধযতিনা লিখিতং বিরচিতমত্র তারতম্যেন।।
ইতি উত্তরগোপাল-তাপনীবিবৃতিঃ সম্পূর্ণতাং গতা।
শ্রীসনাতনরূপস্য চরণাব্জসুধেপ্সু না।
পূরিতা টিপ্পনী চেয়ং জীবেন সুখবোধিনী।।

কেহ কেহ শ্রীরূপের 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'-নাম্নী ভাণিকার টীকা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই টীকার উপক্রম বা উপসংহারে টীকার রচয়িতার কোন নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

টীকার উপক্রম-শ্লোক ঃ—

দানকেলিকলৌ লুপ্তধর্ম্মমর্য্যাদয়োর্ভজে।
রাধামাধবয়োঃ কামলোভদম্ভমদানৃতম্।।

টীকার উপসংহার-শ্লোক ঃ—

দানকেলিকলেরন্তে রাধামাধবয়োর্যুগম্।
কামলোভমদাক্রান্তমেকাকারমহং ভজে।।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র টীকার প্রারম্ভে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈঃ" প্রভৃতি উক্তি দর্শনে কেহ কেহ ঐ টীকাকে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর রচিত বলিয়া মনে করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর রচিত বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় "বৈষ্ণব-বন্দনা" নামক একটি সুদীর্ঘ বন্দনা বা স্তোত্রের উল্লেখও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনার প্রারম্ভে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ঃ—

তদ্বন্দনং তৎস্মরণং সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কম্।
জীবেন কেন ক্রিয়তে পৌর্ব্বাপর্য্যমজানতা।।

উক্ত বন্দনার মধ্যে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

বন্দে তৌ পরমানন্দৌ প্রভু রূপসনাতনৌ।
বিরক্তৌ চ কৃপালু চ বৃন্দাবন-নিবাসিনৌ।।
যৎপাদাব্জ-পরিমল-গন্ধলেশ-বিভাবিতঃ।
জীবনামা নিষেবেয় তাবিহৈব ভবে ভবে।।

বন্দনার উপসংহারে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

এতদ্বৈষ্ণববন্দনং সুখকরং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদং
শ্রীমন্মাধ্বিকসংপ্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্গুণময়ং তদ্ভক্তবর্গাননু
জীবেনৈব ময়া সমাপিতমিদং কৃত্বা তু পাদার্পিতম্।।

Dr. M. Krishnamachariar-প্রণীত ও মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত (১৯৩৭) 'History of Classical Sanskrit Literature' পুস্তকের ১০২৭ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত পুস্তকের তালিকার মধ্যে 'ভৃঙ্গসন্দেশ'-নামক একটি গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি

[১]

আবির্ভাব-কাল

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ ষড়্-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু বাল্যলীলাকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের কাল-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' ২য় বর্ষে (২৫ পৃঃ) "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দনির্ণয়"-শীর্ষক বিবরণে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানের যে অব্দ উদ্ধার করিয়াছেন, তৎসহ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের স্বধামগত পণ্ডিতবর শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত অব্দের মিল হয়। উভয় বিবরণেই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-কাল—১৪২৫ শকাব্দা বা ১৫৬০ সম্বৎ বা ১৫০৩ খৃষ্টাব্দ, গৃহে স্থিতি—৩০ বৎসর, ব্রজে বাস—৪৫ বৎসর, অন্তর্দ্ধান—১৫০০ শকাব্দ (বা ১৬৩৫ সম্বৎ বা ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ), প্রকট-স্থিতি—৭৫ বৎসর। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণঘেরার স্বধামগত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিরচিত "শ্রীরাধারমণ-প্রাকট্য"-নামক হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকে শ্রীগোপাল-ভট্টের আবির্ভাবাদির কাল নিম্নলিখিতরূপে দৃষ্ট হয়,—

আবির্ভাব—১৫৫৭ সম্বৎ (বা ১৫০০ খৃষ্টাব্দ); শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-লাভ—১৫৬৮ সম্বৎ (বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দ) (১১ বৎসর বয়সে); শ্রীব্রজে আগমন—১৫৮৮ সম্বৎ (বা ১৫৩১ খৃষ্টাব্দ); প্রকটস্থিতি—৮৫ বৎসর; অন্তর্দ্ধান—১৬৪২ সম্বৎ (বা ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ) (৮৫ বৎসর বয়সে)।

১৪৩৩ শকাব্দে বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-পর্য্যটনচ্ছলে আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে মহাপুণ্যা কাবেরীর তীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৯-৪০) উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা কাবেরীর জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া শ্রীবাসুদেবে শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

[২]

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তাঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণম্ হইতে প্রায় পাঁচ-ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের অধিদেবতা শ্রীরঙ্গনাথ-বিষ্ণু। শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দিরটী ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের সপ্তসরণির প্রাচীন নাম— (১) ধর্ম্মের পথ, (২) রাজমহেন্দ্রের পথ, (৩) শ্রীকুলশেখরের পথ, (৪) আলিনাড়নের পথ, (৫) তিরুবিক্রমের পথ, (৬) মাড়মাড়ি গাইসের তিরুবিড়ি পথ এবং (৭) অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে চোলরাজ রাজমহেন্দ্র রাজ্য পালন করেন; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। শ্রীকুলশেখর আল্‌বর্ ও আলবন্দারু ঋষি শ্রীরঙ্গমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীসুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। শ্রীলক্ষ্মীর অবতার 'শ্রীগোদাদেবী' শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবদ্দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আলবর্ দস্যুবৃত্তিদ্বারা আহৃত ধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে,—তোণ্ডরডিপ্পডি আলবর্ বা শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ভক্তিযাজন করিতে করিতে কোন বারনারীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গনাথ স্বীয় সেবকের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহাকে উদ্ধার-মানসে নিজের একটী স্বর্ণপাত্র কোন সেবকের দ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। শ্রীমন্দিরে স্বর্ণপাত্র নাই দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে উহা বারনারীর গৃহে পাওয়া যায়। শ্রীরঙ্গনাথের কৃপা-দর্শনে ভক্তের ভ্রম-নিরসন হয়। শ্রীরঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি শ্রীতুলসী-কানন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য—শ্রীকুরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীরামপিল্লাই, তৎপুত্র—শ্রীবাগ্‌বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র—শ্রীবেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। শেষোক্ত মহাত্মার বার্দ্ধক্য-কালে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির আক্রমণ করিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্রীবৈষ্ণবকে হনন করেন। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর-রাজ্যের অধীনে সিঙ্গির শাসনকর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ 'কম্পন্ন উদৈয়র' বা 'গোপ্পণার্য্য' শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রার্থনা মতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে 'তিরুপতি' হইতে 'সিংহব্রহ্মে' আনয়ন করিয়া তথায় তিন বৎসর সেবা করেন ও পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে শ্রীল বেদান্তদেশিক-রচিত এই শ্লোকটি খোদিত আছে; যথা—

"আনীয় নীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিত-জগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রেঃ
শ্রেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাংস্তলুষ্কান্।
লক্ষ্মী-ক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন রঙ্গনাথং
সম্যগ্‌বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশো দর্পণো গোপ্পাণর্য্যঃ।।
বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাদ্ গোপ্পণঃ ক্ষৌণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্ত-তীলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাং তত্ত্ব লক্ষ্মী-মহীভ্যাং
সংস্থাপ্যস্যাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুত সাধুচর্য্যাং সপর্য্যাম্।।"

[৩]

শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট

কুম্ভকোণম্ হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে পাপনাশন-ক্ষেত্রে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক কাবেরীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও তৎসম্মুখে প্রেমাবেশে নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় 'শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট'-নামক এক শ্রীবৈষ্ণব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সসম্ভ্রমে স্বগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালনপূর্ব্বক সবংশে সেই শ্রীচরণামৃত পান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট নিবেদন করেন,—"প্রভো! চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সমাগতপ্রায়। আপনি কৃপা করিয়া এই চারি মাস এই দীনের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করুন এবং এই পামরকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করুন।"

শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের সেই প্রার্থনা স্বীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টগৃহে ভট্টসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথারঙ্গে সুখে চারিমাস যাপন করেন। প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও তৎসমীপে প্রেমাবেশে নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়া বহুলোকের মঙ্গলবিধান করেন। নানাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এইরূপে সকলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ

করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, সকলেই এক-একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। এইরূপে এক-একদিনের ভিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিমাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। কতিপয় ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতে পারিলেন না।

'তিরুমলই', ব্যেঙ্কট ও 'গোপালগুরু' (পরে শ্রীপ্রবোধানন্দ) নামে তিন ভ্রাতা মহীশূর-প্রদেশ হইতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট 'বড়গলই'-শাখাস্থ শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা-সম্বন্ধে সংলাপ হইল। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টকে রহস্যচ্ছলে বলিলেন,—"তোমার শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী নিজকান্তবক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি হইয়াও আমার ঠাকুর, যিনি গোপ ও গোচারক, সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গপ্রার্থিনী কেন হন? সাধ্বী হইয়া কেন শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করেন এবং কি জন্যই বা নিজের সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রত-নিয়মাদি আচরণপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা অঙ্গীকার করেন?"

শ্রীভট্টপাদ বলিলেন,—'শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ একই স্বরূপ। শ্রীনারায়ণে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদি লীলা নাই।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতি।।

শ্রীকৃষ্ণই যখন বিলাসমূর্ত্তিতে শ্রীনারায়ণ, তখন শ্রীনারায়ণ-পত্নী শ্রীলক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে শ্রীলক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীলক্ষ্মী দেখিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে তাঁহার পতিব্রতা-ধর্ম্মের নাশ হয় না, অথচ রাস-বিলাসরূপ অধিক লাভ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায়, শ্রীনারায়ণ-সঙ্গে তাহা পাওয়া যায় না। এ জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করেন। ইহাতে শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর কি দোষ হইল? আপনি কেন ইহাতে পরিহাস করিতেছেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীলক্ষ্মীর ইহাতে দোষ হয় নাই, ইহা আমি জানি। তবে শ্রীলক্ষ্মীদেবী রাসে অধিকার পান নাই, শাস্ত্রে এইরূপই শুনিতে পাই।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্।।

(শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৬০)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীতকণ্ঠ শ্রীব্রজসুন্দরী-দিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত শক্তিগণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিব? শ্রুতিগণ রাসমণ্ডলে প্রবেশাধিকার পাইলেন, অথচ শ্রীলক্ষ্মীদেবী এত তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসহ রাস-বিলাসে অধিকার পাইলেন না কেন? শ্রুতিগণের উক্তি শ্রবণ কর;—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ।।

(শ্রীভাঃ ১০।৮৭।২৩)

মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিঃশ্বাস জয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবানের শত্রুসকলও তাঁহার অনুধ্যানবলে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্প-শরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্র বিষয় কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি।”

শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট ইহা শুনিয়া বলিলেন,—“এই রহস্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি সামান্য জীব, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত; কোটীসমুদ্রগম্ভীর ঈশ্বরের লীলা কি করিয়া বুঝিব? আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, আপনি নিজের লীলাবৈচিত্র্য নিজে জানেন। আপনি যাঁহাকে জানাইবেন, তিনিই আপনার লীলার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ।” শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—“শ্রীকৃষ্ণের এক স্বাভাবিক লক্ষণ এই যে,

তিনি স্বীয় মাধুর্য্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। শ্রীব্রজবাসীর বা গোপীর আনুগত্য ব্যতীত কেহ শ্রীকৃষ্ণসেবায় অধিকার প্রাপ্ত হন না। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন বলিয়া জানেন। পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসীদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি প্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকামা হইলেন না এবং কেবল হৃদ্গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণপূর্ব্বক গোপীনাথের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে, 'কৃষ্ণসঙ্গম' পাওয়া যায় না। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজ-দেবদেহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। শ্রীনারায়ণে ষাটগুণ; সেই ষাটগুণের উপরে আরও শ্রীকৃষ্ণের চারিটী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই, যথা—(১) সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকারলীলা-সমুদ্র-বিশিষ্টতা, (২) অতুল্য-মধুর-প্রেম-পরিশোভিত-প্রিয়মণ্ডলযুক্ততা, (৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিগীতপরায়ণতা ও (৪) চরাচরবিস্ময়কারী সমোর্দ্ধরহিতরূপশ্রীযুক্ততা। এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয়-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীরও অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। 'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি' বলিয়া যে শ্লোক তুমি পাঠ করিলে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরই 'স্বয়ং-ভগবত্তা' স্থির হয়। স্বয়ং ভগবত্তাপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীলক্ষ্মীর মনোহরণ করেন। গোপিকার মনোহরণোপযোগী গুণচতুষ্টয় শ্রীনারায়ণে না থাকায়, তিনি গোপিকার মনোহরণ করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং শ্রীনারায়ণরূপে প্রকাশিত হইলে গোপীগণের তাহাতেও অনুরাগ হয় নাই।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবশেষে ভট্টকে বলিলেন,—"ওহে ভট্টপাদ! তুমি হৃদয়ে দুঃখ করিও না; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণে যেরূপ অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ,—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা একই বিগ্রহে নানাকাররূপ প্রকাশ করেন। শ্রীগোপীদ্বারে শ্রীলক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে শ্রীলক্ষ্মী-

রূপে শ্রীনারায়ণ-সঙ্গাস্বাদন করেন। ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাবভেদে একই চিদ্‌বিগ্রহে নানা আকার ও রূপের ধ্যানভেদমাত্র জানিতে হইবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট বলিলেন,—"কোথায় আমি ক্ষুদ্র জীব, পতিতপামর, আর কোথায় আপনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই আমি একান্ত সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করি। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায় আপনার শ্রীচরণ-দর্শন পাইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়াছেন। আপনার অহৈতুকী কৃপায় শ্রীকৃষ্ণভক্তির সর্ব্বোত্তমতা জানিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি।"

ইহা বলিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপালিঙ্গন করিয়া শ্রীভট্টপাদকে শ্রীকৃষ্ণসেবারসে অভিষিক্ত করিলেন।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র।।
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ পূর্ব্বেতে।
রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৮৩-৮৪)

[৪]

শ্রীগোপালের পূর্ব্ব-পরিচয়

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া প্রভুর পাদোদক সবংশে পান করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীব্যেঙ্কটাত্মজ বালক শ্রীগোপাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদোদক পান করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই শ্রীগোপাল বৈষ্ণবপিতার আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবার সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রাচীন মহাজনগণের বন্দনাত্মক একটী উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং ব্যেঙ্কটাত্মজম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৯৮)

নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যেঙ্কট-নন্দন শ্রীগোপাল-ভট্টকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীব্যেঙ্কটাত্মজই যে শ্রীগোপালভট্ট, এরূপ কোন উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ-ভ্রমণ।
চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন।।
গোপাল-ভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়।
ব্যেঙ্কট-ভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায়।।
অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কটতনয়।
প্রভু-পাদোদক-পানে হৈল প্রেমোদয়।।
করয়ে যতন কত, স্থির হৈতে নারে।
বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে।।
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।৮৬-৮৭, ৯০-৯১, ৯৭)

শ্রীগোপালের বাল্যকালেই শ্রীগৌরসেবায় প্রীতি দেখিয়া বৈষ্ণববর শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্ট মহা-উল্লসিত হইলেন। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট শ্রীগোপালের প্রতি নিজ-ভোগ্য পুত্র-বুদ্ধি না করিয়া শ্রীগোপালকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ-সেবায় সমর্পণ করিলেন।

চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্টের আজ্ঞা লইয়া ও শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। প্রভুর বিরহে তিন ভাই ও বালক শ্রীগোপাল অচেতন হইয়া পড়িলেন। বিদায়ের সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগোপালভট্টকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া গেলেন,—"তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারিবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সান্ত্বনা-বাণী শ্রীগোপালের একমাত্র জীবনরক্ষণৌষধি-স্বরূপ হইল। তিনি সর্ব্বক্ষণ এই স্মৃতিতে উদ্ভাসিত থাকিয়া কেবলই মনে মনে বিচার করিতেন,—'কতদিনে শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবেন!' এইরূপ যতই চিন্তা করিতেন, ততই শ্রীগোপাল শ্রীগৌরপ্রেমে আপ্লুত হইতেন।

শ্রীগোপাল শুদ্ধ বৈষ্ণব-পরিবারে আবির্ভূত হইয়া, পরম বৈষ্ণব-পণ্ডিত পিতৃব্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন লাভ এবং স্বগৃহে সাক্ষাৎ সচল জগন্নাথ কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন ও সেবা লাভ করিয়া স্বতঃসিদ্ধরূপেই আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি মায়াবাদাদি অসম্মতবাদসমূহ খণ্ডন এবং ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র জয়ী হইলেন। শিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীগোপালের এই প্রকার যোগ্যতা-দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব মাতা-পিতা পুত্রের এইরূপ ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে শ্রীব্যেঙ্কটভট্টকে বলিয়া যান,—"তোমার এই বৈষ্ণবপুত্র গোপালের প্রতি আমার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে। তুমি ইহাকে সুপণ্ডিত করিবে ও ইহার বিবাহ দিবে না।

গোপালভট্ট, তোমার এই যে কুমার।
মোর অতি কৃপা হয় ইহার উপর।।
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিভা নাহি দিবে, ইহা কহিল তোমারে।।

খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দের প্রতিও শ্রীমন্মহাপ্রভু আর একটী আদেশ করিয়া যান,—

"একবার বৃন্দাবনে পাঠা'বে ইহারে।"

[৫]

শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীব্যেঙ্কট-ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীগোপাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সেবা করিতেছিলেন, সেই সময় প্রভু শ্রীগোপালকে বলিয়াছিলেন,—

"কতদিন পিতামাতার করিয়া সেবন।
পশ্চাতে তুমি তবে, যা'বে বৃন্দাবন।।
বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে।
সেখানে পাইবে সুখ পরম আনন্দে।।"

('কর্ণানন্দ', ৫ম নির্যাস)

'কর্ণানন্দে'র গ্রন্থকার শ্রীযদুনন্দনদাস। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আত্মজা ও শিষ্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর বিশ্রম্ভ-শিষ্য ও গৌড়ীয়-আচার্য্যগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন এই সকল কথা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া 'কর্ণানন্দে' লিখিয়া থাকিবেন।

শ্রীগোপালভট্ট শ্রীবৃন্দবানে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে অবস্থান করিতেন।

শ্রীভট্টগোস্বামি যবে বৃন্দাবনে গেলা।
শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গেই রহিলা।।

(কর্ণানন্দ, ৫ম নির্য্যাস)

শ্রীল গোপালভট্টের শ্রীব্রজে আগমন-বার্ত্তা পত্রের দ্বারা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা জানিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে পত্রের দ্বারা জানাইলেন—

"নিজভ্রাতা সম ভট্ট-গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে।।"

(শ্রীভঃ রঃ ১।১৯০)

কথিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু একজন লোকের দ্বারা পত্রের সহিত শ্রীল গোপাল ভট্টের জন্য স্নেহাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ডোর-কৌপীন-বহির্ব্বাসও পাঠাইয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গোপালভট্ট শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা রঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের সদাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সদাচার-মূলক কোন স্মৃতি-নিবন্ধ তখনও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল সনাতনের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-স্মৃতি-রচনার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ ও উপদেশ শ্রীল গোপালভট্ট শ্রবণ করিতে পাইলেন। ইহাতে ভাবী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের কল্যাণের জন্য একটী বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা শ্রীল গোপালভট্টের হৃদয়ে উদিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীষ্টানুসারে শ্রীসনাতনই গ্রন্থের সঙ্কলন ও তাহার 'দিগ্‌দর্শিনী'-নামক একটী টীকা রচনা করিলেন। কিন্তু শ্রীল গোপালভট্টের সঙ্কল্পিত বলিয়া ও দৈন্যবশতঃ স্বীয় নাম গোপন করিবার উদ্দেশে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল গোপালভট্টের নাম প্রচার করিলেন। হয় ত' মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি শ্রীল গোপালভট্ট প্রভুই রচনা করিয়া উক্ত গ্রন্থের পত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট-মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে।।
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' বর্ণন।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।১৯৭-৯৮)

[৬]

শ্রীগোপালভট্টের সহিত পদাবলী

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'পদ্যাবলী'তে শ্রীল গোপালভট্টপাদের রচিত বলিয়া নিম্নলিখিত শ্রীনামকীর্ত্তনাত্মক শ্লোকটী পাওয়া যায়।

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল!

কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়।।

(শ্রীপদ্যাবলী, ৩৮ শ্লোক)

হে ভাণ্ডীরবনাধিপতে, শিখিপুচ্ছভূষণ, শ্রেষ্ঠ, চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ, বৃন্দাবনেন্দ্র, বিকশিত সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামল, কালিন্দীরমণ, নন্দনন্দন, পরানন্দ, কমলনয়ন, শ্রীগোবিন্দ, কমনীয়দেহ শ্রীমুকুন্দ! দীন আমাকে আনন্দ দান কর।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে, শ্রীল গোপাভট্ট গোস্বামিপ্রভু বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীরাধারমণে নেত্র-মন সমর্পণপূর্ব্বক নিজকৃত উপরি-উক্ত পদবী কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীগোপাল-ভট্ট বসি' আছয়ে নির্জ্জনে।
সমর্পিয়া নেত্র-মন শ্রীরাধারমণে।।
ক্ষণে নিজকৃত-পদ্য পড়য়ে সুস্বরে।
শুনিতে সে নামাবলী কেবা ধৈর্য্য ধরে?

(শ্রীভঃ রঃ ৬।৪০১-২)

শ্রীল গোপালভট্টের রচিত বলিয়া প্রচারিত ও শ্রীল গোপালভট্টের নামের পুষ্পিকা-সংযুক্ত ব্রজভাষায় রচিত শ্রীরাধাগোবিন্দলীলাত্মক কয়েকটী সঙ্গীত পাওয়া যায়। নিম্নে তিনটী গীতের পুষ্পিকা-সংযুক্ত উপান্ত-পদ উদ্ধৃত হইল,—

(১)

"শ্রীগোপালভট্ট-আশ,
বৃন্দাবন-কুঞ্জে বাস,
শয়ন-স্বপন-নয়নে হেরি'
ভুলল মন আপ হেঁ।।"

(২)

"শাঙর-চীত, উনতে নাগিও,
পলকন নারে আঁখি।

যূথ যূথ, মনমথ ঝুলত,

গোপালভট্ট ইথে সাথি।।"

(৩)

"ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি,

কানুক বদন নিতান্ত না হেরলি,

গোপালভট্ট ভণয়ে,

ভামিনী-পীরিতি টুটলো গো।।"

[৭]

শ্রীরাধারমণ-প্রাকট্য

১৪৫৫ শকাব্দের পর শ্রীল গোপালভট্ট ভারতের উত্তরপ্রদেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্য গমন করেন। হরিদ্বারের নিকট সাহারাণপুর জেলায় 'দেববন্দ্য' নামে * এক গ্রামের প্রান্ত দিয়া শ্রীল গোপালভট্ট যখন গমন করিতেছিলেন, তখন সেইস্থানে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সেই গ্রামে 'গৌড়-ব্রাহ্মণ' নামক শ্রোত্রিয়- ব্রাহ্মণ বংশের বাস ছিল। সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক গৃহস্বামী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আনয়নপূর্ব্বক অতিথি- সৎকার করেন এবং তাঁহার ভাবী প্রথম সন্তানটীকে শ্রীগোপালভট্টের নিকট সমর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শ্রীল গোপালভট্ট উত্তরপ্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে গণ্ডকী নদী হইতে দ্বাদশটী শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া আনেন। একদিন শ্রীল গোপালভট্ট শ্রীযমুনায় স্নান সমাপনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে স্বীয় ভজন- কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেখিতে পান,—তাঁহার কুটীরের দ্বারে একটী বালক বসিয়া রহিয়াছেন; পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন,—'দেববন্দ্য' গ্রামে যে ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীল গোপালভট্ট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, উক্ত বালক তাঁহারই পুত্র শ্রীগোপীনাথ। পরে কয়েকজন শ্রেষ্ঠী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর ভজন-কুটীরে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের উপযোগী এ সকল বসনভূষণ শ্রীশালগ্রাম কিরূপে

* অন্যত্র বর্ণিত বিবরণে 'দেববন'-নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয়ের মতে 'দেববন্দ্য'।

পরিধান করিবেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীল গোপালভট্ট রাত্রি যাপন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী দেখিতে পাইলেন —দ্বাদশটী শালগ্রামের মধ্যে একটী শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, দ্বিভুজমুরলীধর, মধুর, ব্রজকিশোর শ্যামরূপে প্রকটিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে শ্রীল গোপালভট্টের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গকে আহ্বান করিয়া শ্রীবিগ্রহের অভিষেক-মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। সম্বৎ ১৫৯৯ (বা ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে এই অভিষেক-মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। গোস্বামিগণ ঐ শ্রীবিগ্রহকে 'শ্রীরাধারমণ' নামে অভিহিত করেন। দেববন্দ্য গ্রামের ব্রাহ্মণ-বালক শ্রীগোপীনাথ ক্রমে পরিণত বয়স্ক হইলে শ্রীল গোপালভট্ট তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারই উপর শ্রীরাধারমণের সেবার ভার অর্পণ করেন। ইনি 'শ্রীল গোপীনাথ পূজারী গোস্বামী' নামে পরবর্ত্তিকালে খ্যাত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদরদাসও ক্রমে দেববন্দ্য গ্রাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীল গোপীনাথের কৃপাভিষিক্ত হইলেন। শ্রীল গোপীনাথ কোন দার পরিগ্রহ করেন নাই। শ্রীদামোদরদাস সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁহারই তিন পুত্র—শ্রীহরিনাথ, শ্রীমথুরানাথ ও শ্রীহরিরাম। ইঁহাদেরই বংশের হস্তে বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবা ন্যস্ত রহিয়াছে। শ্রীগোপালভট্ট শ্রীরাধারমণের সেবার জন্য একমণ গম ও একটী বৃষের বিনিময়ে যে সমস্ত ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকেই 'ঘেরা' বলা হয়।

কোনও কোনও বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীল গোপালভট্টের অভীষ্ট স্বপ্নে জ্ঞাপন করিলে শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুই শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন।

[৮]

শ্রীল গোপালভট্টের শিষ্যবৃন্দ

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে তিনজনের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, তিনি মাত্র এই তিনজন শিষ্যই করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গী শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর কৃপায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীবৃন্দাবনে দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত

হন। অন্য শিষ্য পূর্ব্বোক্ত শ্রীল গোপীনাথ পূজারী গোস্বামী মহাশয়। তৃতীয় শিষ্য শ্রীহরিবংশ কোন কারণে শ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল গোপীনাথ পূজারী গোস্বামী শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ ও হরিবংশ কাশ্যপ গোত্রীয় গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, হরিবংশের বংশীয়দের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে। হরিবংশের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শ্রুত হয়। ঐ কিংবদন্তীর মূল কথা—হরিবংশ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর আচার-বিচার লঙ্ঘন করায় তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দুরভিসন্ধিমূলে হরিবংশের শিষ্য-তালিকার মধ্যে শ্রীগোপালভট্টের নাম (শ্রীগুরুর নাম) প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু শ্রীল গোপালভট্টের ইচ্ছায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া গৌড়দেশে গোস্বামি-গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া সর্ব্বক্ষণ বিপ্রলম্ভ-বিভাজিত চিত্তে তাঁহাদের গুণগাথা কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতেন। শ্রীরাধারমণের শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কখনও নিজকৃত পদ্য পাঠ করিতেন, কখনও শ্রীনামাবলী কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে করিতে অধৈর্য্য হইতেন, কখনও বা 'হরে কৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গলদশ্রু-ধারায় সিঞ্চিত হইয়া রুদ্ধবাক্ হইয়া পড়িতেন।

[৯]

শ্রীগোপালভট্টের স্তবপঞ্চক

'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত স্তবপঞ্চক' নামে প্রচারিত পাঁচটী শ্লোকে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর মহিমা বর্ণিত আছে। 'কর্ণানন্দে'র ৫ম নির্য্যাসে শ্রীযদুনন্দন-দাস উক্ত স্তবপঞ্চক উদ্ধার করিয়া তাহার পদ্যানুবাদ করিয়াছেন; যথা—

"নিরবধি-হরিভক্তিখ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত সদনুভূতির্নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবরগতিসৌভাগ্যেন বিখ্যাতপট্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ।।

ব্রজভুবি গুণমঞ্জর্য্যাখ্যয়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন-করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুররসবিশেযাহ্লাদ-বিস্তারণায়
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ।।

অবিরলগলদশ্রুস্বেদধারাভিরামঃ।
প্রচুরপুলককম্পস্তম্ভ উচ্চার্য্য নাম।।
হ হ হ হ হরিরিত্যাদ্যক্ষরাদ্যোহস্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ।।

ব্রজগতনিজ ভাবাস্বাদমাস্বাদ্য মাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ।
কলিত-কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ।।

বিদিতপদপদার্থঃ প্রেমভক্তে রসার্থ-
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং
পঠতি ভবতি সোহয়ং মঞ্জরীযূথলীনঃ।।

শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা মহোত্তম।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যা'র প্রেম-আলাপন।।
ভট্ট-গোসাঞির স্তব গোস্বামী কৃষ্ণদাস।
তাহাঁতেই এই সব করিলা প্রকাশ।।

নিরন্তর হরিভক্তি-কথনে যা'র শক্তি।
সদা সৎ অনুভব যিহোঁ বিষয়ে বিরক্তি।।
মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যা'র পাট।
কে বুঝিতে পারে সেই চৈতন্যের নাট।।

হেন সে সৌভাগ্য যা'র কহনে না যায়।
যা'র গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায়।।
সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে।
সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে।।

অবিরত গলয়ে অশ্রু যাহার নয়নে।
শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদধারা বহে অনুক্ষণে।।
প্রচুর পুলক-কম্প সদা অনিবার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে তা'তে নামের সঞ্চার।।

'হরে কৃষ্ণ' নামমাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে।
হহ হহ হহ শব্দ করে অবিরতে।।
ইহা বলিতেই যিহোঁ হয় অচেতন।
সেই গোপাল কর মোরে কৃপা-নিরীক্ষণ।।

বৃন্দাবনে খ্যাতি যিহোঁ শ্রীগুণমঞ্জরী।
সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী।।
কলি-নরে কৃপা করি' হৈলা অবতীর্ণ।
মধুররস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ।।

হেন সে মধুর-রসে যাহার আস্বাদ।
বিতরণ-হেতু জীবে করিলা প্রসাদ।।
প্রেমভক্তিরসে যিহোঁ রহে অনিবার।
আস্বাদন কৈলা যিহোঁ অনেক প্রকার।।

আশ্রয়-রতি-রস-ভেদে যিহোঁ হয় সমর্থ।
তাহাতেই পুণ্য যিহোঁ কহিল যথার্থ।।

এ-আদি করিয়া ভট্টগোস্বামি-গুণ-গান।
কবিরাজ গোস্বাঞি তাহা করিলা বর্ণন।।

এই স্তব অখিলের তম দূর করে।
স্তোত্রগণমধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে।।
যেই জন পড়ে ইহা করি' একচিত্তে।
মঞ্জরীর যূথ-প্রাপ্তি হয় আচম্বিতে।।"

[১০]

শ্রীগোপালভট্ট-সম্বন্ধে ভারবাহী ও সারগ্রাহী মত

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার শিক্ষাগুরু ষড়্গোস্বামীর অন্যতমরূপে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার অন্য কোন পরিচয় বা বিবরণ প্রদান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল গোপালভট্টের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে বা 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় শ্রীরঙ্গে ত্রিমল্লভট্টের গৃহে চারিমাস অবস্থানের কথা বর্ণিত হইলেও ঐ-প্রসঙ্গে শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট বা শ্রীব্যেঙ্কটভট্টাত্মজ শ্রীগোপালভট্টের কোন উল্লেখ নাই। যে সংস্কৃত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' শ্রীল মুরারিগুপ্তের নামে প্রচলিত আছে, তাহাতে ত্রিমল্লভট্টের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিমাস অবস্থানের কথামাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথায় শ্রীগোপালভট্ট শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের পুত্র নহেন, শ্রীত্রিমল্লের স্বল্পবয়স্ক পুত্র বলিয়া বর্ণিত।

সুখাসীনং জগন্নাথং ত্রিমল্লাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ।
স্ত্রীপুত্রস্বজনৈঃ সার্দ্ধং সিষেবে প্রেমনির্ভরঃ।।
গোপালনামা বালোঽস্য প্রভোঃ পার্শ্বে স্থিতস্তদা।
তং দৃষ্ট্বা তস্য শিরসি পাদপদ্মং দয়াদ্রধীঃ।।
দত্ত্বা বদ হরিং চেতি সোঽপি হর্ষসমন্বিতঃ।
বাল্যক্রীনাং পরিত্যজ্য কৃষ্ণং গায়ন্ ননর্ত্ত চ।।

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, ৩য় প্রক্রম, ১৫শ সর্গ)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর প্রদত্ত বিবরণে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১।১০৮-১১০ ও মঃ ৯।৮২-১৬৫) ইহাই প্রকাশিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট ও শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতে শ্রীত্রিমল্ল ও শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের মধ্যে তথায় কোন সম্বন্ধের উল্লেখ নাই এবং শ্রীগোপালভট্টের নামও তথায় অব্যক্ত। কেহ কেহ একটি বিষয় বিচার করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ত্রিমল্লভট্টের গৃহে চারিমাস বাস করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপনের কথা আছে। বহরমপুর হইতে প্রকাশিত শ্রীনিত্যানন্দদাস-রচিত 'প্রেমবিলাস' ও মনোহরদাস-রচিত বলিয়া প্রচারিত 'অনুরাগবল্লী'-নামক এক অর্ব্বাচীন মুদ্রিত পুস্তকে শ্রীল গোপাল-ভট্টের প্রসঙ্গ আছে। 'প্রেমবিলাসে' শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের নাম উল্লেখিত নাই এবং শ্রীগোপালভট্ট যে শ্রীত্রিমল্লের পুত্র, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখিত নাই। 'অনুরাগবল্লী'র বর্ণনা শ্রীভক্তিরত্নাকরের অনুরূপ এবং তথায় শ্রীত্রিমল্ল জ্যেষ্ঠ, শ্রীব্যেঙ্কট মধ্যম ও শ্রীপ্রবোধানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ও শ্রীগোপালভট্ট শ্রীব্যেঙ্কটভট্টেরই পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

আধ্যক্ষিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ এইরূপ বিভিন্ন বৈষ্ণব-গ্রন্থের মধ্যে আপাত-সঙ্গতি-রহিত বর্ণনা দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ এইরূপ আপাত-সঙ্গতি-রাহিত্য ভারবাহিগণকে চিরকালই বঞ্চনা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ পরস্পর অসামঞ্জস্যকর বিবরণ পাঠ করিয়া যাহাতে সারগ্রাহীগণ বিভ্রান্ত না হয়, তজ্জন্য শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পাঠকগণকে সতর্ক করিয়াছেন।

শ্রীগোপালভট্টের এ সব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন।।
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তা'র হৃদয়ে সঞ্চারে।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।২০৯-১০)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার প্রাক্কালে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর অনুমতি যাজ্ঞা করিলে শ্রীল গোপালভট্ট শ্রীল

কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুকে উক্ত গ্রন্থ-রচনায় সানন্দে আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক উহাতে স্বীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন (শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।২২২-২৩)। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা অবিচারে পালনীয়, এই বিচারেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর কোন বিবরণই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রদান করেন নাই; এজন্যই শ্রীগোপালভট্ট—শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট বা শ্রীত্রিমল্লভট্টের মধ্যে কাহার পুত্র, কিছুই শ্রীচরিতামৃতে উল্লেখিত হয় নাই। শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা বলিয়া যাহা প্রচারিত, সেই গ্রন্থেরও বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ও তাহাদের পাঠান্তর প্রভৃতি আলোচিত না হইলে কেবল বর্ত্তমানে 'শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা'-নামে প্রচলিত, মাত্র একখানি মুদ্রিত পুস্তকের পাঠের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিবদমান বিষয়-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। উক্ত মুরারিগুপ্তের কড়চায় শ্রীল প্রবোধানন্দেরও কোন প্রসঙ্গ নাই, অথচ 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-নামক একটি অর্ব্বাচীন পুস্তকে (১৭শ অধ্যায়ে) ও লাল-দাসের 'ভক্তমালে' মায়াবাদী প্রকাশানন্দকে প্রবোধানন্দরূপে উক্ত হইয়াছে; "প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁ'র ছিল। প্রভুই প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল।"—(ভক্তমাল, ৩৫৮ পৃঃ, কালিকাযন্ত্র সং, ১৩০৫ সাল)। এই মতবাদ 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' পত্রিকায় (১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যায়) ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ "শ্রীপ্রবোধানন্দ"-শীর্ষক প্রবন্ধে সুযুক্তি ও প্রমাণ-বলে নিরাস করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র ১৩২ শ্লোকে শ্রীপ্রবোধানন্দ 'গৌরনাগরবর'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গৌরনাগরীবাদের তীব্র প্রতিবাদকারী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীল প্রবোধানন্দ বা তাঁহার শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল গোপালভট্টের নাম উল্লেখই করেন নাই। আবার ৪০৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে প্রকাশিত 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'য় লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীল গোপালভট্টের পরিত্যক্ত শিষ্য হরিবংশকে শ্রীল প্রবোধানন্দ আশ্রয় দিয়াছিলেন; এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকগণ বিশেষভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। এই সকল স্বকপোলকল্পনা বা কল্পনাসুলভ কিংবদন্তী হইতে প্রাপ্ত বিবরণসমূহ শ্রীগৌরজনগণ কেহই গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল প্রবোধানন্দ, শ্রীল গোপালভট্ট-প্রমুখ একান্ত বিরক্ত শ্রীগৌর-নিজজনগণ অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ তাঁহাদের কথা গ্রন্থাদিতে প্রচার করিতে বিশেষ-ভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীগোপালভট্ট প্রভুকে যে শ্রীব্যেঙ্কটভট্টাত্মজ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ব্যক্তিগত বিচার নহে। তিনি এতৎসম্বন্ধে প্রাচীন মহাজনগণের পদ উদ্ধার করিয়াছেন; যথা, (শ্রীভঃ রঃ ১।৯৮) "প্রাচীনৈরুক্তম্—

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং ব্যেঙ্কটাত্মজম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে।।"

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শ্রীব্যেঙ্কটনন্দন ও নিজগৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত শ্রীগোপালভট্টকে আমি বন্দনা করি।

নাভাজীকৃত হিন্দি ভক্তমালের 'বার্ত্তিকপ্রকাশ'ও শ্রীল গোপালভট্টকে শ্রীব্যেঙ্কটাত্মজই বলিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে যে একবার শ্রীত্রিমল্লভট্টের গৃহে, আর একবার শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাজনের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট ও শ্রীত্রিমল্লভট্টের গৃহ অভিন্ন এবং ইঁহারা উভয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। একবার এক ভ্রাতার নাম স্মরণ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীত্রিমল্লভট্টের গৃহের উল্লেখ করিয়াছেন, আর একবার আর এক ভ্রাতার নাম স্মরণ করিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহের কথা বলিয়াছেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্বভাবই এই যে, সাধারণ জড় ঐতিহাসিকের ন্যায় তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে শ্রীগুরুবর্গের পিতামাতার পরিচয় প্রদান করেন না। পিতামাতা বৈষ্ণব হইলেও তাঁহারা গুরুবর্গের আদেশে সেইরূপ পরিচয়-প্রদানে বিরত থাকেন। ইহা জড় ঐতিহাসিকগণের বুদ্ধি ও ব্যবহারের অগম্য। কোন কোন ক্ষেত্রে যে তাঁহারা পরিচয় প্রদান করেন, তাহা সাধারণ বিধি নহে।

আধুনিক কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, শ্রীগোপালভট্টের আদি-নিবাস ছিল— দাক্ষিণাত্যের 'ভট্টমারি'-গ্রামে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১।১১২; ৯।২২৪, ২৩১-২৩৩) 'ভট্টমারি'-(প্রকৃত শব্দ 'ভট্টথারি') শব্দের দ্বারা কোন স্থানের নাম নহে, একদল ভণ্ড সাধুর নামই উক্ত হইয়াছে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৯।২২৬-২৩৩ দ্রষ্টব্য)।

[১১]

শ্রীগোপালভট্ট-সম্বন্ধে পদাবলী

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন পদসমূহ পাওয়া যায়; যথা—

সনাতনপ্রেম-পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্।।

(শ্রীভঃ রঃ ১।২০৮)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত বৈষ্ণব-বন্দনায় শ্রীল গোপাল-ভট্ট-সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়,—

সনাতনো ভক্তকৃত্যং গোপালভট্টনামতঃ।
হরিভক্তিবিলাসাদি কৃতবান্ নিরপেক্ষকঃ।।
স গোপালভট্টঃ সনাতননিকটবর্ত্তী হরিগুণরতঃ।
দিবসরজনীং সুখেন যাপয়ামাস মতিমানিহ।।
তদুদিতং প্রভুরূপগুণং নিশম্য গোপালভট্টঃ সততং হি।
আত্মানং ধন্যং খলু মানয়ামাস পরিতো হি যঃ।।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার ষট্সন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীল গোপালভট্টকে 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের বান্ধব দক্ষিণদ্বিজবংশজ ভট্টপাদ'-নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল গোপালভট্ট-সম্বন্ধে শ্রীমনোহরদাসের একটী পদ পাওয়া যায়; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পদ্যাবলীতে (২৭৪ ও ২৭৫ সংখ্যায়) শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এক শ্রীমনোহর-কৃত দুইটী সংস্কৃত পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইনি শ্রীল শ্রীরূপের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বৈষ্ণব কবি হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১১।৪৬, ৫২) এক শ্রীমনোহরের কথা পাওয়া যায়; আর এক শ্রীমনোহর দাসের নাম খেতুরীর মহোৎসবের বিবরণে পাওয়া যায়।

শ্রীগোপালভট্ট প্রভু, তুয়া শ্রীচরণ কভু,
দেখিব কি নয়ন ভরিয়া!

শুনিয়া অসীম গুণ, পাঁজরে বিন্ধিল ঘূণ,
নিছনি নিয়া যাইরে মরিয়া।।
পীরিতে গড়ল তনু, দশবাণ হেম জনু,
চান্দমুখ অরুণ অধর।
ঝলকে দশন-কাঁতি, জিনি' মুকুতার পাঁতি,
হাসি' কহে অমৃত-মধুর।।
পরাণের পরাণ যা'র, রূপ-সনাতন আর,
রঘুনাথযুগল জীবন।
পণ্ডিত কৃষ্ণ লোকনাথ, জানে দেহভেদ মাত্র,
সরবস্ব শ্রীরাধারমণ।।
প্রেমেতে বিথার অঙ্গ, চৈতন্যচরণ-ভৃঙ্গ,
শ্রীনিবাসে দয়ার অধীন।
সভে মেলি' রসাস্বাদ, ভাবভরে উন্মাদ,
এই ব্যবসায় চিরদিন।।
লীলাসুধা-সুরধুনী, রসিকমুকুটমণি,
রসাবেশে গদ গদ হিয়া।
অহো অহো রাগসিন্ধু, অহো দীনজন-বন্ধু,
যশ গায় জগত ভরিয়া।।
হা হা মূর্ত্তি সুমধুর, হা হা করুণার পূর,
হা হা চিন্তামণিগুণখনি।
হা হা প্রভু একবার, দেখাহ মাধুরীসার,
শ্রীচরণকমললাবণি।।
অনেক জন্মের পরে, অশেষ ভাগ্যের তরে,
তুয়া পরিকর-পদ পাঞা।
নিজ করমের দোষে, মজিনু বিষয়-রসে,
জনম গোঙানু খোলি খাঞা।।

অপরাধ পড়ে মনে, তথাপি তোমার গুণে,
পতিতপাবন আশাবন্ধ।
লোভেতে চঞ্চলমতি, উপেখিলে নাহি গতি,
ফুকারয়ে মনোহর মন্দ।।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত পদটীতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর চরিত বর্ণন করিয়াছেন,—

আরে মোর প্রেমালয়, পরম করুণাময়,
শ্রীগোপালভট্ট ভূ-মাঝার।
সকল সদ্‌গুণখনি, বিপ্রবংশ-শিরোমণি,
শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের কুমার।।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় যতি, অদ্ভুত ভজন-রীতি,
জগতে বিদিত কীর্ত্তি যা'র।
অল্পকালে মহাভক্তি, কে বুঝিতে পারে শক্তি,
সদা কৃষ্ণরসে মাতোয়ার।।
দক্ষিণ-ভ্রমণকালে, প্রভু চারিমাস ছলে,
ত্রিমল্ল-ব্যেঙ্কট-গৃহে স্থিতি।
তথা নিজনাথে পাঞা, পরম-আনন্দ হঞা,
পিতার আজ্ঞায় সেবে নিতি।।
শচীসুত গৌরহরি, পরম করুণা করি'
প্রিয় ভট্ট-গোপালের তরে।
প্রেমামৃত পিয়াইয়া, নিজতত্ত্ব জানাইয়া,
ভাসাইল আনন্দ-সাগরে।।
পুনঃ প্রভু গৌরহরি, ভট্টের করেতে ধরি'
কহে কিছু মধুর বচন।
তুয়া প্রেমাধীন আমি, শীঘ্র ব্রজে যা'বে তুমি,
তাহাঁ পা'বে রূপ-সনাতন।।

শুনিয়া প্রভুর বাণী, বিচ্ছেদ হইবে জানি'
তিলেক ধৈরয নাহি বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে কথা, সদাই অন্তরে বেথা,
ও রাঙ্গা চরণে পড়ি' কান্দে।।
পুনঃ প্রভু গৌরহরি, প্রিয় ভট্টে কোলে করি'
সিঞ্চিয়া শ্রীনয়নের জলে।
কতরূপে প্রবোধিয়া, ভট্টমুখ-পানে চাইয়া
কাতর-অন্তরে প্রভু চলে।।
শ্রীব্যেঙ্কট-ত্রিমল্লেরে আশ্বাসিয়া বারে বারে
দক্ষিণ-ভ্রমণে প্রভু গেলা।
এথা কথোদিন পরি, গৃহসুখ পরিহরি'
শ্রীগোপালভট্ট ব্রজে আইলা।।
প্রভু আসি' পুরুষোত্তমে, যবে গেলা বৃন্দাবনে,
তাহাঁ হইতে আসিবার কালে।
পথে রূপ-সনাতনে, শিক্ষা দিয়া দুই জনে,
তবে প্রভু গেলা নীলাচলে।।
রূপ আর সনাতন, যবে আইলা বৃন্দাবন,
ভট্ট-গোসাঞি মিলিলা সভায়।
প্রভু-প্রিয় লোকনাথ, মিলিলা সভার সাথ,
সভে মেলি' গৌরগুণ গায়।।
নীলাচলে গৌরাঙ্গ, বিহরে ভকত-সঙ্গ,
শুনিলা, শ্রীভট্ট ব্রজে গেলা।
মহাপ্রভু প্রেমভরে, শ্রীগোপালভট্ট-তরে,
ডোর-বহির্ব্বাস পাঠাইলা।।
সভাসহ সনাতন, ডোর-বহির্বাস-ধন
পাইয়া আনন্দ উথলিল।

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ প্রেমে গড়ি' যায়,
চারিদিকে ক্রন্দন উঠিল।।
কথোক্ষণে স্থির হৈয়া, ডোর-বহির্বাস লৈয়া,
সমর্পিলা গোপালভট্টেরে।
ডোর-বহির্বাস-ধন, পাইয়া আনন্দ-মন,
নিয়ম করিয়া সেবা করে।।
গৌরাঙ্গের গুণগানে, দিবানিশি নাহি জানে,
শ্রীরূপসভায় সদা স্থিতি।
গোসাঞি শ্রীসনাতন- সঙ্গে সুখ অনুক্ষণ,
কে বুঝিবে তাহার পীরিতি।।
গোসাঞির বৈরাগ্য যত, তাহা বা কহিব কত,
যা'র প্রেমাধীন জানাইতে।
শ্রীরাধারমণ-লীলা, আপনে প্রকট হৈলা,
শালগ্রাম-শিলাতে হইতে।।
শ্রীরাধারমণ-বিনে অন্য কিছু নাহি জানে,
শ্রীরাধারমণ প্রাণ যা'র।
সদা গৌরগুণে মত্ত, বাখানে ভকতি-তত্ত্ব,
হেন কি বৈরাগ্য হয় আর।।
সদা বাস বৃন্দাবনে, কভু কুণ্ড, গোবর্দ্ধনে,
কভু বরষাণ নন্দীশ্বরে।
কভু বা যাবটে গিয়া, পূর্ব্ব-বাস নিরখিয়া,
ভাসে মহা-আনন্দসায়রে।।
শ্রীগোকুল-মহাবনে, কভু রহে সুনির্জ্জনে,
কভু প্রিয় লোকনাথ পাশ।
এইরূপে ফিরে রঙ্গে, স্নেহ ব্রজবাসি-সঙ্গে,
ভক্তিদানে পরম উল্লাস।।

গুণ কি বর্ণিব আর, কৃপা কর এইবার,
শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভু।
নরহরি অকিঞ্চন, ও পদে সঁপিল মন,
এ অধমে না ছাড়িবা কভু।।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন,—

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপাল-ভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী।।
(শ্রীগৌঃ গঃ, ১৮৪ শ্লোক)

যিনি ব্রজে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী ছিলেন, তিনিই বর্ত্তমানে শ্রীগোপালভট্ট। কেহ কেহ ভট্টগোস্বামীকে শ্রীগুণমঞ্জরী বলিয়া থাকেন।

[১২]

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“শুদ্ধ শৃঙ্গাররসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রতি ছিল।” (জৈবধর্ম্ম, ৩৯শ অধ্যায়)। “তিনি শ্রীরূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার ও ভক্তিস্মৃতি প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন” (শ্রীসজ্জন-তোষণী ২।৭)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু বৈষ্ণবস্মৃতি ‘শ্রীহরিভক্তিবিলাস’ সঙ্কলন করেন। বর্ত্তমান “শ্রীহরিভক্তি-বিলাস শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়” (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ)। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রত্যেক বিলাসের শেষে যে পুষ্পিকা আছে, তাহা দেখিয়া এই গ্রন্থ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর লিখিত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। গদাধরের ‘কালসার’-নামক স্মৃতি-গ্রন্থের (Bibliotheca Indica Ed., Calcutta) ১১৮, ১৪০, ১৬৫ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (শ্যামাচরণ কবিরত্ন-সম্পাদিত সংস্করণ, কলিকাতা) ৯০৫, ৭৯৪, ৮৯৫ ও ৮৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা হইতে এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ‘একাদশীতত্ত্ব’ প্রভৃতিতে ‘হরিভক্তি’ নামক এক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের ৩৯শ সংখ্যায় তপ্তমুদ্রাধারণ-প্রসঙ্গে একটি কারিকায় 'শ্রীব্যেঙ্কটাচার্য্যপাদে'র নাম উল্লেখিত হইয়াছে, যথা,—

বহুশ্চ বেঙ্কটাচার্য্যপাদ-প্রভৃতিভির্বুধৈঃ।
শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়োঽপ্যত্র বিখ্যাতা লিখিতাঃ পরাঃ।।

ইহার টীকায় এইরূপ আছে,—"ব্যেঙ্কটাচার্য্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনো মুখ্যতমাস্তদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতিস্মৃত্যভিজ্ঞৈঃ।"

P. V. Kane-এর History of Dharmasastra-পুস্তকে (Vol. I, P. 745) নিম্নলিখিত পাঁচজন ব্যেঙ্কটাচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে,—

ব্যেঙ্কটাচার্য্যঃ—(১) শতক্রতু তাতাচার্য্যের পুত্র, 'আচার্য্যগুণাদর্শ'-গ্রন্থকর্ত্তা; (২) 'প্রণবদর্পণ'-গ্রন্থের রচয়িতা; (৩) 'সন্ধ্যা-ভাষ্য'-রচয়িতা; (৪) হারীতগোত্রীয় রঙ্গনাথের পুত্র। ইনি 'অশৌচদশকে'র টীকা, অশৌচশতক বা অঘনির্ণয়, গৃহ্যরত্ন ও উহার টীকা বিবুধকণ্ঠভূষণ, পিতৃমেঘসার ও উহার টীকা—প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতকের পরবর্ত্তী।

উড়িষ্যার মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭ খৃঃ-১৫৪০ খৃঃ) 'সরস্বতী-বিলাস'-নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই গ্রন্থের কয়েকটি পুঁথিও পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 'সরস্বতী-বিলাস'- নামের অনুসরণে 'শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস' 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' নামকরণ হয়।

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়ান-গ্রাম-নিবাসী দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ বঙ্গভাষায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পদ্যানুবাদ করেন। পুঁথির লিপিকাল ১২৩৭ (বঙ্গাব্দ?)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় কানাই দাস রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বঙ্গভাষায় সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি (১২৩১ নং পুঁথি) আছে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণবল্লভাটীকার রচয়িতা কে?—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১।২২৮) ও 'অনুরাগবল্লী'-নামক একটী অর্ব্বাচীন পুস্তকে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এক টিপ্পনীর কথা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'কৃষ্ণবল্লভা'-নামে যে টীকা শ্রীগোপালভট্টের রচিত বলিয়া পাওয়া যায়, তাহা কি ষড়্গোস্বামীর অন্যতম

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর রচিত? এই টীকায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের কোন নমস্কার নাই। ইহার প্রথম শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণবন্দনা এবং দ্বিতীয় শ্লোকটীতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় আছে,—

কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জরঃ।।

ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণবল্লভার টীকাকার দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, জানা যায়। ঐ টীকার উপসংহারে টীকার এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

শ্রীমদ্দ্রাবিড়নীবৃদম্বুধিবিধুঃ শ্রীমান্নৃসিংহোঽভবদ্-
ভট্টঃ শ্রীহরিবংশ উত্তমগুণগ্রামৈকভূস্তৎসুতঃ।
তৎপুত্রস্য কৃতিস্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নো মুদং
গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোঽলিনঃ।।

অতএব শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণবল্লভা-টীকাকার শ্রীগোপালভট্ট দ্রাবিড়বাসী শ্রীহরিবংশ-ভট্টের পুত্র ও শ্রীনৃসিংহ ভট্টের পৌত্র। উক্ত টীকার পুষ্পিকায়ও এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"ইতি শ্রীদ্রাবিড়হরিবংশভট্টৈকচরণশরণ-গোপাল-ভট্ট-বিরচিতা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতটীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা।"

এইরূপ কোন পুষ্পিকা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণবল্লভা টীকায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীধরস্বামিপাদকৃত শ্রীভাবার্থ-দীপিকা-টীকা, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুকৃত শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীপদ্যাবলী এবং শ্রীল রামানন্দ রায় প্রভুর জগন্নাথবল্লভ-নাটক প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রমাণ-বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র কোন টীকা রচনা করিয়া থাকিলে তদনুগত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীকর্ণামৃতের 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' টীকায় উহার নামোল্লেখ করিতেন বলিয়াই মনে হয়। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকার নাম বা ঐ টীকাধৃত কোন শ্লোকাদি শ্রীভক্তিরত্নাকরে উল্লেখিত হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা'-টীকাকার শ্রীগোপালভট্ট

নিশ্চয়ই ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু নহেন। অধ্যাপক অফ্রেতের তালিকায় (Vol I, p 161) কয়েকজন শ্রীগোপালভট্টের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-ঘেরার স্বধামগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের গ্রন্থাগারে শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতির 'শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী'-নামসংযুক্ত পুষ্পিকার সহিত 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা'-নাম্নী টীকার একটি হস্তলিখিত পুঁথি আমরা দর্শন করিয়াছি। উহার আদ্যশ্লোক এইরূপ,—

"কন্দর্পকন্দকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঽস্তু তে।
গোপীজনবল্লভায় স্বানুরক্তাত্মহারিণে।।
শ্রীমদ্‌গোপালতাপনী-শ্রুতেষ্টীকাং শুভাবহাম্।
কুর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।।"

উপান্ত-শ্লোক ও পুষ্পিকা এইরূপ,—

"গান্ধর্ব্বীবরগান্ধর্ব্বা-গন্ধবন্ধুর-শর্ম্মণে।
বৃন্দাবনাবনীবৃন্দনন্দিনে নন্দিতাত্মনে।।

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-প্রকাশিতায়াং শ্রীশ্রীগোপালতাপনীয়োপনিষট্টীকায়াং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাখ্যায়ামুত্তরভাগটীকা সমাপ্তা।"

পূর্ব্বোক্ত হরিবংশ-ভট্টের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভা-টীকাকার শ্রীগোপালভট্টের রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী'র 'রসিকরঞ্জনী' টীকা ও আর একটি 'সময়কৌমুদী' বা 'কালকৌমুদী'-নামক এক স্মৃতিগ্রন্থ। রুদ্রের 'শৃঙ্গারতিলকে'র কাব্যমালা-সংস্করণে (৩য় গুচ্ছক, ১১ পৃষ্ঠার পাদটীকা) শৃঙ্গারতিলকের শ্রীগোপালভট্টকৃত 'রসতরঙ্গিণী' নাম্নী অসম্পূর্ণ টীকার কথা উল্লেখিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ টীকার কোন পুঁথি যাওয়া যায় নাই।

উক্ত 'রসিক-রঞ্জনী' টীকা ও 'সময়কৌমুদী'র আদিম ও অন্তিম শ্লোকে এবং পুষ্পিকায় 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা' টীকার অনুরূপই গ্রন্থকারের পরিচয় আছে। যথা,—

"শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা।
ক্রিয়তে রসমঞ্জর্য্যাষ্টীকা রসিক-রঞ্জনী।।

ইতি হরিবংশভট্টৈকচরণশরণ-গোপালভট্টকৃতা রসমঞ্জরী-টীকা 'রসিকরঞ্জনী' সমাপ্তা।

শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্বণা।
ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ রম্যা সময়কৌমুদী।।

'ইতি শ্রীহরিবংশ-ভট্টচরণশরণ-শ্রীগোপালভট্টকৃতা কালকৌমুদী সমাপ্তা।'

কালকৌমুদী-স্মৃতিগ্রন্থ সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে লিখিত। ইহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক সদাচার, দীক্ষা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত এবং শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য শুভকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যদি ইহা ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর লিখিত হইত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কৃষ্ণবল্লভাটীকা, রসমঞ্জরীর রসিক-মঞ্জরী টীকা ও কালকৌমুদীর লেখক ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতমই হইতেন, তাহা হইলে মনে হয়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহাদের কোন-না-কোন একটীর নাম উল্লেখ করিতেন।

পুণা ভাণ্ডারকার প্রাচ্যবিদ্যামন্দিরে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের আর একটী টীকার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ঐ টীকার নাম 'শ্রবণাহ্লাদিনী'। ইহার একটি প্রারম্ভিক-শ্লোকে টীকাকারের গুরুর নাম 'নারায়ণ' ও একটি উপান্ত শ্লোকে পিতার নাম 'ভদ্দন্‌ফণা' (?) বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ইনি 'শ্রীরাধারমণাঙ্ঘ্রি-সক্ত-মনসা গোপালভট্টেন' এইরূপ বাক্য উল্লেখ করায় শ্রীরাধারমণের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামী বলিয়া আপাত বিচার হয়।

পুঁথির একটি উপান্ত-শ্লোকে ইনি সুহৃৎ শ্রীবনমালিদাস ও অনুজ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের প্রীতির জন্য টীকা লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ইনি শ্রীকর্ণামৃতের বঙ্গীয় পাঠ অনুসরণ করিয়া টীকা লিখিয়াছেন এবং ইহাতে শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই টীকা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের প্রচারের পর লেখা হইয়াছে; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ষট্‌সন্দর্ভের কারিকা—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বমি-প্রভু কেবল যে বৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মুখোদ্‌গীর্ণ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচারসমূহ শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন-শাস্ত্রের একটী 'কড়চা' বা কারিকা-গ্রন্থও রচনা

করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'ষট্সন্দর্ভ' বা 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' রচনা করিয়াছেন। ইহা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার ষট্সন্দর্ভের প্রত্যেক সন্দর্ভের উপক্রমে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে।।
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ।।"

'তত্ত্বসন্দর্ভ'-নামক প্রথম সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নামের সহিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণের নামও উক্ত হইয়াছে; যথা—

"কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজ-বংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।।"

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় লিখিয়াছেন,—"তয়োঃ—রূপসনাতনয়োর্বন্ধুঃ—গোপালভট্ট ইত্যর্থঃ; বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ—শ্রীমধ্বাদিভির্লিখিতাদ্ গ্রন্থাৎ।"

বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক যে-সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনপ্রভুর বান্ধব দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণবংশজ শ্রীল গোপালভট্টপাদ যে কড়চাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কোনস্থলে ক্রমানুসারে কোথাও বিপরীতক্রমে, কোথাও বা খণ্ডিতভাবে শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তসমূহ সংগৃহীত ছিল। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমনিবন্ধনপূর্ব্বক 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' রচনা করেন। অতএব শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুই 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভে'র সংক্ষেপ-রচয়িতা বা ষট্সন্দর্ভের আকররূপে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর 'কড়চা' বা কারিকাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সৎক্রিয়াসারদীপিকা—শ্রীমদ্ গোপালভট্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণগণের আজ্ঞাক্রমে একান্ত গোবিন্দোপাসক গৃহস্থ, ব্রাহ্মণাদি ও অন্যান্য বর্ণসঙ্করকুলে আবির্ভূত ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্য 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' নাম্নী বৈদিকী বিবাহাদি-সংস্কারপদ্ধতি সংস্কৃত গদ্য ও

পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' প্রায়শঃ ধনী বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের কর্ত্তব্যাদি লিখিত হইলেও তাহাতে বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের কথা নাই। শ্রীঅনিরুদ্ধভট্ট, শ্রীভীমভট্ট ও শ্রীগোবিন্দভট্ট কর্ম্মিগণের জন্য বৈদিকী পদ্ধতি-সমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণভট্ট মহাকর্ম্মশালিগণের জন্য ও শ্রীভবদেবভট্ট সামবেদীয় কর্ম্মিগণের জন্য বৈদিকী পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ও অন্ত্যজ-বর্ণে আবির্ভূত শ্রীগোবিন্দ-ভক্তগণের জন্য বেদ, পুরাণ ও মন্বাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যসমূহের দ্বারা সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বিচার-পূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চন বর্জ্জন করিয়া এই পদ্ধতি-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; অর্থাৎ ইহাতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি বা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চনাদির বিধি নাই। যাঁহারা অনন্যশরণ একান্ত গোবিন্দোপাসক, সেই সকল বর্ণাশ্রমীর ও অন্ত্যজাদি কুলে আবির্ভূত গৃহস্থ-ভক্তগণের পিতৃশ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম বা অন্য দেবতার অর্চ্চন শাস্ত্রে কোথাও বিহিত হয় নাই; বরং যদি তাঁহারা ঐ সকল অনুষ্ঠান করেন, তবে তাঁহাদের সেবাপরাধ ও নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারাই পিতৃদেবগণের আনুষঙ্গিকভাবে পূজা হইয়া থাকে *। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনেই পূজায় সর্ব্ব-সম্পূর্ণতা লাভ হয়। এই গ্রন্থে সাধারণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসের অর্থ, বিবাহের পূর্ব্বকৃত্যসমূহ, স্মার্ত্ত-নান্দীমুখশ্রাদ্ধ-নিষেধ, মহাব্যাহৃতিহোম, বিবাহ, উত্তরবিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, হোম, ব্রহ্মচারিকৃত্য, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক এইরূপ,—

"বক্তি গৃহিদ্বিজাদীনামনন্যানাং বিশেষতঃ।
পদ্ধতিং তাং বিবাহাদেঃ সৎক্রিয়াসারদীপিকাম্।।
শ্রীমদ্গোপালভট্টোঽহং সাধুনামাজ্ঞয়া ভৃশম্।
ভগবদ্ধর্ম্মরক্ষার্থং ভক্তানাং বৈদিকী তু যা।।"

ইহার টীকায় স্বয়ং গ্রন্থকারের উক্তি এইরূপ,—"নন্বপরগ্রন্থকারবদ্ গ্রন্থ-কর্ত্তৃত্বেনাস্মদ্বিধস্য স্বনাম নিবদ্ধুমনুচিতম্, 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'

* শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্নের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবার্চ্চনবিধি দৃষ্ট হয়। স্বতন্ত্রপূজা সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইতি দোষশ্রবণভয়াৎ, তথাপি স্বযূথ্যানাং সাধূনামাজ্ঞয়া স্বনাম নিবদ্ধম্,—শ্রীমদ্গোপালভট্টনামায়ং কোঽপি জীবঃ। শ্রীমদ্গোপালভট্টত্বেন জ্ঞাপিতং (যদয়ং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণারবিন্দ-মকরন্দ-সতত-পায়িত্বেন সদৈব সাধুনিদেশবর্ত্তীতি।।"

"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি 'আমি—কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে"—শ্রীগীতোক্ত এই বাক্য হইতে শ্রুত অপরাধের ভয়ে সাধারণ গ্রন্থকারের ন্যায় গ্রন্থকাররূপে আমাদিগের নিজনাম উল্লেখ করা অনুচিত। তথাপি নিজসম্প্রদায়ী সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে নিজনাম প্রদত্ত হইল। এই ব্যক্তি 'শ্রীমান্ গোপালভট্ট'-নামক কোন এক জীব। ইনি সতত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্মের সুধাপানকারী বলিয়া সর্ব্বদাই সাধুদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী,—এই ভাব শ্রীমদ্গোপালভট্টপদের দ্বারা সূচিত হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Notices of Sanskrit Mss. -পুস্তক (2nd Series, Vol. I., P. 397, No. 395; Vol. II., P. 209-10, No. 235) 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'র দুইটি পুঁথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সংস্কার-দীপিকা সৎক্রিয়াসার-দীপিকারই অঙ্গীভূত। শাস্ত্রি-মহাশয়ের অসম্পূর্ণ -এর মধ্যে তাহা উক্ত হয় নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন হইতে 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা'র প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি স্বহস্তে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শ্রীহস্ত-লিখিত পুঁথি আমরা দর্শন করিয়াছি। তিনি ঐ পুঁথি হইতেই 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় ১৫শ-১৭শ খণ্ডে (ইং ১৯০৩-১৯০৯) ঐ গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত করান।

'শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা'-ধৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের একটি তালিকা নিম্নে বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত হইল,—

অঙ্গিরা, অথর্ব্ববেদ, অথর্ব্ববেদোক্ত-শ্রীনারায়ণোপনিষদৎ, অনিরুদ্ধভট্ট, অর্চ্চন-পদ্ধতি, উত্তরগীতা (মহাভারত-ভীষ্মপর্ব্বে), ঋক্সামাথর্ব্বযজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদীয়-কৃষ্ণোপনিষৎ, কপিল-পঞ্চরাত্র, কৃষ্ণোপনিষৎ (ঋগ্বেদীয়), গায়ত্রী বা সাবিত্রী (ঋক্সামাথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও তৈত্তিরীয়ারণ্যক), গীতা, গৃহ্যবচন, গোবিন্দানন্দভট্ট, ছন্দোগাঃ, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, তৈত্তিরীয়ারণ্যক, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, দেবীপুরাণ, দ্রাবিড়ীয়াঃ, নারদীয়-পুরাণ, নারসিংহ, নারায়ণ-

ভট্ট, নারায়ণোপনিষৎ (অথর্ব্ববেদীয়), পাণ্ডবগীতা, পাদ্ম, পুরাণান্তর, বশিষ্ঠ-সংহিতা, বিষ্ণু, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বিষ্ণুযামল-সংহিতা, বিষ্ণুরহস্য, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ, বৃহন্নারদীয়, বেদান্ত, বৈষ্ণবী গায়ত্রী, ব্যাসদেব, ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবদেবভট্ট, ভাগবত, ভারত, ভীমভট্ট, মনু, মন্বাদ্যষ্টাদশ-ধর্ম্মশাস্ত্র, মহাভারত (সনৎসুজাতোক্তি, হরিবংশ ইত্যাদি), রামায়ণ, রুদ্রযামল, শতপথ-ব্রাহ্মণ, শৌনক, শ্রুতি, ষড়্‌দর্শন, সম্মোহন-তন্ত্র, সামযজুর্ব্বেদাদ্যুক্ত-শ্রীপুরুষ-সূক্তমন্ত্র, সামবেদ, স্কন্দপুরাণ, স্কান্দ (রেবাখণ্ড, শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ, সেতুখণ্ড ইত্যাদি), হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, হরিবংশ, হারীত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত (ঋগ্বেদ)।

সংস্কারদীপিকা—সাম্প্রদায়িক ও তান্ত্রিক বৈষ্ণব, গৃহী ও সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা, দশনামী ব্রহ্মসন্ন্যাসী, পরমহংস অবধূতের মহিমা, বৈষ্ণবী দীক্ষায় বিপ্রত্বলাভ, স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, একান্ত শরণাগত শূদ্রাদিকুলোৎপন্ন ব্যক্তিরও বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-ব্যবস্থা, সন্ন্যাসের সংস্কার, ক্ষৌর-সংস্কার, তীর্থস্নান, হরিমন্দির-তিলক, নাম-মুদ্রাধারণ, কৌপীন-শুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, নাম-করণ, বিষ্ণুমন্ত্র-ধারণ, অচ্যুতগোত্র-স্বীকার, শালগ্রাম-অর্চ্চন ও সমাধিমন্ত্র অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের স্বধাম-গমনে কৃত্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে এইরূপ উপান্ত-শ্লোক দৃষ্ট হয়—

সংস্কারদীপিকা নাম্নী সন্ন্যাসার্থং সতাং মতা।
নির্ম্মিতা গৌরদাসানামেকান্তধর্ম্মসিদ্ধয়ে।।

পুষ্পিকা এইরূপ—"ইতি শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিকৃতা সৎক্রিয়াসার-দীপিকান্তর্গতা সংস্কারদীপিকা সমাপ্তা।"

মুদ্রিত 'সংস্কারদীপিকা'য় নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও পাত্রের নাম বা প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—

ঋক্‌পরিশিষ্ট, গীতা, পাদ্মোত্তরখণ্ড, ভাগবত, যাজ্ঞবল্ক্যাদি-কৃত-পদ্ধতি, বৈরাগ্যখণ্ড, স্মৃতি, অদ্বৈত, উদয়নাচার্য্য, কৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, কৈশ্চিৎ, গদাধর, চুল্লীভট্ট, দামোদর, নিত্যানন্দ, প্রাচীনৈঃ, মধ্বাচার্য্য, মাধবী বৈষ্ণবী, রঘুনাথদাস গোস্বামী, রামানুজাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীবাস, হরিদাস, হরিভক্তিবিলাসকৃৎ।

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীসঙ্কেতে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর ভজনকুটীরের সন্নিহিত প্রদেশের এক অতিবৃদ্ধ ব্রজবাসীর (বর্ত্তমানে স্বধামগত) নিকট হইতে

'সংস্কার-দীপিকা'র বঙ্গাক্ষরে লিখিত, স্থানে স্থানে জীর্ণ একখানা পুঁথি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকার ১৭শ বর্ষে (বঙ্গাব্দ ১৩১৫, খৃষ্টাব্দ ১৯০৮-৯) 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'র পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত 'সংস্কারদীপিকা'য় কোন মঙ্গলাচরণ বা নমস্ক্রিয়া নাই। কিন্তু এই পুঁথিতে নিম্নলিখিতরূপ মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোক ব্যতীতও ইহাতে মধ্যে মধ্যে বহু নূতন মূল-শ্লোক ও প্রমাণ-শ্লোক আছে।

মঙ্গলাচরণ ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে স্বাভিলাষপ্রদায়কম্।
নিত্যানন্দাখ্যং-রামঞ্চ নৌমি তৎপার্শ্ববর্ত্তিনম্।।
যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভো [ঃ] * * * ।
যন্মতালম্বিনা [বেত্তৌ] দ্বৌ শ্রীরূপ-সনাতনৌ।।
শ্রীজীবরঘুনাথৌ শ্রীভট্টাখ্য-রঘুনাথকঃ।
তেযামাদেশতঃ শ্রীমদ্‌গোপাল-ভট্টনামিন [।] ।
গোস্বামিনা কৃতা যত্নাৎ সৎক্রিয়াসারদীপিকা।।
শ্রীমদ্রামানুজাদীনাং মতমালোচ্য সর্ব্বশঃ।
শ্রীমন্মাধবসম্প্রদায়-শিষ্টার্থমনুকম্পয়া।।
তদন্তঃ-পাতিতা যেয়ং নাম্না সংস্কার-দীপিকা।
তন্যতে গোপীভৃত্যেন সাধূনামর্থযাজ্ঞয়া।।
তস্যাং যদুচ্যতে কৃত্যং কুর্য্যাস্তৎ সাম্প্রদায়িকম্।
উত্তরাত্যো দাক্ষিণাত্যো দ্বিভেদঃ সাম্প্রদায়িকঃ।।
মাধ্ব-রামানুজাদ্যাঃ স্যুরুত্তরাত্যা হি পূর্ব্বতঃ।
ক্রমানুসারি তৎসর্ব্বং বিবিচ্য লিখ্যতে ময়া।।

* * *

এবমাদীনি ভূরীণি নিষিদ্ধবচনানি বৈ।
শ্রূয়ন্তে সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ সমাধানং ভবেৎ কথম্।।

* * *

অতোঽত্র সর্ব্ববর্ণানামুপচারাৎ প্রকল্প্যতে।।
উপচারাত্মকং বাক্যং বিবিচ্য চ প্রতন্যতে।
সমঞ্জসপরং যদ্‌যৎ তদপ্যত্র বিলিখ্যতে।।

গ্রন্থমধ্যে "শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণসংজ্ঞকান্ .... শ্রীলাদ্বৈতং গদাধরং শ্রীবাসং ভক্তবর্য্যকম্।" —এইরূপ শ্রীগুরুপরম্পরার উল্লেখকালে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পুঁথিতে অধিক দৃষ্ট হয়; এই শ্লোকটি মুদ্রিত গ্রন্থে নাই।

শ্রীসনাতনরূপৌ শ্রীভট্টরঘুনাথকম্।
ভট্টগোপালসংজ্ঞং শ্রীজীবাখ্যং রঘুনাথকম্।।

উক্ত শ্লোকটি গ্রন্থকারের অথবা লিপিকরের, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

পুঁথির শেষে এইরূপ উপসংহার ও পুষ্পিকা আছে,—

"সংস্কারদীপিকা নাম্নী সন্ন্যাসার্থং সতাং মতা।
নির্ণীতা গোপীভৃতেন সদানন্দপ্রমোদনী।।"

ইতি সৎক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গতা সংস্কার-দীপিকা সমাপ্তা।।

এই পুষ্পিকার পরে পুঁথিতে চারি-সম্প্রদায়ের ধাম-ক্ষেত্র প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে ইহা নাই; যথা—

* * *

"ক্ষম্যতাং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ।।

* * *

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যং গুরুং নত্বা যথামতি।
তৎসাম্প্রদায়িকং ধামক্ষেত্রাদিশ্চ নিরূপ্যতে।।

* * *

নিমানুজং (?) গুরুং বন্দে যৎপাদস্মরণাদহম্।
তৎসাম্প্রদায়িকং ধামক্ষেত্রাদ্যং হি নিরূপ্যতে।।

* * *

মধ্বাচার্য্যং গুরুং নৌমি যৎপাদাশ্রয়ণাদহম্।
তৎসাম্প্রদায়িকং ধামক্ষেত্রাদীন্ কথয়ামি তে।।

* * *

ইত্যেবং শ্রীল-মধ্বস্য সংপ্রদার্হং পরং মহৎ।
ধামক্ষেত্রাদিকং সর্ব্বং সারতঃ পরিকীর্ত্তিতম্।।
ইতি গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।”

সঙ্কেতের উক্ত পুঁথির বর্ণনানুসারে জানা যায়, সৎক্রিয়াসারদীপিকা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দের অভীষ্টানুসারে ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামিপ্রভুরই রচিত। কিন্তু সংস্কার-দীপিকার আদিম ও অন্তিম শ্লোকে ‘গোপীভৃত’ বা ‘গোপীভৃত্য’-ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ভণিতায় লিখিত ‘গোপীভৃত’ বা ‘গোপীভৃত্য’ শব্দদ্বয় কি নাম, অথবা বিশেষণ, অথবা প্রচ্ছন্ন নাম?

উপসংহারে আমরা শ্রীশ্রীরাধারমণৈকজীবন শ্রীশ্রীরূপসনাতনের বান্ধববর শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মরেণুগণের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা যেন ভারবাহিগণের বিচারে বিমোহিত না হইয়া সারগ্রাহী বৈষ্ণববৃন্দের সেবোন্মুখবিচার বরণ করিতে পারি। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১০।১০৫) বলিয়াছেন,—

“শ্রীগোপালভট্ট—একশাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে—যাঁ'র প্রেম-আলাপন।।”

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপের গণ; ইহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীমথুরায় শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে সপরিকরে শ্রীরূপের শ্রীগোপাল-দর্শন-প্রসঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন। তথায় শ্রীরূপের নিজগণের যে নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর নামই সর্ব্বপ্রথম (শ্রীচৈঃ চঃ ঃ ১৮।৪৯)। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাসমূহ শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের দর্শন ও স্মৃতির রত্নমঞ্জুষা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদাব্জভৃঙ্গ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শিক্ষাশিষ্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মিত্ররূপে নিজ শ্রীরূপানুগবরত্বই আচার ও প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামি

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের 'শ্রীলঘুতোষণী'-টীকায় লিখিয়াছেন,—

যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্ম্মি-নিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভা-ভরমতীত্যৈবানয়োর্ভ্রাজতো-
স্তুল্যস্তত্ত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ।।

'শ্রীল রঘুনাথদাস'-নামক মহাজন তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের) মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে সঞ্চরণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপমার প্রভারাশিকে ম্লান করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় শোভমান ছিলেন। ত্রিভুবনে সজ্জন-শ্রেষ্ঠগণ শ্রীল রঘুনাথকেও সেই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের তুল্যতত্ত্বরূপে সবিস্ময়ে পূজা করিতেন।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীল শিবানন্দ সেনের শ্রীমুখোক্ত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্।।
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাদিকৃষ্টপচ্যা
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ।।

—(শ্রীচৈঃ চঃ নাঃ ১০।৩-৪)

(কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য; তাঁহার শিষ্যই—শ্রীল রঘুনাথ দাস। নিজগুণে তিনি আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক প্রিয়বস্তু; তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয় দ্বারা সততস্নিগ্ধ

শ্রীল স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় এবং বৈরাগ্যরাজ্যের একমাত্র নিধি। যিনি সর্ব্বলোকের চিত্তরঞ্জনদ্বারা কোন এক অনির্ব্বচনীয় স্বতঃপ্রকটিত সৌভাগ্যের আধারস্বরূপ হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ-সমারোহণ-সময়েই শ্রীচৈতন্যের অনুপম প্রেমবৃক্ষ ফলবান্ হইয়াছিল, নীলাচলবাসী ভক্তগণের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে (শ্রীরঘুনাথকে) না জানেন?

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাবের তারিখ আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় দ্বিতীয় খণ্ডের (বঙ্গাব্দ ১২৯২) ২৫ পৃষ্ঠায় "ছয় গোস্বামীর সম্বন্ধে অব্দ-নির্ণয়" শীর্ষক বিবরণে ষড়্‌গোস্বামীর আবির্ভাবাদির তারিখ নিম্নলিখিত মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমরা কোন বৈষ্ণবের দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত অব্দগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি অব্দ-সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী

জন্ম—১৪২৮ শকাব্দা; প্রকটস্থিতি—৭৬ বৎসর; বৃন্দাবন-বাস—৪৯ বৎসর; গৃহে স্থিতি—১৯ বৎসর; নীলাচল-বাস—৮ বৎসর; অন্তর্দ্ধান—১৫০৪ শকাব্দা, আশ্বিনীয় শুক্লা দ্বাদশী।"

শ্রীধাম-বৃন্দাবনের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাবাদির কাল-সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি,—

প্রাকট্য—১৫৬৩ সম্বৎ (শকাব্দ ১৪২৮), গার্হস্থ্য (শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)—১৯ বর্ষ; শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবা (শ্রীক্ষেত্রে)—৮ বর্ষ; শ্রীব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস—৪৯ বর্ষ; মোট প্রাকট্য-কাল—৭৬ বর্ষ; ইষ্টলাভ (অপ্রকট)—১৬৩৯ সম্বৎ; শকাব্দা ১৫০৪, আশ্বিন, শুক্লা দ্বাদশী।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথির মধ্যেও আমরা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাবাদির নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি,—

প্রাকট্য—১৪২৮ শকাব্দ; গার্হস্থ্য—১৯ বর্ষ; শ্রীক্ষেত্রে-বাস—৮ বর্ষ; শ্রীব্রজে বাস—৪৯ বর্ষ; অপ্রকট—১৫০৪ শকাব্দ, আশ্বিন, শুক্লা দ্বাদশী; প্রপঞ্চে স্থিতি—৭৬ বর্ষ।

এই তিনটী বিভিন্ন বিবরণের তারিখ একই প্রকার। উক্ত বিবরণত্রয়-অনুসারে ১৪২৮ শকাব্দা বা ১৫৬৩ সম্বৎ (১৫০৭ খৃষ্টাব্দ) শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব-অব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের গৃহে আবির্ভূত হন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস কায়স্থ-কুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইঁহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি 'মজুমদার'। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজনা-আদায় তদানীন্তন বারলক্ষ মুদ্রা ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে নবদ্বীপনগর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানু-শীলনরত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থল ছিল। ইঁহাদের প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও গ্রামাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক অধ্যাপনাদি করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ইঁহাদের অনুগত ভ্রাতৃসম্বন্ধ ছিল। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে 'আজা' বা 'মাতামহ' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকেও ইঁহারা পূর্ব্বে অনেক সেবানুকূল্য করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য-প্রভুকেও ইঁহারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সেবা করিতেন। যদিও ইঁহারা ব্রাহ্মণের সহায়ক ছিলেন, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদের বিষয়ানুরক্তি দেখিয়া ইঁহাদিগকে 'বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া', 'শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়' প্রভৃতি স্পষ্ট উক্তি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ বিষয়ীর গৃহে বিষয়-বিরক্তগণের আদর্শ প্রপূজ্যচরণ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু অবতীর্ণ হন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্য নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র ছিলেন। ঠাকুর শ্রীহরিদাস কোন সময় শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তনানুশীলনে রত ছিলেন। সেই সময় শ্রীবলরামের গৃহে অধ্যয়নার্থ আগত শ্রীরঘুনাথ প্রত্যহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া শ্রীল ঠাকুরের কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের গুরুপুরোহিত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। শ্রীল যদুনন্দন শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। এই শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যই শ্রীল রঘুনাথের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীল রঘুনাথদাস

গোস্বামি-প্রভুর চরিত-গাথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বিভিন্ন সময়ে 'শ্রীসজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে ও অনুভাষ্যে এবং 'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস' পুস্তিকায় শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর চরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি কৈশোর কালেই 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য' ও 'অপ্সরাসম স্ত্রী' পরিত্যাগের লীলা প্রকট করিয়া—স্বধর্ম্মপরায়ণ মাতাপিতার বহু চেষ্টা ও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া—বিপ্রলম্ভবিভাবিত-হৃদয়ে শ্রীনীলাচলে গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ 'স্বরূপের রঘু' হইয়া শ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলারূপী শ্রীগিরিধারী ও গুঞ্জামালারূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; যিনি শ্রীগৌরবিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনে ভৃগুপাতের দ্বারা দেহ বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের কৃপামৃতে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতৃরূপে অতিমর্ত্ত্য সুতীব্র বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের ভজন-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর কথা কোন্ সুধী ব্যক্তিই না অবগত আছেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সেই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বরণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীল রঘুনাথের শ্রীব্রজবাসকালীন দৈনিক কৃত্য এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ।।
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম।।
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন।।
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান।।

সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৮-১০২)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় জানিতে পারি,—

"অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।।"

শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার 'স্বনিয়মদশকে' যে কয়েকটী নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ও অতুলনীয় প্রগাঢ় নিত্যসিদ্ধ রতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে ব্রজলীলার 'রতিমঞ্জরী', কেহ বা 'রসমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন।

দাস-শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ।।

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৮৬ শ্লোক)

শ্রীরঘুনাথদাসের পূর্ব্বনাম 'রসমঞ্জরী'। কেহ কেহ ইঁহাকে 'শ্রীমতী রতিমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন, নামভেদে কেহ কেহ তাঁহাকে 'ভানুমতী' বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুর 'স্বনিয়মদশক' হইতে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে,—

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা-সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ।।

শ্রীগুরুদেব, ইষ্টমন্ত্র, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীপাদপদ্ম, শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু, গণাগ্রগণ্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীমথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীব্রজভূমি, ভক্তজন এবং শ্রীগোষ্ঠবাসিগণে আমার রতি নিরতিশয়ভাবে অবস্থান করুক।

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু-সনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্।।

অন্য কোন ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও আমি শ্রীবৈষ্ণব-সুজনের নিকট হইতে সপ্রেমে রসাস্বাদন করিয়া ক্ষণকালও তথায় বাস করিব না, পরন্তু এই শ্রীব্রজভূমিতে ইতরজনগণের সহিত গ্রাম্যজনোচিত বাক্যালাপ করিয়াও প্রতিজন্মে বাস করিব।

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্।।

বীণাবাদক শ্রীনারদপ্রমুখ মুনিগণ বেদে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমা প্রবীণা শ্রীগান্ধর্ব্বাকে পরিত্যাগ করিয়া যে কপট-ভাবাপন্ন পুরুষ দম্ভ বশতঃ কেবল গোবিন্দের ভজন করে, তাহার সমীপবর্ত্তী অপবিত্র দেশে আমি ক্ষণকালও গমন করিব না,—ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে পানিহাটি-গ্রামে শ্রীল রঘুনাথের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের বিশেষ কৃপা ও তাঁহার ইচ্ছায় শ্রীল রঘুনাথের দধি-চিড়া-মহোৎসব দানের কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এই প্রসঙ্গ, এমন কি, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর নামটিও তাঁহার গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেন নাই অথবা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'স্তবাবলী' প্রভৃতির মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কোন নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা দেখিয়া আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় বঞ্চিত হইয়া থাকে। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের মাপ-কাঠির মধ্যে বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বা শ্রীভগবদ্ভক্তগণ কোনদিনই আত্মসমর্পণ করেন না।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু-রচিত গ্রন্থত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—

রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
'স্তবমালা' নাম (১) 'স্তবাবলী' যা'রে কয়।।
(২) 'শ্রীদানচরিত', (৩) 'মুক্তাচরিত' মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর।।
রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রত্বমীয়ুষঃ।
স্তবমালা-দান-মুক্তাচরিতং কৃতিষূদিতম্।।

—(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৮৩০-৮৩২)

তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের) বন্ধুত্বপ্রাপ্ত 'শ্রীল রঘুনাথ'-নামক গোস্বামীর গ্রন্থমধ্যে 'স্তবমালা', 'দানচরিত' ও 'মুক্তাচরিত' প্রসিদ্ধ।

(১) স্তবাবলী—শ্রীল রঘুনাথের স্তবাবলীতে ২৯টী স্তব গ্রথিত আছে। নিম্নে সেই স্তবসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(ক) শচীসূন্বষ্টক—এই অষ্টকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর কড়চা-ধৃত শ্রীগৌর-অবতারের মূল-প্রয়োজন ও শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলাসমূহ-বর্ণনমুখে বিপ্রলম্ভবিভাবিত হইয়া শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের পুনরায় দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু—ইহাতে একাদশটী শ্লোক ও আর একটী ফলশ্রুতিবাচক শ্লোক—সর্ব্বসাকুল্যে দ্বাদশটী শ্লোকে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শচীসূন্বষ্টক ও শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর শ্লোকাবলী হইতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিস্তার করিয়াছেন, ইহা বেশ উপলব্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এই উক্তিটীও বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়,—

রঘুনাথদাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁ'র মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি।।

চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহাঁ কিছু যে শুনিলুঁ, তাহাঁ ইহাঁ বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে।।

(গ) মনঃশিক্ষা—একাদশটী শ্লোকে গ্রথিত। অন্তিম শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি আছে। এই দ্বাদশটী শ্লোক ঐকান্তিক হরিভজনপ্রার্থী, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের বিচারধারা-অনুসরণকারী সাধকগণের নিত্যারাধ্য ও নিত্যপাঠ্য। শ্রীরূপানুগগণ সর্ব্বদা এই মনঃশিক্ষার শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া প্রত্যহ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া শ্রীসনাতন শ্রীরূপ-গোবর্দ্ধনের ভজনা করেন। এই মনঃশিক্ষার ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ 'সযূথ-শ্রীরূপানুগ'-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগতসর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে।।

যিনি মনঃশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোকের যাবতীয় অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া মধুর বচনে ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীগোপাল-শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী এবং শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ যূথের সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম ভজন-রত্ন লাভ করেন।

বহরমপুর হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর যে 'স্তবাবলী'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যে বঙ্গেশ্বর শ্রীবিদ্যাভূষণ-কৃতি-রচিত 'কাশিকা'-নাম্নী এক টীকা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মনঃশিক্ষার টীকায় অতিশয় পাষণ্ডমত স্থান পাইয়াছে। উক্ত টীকাকারের অর্ব্বাচীন-মতে 'শ্রীরূপানুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে না', এরূপ বিচার আধুনিক বিচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত টীকাকার শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের 'স্তবাবলী'র টীকা লিখিবার অভিনয় করিয়া অতিশয় অপরাধফলে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর বিচারধারা সম্পূর্ণ অবধারণ করিতে পারেন নাই। ইনি জনৈক অপরবিদ্যাভূষণ; শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য পরবিদ্যাভূষণ অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু নহেন। উক্ত 'কাশিকা'-টীকার রচয়িতা আপনাকে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বংশধর 'শ্রীমধুসূদন'-নামক এক ব্যক্তির অনুগ্রহলাভকারী এবং টীকার প্রারম্ভে গুরুর নাম 'বৃন্দাবনচন্দ্র শব্দবিদ্যার্ণব' ও টীকার শেষে গুরুর নাম 'তর্কালঙ্কার' এবং টীকারচনার কাল ১৬৪৪ শকাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার অপর নাম—বঙ্গবিহারী বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকৃত শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর মনঃশিক্ষার 'ভজন-দর্পণ'-নামক মিশ্রভাষ্য ও পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

(ঘ) প্রার্থনা—ইহা চতুঃশ্লোকী আকারে শ্রীসখীগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের স্মরণময়ী সেবা-প্রার্থনা।

(ঙ) শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক—দশটী শ্লোকে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য ও শোভা কীর্ত্তন করিয়া গোকুলবান্ধব গিরিরাজের আশ্রয় লাভ করা প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, ইহা শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতিবাচক একাদশসংখ্যক শ্লোকটী এই,—

তস্মিন্ বাসদমস্য রম্যদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যৎ
প্রাদুর্ভূতমিদং যদীয়কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি।
তস্যোদ্যদ্‌গুণবৃন্দবন্ধুরখনের্জীবাতুরূপস্য ত-
ত্তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পক্বং ময়া মৃগ্যতে।।

যে শ্রীগোবর্দ্ধনের কৃপায় এই জীর্ণ অন্ধ ব্যক্তির মুখ হইতেও শ্রীগোবর্দ্ধন-বাসপ্রদ এই রম্য শ্লোকদশক প্রকাশিত হইল, তাহা অনন্তগুণখনিস্বরূপ এবং আমার জীবনস্বরূপ শ্রীগোবর্দ্ধনেরই সন্তোষবিধান করুক—এই প্রপক্ক ফল আমি প্রার্থনা করি।

(চ) শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক—দশটী শ্লোকে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিবিধ লীলানিকেতনরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার সন্নিকটে বাসের প্রার্থনা করতঃ দশম শ্লোকে অতিশয় দৈন্যভরে বলিতেছেন,—

নিরুপধিকরুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটিশঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।।

হে শ্রীগোবর্দ্ধন! আমি কপটী ও শঠ হইলেও আপনার প্রিয় অহৈতুক-কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন কর্ত্তৃক আপনার নিকটে অর্পিত হইয়াছি; কেবল এইহেতু আমার

যোগ্যতা ও অযোগ্যতা গ্রহণ না করিয়া নিজসমীপবাস প্রদান করুন।

(ছ) **শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক**—নিখিল শ্রীহরিজনের মধ্যে যেরূপ শ্রীমতী রাধার সর্ব্বোত্তমতা, তদ্রূপ নিখিল শ্রীহরিক্ষেত্রের মধ্যে শ্রীরাধাভিন্না শ্রীরাধাসরসীর সর্ব্বোত্তমতা। শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীঈশ্বরীর কুণ্ডের শোভা, মহিমা ও লীলাগাথাসমূহ বর্ণন করিয়া সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই তাঁহার আশ্রয়স্থল হউক, এইরূপ প্রার্থনা শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(জ) **শ্রীব্রজবিলাসস্তব**—ইহাতে ১০৬টী শ্লোকে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাময় স্থান, কাল ও পাত্রের বর্ণন অতীব অনবদ্য অতিমর্ত্ত্য নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিভিন্ন পুরাণাদি-শাস্ত্রে শ্রীব্রজমণ্ডলে সাবরণ শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল বিলাস বর্ণিত আছে, তাহার সার-নির্যাস এই শ্রীব্রজবিলাস-স্তবে দৃষ্ট হয়। এই স্তবের মঙ্গলাচরণের প্রথম দুইটী শ্লোক এই,—

প্রতিষ্ঠারজ্জুভির্বদ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ।
ছিত্ত্বা তাঃ সংহরন্তস্তানঘারেঃ পান্তু মাং ভটাঃ।
দগ্ধং বার্দ্ধকবন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরান্ধ্যাহিনা
বিদ্ধং মামতিপারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদিসিংহৈর্বৃতম্।
স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
যেনৈতানবধীর্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে।।

কামক্রোধাদি রিপুগণ সংসারমার্গে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুদ্বারা আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে; অঘদমন শ্রীকৃষ্ণের বীরাগ্রগণ্য সেনাপতি-স্বরূপ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ সেই দস্যুসমূহকে সংহারপূর্ব্বক আমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভো শ্রীহরে! বার্দ্ধক্যরূপ দাবানলে নিতান্ত দগ্ধ, অতিশয় অন্ধত্বরূপ সর্পের দ্বারা দষ্ট, পরাধীনতারূপ শরসমূহদ্বারা বিদ্ধ ও ক্রোধাদিরূপ সিংহগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক শীঘ্র এতাদৃশ প্রেমসুধারস পান করান, যাহাতে আমি বার্দ্ধক্য-অন্ধত্বাদি (প্রতিকূল) বিষয়সমূহের স্বরূপ অবগত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক (অবিচলিতচিত্তে) আপনার ভজন করিতে পারি।

উপসংহারের শেষ তিনটী শ্লোক এইরূপ,—

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি-
স্নাতোঽপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্ম্ম নির্ভরঃ প্রতিমুহূর্বসোঽস্তু নিত্যং মম।।

রাগেণ রূপমঞ্জর্য্যা রক্তীকৃত-মুরদ্বিষঃ।
গুণারাধিত-রাধায়াঃ পাদযুগ্মে রতির্ম্মম।।

ইদং নিয়তমাদরাদ্ব্রজবিলাসনাম স্তবং
সদা ব্রজজনোল্লসন্মধুরমাধুরী-বন্ধুরম্।
মুহুঃ কুতুকসম্ভৃতাঃ পরিপঠন্তি যে বস্তু তৎ
সমং পরিকরৈর্দৃঢ়ং মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে।।

প্রেমামৃতসমুদ্রে স্নাত হইয়া ভগবজ্জনগণ-সঙ্গেও (শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত) অন্য কোন শ্রীহরিধামে আমি কখন বাস করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু এই (শ্রীব্রজে) ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে সংলাপাদি দ্বারা নিত্যকাল—প্রতি-মুহূর্ত্ত আমার বাস হউক।

অনুরাগদ্বারা শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়াছেন, সেই অশেষগুণসমূহদ্বারা আরাধিতা শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপদ্মযুগলে আমার রতি হউক।

শ্রীব্রজজনগণের উজ্জ্বলমাধুরীদ্বারা অতি সুন্দর এই 'ব্রজবিলাস'-নামক স্তব যাঁহারা নিরন্তর মুহুর্মুহুঃ পরম আগ্রহ ও আদরের সহিত পরিগঠন করেন, তাঁহারা সপরিকর মনোরম শ্রীযুগলমূর্ত্তি দর্শন করেন।

(ঝ) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—অতিমর্ত্ত্য অত্যুৎকট অপ্রাকৃত বিরহানল-সন্তপ্ত হইয়া শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভু ১০৪টি শ্লোকে যে অপ্রাকৃত বিলাপকুসুম শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান করিয়াছেন, তাহাই 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'-নামে খ্যাত। ইহাতেও শ্রীল রঘুনাথের শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ প্রগাঢ় অনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাসকুসুমাঞ্জলির মঙ্গলাচরণে চতুর্থ হইতে সপ্তম শ্লোকের অতিমর্ত্ত্যা বিরহ-বিভাবিতা দৈন্যাত্মিকা উক্তি পাষাণ-হৃদয়কেও বিগলিত করে।

প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ
প্রিয়-যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ।
স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে।।

যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে।।

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ।।

শ্রীযদুনন্দন—যিনি উন্নতপ্রভাববিশিষ্ট ও শ্রীযদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার অতীব প্রিয়—যিনি স্বয়ং আমাকে অতুলনীয় কৃপামৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

স্বভাবতঃ প্রগাঢ় করুণাসমুদ্রস্বরূপ যিনি আমাকে অহৈতুকী কৃপারজ্জুদ্বারা দুস্তর ও অশেষ-ক্লেশপূর্ণ গৃহরূপ নির্জ্জল মহাকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় কমলবিনিন্দিত শ্রীচরণপ্রান্তে আকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীদামোদরস্বরূপের শ্রীহস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

আমি অজ্ঞানান্ধ ও অনিচ্ছুক হইলেও যিনি প্রযত্ন-সহকারে আমাকে বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই পরদুঃখদুঃখী দয়ার সাগর শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

হে স্বামিনি শ্রীরাধে! শ্রীগোবর্দ্ধনের একদেশে আপনার কোন এক দাসী অত্যুৎকট বিরহানলদ্বারা মুহুর্মুহুঃ নিতান্ত দগ্ধহৃদয় হইয়া অত্যন্ত বিরহবিধুরচিত্তে ক্রন্দন সহকারে গাঢ়প্রণয়পূর্ণ পদ্যসমূহদ্বারা ক্ষণকাল বিলাপ করিতেছে।

(ঞ) **প্রেমপূরাভিধস্তোত্র**—অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তত্তৎ লীলাসমূহের দ্বারা শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর নেত্রানন্দ বিধান করুন, ইহাই দশশ্লোকাত্মক-স্তোত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

(ট) **প্রার্থনা**—ইহাতে চারিটী শ্লোকে শ্রীরাধিকা, সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও সখীকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

(ঠ) **স্বনিয়মদশক**—ইহাতে দশটী শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু স্ব-ভজনের নিত্য নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীব্রজধামেই নিত্যকাল অবস্থান করিয়া শ্রীব্রজোৎপন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা আহারব্যবহারাদি নির্ব্বাহপূর্ব্বক শ্রীরূপানুগ সজাতীয়াশয়গণের সঙ্গে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণ একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর পশ্চাতে থাকিয়া নিত্য স্বাভীষ্ট-সেবার নিয়ম এই দশকে গ্রথিত হইয়াছে এবং একাদশ-সংখ্যক শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে।

(ড) **শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র**—ইহাতে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারিণী লীলা-বিষয়ক অষ্টোত্তরশতনাম ৪৬টী শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একটী ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকও আছে। ইহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকপাঠে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু নিজেশ্বরী শ্রীরাধিকার বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীরাধিকার নামাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের দুইটী শ্লোক এইরূপ,—

অবীক্ষ্যাত্মেশ্বরীং কাচিদ্বৃন্দাবনমহেশ্বরীম্।
তৎপদাম্ভোজমাত্রৈকগতির্দাস্যতিকাতরা।।
পতিতা তৎসরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরবাকুলম্।
তচ্ছ্রীবক্ত্রেক্ষণাবাপ্ত্যৈ নামান্যেতানি সংজগৌ।।

স্বীয় আত্মেশ্বরী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে না দেখিতে পাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই যাহার একমাত্র গতি, তাদৃশী কোন দাসী অত্যন্ত কাতরা এবং

শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে দণ্ডবৎ-পতিতা হইয়া আর্ত্তব্যাকুলস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীমুখদর্শনহেতু এই শ্রীনামসমূহ গান করিয়াছিল।

(চ) শ্রীরাধিকাষ্টক—ইহাতে আটটি শ্লোকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর লীলাময়ী শোভা ও কীর্ত্তি বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু শ্রীরাধিকা কবে তাঁহাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অষ্টকের পরে নবম শ্লোকে এই ফলশ্রুতিটী বিবৃত হইয়াছে,—

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃতনিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি।।

যিনি সর্ব্বপ্রকার বাসনারাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমলচিত্তে কাতরভাবে এই কমনীয় শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, শ্রীনন্দনন্দন অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজজনগণ-মধ্যে গণনা করেন।

(ণ) প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজ—দ্বাদশটী শ্লোক ও একটী ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শ্রীকৃষ্ণময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর রূপ ও গুণ বর্ণনা এই স্তব মধ্যে দৃষ্ট হয়। শেষ দুইটী শ্লোকে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু নিজেশ্বরীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন,—

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্।।
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্।।

হে শ্রীরাধে! দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতিপুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি—এই সুদুঃখিতজনকে স্বীয় দাস্যামৃতসেকের দ্বারা জীবিত করুন। হে শ্রীগান্ধর্ব্বিকে! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্ট ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন তুমি আশ্রিত এই দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করিও না।

এই প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজটী অবলম্বন করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে ১৬৪ সংখ্যা হইতে ১৮০ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন।

(ত) স্বসঙ্কল্পপ্রকাশস্তোত্র—শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু বিংশতিটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় স্বীয় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া এই স্তোত্র রচনা করিয়াছেন এবং একবিংশ শ্লোকে সখীর অনুকম্পায় সেই সকল সঙ্কল্প বাস্তবতায় পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই স্বসঙ্কল্পপ্রকাশ-স্তোত্রের উপক্রম-শ্লোকটী ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত তৎপদ্যানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ।।

রাধা-পদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্কপূত ব্রজ না ভজিলে।।
না সেবিলে রাধিকা-গম্ভীরভাবভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হ'বে অনুরক্ত?

(থ) শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি—ইহাতে ত্রিচত্বারিংশটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সখীগণের প্রণয়কলহ ও পরস্পর বাক্‌চাতুর্য্য-প্রতিযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছে। উপসংহারে চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু এরূপ প্রার্থনা করিতেছেন,—

ইদং রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলীকলিমধু
প্রিয়ালীনর্ম্মালীপরিমলযুতং যস্য ভজনাৎ।
মমান্ধস্যাপ্যেতদ্বচনমধুপেনাল্পগতিনা
মনাগ্‌ঘ্রাতং তন্মে গতিরতুলরূপাঙ্ঘ্রিজরজঃ।।

যাঁহার অতুলনীয় শ্রীচরণধূলির ভজনহেতু আমার ন্যায় অন্ধেরও স্বল্পগতিশীল এই বাক্যভৃঙ্গ প্রিয়সখীগণের পরিহাস-বচনপরিমলপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উজ্জ্বল কুসুমকেলিকলহমধুকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শ্রীরূপপ্রভুর অনুপম পদরেণু আমার একমাত্র গতি হউক।

(দ) প্রার্থনামৃত—ইহাতে বিংশতিটী শ্লোকে শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু স্বীয় অভীষ্ট প্রার্থনা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রণয়লীলাবর্ণনমুখে উভয়ের স্তুতি ও শ্রীরূপ-

মঞ্জরীর নিকট নিজেশ্বরীর কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রার্থনামৃতের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটী এইরূপ,—

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোরঙ্ঘ্রিসেবৈকগৃধ্নুনা।
অসংখ্যেনাপি জনুষা ব্রজে বাসোঽস্তু মেঽনিশম্।।

শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরীর শ্রীচরণসেবালাভেই একমাত্র লালসা থাকে, এরূপ অসংখ্য জন্মে শ্রীব্রজেই নিরন্তর আমার বাস হউক।

(ধ) **নবাষ্টক**—এই অষ্টকে শ্রীরাধার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু নিজ মনকে সেইরূপ অপর্য্যাপ্তগুণশালিনী শ্রীরাধার ভজনের জন্য অনুনয় করিয়াছেন। উপসংহারে নবম শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাক্বা গদগদনিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্ যঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্তমুকুন্দভৃঙ্গবিলসদ্রাধাসুধাবল্লরীং
সেবোদ্রেকরসেন গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্না স তাং সিঞ্চতি।।

যে সুবুদ্ধিসম্পন্ন সুকৃতিমান্ ব্যক্তি প্রীতিসহকারে ভূমিতে নিপতিত হইয়া কাকুর্ব্বাদযুক্ত গদ্‌গদস্বরে পরিস্ফুটভাবে নিয়ত সম্পূর্ণ এই নবাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ঘূর্ণনরত উন্মত্ত শ্রীমুকুন্দরূপ ভ্রমর-পরিশোভিত শ্রীরাধিকারূপা অমৃতলতাকে স্বীয়সেবাসম্ভূত-রসদ্বারা সেচন করিতে পারেন অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা-মাধবকে সেবারস দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারেন।

(ন) **শ্রীগোপালরাজস্তোত্র**—শ্রীবল্লভাচার্য্য-আত্মজ শ্রীবিঠ্ঠলের প্রণয়-সেবা-ভূষিত শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতবিহারী শ্রীগোপালদেবের স্তব চতুর্দ্দশটী শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শ্লোকে ইহার ফলশ্রুতি আছে।

(প) **শ্রীমদনগোপালস্তোত্র**—এই স্তোত্রে শ্রীশ্রীমদনগোপালের লীলা ও মাহাত্ম্যময় একবিংশ শ্লোকাত্মক। ইহার ফলশ্রুতিবাচক শ্লোকটী এই,—

মদনবলিতগোপালস্য যঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি সুমতিরুদ্যদ্দৈন্যবন্যাভিষিক্তঃ।
স খলু বিষয়রাগং সৌরিভাগং বিহায়
প্রতিজনি লভতে তৎপাদকঞ্জানুরাগম্।।

সুমতিবিশিষ্ট, স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত দৈন্যবন্যাদ্বারা অভিষিক্ত যে ব্যক্তি এই শ্রীমদনগোপালের স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যপুত্র শ্রীযমরাজের দণ্ডভোগের কারণ-স্বরূপ বিষয়ানুরক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিজন্মে শ্রীমদন-গোপালের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগ লাভ করেন।

(ফ) **শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্র**—ইহাতে ১৩১টী শ্লোকে শ্রীরাধার অভিন্ন-স্বরূপা শ্রীবিশাখার আনন্দদায়িনী শ্রীরাধাস্তুতি গ্রথিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে ভাব, নাম ও গুণাদির ঐক্যনিবন্ধন যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকাস্বরূপা, সেই শ্রীবিশাখাদেবীর প্রতি প্রার্থনা জ্ঞাপিত হইয়াছে। উপসংহারে শ্রীরাধাই গ্রন্থকারের একমাত্র গতি—ইহা বর্ণন করিয়া উক্ত স্তোত্রপাঠের ফলশ্রুতি ও শ্রীরূপানুগ জনগণকে উক্ত পদ্য আস্বাদন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

(ব) **শ্রীমুকুন্দাষ্টক**—ইহাতে আটটী শ্লোকে শ্রীরাধার প্রাণনাথ ও একান্ত বল্লভ শ্রীমুকুন্দের স্তব করা হইয়াছে। শেষে ফলশ্রুতিবাচক আর একটী শ্লোক আছে।

(ভ) **উৎকণ্ঠাদশক**—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়লীলাসমূহ বর্ণনপূর্ব্বক সেই শ্রীরাধার সেবা-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।

(ম) **শ্রীনবযুবদ্বন্দ্বাদিদৃক্ষাষ্টক**—ইহাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিভিন্ন প্রণয়-কেলি বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীব্রজভূমিতে সেই শ্রীনবযুব-যুগলের দর্শন আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে।

(য) **অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক**—এই অষ্টকে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু শ্রীবিশাখার প্রিয়সখী ও নিজেশ্বরী শ্রীরাধার প্রতি অভীষ্ট-সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার ন্যায় যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমশ্রী নিত্য বাস করিতেছে, সেই শ্রীললিতাসখীর দর্শন শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপদেশে প্রার্থনা করিয়াছেন।

(র) **দান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টক**—এই অষ্টকে শ্রীদাননির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডের অতুলনীয় মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু সেই কুণ্ডে বাস প্রার্থনা করিয়াছেন। ফলশ্রুতিবাচক নবম শ্লোকে যোগ্য অধিকারি-কর্ত্তৃক দান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টক-পাঠের নিম্নলিখিত ফল বর্ণিত হইয়াছে,—

পঠতি সুমতিরেতদ্দাননির্বর্ত্তনাখ্যং
প্রথিতমহিমকুণ্ডস্যাষ্টকং যো যতাত্মা।
স চ নিয়তনিবাসং সুষ্ঠু সংলভ্য কালে
কলয়তি কিল রাধাকৃষ্ণয়োর্দানলীলাম্।।

যিনি সংযতাত্ম ও সুমতিবিশিষ্ট হইয়া এই 'দাননির্বর্ত্তন'-নামক প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য-যুক্ত শ্রীকুণ্ডাষ্টক পাঠ করেন, তিনি 'দাননির্বর্ত্তন'-নামক কুণ্ডে নিয়তবাস লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা নিশ্চিতরূপে দর্শন করেন।

(ল) প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক—এই চতুর্দ্দশ-শ্লোকাত্মক প্রার্থনায় শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভু নিজাভীষ্ট-সেবালাভের সুতীব্র উৎকণ্ঠাবশতঃ বিপ্রলম্ভ-কাতর আপনাকে সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য অপ্রাকৃত ভাবাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীকে আহ্বান করিয়া দীপাবলী-কৌতুকসমূহ নিবেদন করিতেছেন এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট শ্রীঈশ্বরীর কুণ্ডে সর্ব্বাঙ্গে বাস প্রার্থনা করিতেছেন। আবার অপ্রাকৃত ভাবাবেশে শ্রীরূপমঞ্জরীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিরহে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন—

অপূর্ব্বপ্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাববলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্।।
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে।।
গিরিবরতটকুঞ্জে মঞ্জুবৃন্দাবনেশা-
সরসি চ রচয়ন্ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-কীর্ত্তিম্।
ধৃতরতি রমণীয়ং সংস্মরংস্তৎপদাব্জং
ব্রজদধিফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি।।
বসতো গিরিবরকুঞ্জে লপতঃ শ্রীরাধিকেঽনুকৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজদধিতক্রং নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু।।

আমার জীবনস্বরূপ যিনি (শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু) অপূর্ব্ব প্রেমসমুদ্রের পরিমল-যুক্ত সলিলের ফেনসমূহদ্বারা (অর্থাৎ প্রেমামৃতবারিদ্বারা) কৃপাপূর্ব্বক প্রচুরভাবে

সতত আমাকে সিঞ্চিত করিতেন, সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ প্রতিক্ষণ নানা বিপদরূপ দাবানলদ্বারা গ্রস্ত নিরাশ্রয় আমি তাঁহা ব্যতীত আর কাহাকে আশ্রয় করিব ? আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায়, শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে ও অনুরাগের সহিত রমণীয় শ্রীযুগলপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পরম মনোরম শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার কুণ্ডতটবর্ত্তী কুঞ্জে ব্রজের দধি ও ফল ভক্ষণ করিয়া যেন সর্ব্বকাল বাস করি।

(শ) অভীষ্টসূচন—ইহাতে ত্রয়োদশটী শ্লোকে শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভু শ্রীরাধাদাস্য-বিরহকাতর হইয়া শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মরাগে সুতীব্র আবেশ-সহকারে শ্রীরাধার দাস্যই প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার উপক্রমের শ্লোকটী এই,—

আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ।
শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তিসংস্থো মৎস্বান্তদুর্দান্তহয়েচ্ছুরাস্তাম্।।

আভীরপল্লীপতি শ্রীনন্দ মহারাজ, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কান্তা শ্রীরাধিকা, তাঁহার দাস্যাভিলাষরূপ অতি বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর চিন্তারূপ নির্ম্মল অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার চিত্তরূপ দুর্দ্দান্ত অশ্বের অভিলাষী হউন; অর্থাৎ আমার চিত্তবৃত্তি শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর চিত্তবৃত্তির ন্যায় সতত শ্রীরাধা-পদদাস্যের জন্য লালায়িত থাকুক।

'অভীষ্টসূচনে'র নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকদ্বারা শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু অননুকরণীয়—অতিমর্ত্ত্য—বিপ্রলম্ভময় দিব্যোন্মাদের পরিচয় দান করিতেছেন,—

নিভৃতবিপিনলীলাঃ কৃষ্ণবক্ত্রং সদাক্ষ্ণা
প্রপিবথ মৃগকন্যা যূয়মেবাতিধন্যাঃ।
ক্ষণমপি ন বিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা-
প্যুদরভরণবৃত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাহম্।।
রাধেতি নাম নবসুন্দরসীধুমুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুতগাঢ়দুগ্ধম্।

সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে।।
চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য
হৃদ্যং বিধেহি নিজচিন্তনভৃঙ্গরঙ্গৈঃ।
কিঞ্চাপরাধতিমিরং নিবিড়ং বিধূয়
পাদামৃতং সদয় পায়য় দুর্গতং মাম্।।
যৎপাদাম্বুজযুগ্মবিচ্যুতরজঃসেবাপ্রভাবাদহং
গান্ধর্ব্বাসরসী-গিরীন্দ্রনিকটে কষ্টোঽপি নিত্যং বসন্।
তৎপ্রেয়োগণপালিতো জিতসুধাধারা মুকুন্দাভিধা।
উদ্গায়ামি শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স রূপোঽবতু।

হে মৃগকন্যাগণ! তোমরাই অতিশয় ধন্যা; যেহেতু, নির্জ্জন বৃন্দারণ্য মধ্যে বিচরণকালে তোমরা সর্ব্বদা নেত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনসুধা পান করিতেছ; কিন্তু কুক্কুরীস্বরূপা আমি শ্রীব্রজে অবস্থান করিয়াও ক্ষণকালের জন্যও ঐ শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিলাম না; কেননা, উদরভরণ নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতেই আমি হত হইলাম।

'শ্রীরাধা' এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোরম; 'কৃষ্ণ' এই নাম গাঢ়দুগ্ধবৎ অত্যদ্ভুত মধুর। হে ক্ষুধার্ত্ত মদীয় রসনে! তুমি অনুরাগরূপ সুগন্ধি তুষার দ্বারা আরও রমণীয় করিয়া উহা সর্ব্বক্ষণ পান কর।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র! আপনি আমার হৃদয়-কুমুদকে বিকশিত করিয়া আপনার চিন্তনরূপ ভ্রমরগণের রঙ্গদ্বারা উহাকে মনোরম করুন এবং হে সদয় প্রভো! অপরাধরূপ নিবিড় অন্ধকার বিনাশ করিয়া দুর্গত আমাকে আপনার শ্রীচরণামৃত পান করান।

অহো! যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-যুগল হইতে বিচ্যুত পরাগের সেবা-প্রভাবে শ্রীরাধাকুণ্ড সমীপস্থ গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন-সন্নিকটে নিত্য বাস করতঃ অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত আমি তাঁহার প্রিয় স্বগণ-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া অমৃতধারা-বিজয়ী শ্রীমুকুন্দের শ্রীনামাবলী উদ্গান ও শ্রবণ করিতেছি, সেই শ্রীমান্ রূপপ্রভু পুনরায় আমাকে রক্ষা করুন।

(২) শ্রীদানচরিত—'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' যাহা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীদানচরিত'-নামে উক্ত হইয়াছে, তাহারই অপর নাম 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'—এইরূপ অনেকেই বিচার করেন। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র রচয়িতা তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত সংস্কৃত প্রমাণ-শ্লোকের 'দান-মুক্তাচরিতম্' এই পদে 'মুক্তাচরিতে'র সহিত 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'কে একসঙ্গে মিলাইয়া 'শ্রীদানচরিত' নাম দিয়াছেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Noticcs of Sanskrit Mss. পুস্তকে (Vol. VII, P. 279-280, No. 2528) ও Catalogue of Sanskrit Mss. in the Sanskrit College পুস্তকে (Calcutta, 1908, No. 677) 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'-গ্রন্থকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের রচিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। Theodor Aufrecht-এর Catalogus Catalogorum পুস্তকে (Vol. I, P. 249; Vol. III, P. 54) 'শ্রীদানকেলি-চিন্তামণি'র প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তাহার নামের উল্লেখমাত্র আছে।

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্নন্দ মহারাজের ভ্রাতা ও মন্ত্রী উপানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র—শ্রীসুভদ্র। তাঁহারই পত্নী শ্রীকুন্দলতা এই গ্রন্থের শ্রোত্রী এবং তাঁহার সখী শ্রীসুমুখী ইহার বক্তা। শ্রীরূপের 'শ্রীদানকেলি-কৌমুদী'-ভাণিকার অনুসরণে এই 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি'-গ্রন্থ রচিত। শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

উদ্দাম-নর্ম্মরস-রঙ্গ-তরঙ্গকান্ত-
রাধাসরিদ্-গিরিধরার্ণব-সঙ্গমোত্থম্।
শ্রীরূপ-চারুচরণাজ-রজঃপ্রভাবা-
দন্ধোঽপি দান-নবকেলিমণিং চিনোমি।।

আমি অন্ধ হইলেও (দৈন্যোক্তি) শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর চারুচরণকমলের পরাগপ্রভাবে এই দান-নবকেলিমণি চয়ন করিতেছি। এই মণি উদ্দাম-পরিহাস-রঙ্গরসের তরঙ্গময়ী রাধারূপা সরিৎ ও শ্রীগিরিধারীরূপ সমুদ্রের সঙ্গম-ফলেই আবির্ভূত হইয়াছে।

উপসংহারে শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

দধ্যাদি-দান-নব-কেলি-রসাব্ধিমধ্যে
মগ্নং নবীনযুবরত্নযুগং ব্রজস্য।
নর্ম্মালী-হৃদ্যমুদিত-দ্যুতি-গৌরনীল-
মন্ধোঽপি লুব্ধ ইব লোকিতুমুৎসুকোঽস্মি।।
রাধামাধবয়োর্দানকেলিচিন্তামণিং গিরৌ।
লব্ধমন্ধেন বীক্ষন্তাং শ্রীমদ্রূপগণাঃ প্রিয়াঃ।।
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-রজোঽহং স্যাং ভবে ভবে।।

দধি প্রভৃতি দান-বিষয়ক নবকেলিরস-সাগরে নিমগ্ন, নর্ম্মসখীবৃন্দের মনোজ্ঞ, গৌর ও নীলবর্ণ দ্যুতিশীল শ্রীব্রজের নবযুবরত্নযুগলকে দর্শন করিবার জন্য অন্ধ হইলেও আমি লুব্ধ ব্যক্তির ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। এই অন্ধ ব্যক্তি গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি' লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর প্রিয় নিজজনগণ ইহা বিশেষভাবে দর্শন করুন, এই প্রার্থনা। আমি দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এই ভিক্ষা করিতেছি যে, যেন জন্মে জন্মে শ্রীল রূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন,—শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'তে যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণামসূচক কোন শ্লোক বা নামোল্লেখ নাই—'শ্রীদানকেলি চিন্তামণি'র মঙ্গলাচরণেও যখন সেইরূপ কোনও নামোল্লেখ নাই, তখন ইহা কি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচরণ-আশ্রয়ের পূর্ব্বের রচনা? বস্তুতঃ 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি'তে শ্রীরূপ-প্রভুর বন্দনা-সূচক শ্লোকই ঐরূপ প্রশ্নের অবকাশকে নিরাস করিয়া থাকে। যে স্থানে শ্রীরূপপ্রভুর বন্দনা আছে, তথায় শ্রীরূপপ্রভুর আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরেরও বন্দনা তদন্তর্ভুক্ত। 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী' ১৪৭১ শকাব্দায় রচিত। অতএব 'শ্রীদানকেলিচিন্তামণি' ইহারই কিছুকাল পরে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর জন্য সজ্জনগণের সুখদায়িনী ভাণিকারূপা 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী' রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

(৩) শ্রীমুক্তাচরিত—এই গ্রন্থের বক্তা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোত্রী শ্রীসত্যভামা দেবী। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজে মুক্তাফল-রোপণাবধি তদ্বিষয়ক যে-সকল অপ্রাকৃত লীলা

করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি শ্রীসত্যভামার নিকট বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অষ্টমহিষীর অন্যতমা শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর প্রিয়সখী শ্রীসমঞ্জসাও তৎসময়ে মুক্তা-চরিত শ্রবণ করিয়া স্বীয় সখী শ্রীলক্ষ্মণাদেবীর নিকট তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ এইরূপ,—

> কন্দর্পকোটিরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
> জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্রসূনবে।।
> ক্রয়বিক্রয়খেলাব্ধৌ মুক্তানাং মজ্জিতাত্মনোঃ।
> মিথো জয়ার্থিনোর্বন্দে রাধামাধবয়োর্যুগম্।।
> নিজামুজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
> উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে।।
> নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
> রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
> রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
> প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।
> হরিচরিতামৃতলহরীং বৃন্দাবিপিনাম্বুরাশিভূতাম্।
> রসবদ্বৃন্দারকগণ-পরমানন্দায় সন্তনুমঃ।।

যিনি কোটী কোটী কন্দর্প হইতেও রমণীয়, যাঁহার কান্তি প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম-সদৃশ এবং যাঁহার লীলাবলী ত্রিজগন্মানসাকর্ষিণী, সেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। মুক্তাদামের ক্রয়বিক্রয়রূপ ক্রীড়াসিন্ধুতে যাঁহাদের চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছে এবং মুক্তাবিষয়ে বাদানুবাদে যাঁহারা পরস্পর বিজয়ার্থী, সেই শ্রীশ্রীরাধামাধবযুগলকে আমি বন্দনা করি। যিনি এই পৃথিবীতে নিজ উজ্জ্বল ভক্তিসুধা সমর্পণ করিবার জন্য শ্রীশচীমাতার গর্ভাকাশে সমুদিত হইয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত পূর্ণচন্দ্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। অহো! যাঁহার বিস্তৃত কৃপায় নামশ্রেষ্ঠ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র, শ্রীমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীল স্বরূপ-দামোদর, শ্রীরূপ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীল সনাতন, বিশালা শ্রীমথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণসেবার আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি নমস্কার করি। রসবেত্তা ভক্তগণের পরমানন্দের

জন্য শ্রীবৃন্দাবন-সমুদ্রে সমুৎপন্ন শ্রীহরিচরিতামৃত-লহরী সম্যগ্‌রূপে বিস্তার করিতেছি।

শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভু তাঁহার এই 'মুক্তাচরিত'-গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীল রূপ-প্রভুর শিক্ষার অনুসরণ করিয়া রচনা করিয়াছেন, ইহাই উপসংহারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ অনুরাগী ভক্তগণই এই গ্রন্থ-পাঠের অধিকারী। অন্তিম শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গপ্রভাবে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহাও দৈন্যভরে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।

যস্যাজ্ঞাসুধয়া প্রবোধিতধিয়া মুক্তাচরিত্রৈর্ময়া
গুচ্ছঃ পুষ্পভরৈর্ব্যধায়ি য ইহ শ্রীরূপসংশিক্ষয়া।
জীবাখ্যস্য মদেকজীবিততনোস্তস্যৈব দৃক্‌ষট্‌পদী
ঘ্রাণৈস্তং পরিভূষিতং নু তনুতাং তৎকেলিশীধুৎকধীঃ।।

মুক্তাচরিত্রপুষ্পৌঘৈর্গুচ্ছং গুম্ফিতমদ্ভুতম্।
বতংসয়তু মৎস্নেহাৎ শ্রীমদ্রূপগণো রহঃ।।

যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতা ময়া
মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতের্ব্রজে
সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে।।

আমি দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, যেন জন্মে জন্মে শ্রীল রূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হই। আমি শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর আদেশামৃতে প্রবোধিতবুদ্ধি হইয়া শ্রীল রূপপ্রভুর সম্যক্ শিক্ষানুসারে 'মুক্তাচরিতে'র কুসুমসমূহের এই স্তবক প্রস্তুত করিলাম। আমার একমাত্র জীবিত-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীজীবের যে নেত্রভৃঙ্গ শ্রীকৃষ্ণলীলামাধ্বীকপানের জন্য অতিশয় সমুৎসুক হইয়াছে, সেই নয়নভ্রমর ঘ্রাণের দ্বারা এই স্তবককে পরিভূষিত করুক। 'মুক্তাচরিতে'র কুসুমদামে যে গুচ্ছ গ্রথিত হইল, শ্রীল রূপপ্রভুর নিজজনগণ আমার প্রতি স্নেহবশতঃ নির্জ্জনে বসিয়া তদ্দ্বারা স্ব-স্ব কর্ণ বিভূষিত করুন। আমি

যাঁহার সঙ্গবলে এই অতিমর্ত্ত্য মৌক্তিকোত্তম-কথা প্রচার করিলাম, সেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সঙ্গ এই ব্রজমণ্ডলে আমার জন্মে জন্মে লাভ হউক।

Theodor Aufrecht-এর Catalogus Catalogorum পুস্তকে (Vol. I. P. 486, 729) শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া 'গুণলেশসুখদ' ও 'সুরাবলী'-নামক দুইখানি গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে (Vol. I. P. 249, 486; Vol. III. P. 54) শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী'র 'শ্রীরঘুনাথদাস'-কৃতা টীকার কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু কিনা, তাহা বলা যায় না।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থেও শ্রীরঘুনাথদাসের নামে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কথিত হয় যে, শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর রচিত উপরি-উক্ত গ্রন্থত্রয়ের কোনটিতেও এই শ্লোক-তিনটি দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্লোক-তিনটি এই,—

গোপেশ্বরীবদনফুৎকৃতি-লোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনু সঞ্চরন্তম্।
কঞ্চিন্নবস্মিতসুধা-মধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি।।

(পদ্যাবলী, ১৩১ শ্লোক)

তল্পং কল্পয় দূতি পল্লবকুলৈরন্তর্লতামণ্ডপে
নির্ব্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি।
পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্ধতমসং বৃন্দাটবীং তস্তরে
তদ্‌গোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে।।

(পদ্যাবলী, ২১২ শ্লোক)

প্রথয়তি ন তথা মর্ম্মার্ত্তিমুচ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ
কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে
দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ।।

(পদ্যাবলী, ৩৩১ শ্লোক)

দ্বিতীয় পদ্যটী Deccan College Paper Mss-এ (৬৭ নং, ১৮৭৩-৭৪) "রূপস্য" অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর কৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি (১০৯১ নং) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে (২৪২০ ও ৩০৯৪০ নং) এবং বহরমপুরের শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত পুস্তকে এই শ্লোকটী শ্রীরঘুনাথদাসের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদ্যাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও শেষোক্ত তৃতীয় শ্লোকটী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের হস্তলিখিত পুঁথিতে এই শ্লোকের রচয়িতার নামের স্থলে 'হরেঃ' এইরূপ দৃষ্ট হয়। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতেও রচয়িতার নাম-নির্দ্দেশ নাই। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সম্পাদিত পদ্যাবলীতে "রাঙ্গস্য" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। Deccan College Paper Mss-এ (১৪৭ নং) ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে "কস্যচিৎ" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত 'শ্রীপদকল্পতরু'-নামক বাংলা পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভুর নামে আরোপিত তিনটী বাংলা পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজয়দেব-বন্দনা

জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময়,
পদ্মাবতী-রতিকান্ত।
রাধামাধব- প্রেম-ভকতি-রস,
উজ্জ্বল-মূরতি নিতান্ত।।

'শ্রীগীতগোবিন্দ', গ্রন্থ সুধাময়,
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধা-গোবিন্দ- নিগূঢ়-লীলাগুণ-
পদ্মাবতী-পদবৃন্দ।।

কেন্দুবিল্ব বর- ধাম মনোহর,
অনুখণ করয়ে বিলাস।
রসিক-ভকতগণ, যো সরবস-ধন,
অহনিশি রহু তছু পাশ।।
যুগলবিলাস-গুণ, করু আস্বাদন,
অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণন,
কীয়ে করব লব ওর।।

শ্রীরাধাস্তব

চন্দ্রবদনি ধনি, মৃগনয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণীমণী।।
মধুরিম হাসিনি, কমল-বিকাশিনি,
মোতিম-হারিণি কম্বু-কণ্ঠিনী।
থির-সৌদামিনি, গলিতকাঞ্চন জিনি’,
তনু-রুচি-ধারিণি পিক-বচনী।।
উরজ-লম্বি-বেণি, মেরু ’পর যেন ফণি,
আভরণ বহু মণি, গজ-গমনী।
বীণা-পরিবাদিনি, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
রতিরসে পুলকিনি কৃষ্ণ-মোহিনী।।
সিংহ জিনি’ মাঝ খিণি, তাহে মণি-কিঙ্কিণি,
ঝাঁপি ওঢ়নি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনি, জগজন-বন্দিনি,
দাস রঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী।।

শ্রীমদনগোপালের আরতি

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যমকালকি।
আরতি কিয়ে মদনগোপালকি।।
গো-ঘৃত-রচিত কপূরকি বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থারকি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
বাজত বেণু বিষাণকি।।
চন্দ্রকোটি-জ্যোতি ভানুকোটি-ছবি
মুখশোভা নন্দলালকি।
ময়ূরমুকুট পীতাম্বর শোহে
উরে বৈজয়ন্তী-মালকি।।
চরণকমল 'পর নূপুর বাজে
আজ রি কুসুম গুলাবকি।
সুন্দর লোল কপোলক ছবিসোঁ
নিরখত মদনগোপালকি।।
সুর-নর-মুনিগণ করতহি আরতি
ভক্তবৎসল-প্রতিপালকি।
হুঁ বলি বলি রঘুনাথদাসপ্রভু
মোহন গোকুল-বালকি।।

নিম্নলিখিত গীতটী শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রভুর উদ্দেশ্যে রচিত গীত বলিয়া প্রচলিত। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ এই গীতটী অবধূতবেশে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো, জয় রাধে রাধে।।

দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে, রাধে রাধে।।
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি, রাধে রাধে।
রাধে কানু-মনোমোহিনি, রাধে রাধে।।
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি, রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানু-নন্দিনী, রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) নিয়ম করে' সদাই ডাকে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে, আবার
ডাকে বংশীতটে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার
ডাকে কুঞ্জবনে, রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার
ডাকে শ্যামকুণ্ডে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে, আবার
ডাকে গোবর্দ্ধনে, রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে, আবার
ডাকে তমালবনে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায়, ব্রজের ধূলায়
গড়াগড়ি যায়, রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) মুখে 'রাধা রাধা' বলে, ভেসে' নয়নের
জলে, রাধে রাধে।
(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কেঁদে' বেড়ায়
'রাধা' বলি', রাধে রাধে।।
(গোসাঞী) ছাপান্নদণ্ড রাত্রদিনে, জানে না
রাধা-গোবিন্দ বিনে, রাধে রাধে।

(তারপর) চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপনে রাধা-গোবিন্দ
দেখে, রাধে রাধে।।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর 'শিষ্য'-নামে প্রচারিত ('প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থানুসারে) 'শ্রীরাধাবল্লভদাস'-নামে এক প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর একটী সংক্ষিপ্ত চরিত পদ্যাকারে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

অথ রঘুনাথদাস-গোস্বামিনাং গুণবর্ণনং যথা।

শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস-চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা-গৃহসম্পদ, নিজরাজ্য-অধিপদ,
মলপ্রায় সকল ত্যজিল।।
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণনামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথদাস,
নয়নগোচর হ'বে কবে।।
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, 'রাধাকৃষ্ণ'-নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিলা তাহারে।।
চৈতন্যের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি' করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা।।
ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিলা তা'র জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া,
বাস করি' নিয়ম করিলা।।

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজফল গব্য খান,
অন্ন-আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি', স্মরণ-কীর্ত্তন করি',
রাধাপদ ভজন যাহার।।
ছাপ্পান্নদণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণে ত' সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়।।
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনভৃঙ্গ-রাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ-সনে, গতি যা'র সনাতনে,
ভট্টযুগপ্রিয় মহাশয়।।
শ্রীরূপের গণ যত, তা'র পদ-আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যা'র জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি', কাঁদি' বলে 'হরি হরি,
প্রভুর করুণা হ'বে কবে।।
হে রাধাবল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব,
রাধিকা-রমণ, রাধা-নাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ।।
শ্রীরূপ-সনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাহাঁ দেখি, বৃথা প্রাণ কাহাঁ রাখি',
এত বলি' করয়ে ক্রন্দন।।
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তা'র গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।

গুপ্ত ব্যক্ত লীলস্থলে, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব
সভারে করয়ে পরণাম।।
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখ রুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি' দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার।।
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেই দিনে,
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি' দিল তবে,
"রাধাকৃষ্ণ" বলি' রাখে প্রাণ।।
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি' তাহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণকথা-আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে।।
"হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, থা বিশাখা-ললিতা,
কৃপা করি' দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন।।"
কান্দে গোসাঞি রাত্রিদিনে, পুড়ি' যায় তনু-মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ—অনাহার, আপনাকে দেহ-ভার,
বিরহে হইল জরজর।।
রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি' সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি'
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ।।

সেই রঘুনাথদাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ-দাস, মনে বড় অভিলায,
প্রভু মোরে কর পরসাদ।।

শ্রীরাধাসেবাসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভময় দিব্যোন্মাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ে সম্ভোগগন্ধের লেশমাত্র থাকিতে উপলব্ধি হয় না। কিরূপ সহজসিদ্ধ সুতীব্রতম অনুরাগপরাকাষ্ঠা এবং নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সুগভীর—সুগম্ভীর আবেশ ও অভিনিবেশের সহিত শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রভু শ্রীরাধাদাস্যের জন্য সর্ব্বাঙ্গ নিজেশ্বরীর শ্রীকুণ্ডে আহুতিপ্রদান করিয়াছেন! সমগ্র জীবনীশক্তি, সমগ্র সত্তা, আনখকেশাগ্র, সর্ব্বাঙ্গ, সমগ্র চিন্তা, অস্মিতা, প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য—সর্ব্বস্ব নিজাভীষ্টা শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীরূপমঞ্জরী ও তদারাধ্যা নিজেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর দাস্যলাভের জন্য যে পণ করিয়াছেন, তাহা কোনপ্রকার মর্ত্ত্য ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে না। শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর চিত্তবৃত্তির ইঙ্গিত পাইবার যোগ্যতা নৃলোকে দুর্ল্লভ। কেবল যাঁহারা সেই শ্রীরূপানুগ বরের বিশেষ কৃপামৃতাভিষেকে সুনির্ম্মল-হৃদয় হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য দিব্যোন্মাদময়ী ভজনবিলাসসিন্ধুকণার প্রতি লোভবিশিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল রঘুনাথের বিপ্রলম্ভময় বৈরাগ্য যে কোন্ ভূমিকায় অবস্থিত, তাহা পৃথিবীর কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিভজন-প্রয়াসিগণের দুই প্রকার গতির কথা বলিয়া থাকেন। যাঁহারা বৈধমার্গে ভজন-প্রয়াসী অর্থাৎ যাঁহারা শাসন, লগুড়, দণ্ড প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া হরিভজনের জন্য ক্ষীণা চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের গতি শামুকের গতির ন্যায়; আর যাঁহারা রাগাত্মিকাজনের সুতীব্র সেবাদর্শের লোভে লুব্ধ হইয়া অতিশয় অনুরাগ, অভিনিবেশ ও আবেশের সহিত হরিভজনে অগ্রসর হন, তাঁহাদের গতি এরোপ্লেন বা আকাশযানের গতির ন্যায় প্রবল বেগশালিনী। ঐরূপ সুপ্রবল বেগশালী কোটী কোটী আকাশযানের গতিকে অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর দিব্যোন্মাদের স্বাভাবিকী বিদ্যুৎ-প্রগতি স্বয়ং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাবকান্তিতে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরেরও বিস্ময় ও প্রীতি উৎপাদন করিয়াছে।

শ্রী শ্রীনিবাস-আচার্য্য

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিরহবিধুর হইয়া শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে সপার্ষদ ভগবদ্বিরহ-বিলাপগীতি গান করিয়াছিলেন, তাহা ভক্ত মাত্রেরই নিত্য কণ্ঠমালিকা হইয়াছে।

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।"

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম আরও গাহিয়াছেন,—

"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস।।"

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা সুহৃৎ হইলেও তিনি শ্রীআচার্য্যপ্রভুর ভৃত্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রতি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কতটা প্রীতি ছিল, তাহা ইহা দ্বারাই বেশ উপলব্ধি হয়। শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি। যেমন শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গা-শক্তিরূপে শ্রীব্রজমণ্ডলে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ অপর-শক্তি শ্রীগৌড়-মণ্ডলে বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গের গ্রন্থবিস্তার করিয়াছেন। এই শেষোক্ত শ্রীগৌরশক্তিই শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু।

"শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ। অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদি-শ্রীমদ্রূপগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। অপরয়া শক্ত্যা গৌড়-মণ্ডলে মহাজনসংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোতি।"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ-ধৃত পত্রিকা)

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীগৌরলীলা ও শ্রীব্রজলীলার পরিকর—তিনি শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নিজজন। স্বয়ং শ্রীশ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে "মহত্তম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

শ্রীগঙ্গাতটে চাখন্দি নামক গ্রামে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথে দাঁইহাট-ষ্টেশন হইতে চাখন্দি গ্রামে যাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাটোয়ায় সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করেন, সেই সময় শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীলালা দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন শ্রীগঙ্গাধর শ্রীগৌরসুন্দরের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নাম শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু-গঙ্গায় ভাসিতে থাকেন। শ্রীগঙ্গাধর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীচৈতন্য' বলিয়া সর্ব্বদা আর্ত্তনাদ করেন। স্নান-ভোজনাদি-ক্রিয়া সমস্ত ভুলিয়া 'শ্রীচৈতন্য'-নামে প্রমত্ত হইয়া চাখন্দিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া ধারণা করেন। তন্মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কেহ কেহ তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্যের বাতুল' জানিয়া তাঁহার নাম 'শ্রীচৈতন্যদাস' রাখেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবই তাঁহাকে ভাল করিয়া দিবেন, ইহা বলিতে থাকেন। শ্রীগঙ্গাধর "শ্রীচৈতন্যদাস"-নাম প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হন।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। শ্রীখণ্ডের নিকটে যাজিগ্রামে শ্রীচৈতন্যদাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা শ্রীবলরাম বিপ্র বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্য দাস সহধর্ম্মিণীর সহিত যাজিগ্রাম হইয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখচন্দ্র-দর্শনের উৎকণ্ঠাই তাঁহাদের একমাত্র পাথেয় হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া শ্রীচৈতন্যদাসের পিপাসিত হৃদয় তৃপ্ত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, অপুত্রক শ্রীগঙ্গাধর পুত্র-কামনা করিয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার গৃহে মহাভাগবত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন।

পুত্রের কামনা করি' আইল ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস-নামে তাঁর হইবে নন্দন।।
শ্রীরূপাদি-দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব।
শ্রীনিবাস-দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদাসকে শীঘ্র গৌড়দেশে গমন করিয়া নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যদাস সহধর্ম্মিণী-সহ চাখন্দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় বৈশাখী-পূর্ণিমায় রোহিণী-নক্ষত্রে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর ক্রোড়ে এক অপূর্ব্ব-দর্শন পুত্ররত্ন আবির্ভূত হন। কিছুদিন পরে শ্রীচৈতন্যদাস পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন-মহোৎসব করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি স্মরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদাস পুত্রের নাম রাখিলেন—'শ্রীনিবাস'। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী শিশুকাল হইতেই বালককে নাম-সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

অরে বাপ! বল দেখি গৌর বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি শচীর কুমার।।
গদাধর-প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ হলধর।।
বল দেখি—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দয়াময়।
বল দেখি—রাধাকৃষ্ণ শ্রীনন্দতনয়।।
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
ঐছে কহে প্রভু-পরিকর-নামগণ।।
শুনি' শ্রীনিবাস অতি উল্লাস অন্তরে।
কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে নারে।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ২।১৭৬-১৮০)

ক্রমে শ্রীনিবাসের চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কার হইল। ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রীনিবাস অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন।

চাখন্দির নিকট যে সকল শ্রীগৌর-ভক্তের বাস ছিল, বালক শ্রীনিবাস তাঁহাদের গৃহে প্রায়ই গমন করিয়া শ্রীগৌরগুণগাথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর শ্রীনিবাসকে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকথা বলিতেন। শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ সকলেই শ্রীনিবাসকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একসময় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁহার গোষ্ঠীর সহিত যাজিগ্রামের পথে গঙ্গাস্নানে আগমন করিয়া শ্রীনিবাসের

প্রতি প্রচুর কৃপা ও স্নেহবর্ষণ করিলেন। শ্রীনিবাস নিজ পিতৃদেব শ্রীচৈতন্যদাসের শ্রীমুখেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ লীলাকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সময় সময় শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীনিবাসের নিকট শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের চরিত এবং তাঁহাদের অদ্ভুত শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রীতির কথা বর্ণন করিতেন। মাতা, পিতা ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত ভক্তগণের শ্রীমুখে শিশুকাল হইতেই শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে অচিরেই শ্রীনিবাসের শ্রীগৌরসুন্দরে নিত্যসিদ্ধা প্রীতির উদয় হইল। চাখন্দি হইতে যাজিগ্রামে মাতামহের আলয়ে আগমন করিয়া শ্রীনিবাস মাতার সহিত যাজিগ্রামে বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, তথায় বাস করিলে শ্রীখণ্ডবাসী গৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের সর্ব্বদা সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন।

সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ শ্রীনিবাস নীলাচলে গমনের সঙ্কল্প করিলেন। নীলাচল-যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডে শ্রীল সরকার ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌর-পার্ষদগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীল সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর তর্জ্জার উল্লেখ করিয়া শ্রীনিবাসকে বলিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর অচিরেই অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিবেন, সুতরাং শ্রীনিবাসের ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-দর্শনে গমন করা কর্ত্তব্য। শ্রীখণ্ডবাসিগণের আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ এবং মাতার সমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীনিবাস নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নীলাচলের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর শ্রীগৌরসুন্দরের সংগোপন-বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীনিবাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন—

কতশত করাঘাত করে নিজ শিরে।
ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ, নখে বক্ষঃ চিরে।।
আপনা ধিক্কার করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
সে বিলাপ শুনি' যায় পাষাণ গলিয়া।।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বার বার।
নেত্রধারা দেখি' প্রাণ বিদরে সবার।।
অতি কদর্থনে হইল দিবা-অবসান।
নিশ্চয় করিল—দেহে না রাখিব প্রাণ।।

অগ্নিকুণ্ড করি' তাহে করিব প্রবেশ।
তবে সে ঘুচিবে মোর এ দারুণ ক্লেশ।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৩।৬৬-৭০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিবাসের নয়নে তন্দ্রা আকর্ষণ করিয়া স্বপ্নসমাধি মধ্যে তাঁহাকে দর্শন দান এবং শ্রীনিবাসকে নীলাচলে যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীনৃসিংহকবিরাজ-কৃত একটি শ্লোকে শ্রীনিবাসের এই সময়ের অবস্থাটী বর্ণিত আছে—

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুমূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্।।

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীনিবাস কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটলীলা-সঙ্গোপন-বার্ত্তা লোকমুখে শুনিয়া অতি দুঃখে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে থাকিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্তের দুঃখ দর্শনে শ্রীনিবাসকে নিজ-কৃপা জ্ঞাপন করিবার জন্য স্বপ্নে অনেক আশ্বাস-বাক্য বলিলেন।

শ্রীনিবাস শ্রীগৌরসুন্দরের স্বপ্নাদেশানুসারে নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের দর্শন করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীশিখি মাহিতি, শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য—সকলকেই শ্রীগৌর-বিরহে আহার-নিদ্রাদি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ কেবল শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাকথা-কীর্ত্তন তৎপর দেখিতে পাইলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভু তখন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভুর অদর্শনে বিরহোন্মত্ত হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের যে দশা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের সমাধির নিকট গিয়া শ্রীনিবাস আর্ত্তিময় বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়া শ্রীল গদাধরের শ্রীগোপীনাথ দর্শন এবং পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিলেন। শ্রীল

গদাধরের আদেশে শ্রীনিবাস গৌড়দেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীখণ্ডে গমন-পূর্ব্বক শ্রীল সরকার ঠাকুর প্রভৃতি গৌরপ্রণয়ি-ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভুর সঙ্গোপনবার্ত্তা বর্ণন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীনিবাসের প্রাণ পুনরায় নীলাচল গমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, এইবার শ্রীল গদাধর প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও তাঁহার নিকট অবস্থান করিবেন। কিন্তু নীলাচলাভিমুখে গমন করিতে করিতে নীলাচল হইতে প্রত্যাবৃত্ত পথিকগণের মুখে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তা শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দর্শন লাভ করিয়া কিছু স্থির হইলে তাঁহাদের আদেশানুসারে শ্রীনবদ্বীপ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনের সঙ্কল্প করিলেন। গৌড়দেশের পথে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণে শ্রীনিবাসের যে কি দশা হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীনিবাস শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরবিরহে আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরগৃহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরবিরহে নিদ্রা-বিশ্রামাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অষ্টপ্রহর শ্রীহরিনামকীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের জন্য এক-একটি তণ্ডুলের দ্বারা শ্রীহরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া সেই তণ্ডুল রন্ধন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অর্পণ করিতেন এবং সেই প্রসাদই কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্নেহাশীর্ব্বাদ ও উপদেশ লাভ করিয়া এবং শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীনিবাস শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবনে গমন করিলেন। শ্রীসীতাদেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ভবনে আগমন করিলেন। তথায় শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা-দেবীর কৃপা এবং শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া খানাকুলে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে পুনরায় শ্রীখণ্ড ও যাজিগ্রাম হইয়া শুক্লা দ্বিতীয়া-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, মৌড়েশ্বর, একচাকা প্রভৃতি সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থানসমূহ দর্শন করিয়া গয়ায় শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম এবং কাশী, অযোধ্যা ও প্রয়াগ-দর্শনান্তে শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভু অপ্রকট- লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরহে শ্রীনিবাসের যে কি দশা হইয়াছিল, তাহা একমাত্র

মর্ম্মজ্ঞগণেরই উপলব্ধির বিষয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনৃসিংহ-কবিরাজের নবপদ্যে এইরূপ বর্ণন আছে—

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ।
প্রোচুস্তং ন হি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয়।।

শ্রীল সনাতন প্রভু-সহ তাঁহারা—শ্রীরূপপ্রমুখ গোস্বামিগণ স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে আদেশ করিলেন,—"তোমার এখন বিষাদের সময় নহে, যেহেতু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রকটলীলা করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোপাল-মন্ত্র ও আমাদের রচিত সমগ্র গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে গমন কর; তথায় শ্রীস্বরূপরূপানুগ-সম্মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রচার কর এবং বৈষ্ণবগণকে শিক্ষা দান কর।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির পর শ্রীনিবাস শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পাইলেন। শ্রীজীবপ্রভু অত্যন্ত স্নেহকৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীনিবাসকে একটি নির্জ্জনস্থানে বাসস্থান প্রদান এবং তাঁহাকে শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীনিবাসকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর সমীপে লইয়া গিয়া শ্রীভট্টগোস্বামিপাদ ও শ্রীরাধা-রমণের শ্রীচরণ দর্শন করাইয়া শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দ ও শ্রীমধুপণ্ডিতের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার পর অন্য একদিন শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীনিবাসকে শ্রীযমুনায় স্নান করাইয়া নিজসঙ্গে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বমি-প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীল ভট্টগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসকে দীক্ষা-মন্ত্রদানের দ্বারা কৃপা এবং শ্রীনিবাসের আর্ত্তি ও অকপটতাদর্শনে "সর্ব্বসিদ্ধি হউক্" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিনজন শিষ্যের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ব্যতিরেকভাবে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার নাম হরিবংশ। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আরও দুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে গৌড়দেশে শ্রীনিবাস প্রভু আর শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীগোপীনাথ পূজারী। বর্ত্তমানে শ্রীল গোপীনাথ পূজারীর বংশের হস্তেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীনিবাস প্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিবার পর-দিবস শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন।

একদিন শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থের উদ্দীপন-বিভাবের একটি শ্লোক আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু ঐ শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যাটি শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীনিবাসের হৃদয়ে ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এরূপ সুন্দরভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দ সেই ব্যাখ্যা-শ্রবণে সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন। শ্রীরূপের কৃপোদ্ভাসিত না হইলে এরূপ ব্যাখ্যার স্ফূর্ত্তি কিছুতেই সম্ভব নহে, ইহা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু ও বৈষ্ণববৃন্দ অবধারণ করিলেন। তখন শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু সকল বৈষ্ণবের অনুমতি লইয়া অতি উল্লাস ভরে শ্রীনিবাস প্রভুকে 'আচার্য্য'-পদবী প্রদান করিলেন। তদবধি শ্রীনিবাস বৈষ্ণবসমাজে "শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু" বা "শ্রীআচার্য্য প্রভু" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু তদবধি ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণকে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে খেতুরী হইতে শ্রীল নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মিলন হইল। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনরোত্তমকেও 'ঠাকুর মহাশয়'-পদবী প্রদান করিলেন।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর অনুজ্ঞানুসারে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল রাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাস-আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সমগ্র ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। শ্রীরাঘব গোস্বামি-প্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থান সমূহের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উহা দর্শন করান।

কিছুদিন পরে উৎকলের দণ্ডকেশ্বর-গ্রাম হইতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য "দুঃখী কৃষ্ণদাস" শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে শ্রীমদ্ভাগবত

অধ্যয়ন করাইয়া 'শ্রীশ্যামানন্দ'-নাম রাখিলেন ও তাঁহাকে ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য করিয়া শ্রীনিবাস-আচার্য্যের নিকট সমর্পণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কিছুদিন শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তনপদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতী-বিদ্যায় তিনজনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ, একাশয় ও হৃদয়বন্ধু। তাঁহারা ব্রজরসজ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশারদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভুবংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসনরহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু শ্রীবীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র-স্বভাববশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলমাল। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থী প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। তাহারা স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের দোহাই দিয়া দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি শ্রীব্রজে থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা-শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীগোস্বামিবৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর সহিত স্থির করিলেন যে, গ্রন্থসমূহ শ্রীনিবাসের হস্তে প্রদান করিয়া তাহা গৌড়দেশে বিস্তার করিবার জন্য অচিরেই প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

একদিন শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরে বৈষ্ণবগণের সহিত একত্রিত হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—"হে শ্রীগোবিন্দদেব! শ্রীনিবাসকে শ্রীগ্রন্থ-প্রচার-শক্তি প্রদান কর।" ইহা বলিতেই শ্রীগোবিন্দের কণ্ঠ হইতে একটি পুষ্পমালিকা ছিঁড়িয়া পড়িল। শ্রীগোবিন্দের পূজারী ঐ মালা লইয়া যত্নের সহিত শ্রীনিবাসকে প্রদান করিলেন। শ্রীগোবিন্দের

কৃপা শ্রীনিবাসের উপর বর্ষিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ অগ্রহায়ণ-মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে গৌড়দেশে যাত্রার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভু, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমধু পণ্ডিত প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ ও অন্যান্য মহান্ত-বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। বহু বৈষ্ণব-মহান্তের সম্মুখে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু সমস্ত গ্রন্থরত্ন আনয়ন করিয়া সম্পুটের মধ্যে সাবধানে রক্ষা করিলেন। মথুরায় কোন সৌভাগ্যবান্ ধনী গ্রন্থাদি-বহনের জন্য শকট, বর্ষা-ভয়-নিবারণের জন্য কাষ্ঠ-সম্পূট ও অগ্র-পশ্চাতে পদাতিকসমূহ প্রেরণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিলেন। অগ্রে ও পশ্চাতে রক্ষী পদাতিকগণ গ্রন্থ রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু মথুরা পর্য্যন্ত শ্রীগ্রন্থসম্পূটের অনুগমন করিলেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয় গ্রন্থের সহিত গৌড়দেশাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা গৌড়দেশের পথে বন-বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইয়া যখন রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তথাকার দস্যুস্বভাব রাজা বীর-হাম্বীরের ব্যক্তিগণ গ্রন্থপূর্ণ সম্পূটকে ধনরত্নাদিপূর্ণ মঞ্জুষা মনে করিয়া উহা অপহরণ করিল এবং বীরহাম্বীরের নিকট লইয়া গেল। প্রভাতকালে শ্রীনিবাস-আচার্য্যাদি প্রভুত্রয় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ গ্রন্থাদির অন্বেষণ করিলেন। গ্রন্থসম্পূট দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদের যে কি দশা হইল, তাহা কেহ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না।

কোন কোন ব্যক্তি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে জানাইলেন যে, রাজার নিকট ইহা অবিলম্বে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপুরেই এই সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই আছে। এদিকে শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে খেতুরী-গ্রামে ও শ্রীশ্যামানন্দকে উৎকলে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু একাকী রাজভবনে গমনের সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-নামে এক ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহারই নিকট শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু জানিতে পারিলেন যে, রাজা বীরহাম্বীর প্রত্যহ এক ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণবল্লভকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীল আচার্য্য প্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে রাজা শ্রীআচার্য্য-

পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। রাজার প্রার্থনানুসারে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীবীরহাম্বীরের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল এবং আচার্য্যপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিজ অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণ রত্নপূর্ণ মঞ্জুষা ভাবিয়া কিরূপে গ্রন্থ অপহরণ করিয়াছে এবং সম্পূট উন্মোচন করিবার পর উহাতে শ্রীগ্রন্থরাজি-দর্শনে তাঁহার চিত্তের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—সমস্ত কথা শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর শ্রীচরণে ক্রন্দন ও ক্ষমাভিক্ষা করিতে করিতে নিবেদন করিলেন।

'প্রেমবিলাসে' নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক গল্প মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহার ত্রয়োদশবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হওয়ার সংবাদ শ্রীব্রজমণ্ডলে পৌঁছিলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থ চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল জানিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝম্ফপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। বস্তুতঃ অন্য কোন প্রামাণিক ইতিহাস ইহা সমর্থন করে না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভৃগুপাত-চেষ্টা ও শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপ্রভুর নীলাচলে শ্রীরথচক্রের নিম্নে দেহত্যাগের সঙ্কল্পের প্রতিকূলেই শ্রীমহাপ্রভুর বিচার লিপিবদ্ধ আছে।

রাজার হৃদয়ে অনুশোচনা ও দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু বলিলেন,—"তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর কৃপা হইয়াছে। তুমি আপনাকে সর্ব্বক্ষণ অপরাধী জানিয়া অবিরাম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কর। ইহা বলিয়া শ্রীবীরহাম্বীরকে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীবীরহাম্বীরের প্রার্থনানুসারে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামিগণের নিকট এবং শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দের নিকট গ্রন্থ-পুনঃপ্রাপ্তি ও শ্রীবীরহাম্বিরের চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কথা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। যে যানে গ্রন্থ আসিয়াছিল, তাহা বিবিধ সেবোপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীবীরহাম্বীরকে কৃপা করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গোস্বামিগণের আজ্ঞানুসারে গৌড়দেশে গ্রন্থপ্রচার আরম্ভ করিলেন।

শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দনাদি শ্রীখণ্ডবাসিগণ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে বাৎসল্যভরে স্নেহ করিতেন। কিছুকাল পরে শ্রীরঘুনন্দন যাজিগ্রামে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যের

বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। যাজিগ্রামে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শ্রীদ্রৌপদী দেবীর সহিত বৈশাখ-মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। শ্রীদ্রৌপদী দেবী শ্রীল আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র লাভ করিয়া 'ঈশ্বরী'-নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী সামাজিক সম্বন্ধে শ্বশুর ও পূজাস্পদ হইলেও শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীশ্যামদাস ও শ্রীরামচন্দ্র নামান্তর শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরামচরণও আচার্য্যপ্রভুর শিষ্য হইলেন। আচার্য্যপ্রভুর বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীল দাস গদাধর প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বহু শ্রদ্ধালু শিষ্যকে গোস্বামি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নামক এক প্রতিষ্ঠাশালী দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এই শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নামই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'র ভণিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার পরে শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীল দাস গদাধর প্রভু ও শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কার করিলে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীল দ্বিজ-হরিদাসের অপ্রকট-লীলার কথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু প্রভৃতি গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-লীলাকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুর হইয়া তথায় শ্রীবীরহাম্বীরকে শ্রীযুগল-মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর অনুজ্ঞানুসারে তাঁহার নাম 'শ্রীচৈতন্যদাস' রাখিলেন। শ্রীবীরহাম্বীরের রাণী ও রাজকুমার শ্রীধাড়িহাম্বীরও শ্রীল আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইলেন। শ্রীল আচার্য্যপ্রভু শ্রীচৈতন্যদাসের (শ্রীবীরহাম্বীরের) দ্বারা শ্রীকালাচাঁদের সেবা প্রকাশ করাইলেন এবং প্রতিষ্ঠা-দিবসে স্বয়ং সেই শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর ও শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া যাজিগ্রামে আগমন করিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর আদেশক্রমে যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে ছয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন শ্রীজাহ্নবাদেবীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুই শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক ও অর্চ্চন সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

খেতুরী-মহোৎসবের প্রসঙ্গে 'প্রেমবিলাসে'র ১৯শ বিলাসে আরও কয়েকটী সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বিচার ও আচারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহাতে লিখিত রহিয়াছে যে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু খেতুরীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-মন্ত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা ও অভিষেক সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং গোস্বামিগণও দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রেই শ্রীগৌরপূজার বিধান দিয়াছেন। শ্রীজাহ্নবাদেবীও তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। তৎপরেই লিখিত রহিয়াছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরজন্মতিথিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সকলেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এইরূপ বিচার ও আচার শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরজন্মতিথির সেবা-বিরোধী কোনও অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা 'প্রেমবিলাসে' রচিত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১০ম তরঙ্গে) এইরূপ কোনও বর্ণন বা বিচার দৃষ্ট হয় না; বরং তাহাতে শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু—

> অপূর্ব্ব বিধানে পূজা করি' মহাসুখে।
> করে আরাত্রিক—সবে দেখেন কৌতুকে।।

আর—

> নরোত্তম সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈয়া।
> প্রণময়ে শ্রীপ্রভুগণের নাম লৈয়া।।
> গৌরাঙ্গ! বল্লভীকান্ত! শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজমোহন!
> রাধারমণ! হে রাধে! রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে।।

(ভক্তিরত্নাকর ১০।৪৯২, ৪৯৫-৪৯৬)

এই 'অপূর্ব্ববিধানে পূজা' ও প্রত্যেক শ্রীমূর্ত্তির শ্রীনামগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবার প্রসঙ্গোল্লেখ দ্বারা প্রত্যেক ভগবৎস্বরূপেরই যে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের দ্বারাই পূজা হইয়াছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। শ্রীভগবানের স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলার যেরূপ বিচিত্রতা আছে, তদ্রূপ তাঁহাদের পূজাবিধানের মন্ত্রেরও বিচিত্রতা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহা শাস্ত্র ও মহাজন উভয়ই সমর্থন করেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীগৌরজন্মতিথিদিবস শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্মাভিষেক ও সারা রাত্র ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীত-সংকীর্ত্তনে যাপন করিয়াছিলেন এবং তৎপর-দিবস শ্রীজাহ্নবাদেবী সকল বৈষ্ণবকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন ও স্বয়ং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

*   *   ধন্য ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী।
এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী।।
কি অদ্ভুত প্রভুপরিকরের চরিত।
গায়েন প্রভুর জন্ম-অভিষেক-গীত।।
হইল প্রভুর অভিষেক সমাধান।
ক্রমে গান বাড়ে—নহে গানের বিরাম।।
গানানন্দে নিমগ্ন হইলা অতিশয়।
পোহাইল নিশি কৈছে কিছু না জানয়।।
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া সর্ব্বজন।
শ্রীমঙ্গল-আরাত্রিক করিলা দর্শন।।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হইয়া।
প্রাতঃকালে করিলেন স্নানাহ্নিক-ক্রিয়া।।
পরম উৎসাহে কৈলা অপূর্ব্ব রন্ধন।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন।।
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে।
ভোগ সমর্পণ কৈলা অপূর্ব্ব বিধানে।।

*   *   *

শ্রীনিবাস আদি আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
ভুঞ্জিলেন,—শ্রীঈশ্বরী যত্নে ভুঞ্জাইল।।
(ভক্তিরত্নাকর ১০।৬৭৫, ৬৮১-৬৮৪, ৬৮৬-৬৮৮, ৭০৭)

বিশেষতঃ 'প্রেমবিলাসে'র ১৯শ ও ২০শ বিলাস প্রামাণিক অংশ নহে। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহরমপুর হইতে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে যে 'প্রেমবিলাসে'র সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, তিনি যে চারিখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনখানিতেই ১৮শ বিলাস পর্য্যন্ত ছিল। ইহা হইতেও জানা যায় যে, ১৯শ ও ২০শ বিলাস কোন অভিসন্ধিযুক্ত

ব্যক্তির পরবর্ত্তীকালের রচনা। এতদ্ব্যতীত 'প্রেমবিলাসে'র স্থানে স্থানেও নানাপ্রকার অপসিদ্ধান্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহার পর শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু তাঁহার অভিন্নাত্মা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের বর্ষীয়ান্ ভক্তবর শ্রীঈশান প্রভু তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরলীলাস্থল-সমূহ প্রদর্শন করান। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু সঙ্গিগণের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর হইয়া যাজিগ্রামে গমন করেন। তখন রাজা বীরহাম্বীর শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনার্থ যাজিগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীআচার্য্যপ্রভু শ্রীখণ্ড ও বুধরি হইয়া খেতুরীতে আগমনপূর্ব্বক অষ্টপ্রহর সংকীর্ত্তনরসে মগ্ন ছিলেন। তথায় তার্কিক ও বিষয়ী ব্যক্তিগণও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হয়। একদিন শ্রীল আচার্য্য-প্রভু শ্রীখণ্ডে শ্রীল রঘুনন্দন প্রভুর নিকট গমন করিলে শ্রীল রঘুনন্দন প্রভু ভাবিকালে যে-সকল কুতর্ক ও সন্দেহ লোকের হৃদয়ে উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে শ্রীআচার্য্যপ্রভুকে ইঙ্গিত প্রদান করিয়া শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর শুদ্ধভক্তিপ্রচারের ফলে আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণেরই ঐ সকল সন্দেহ-সাগর উত্তীর্ণ হইবার কথা জ্ঞাপন করেন।

ইহার পর শ্রীল রঘুনন্দন নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার পুত্র ঠাকুর কানাই শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুকে লইয়া শ্রীখণ্ডে বিরহ-উৎসব সম্পন্ন করেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু শ্রীখণ্ড হইতে যাজিগ্রাম হইয়া বনবিষ্ণুপুরে গমনপূর্ব্বক তথায় কীর্ত্তন-প্রচার করেন। এই সময় শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ-লীলা প্রকাশ করেন। রাঢ়দেশের গোপালপুর গ্রামের শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তীর সুবিনীতা দুহিতা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া শ্রীআচার্য্যপ্রভুকে পতিত্বে বরণ করিয়া কৃতকৃতার্থা হন। মহারাজ বীরহাম্বীর (শ্রীচৈতন্যদাস) শ্রীগুরুদেবের বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করেন।

'প্রেমবিলাস'-নামক গ্রন্থের কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত পদে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাকে হেয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরূপ বিচার কতিপয় ফল্গুত্যাগী, অতিবৈরাগীর অত্যন্ত অপরাধময় ভক্তিবিরুদ্ধ বিচার, সন্দেহ নাই। ঐ বিচারের অনুসরণ করিয়া কতিপয় অর্ব্বাচীন সাহিত্যিকও অনধিকার-চর্চ্চা করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের মতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খুব

বৈরাগ্যবান্ ছিলেন; কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু পূর্ব্বে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিলেও পরে দুই দুইবার দারপরিগ্রহ ও কতিপয় সন্তানের জনক হওয়ায় পূর্ব্ব আদর্শ হইতে স্খলিত (?) হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রথম দার-পরিগ্রহ-লীলার পরেই শ্রীআচার্য্য প্রভুকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও স্বরচিত 'প্রার্থনা'য়—'দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস' বলিয়া আচার্য্যপ্রভুর করুণা-ভিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শ্রীল নরোত্তম প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দের সহিত সমগ্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে গৃহস্থ ও ত্যাগী উভয়কুলের দ্বারাই নিত্য পূজিত হইতেছেন। শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শিষ্যব্রুব রূপকবিরাজ নামক এক ব্যক্তি আচার্য্য প্রভুকে 'গৃহস্থ' বলিয়া অপরাধ করায় শ্রীআচার্য্য-দুহিতা হেমলতা ঠাকুরাণী রূপকবিরাজের কণ্ঠমালিকা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন। তদবধি রূপকবিরাজ 'বঙ্গীয় অতিবাড়ী' বলিয়া সমস্ত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদ ত্যাগিকুল শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন। সুতরাং মহাভাগবতবর শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর বিবাহ-লীলা জীবশিক্ষার জন্য সন্দেহ নাই অর্থাৎ গৃহব্রতগণ যাহাতে গুরুদেবের অনুকরণ না করে এবং ত্যাগিব্রুবগণও যাহাতে মহাভাগবতবরকে স্ত্রীপুত্রাসক্ত গৃহমেধী মনে করিয়া বঞ্চিত না হয়, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর বিবাহলীলায় গৌরপার্ষদগণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর নিকট দুইটী পত্র প্রেরণ করিয়া শ্রীব্রজে শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামি-চরণের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের কথা এবং শ্রীরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীমাধব-মহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূর উত্তর-চম্পূ, শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থলিখন-কার্য্য কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করেন। সেই পত্রিকা-মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বৃন্দাবন দাসের ও অন্যান্য আচার্য্য-শিষ্যগণের কুশল-সংবাদও জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর পুত্রের নাম 'শ্রীবৃন্দাবনদাস' রাখিয়াছিলেন। যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

পত্রী-মধ্যে বৃন্দাবনদাস নাম যাঁর।
তেহোঁ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার।।

পুত্র হবা মাত্র ব্রজে সংবাদ হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে এ নাম থুইল।।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৪।১৯-২০)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু তাঁহার দ্বিতীয় পত্রিকায় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে 'সমস্ত-গুণ-প্রশস্ত-বন্ধুবর-শ্রীনিবাস-আচার্য্য-মহত্তমেষু' বলিয়া পাঠ লিখিয়াছেন। ঐ পত্রিকায় শ্রীব্রজমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত সংবাদ, বৈষ্ণবতোষণী, দুর্গমসঙ্গমনী, গোপালচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থ-সংশোধনের সংবাদ, পূর্ব্বে প্রেরিত শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ—যাহা শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর সহিত প্রেরিত হইয়াছিল, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে তাহা সংশোধন করিবার আজ্ঞা এবং উত্তর-গোপালচম্পূ রচনার প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গৌড়দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া গ্রন্থ-বিস্তার ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রচার করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য শ্রীহরিরামাচার্য্য সর্ব্বত্র শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর অপ্রকটের পর তেজস্বিতার সহিত শুদ্ধভক্তি প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীযদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দে' শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর রচিত পদাবলীর উল্লেখ ও আদর্শ দৃষ্ট হয়।

'কর্ণানন্দে' শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর কন্যাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

জ্যেষ্ঠ হেমলতা, মধ্যমা কৃষ্ণপ্রিয়া হয়।
কাঞ্চনলতিকা কন্যা কনিষ্ঠ কহয়।।
ইঁহাদের শাখা-উপশাখা হ'বে যত।
ভাগ্যবন্ত-জনে তাহা করিবে বেকত।।

তাঁহার শিষ্য শ্রীযদুনন্দনদাস বহু গোস্বামি-ভক্তিগ্রন্থের সুমধুর পদ্যানুবাদ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা হইয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

শ্রীযুত শ্রীপ্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণ-লীলার ভাণ্ডার প্রচুর।।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমময়ী তাঁহার নন্দিনী।
শ্রীল হেমলতা নাম ঠাকুরাণী।।
তিহোঁ পদধূলি দিল আমার মস্তকে।
সেই সে ভরসা মোর হঞাছে অধিকে।।

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব)

শ্রীচৈতন্যদাসের দাস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস,
আচার্য্য আর শ্রীল হেমলতা।
তাঁর পাদপদ্ম-আশ, এ যদুনন্দন দাস,
অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা।।

(শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত)

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পুত্র ও বহু শিষ্য পদকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ আচার্য্যপ্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ-প্রণীত 'বীর-রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ—

মহাপ্রভু বীরচন্দ্রামূল্যপদদ্বন্দ্বে।
শ্রীনিবাসসুত কহে এ গতিগোবিন্দে।।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর রচিত পদ বলিয়া দুই-একটি পদ কেহ কেহ উল্লেখ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে 'পদামৃতসমুদ্র'-নামে এক পদ-সঙ্কলন-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহার "মহাভাবানুসারিণী"-নাম্নী একটি সংস্কৃত টীকাও তিনি লিখিয়াছিলেন।

'শ্রীনরোত্তম-বিলাসে' ঘনশ্যাম দাস কর্ণপুর কবিরাজের গুণলেশসূচকের যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর চরিত্রের উপকরণ পাওয়া যায়।

আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয়-ঘণ্টেশ্বরো
নানাশাস্ত্রসুবিজ্ঞনির্ম্মলধিয়া বাল্যে বিজেতা দিশাম্।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুতপদং শ্রুত্বা জনাৎ সর্ব্বকং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্ব্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ।।

রাঢ়ীয় ঘণ্টেশ্বরিকুলে ব্রাহ্মণভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ও নির্ম্মল-বুদ্ধিবলে যিনি বাল্যকালেই দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এবং নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন প্রকট আছেন, ইহা জনমুখে শুনিয়া যিনি তথায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই এই মদীয় করুণাসাগর শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্চৈতন্যসঙ্গোপনং
মূর্চ্ছীভূয় কচান্ লূনন্ স্বশিরসো ঘাতং দধদ্ধিক্কৃতম্।
তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু।।

আহা! যিনি শ্রীপুরুষোত্তমে যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই শ্রীগৌরসুন্দরের তিরোভাব-বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কেবল মূর্চ্ছিতই নহে, মস্তকের কেশ-কলাপ ছিন্নভিন্ন করিয়া মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক শত-শতবার আত্মধিক্কার করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করতঃ স্বয়ং নীলাচলে গমন করিলেন, সেই এই মদীয় করুণানিধি শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

গচ্ছন্ যঃ পথি খণ্ডসংজ্ঞনগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ং
নত্বা শ্রীসরকারঠক্কুরবরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা।
তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যঃ স্মরন্
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু।।

যিনি শ্রীখণ্ডে গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রেষ্ঠ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তৎপরে শ্রীল রঘুনন্দনের শ্রীচরণ অভিবন্দন ও স্মরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই এই মদীয় কৃপাবারিধি শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

অনেকের হৃদয়ে সন্দেহ হয় যে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর শিক্ষাশিষ্য এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর দীক্ষিত শিষ্য হইলেও তাঁহার নাম বা শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর শিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নাম 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কেন উল্লেখিত হয় নাই? ইহার উত্তরে অনেকে

বলেন যে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মারফৎ গৌড়দেশে অন্যান্য গোস্বামি-গ্রন্থের সহিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ প্রেরণ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নিকট 'আচার্য্য' পদবী লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য্য শ্রীনিবাস বা ঠাকুর মহাশয়ের নাম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর গ্রন্থে অনুল্লেখ কিছু অস্বাভাবিক নহে। আমরা প্রাচীন পদকর্ত্তার অনুগমনে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর জয়কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীনতারণ, প্রেম-রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম।। ধ্রু ।।
কাঞ্চনবরণ-হরণ, তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেমনাম করি', কহত 'ভাগবতে',
সোই বরণ তনু সাজে।।
নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গহি,
প্রকট সুচরণারবিন্দে।
নিরবধি বদনহি, নাম বিরাজিত,
"রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে"।।
যুগল-ভজন, লীলা-আস্বাদন,
গ্রন্থকল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনু অধমে, শরণকো দেওব,
গোবিন্দদাস অনাথে।।

'প্রেমবিলাসে' ১৮শ বিলাসের শেষে অর্থাৎ গ্রন্থের উপসংহারে বহরমপুরের সংস্করণে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শাখা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামাদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীল-গোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা।।
ষট্‌চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ।।
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপুর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ।।
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ।।
চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ।।
শ্রীরূপঘটকশ্চাপি সর্ব্ববিখ্যাত এব চ।
শ্রীমৎ-ঠাকুরদাসাখ্যঃ ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ।
মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্।।
এবমষ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ।
মল্লাবনিপতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ।।
শ্রীশ্রীনিবাসকল্পদ্রোঃ শাখাবর্ণনমেব চ।
শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দন-গিরেশচঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীবসুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্।।

শ্রীশ্রীদাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামাদাস, শ্রীব্যাস, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ —ইঁহারা ষট্ (ছয়) চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনরত, বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ ও অখিলজগজ্জনের নিস্তারকারী ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকর্ণপুর, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীভগবান্, শ্রীবল্লবীদাস, শ্রীগোপীরমণ ও শ্রীগোকুল—এই আট জন অষ্ট কবিরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীতে ভক্তিরত্নমালা-বিতরণে নিপুণ; ইঁহারা জয়যুক্ত হউন।

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী 'চট্টরাজ'-নামে বিখ্যাত, শ্রীকুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী 'কুলরাজ' বলিয়া বিশেষরূপে কীর্ত্তিত, শ্রীরাধাবল্লভ 'মণ্ডল' বলিয়া বিঘোষিত, শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী জগতে সুপ্রসিদ্ধ, শ্রীরূপঘটক সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং শ্রীঠাকুরদাস 'ঠাকুর' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত ছিলেন।

মালরাজকুলোৎপন্ন মহারাজাধিরাজ শ্রীবীরহাম্বীর সিংহ ভক্তিমান্ ও অতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন।

শ্রীশ্রীনিবাসকল্পতরুর একবিংশতি শাখা—অষ্ট কবিরাজ, দ্বাদশ বিপ্র বা 'চক্রবর্ত্তী' ও মল্লরাজ (শ্রীবীরহাম্বীর) এইরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখা।

শ্রীগোবিন্দকবিরাজরূপ চন্দনগিরি (মলয়পর্ব্বত) হইতে বসন্তরূপ অনিলের দ্বারা আনীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-সম্বন্ধযুক্ত কবিতাবলীর সৌরভ শ্রীব্রজবনে শ্রীমজ্জীব-গোস্বামিপাদ-কল্পতরু-সেবী ভক্তরূপ ভৃঙ্গগণকে উন্মত্ত করিয়া সকলেরই চমৎকার বিধান করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

শ্রীসারঙ্গদাস ঠাকুর

শ্রীল সারঙ্গদাস ঠাকুরকে কেহ কেহ ‘শ্রীশার্ঙ্গ ঠাকুর’, কেহ কেহ ‘শ্রীশার্ঙ্গপাণি’, কেহ বা ‘শ্রীশার্ঙ্গধর’-নামে অভিহিত করেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীগঙ্গার তীরে বাস করিয়া ভজন করিতেন। তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একটি সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটি সুপ্রাচীন বকুল-বৃক্ষের সম্মুখে শ্রীল শার্ঙ্গমুরারির শ্রীবিগ্রহের একটি মন্দির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীশার্ঙ্গমুরারি শ্রীগৌরপার্ষদ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনে লিখিয়াছেন,—

রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।১১৩)

কথিত হয় যে, শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুর অতিশয় বিবিক্ত-ভজনানন্দীর লীলা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও শিষ্য করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরকে শিষ্য করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রেরণা দান করেন। অবশেষে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করেন যে, তাঁহার সহিত যাঁহার পরদিন প্রত্যুষে সর্ব্বপ্রথমে দেখা হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটি মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তিনি সেই মৃতদেহে পুনর্জীবন প্রদান করিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই ‘শ্রীঠাকুর মুরারি’ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশার্ঙ্গের নামের সহিত ‘মুরারি’ শব্দটি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ‘শার্ঙ্গমুরারি’-নাম এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীঠাকুর মুরারির অনুগগণ বংশপরম্পরায় সম্প্রতি ‘শর্’-নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী ‘শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা’য় লিখিয়াছেন যে, —যিনি ব্রজে ‘শ্রীনান্দীমুখী’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় ‘শ্রীসারঙ্গদাস ঠাকুর’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ ইঁহাকে ‘প্রহ্লাদ’ বলিয়া

মনে করেন, কিন্তু শ্রীল কবিকর্ণপূরের পিতৃদেব শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভুর অভিমত সেরূপ নহে। যথা—

ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠক্কুরঃ।
প্রহ্লাদো মন্যতে কশ্চিন্মৎপিতা স ন মন্যতে।।

(শ্রীগৌঃ গঃ ১৭২ শ্লোক)

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরূপাভিন্ন-বিগ্রহ স্বীয় শ্রীগুরুদেবদ্বয়কে শ্রীরূপের 'উপদেশামৃতে'র অনুবৃত্তির মঙ্গলাচরণে এইরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

গৌরকিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু,
শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল।
সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি,
পাইবার তরে এক তিল।।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বীয় দীক্ষাদাতা ভাগবত-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজকে 'প্রভু' অর্থাৎ নিজের প্রতি অনুগ্রহ-নিগ্রহকারী নিয়ামক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্তানন্দী—ভজনানন্দী ছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোস্বামিপ্রভুকে 'বিভু' অর্থাৎ অপরিমিত-বিজ্ঞানানন্দ স্বানন্দৈক-রসিক কায়ব্যূহবিস্তারকারী শিক্ষাগুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোষ্ঠ্যানন্দী ও বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তির প্রচারক-প্রবর মূল মহাজন। গোষ্ঠ্যানন্দিত্ব—বিভুত্ব বা কায়ব্যূহবিস্তার-কার্য্যের পরিচায়ক।"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্ত-ভজনানন্দী থাকিলেও তিনি অনুগ্রহ-নিগ্রহকারী নিয়ামক-প্রভু-লীলা প্রকট করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অহৈতুকী করুণার একটী অভূতপূর্ব্ব চমৎকারিতা ও বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ বিবিক্ত-ভজনানন্দী মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর বিচারানুসারে 'সবে কৃষ্ণভজন করে, এইমাত্র জানে।' (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৩৩)—এইরূপ দর্শনে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ-নিগ্রহ-নিয়মনরূপ কৃপা ও উপেক্ষা প্রদর্শন সম্ভবপর হয় না বা উত্তমোত্তম ভাগবতোত্তমের নিজের যেরূপ ইষ্টদেবে প্রেম, সেইরূপ প্রেম সমস্ত প্রাণীর হৃদয়েও বিদ্যমান, এইরূপই উপলব্ধি হয়। মধ্যম ভাগবতোত্তমের হৃদয়ে কৃপা ও উপেক্ষার বিচার দৃষ্ট হয়। আবার উত্তম ভাগবতোত্তম ভগবৎ-পার্ষদ হইয়াও শ্রীনারদাদি গুরুবর্গের ন্যায় জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃ কাহাকেও বিশেষ কৃপা করিবার জন্য অভিশাপ বা অনুগ্রহ-নিগ্রহ-দণ্ডাদি দান-লীলা কোন

কোন মহাভাগবতবরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবর মহাভাগবতবর হইয়াও সমগ্র জগতের প্রতি ঐরূপ করুণা-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিষয়াসক্ত জীবের প্রতি ''সর্ব্বনাশ হউক'' বলিয়া অভিশাপ; কপট, ভণ্ড, কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীকে নানাভাবে শাসনের শত শত দৃষ্টান্ত, তাঁহার বিশেষ করুণ চমৎকারিতারই নিদর্শন। তদনুগত অবধূতবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের আদর্শেও এইরূপ শাসন ও নিয়মনের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। শুদ্ধভক্তি পুনঃ প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোষ্ঠ্যানন্দিরূপে জীবসমূহের অনর্থ, অভদ্র ও কষায়রাশি কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিপথে নানাভাবে সতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিবিক্ত-ভজনানন্দী হইয়াও বদ্ধজীবকে নানাভাবে শাসন-দণ্ডাদি দ্বারা কৃপা করিতে কৃপণতা করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'আমার প্রভুর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিক্ত-ভজনানন্দী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর 'অমায়ায় কৃপা'র অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন নবীন কৌপীনধারীর কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি ক্রয় করিবার চেষ্টাদর্শনে তৎপ্রতি শিক্ষা-শাসন-বাক্য; কোনও কৌপীনধারীর আভ্যন্তরিক চরিত্রে মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৌপীন ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালপেড়ে ধুতি-চাদর কোঁচাইয়া পরিধানপূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আগমন, ভাগবতে সুনিপুণ কোন গোস্বামি-সন্তানের কৌশলে অর্থ-সংগ্রহের পিপাসা ও 'গৌর' 'গৌর' বলিবার চেষ্টার অপরাধময় কপটতা প্রদর্শন, প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার জঘন্যত্ব প্রদর্শনের জন্য কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় সাধারণের পুরীষ-পরিত্যাগের স্থানে ছয়মাসকাল বাসের লীলা প্রভৃতি কেবল ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার জন্য নহে, তাহা সর্ব্বপাত্রে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অকপট শুদ্ধহরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের প্রতি অমায়ায় কৃপার আলোকস্তম্ভরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও থাকিবে। অতএব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্ত-ভজনানন্দী হইয়াও গোষ্ঠ্যানন্দী শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্টের সাহচর্য্যই করিয়াছেন।

শ্রীল গৌরকিশোর সত্য সত্যই 'প্রভু' বা নিয়ামকের লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার সুতীব্র কঠোর শাসনের কথা, যাহা আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রতিনিয়তই শ্রবণ করিতাম, তাহাতে সত্য সত্যই শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে

অমায়ায় কৃপাবিতরণকারী—অনুগ্রহ-নিগ্রহকারী নিয়ামক বলিয়াই উপলব্ধি হয়। তাঁহার সেই অনুগ্রহ-নিগ্রহের মধ্যে তাঁহার অহৈতুক পরদুঃখপরতা ও স্নেহময় হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বৃ—লস্করকে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু 'তোমার সর্ব্বনাশ হউক্' বলিয়া অভিশাপ-প্রতিম নিত্যমঙ্গলময় বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার ন্যায় বিষয়াসক্ত জীবের হৃৎকম্পের উদয় হয়। কিন্তু ইহা বিষয়াসক্ত জীবকোটির প্রতি শ্রীল গৌরকিশোরের অমায়ায় কৃপাবিতরণের সাক্ষ্যস্বরূপ। ইহা কেবল ব্যষ্টিগত বিষয়ীতে নিবদ্ধ নহে, পরন্তু সমষ্টি বা গোষ্ঠীগত জড়াসক্ত জীবের প্রতি করুণারই নিদর্শন।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু একদিকে যেমন অমায়ায় কৃপা করিয়াছেন, অপর-দিকে তাঁহার অগাধ অচিন্ত্য চরিত্র বহু জীবকে বঞ্চিতও করিয়াছে ও করিবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভক্তি-বিধির অপূর্ব্ব প্রকার এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—কত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না—কৃপাপাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ ছিল না। তিনি বলিতেন,—'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।' আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তিধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কু-বিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটিগণ গৃহীত হইলে তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাগবতধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইত। 'নিরপেক্ষ'-বলিলে কি বুঝায়, তাহা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের ও আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। জড়াভিনিবেশবশতঃ সাপেক্ষভাব পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণবমহাত্মাগণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরি-উক্ত সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—১৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শেষ কয়েকটী কথা-অনুসরণে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ বিভু উভয়েই একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। যাঁহারা সমগ্র জগৎকে শ্রীহরি-ভজনে প্রবৃত্ত করান, তাঁহারাই বিভু; তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরের মধ্যে যে লীলাবৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরকে 'প্রভু' ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে 'বিভু' বলিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিবিক্ত-ভজনানন্দী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর ন্যায় স্বীয় গোষ্ঠী বিস্তার করেন নাই; কিন্তু শ্রীল লোকনাথও একমাত্র শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সেবাবাধ্য হওয়ায় তাঁহা হইতে গোষ্ঠী বিস্তৃত হইয়াছে। তদ্রূপ বিবিক্ত-ভজনানন্দী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও একমাত্র ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরকে শিষ্য করিতে ভক্তিবাধ্য হওয়ায় তাঁহা হইতেই গোষ্ঠীবর্দ্ধন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভুর ন্যায় সাক্ষাদ্‌ভাবে সেই গোষ্ঠী-বর্দ্ধনকার্য্য বা গোষ্ঠ্যানন্দী প্রচারকবরের কার্য্য করেন নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় সাধারণ্যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকবর-রূপে গোষ্ঠ্যানন্দীর কার্য্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট পূরণ করেন। এই জন্যই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 'শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা'-শব্দটী আবিষ্কার এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ও বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃ প্রবাহের মূল-পুরুষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামি মহারাজও গোষ্ঠ্যানন্দিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি গোত্রবর্দ্ধনকার্য্য ও শুদ্ধভক্তিপ্রচারে যে প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদে ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর শ্রীনাম উচ্চারিত হইবামাত্রই আমাদের হৃদয়ে যে ধারণা হয়, তাহা নিরাস করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন যে,—শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ একই উপাদানে গঠিত। কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনাকারিরূপে জগদুদ্ধারক মহাজন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে আমরা অত্যন্ত বৈরাগী, কর্কশভাষী, বিষয়ী ও গৃহব্রত-

ধর্ম্মের নিন্দাকারী প্রভৃতি বলিয়া ধারণা করি; আর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বিষয়বৈভবের মধ্যে অবস্থিত, বৈরাগ্যের নিন্দাকারী, গৃহব্রত বিষয়িগণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন শিষ্টাচারযুক্ত-বাক্যপ্রয়োগকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

এই উভয় প্রভুকে যাহারা ঐরূপ আধ্যক্ষিক-জ্ঞান লইয়া দেখিতে যায়, তাহারা কিরূপে বঞ্চিত হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর দৈন্যভরে তাঁহার নিজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছেন,—"জগতে অনেক মহচ্চরিত্র ব্যক্তি পাইলাম, কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষিরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ বৈষ্ণব ইহ-জগতে থাকিতে পারেন। আমার প্রভুর করুণায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম।" শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,—"কোন কোন সময়ে (শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর) গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্রগ্রন্থিমালা, উন্মুক্ত কৌপীনে নগ্নভাব, কারণ-রহিত-বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, পণ্ডিত, ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটি কৃষ্ণভক্তের ঐশীশক্তি।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে চিনিতে হইলে যদি কৃপা করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু চিনাইয়া না দেন, তবে ঐ অবধূতবরকে চিনিতে পারা যায় না। আবার শ্রীল

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র বুঝিতে হইলে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর করুণা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তের ঐশীশক্তি আধ্যক্ষিকতাকে সর্ব্বদা 'গড়ের পারে' রক্ষা করে। সেই প্রভু ও বিভু-মহাজনের করুণাশক্তিরূপ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপা না হইলে ঐ প্রভু ও বিভুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন না ও পারেন নাই। স্বয়ং শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুও ইহা তাঁহার কয়েকটী শিক্ষার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা ভক্তিভবনের পরম-পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীভগবতীদেবী (শ্রীভক্তিবিনোদ-সহধর্ম্মিণী)-প্রমুখ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবকগণ শ্রীকুলিয়া-নবদ্বীপে গমন করিয়া এক সময় শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। তখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, —"আপনারা ঘরের ঠাকুরকে ছাড়িয়া কুলিয়ায় কি করিতে আসিয়াছেন? এখানে কি বাজার করিতে আসিয়াছেন—না বাজারের ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন? আপনাদের গৃহেই গৌরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ আবির্ভূত হইয়াছেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন অসুস্থলীলার অভিনয় করিয়া কলিকাতার 'ভক্তিভবনে' অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন জনৈক লৌকিক গোস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে পরমহংস শ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত গোঁসাইজীকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—"আপনি কলিকাতায় গিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মাথায় করিয়া 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' কলিকাতা হইতে এই ধামে লইয়া আসুন।" উক্ত গোঁসাইজী লৌকিক সাধারণ বিচারানুসারে পরম-মুক্ত শ্রীগৌরনিজজনের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার এই বিচার জানা ছিল না,—

"তোমার (বৈষ্ণবের) হৃদয়ে সদা গোবিন্দবিশ্রাম।"

"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।"

মহাভাগবত বৈষ্ণব যে-স্থানেই অবস্থান করুন, সে-স্থানেই তিনি গোলোকের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা অবতরণ করাইয়া অষ্টকাল তাঁহার অভীষ্ট শ্রীব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বের সেবায় নিযুক্ত থাকেন অথবা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "গৃহে বা

বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "গৃহেতে গোলোক ভায়" প্রভৃতি উক্তি শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বভজনের মধ্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের মাংসচক্ষুর ভ্রান্তদর্শন বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারাই এই আদর্শ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে পারেন। উক্ত লৌকিক গোঁসাইজী কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীধাম-নবদ্বীপ যাইবার জন্য পরমহংস শ্রীল বাবাজী মহারাজের অনুরোধ জানাইলে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে হরিভজনের উন্নতির জন্য আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে অক্ষম উক্ত গোঁসাইজীকে শ্রীল প্রভুপাদ সকল কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, —"বৈষ্ণবগণ আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তি দেখিয়া 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' ন্যায়ানুসারে অনেকভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। আমরা বৈষ্ণবের নিকট যেরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া যাই, তাহাতে আমরা মঙ্গল বরণ করিব না দেখিয়া তাঁহারা আমাদের রুচির অনুকূল নানা কথা বলিয়া নিজেরা অন্তরে নির্ব্বিঘ্নে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন। পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ রুচি লইয়া যাইতেন, সেইরূপ রুচির কথা শুনিয়াই বঞ্চিত হইয়া আসিতেন।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু উভয়েই মহাচিদ্‌বিলাসী অপ্রাকৃত বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভ-শ্রী-বিভূষিত। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গঙ্গামৃত্তিকা, অপক্ব তণ্ডুল ভোজন বা শ্রীধামের শ্বপচ-গৃহ হইতে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া ও দিগম্বর থাকিয়া যেরূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসের বিলাসী, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ প্রচুর দুগ্ধপান, অট্টালিকা ও সৌধে বাস, পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শয়ন ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াও সেই শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরেরই চিদ্‌বিলাসের নিত্য-বিলাসী। অতত্ত্বজ্ঞগণের নিকট বস্তুর স্থূল ত্যাগকে 'বৈরাগ্য' বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শুদ্ধভক্তির সহজ—অনুগ—আশ্রিত—পাল্য—লাল্য বৈরাগ্যটি অর্থাৎ বৈষ্ণব-মহাজনগণের 'বৈরাগ্য' বা 'বিপ্রলম্ভ' তাদৃশ ফল্গুজাতীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণবিলাস-লালসার পরাকাষ্ঠার নাম 'বৈরাগ্য'। শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীগোস্বামী প্রভুপাদের

এবং শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথাদি ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ, শ্রীগৌর-কিশোর প্রভৃতি মহাচিদ্‌বিলাসী মহাজনগণের বৈরাগ্যে পার্থক্য নাই; কারণ, উভয়-শ্রেণীর মহাজনই আশ্রয়বিগ্রহসমন্বিত বিষয়বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবা-বিলাসের বিলাসী। তাঁহারা সকলেই সম্ভোগকে শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া ব্যাপার জানিয়া বিপ্রলম্ভপরাকাষ্ঠায় বিভাবিত। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য, উভয়ই তুল্য—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায়কে বলিয়াছেন,—

তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি।।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।২০১)

এই বিপ্রলম্ভ বা শ্রীকৃষ্ণতোষণপর বৈরাগ্য—সাধন ও সাধ্য উভয়ই। শ্রীগৌর-সুন্দরের সন্ন্যাস-লীলাটি বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভৃতি শ্রীগৌরবাসুদেবের শক্তিগণ; শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভৃতি মধুর রসের কলত্র-পর্য্যায়ের শক্তিগণ—সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের সহায়। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর শ্রীকৃষ্ণসুখপর নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য ভক্তিচক্ষু থাকিলেই দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়। নামদৃগ্‌গণই তাঁহাদের বৈরাগ্যবিপ্রলম্ভ-শ্রী দর্শন করিতে পারেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বৈরাগ্যমাত্র-দর্শনকে অক্ষজজ্ঞানীর দর্শন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে বৈরাগী দর্শন, প্রভুরূপে দর্শন নহে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর "অপ্রকটতিথি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"এই বৈষ্ণব-শিরোভূষণের কথা অনেকে জানেন না, অনেকে অক্ষজজ্ঞানে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষজ-জ্ঞানে সেই মহাত্মাকে দর্শন করিতে গেলে আমরা তাঁহার অলৌকিক ও অনুপম বিষয়বিরাগ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। সদাচাররত আচার্য্য-জগতে অক্ষজজ্ঞানে তাঁহার সর্ব্বোপরি আদর বিচারিত না হইলেও অধোক্ষজ-সেবাপর শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে অধোক্ষজ-ভক্তিপর ভগবদাশ্রয়-জাতীয় বস্তু বলিয়াই লক্ষ্য করেন। আমাদের ন্যায় মর্ত্ত্যমানব কোন্ কোন্ সেবার অবলম্বনে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীবৃষভানুকুমারীর সুদুর্ল্লভ নিত্যসেবা লাভ করিবেন, সেই অপ্রাকৃত স্মরণচিত্র

যে জীবনে সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই চরিত্রের স্মরণী-সেবা কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তজগতে কিরূপ আদরণীয়, তাহা ব্যক্ত করিতে ভাষা অসমর্থ।”

(গৌড়ীয়—১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

অধোক্ষজ ভক্তিতৎপর ভগবদাশ্রয়-জাতীয় বস্তু-দর্শনের নামই ‘প্রভু’-দর্শন এবং সেই প্রভুকে কায়ব্যূহ-বিস্তারকারিরূপে দর্শন—‘বিভু’-দর্শন। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী মূল আশ্রয়বিগ্রহরূপে শ্রীরূপমঞ্জরী-শ্রীরতিমঞ্জরী-গণের ঈশ্বর। এজন্যই শ্রীল শ্রীরূপ সখীত্ব বাঞ্ছা না করিয়া মঞ্জরীত্ব বরণ করিয়াছেন এবং শ্রীল রঘুনাথও ‘বিলাসকুসুমাঞ্জলী’তে গাহিয়াছেন—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।।

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ১৬ শ্লোক)

হে দেবি! তোমার শ্রীপাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কোন কালেও অন্য সখীত্বাদি কামনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার দাস্যের প্রতিই আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী কায়ব্যূহবিস্তারকারিণী-রূপে দর্শন—‘বিভু’-দর্শন। অতএব সেই স্থানে বস্তুতত্ত্বে পার্থক্য নাই, কেবল লীলাবৈচিত্র্যমাত্র বর্ত্তমান। শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। দীক্ষাগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরুগণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য নাই, কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে “আমার প্রভু”, “আমার ঈশ্বর” রূপে দর্শন করেন, তখনই ‘প্রভুদর্শন’, আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৫ম পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরের আনুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ‘বিভু’-দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহ হইয়াও শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব কায়ব্যূহ বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা

করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেইভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস।।
শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৫ম)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভের 'গৌড়ীয়ভাষ্যে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদকে যে-ভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহার সহিত বিষয়টী বিচার করিলে শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বিভুত্ব ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর প্রভুত্বের উপলব্ধি হয়।

"শ্রীভক্তিবিনোদ, কৃষ্ণরসে মোদ,
দাসের গৌরবনিধি।
শ্রীগৌরকিশোর, ভক্তিরসে ভোর,
পতিতের ভক্তিবিধি।।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে যে 'ভক্তিবিধি' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভুকে যে 'গৌরবনিধি' বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীল রঘুনাথের 'বিলাপকুসুমাঞ্জলী'র পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পূর্ণসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে ও তাঁহারই বর্ণিত-ভাষায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-তিথিতে আত্মনিবেদনক্ষেত্রে এই নিবেদন করিতেছি—"শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল রূপ-রঘুনাথের আনুগত্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার পর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা-কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীরাধা-সরসী শ্রীগোবর্দ্ধনের সহিত আলিঙ্গিতা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা। শ্রীরাধা-নিত্যজন শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাস প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীগুরু-গোবর্দ্ধন-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনমুখে শ্রীল রঘুনাথের মনঃশিক্ষার যে শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা সেই উচ্ছিষ্টের নিত্যভোজী

বিঘসাশী। অতএব আমরাও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে বলিতেছি,—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ।।

হে ভ্রাতঃ মন! তোমার দুইটি পায়ে পড়িয়া আমি বিশেষ কাকুতি-মিনতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি—তুমি সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবে, গোষ্ঠে বা ব্রজে, ব্রজবাসী গুরুগোষ্ঠীতে, শুদ্ধবৈষ্ণবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে, মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারী মন্ত্রে, শ্রীনামে ও সর্ব্বশরণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দে অপূর্ব্ব ও গাঢ়তর রতিবিশিষ্ট হও।”

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা গৌড়ীয়ে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে খড়গপুরে শ্রীপদার্পণ করিবার পর শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের বিচলন-সন্দেশ এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে,—

"শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ খড়গপুরে অবতরণ করিয়া সেবকগণকে বংশী-বটের অনুসন্ধান করিতে বলেন। খড়গপুর ষ্টেশনের সম্মুখেই একটী বট বৃক্ষ ছিল। তথায় তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে দুই দিবস কিছু গ্রহণ করেন নাই। তিনি এক রাত্রি উক্ত বটবৃক্ষের নিম্নে অবস্থান করেন এবং তৎপর দিবস গোমো প্যাসাঞ্জারে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে শুভ-বিজয় করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই দুইখানা গরুর গাড়ী আনিবার জন্য কৃপাদেশ করেন। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক গোমো-প্যাসেঞ্জারে যাইবার জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বিশেষ অনুরোধ করিলেও তিনি গরুর গাড়ীতে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার জন্যই পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর একখানা রিক্সা ও হিন্দু গাড়োয়ানের একখানা গরুর গাড়ী করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পথে চলিতে চলিতে মেদিনীপুর-সহরস্থ নূতন-বাজারে 'উপেন্দ্র মাইতি' রোডের নিকটবর্ত্তী এক বটবৃক্ষের নিম্নদেশে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় চারি দিবস অবস্থান করেন। গো-যানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ "গোদাপিয়াসাল" গ্রামে একরাত্রি যাপন করেন। পর-দিবস প্রাতেঃ গো-যানে 'শালবনি' গ্রামে আগমন করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ তথায় কোন ষ্টেশন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজী মহারাজ ট্রেন-যোগে রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় গোমো-ষ্টেশনে আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে অবস্থান করেন। পরদিন দিল্লী মেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ দুইজন সেবক-সহ অপরাহ্নে প্রায় ১।। ঘটিকার সময় শ্রীগয়াধামে শুভ-পদার্পণ করেন। তিনি গয়া-ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই শ্রীশ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম-মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তথায় তিনি ফল্গু-নদীর তীরে বালুকার উপরে তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করেন। ২।৩ দিন পর তথা হইতে তিনি শ্রীধাম-বৃন্দাবনাভিমুখে শুভবিজয় করিবার ইচ্ছা করেন। স্থানীয় সজ্জনগণ ফল্গু-নদীর তটস্থ উন্মুক্ত ধর্ম্মশালার বারান্দায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেও তিনি তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সময় সময়—

"যে-দেশে নিতাই নাই, সেই দেশে নাহি যাই, নিতাই বিরোধী জনের মুখ না হেরিব"—এইরূপ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথিতে সমস্ত দিবস শ্রীল বাবাজী মহারাজ পরমানন্দ চিত্তে অবস্থান করেন। শ্রীগয়াধামবাসী কএকজন পাণ্ডা শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া অনুরোধ করিলেন,—"আপনি গয়াধামে পিণ্ড প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন,—"গয়াসুর কোথা হইতে আসিল?" ইহা শুনিয়া পাণ্ডারা গয়াসুরের জন্ম-বৃত্তান্ত-সমূহ শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বর্ণন করিলেন। পুনরায় তাঁহারা বাবাজী মহারাজকে বলিলেন,—"শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে শ্রীসীতাদেবী এখানে মহারাজ শ্রীদশরথকে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনিও পিণ্ড দান করুন।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"লোক দান-ধর্ম্ম ক'রে বৈতরণী পার হইয়া কোথায় যায়? আমি ত' গাড়ীতে পার হই। আমাকে বেদ-বিধির বাহির করিয়া রাখিয়াছে। আমি কি করিব? আমি বেদের কাম কর্‌ছি না, বিধির কাম কর্‌ছি না; আমি কি করিয়া মাতাপিতাকে পিণ্ড দান করিব? (শ্রীবিগ্রহগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং শ্রীবিগ্রহগণকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন) এগুলা আমাকে করিতে দেয় না। দেখি এখন কি হয়।" তৎপর পাণ্ডারা বলিলেন,—"আপনার ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই করুন।" ইহা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—"ভকতবৎসল হরি! ভকতবৎসল হরি!"

কিছুক্ষণ পরে একজন মল্ল তাহার নিজ গলার 'হনুমান-যন্ত্র' (ছাপ) বাহির করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে অতি নিকটে রাখিয়া বলিলেন,—"বাবা! আপনি এই যন্ত্রটী নিজ-হাতে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দিন, যাহাতে শ্রীহনুমানজী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন।" বাবাজী মহারাজ তখন তাহাকে ধমক দিয়া বলিতে থাকেন,—"এখানে আশীর্ব্বাদ বাহির কর্‌তে আসিয়াছে! এটা নে, কি জন্য এখানে ফেলিয়াছিস্!" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি নিজ হস্তে যন্ত্রটী তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ সময় সময় বলিতেন,—"পুরীতে পাণ্ডা, এখানেও পাণ্ডা, হরিনাম নাই, (শ্রীগোপালের দিকে হাত দেখাইয়া) আমি কিছু জানি না, এখন পাণ্ডাদের সঙ্গে বুঝা-শুনা কর। বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছ; তোমার হাতের জল কে খাবে? গয়ানাথের বাড়ী-ঘর নাই, কাশীনাথেরও

নাই।" তিনি "নিতাইপদ-কমল"—এই গীতিটী প্রায় প্রত্যেক দিনই কীর্ত্তন করিবার কালে "নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে" পদটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"ব্রজে যাওয়ার কথা হইতেছে, যাওয়া হ'বে কিনা বলিতে পারি না।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ২৫শে আশ্বিন হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-লীলা-ক্ষেত্র শ্রীকাশীধামে শ্রীগাঙ্গতটে স্বানুভবানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য দৈনন্দিন-লীলাচরিতের সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার কিয়দশং "গৌড়ীয়ে'র সারগ্রাহী পাঠকগণের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

শ্রীল বাবাজী মহারাজ একদিন ঠাকুরকে বলিতেছিলেন,—"গয়ানাথকে দেখিয়াছ, এখন কাশীনাথকে দেখ। পুরীতে লোকনাথকে দেখিয়াছ, তিনিঁই এখানে কাশীনাথ। প্রয়াগে যাইবে, সেখানেও সৈন্য, তবে সাধুও আছেন, সকলের কাছে প্রকাশ হ'ন না। বৃন্দাবনে ত' যাইবা, তারপর কোথায় যাইবা? বর্ষাকালে যখন গঙ্গার জল বাড়িবে, আষাঢ় মাসে তখন নবদ্বীপে ফিরিবে।"

আর একদিন একজন লোককে বলিতেছিলেন (একটি ধূপকাঠি আঘ্রাণ করিতে করিতে)—"কোনও জিনিষে গন্ধ নাই; অথবা গন্ধ আছে, নাকেরই গন্ধ গ্রহণ করিবার শক্তি নাই! ব্রহ্মপুত্রের ওপারে, পূর্ব্বাশ্রমে থাকা-কালে একজন বলিয়াছিল,—'যে দেশে ল্যাংটা সন্ন্যাসীর দল, সেখানে ধোপায় কি করে?' সেইরূপ, শ্রোতা না থাকিলে বক্তা কি করিবে? মহাপ্রভু যখন আসিয়াছিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়াছিল, দেখি, এখন কত লোক আসে! তখন কাশীর মায়াবাদীরা মহাপ্রভুর নিন্দা করিত! তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর খুব মনঃকষ্টে থাকিতেন; এখন আসুক দেখি, কে আসিতে পারে?

কখনও বা শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতেছিলেন,—"আমি বেদের কাম করি না, বিধির কাম করি না। পিতা-মাতার সেবা না করিয়া কৌপীন লইয়া বাহির হইয়াছি, আমার গতি কি হইবে? চার-সম্প্রদায়ের কাহারও সঙ্গে আমার মিল নাই, আমার গতি কি হইবে?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ এক এক দিন সারা রাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন এবং আনন্দের সহিত গান করেন। কখনও বা বলেন,—"আমি যেখানে যাই,

দুঃখ (বিপ্রলম্ভ-প্রেম) আমার সাথে সাথে চলে।" নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল। কিন্তু কৈ শীতল ত' হইলাম না।

শ্রীকাশীধামে শ্রীগঙ্গার তটে প্রথম দিন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজেই শিবির-স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া স্বয়ং শিবির স্থাপন করিতে উদ্যত হইলে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া বাধা দিয়া বলিল,—"আমার জায়গা, আমি ওখানে বিশ বছর যাবৎ বসি, ওখানে তাঁবু ফেলিতে দিব না।" তখন বাবাজী মহারাজ নিজেই ঐ বৃদ্ধাকে তাড়া দিয়া বলিলেন,—"ওর জায়গা!! ওর কেনা ঘাট!! নিতাইর খাস্তা তালুক উঠে গেল!!" —ইহা বলিতে বলিতে একটি গানের দুই-একটি পদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

"শমন পালা; পালা!

নিতাই চান্দের খাস্তা পালায় তোর পালা এবার উঠে গেল।

তুই এবার পালা, পালা!"

বৃদ্ধা তখন পলাইয়া গেল। স্থানীয় বিষয়ি-লোকগণের সহযোগিতায় বাবাজী মহারাজকে উঠাইতে পারে কি না, সেই চেষ্টা করিতেছে!! কাশীবাসের অভিনয় করিয়া শ্রীবৈষ্ণবরাজ শম্ভুর চরণে অপরাধী, ধামাপরাধী জীব মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইলেই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিজ-জন মহাভাগবত পরমহংসের চরণে অপরাধ করে! একদিন রামচন্দ্র খাঁন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিল!

আর এক ব্যক্তির সহিত একদিন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ কথা বলিতে বলিতে গাহিলেন,—

" 'সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র' আমার এ সবের কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ নাই—এ সব কিছুই আমি দেখি না।" ইহা বলিয়া দুইটী পদ ধরিলেন,—

"সখীর অনুগা হঞা প্রেম সেবা নিব চাঞা"

"গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে,

চামরের বাতাস করিব।।"

গতা ৩রা কার্ত্তিক শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ সরাসরি শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গাড়ী ঠিক করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং ট্রেণে যাইতেই

স্বীকার করিয়াছিলেন; তবে সেই ট্রেণে (কামরায় নহে, সমস্ত ট্রেণে) অন্য কোনও যাত্রী যাইতে পারিবে না, এইরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন। ট্রেণের একটি কামরা Reserve করিতে যাইবার কালে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হইল; তখন তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"এখন যাইব না।" সেবকগণ বলিলেন,—"ট্রেণ Rcscrvc করা হইয়া গিয়াছে।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"করিলে কেন?" পূ—বলিলেন,—"টাকা দেওয়া হইয়াছে।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"দিলে কেন? আমি কি জানি যে আমি যাইব না? দিয়াছ, দিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আমি যাইব না।

ঐ-দিন প্রাতঃকাল হইতে তিনি নিজের মনে মনে হাসিয়া হাসিয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। "নিতাই-গৌর নাচে গৌরীদাস-ভবনে" বলিয়া গান করিতেছিলেন, চক্ষে আনন্দাশ্রুধারা বহিতেছিল। কখনও বা 'কাল্‌না'র কথা, কাল্‌নার 'আমলী-তলা'র কথা বলিতেছিলেন।

একজন স্নান করিতে করিতে "সীতারাম! সীতারাম!" উচ্চারণ করিলে সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন,—" 'সীতারাম' থাকে সিংহাসনে, আর 'হরেরাম' থাকে সরযূ-তীরে।" আবার বলিলেন,—"সব সাধু গোপালের কাছে আট্‌কা পড়িয়া যায়। এখন মধুর রস নাই। (হাস্য-সহকারে) আমার কাছে ত' মধুর রস নাই। এখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য পর্য্যন্ত। মধুর রসে (ঠাকুরের সম্মুখে অবস্থিত থাকা কলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) রম্ভা—রম্ভাবতী, কলাবতী, লীলাবতী (হাস্য-সহকারে) এসব 'পুরীতে' আছে।" একজন সেবক সেবার জল লইয়া আসিলে আপন মনে বলিলেন,—"সেবা বিনা শুদ্ধ বস্তু কভু নাহি পায়। রায় কহে, শুদ্ধ সেবাপ্রাপ্তির উপায়।।" এক সময়ে হঠাৎ বলিলেন,—"পৈতা কি হইবে? মহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন,—'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।।"

শ্রীকাশীধামে একদিন এক প্রাকৃত-সহজিয়া (যে-ব্যক্তি তৎপূর্ব্বে একদিন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে লীলাকীর্ত্তন করিয়াছিল) শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে ও হাসিতে হাসিতে "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া খুব ভাবুকতা প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীকথামৃতবর্ষণে বাধা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে যেন বাবাজী মহারাজের প্রশংসা করিয়া "এসেছে ব্রজের রাখাল" বলিয়া কীর্ত্তন ধরিয়াছিল। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজকে

শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে উদ্যত দেখিয়া শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ ভাবুকতা প্রদর্শন করিতে নিরস্ত করিলেন এবং শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তাহাতে সেই প্রাকৃত-সহজিয়া আকুপাঁকুভাব দেখাইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত ভাবুকাভিমানী ব্যক্তির মুখের উপর হাত তুলিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!" ঐ ব্যক্তি পুনরায় ভাবুকতা দেখাইয়া বলিল,—"চোর হইতে পারিলাম কৈ?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আমি মুখে বলি হরি, মনে অন্য করি।" কপটভাবুক তাহার কাপট্যের 'মুখোশ' খুলিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

জনৈকা স্থূলকায়া গৈরিক-বসনধারিণী স্ত্রীলোক বাবাজী মহারাজের সম্মুখে বসিয়া 'মুরুব্বিয়ানা'-ভাব দেখাইয়া বলিল, "বাবা, তোমাকে ত' আমি নবদ্বীপের বড়ালঘাটে দেখিয়াছি! আমি যা'তে খুব শ্রীহরিনাম করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি অদ্বৈত-বংশের বৌ।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তিন তালার উপর ছয় তালা, তা'র উপর ষোল তালা; তাহাও ভাঙ্গিয়া চোরে চুরি করে; বংশের কেবল একতালা, উহা কি করিবে? যাও, বড়ালঘাটে যাও।"

একজন স্ত্রীলোক বেলপাতা হস্তে লইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে বসিলে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, নবদ্বীপেও আছে।" এই বলিয়া হাত দিয়া ইঙ্গিতে শিবলিঙ্গ বুঝাইলেন এবং বলিলেন,—"এখানেও এই সব, গৌর যখন ছোট ছিল, তখন ল্যাংটা হইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেন; মেয়েরা শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করিলে, তাঁ'দের সঙ্গে ঠেটামি' করিয়া বলিলেন,—"তোরা শিবপূজা না করিয়া আমার 'এইটা'র পূজা করিতে পারিস্ না?"

কয়েকজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, আমাদের কি হ'বে, আমরা কি কর্‌ব?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"নিতাই ভজলে গৌর পা'বে, নিরানন্দ দূরে যা'বে, পরমানন্দের উদয় হ'বে।" কাহারও কাহারও ঐ প্রকার প্রশ্নের উত্তরে কেবল "ভকত-বৎসল হরি! ভকত-বৎসল হরি!" এইরূপ উচ্চারণ করিলেন। আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমি খুঁজে বেড়াই সারা বিশ্ব, মনের মানুষ পেলাম না।"

স্বীকার করিয়াছিলেন; তবে সেই ট্রেণে (কামরায় নহে, সমস্ত ট্রেণে) অন্য কোনও যাত্রী যাইতে পারিবে না, এইরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন। ট্রেণের একটি কামরা Reserve করিতে যাইবার কালে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হইল; তখন তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"এখন যাইব না।" সেবকগণ বলিলেন,—"ট্রেণ Reserve করা হইয়া গিয়াছে।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"করিলে কেন?" পূ—বলিলেন,—"টাকা দেওয়া হইয়াছে।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"দিলে কেন? আমি কি জানি যে আমি যাইব না? দিয়াছ, দিয়াছ, বেশ হইয়াছে; আমি যাইব না।

ঐ-দিন প্রাতঃকাল হইতে তিনি নিজের মনে মনে হাসিয়া হাসিয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। "নিতাই-গৌর নাচে গৌরীদাস-ভবনে" বলিয়া গান করিতেছিলেন, চক্ষে আনন্দাশ্রুধারা বহিতেছিল। কখনও বা 'কাল্না'র কথা, কাল্নার 'আমলী-তলা'র কথা বলিতেছিলেন।

একজন স্নান করিতে করিতে "সীতারাম! সীতারাম!" উচ্চারণ করিলে সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন,—" 'সীতারাম' থাকে সিংহাসনে, আর 'হরেরাম' থাকে সরযূ-তীরে।" আবার বলিলেন,—"সব সাধু গোপালের কাছে আট্‌কা পড়িয়া যায়। এখন মধুর রস নাই। (হাস্য-সহকারে) আমার কাছে ত' মধুর রস নাই। এখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য পর্য্যন্ত। মধুর রসে (ঠাকুরের সম্মুখে অবস্থিত থাকা কলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) রম্ভা—রম্ভাবতী, কলাবতী, লীলাবতী (হাস্য-সহকারে) এসব 'পুরীতে' আছে।" একজন সেবক সেবার জল লইয়া আসিলে আপন মনে বলিলেন,—"সেবা বিনা শুদ্ধ বস্তু কভু নাহি পায়। রায় কহে, শুদ্ধ সেবাপ্রাপ্তির উপায়।।" এক সময়ে হঠাৎ বলিলেন,—"পৈতা কি হইবে? মহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন,—'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।।"

শ্রীকাশীধামে একদিন এক প্রাকৃত-সহজিয়া (যে-ব্যক্তি তৎপূর্ব্বে একদিন শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে লীলাকীর্ত্তন করিয়াছিল) শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে ও হাসিতে হাসিতে "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া খুব ভাবুকতা প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীকথামৃতবর্ষণে বাধা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে যেন বাবাজী মহারাজের প্রশংসা করিয়া "এসেছে ব্রজের রাখাল" বলিয়া কীর্ত্তন ধরিয়াছিল। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজকে

শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে উদ্যত দেখিয়া শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ ভাবুকতা প্রদর্শন করিতে নিরস্ত করিলেন এবং শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তাহাতে সেই প্রাকৃত-সহজিয়া আকুপাঁকুভাব দেখাইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত ভাবুকাভিমানী ব্যক্তির মুখের উপর হাত তুলিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!" ঐ ব্যক্তি পুনরায় ভাবুকতা দেখাইয়া বলিল,—"চোর হইতে পারিলাম কৈ?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আমি মুখে বলি হরি, মনে অন্য করি।" কপটভাবুক তাহার কাপট্যের 'মুখোশ' খুলিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

জনৈকা স্থূলকায়া গৈরিক-বসনধারিণী স্ত্রীলোক বাবাজী মহারাজের সম্মুখে বসিয়া 'মুরুব্বিয়ানা'-ভাব দেখাইয়া বলিল, "বাবা, তোমাকে ত' আমি নবদ্বীপের বড়ালঘাটে দেখিয়াছি! আমি যা'তে খুব শ্রীহরিনাম করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি অদ্বৈত-বংশের বৌ।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"তিন তালার উপর ছয় তালা, তা'র উপর যোল তালা; তাহাও ভাঙ্গিয়া চোরে চুরি করে; বংশের কেবল একতালা, উহা কি করিবে? যাও, বড়ালঘাটে যাও।"

একজন স্ত্রীলোক বেলপাতা হস্তে লইয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে বসিলে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, নবদ্বীপেও আছে।" এই বলিয়া হাত দিয়া ইঙ্গিতে শিবলিঙ্গ বুঝাইলেন এবং বলিলেন,—"এখানেও এই সব, গৌর যখন ছোট ছিল, তখন ল্যাংটা হইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেন; মেয়েরা শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করিলে, তাঁ'দের সঙ্গে ঠেটামি' করিয়া বলিলেন,—"তোরা শিবপূজা না করিয়া আমার 'এইটা'র পূজা করিতে পারিস্ না?"

কয়েকজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, আমাদের কি হ'বে, আমরা কি কর্‌ব?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"নিতাই ভজলে গৌর পা'বে, নিরানন্দ দূরে যা'বে, পরমানন্দের উদয় হ'বে।" কাহারও কাহারও ঐ প্রকার প্রশ্নের উত্তরে কেবল "ভকত-বৎসল হরি! ভকত-বৎসল হরি!" এইরূপ উচ্চারণ করিলেন। আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমি খুঁজে বেড়াই সারা বিশ্ব, মনের মানুষ পেলাম না।"

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের বিচরণ-লীলা

অবধূতবর পরমহংসকুল-মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ঈশবিমুখ, মায়া-নিগড়বদ্ধ, ত্রিতাপক্লিষ্ট জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুক অসীমকরুণা-বিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন তীর্থ, নগরী ও জনপদ-সমূহে পরিভ্রমণ-লীলা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার পদরজঃ প্রাপ্ত হইয়া জগৎ পবিত্রীকৃত এবং বৈকুণ্ঠপ্রিয় তাঁহার সুদুর্ল্লভ দর্শন ও সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আপামর জগজ্জীব ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীকাশীধামে শুভবিজয় করিয়া তথায় স্বানুভবানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। 'গৌড়ীয়' পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ গত ৩০শে অক্টোবর, ১৩ই কার্ত্তিক, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীকাশীধামে অবস্থান করেন। অতঃপর ঐ দিনই রাত্রি ১১টায় তথা হইতে নৌকা-যোগে ৪ঠা নভেম্বর, ১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার বেলা ৪টায় পাটনায় উপনীত হন। পাটনা হইতে ১৫ই নভেম্বর, ২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার অপরাহ্ণ প্রায় ৬।। ঘটিকার সময় পুনরায় নৌকারোহণে মুঙ্গেরাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৩ দিন পরে ১৮ই নভেম্বর, ২রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুঙ্গেরের গাঙ্গতটে উপনীত হন। তথা হইতে ২২শে নভেম্বর, ৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার বেলা ২।। টায় পুনরায় নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া পরদিন অর্থাৎ ২৩শে নভেম্বর, ৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় ভাগলপুর মায়াগঞ্জ-ঘাটে শুভবিজয় করেন। সম্প্রতি তিনি ভাগলপুরেই আছেন।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মহাপুরুষবর বিভিন্ন স্থানে কৃপাপূর্ব্বক যে সকল বাণী কীর্ত্তন ও উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ একান্ত শ্রদ্ধালু পাঠকগণের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

কাশীতে—২৬শে অক্টোবর, ৯ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ গান ধরিলেন,—"ওরে, বৃন্দাবনে ছিলে ননীচোরা। তোরে ডাক্‌তো মাখন-ননীচেরা।। ননীচোরা, মাখনচোরা, বসনচোরা, মনচোরা। বৃন্দাবনে ছিলে ননীচোরা।।" সেবকগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী দেখিতেছিস্। সেখানে মহাপ্রভু ছিলেন; এখন কেহই বলিতে পারে না। এ'টা পাথরের কাশী, এখানে বিশ্বনাথ নাই।"

২৮শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, বৈকাল। এইটা (শ্রীকৃষ্ণ) ডাকাইত, আর ঐটা (শ্রীগৌরসুন্দর) ঠগের গোড়া; ধরা দেয় না। গয়া হইতে আসিয়াছিল কাশী, এখন কাশীতে আসিয়াছি, আবার গিয়াছে গয়ায়। এইটার বাড়ী-ঘর নাই, বৈরাগী হইয়াছে, দেশান্তরী হইয়াছে, ফকির সাজিয়াছে, ছেড়া নেক্‌ড়া গায়, আর কৌপনী পরিয়াছে।।”

গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—“মাঠের মধ্যে শূকর চড়ায় যে-সকল ডোম, তাহারা মন্ত্রদ্বারা শূকরকে একটা সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, পাল ছাড়া শূকর অন্যত্র যাইতে পারে না। কোনক্রমে দু' একটা শূকর পাল হইতে বাহির হইয়া যায়। সংসারের মানুষগুলিও এই রকম। সংসার ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে না, আর বাহির হইলেও কাশীতে আসিয়া বাস করে। কাশীতে বিশ্বনাথ নাই। এইটা পাথরের কাশী। সোনার (চিন্ময়) কাশীতে বিশ্বনাথ থাকেন। এখন শ্মশানে-মশানে বেড়াইতেছেন। এখানে ঘাটে হরগৌরী বসাইয়াছে, সম্মুখে থালা রাখিয়াছে। বহু পয়সা পড়িতেছে! নবদ্বীপেও ঐ রকম দেখিয়াছি।”

৩০শে অক্টোবর, ১৩ই কার্ত্তিক শনিবার। কাশী হইতে পাটনায় শুভবিজয়ের দিন বৈকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন—

“যে করে তোমার আশ। তা'র কর সর্ব্বনাশ।। কাহাকেও টাকা দেয়, কাহারও টাকা নেয়। ‘তোমা স্থানে অপরাধের নাহি পরিত্রাণ।’ ঠেকাবে কি ক'রে? পরিত্রাণ কর্‌বে কে? কা'কেই বা বলি, কেই বা শুনে? বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না হইল।” অতঃপর তাঁবু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গুটাইয়া নৌকায় উঠাইলে পর বলিতে লাগিলেন,—

“ত্যাগ আর ভোগ, ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য। গন্ধ পাই না; আমি কোনও গন্ধই পাই না। ফুলে গন্ধ নাই, ফলেও গন্ধ নাই। ‘একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি’। বহু তারকায় কি করে? কোথাও কোন গন্ধযুক্ত ফুল ফোটে?” এইভাবে বহু কথা বলিতে লাগিলেন। নৌকা ছাড়িতে রাত্রি ১১টা হইল। তিনি সারাদিন উপবাসী রহিলেন; কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

নৌকাপথে—৩১শে অক্টোবর, ১৪ই কার্ত্তিক, রবিবার। কাশী হইতে ২০ মাইল দূরে ‘সৈয়দপুর’ গ্রামে বেলা প্রায় ২টার সময় গঙ্গার তীরে এক বটবৃক্ষের তলে তাঁবু করা হইল।

১লা নভেম্বর, ১৫ই কার্ত্তিক, সোমবার নৌকা সারারাত্র স্রোতের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল।

২রা নভেম্বর, ১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার নৌকা সারারাত্র স্রোতের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল।

২রা নভেম্বর, ১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার ভোর বেলায় শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন,—"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন। ইহা বই ধর্ম্ম আর নাহি সনাতন।।" (শ্রীবিগ্রহের প্রতি) "কাশীর গঙ্গা দেখিয়াছ, এখন পাটনার গঙ্গা দেখিবে।" গাজিপুর জেলার 'ঘোষপুর' গ্রামে নৌকা বাঁধিয়া ঠাকুরের জন্য দুধ লওয়া হইল। বেলা ৮টার সময় পুনরায় ঘাট হইতে নৌকা ছাড়া হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার তীরবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে একটী বোঁটাছাড়া লাউ আনিয়ে দিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। সন্ধ্যার পরে রন্ধন করিতে যাইয়া ঠাকুরকে বলিতে থাকেন, "দুঃখে-সুখে নৌকায় বাস। কখনও ঘৃত-মধু, কখনও উপবাস।।" "আনিয়া বনের শাক, অ-লবণে করি' পাক, মুখে দিবে দুই তিন গ্রাস।" সেদিন কেবল অন্ন ও সিদ্ধ ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন।

৪ঠা নভেম্বর, ১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার প্রাতেঃ 'ছাপরায়' ষ্টীমারযোগে নৌকা বাঁধা হইয়াছিল। ৮টায় নৌকা ছাড়িল। অপরাহ্ণ ৪টায় সময় পাটনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া সেখানে তাঁবু ফেলা হইল। তিনি পাটনায় ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

পাটনায়—৫ই নভেম্বর, ১৯শে কার্ত্তিক, শুক্রবার শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বানুভবানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্বিপ্রহরে তাঁবুর মধ্যে বলিতে থাকেন, —"জেলখানায় আটক হইয়াছে। পূর্ব্বে কত খাইত, এখন তিন ছটাক চাউলের অন্ন। কাশীতে যে-রকম গন্ধ পাইয়াছি, পাটনাতেও সেই রকম গন্ধ।"

৬ই নভেম্বর, ২০শে কার্ত্তিক, শনিবার। সকাল বেলা তাঁবুর দরজা খোলা হইলে জনৈক সেবক বলিলেন, 'জিনিষপত্র ঢাকিয়া না রাখায় ইঁদুরে খাইয়াছে।' শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"এখন চুরি করিয়া খায়, আদর করিয়া দিলে খায় না।" পাটনাবাসী জনৈক রামানুজীয় সাধুকে 'হরিহর-ছত্র'-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। সেই দিন 'হরিহরছত্রে' যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পরের দিন আর যাইতে চাহিলেন না।

৭ই নভেম্বর, ২১শে কার্ত্তিক, রবিবার। তাঁবুর দরজা খুলিতেই বলিতে

লাগিলেন,—"'ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।' পান খাইবে না, তামাক খাইবে না। "ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ।।" গঙ্গাস্নানার্থী জনৈক বৃদ্ধ-সাধুকে দেখিয়া খুব আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ।।" শ্রীহনুমান বলিতেছেন,—'শ্রীনাথ ও জানকীনাথ একই বস্তু, তথাপি আমার সর্বস্ব কিন্তু কমললোচন শ্রীরাম।' কলির রাজা খুব প্রতাপ-শালী। কলির আগমনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারদকে বলিলেন,—'এখন আমার যাইবার সময় হইয়াছে।' শ্রীনারদ বলিলেন,—'জগতের জীবের তবে গতি কি হইবে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'ষোড়শোপচারে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে আমাকে পাইবে।' শ্রীনারদ বলিলেন,—'যাহারা দরিদ্র, তাহারা কি করিয়া ষোড়শোপচারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'ফুল, জল-তুলসী-দ্বারা আমার পূজা করিলেও পাইবে।' শ্রীনারদ বলিলেন,—'যাহারা জন্ম হইতে পঙ্গু, তাহাদের কি হইবে?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'দিনান্তে একবার একান্তভাবে আমার নাম লইলেই আমাকে পাইবে।"

পাটনাবাসী জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন,—"আমাকে উপদেশ দিন।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"আমি কি উপদেশ দিব?" অতঃপর বলিতে থাকেন,—"মায়ের ছেলের পেটের দিকে লক্ষ্য অর্থাৎ ছেলের ক্ষুধা পাইয়াছে কি-না, সেজন্য পেট দেখে। স্ত্রীর স্বামীর কোমরের দিকে লক্ষ্য অর্থাৎ স্বামী টাকা-পয়সা আনিয়াছে কি-না, দেখে। বিষয়ীর নিকট হইতে কৃষ্ণ বহু দূরে থাকেন।" ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"কি করিয়া বিষয় ত্যাগ করা যায়?" শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"সাধুরা সরযূ-নদীর তীরে থাকে, আর 'সীতারাম' বলে। এখানে আনন্দ; নিরানন্দ থাকে না। দুর্য্যোধন রাজার পক্ষে যাহারা আছে, তাহাদের নিরানন্দ। সুখ হইয়াছে, যুধিষ্ঠির মহারাজের পক্ষে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের। এই সুখ ও দুঃখ—দুই ভাই। ভোগ, আর ত্যাগ। কেহ ভোগ করে, কেহ ত্যাগ করে।"

১৪ই নভেম্বর, ২৮শে কার্ত্তিক, রবিবার। তাঁবু বন্ধ হইলে তিনি খুব উচ্চৈঃস্বরে 'হরি বোল, হরি বোল, গৌর নিতাই বোল' বলিতে থাকেন। অতঃপর বলিলেন,—"ইহা নবদ্বীপে বলে, মায়াপুরেও বলে। মায়াপুরের মন্দিরের চারিদিকে ঘর আছে। নিমগাছের তলে সেবা আছে। আমি একবার ছেঁড়া কাঁথা ও করঙ্গ লইয়া

মায়াপুরে গিয়াছিলাম। শচীনন্দন গোসাঞী আসিয়া আমার করঙ্গটী লইয়া গেল। আমি বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে করঙ্গটা ফিরাইয়া দিয়া শচীনন্দন গোসাঞী চলিয়া গেলেন। আমিও চলিয়া আসিলাম।”

১৫ই নভেম্বর, ২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার পাটনা হইতে ‘মুঙ্গের’ যাত্রার দিন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সকালে বাল্যভোগ দিয়া তাঁবুর দরজা বন্ধ করিলেন। অতঃপর খুব তাড়াতাড়ি রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়া ৩টার সময় প্রসাদ পাইলেন। তাঁবুর দরজা খুলিলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ‘শ্রীপঞ্চতত্ত্ব’-নামক, ‘নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল’ প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ আনন্দের সহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে সমস্ত জিনিষপত্র নৌকায় উঠাইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৬।। টার সময় পাটনা হইতে নৌকা ছাড়িল।

মুঙ্গেরের পথে—১৬ই নভেম্বর, ৩০শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, সন্ধ্যার সময় ‘রূপস্’ গ্রামে নৌকার নোঙ্গর পোতা হইল।

১৮ই নভেম্বর, ২রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীগঙ্গার দৃশ্য দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে দিন সন্ধ্যার সময় মুঙ্গের-ঘাটে নৌকা গিয়া পৌঁছিয়াছিল।

১৯শে নভেম্বর, ৩রা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার প্রাতেঃ নদীর ধার দিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। সহর হইতে বহুদূরে ‘চণ্ডীঘাটে’ গিয়া সেখানে তাঁবু খাটাইতে বলিলেন। তাঁবুর মধ্যে বসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,—

“শুনিয়া গোবিন্দ-রব, আপনি পলা’বে সব, সিংহরবে যথা করিগণ।” শ্রীগোপালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“ছানা-মাখন কোথায় পাইবে?” দধি পাওয়া গেল না বলিয়া তিনি আর বাল্যভোগ দিলেন না। সেবককে শাক আনিতে বলিলেন, শাক আনীত হইলে রন্ধন আরম্ভ করিলেন অতঃপর তিনি বলিতে-ছিলেন,—“শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বাড়ীতে ছয়টা তস্কর (ছয় বিগ্রহ—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ)। মায়াপুরে একটা তস্কর (শ্রীবিশ্বম্ভর)।

২০শে নভেম্বর, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, শনিবার প্রাতেঃ তাঁবু খোলা হইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন,—“মায়া এই সমস্ত লোককে পাইয়া বসিয়াছে।

পাখীগুলিও খায়-দায়, তাহাদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়-চড়ান আছে। এমনই মায়া!"

২১শে নভেম্বর, ৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বেলা ২টার সময় তাঁবু খুলিতে বলেন। তাঁবু খোলা হইলে বলিতে থাকেন,—"ভক্ত মোর প্রাণ-সখা শুনহে অর্জ্জুন। ভক্তমুখে করি মুঞি দ্বিতীয় ভোজন।" কে খায় এবং কে দেয়? পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে যাইতেছ, দেখা যাউক, কি হয়। ছয় গোস্বামী, ছয় রিপু, ছয় তস্কর। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বাড়ীতে ছয়টী তস্কর, আর মায়াপুর একটী তস্কর।" মধ্যরাত্রে প্রসাদ-সম্মানের পর শ্রীল বাবাজী মহারাজ গান করিতে থাকেন,—"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। ....", "এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি। ....", "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু। ....", ইত্যাদি।

২২শে নভেম্বর, ৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, প্রত্যুষে শ্রীল বাবাজী মহারাজ আনন্দের সহিত অনেক প্রকার গান গাহিতে লাগিলেন এবং ভাগলপুরে যাইবার জন্য নৌকা আনিতে বলিলেন। নৌকা আসিলে বেলা প্রায় ২।। টার সময় ভাগলপুর যাত্রা করিলেন। পরের দিন সোমবার বেলা প্রায় ১২টার সময় নৌকা ভাগলপুরে পৌঁছিল।

৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর, মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে ভাগলপুর 'মায়াগঞ্জ' ঘাটে পদার্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে বংশীবটের নিম্নে বস্ত্রমণ্ডপে তাঁহার ভাবসেবার শ্রীবিগ্রহগণ-সহ কৃপাপূর্ব্বক অদ্যাবধি অবস্থান করিতেছেন।

৯ই অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রাতেঃ শ্রীল বাবাজী মহারাজ জনৈক ব্যক্তিকে ভাগলপুর হইতে গোদাবরী ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে কতদিন লাগিবে এবং পথে কি কি প্রসিদ্ধ স্থান আছে, জিজ্ঞাসা করেন। সে দিন ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ সম্মান করিতে তাঁহার প্রায় রাত্রি ১টা হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতেঃ চতুর্দ্দিকে অনেক তালগাছ দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে থাকেন,—'তালবন, খেজুরবন দেখ; ভাগলপুরে কতক দিন থাক।' অতঃপর 'তালবন, খেজুরবন, বৃন্দাবনে মধুবন'—এইরূপ একটী গীতি গান করেন।

১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর, শনিবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ অপরাহ্ণ-কালে বলেন,—"অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে। নির্ভয় যেখানে, সেইখানেই ভয়। নির্ভয়

হওয়াই কঠিন। 'দিব না, দিব না অন্য কোন ভার। আমি চাই না রত্ন-অলঙ্কার।।', 'একবার দর্শন পেয়েছিলাম গর্ভ-মাঝারে। এখন আর তোমারে খুঁজিয়া পাই না হরি।।' হরি, আর কবে দর্শন পাইব?"

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, বুধবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রত্যূষে বলিতে থাকেন,—"অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গের ভিতরের কাজ, বহিরঙ্গের বাহিরের কাজ। যে যে-রকম ভাবে, তাহার নিকট সেই রকম আছে। যশোদার কাছে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য পর্য্যন্ত; শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযশোদা ও শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায়? ষোড়শ-সহস্র গোপী কোথায়? দধি-মাখন এখন কে করে?" সম্মুখে কতকগুলি বন দেখিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবন-স্মৃতিতে গাহিলেন,—"ভাণ্ডীরবনে বংশীতটের তলে কে বাজায় বাঁশরী?"

১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর, শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"কোথায় যাইব? কোন পথ পাইতেছি না। যেখানে যাইব, সেখানে গিয়াই ত' বসিয়া থাকিব। এই সেবার কাজ করে কে? সংসার করিয়াছ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর সংসার করিয়াছিলেন—ছয় সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন।"

১৮ই অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর, শনিবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, —"মাজিদপুর পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ। লোকের স্বভাব ভাল নয়; যাহা তাহা খায়; হরিনাম নাই। আমার স্থান নাই; পাণ্ডবদের মত অজ্ঞাত বনবাসে আছি। 'ভক্তের মুখে করি দ্বিতীয় ভোজন।'—এখন ভক্তই বা কোথায়? আর ভোজনই বা কোথায়?"

২০শে অগ্রহায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর, সোমবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন, —"জন্মিয়াই বামন, তাহাকে টান্‌লে টুন্‌লে কি হইবে? মায়া খুব ধরিয়াছে। 'পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে, ওহে নাথ কর পরিত্রাণ।' 'হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, ও পদে স্মরণ গেল দূরে।' 'সাধু-কৃপা বিনা আর না দেখি উপায়।' এই সাধু কে?"

২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, বুধবার প্রাতঃকাল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-স্মৃতিতে বলিতে লাগিলেন,—"নবদ্বীপের গঙ্গাও ডান্‌দিকে যায়, এখানের গঙ্গাও ডান্‌দিকে যায়। সম্মুখে চড়া দেখা যায়,—মায়াপুরের চড়া যেমন নবদ্বীপ হইতে দেখা যাইত, সেইরূপ।"

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর, শুক্রবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন, —"অবিশ্বাসী জনের সঙ্গে বাস করিবে না। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,— 'অসাক্ষাতে কার্য্য নাশ করে যেই জন। সাক্ষাতে কহে প্রিয় মধুর বচন।। বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ, মুখে মাত্র ক্ষীর। এমন দুর্জ্জন মিত্র ত্যজিবেক ধীর।।' কি সঙ্গ করিতেছ? 'পড়িনু অসৎ ভোলে।' কি মায়া! কি করিয়া ছাড়া যায়? 'না দেখি তারণ-লেশ'—তারণের লেশ দেখিতেছি না। 'যত দেখি, তত ক্লেশ'—ক্লেশ বাড়িতেই আছে। 'অনাথ কাতরে তেঁই কান্দে।' এখন কাঁদিতে পারে না। পথ দেখিতেছি না। শমন আসিলে কি জবাব দিব? মুখের কথা শুনিবে না।"

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন, —"এই দেশে হরিনাম নাই, এখন এই দেশে আসিয়াছি। এখন যে কোথায় যাইব, জানি না। 'রিপুবশ ইন্দ্রিয় হইল ......' রিপুর বশ ইন্দ্রিয় হইল, এখন উপায় কি?"

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৬ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। প্রত্যূষে তাঁবু খুলিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন,—"একটার পর আর একটা। তিন দিন হইয়াছে, আরও কয়দিন যায় দেখি। 'রুগ্ন-শরীরে না হয় কৃষ্ণভজন। যথা রোগ, তথা থাকে মন।।' 'ছাপান্নদণ্ড ভজন, চারি দণ্ড বিশ্রাম, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ-দর্শন।' 'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণদর্শন হয়।।' সাধুসঙ্গ ত' হইতেছে, কৃষ্ণদর্শন কোথায়? 'গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা।' 'গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর।।' শরীরে পুলক হয়, না নয়নে নীর বয়? কোন্‌টা হয়?—কোনটাই না। কেবল গাহিয়া? গাহিতে ত' আছেই। 'পুণ্য সে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম, পুণ্য মুক্তি দুই পরিহরি।' মন ত' সুখ চায়।"

একদিন কয়েকজন মাড়োয়ারী আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজকে 'যুদ্ধ কতদিন চলিবে?'—এই সম্বন্ধে বহুভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"এই সমস্ত আমি কিছুই জানি না।" বিষয়-ধুরন্ধর মাড়োয়ারিগণ তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইল না দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

ভাগলপুরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ কখনও চতুষ্পার্শ্বে তালবন, খেজুরবন ও ভাণ্ডীরবন দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন-স্মৃতিতে কখনও শ্রীগঙ্গার স্রোত, গঙ্গার চড়া প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্মৃতিতে কখনও হাস্য, কখনও রোদন করিতে করিতে

স্বানুভবানন্দে নিমগ্ন আছেন। এই অবধূতবর মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠের প্রত্যেকটী ক্রিয়াকলাপ অদ্ভুত ও অলৌকিক। এখানে কয়েকদিন তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে সর্দ্দি-কাশিতে আক্রান্ত হইবার লীলা করেন। এই সময়ে তাঁহার মানবধারণার অতীত, বিপরীত, বিসদৃশ ব্যবহার দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সর্দ্দিকাশি হইতে কোথায় লোকে ঠাণ্ডা হইতে দূরে থাকে, কিন্তু তিনি ঠাণ্ডাকে তখন অধিকভাবে আদর করিতেছেন! এই সময় তিনি দধি ও টক্ গ্রহণ করিতেছেন, ভোরবেলায় মাটীর কলসীর হিমবৎ ঠাণ্ডাজল শ্রীগঙ্গা-যমুনার নাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীমস্তকে দিতেছেন এবং এই ভীষণ শীতকালেও প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত-গাত্রে অবস্থান করিতেছেন।

১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর, শুক্রবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রত্যুষেই শীতের মধ্যে খেচরান্ন, পরমান্ন প্রভৃতি রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরেই তিনি পৌষ মাসে প্রত্যহ সকালে এইরূপ খেচরান্ন ভোগ দেন।

পরদিন তিনি বলেন,—"নবদ্বীপে ভিক্ষা করিতাম। পরের ভাত খাওয়া ভাল, পরের ঘরের তলে থাকা ভাল নহে।"

৩রা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার। শ্রীল বাবাজী বলেন,—"বেশ, নির্জ্জনে আছি। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'শ্রীরামকেলি'র মেলা; তখন সেখানে গিয়া খুব আনন্দ হইবে। এই কয়-মাস এইখানেই থাকিতে হইবে। (শ্রীনবদ্বীপের স্মৃতিতে–) এইখানেও নবদ্বীপের নক্সা—সম্মুখে ঐ শ্রীমায়াপুরের চর এবং ঐ পারে স্বরূপগঞ্জ। শ্রীগঙ্গা ও নবদ্বীপের ন্যায় দক্ষিণদিকে যায়। (আবার শ্রীবৃন্দাবন-স্মৃতিতে—) তালবন, খেজুর-বন, ভাণ্ডীরবন, বাঁশবন ও বংশীতটের নীচে বেশ আছি।"

৯ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার। দরজা খুলিলে কতগুলি মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক দু'একটী পয়সা দিয়া দর্শন করিয়া চলিয়া গেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে থাকেন,—"আমি যা'রে ভালবাসি, চোখের দেখা দেখে' আসি।' এই ত' আসিয়া দেখিয়া গেল, এই ত' ভালবাসা, দু'একটী পয়সা দিয়া গেল!"

পরদিন প্রাতেঃ একজন সেবককে তাঁবুর সম্মুখস্থ ছোট ছোট খেজুর গাছের গোড়া পরিষ্কার ও তাহাতে জল দিতে আদেশ করেন এবং উহার ডাল কাটিতে নিষেধ করেন। অতঃপর বলেন,—"সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র।" "ভক্তের মুখে করি দ্বিতীয় ভোজন।" "দ্বিতীয় ভোজন কি ভাবে করিবে? ভক্ত

কোথায় পাইবে? মাধুকরী ভিক্ষা যে বলে, মাধুকরী ভিক্ষা কে দিবে ও কে করিবে? মাধুকরী ভিক্ষা দিয়া কি ফল চায়? ভিক্ষা ত' দিতেছে। মাধুকরী কি করিয়া করিব? আমাকে ত' বসাইয়া রাখিয়াছে।" শ্রীল বাবাজী মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে সেবকগণকে বলেন,—"হরিনাম করিবে।"

১২ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। সেবকগণ নিকটে গিয়া বসিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবনামধারী তাঁহার পূর্ব্ব সখীদের নাম করিয়া তাহাদের বিবিধ অবৈধ কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি ঐ রকম অসৎ সঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের সঙ্গে মিশেন নাই, তাঁহার ভজন তিনি সুষ্ঠুভাবে করিয়াছেন।

পরদিন তিনি বলেন,—"'আপন ভকত-সঙ্গে, প্রেম-কথা রস-রঙ্গে'। ভজনই নাই, প্রেমকথা কি করিয়া হইবে?"

১৫ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন, —"'পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।।" গৌর ভজ্‌লে নিতাই পা'বে, নিতাই ভজ্‌লে গৌর পা'বে।' 'সর্প দুষ্ট, খল দুষ্ট, দুষ্ট দুইজন। খলের বশ করিতে নাহি কোন ক্রম।।"

১৬ই পৌষ, ১লা জানুযারী, শনিবার। বিকালে তাঁবু খোলা হইলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেন,—"'রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল........।' গোরাপদ পাসরিলে কি হয়, দেখা যাউক্। 'সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র'; জন্মই তাহার বৃথা, তবে আর ভাল হইবে, কোথা হইতে? 'গঙ্গার পরশে হয়, পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ।।" গঙ্গার মধ্য দিয়া ত' আসিয়াছ? পাবন হইয়াছি কি? দর্শনে পবিত্র করে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—'জীয়ন্তে মরণ ভেল'। আর, থাকিয়া কি করিবে? আমার পাপের বোঝা দেখিয়া গৌরও চলিয়া গিয়াছে। 'অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ। অসৎসঙ্গ ছাড়লে ত' লইবে। তোমাকে না ডাকিলে, স্বয়ংই আসিবার কথা আছে। একা আসিতে না পর, নিতাইকে লইয়া আসিও। তাহাও না পারিলে ভক্তগণকে লইয়া আসিও। গোপনে আসিলে একবার হৃদয়ে আসিও, একবার আসিও, দেখি।" এই বলিয়া তিনি 'গৌরচন্দ্র গৌরহরি, একবার এসো হে!'—এই গান করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র

শ্রীহট্টজেলার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ শ্রীমধু মিশ্রের চারিপুত্র— ১। উপেন্দ্র, ২। রঙ্গন, ৩। কীর্ত্তিদ, ৪। কীর্ত্তিবাস। উপেন্দ্রের সাতপুত্র—১। কংসারি, ২। পরমানন্দ, ৩। পদ্মনাভ, ৪। সর্ব্বেশ্বর, ৫। জগন্নাথ মিশ্র, ৬। জনার্দ্দন, ৭। ত্রৈলোক্যনাথ— (প্রেমবিলাস-২৪); উপেন্দ্রের পত্নীর নাম কলাবতী। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাব শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণপিতামহ পর্জ্জন্য গোপ-ই শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র—ইহা কথিত হইয়াছে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়। গৌঃ গঃ দীঃ-৩৭ অনুসারে গৌরলীলার শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ছিলেন ব্রজলীলায় শ্রীনন্দ মহারাজ।

পুরা যশোদা ব্রজরাজ নন্দো বৃন্দাবনে প্রেমবশকরৌ।
শচী-জগন্নাথপুরন্দাভিধৌ বভুবতুস্তৌ ন চ সংশয়ো।।
অম আবিশাতামেব দেবাবদিতিকশ্যপৌ।
শ্রীকৌশলা দশরথৌ তথা শ্রীপৃশ্নিতৎপতী।।

—গৌর গঃ ৩৭-৩৮

ইঁহারাই লীলাভেদে শ্রীকশ্যপ, শ্রীদশরথ, শ্রীসুতপা ও শ্রীবসুদেব নামে পরিচিত। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পদবী পুরন্দর। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীশচীদেবী শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পত্নী।

"সেই ব্রজেশ্বর,—ইঁহ জগনাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইঁহ শচীদেবী মাতা।।
সেই নন্দসুত—ইঁহ চৈতন্য গোসাঞি।
সেই বলদেব—ইঁহ নিত্যানন্দ ভাই।।"

(চৈ চঃ আঃ ১৭।২৯৪-২৯৫)

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের উদার চরিত্র বর্ণনা করিবার উপমা জগতে বিরল। "উদার চিরতর তেঁহো ব্রহ্মাণের সীমা। হেন নাহি—যাহা দিয়া করিব উপমা।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১৩৭)। ধর্ম্মের গ্লানি ও ভক্তগণের দুঃখ মোচনার্থ কৃপালু ভগবান্ ও ভক্তগণের 'অবতার' হয় মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে শচীদেবীর আটটী কন্যা

জন্মগ্রহণ করিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, আর একমাত্র পুত্র শ্রীবিশ্বরূপই মহাপ্রভুর জন্মকালে প্রকট ছিলেন। শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের প্রকাশ পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব। ইনি ১২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শঙ্করারণ্য' নাম লাভ করেন। ১৪৩১ শকাব্দে বোম্বাই (মুম্বই) প্রদেশে শোলপুর জেলার অন্তর্গত পান্টরপুরে অপ্রকট হন।

অপ্রাকৃত বাৎসল্য রসের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় বিপ্র-দম্পতি শচী-জগন্নাথ পুত্রজ্ঞানে গৌরমুখদর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী লগ্নবিচারে মহারাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণসমূহ, সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব ও অলৌকিক গুণসমূহ শ্রবণ করিযা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও মিশ্রভবনের ভক্তগণ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন। লগ্ন বিচারকালে জনৈক পরমার্থবিৎ মহাজন ব্রাহ্মণরূপে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর ভবিষদ্-লীলার দিব্যকর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রেমভক্তি প্রচারের কথা বলিবার কালে জানাইলেন, যাহা জগতে কোনও দিন প্রচারিত হয় নাই। সেই অনর্পিত উজ্জ্বল-রসসম্বন্ধিনী কৃষ্ণভক্তি শোভা এই শিশুর দ্বারাই সমগ্র জগজ্জীবের নিকট সমর্পিত হইবে। বিপ্র স্থির করিলেন—"প্রভুর কোষ্ঠীগণনা দ্বারাই আমি ভাগ্যবান্ হইয়াছি এবং এই শিশুর নাম—"বিশ্বম্ভর" হইবে।" সকল শুভলক্ষণের সহিত প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানিতে পারিয়া তাদৃশ দুঃখ বার্তা দ্বারা পাছে রসভঙ্গ বা রস-বিপর্যয় হয়, এজন্য সে-সকল কথা প্রকাশ করিলেন না।

"নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪৫)

—এই দুই পুণ্যতিথির সেবা করিলে বদ্ধজীবের অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবক প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই তিথি দ্বয়—জয়ন্তীব্রত বা ভগবদাবির্ভাব দিবস; উপোষণ প্রভৃতি দ্বারা এবং মহোৎসবাদির দ্বারা এই তিথিদ্বয়ের সেবা হয়।

নিমাইর অন্নপ্রাশন সংস্কার কালে রুচি পরীক্ষাকালে শ্রীগৌরসুন্দর বৈশ্যোচিত ধান্য, রজত, স্বর্ণ প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন না বা উদর পরায়ণ সকাম বিপ্রের ন্যায় খই প্রভৃতি ভোজন করিবার ব্যগ্রতা লীলা দেখাইলেন না; পরন্তু বিবিধ বেদানুগ

শাস্ত্রের মধ্য হইতে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানিকেই গ্রহণপূর্বক স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রাধান্য স্থাপনই প্রভুর ভাবি কৃষ্ণভজন প্রচার লীলার নিদর্শনরূপে জ্ঞাপিত হইয়াছিল।

একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে গৃহমধ্য হইতে পুস্তক আনিতে আদেশ করেন। পুস্তকানয়নার্থ নিমাইর পদসঞ্চরণকালে শচী ও জগন্নাথ অপূর্ব নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গ্রন্থ প্রদান করিয়া বিশ্বম্ভর ক্রীড়ার্থ গমন করিলে ব্রাহ্মণ দম্পতি গৃহমধ্যে ধ্বজ-বজ্র-তুল্য-পতাকা লাঞ্ছিত অপরূপ চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন; কিন্তু বাৎস্য প্রেমের স্বভাববশতঃ ঐ পদচিহ্ন যে তাঁহাদেরই পুত্ররত্নের, ইহা জানিতে না পারিয়া গৃহদেবতা শ্রীদামোদর শালগ্রামই তাঁহাদের অলক্ষিতে গৃহ মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীদামোদরের অভিষেক-ভোগ-পূজাদির অনুষ্ঠান করেন। নিমাই একটুকু বড় হইলে হামাগুড়ি অর্থাৎ জানুচংক্রমন লীলা করিয়া পিতা মাতা ও সকলকে আনন্দ দিতে লাগিলেন। একদিন শিশু নিমাই অঙ্গনে সর্পরূপধারী শেষকে দেখিয়া গৌর নারায়ণরূপে তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ খেলা করিয়া কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপর শয়ন করিয়া স্বীয় শেষশায়ী লীলা প্রদর্শন করিলেন। সর্প হইতে নিমাইর বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রাদি সকলে অত্যন্ত কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে সর্প নিমাইকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিলে নিমাই এর ক্রন্দন থামিয়া যায়, নিমাই আনন্দে নৃত্য করেন, ধূলায় গড়াগড়ি যান—এই সব দেখিয়া নারীগণ উষাকাল হইলে বালককে বেষ্টন করিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে থাকেন। পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিগণ নিমাইয়ের অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আদরপূর্বক সন্দেশ, কলা প্রভৃতি দিতেন, নিমাই সেই সব আনিয়া যে সকল নারী হরিকীর্ত্তন করিতেন তাঁহাদিগকে প্রসাদরূপে দিতেন। একটু বড় হওয়ায় নিমাই এখন প্রতিবেশীদের গৃহেও গমন করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দুগ্ধ অন্নাদি গ্রহণ করেন এবং আহার্য্য যেখানে না পান তাঁহাদের গৃহদ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া আসেন। এইরূপ বালচাপল্য করিয়া ভক্তগণকে সুখ দিতেন। একদিন নিমাই জগন্নাথ মিশ্রালয়ের বাহিরে খেলা করিতেছেন এমন সময়ে বালকের শ্রীঅঙ্গে বহমূল্যবান অলঙ্কারাদি দেখিয়া দুইটি চোরের বড় লোভ হইল, তাহারা তাঁহাকে ভুলাইয়া কাঁধে করিয়া দূরে লইয়া যায়, কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনেই আসিয়া উপনীত হয়। তখন তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পলায়ন করে। শ্রীজগন্নাথ

মিশ্র ব্যাকুল হইয়া নিমাই এর অন্বেষণ করিতেছিলেন, পুনঃ নিমাইকে দেখিয়া প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন, তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

বালগোপাল-উপাসক কোনও এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বিপ্রগৃহে আসিলে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পূজা বিধান করিলেন এবং রন্ধনাদির জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৈর্থিক বিপ্র রন্ধন করিয়া বালগোপাল মন্ত্রে ভোগ নিবেদন করা মাত্রই নিমাই আসিয়া সেই নৈবেদ্য খাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথ মিশ্র অতীব মর্ম্মাহত হইয়া শিশুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বিপ্র তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ রন্ধন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও জগন্নাথ মিশ্রের প্রার্থনায় পুনরায় রন্ধন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বালককে প্রতিবেশীর গৃহে লইয়া গিয়াছেন যাহাতে সে উৎপাত করিতে না পারে, কিন্তু তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বালগোপাল মন্ত্রে সেই ভোগ নিবেদন করা মাত্রই গৌরগোপাল আসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। নষ্ট হইল নষ্ট হইল বলিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুনঃ মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রকে শাসন করিতে গেলে তৈর্থিক বিপ্র পুনরায় নিবারণ করিলেন। বিপ্র বলিলেন—"শিশুর বোধ নাই, ইঁহার কি দোষ, অদ্য আমার অদৃষ্টে ভোজন নাই।" কিন্তু নিমাই এর বড় ভাই বিশ্বরূপের বিশেষ প্রার্থনায় রন্ধন করিলেন। তখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, নিমাইও ঘরের মধ্যে যোগনিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। সকলেই যখন নিদ্রাভিভূত, সেই সময় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ভোগ নিবেদন করিলে গৌরগোপাল আসিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এইবার নিমাই অপরূপ অষ্টভুজ মূর্ত্তি তৈর্থিক বিপ্রকে দেখাইলেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ তদ্ব্যতীত এক হস্তে নবনীত ধারণ, অপর হস্তে ভক্ষণ এবং অপর দুই হস্তে মুরলী বাদন। ব্রাহ্মণ সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে উক্ত গুহ্যলীলা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্মণ অন্যত্র ভিক্ষাদি করিয়া প্রতিদিন মিশ্রভবনে আসিয়া ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া যাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"তুমি অনেক জন্মের আমার কিঙ্কর, গোকুলে নন্দ গৃহেও তুমি অতিথি হয়েছিলে, সেখানেও অনুরূপ লীলা হয়েছিল।"

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যথাকালে গৌরগোপালের 'হাতে খড়ি' এবং কর্ণবেধ ও 'চূড়াকরণ সংস্কার' সমাপন করিলেন। বিদ্যারম্ভ হইলে নিমাই তিনদিনে সমগ্র

বর্ণমালা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া কৃষ্ণনাম মালা পড়িতে ও লিখিতে লাগিলেন। নিমাই কখনও কখনও আকাশের পাখী, চাঁদ, তারা ইত্যাদি আনিয়া দিবার জন্য মাতা-পিতার নিকট আব্দার করেন, না আনিয়া দিলে ক্রন্দন করিতে থাকেন। মাতাপিতা হরিকীর্ত্তন করিলে পুত্রের ক্রন্দন বন্ধ হয়। একদিন পুনঃ পুনঃ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলেও পুত্রের ক্রন্দন বন্ধ না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই জানাইলেন আজ একাদশী দিনে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে যে বিষ্ণুর নৈবেদ্য হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। এমন অসম্ভব কথা শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অবশেষে তাঁহার বন্ধুদ্বয় জগদীশ-হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া সব কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাঁহারাও সানন্দে বিষ্ণুর নৈবেদ্য জগন্নাথ মিশ্রকে দিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উহা লইয়া পুত্রকে দিলে তাহার ক্রন্দন বন্ধ হইল। নিমাই এর বিভিন্ন প্রকার বাল-চাপল্যের কথা পুরুষগণ জগন্নাথ মিশ্রের নিকট ও বালিকাগণ শচীমাতার নিকট অভিযোগ জানাইতে থাকিলে শ্রীমিশ্র পুত্রকে শাসন করিতে গিয়া তাহাকে শান্ত ও নির্দোষের ন্যায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণে শচী ও জগন্নাথ অতীব মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। নিমাইও অধ্যয়ন করিয়া পরে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যদি সংসার ত্যাগ করে এই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন, এই বিচার করিলেন, পুত্রের পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, মূর্খ হইয়া ঘরে থাকুক। তাহাতে নিমাই পুনরায় চাপল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন বিষ্ণুর ভোগরন্ধন হইয়াছে এমন বর্জ্য মৃদ্‌ভাণ্ডের উপর অপবিত্র স্থানে বসিয়া পড়িলেন। শচীমাতা তাহা দেখিয়া অস্থির হইয়া পুত্রকে অপবিত্র স্থান হইতে চলিয়া আসিতে বার বার বলিতে থাকেন। নিমাই মাতাকে দত্তাত্রেয়ভাবে বলিতে লাগিলেন—"মূর্খের শুদ্ধাশুদ্ধের জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? যে হাঁড়ীতে বিষ্ণুর নৈবেদ্য রন্ধন হইয়াছে তাহা কি করিয়া অপবিত্র থাকে? বিশেষতঃ যেখানে আমি আছি সেটাই বা কি করিয়া অপবিত্র হয়? ভগবদ্ভক্তিরহিত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক শুচি-অশুচি বিচার প্রাকৃত লোকের কল্পনা ও মনোধর্ম্ম মাত্র। বালক কিছুতেই অশুচি স্থান পরিত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শচীমাতা নিজে যাইয়া পুত্রকে ধরিয়া আনিলেন এবং স্বয়ং স্নান করিলেন ও পুত্রকেও স্নান করাইলেন। শচীদেবী ও অন্যান্য সকলে

নিমাইকে পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিলে মিশ্র নিমাইকে পুনরায় পড়িতে আদেশ দিলেন।

অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীনিমাই এর উপনয়ন সংস্কার হইলে তিনি বামনলীলানুসরণে ভিক্ষা করিলেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য অভিন্ন সান্দীপনি মুনি অধ্যাপক শিরোমণি শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অর্পণ করিলেন। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতও উপযুক্ত পরম সুন্দর শিষ্য পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া পড়ুয়াগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক ও তাহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। নিমাইকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, যথাবিধি বিষ্ণু পূজন, তুলসীতে জল প্রদান ও প্রসাদ ভোজনাদি নির্জ্জনে অধ্যয়নলীলা ইত্যাদি দেখিয়া মিশ্রের আনন্দ হইল, পুত্রের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভয় এই পুত্রও সংসার অসার বুঝিয়া সংসার পরিত্যাগ না করে। একদিন স্বপ্নে শ্রীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব সন্ন্যাসরূপ ভক্তগণ সহ সংকীর্ত্তন, নৃত্য, কীর্ত্তন, ক্রন্দন, হাস্য ইত্যাদি দেখিয়া স্থির প্রত্যয় হইল নিমাই নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবে। শচীদেবী পতিকে বুঝাইলেন, নিমাই যেরূপ বিদ্যারসে নিমগ্ন হইয়া, সে কখনও গৃহত্যাগ করিয়া যাইবে না। তাহাতেও মিশ্রের প্রত্যয় হইল না। তিনি নিমাই এর সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শনের পূর্বেই অন্তর্ধান করিলেন। শ্রীদশরথ মহারাজের বিয়োগে ভক্তবিরহে শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরসুন্দরও তদ্রূপ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধানে বিস্তর ক্রন্দন করিলেন এবং বিরহ সন্তপ্ত শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পুণ্যবান্ সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি এক ধার্মিক পিতা শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্য, কুমার হট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-এর সন্তান (কলিকাতা ও চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর ধামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই কুমারহট্ট)। তাঁহার সন্ন্যাসপূর্ব নাম কোথাও জানা যায় না। তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান এবং বেদশাস্ত্রে ও বেদান্তে সুপণ্ডিত। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস (সংসার জীবন ত্যাগ) গ্রহণ করিয়া তিনি সর্বান্তঃকরণে ও সর্বপ্রকারে নিজেকে গুরুসেবায় নিয়োজিত করেন, এবং তাঁহার (গুরুর) অতীব প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠেন।

যে সময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু একাদিক্রমে কয়েক বৎসর ধরিয়া তীর্থযাত্রায় রত ছিলেন, দৈবক্রমে সে সময় পশ্চিম ভারতের কোন এক স্থানে তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সান্নিধ্যে আসেন। উভয়েই তখন স্বাভাবিকভাবে নিরন্তর কৃষ্ণের অনুধ্যানে বিভোর হইয়া ভাব বিহ্বল থাকিতেন। এই ভাবের লক্ষণগুলি তাঁহাদের দেহে পরিস্ফুট হইত। পরস্পরের দর্শনে উভয়েই প্রেম বিহ্বল হইতেন, তখন উভয়েই মূর্চ্ছাগত হইতেন। ইহা দর্শন করিয়া শ্রীঈশ্বর পুরী, যিনি শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী সহ অন্যান্য সহশিষ্যগণ লইয়া উপস্থিত ছিলেন, প্রেমভাবের উদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চেতন লাভ করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেমভাবে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখিয়া, ঈশ্বরপুরী ও ব্রহ্মানন্দ পুরী শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি গাঢ় অনুরাগী হইয়া পড়িলেন, যেহেতু তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে তিনি তাঁহাদের গুরুর এতই প্রিয়।

যে সময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজেকে পঠন পাঠনে নিমজ্জিত ও এক প্রখ্যাত পণ্ডিতরূপে শিক্ষকের ভূমিকায় নিবিষ্ট, একবার শ্রীঈশ্বরপুরী নিজের নাম-ধাম-পরিচয় গোপন রাখিয়া শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে আগমন করেন যাহাতে কেহ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে না পারে। যে সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অন্যান্য ভক্তগণকে লইয়া কৃষ্ণ মহিমা আলোচনা রূপ কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত, তখন পুরীপাদ খুব দ্বিধাযুক্ত অত্যধিক নম্রতা লইয়া সেখানে বসিলেন; শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার উপর নজর রাখিতেছিলেন ও তাঁহার আচরণ দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন ইনি নিশ্চয়ই কোন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। আচার্য্য তাঁহার নিকট খুব বিনীত ভাবে গমন

করিয়া বলিলেন যে তাঁহার ধারণা হইতেছে যে তিনি একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য নিজে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য, যে কারণে তিনি নিজ গুরুভ্রাতার ভিতর বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরে শ্রীঈশ্বর পুরী বলেন, "আমি এক শূদ্রাধম (অর্থাৎ হিন্দুদের ভিতর নিম্নতম শ্রেণীর লোক অপেক্ষা নিম্নতর), আমি আপনার চরণদর্শনে আসিয়াছি।" নিজে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এবং অন্যদিকে চারি আশ্রমের শ্রেষ্ঠ আশ্রমের অন্তর্গত সন্ন্যাসী হইয়াও নিজের এই প্রকার পরিচয় প্রদান হইতেই বুঝা যায় তিনি নিশ্চয়ই এক মহান্ বৈষ্ণব হইবেন, কারণ অন্য কেহই এইরূপ নিজেকে গুরুত্বহীন ও সম্মান প্রাপ্তি অযোগ্য মনে করিতে পারেন না। এই প্রকার আভাস পাইয়া তৎকালীন অদ্বৈত সভার নিয়মিত যোগদান কারী ও পরবর্ত্তীকালে শ্রীমহাপ্রভুর খুব ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ভক্ত শ্রীমুকুন্দ তাঁহাকে এক মহান্ বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং সে পুরীপাদের প্রকৃত চরিত্র গোপনীয়তা হইতে প্রকাশ করাইবার নিমিত্ত ভক্তিপ্রকাশক এক শ্লোক গান করিলেন, যাহা তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিল ও এক মহান্ ভক্তরূপে তাঁহার পরিচিতি প্রকাশ পাইয়া গেল, কারণ তৎক্ষণাৎ তিনি চক্ষে প্রবল অশ্রুধারা সহ পড়িয়া গেলেন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন ও তাঁহার দেহ অশ্রুজলে সিক্ত হইল। অদ্বৈত সভার ভক্তগণ তাঁহাদের মধ্যে এমন একজন ভক্তকে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন ও ক্রমশঃ তাঁহারা তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলেন।

অপর এক দিবস শ্রীপুরীপাদের সহিত দৈবক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত পথে দেখা হইয়া গেল,সেই সময় তিনি (মহাপ্রভু) ছাত্রগণকে পড়াইয়া গৃহে ফিরিতে ছিলেন, তিনি তাঁহাকে (পুরীপাদকে) প্রণাম করিলেন। তাঁহার (মহাপ্রভুর) অসামান্য সুন্দর দেহ এবং ভক্তপ্রযুক্ত ভয় জাগরণকারী আকৃতি দর্শন করিয়া তিনি (পুরীপাদ) তাঁহাকে একের পর এক কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম কি, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কোথায় তোমার গৃহ, কি গ্রন্থ তুমি পড়াও?" মহাপ্রভুর সঙ্গে ছাত্রগণ বলিল, ইনি নিমাই পণ্ডিত। তাঁহার জন্ম-দিবসে প্রতিবেশী মাতৃমণ্ডলী স্নেহভরে তাঁহার এই নাম দিয়াছেন এবং নবদ্বীপ মায়াপুরের জনগণ তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকেন ও পরবর্ত্তীকালে যখন তিনি অধ্যাপক হন তখন তিনি নিমাই পণ্ডিত হইয়া যান। শ্রীপুরী নামটি জানিয়া খুশী হইলেন ও বলিলেন, "ওহো, তা'হলে তোমার নাম নিমাই পণ্ডিত?" মহাপ্রভু তাঁহাকে আহারের

জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া প্রগাঢ় স্নেহময় সমাদর সহকারে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শচীমাতা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ প্রস্তুত করিলেন ও তাঁহাকে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। মহাপ্রভুর আতিথেয়তার সম্মান করিয়া তিনি কিছুক্ষণ গৃহের মন্দিরে যাওয়ার মধ্যবর্ত্তী কক্ষে অবস্থান করিলেন ও কৃষ্ণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মধ্যে প্রেমের মোহ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় দেহ শিথিল হইয়া পড়িল, ও যদিও তিনি, মেকী বৈষ্ণবগণ যাহারা লোকের নিকট হইতে সম্মান লাভের আশায় যেমন কৃত্রিমভাবে দেহের অশ্রু, কম্পাদি বিকার দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহাদের মত না হইয়া, প্রকৃত বৈষ্ণবের মত তাহা গোপন করার চেষ্টা করেন। মহাপ্রভু তাঁহার সম্মানীয় অতিথির মধ্যে এপ্রকার অস্বাভাবিক অশ্রু প্রবাহ, যাহা ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের প্রকাশ সূচক, দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন।

শ্রীপুরীপাদ শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের একান্ত অনুরোধে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে তাঁহার গৃহে অতিথিরূপে কয়েকমাস অবস্থান করেন। এই আচার্য্য ভগবানের এক মহান্ ভক্ত এবং পরবর্ত্তীকালে যখন পুরীতে ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের ভগবত্ত্বা বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়কারী ও তাঁহাকে কলিযুগে অবতারী রূপে গণ্যকারী ও তাঁহার গুণমুগ্ধ তিনি সেকালের ভারতের পূর্বাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও নিজ শ্যালক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। অতঃপর এই ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া পড়েন। প্রত্যেক ভক্ত পুরীপাদকেও দর্শন করিতে আসিতেন এবং মহাপ্রভুও প্রত্যহ নিয়ম করিয়া দৈনিক সন্ধ্যায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিতেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার শেষে।

পুরীপাদ শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে খুব ভালবাসিতেন, তাঁহার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন প্রেমাশ্রুর প্রবাহ ও যিনি ছিলেন আবাল্য বৈরাগী প্রকৃতির। তিনি নিজ রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে পণ্ডিতকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। মহাপ্রভু যখন যথারীতি সন্ধ্যায় দর্শন করিতে আসেন, সে সময় পুরীপাদ সেই পাণ্ডু লিপিটি তাঁহাকে দিয়া বলেন, "শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিষয়ে আমি এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছি, যেহেতু তুমি এক মহান পণ্ডিত, সেই জন্য আমি ইহা তোমার নিকট পেশ করিতেছি, ইহার মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকিলে আমাকে জানাইবে। তুমি ইহা করিয়া দিলে আমি অতীব প্রীত হইব।" তদুত্তরে মহাপ্রভু

বলিলেন, "যে ভক্তের বিশেষতঃ কৃষ্ণের ভুল ধরে সে একজন পাপী। ভক্তের কবিত্ব ভাবে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে তুষ্ট হন, শিক্ষা বিষয়ক যোগ্যতা যাহাই হউক না কেন, জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাব গ্রহণ করেন, যে শব্দই, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সে ব্যবহার করুক না কেন সে বিচার না করিয়াই। ভুল ত্রুটি নির্দেশ কারীরাই ভ্রান্ত, কারণ কৃষ্ণ ভক্তের বর্ণনাতেই প্রীতি লাভ করেন। সুতরাং কৃষ্ণ প্রেম হইতে উদ্ভূত বিবরণীতে প্রশ্ন উঠাইবার মত ধৃষ্টতাকে কে দেখাইবে?" মহাপ্রভুর এই মধুর উক্তিগুলি পুরীর হৃদয়কে যেন অমৃতে ভরাইয়া দিল। তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন, "তোমাকে দোযারোপ করা হইবে না, তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যেখানে কোন ত্রুটি থাকে।" এইভাবে মহাপ্রভু প্রতি সন্ধ্যায় প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ এই ধরণের আলোচনায় মত্ত হইয়া থাকিতেন। একদিন মহাপ্রভু উহাতে ব্যাকরণ সংক্রান্ত কিছু অসঙ্গতি নির্দ্দেশ করিলেন। পুরীপাদও এক মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। পর দিবস তিনি নিয়ম মত তাঁহার নিজ পক্ষ সমর্থন করিলে মহাপ্রভু তাহা অনুমোদন করিলেন আবার নিজ পক্ষও। মহাপ্রভু এই আলোচনা লইয়া আর অগ্রসর হইলেন না, পরন্তু পুরীপাদের বক্তব্য মানিয়া লইলেন, যেহেতু তিনি সর্বদা নিজ অপেক্ষা ভক্ত মহিমা বর্ণনা করিতে অধিক আনন্দিত হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১-৯-১০, ১১) দুইটি শ্লোক পাওয়া যায় যাহাতে বলা হইয়াছে; "শ্রীমাধব (অর্থাৎ মাধবেন্দ্র)পুরী যিনি কৃষ্ণ প্রেমে পরিপৃক্ত হইতেছেন তিনি ভক্তিলতার প্রথম অঙ্কুর। সেই অঙ্কুর তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী পাদের সেবা যত্নে পুষ্ট হইয়া হইয়া উঠে ও পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভুতে মহীরুহে পরিণত হয়।" যদিও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ আবির্ভাবেরও পূর্বে নিজ ভক্তগণকে প্রেরণ করেন কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে, যেজন্য তিনি নিজে অবতরণ করেন ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ লীলাভিনয় করেন যাহাতে মানুষ সৎগুরুকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে—শুদ্ধ ভক্তি যাজনের জন্য যাহা-দ্বারা জীব চরমতম মঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (১-১১-১২৫) শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেন; "প্রেমের পূর্ণ ভাণ্ডার শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী নিজ প্রিয়তম শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীকে উজাড় করিয়া দিয়াছেন।"

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ইহলোক ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাব প্রকাশ করিয়া ছিলেন যেমন প্রতিটি শুদ্ধ ভক্ত সদাই নিজ হৃদয়ে আত্মনিবেদন অনুভব

করেন যে তিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারিলেন না যেহেতু তাঁহার সেরূপ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা লাভ হয় নাই। শেষ সময়ে, শ্রীপুরীপাদ সর্বদা তাঁহার পাশে থাকিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ও কৃষ্ণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় সকল সেবা এমন কি সর্বপ্রকার ধূলা অবর্জনাদি পরিষ্কার করিতেন। তাঁহার প্রতি অতীব প্রীত হইয়া গুরু (মাধবেন্দ্র পুরী) তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এই বলিয়া বর প্রদান করেন "তোমার কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ লাভ হউক।" তাহা করিয়াই তিনি এক শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, যে শ্লোকে কৃষ্ণদর্শন লাভ রূপ কৃপার জন্য গভীর উদ্বেগ ব্যঞ্জক এবং সেই শ্লোকে প্রতিটি শুদ্ধভক্তের মুখে প্রকাশিত হওয়ায় খুব বিখ্যাত। সেই সময় হইতে শ্রীঈশ্বর পুরী শ্রী চৈঃ চঃ (২।৮।২৯) এর ভাষায় এক 'প্রেমসমুদ্র' হইয়া উঠিলেন।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, কিছুদিন পূর্বে অপ্রকটিত নিজ পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের উদ্দেশ্যে 'গয়া-শ্রাদ্ধ' সম্পন্ন করিবার মানসে গয়ায় আগমন করেন সে সময় সহসা সেখানে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায় যাঁহার মনকে মহাপ্রভু স্বয়ং পরিচালিত করিয়া, যদিও তাঁহার সেই সময় উপস্থিত থাকার ব্যাপারে কিছু জানা ছিল না, সেখানে উপস্থিত করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রদ্ধাসহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে, তিনি ও মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরের অশ্রুতে উভয়ের দেহ সিক্ত হইল। মহাপ্রভু বলেন, "এখন আপনার চরণ দর্শন হওয়ায় আমার গয়া যাত্রার উদ্দেশ্য সার্থক হইল। লোকান্তরিত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানে তাঁহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং তাহাও যাঁহাকে যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া করা হয়, তাঁহারাই উদ্ধার প্রাপ্ত হন। কিন্তু আপনার দর্শন মাত্রই কোটি কোটি লোক সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সুতরাং পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আপনার সমান নহে,কারণ আপনি পবিত্রতার কারণ। এখন আপনি আমাকে এই সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন। যেজন্য আমি আমার দেহটিকে আপনাকে উৎসর্গ করিলাম। আমাকে কৃষ্ণ পাদপদ্মের মধু পান করাইয়া পরিপৃক্ত করুন, এই দানই আমি আপনার নিকট হইতে যাজ্ঞা করি।" তদুত্তরে শ্রীঈশ্বরপুরী কহিলেন "ওহে পণ্ডিত, শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিত জানিয়াছি যে তুমি সম্যক্‌রূপে ভগবান্। তোমার মধ্যে অত্যধিক পাণ্ডিত্য ও অনবদ্য চরিত্র ভগবানের উপাদান ব্যতীত কি সম্ভব হইতে পারে? যে শুভ স্বপ্ন আমি দেখিয়াছি তাহারই ফল আমি এই সবে পাইতেছি। ইহা অতীব ও প্রশ্নাতীত ধ্রুব সত্য যে তোমার দর্শনে প্রতি

মুহূর্তে আমি পরমসুখ লাভ করি। শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে তোমাকে দেখা অবধি অন্য কোন চিন্তা আমার মনে নাই। ইহা খাঁটি সত্য ও ইহার মধ্যে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু নাই, যে আমি তোমাকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণ দর্শন সুখ অনুভব করি।" ঈশ্বরপুরীর এই সত্যবচনে মহাপ্রভু সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন, "ইহা তো আমার পরম সৌভাগ্য", এইরূপ কিছু কথাবার্ত্তার পর মহাপ্রভু, পুরীপাদের অনুমতিক্রমে গয়া শ্রাদ্ধাদির জন্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি করিতে গেলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর তিনি বাসায় ফিরিলেন ও একটু বিশ্রাম লইয়া রন্ধন করিতে গেলেন, ঈশ্বরপুরীপাদ সেখানে আগমন করিলেন, মহাপ্রভু নিজের জন্য পাচিত ভোজ্যাদি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, কিন্তু পুরীপাদ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া খাইবার প্রস্তাব দিলেন। মহাপ্রভু অবশ্য একাকীই খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ও নিজে পুনরায় রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরীর ভোজন সমাপ্ত হইলে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁহার দেহ সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা লিপ্ত করিলেন। পরদিন মহাপ্রভু নিভৃতে পুরীর নিকট আগমন করিয়া অতীব শ্রদ্ধাবনতভাবে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পুরী বলিলেন, "আমি তোমাকে আমার জীবনও দান করিতে প্রস্তুত, মন্ত্র দানের কথা আর!" এইভাবে জগদ্গুরু মহাপ্রভু এক সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন নিজ প্রকৃত মঙ্গলের জন্য দীক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও কিভাবে গুরুর সহিত আচরণ করিতে হয়। অতঃপর তিনি অতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গুরুর সহিত বাস করিয়া, তাঁহার উপদেশমত তিনি নবদ্বীপ মায়াপুরের উদ্দেশ্যে গয়া ত্যাগ করিলেন।

শ্রীপুরীপাদ নবদ্বীপ মায়াপুরের কতিপয় তীর্থ যাত্রীগণের মুখে শুনিলেন গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে মহাপ্রভু শ্রীনিমাই একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন; সর্বদা তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মগ্নচিত্ত, কৃষ্ণ নাম ও মহিমা কীর্ত্তনে সদাই নিয়োজিত, দরবিগলিত ধারায় অশ্রু জলে চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলকে সিঞ্চিত করিতেছেন, ভক্তগণ বুঝিয়াছেন কলিযুগের মানবগণের উদ্ধারার্থ স্বয়ং কৃষ্ণই মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সংবাদও তিনি পাইয়াছেন যে তিনি (মহাপ্রভু) শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লাভ করিয়াছেন ও পরবর্ত্তীকালে পুরীতে বসবাসের সংবাদও পাইয়াছিলেন। ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রাক্কালে নিজ সেবায় রত শিষ্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে আদেশ করিয়া যান তাহারা যেন তাঁহার

অপ্রকটের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হয়। তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করেন নিজ গুরুভ্রাতাগণ হিসাবে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেবা গ্রহণের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, যেহেতু তাঁহারা গুরুভ্রাতা ও গুরুর সেবক ছিলেন, সুতরাং মান্য। কিন্তু যখন তাঁহাকে মনে করাইয়া দেওয়া হইল যে ইহা গুরুর আদেশ, তখন তিনি তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিতে স্বীকৃত হইলেন।

তাহার কিছুদিন পরে যখন তিনি বৃন্দাবন গমনের পথে বঙ্গদেশে গৌড় হইয়া যাইতেছিলেন সেই সময় অন্যান্য স্থান সহ শ্রীপুরীপাদের জন্মস্থান কুমারহট্টে গমন করেন, সেইখানে পবিত্র ক্ষেত্র হিসাবে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনি সে সময় অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া কেবল 'গুরু' নাম লইতে থাকেন। অতঃপর তিনি সেই স্থানের মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ লইয়া বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিলেন। এইভাবে মহাপ্রভু জনসাধারণকে শিক্ষা দিলেন যে, গুরুর জন্মস্থানকে কিভাবে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। মহাপ্রভুর এই দৃষ্টান্তে সেই হইতে তাঁহার প্রকৃত ও এমন কি মেকী অনুগামিগণের মধ্যেও এই কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অনুকরণে প্রত্যেকেই সেই স্থানের মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছেন, যাহার ফলে ক্রমশঃ এক ডোবা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে নাম হইয়াছে 'চৈতন্য ডোবা'। স্থানটি শ্রীবাসপণ্ডিতের বাসার অনুরূপ, এই পণ্ডিত মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর তিনিও এই স্থান হইতে সমগ্র পরিবার সহ সেখানে বসবাস করিতে থাকেন। চৈতন্য ডোবার দিকে মুখ করিয়া একটি মন্দির গৃহ নির্মিত হইয়াছে, যাহার নাম 'দেবালয়' ও শ্রীবাস পণ্ডিতের বাসস্থানরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। মানুষ সেইস্থানে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছে কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে মহাপ্রভু সেইস্থানের মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন যেহেতু স্থানটি নিজগুরু শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য

(শ্রীচৈতন্যের ভগবান রূপে পূর্ণপ্রকাশের পূর্বে)

যে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে 'সাধু' বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং নিজদিগকে পবিত্র করিতে যাঁহাদের ইতিবৃত্ত আমরা আলোচনা করিয়া থাকি, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভগবানের পার্ষদ ভক্তগণের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম হইতে সমসাময়িকভাবে অথবা পৃথকভাবে অবতরণ করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সাধুর জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি শুধু এক পার্ষদ ভক্তমাত্র নহেন, যদিও তিনি সেই প্রকার আচরণ করেন, তিনি কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের সাধু-প্রকৃতির গোস্বামিগণের মতানুসারে, মহাবিষ্ণুর অবতার। অভিন্ন বলদেব (অথবা সঙ্কর্ষণ বিষ্ণু) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু (যাঁহাকে আচার্য্য গোস্বামী বলা হয়) এই দুই জন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গ। এই দুই সমসাময়িক পার্ষদ-ভক্ত এবং পারিষদগণের মধ্যে অনেককে যথা, শ্রীবাস পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর ইত্যাদি গণকে ভগবান স্বয়ং অবতরণ করিবার পূর্বেই এজগতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ভগবান্ যখন অবতরণ করেন তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বয়স ৫২। শ্রীহট্ট হইতে তিনি নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথীর তীরে শান্তিপুরে আগমন করেন, নবদ্বীপেও তাঁহার একটি গৃহ ছিল যেখানে তিনি টোল চালাইতেন, কারণ সেই স্থানটিকে এক বিশ্ববিদ্যালয় সহর ভারতের অক্সফোর্ড বলা হইত। কোন কোন জীবনীকার বলেন তিনি শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিবরণ কম নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়, পরন্তু শ্রীহট্টে জন্ম অধিকতর গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। শান্তিপুরে তাঁহার মাতা-পিতাগণ স্বপ্নে দেখেন যে এক দিব্যপুরুষ অন্য এক জনকে অনুরোধ করিতেছেন কলিযুগের জনগণের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে এবং তিনি নিজে পরবর্ত্তী সময় অবতীর্ণ হইবেন। অতঃপর তাঁহার পিতা-মাতা কুবের পণ্ডিত ও নাগদেবী নিজ আবাসস্থল শ্রীহট্টে নবগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং সেইখানেই শ্রীঅদ্বৈত জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বে তাঁহার নাম ছিল শ্রীকমলাক্ষ বেদ-পঞ্চানন।

একটি বিবরণ হইতে দেখা যায় যে যৌবনে বিভিন্ন পুণ্যস্থান ভ্রমণ ব্যাপদেশে তাঁহার সহিত মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার হয়, সে সময়ে তিনি খুব বৃদ্ধ, অকস্মাৎ খুব সুললিত স্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণনা মূলক এক কবিতা

আবৃত্তিকালে তাঁহার প্রতি (অদ্বৈত) আকৃষ্ট হন। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে উভয়ে উভয়কে গুণকীর্ত্তনে (গুণের যথোচিত বিচারে) অভিনন্দিত করেন। পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবস্থানকালে যে সমস্ত মহাজনগণের রচিত কৃষ্ণলীলার আবৃত্তি ও গুণকীর্ত্তন হইত তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি একজন। তীর্থযাত্রাকালে শ্রীঅদ্বৈত মথুরার কাছাকাছি ব্রজধামে উপস্থিত হইয়া বেশ কিছুদিন ধরিয়া বৃন্দাবনের এক বটবৃক্ষের পার্শ্বে বাস করেন, সেই স্থানটি অদ্বৈত বট নামাঙ্কিত করা হইয়াছে ও যথার্থ দর্শনকারীকে পবিত্র করিতে ও দুর্লভ গোপীপ্রেম দান করিবার শক্তিসম্পন্ন। তীর্থভ্রমণকালে শ্রীব্রজধামে আগমনের পূর্বে তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন, যাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গয়ায় দীক্ষাদান করেন এবং যাঁহাকে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণের হর্ষোৎফুল্ল প্রেমের মূল উৎস' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। তখন হইতে শ্রীঅদ্বৈত কৃষ্ণভক্তির একনিষ্ঠ প্রচারক হন। তৎপূর্বে তিনি ছিলেন জ্ঞানবাদের শিক্ষক, ঠিক যেমন গয়ায় দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে মহাপ্রভু ছিলেন ব্যাকরণ, ছন্দ, ন্যায় ইত্যাদির পণ্ডিত ও অজেয় পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, শ্রীঅদ্বৈত অধিকাংশ সময় শ্রীবাসপণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, গঙ্গাদাস প্রভৃতি স্থানীয় বৈষ্ণবগণের নেতৃস্থানীয় হইয়া কাটাইতে থাকেন। স্থানটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং পণ্ডিতগণে পূর্ণ হইলেও প্রায় সকলেই ভগবৎ-ভক্তির প্রতি বিরূপ ছিলেন, কৃষ্ণ ও রামের উপাসক কমই ছিল। তাহারা ধর্ম বলিতে পার্থিব ধন সম্পদের প্রত্যাশী হইয়া কর্মযোগকেই প্রাধান্য দিত এবং সেই জন্য কৃষ্ণেতর দেবদেবীকে পূজা করিত। এই ব্যাপারে পণ্ডিতগণও কিছু কম যাইতেন না। এমন কি গীতা ও শ্রীভগবানের শিক্ষক হইয়াও যেগুলি ভক্তিবাদে পূর্ণ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহারা ভক্তির ব্যাখ্যায় এক শব্দও ব্যয় করিতেন না। শ্রীঅদ্বৈতের নেতৃত্বাধীন বৈষ্ণবগণ দেশের মধ্যে নাস্তিক্য লক্ষ্য করিয়া মনে খুব দুঃখিত হইলেন, উপরন্তু তাঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য সুযোগের অভাব ছিল, নিজ নিজ বিদ্যার ও উচ্চ-বংশের অহঙ্কারে তাঁহারা স্ফীত থাকিতেন। এমন কি যাহারা সাধুর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইত তাহারাও ভগবান্, হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম ও উচ্চারণ করিত না। আমোদ-প্রমোদের জন্য সর্বত্র সারা বৎসর ব্যাপী নৃত্য, বাদ্য উচ্চঃস্বরে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত ইত্যাদি চলিত; কিন্তু কোথাও কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইত না—যাহা হইতে প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়।

শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় মানুষের এ-হেন প্রকৃত মঙ্গলের (শাস্ত্রানুসারে এই কলিযুগে, যে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের তাহার) প্রতি উদাসীনতা দর্শনে মানবীয় করুণায় পূর্ণ হইল। জন সাধারণকে হরি নাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মুখ করিবার জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যদি হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে ঐ জীবগুলি উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ভগবানকে আবির্ভূত হইবার আহ্বান জানাইয়া তিনি তুলসী ও গঙ্গাজল দ্বারা বিশেষ পূজা করিতে লাগিলেন এবং প্রায়ই এ জন্য উপবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণবগণকে একত্রিত করিয়া মিলিত ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নাস্তিক লোকগণ উচ্চঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, তাহাতে অদ্বৈত অগ্রাহ্যভাব দেখাইয়া ও ভক্তগণের ভগ্নহৃদয়ে সাহস জোগাইয়া আশ্বস্ত করিলেন যে তাঁহাদের প্রার্থনা ভগবান্ অবশ্যই শুনিবেন ও তিনি তাঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ (চৈতন্য) মহাপ্রভুর অবতরণের বহু পূর্বে হরিদাস প্রভু (যিনি শ্রীব্রহ্মার অবতার বলিয়া কথিত) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শান্তিপুরের বাসস্থানের নিকট গঙ্গাতীরবর্ত্তী ফুলিয়ায় বাস করিতে আসিলেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে এক গুহাবৎ কুটীর নির্মাণ করিয়া দিলেন ও দৈনিক তাঁহার নিষ্ঠাভক্তি মূলা গীতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং নিজগৃহ হইতে প্রসাদ দেওয়াইতেন। হরিদাস মহান্ একজন ভক্ত হইলেও যবনকুলে জন্মের জন্য ইহাতে আপত্তি উঠাইলেন যে ইহার ফলে ভগবানের নিজজন তাঁহাদের মত উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণগণের অসন্তোষ উৎপন্ন হইতে পারে। অদ্বৈত খুব সাহস দেখাইয়া বলিলেন যে শাস্ত্রে যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে তিনি সেই মতই করিবেন তাহাতে যতই অসুবিধা আসুক না কেন এবং জানাইলেন যে তাঁহাকে ভোজন করান এক কোটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার মত সুকৃতিদায়ক। এমনকি ভগবানকে নিবেদিত বার্ষিক শ্রাদ্ধের প্রথম শ্রাদ্ধপাত্রও তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। সেখানে তাঁহারা আলোচনা করিতেন কি করিয়া লোককে নাস্তিক্যের অন্ধকার হইতে উদ্ধার করা যায়। অদ্বৈত শান্তিপুরে ও শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে গঙ্গাজল ও তুলসী দ্বারা ভগবানের বিশেষ পূজা করিতে লাগিলেন এবং হরিদাস নিজকুটীরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন যাহাতে ভগবান্ জন্ম পরিগ্রহ করেন। কথিত

হয় যে অদ্বৈত ও হরিদাসের এই মিলিত প্রার্থনাই ভগবানকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে অবতরণ করাইবার জন্য দায়ী।

একদা শচীদেবী গৌরাঙ্গকে ছয় মাস যাবৎ গর্ভে ধারণ করিয়া আছেন এমন সময়ে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া স্তোত্র উচ্চারণ ও প্রণাম করিতে করিতে তাঁহাকে (শচীকে) পরিক্রমা করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইলেন যে যথাসময়ে তাঁহারা তাহা জানিতে পারিবেন। অতঃপর এক সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিলে সে সময় শান্তিপুরে অবস্থান কালে ঠাকুর হরিদাসকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ জানিতে পারিল না, কেন। চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বাভাসরূপে বহু দানাদি করিলেন। হরিদাস অদ্বৈতের মন বুঝিয়া লইয়া প্রকৃত ঘটনা অনুমান করিয়া লইলেন। তাঁহারা উভয়েই এই ব্যাপারে নীরব থাকিলেন ও জানিতে দিলেন না যে ভগবান্ তাহাদের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যতদিন পর্য্যন্ত না উপযুক্ত সময় হয়। শ্রীঅদ্বৈত নিজ পত্নী সীতাদেবীকে এক শিবিকা আরোহণে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে মায়াপুরে প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে মূল্যবান্ বস্ত্র, অলঙ্কার, শুভ মুহূর্ত্তের উপযুক্ত দ্রব্যাদি এক পেটিকায় করিয়া প্রেরণ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া শিশুর অতিমানবীয় রূপ দর্শনে অতীব আশ্চর্য্য হইলেন, তিনি ধান্য, দূর্বা, প্রভৃতি মস্তকে দিয়া অপদেবতাদির হাত হইতে রক্ষার জন্য তাঁহার নাম করিলেন 'নিমাই'। নবদ্বীপ মায়াপুরের ভক্তগণ নিশ্চিত হইতে পারিলেন না যে এই নিমাই যে স্বয়ং ভগবান্। যদিও নিমাই তাঁহার শৈশবে অনেক অতিমানবিক ঘটনা সমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা-পিতা শিশুর অমঙ্গলের ভয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেন নাই। বয়স বৃদ্ধির সহিত তিনি অকালেই অতি উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিলেন এবং ভক্তগণ ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন যে তিনি যেন ভক্তে পরিণত হন। শ্রীঅদ্বৈতও নিমাইকে না জানার ভাণ করিয়া তাহাদের সহিত একই প্রকার এমনকি আরও অধিক পরিমাণ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম পূজার্থে গয়ায় গমন করিবার পর, সেখানে হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে চরম ভক্তির লক্ষণ সমূহের প্রকাশ

পাওয়া যায়, তাঁহার ভক্তগণ অতীব আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন।

এইবার শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইয়ের প্রকৃত চরিত্র ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে সুযোগ পাইলেন। একদিন তিনি ভক্তগণকে জানাইলেন যে "পূর্বরাত্রে তিনি উপবাস করিয়াছিলেন, কারণ গীতার একটি শ্লোক বুঝিতে অক্ষম হইয়া খুব দুঃখিত অন্তর হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে কেহ জানাইলেন, "হে আচার্য্য, উঠ ও আহার গ্রহণ কর। শ্লোকের অর্থ এই। শুধু আমাকে পূজা কর। সকলকে দুঃখ দিও না। তুমি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলে তাহা সফল হইয়াছে। যে প্রভুর জন্য তুমি এত উপবাস করিয়াছিলে, বহু পূজা করিয়াছ এবং কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ ও ক্রন্দন করিয়াছিলে ও যাঁহাকে আনয়নের জন্য তুমি হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তিনি নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন। সমগ্র দেশময় কৃষ্ণকীর্ত্তন হইবে এবং তোমার কৃপায় মানুষ ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তির প্রকাশ দেখিতে পাইবে। চক্ষু উন্মোচিত করিয়া দেখিলাম বিশ্বম্ভর (শ্রীগৌরাঙ্গ বা নিমাই এর জন্মগত নাম) তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি কৃষ্ণের রহস্য উন্মোচিত করিতে পারি নাই ও জানিতে পারি নাই কিভাবে ও কখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যাহাই হউক, আমাদের একান্তভাবে ইচ্ছা যে তিনি কৃষ্ণের একান্ত অনুরক্ত হউন।" ভক্তগণ অদ্বৈতের প্রতি অবনত হইলেন ও সানন্দে উচ্চকণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার ঘনিষ্ঠ পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলেন, তিনি কি করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য। অদ্বৈত যখন নিজগৃহ দেবতার পূজার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন উচ্চঃস্বরে 'হরি' 'হরি' কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তখন গৌরাঙ্গ তাঁহার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। অদ্বৈত তখন সুযোগ বুঝিয়া গৃহদেবতার পূজার সামগ্রী লইয়া তাহা দ্বারা প্রভুর চরণদ্বয় পূজা করিলেন ও করজোড়ে গোবিন্দের স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন। তাহাতে গদাধর নিজ জিহ্বা দংশন করিয়া, তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন না করিয়া আপত্তি জানাইয়া বলিলেন যে অদ্বৈতের ন্যায় এক বৃদ্ধের পক্ষে বালকমাত্র গৌরাঙ্গের চরণ পূজা করা ঠিক হয় নাই। উত্তরে অদ্বৈত সহাস্য বলিলেন, 'গদাধর, কিছুদিন পরে এই বালককে চিনিবে।' গদাধর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও নিজ মনে চিন্তা করিলেন গৌরাঙ্গ স্বয়ং সেই

ভগবান্ কি না যাঁহার জন্য অদ্বৈত আরাধনা করিয়াছিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রভু অদ্বৈতের নিকট করজোড়ে সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন যেহেতু তিনি ভগবানের প্রিয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রতি সৌজন্য দেখাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন যে ভক্তগণ তাঁহাকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নেতারূপে পাইলে আনন্দিত হইবেন। সেই অনুরোধ স্বীকৃত হইল।

তাঁহার স্বীকৃতিকে দ্বিগুণভাবে নিশ্চিত করিতে ও শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বা বিষয়ে তাঁহার পূর্বাভাসের সারবত্ত্বা যাচাই করিবার জন্য শ্রীঅদ্বৈত চিন্তা করিলেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিবেন এবং যদি গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণের অবতার হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে নিজচরণে টানিয়া লইবেন। সেইজন্য তিনি নবদ্বীপ মায়াপুর ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে নিজ গৃহে রহিলেন। যাঁহার আহ্বানে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করিয়াছেন সেই অদ্বৈতের মন বুঝা খুব কঠিন।

তাহার পর একদিবস শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীবাসের গৃহে দ্রুতপদে গমন করিয়া তাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরের দ্বারে পদাঘাত করিয়া চিৎকার পূর্ব্বক অশ্রদ্ধান্বিত কণ্ঠে বলিলেন, 'ওহে শ্রীবাস তুমি কাহাকে পূজা করিতেছ? এই দেখ আমি তোমার আরাধ্য বিগ্রহ।' শ্রীবাস দেখিলেন তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবস্থিত। মহাপ্রভু উদ্ধত ভাবে আরও বলিলেন, "এ যাবৎ তুমি আমার প্রকাশ বিষয়ে জানিতে পার নাই। তোমাদের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের ফলে ও ভক্তগণের উৎপীড়নের জন্য অদ্বৈতের ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিৎকার কারণে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছি। আমাকে না জানিয়া তোমরা নিরুদ্বেগে আছো।" শ্রীবাস স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার গৃহের সকলে তাঁহার দর্শনে ও করুণায় ধন্য হইলেন।

অন্য এক ঘটনাক্রমে, ব্যাসপূজা দিবসে নিজ পার্ষদ ভক্তগণের মধ্যে মোহাবিষ্ট অবস্থায় প্রভু উচ্চস্বরে বার বার 'নারা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা 'নারা' বলিয়া কাহাকে বুঝাইতেছেন, তাহাতে তিনি বলিলেন যে ঐ নামে তিনি অদ্বৈতকে ডাকিতেছেন, যাঁহার উদ্ধত চীৎকারে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ করিতে হইয়াছে এবং প্রভু আরও অভিযোগ করিলেন যে তাঁহাকে নামাইয়া আনিয়া অদ্বৈত নিশ্চিন্ত চিত্তে হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছে।

(শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পর)

এক দিবস শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে যাইয়া নিজ আত্ম প্রকাশের সংবাদ দিতে বলিলেন, আর বলিয়া দিলেন যে প্রভু স্বয়ং ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য আসিয়াছেন, যাঁহার জন্য অদ্বৈত বহু পূজা করিয়াছে, বহু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, বহু উপবাস পালন করিয়াছে; প্রভু রামাইকে আরও বলিয়া দিলেন শ্রীনিত্যানন্দের আগমন সংবাদ জানাইতে ও পূজার উপকরণাদি সহ সত্বর চলিয়া আসিতে। রামাই অদ্বৈতের গৃহে পৌঁছিলে আনন্দের আতিশয্যে কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারেন নাই, অদ্বৈত, ভক্তিযোগের মাধ্যমে ইতঃপূর্বেই যাঁহাকে জানিতে পারিয়াছেন, রামাইকে বলিলেন যে মনে হইতেছে তাঁহাকে লইয়া যাইতে মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রেরিত বার্ত্তা রামাই সবিস্তারে তাঁহাকে জানাইলেন এবং অদ্বৈতকে সত্বর তাঁহার সহিত যাইতে বলিলেন, তখন তিনি (অদ্বৈত) আনন্দের আতিশয্যে দুইবাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং "আমি প্রভুকে নামাইয়া আনিয়াছি, তিনি আমারই কারণে অবতরণ করিয়াছেন" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। "আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে যদি তিনি আমার মস্তকের উপর তাঁহার চরণ উঠাইয়া দেন। আমি নিজেকে লুকাইয়া রাখিব, আমার প্রভুকেই আমায় বাহির করিতে হবে।" তাহার মনের ইচ্ছা বুঝিয়া প্রভু অন্যান্য ভক্তগণকে ডাকাইলেন ও শ্রীবাস অঙ্গনে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন নারা তাঁহার ভগবত্ত্বার আরও প্রমাণ চাহে। এই ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দ ভগবান মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত ভক্তগণ বিগ্রহগণকে নিবেদনযোগ্য অন্যান্য সেবা প্রদান করিতে লাগিলেন। রামাই ফিরিয়া আসিতেই প্রভু তাঁহাকে অদ্বৈত যেখানে নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন সেই নন্দন আচার্য্যের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অদ্বৈত আনন্দে অভিভূত হইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন এবং দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ পতিত হইয়া স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত তাঁহার সম্মুখে প্রভুকে চারিদিকে দিব্য জ্যোতিতে বেষ্টিত দেখিলেন, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত বিবিধ প্রকার উজ্জ্বল অলঙ্কারে সজ্জিত (তাঁহাকে ধ্যানের জন্য যেমন যেমন উল্লেখিত আছে) চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, ষড়্মুখ বিশিষ্ট দেবগণ দ্বারা প্রার্থনারত, সহস্রফণা দ্বারা অনন্ত কর্ত্তৃক চন্দ্রাতপ আবৃত, আকাশে অসংখ্য দেবদেবী পরিবেষ্টিত ও চারিদিকে (আকাশে)

মুনিগণ ও বিভিন্ন স্বর্গীয় বস্তু পরিবৃত। অদ্বৈত বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইলেন। গম্ভীর স্বরে প্রভু অদ্বৈতকে বলিলেন তাহারই আহ্বানে তিনি ক্ষীর সমুদ্রে বিশ্রামরত অবস্থা হইতে আসিয়াছেন। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া অদ্বৈত দু বাহু উত্তোলন করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। অনুমতি পাইয়া অতঃপর তিনি বিভিন্ন দ্রব্যে, ভগবানের চরণ পূজা করিতে লাগিলেন ও পুনরায় তাঁহার চরণে পতিত হইলেন, তখন প্রভু, রামাইয়ের নিকট প্রকাশিত নিজ বাসনা অনুসারে তাঁহার মস্তকে চরণ স্থাপন করিলেন তখন চারিদিকে ভক্তগণের 'জয়' 'জয়' ধ্বনি উঠিতে লাগিল। প্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে নৃত্য করিতে লাগিলে তাঁহারা তাঁহার বিভিন্ন ভাবভঙ্গীসহ এই পরিণত বয়সে নৃত্য দর্শনে অতীব আহ্লাদিত হইলেন। প্রভু তখন নিজ গলা হইতে একটি মাল্য লইয়া অদ্বৈতের গলায় পরাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অদ্বৈত বলেন তিনি এই মুহূর্ত্তেরই অপেক্ষায় ছিলেন ও জানাইয়া দিলেন তাঁহার নিজের জন্য চাহিবার কিছু নাই; পরন্তু তাঁহার ইচ্ছা ভক্তি যেন নীচ শ্রেণীর লোকদের মাঝে বিতরিত হয়, কারণ মানুষ নিজেদের বিদ্যাবত্তা, ধনসম্পদ, উচ্চ-বংশ, বৈরাগ্য ইত্যাদির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভক্তগণকে ভক্তি প্রচারে বাধা প্রদান করিয়াছে। প্রভু উদ্ধত কণ্ঠে তাহাই অনুমোদন করিলেন। সেই সময় হইতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপ মায়াপুরেই অবস্থান করিতেন। শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তন সভায় প্রত্যহ যোগদান করিতেন, যখন প্রভু নিজেকে একজন ভক্ত বলিয়াই আচরণে দেখাইতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি নিজ ভগবত্ত্বা প্রকাশ করিতেন।

অন্য এক সময় তিনি সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া নিজ ভগবত্ত্বা ঘোষণা করেন এবং সকলের নিকট হইতে পূজার নিবেদনরূপে ভোজ্যাদি অর্পণ করিতে বলেন। সকল ভক্তই তখন সত্ত্বর ভোজ্যদ্রব্যাদি আহরণ করিয়া নিবেদন করিলে ভগবান্ তাহা নিমেষের মধ্যে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কর্পূর সহ তাম্বুল নিবেদন করিলে তাহাও শেষ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি বার বার 'নারা' 'নারা' উচ্চারণ করিলে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকের উপর ছত্র মেলিয়া ধরিলেন এবং অদ্বৈত সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, যেহেতু তাঁহারই কারণে এই অবতারীত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অতঃপর পুনরায় বাহ্যদশা

প্রাপ্ত হইয়া তিনি এক এক ভক্তের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া 'কৃষ্ণে'র জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একবার প্রভু 'মহাপ্রকাশ' সময়ে নিজেকে পূর্ণরূপে প্রকাশিত করেন এবং একাদিক্রমে সাত প্রহর (অর্থাৎ একুশ ঘন্টা) ধরিয়া ঐ (মহাপ্রকাশ) অবস্থায় থাকেন। তিনি প্রত্যেক ভক্তকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহার পূর্ব ইতিহাস তাহাকে জানাইয়া দিয়া তাহার অতীব প্রার্থিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শ্রীঅদ্বৈত পূর্বের মতই উত্তরে জানাইলেন, ভগবানের আবির্ভাবে তিনি পূর্ণ, তাঁহার আর কোনও প্রার্থনা নাই। তখন প্রভু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, যখন গীতার কোন একটি শ্লোকে ভক্তি মূলা ব্যাখ্যা দিতে না পারিয়া উপবাস করিয়াছিলেন, সে সময় তিনিই স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া অসুবিধার সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন। যে সমস্ত ঘটনা নিজের মনের মধ্যে উদিত এবং একমাত্র নিজের জানিত ও কখনও অপরের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই, (তাহা প্রভুর মুখে শ্রবণ করিয়া) অদ্বৈত প্রেমাতিশয্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এই বলিয়া যে ভগবানকে নিজ প্রভুরূপে লাভ করার মধ্যেই তাঁহার মহত্ত্ব। তিনি বলিলেন, ''ইহাই আমার বর, হে প্রভু আপনি অশিক্ষিত, অবহেলিত ও পতিত জনের প্রতি কৃপাপরবশ হউন।'' ভগবান্ এইভাবে নিজেকে প্রকাশিত করায় শ্রীঅদ্বৈত স্বস্তি বোধ করিলেন, আরও তুষ্ট হইলেন যে তিনি তাঁহাকে নিজ ভৃত্য গণনা করিবেন। কিন্তু অন্য সময়ে নিজ দৈন্যপ্রকাশ করিয়া নিজেকে ভক্তমধ্যে একজন বলিয়া গণ্য করিতেন, সে সময় অদ্বৈতকে গুরু (পারমার্থিক ভাবে জ্যেষ্ঠ) হিসাবে মনে করিতেন। তাহাতে অদ্বৈত অতীব মনক্ষুণ্ণ হইতেন; প্রভু সে সময় তাঁহার পদতলে পতিত হইতেন, এবং প্রভুর পদস্পর্শ করিতে গেলে বাধা প্রদান করিতেন। একদা মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনকালে মূর্চ্ছাগত হইলে অদ্বৈত সেই সুযোগে নিজদেহে তাঁহার চরণ ধূলিতে সিঞ্চিত করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাহাদের পূজা করিয়াছিলেন, বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ও অদ্বৈত কি করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভু মানসিক উদ্বেগে দৌঁড়াইয়া গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। তখন মহাপ্রভু অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যখন শুনিলেন যে অদ্বৈত দুঃখান্তকরণ হইয়া সেই হইতে উপবাস করিতেছেন, তখন তিনি অদ্বৈতকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে তিনি চরম বিষাদগ্রস্ত দৈহিকভাবে দুর্বল হইয়া

মূর্চ্ছাগত-প্রায় হইয়া আছেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্র অদ্বৈত উত্থিত হইলেন ও নিজ আচরণ লঘু করিলেন।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর জন্য মানসিকভাবে বিষাদগ্রস্ত ভাবাপন্ন হইলেন, যদিও স্বয়ং মহাপ্রভু মূর্চ্ছাগ্রস্ত অবস্থায় না থাকাকালীন কোনও ভক্তকে নিজ চরণস্পর্শ করিতে দিতেন না, এবং যেহেতু মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে বয়োজ্যেষ্ঠরূপে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন ও প্রণামও করিতেন। তিনি প্রভুর রোষ জন্মাইবার জন্য এক পরিকল্পনা করিলেন যাহাতে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হয় যেহেতু অ-ভক্তি তাঁহাকে যার-পর-নাই কোপান্বিত করে, তাই তিনি যোগবাশিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞানকে ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। কোন এক ছলে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া নিজ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া সর্বজ্ঞ প্রভু শান্তিপুর যাত্রা করিলেন, সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দকে লইলেন। প্রভুর সেই স্থানে আগমন অনুমান করিয়া, অদ্বৈত অধিক উৎসাহের সহিত জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন। সে সময়, যেমন অদ্বৈত নিজে সংকল্প করিয়াছিলেন, প্রভু সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই কার্য্য করিতে দেখিয়া কিলাইতে লাগিলেন ও বলিলেন "কেন তুমি আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে নামাইয়া আনিলে যখন ভক্তিকে লঘু করিয়া এখন জ্ঞানবাদ প্রচার করিবে?" এই শাস্তি লাভ করিয়া অদ্বৈত অতীব প্রীত হইলেন ও তাঁহার জয় হইয়াছে বুঝিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া মস্তক চরণে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব, সে যে-কেহ হউক না কেন, যদি সে আমার প্রতি অপরাধও করে, কিন্তু তোমাকে আশ্রয় করে।" প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বলিলেন, "হে প্রভু, যে আপনাকে অস্বীকার করে, সে আপনার কাছে কেহ নহে।"

ভক্তির মাধ্যমে ভগবানে প্রকৃত প্রেম বিবর্ধনের ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশের জন্য এক অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন, যাহা 'বৈষ্ণবাপরাধ' (ভক্তের চরণে অপরাধ) ভক্তির পথে এক প্রবল বাধাস্বরূপ। সংশ্লিষ্ট জনগণ অন্য কেহ নহেন, নিজমাতা শচীদেবী ও শ্রীঅদ্বৈতের ব্যতীত। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ ভক্তিযোগের প্রতি অতি নিবিড়ভাবে আবিষ্ট।

তিনি দৈনিক শ্রীঅদ্বৈত ভবনে ভক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি আলোচনায় সারা দিবস অতিবাহিত করিতেন। যখন মহাপ্রভু এক বালকমাত্র সে সময় তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। এখন মহাপ্রভু বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই অদ্বৈতের সঙ্গে শ্রীবাসাঙ্গনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, কিন্তু গৃহকার্য্যে উদাসীন। শচীদেবী মনে করিলেন যে অদ্বৈতের প্রভাবেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্ন্যাসী হইয়াছে এবং এখন তাঁহার আশঙ্কা হইল যে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন নিমাইও বোধ হয় দাদার পথ অবলম্বন করিবে। মনে মনে তিনি বলিলেন, "কে তাঁহাকে অদ্বৈত বলে? তিনি অতীব দ্বৈত অর্থাৎ দ্বিচারিতাপূর্ণ, এক নিরাশ্রয় বিধবা আমার প্রতি নির্দয়।" এইটুকু মাত্র তাঁহার অপরাধ অদ্বৈতের প্রতি, যাহা কেহই জানিত না, কিন্তু ইহা তাঁহার সর্বজ্ঞ পুত্রের কাছে গোপন ছিল না।' মাঝে মাঝে যেমন করিয়া থাকেন সেইমত প্রভু বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুকে অনুরোধ করেন নিজ মাতাকে ভগবৎ প্রেম প্রদান করিতে, যেহেতু এযাবৎ তিনি বঞ্চিত আছেন। প্রভু বলিলেন, তাহা সম্ভব নহে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি অদ্বৈত চরণে অপরাধ হইতে নিজেকে মুক্ত করেন। প্রত্যেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এমন একজন ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী রমণী কাহারও কাছে, তা' সে যে কেহই হউক না কেন, অপরাধী হইতে পারেন। মাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে বলায় তিনি বলিলেন ইহা তাঁহার এক্তিয়ারভুক্ত নহে, ইহা একমাত্র অদ্বৈত ক্ষমা করিতে পারেন। যাঁহার চরণে তিনি অপরাধী, ঠিক যেমন দুর্বাসার অপরাধ স্বয়ং বিষ্ণু ক্ষমা করিতে পারেন নাই, কিন্তু যাঁহার চরণে অপরাধ সেই অম্বরীষ ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন। অদ্বৈতকে জানান হইলে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন, যে মাতার নিকট তিনি পুত্রতুল্য ও এমনই পুণ্যবতী যে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে মাতারূপে বাছিয়া লইয়াছেন, তিনি কিভাবে তাঁহার কাছে অপরাধী হইতে পারেন। এইভাবে বলিতে বলিতে অদ্বৈত মূর্চ্ছাগত হইলেন এবং সেই সুযোগে শচীদেবী তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি (শচীদেবী) ভগবৎ-প্রেমে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন প্রভু বলিলেন আর তিনি অপরাধী নহেন ও বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়াছেন তখন চারিদিক হইতে ভক্তগণ উল্লসিত হইলেন। এইভাবে মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব ও তাহা হইতে নিস্তার লাভের একমাত্র উপায় যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ তাঁহা দ্বারা স্খালন, তাঁহার (সেই বৈষ্ণবের) অজ্ঞাতসারে হইলেও।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দীক্ষা-বিষয়ে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বে মাধবেন্দ্রপুরী সমগ্র দেশে পরিভ্রমণ ব্যাপদেশে শ্রীঅদ্বৈতের আবাসে উপস্থিত হন, (অদ্বৈত) বুঝিতে পারিলেন তিনিই (পুরীপাদই) একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি যাঁহার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করা যাইতে পারে, এইভাবে তিনি তাঁহাকে গুরুপদ্মে বরণ করিলেন।

(শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর)

যে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী যিনি শাসন জারী করিয়াছিলেন যে কেহই নবদ্বীপ-মায়াপুর সহরে উচ্চকণ্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারিবে না তাঁহারই গৃহের দিকে যখন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব এক বিশাল সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেছিলেন সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত সেই বিশাল শোভা যাত্রার এক অংশকে নৃত্যসহ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন পরিচালনা করেন। কাজী এক বন্ধুতে পরিণত হন ও হরির নামও উচ্চারণ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি অথবা তাঁহার সম্পর্কিত কেহ বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তনে, গৃহমধ্যে হউক বা প্রকাশ্য রাজপথে হউক, বাধা প্রদান বা বিরক্ত করিতে পারিবে না।

একদিন শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত অন্তরে শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য করিতে করিতে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন ও দুঃখপ্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছিলেন যে সর্ব্বোচ্চ পরম সুখ লাভের আশা তাঁহার এখনও পূর্ণ হইল না। বহু ভক্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পরম উল্লাসে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। দুইপ্রহর (ছয় ঘন্টা) অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন তিনি থামিলেন না অন্য ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে শান্ত করেন। তথাপি তাঁহার মনঃকষ্ট প্রায়ই তাঁহাকে নাড়া দিত; যখন মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন যে শ্রীঅদ্বৈত মনোদুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ার জন্য বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণু পূজার গৃহে গমন করিয়া তিনি কি চাহেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর তিনি জানাইলেন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে যাহা দেখান হইয়াছিল তাহা তিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন। নিমেষের মধ্যে সমগ্র দৃশ্যটি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল সেখানে কৃষ্ণবর্ণ নীলাভ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপে দণ্ডায়মান। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি কৃষ্ণের দেহের মধ্যে দেখিলেন সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নৈসর্গিক বস্তুসকল প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু সকল যাহা সমুদ্র,

পর্বত, নদী ইত্যাদি এবং ভগবানের লক্ষ লক্ষ মুখমণ্ডল, বাহু, চক্ষুসকল ইত্যাদি, আরও দেখিলেন স্তোত্রাদি পাঠরত অবস্থায় অর্জুনকে। অদ্বৈত দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বার বার ভগবানের সেবকত্ব প্রার্থনা করিলেন।

তাহার কিছুদিন পর একদিবস প্রাতে মহাপ্রভু কাটোয়ায় যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং দূর হইতে তাঁহাকে অনুসরণরত ও ঘটনার দর্শনকারী নিজ ভক্ত মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে নবদ্বীপ-মায়াপুরে তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য সকলকে সান্ত্বনা-প্রদান করিতে পাঠাইলেন। সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈতের ক্রন্দন অতি হৃদয় বিদারক, তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন, যেন প্রাণহীন। ইহাতে এক আকাশ-বাণীতে তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তগণকে বলিলেন দুঃখে নিমজ্জিত না হইতে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইবেন। বঙ্গের ভিতর দিয়া বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে মায়াপুরে প্রেরণ করিলেন ভক্তগণকে লইয়া অদ্বৈতের বাসস্থান শান্তিপুরে যাইতে, হরিদাস ঠাকুরের ফুলিয়া হইয়া তিনি শান্তিপুরে আসিবেন। সংবাদটি অগ্নির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল; যাহারা পূর্বে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়াছিল এমন কি যাহারা তাঁহার নিন্দা-অপবাদ করিত তাহারা সমেত সমস্ত লোকজন ফুলিয়ার দিকে গমন করিল যাহার ফলে কল্পনাতীত জনসমাগম হইল, তাহারা সকলেই আকাশভেদী হরিনামে আকাশ বাতাস মুখরিত করিল। মহাপ্রভু সেখানে তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। অতঃপর তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে গমন করিলেন, অদ্বৈত তাঁহার চরণতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া সাগ্রহে স্বাগত জানাইলেন ও হস্তদ্বয় দ্বারা চরণযুগল জড়াইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইলেন। অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ ধূলিধূসরিত ও নগ্ন অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলে তিনি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন, প্রভু তাহাকে ভ্রাতা বলিলেন। প্রত্যেককে বিস্মিত নগ্নবালক অচ্যুত বলিল ঃ "শাস্ত্র মতে আপনি সকলের পিতা"। এই সময় নাগাদ শ্রীমায়াপুরের ভক্তগণকে লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া পড়িলেন। দশ দিবস তাঁহাদের সহিত সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে কাটাইয়া মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতের পরিচালনাধীন ভক্তগণকে উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচল (পুরী) রওনা হইলেন।

দক্ষিণ ভারতে অনেক বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য অবৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরিত করিয়া মহাপ্রভু সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া উত্তরভারত যাত্রা করিলেন। কয়েকজন ভক্ত সঙ্গে যাত্রাকালে তিনি শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরের বিপরীতে কুলিয়া অতিক্রম করিলেন সেখানে অসংখ্য জনগণ তাঁহার দর্শনে পবিত্র হইলেন। সেখান হইতে গৌড়ের রাজধানীর নিকট রামকেলিতে গমন করিয়া একান্ত অনুরক্ত ভক্তযুগল শ্রীরূপ ও সনাতনের সহিত এই প্রথমবার মিলিত হইলেন। সেখানে হইতে তিনি আর অগ্রবর্ত্তী না হইয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইত্যবসরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহ এক কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিল। এক সজ্জন সন্ন্যাসী অদ্বৈতের গৃহে আগমন করিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীকেশব ভারতীর সম্বন্ধ কি? বারংবার প্রশ্ন করায় শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে ভাবিলেন যেহেতু এই সম্বন্ধের দুইটি দিক আছে এবং যেহেতু যদিও ভগবানের কোন মাতা-পিতা নাই, তথাপি সাধারণভাবে তাঁহাকে দেবকীর পুত্র বলিয়া লোকে জানে এবং যদিও তাঁহার গুরু কেহ হইতে পারে না (যেমন সন্দীপনী মুনির ক্ষেত্রে), সুতরাং পারমার্থিক দিকটি বিচার না করিয়া সাধারণভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। তখন তিনি বলিলেন যে, শ্রীকেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু। এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় বালক অচ্যুত যে মাত্র শুনিলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক জন গুরু আছে, তখন সে প্রবল ক্রোধান্বিত হইয়া পিতা অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিল এই প্রকার ঈশ্বর নিন্দাসূচক বাক্য তিনি জিহ্বায় উচ্চারণ করিলেন কি করিয়া। শ্রীচৈতন্য সকল দেবগণের অধীশ্বর ভগবান্, ব্রহ্মারও সৃষ্টিকারক, তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহার গুরু থাকিতে পারে। সেই নগ্নপুত্রের সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত লজ্জিত হইলেন ও তাহার নিকট নিজ উক্তির জন্য ক্ষমা চাহিলেন। সেই সন্ন্যাসী তখন অচ্যুতের পদতলে পতিত হইলেন ও বলিলেন "যেমন পিতা, তেমন পুত্র।" পিতা ও পুত্র উভয়ের প্রতি পুনরায় নত হইয়া তিনি এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন যে এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিতে তিনি এক শুভক্ষণে আগমন করিয়াছিলেন। অদ্বৈত পুত্রের সহিত হাতে হাত দিয়া নৃত্য করিলেন ও ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তিনি অতীব ভাগ্যবান্ যে শ্রীচৈতন্যের এমন একজন পার্ষদ ভক্ত তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্গীগণ সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখনই শ্রীঅদ্বৈত তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন এবং বার বার তাঁহার নাম,

হরি, হরি বলিয়া উচ্চরব করিতে লাগিলেন। নারীগণও স্বল্পবাক্যে নিজ নিজ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ও প্রেমপূর্ণ অশ্রু জলে সিক্ত করিলেন। অদ্বৈতও বিগলিত অশ্রুধারায় রোদন করিতে লাগিলেন ও তাঁহার বাহ্য জ্ঞান রহিল না। ভক্তগণও তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া অদ্বৈত মহাপ্রভুকে সুখাসনে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর তিনি (অদ্বৈত) ও নিত্যানন্দ খুব উদ্যমী হইয়া পরস্পরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার প্রতি অবনত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর অচ্যুত প্রভুর চরণে প্রণতঃ হইলে তিনি তাহাকে কোলে উঠাইয়া প্রেমাশ্রু দ্বারা দেহে ধূলি ধৌত করিয়া দিলেন। বালকটি প্রত্যেক ভক্তের প্রিয়পাত্র ছিল।

মহাপ্রভু সেখানে কিছুদিন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। অদ্বৈত শচীমাতাকে আনিতে পাঠাইলেন। সেই সংবাদ তাঁহার প্রায় অচৈতন্য দেহে প্রাণের সঞ্চার করিল ও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য প্রেরিত আচ্ছাদিত শিবিকায় আরোহণ করিলেন। নবদ্বীপ মায়াপুরের ভক্তগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিবামাত্র মহাপ্রভু স্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ পতিত হইলেন। তিনি (মাতা)ও খুবই আনন্দিত হইলেন, তাহাতে হরিদাসসহ ভক্তগণের খুব আনন্দ হইল। তিনি রন্ধনের ভার গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় বহু প্রকার ব্যাঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন, মহাপ্রভু তাহাতে খুব পরিতৃপ্ত হইলেন ও মহাপ্রভু ভক্তগণকেও পরিবেশন করাইলেন। এক বিশাল জনতা বিরাট মহোৎসব সহ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিল, সেখানে অদ্বৈতের স্থানে কয়েকদিন ধরিয়া সেই উৎসব চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহ জানিতে পারিল না কে তাহাদের ভোগের এই সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করিল।

এই সময় রঘুনাথ দাস নামে এক নবযৌবন বালক আসিল তাহার প্রার্থনা মহাপ্রভু যেন নীলাচলে এক সেবকরূপে অঙ্গীকার করেন। তাহার পিতা শ্রীঅদ্বৈতকে বহুপ্রকার উপহারাদি প্রদান করার সূত্রে পরিচিত থাকায় তিনি (অদ্বৈত) তাহাকে মহাপ্রভুর সহিত পরিচয় করাইয়াদেন, মহাপ্রভু নিজে মথুরা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত কিছুদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। শচীমাতাকে অনেক সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ও তাঁহার অনুমতি ও বিদায় লইয়া কৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শনের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে ভক্তগণকে প্রতিবৎসর রথযাত্রার

সময় আসিতে আমন্ত্রণ জানাইয়া বিদায় দিলেন। তিনি অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করিলেন ও এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে এক বৎসরের মধ্যে নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আশা রাখেন।

যথাসময়ে রথযাত্রা উৎসবের পূর্বে অদ্বৈত বঙ্গদেশের ভক্তগণকে লইয়া শচীমাতার অনুমতিক্রমে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আগাম কটকে পাঠাইয়া দিলেন। পুরীতে মহাপ্রভু ভক্তগণকে জানাইলেন যে অদ্বৈতের আহ্বানেই তিনি নবদ্বীপ-মায়াপুরে অবতরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা তাঁহার প্রতি অতীব ভক্তিযুক্ত হইলেন। মহাপ্রভু যখন জানিতে পারিলেন যে অদ্বৈত আঠার নালার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তখন তিনি পুরীর ভক্তগণ-সহ আগাম নরেন্দ্র সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন আচার্য্যকে অভ্যর্থনা জানাইতে। উভয় দল পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হইলে পরস্পরকে প্রণাম জানাইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বারম্বার সাষ্টাঙ্গ পতিত হইলেন; মহাপ্রভুও তাঁহাকে প্রতি- প্রণাম জানাইলেন। নিকটবর্ত্তী হইলে মহাপ্রভু অদ্বৈতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, অদ্বৈত স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণতঃ হইলেন এবং পরম আনন্দে চিৎকার করিয়া জানাইতে লাগিলেন 'আমি তাঁহাকে আনিয়াছি, আমি তাঁহাকে আনিয়াছি।' তখন উচ্চঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, শুধু ভক্তগণ দ্বারা নহে উপরন্তু পথিপার্শ্বস্থ জনগণও সামিল হইয়াছিলেন। যাঁহার জন্য শ্রীচৈতন্যের অবতার সেই অদ্বৈতকে সকলে প্রণাম জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর জগন্নাথের প্রসাদী সহস্র সহস্র মালা ও চন্দন আসিল। মহাপ্রভু সর্ব প্রথম অদ্বৈতকে মাল্যভূষিত করিলেন।

বঙ্গদেশের ভক্তগণকে বাসস্থান দেওয়া হইলে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইলেন তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য; তখন তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজকে ধন্যবোধ করিবেন। মহাপ্রভুর রীতি ছিল যে তিনি নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলে সঙ্গে তিনি সন্ন্যাসী সঙ্গীগণকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন; কিন্তু অদ্বৈতের মনের ইচ্ছা অন্যরূপ, পাছে তাঁহার দ্বারা পাচিত বিভিন্ন অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সর্বসমক্ষে তাঁহাকে ভোজন করাইতে না পারেন। তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। অদ্বৈতের বাসনা পূর্ণ হইল, তখন প্রভু সন্ন্যাসীগণের ও পূর্বে উপস্থিত

হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ স্থান হইতে যাত্রার পূর্বে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় বহুক্ষণ আটক পড়িয়া গেলেন। অদ্বৈতের ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় তিনি বৃষ্টি দেবতা ইন্দ্রের প্রশংসা করিলেন। কারণ তিনি যথাসময়ে ঝড়বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, অসময়ে এই ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া শ্রীঅদ্বৈতেরই সৃষ্টি।

একদিবস শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম ও মহিমাব্যঞ্জক সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। যদিও তাঁহারা ভয় পাইতেছিলেন পাছে প্রভু ক্ষুব্ধ হন ও তাঁহাদের উপর রাগান্বিত হন, তথাপি নিজ প্রবর্ত্তিত গীতের দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া খুব উদ্যমের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন তিনি তাঁহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া শয়ন করিয়া আছেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়িয়া তাঁহার বিষয়ে কীর্ত্তনের জন্য তিরস্কার করিলেন। তাহার উত্তরে বলা হইয়াছিল সূর্য্যকে যেমন হস্ত দ্বারা কেহ ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না, তেমনি যদিও তিনি ভক্তবৎ নিজ জীবন যাত্রা চালাইয়া গেলেও তাঁহার ভগবত্ত্বা পৃথিবীর লোকের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা যাইবে না। এইভাবে অদ্বৈতই ভক্তগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম ও মহিমা ব্যঞ্জক কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন, অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া। তিনি ছিলেন পারমার্থিক নির্ভীকতার মূর্ত্ত প্রতীক, যাহা আমরা বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য

শ্রীগৌরগণোদ্দেশমতে শ্রীচন্দ্রশেখর নবনিধি অন্যতম বা চন্দ্র। ইনি প্রভুর ভক্ত মোসো মশাই। ইঁহারই গৃহে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেবীভাবে গীতাভিনয় ও নৃত্য কাচ হইয়া ছিল। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই অধুনা 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ এবং এই স্থানেই বিশ্ববিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার পরিপোষক আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের সুবৃহৎ অভিনব অষ্টকোণ-মন্দির বিরাজমান,—উহাতে চারি সৎ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের অর্চাবিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভুর ভাবি সন্ন্যাস অভিনয়ের কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখে পূর্বেই জানিয়াছিলেন। (মঃ ২৬ অঃ) এবং সন্ন্যাসকালে শ্রীনিত্যানন্দ ও মুকুন্দের সঙ্গে কাটোয়ায় উপস্থিত থাকিয়া প্রভুর সন্ন্যাসলীলাভিনয়োচিত কার্য্যাদি যথাশাস্ত্র সম্পাদনপূর্বক নবদ্বীপে আসিয়া সকলকেই প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর অবতরণের পূর্বে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের নবদ্বীপে আবির্ভাব হইয়াছিল, যথা—

নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বে সব জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায়।।
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান্‌, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৯৮-৯৯)

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে—'ইনি মহাপ্রভুর মেসোমহাশয় অর্থাৎ শচীদেবীর ভগিনী শ্রীমতী সর্বজয়া দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।' শ্রীল গদাধর গোস্বামীর শিষ্য শ্রীযদুনাথ দাস-কৃত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের আবির্ভাব স্থান শ্রীহট্ট—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব—ত্রৈলোক্য পূজিত।।

ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার।।"

চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৩৪-৩৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী সর্বদা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তত্ত্বাবধানসেবা কার্য্য করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে শচীমাতার গৃহের দেখাশুনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যে অর্পিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিলে যে সময়ে ভক্তগণসহ কীর্ত্তন বিলাসে প্রমত্ত হইয়াছিলেন সে কালে প্রতিরাত্রে শ্রীবাস মন্দিরে এবং কখনও বা চন্দ্রশেখর ভবনে কীর্ত্তন হইত।

সর্ব্ব বৈষ্ণবের হইল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস।।
শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন।।

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১১০-১১১

জগাই-মাধাই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণকুলের প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ-পূর্বক দস্যুবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের পুনর্জীবন লাভ হইল। দস্যুদ্বয়ের সকল অপরাধ ক্ষমাপনপূর্বক তাঁহাদিগকে কীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার দিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আত্মীয় জ্ঞানে নিজজন গণনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভবনে লইয়া গেলেন। প্রভুর নিজ অন্তরঙ্গ জনগণ এবং আত্মসাৎকৃত দস্যুদ্বয় প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্যের প্রবেশ নিবারণ জন্য দ্বারবন্ধ হইয়াছিল। প্রভুর নিজের যে সকল পার্ষদগণ এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্যসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য।

'বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানের চৈতন্যের সব কার্য্য।।'

—চৈঃ ভা মঃ ১৩।২৪০

চন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, যথা—মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণের নিকট ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শ্রীসদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে লীলাভিনয়ের জন্য পার্ষদগণ কে কি বেশ-ধারণ করিবেন তাহা বলিয়া দিলেন। তদনুসারে কার্য্য সম্পাদন করায় প্রভু বুদ্ধিমন্ত খানের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় তাঁহারাই এই লীলা দেখিতে পাইবেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, তাঁহারা অজিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা নৃত্য দর্শনে অনধিকারী। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সকলেই মহাযোগেশ্বরত্ব লাভ করিবেন, কাহারও মোহ হইবে না। মহাপ্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যদর্শন করিবার ইচ্ছায় শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া এবং সকল বৈষ্ণবগণ পরিবারবর্গকে লইয়া অভিনয় দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাবিদূষকের বেশে, হরিদাস ঠাকুর কোটালবেশে, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ সাজে সজ্জিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর কোটালবেশে দণ্ড ঘুরাইয়া নৃত্যদর্শনে সকলকে সাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের বেশে বলিতে লাগিলেন, —তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্খায় বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, সেখানে গৃহদ্বার জনশূন্য দেখিতে পাইলেন, পরে 'কৃষ্ণ' নদীয়ায় আগমন করিয়াছেন শুনিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন এবং প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যলীলাভিনয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীবাসের অপূর্ব্বভাব দেখিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। নারীগণ কৃষ্ণনাম শুনাইয়া শচীমাতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। পরবর্ত্তী লীলাতে বিশ্বম্ভর রুক্মিণীর বেশ ধারণ করিলেন। রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু নিজেকে 'বিদর্ভসুতা'-জ্ঞানে কৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্র বিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে লিখিত থাকিলেন। সেই লীলা দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন।

দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ব্রজ বণিতার সাজে সজ্জিত হইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে রমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আদ্যাশক্তি ও

শ্রীনিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর (রাধারাণীর দিদিমার) বেশ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় মহাপ্রভুকে ভক্তগণের মধ্যে নিজ নিজ ভাবানুরূপ কেহ কমলা, কেহ লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়া রূপে দর্শন করিলেন। যাঁহারা আজন্ম মহাপ্রভুকে দেখিয়াছেন, তাঁহারাও চিনিতে পারিলেন না, এমনকি শচীমাতাও চিনিতে পারিলেন না। লীলাভিনয়ের ছলে মহাপ্রভু তাঁহার সকল শক্তি প্রকট করিলেন এবং সকল শক্তিকেই যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শনের শক্তি দিলেন। মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তি বেশে নৃত্য দর্শন করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন, ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আরও একটি অলৌকিক লীলা করিলেন, তিনি গোপীনাথ বিগ্রহকে ক্রোড়ে করিয়া মহালক্ষ্মীভাবে খট্টায় বসিলেন। ভক্তগণ তদ্দর্শনে স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হওয়ায় মহানন্দ মরলীলা দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া সকলেই বিষাদগ্রস্ত হইলেন। ভক্তগণের অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত অবস্থা দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বাৎসল্যবশতঃ জগজ্জননীভাবে সকলকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য পান করাইলেন। ভক্তগণের সকল দুঃখ দূর হইল।

মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে সাতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অদ্ভূত জ্যোতিঃ বিদ্যমান ছিল। লোকে চোখ খুলিয়া সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারিত না। বৈষ্ণবগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কিছু না বলিয়া হাস্য করিতেন।

চাঁদকাজী উদ্ধার লীলায় মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে লইয়া নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন, সেই সময়েও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন, এইভাবে মহাপ্রভু গোকুলের গূঢ় সম্পদ নাম সংকীর্ত্তন বিশ্বের সর্বত্র বিতরণ করিবার আয়োজন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর উন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চাতুর্য্যক্রমে শান্তিপুরে গঙ্গাতটে আনীত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ বার্তা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শান্তিপুর ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে জানাইয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশক্রমে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শচীমাতাকে নবদ্বীপ হইতে দোলায় চড়াইয়া অদ্বৈত ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে নবদ্বীপের ভক্তগণও আসিয়াছিলেন।

"প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াঞা।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৩৭)

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিলে সেই প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ নিত্যানন্দ প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসকে (যাঁহাকে মহাপ্রভু দক্ষিণভারতে ভট্টথারি স্ত্রীগণ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন) দিয়া গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সময় চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত কালাকৃষ্ণদাসের মিলন হইয়াছিল। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরুষোত্তম ধামে যাইতেন ও থাকিতেন। শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন লীলায়, নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি-লীলায় প্রভৃতি বহু লীলাতেই তিনি সঙ্গী হইয়াছিলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় (৫৩ শ্লোক) গঙ্গাদাস সম্বন্ধে বলা হয়---যিনি পুরাকালে রঘুনাথের (শ্রীরামচন্দ্রের) গুরু বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন, তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহ এই 'গঙ্গা-দাস'। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে নবদ্বীপে গুপ্তভাবে আবির্ভূত করানো হইয়াছিল যাঁহাদিগকে (যথা শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড় প্রভৃতি) তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাসও একজন। প্রভুর গৃহের অতি নিকটে গঙ্গানগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ইঁহারা সকলে মহাপ্রভুর অবতরণ প্রতীক্ষায় ছিলেন। চৈতন্যভাগবত আঃ ৮।২৬ অনুসারে কৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনিই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অধ্যাপক---শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত।

গঙ্গাদাস সমীপে মহাপ্রভুর অধ্যয়ন লীলা

শুভ দিনে শুভ লগ্নে শ্রীগৌরসুন্দরের উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ লীলা ও জীবোদ্ধারার্থ ব্রাহ্মণলীলা আবিষ্কার করিলেন। নবদ্বীপের 'অধ্যাপক শিরোমণি' অভিন্ন সান্দীপনি মুনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। শিষ্যরূপী নিমাইকে নিজ সান্নিধ্যে পুত্রপ্রায় দেখিতে লাগিলেন! গঙ্গাদাস-কৃত অর্থ একবার শ্রবণ করিয়াই অলৌকিক মেধা-বলে নিমাই অনুধাবন করেন। নিমাইয়ের অলৌকিক মেধা দর্শনে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ দেখিতে পাইয়া গঙ্গাদাস বড়ই আনন্দিত হইলেন। নিমাই প্রতিদিন উষাকালে সন্ধ্যাহ্নিক বন্দনাদি সমাপন করিয়া সমস্ত শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় আসিয়া বসিতেন এবং তাহাদের পক্ষ-প্রতিপক্ষ করিতেন অর্থাৎ অনুকূল প্রতিকূল প্রশ্নোত্তর করিতেন।

সরস্বতীপতি শ্রীগৌরচন্দ্র অধ্যয়ন-রসে প্রমত্ত থাকিয়া সমস্ত ছাত্রের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। একমাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে এমন কোন পণ্ডিত ছিলেন না,—যিনি নিমাই পণ্ডিতের ব্যাখ্যা সম্যক বুঝিতে পারিতেন। একমাত্র স্বীয় অধ্যাপকের সহিত প্রভু গ্রন্থ আলোচনা করিতেন।

গয়া দর্শনান্তে প্রভুর গঙ্গাদাসের গৃহে আগমন

মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অপূর্ব প্রেমবিকার প্রকটন করিতে লাগিলেন ও বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাদাসের গৃহে গমন করিলেন। পণ্ডিত

তাঁহাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রভু গুরুর বন্দনা করিলে পণ্ডিতও সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গুরু বলিলেন, 'তোমার জীবন ধন্য হইল, তুমি পিতৃকুল, মাতৃকুল মোচন করিলে। এদিকে তোমার পড়ুয়াগণ তুমি যাওয়া অবধি কেহ আর পুঁথি মেলে না। কাল হইতে তাহাদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিবে।' প্রভু শিষ্যগণ-বেষ্টিত হইয়া মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিলেন। কিন্তু এখন হইতে প্রভু সর্ব শব্দ ও বাক্যাদির কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিলে ছাত্রগণ তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিত সমীপে যাইয়া বলিলেন, 'গয়া হইতে ফিরিয়া আসা অবধি সকল শব্দেই কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করেন; আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কি করিব বলুন।' বৈকালে প্রভু গঙ্গাদাস সমীপে আসিয়া বসিলে শিক্ষা গুরুদেব বলিলেন, 'বাপ বিশ্বম্ভর, ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন কার্য্য বহুভাগ্যে হয়। তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র এই উভয় কুলেতে কেহ মূর্খ নাই। তুমিও পরম যোগ্য ব্যক্তি। তুমি এবার হইতে তাহাদিগকে ভাল করিয়া পড়াও।' প্রভু বলিলেন, 'আপনার চরণ প্রসাদে নবদ্বীপে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। আমি নগরে বসাইয়া পড়াইব, দেখি কার শক্তি আছে আমার দোষ দেয়।'

যে দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস মন্দিরে মহাপ্রকাশ লীলায় সাত প্রহর অবস্থান করেন ও প্রত্যেক ভক্তবৃন্দের পূর্ব বৃত্তান্ত সমূহ বর্ণনা করিতেছিলেন সেই সময় এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—'তোমার কি মনে আছে, একবার রাজভয়ে সর্বপরিবার সহ রাত্রিতে পলায়ন করিবার সময় খেয়াঘাটে আসিয়াছিলে, কিন্তু তখন কোনও নৌকা না পাইয়া সঙ্কটে পড়িয়াছিলে? রাত্রি শেষ হইয়া গেলেও কোন নৌকা না পাইয়া পরিবারপরিজনকে যবনে স্পর্শ করিবে এই ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলে ও গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে মনস্থ করিতেছিলে, এমন সময় আমি নৌকা লইয়া উপস্থিত হইয়া পার করিয়া দিয়াছিলাম।' তাহা শুনিয়া গঙ্গাদাস আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রসঙ্গে দেখা যায়— (১) নিত্যানন্দ হরিদাস যখন প্রথমদিকে পলাইয়া আসিয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাহাদের বিষয় নিবেদন করেন, সে-সময় শ্রীনিবাস ও গঙ্গাদাস তাহাদের পরিচয় জানাইয়াছিলেন, (২) উদ্ধার করিয়া লইয়া আসার পর যখন প্রভু নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও আত্মসাৎ-কৃতদস্যুদ্বয়কে লইয়া কীর্ত্তনে অধিকার দান করিয়া রুদ্ধদ্বারে

উপবেশন করেন সে সময়ও অন্যান্যগণের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, এবং (৩) মহাপ্রভু যখন নিজ ভক্তগণসহ জগাই-মাধাইকে লইয়া গঙ্গা-স্নানার্থ গমন ও বিবিধ জলক্রীড়া করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও শ্রীগঙ্গাদাস একজন।

এতদ্ ব্যতীত গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে প্রভুর বিভিন্ন লীলা প্রসঙ্গে তাঁহার পরিকর-রূপে দৃষ্ট হয়, যথা—মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর গৃহে অভিনয়কালে সঙ্গী ব্রহ্মানন্দ-সহ কথোপকথনে, কাজীদলন দিবসে প্রভুসহ নগর সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী হিসাবে, শ্রীধর-গৃহে প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য দর্শনে প্রেমক্রন্দনকালে, প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণে খেদ-প্রকাশে, সন্ন্যাস লীলান্তে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনাগত মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য তাঁহা কর্ত্তৃক শচীমাতাকে লইয়া শান্তিপুর যাত্রাকালে, রথযাত্রা দর্শনের জন্য নীলাচলে যাত্রায় ও সেখানে নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া সময়ে। রথযাত্রাকালে নৃত্য-কীর্ত্তনকারিগণের দ্বিতীয় দলে মূলগায়ক শ্রীবাস সহ দোহার মধ্যে ছিলেন— ১। গঙ্গাদাস, ২। বড় (?) হরিদাস, ৩। শ্রীমান ৪। শুভানন্দ, ৫। শ্রীরাম; নর্ত্তক—শ্রীনিত্যানন্দ। মোট সাতটি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে প্রভু কখনও একমূর্ত্তি, কখনও বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং নাচিয়া, গাহিয়া এবং ভক্তগণকে নাচাইয়া আনন্দ-আস্বাদন করিতে এতই মত্ত ছিলেন যে, নিজ স্বরূপ বিষয়ে লক্ষ্য করিবার আদৌ অবকাশ পান নাই।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৫৪ সংখ্যায়) তাঁহাকে (শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে) বৃষভাণু রাজা বলিয়াছেন। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গুরু। ইঁহার পত্নীর নাম রত্নাবতী; পিতার নাম—'বাণেশ্বর' (মতান্তরে 'শুক্লাম্বর') ও মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। নিবাস চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানার অন্তর্গত 'মেঘল' গ্রাম। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কৃষ্ণের অতীব প্রিয়ভক্ত ছিলেন।

যখন মহাপ্রভু নবদ্বীপ নগরে স্বীয় বৈকুণ্ঠলীলার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অভাব বোধ করিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৌরসুন্দরের মুখে 'পুণ্ডরীক' শব্দ শ্রবণে ভক্তগণ উহা 'কৃষ্ণ'-বাচক বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন, যেহেতু তৎকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন পরিচয়বোধ ছিল না। প্রভুকে সকলে মিলিয়া জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বলিলেন, "তোমাদের তাঁহার আখ্যান শুনিবার আগ্রহ হইয়াছে, সেহেতু তোমরা সকলে ভাগ্যবান্। তাঁহার চরিত্র অতি অদ্ভুত, নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র হয়; মূঢ় জনকে বঞ্চনার জন্য, বাহ্যবেশ দর্শন করিয়া যাহারা ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহাদের জন্য প্রচ্ছন্ন গৌরাবতারে বিদ্যানিধি আপনাকে বিষয়ীর সজ্জায় সজ্জিত রাখিতেন। পণ্ডিত বলিয়া বিদ্যার্থিগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। ধর্মপ্রাণ জনগণ তাঁহাকে পরম ধার্মিক জ্ঞানে তাঁহার নিকটে ধর্মশিক্ষা করিতেন। তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা তৎপর হইয়া স্বেদ-অশ্রু-কম্প-পুলক বেষ্টিত দেহে অবস্থান করিতেন। পদস্পর্শভয়ে গঙ্গায় স্নান করিতেন না, নিশাকালে জন সাধারণের অলক্ষ্যে গঙ্গা-দর্শন করিতেন—যেহেতু জনসাধারণকে গঙ্গাজলে কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার ইত্যাদি করিতে দেখিয়া ব্যথিত হইতেন। দেবার্চন করিবার পূর্বে গঙ্গাজল পান করিতেন। ভগবৎ পূজার সুষ্ঠু বিধি-শিক্ষণ-কল্পে তাঁহার আচরণ অনেকের অনুসরণীয়। পুণ্ডরীকের নিবাস চট্টগ্রামে হইলেও শ্রীমায়াপুরে তাঁহার একটি গঙ্গাবাস বাটী ছিল; তৎকালে গৌড়পুর নবদ্বীপ নগরে গৌড়দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী আগমন করিয়া স্ব-স্ব চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন। ভগবদাকর্ষণে পুণ্ডরীক তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপের বাড়ীতে অনেকের অজ্ঞাতসারে

আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভে অসমর্থ হইয়া অনেকেই তাঁহাকে 'ভোগী', 'বিষয়ী' বলিয়া ভ্রান্ত হইতেন।

বৈষ্ণবগণ কেহই পুণ্ডরীকের বিষয় তখন পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। কেবল মাত্র চট্টগ্রাম-নিবাসী বৈদ্য উপাধ্যায় মুকুন্দ দত্ত তাঁহার কথা জানিতেন। তিনি ব্যতীত বাসুদেব দত্তও জানিতেন।

গদাধর পণ্ডিতের দর্শন

পণ্ডিত গদাধর এই মুকুন্দ দত্তের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে মুকুন্দ জানাইলেন, 'আজ তোমাকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইব। যদি আমি তোমাকে এক লোকাতীত বৈষ্ণব মহাপুরুষের সঙ্গ করাইতে পারি, তাহা হইলে বিনিময় স্বরূপ আমাকে তোমার 'ভৃত্য' বলিয়া স্মরণ করিও—ইহাই আমার পুরস্কার।'

গদাধর অতি হৃষ্টচিত্তে সেইক্ষণেই দেখিতে চলিলেন। গদাধর যাইয়া নমস্কার করায় পুণ্ডরীক গদাধরকে সম্মান করিয়া আসনে বসাইয়া মুকুন্দের নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন, 'ইঁহার নাম শ্রীগদাধর; শিশুকাল হইতেই সংসারে বিরক্ত। ব্যবহারিক জগতে ইনি মাধব মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র, আবাল্য বৈরাগ্য ধর্মে অবস্থিত; কিন্তু ইনি সকল বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন। আপনার নাম শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।' বিদ্যানিধি খুব খুশী হইলেন।

গদাধর দেখিতে লাগিলেন পুণ্ডরীক মহাশয় রাজপুত্রের মত বসিয়া আছেন। সুন্দর উন্নত শয্যা, রেশমী বস্ত্র, বালিশ, দিব্য চন্দ্রাতপ, পাঁচ-সাতটি ছোট বড় ঝারি, দিব্য পিতলের বাটায় পান, পান-চর্বণরত, দুইদিকে দুইজন ময়ূরের পাখা হস্তে ব্যজনরত, কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক, সুগন্ধি আবিরের লাল ফোঁটা, অপূর্ব কেশ ভারের সংস্কার, মদন সমান দেহ, সম্মুখে এক বিচিত্র দোলা, তার মধ্যে শয্যা-সব মিলিয়া বিষয়ীর মত ব্যবহার। ইহাতে গদাধরের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈষ্ণবতায় সন্দেহ হইল।

মুকুন্দ তাঁহার চিত্ত-বৈক্লব্য অনুমান করিয়া বিদ্যানিধিকে প্রকাশ করিবার মানসে ভক্তি মহিমা বর্ণনা সূচক শ্লোক গাহিতে লাগিলেন,—"রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দয়া। ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া। তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে। না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে।।"

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।

(ভাঃ ৩।২।২৩)

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্ গতিম্।।

(ভাঃ ১০।৬।৩৫)

ভক্তিযোগের বর্ণনা শ্রবণমাত্র বিদ্যানিধি আনন্দে আপ্লুত হইলেন এবং তাঁহাতে অকৃত্রিম অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সমূহ দৃষ্ট হইল। তাহাতে গদাধর বিস্মিত হইলেন। তিনি এইরূপ মহাভাগবতকে সাধারণ বিলাসীপুরুষ সাম্যে বিচার করায় তাঁহার বৈষ্ণব অপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন।

গদাধর মুকুন্দের নিকট আত্মভাব জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 'মুকুন্দ, তুমি আমার পরম বন্ধুর কার্য্য করিলে; তুমি নিকটে ছিলে বলিয়া আমি আজ সঙ্কট এড়াইতে পরিলাম; বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে চিনিতে আমার ভুল হইয়াছিল। তুমিই আমার চিত্ত বুঝিয়া তাঁহাকে প্রকাশ করিলে। আমি তাঁহাকে যত অবজ্ঞা করিয়াছি, আমি উঁহার শিষ্য হইলে ক্ষমা পাইব।' মুকুন্দ তাহাতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া দুই প্রহর পরে বিদ্যানিধি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে মুকুন্দ তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া পূর্বে গদাধরের কিছু চিত্ত দোষ ঘটিয়াছিল, সেইজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তোমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিতে চায়।' তাহাতে বিদ্যানিধি অতীব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবান্ আমাকে এক মহারত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন, এমন শিষ্য বহু জন্মে পাওয়া যায়। আগামী শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে সর্ব শুভ লগ্নে গদাধরের দীক্ষা হইবে।'

বৈষ্ণবগণ চিরদিনই নির্বিষয়ী। যে সকল ভাগ্যহীন সত্যদর্শনে বিমুখ, তাহারাই বাহিরের পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণব গুরুতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার সদস্যগণ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সেবকগণ ভক্তিসূচক পদবী দ্বারা ভক্তের যে সম্মান নির্দ্দেশ করেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অভক্তগণ যে ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয় এবং ভক্তাভক্তের পর্য্যায়ভেদ-নিরূপণে অজ্ঞতা

প্রকাশ করেন, তাহাকে অকিঞ্চিৎকর দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরলীলায় পুণ্ডরীক ও গদাধরের এই লীলা প্রদর্শন।

পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষালাভের সম্মতি পাইয়া গদাধর মুকুন্দসহ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বিদ্যানিধির আগমন সংবাদ দিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু খুবই হর্ষ প্রকাশ করিলেন। বিদ্যানিধি গোপনে মহাপ্রভু সমীপে আসিয়া তাঁহাকে দর্শনমাত্র মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। চৈতন্য লাভ করিয়া বিদ্যানিধি হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া বৈষ্ণবগণও অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বিদ্যানিধিকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলে বিদ্যানিধি তাঁহাকে স্ববক্ষে এমন ভাবে চাপিয়া ধরিলেন যে, উভয়ের মূর্ত্তিদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না,—যেন এক হইয়া গেলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—'প্রেমনিধি'কে সাক্ষাৎ নয়নে দেখিয়া আমার আজ সুপ্রভাত ও মহামঙ্গল সাধিত হইল।

গদাধর মহাপ্রভুর নিকট জানাইলেন যে তিনি পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের মনস্থ করিয়াছেন। তাহাতে মহাপ্রভু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন, —"শীঘ্র কর, শীঘ্র কর।" অতঃপর গদাধরের দীক্ষা হইল এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দুই প্রিয়কলেবর পুণ্ডরীক ও গদাধর—যোগ্য গুরু-শিষ্য হইলেন।

মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস সঙ্গী

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন প্রতিরাত্রে শ্রীবাস মন্দিরে নৃত্য-কীর্ত্তনে নিজ পার্ষদ ভক্তগণকে লইয়া রত থাকিতেন সে-সময় অন্যান্যগণের মধ্যে শ্রীবিদ্যানিধিও উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার মহাপ্রকাশের দিনে 'সাত-প্রহরিয়া-ভাবে' অবস্থানের সময় তাঁহার পার্ষদবর্গকে অমায়ায় সকলের প্রতি কৃপাবর্ষণ করিয়াছিলেন—তখন বিদ্যানিধিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু নিজগৃহে রুদ্ধদ্বারে তাঁহাদিগকে লইয়া কীর্ত্তন বিলাসকালেও বিদ্যানিধি তথায় ছিলেন। অতঃপর গঙ্গায় প্রভু সকলকে লইয়া জল ক্রীড়া করেন। রথযাত্রাকালে পুরীতে গমন করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি-কালে শ্রীবিদ্যানিধি ও তাঁহার প্রিয়সখা শ্রীস্বরূপ দামোদরের মধ্যে জলযুদ্ধ হয়।

গদাধরের পুনঃ দীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গ

ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার জন্য যে শব্দব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই 'মন্ত্র'। অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে সেই মন্ত্র উপদেশ করিলে উপদেশকের চিত্তে মলিনতা

প্রবেশ করে। সঙ্গদোষে দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইলে পুনরায় দিব্যজ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক—ইহা জানিয়া গদাধর শ্রীগৌর সুন্দরের নিকট তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু পূর্বগুরুর নিকট পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিবার বিচার বলিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নীলাচলে আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন। দিন দশের মধ্যেই বিদ্যানিধি নীলাচলে আসিয়াছিলেন ও গদাধরকে পুনঃ মন্ত্র দীক্ষা দান করেন।

ওড়নষষ্ঠী যাত্রা

ওড়নষষ্ঠী দিনে জগন্নাথ নূতন মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিধান করেন। মণ্ডযুক্ত বস্ত্র অশুদ্ধ—ইহা স্মৃতির বিচার। ভগবানের সম্বন্ধে ইহা সিদ্ধ হইলেও ভগবদ্দাসগণের শুদ্ধাচারে থাকাই সঙ্গত। ব্রহ্ম সবিশেষ বস্তু, সেখানে গুণসমূহের বিচার নাই। শ্রীবিগ্রহ্ চিন্ময়—সেখানে না হয় ঐ বিচার হইল; কিন্তু সেবকগণ ত' বিধি-বাধ্য। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণের আচার—দোষযুক্ত ইহাই বিদ্যানিধি বিচার করিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পরমভক্ত হইলেও তাঁহার শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তগণের আচরণে দোষ-দর্শনাভিনয় হওয়ায় তাঁহার অভিনীত ভ্রান্তির নিরাস-কল্পে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা। মাড়ুয়া কাপড় ব্যবহারে বিদ্যানিধি যে দোষ কীর্ত্তন করিলেন, তৎফলে বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম আসিয়া দুই গালে প্রচুর চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। কানাই-বলাইকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বিদ্যানিধিকে বলিলেন—তাঁহাদিগকে ও সেবকগণকে মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করার যে দোষ দর্শন হইয়াছে, তাহাই অপরাধ। যদি তিনি ভক্তি আচরণ ও জাতীয় আচরণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে থাকিয়া ঐরূপ আচরণ করাই ভাল। এই সকল আপাতদর্শনে দোষ হয়।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নিজের শারীরিক ক্লেশ স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে শ্রীভগবানের শ্রীহস্তস্পর্শে তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। ভগবান তাঁহাকে শাসন করিয়াছেন—ইঁহাতেই তাঁহার পরমানন্দ; —ইহাই সেবকের প্রতি প্রভুর প্রকৃত দয়া।

ভগবান্ অভক্তের প্রতি সর্বদা পুরস্কার ও দণ্ডবিধান হইতে পৃথক্ থাকেন। তিনি ভক্তের শুভাকাঙ্খী হওয়ায় প্রিয়ভক্তকে স্বপ্নাদি ব্যাপার মধ্যে দণ্ডদ্বারা শোধন করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ প্রত্যুষে দামোদর স্বরূপ ও বিদ্যানিধি একসঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন। সেইদিন প্রভাত-শয্যা ত্যাগ না করিবার কারণ কি তাহা জানিতে চাহিলে বিদ্যানিধি স্বরূপকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া বিদ্যানিধির গাল ফুলার কি কারণ তাহা সবিস্তারে বলিলেন। বিদ্যানিধির প্রতি ভগবানের কৃপা দর্শনে দামোদর উল্লসিত হইলেন। স্বরূপ বলিলেন,—'এমন শাস্তি কখনও শুনি নাই,—যে সাক্ষাতে নিজে আসিয়া স্বপ্নেতে দণ্ডবিধান করেন।'

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র শ্রবণ করিলে তাঁহার কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটে।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামার স্বরূপ বলিয়া খ্যাত। ইনি শ্রীবাসাঙ্গনে ও চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসান্তে উড়িষ্যা গমনকালে দণ্ড বহিতেন ও ভিক্ষা করিতেন। প্রভু যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহ হইতে নীলাচল যাত্রা করেন, তখন নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ, গদাধর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত—এই চারি জনকে সঙ্গে লইলেন।

সার্বভৌমের শ্লোক প্রভুকে প্রদান

নীলাচলে আসিয়া শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকে উদ্ধারের পর যখন জগদানন্দ ও দামোদরকে লইয়া সার্বভৌম জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন, তখন তিনি প্রচুর পরিমাণ উত্তম উত্তম প্রসাদ আনাইয়া লোকজন সহ পাঠাইয়া দিলেন, সেই সময় ভট্টাচার্য্য নিজকৃত দুইটি শ্লোক জগদানন্দের হাতে দিয়া মহাপ্রভুকে দেওয়ার জন্য বলিয়া দিলেন। তাঁহারা দুইজন প্রসাদ ও পত্রী লইয়া প্রভু-স্থানে আসিলেন। মুকুন্দ দত্ত পত্র লইয়া বাহির ভিত্তে লিখিয়া রাখিয়া, তবে জগদানন্দ প্রভুকে পত্রীটি দিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত ভৃঙ্গঃ।।

—বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষাদিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপধারী একটী সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

কালে নিজ ভক্তিযোগকে বিনষ্ট প্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক্।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৪-৫৫)

শ্লোকগুলি পড়িয়া মহাপ্রভু পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; কিন্তু পূর্বে লিখিত ভিত্তে দেখিয়া ভক্তগণ কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। শ্লোক দুইটি ভক্ত কণ্ঠে মণিহার স্বরূপ হইয়া সার্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

দক্ষিণদেশে যাইবার প্রস্তাবে প্রেম-কোন্দল

বিশ্বরূপের অন্বেষণে যাইবার ছল করিয়া মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে একাকী যাইতে চাহিলে নিত্যানন্দ প্রভু ঘোর আপত্তি উঠাইলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন দু-একজন সঙ্গে চলুক, দক্ষিণের তীর্থ পথ তাঁহার (নিত্যানন্দের) ভাল জানা আছে। প্রভুর আজ্ঞা হইলে তাঁহারা সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, 'আমি নর্ত্তক আর তুমি সূত্রধার, যেমন নাচাও তেমনই নাচি। সন্ন্যাস করিয়া আমি বৃন্দাবন চলিলাম, তুমি আমায় অদ্বৈতভবনে লইয়া আসিলে; নীলাচলে আসিতে, পথে আমার দণ্ড ভগ্ন করিলে; জগদানন্দ চায় আমি বিষয় ভোগ করি, যাহা বলে আমাকে ভয়ে ভয়ে তাহাই করিতে হয়, অন্যথা করিলে ক্রোধে তিন দিন কথা বন্ধ করিয়া দেয়; মুকুন্দ আমার সন্ন্যাস-ধর্ম পালন দেখিলে দুঃখ পায়, কেননা আমাকে তিনবার স্নান ও ভূমিতে শয়ন করিতে হয়; দামোদর ব্রহ্মচারী আমাকে এরূপ শিক্ষাদণ্ড দেন, যাহাতে এরূপ মনে হয় যে, আমি ইঁহার সম্মুখে যেন একজন ব্যবহার জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, অতএব তোমরা সব নীলাচলে থাক আমি কয়েক দিন একলা ভ্রমণ করিব।' এইভাবে মহাপ্রভু দোষারোপ ছলে ভক্তগণের গুণ আস্বাদন করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত 'কৃষ্ণদাস' নামে এক সরল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে অঙ্গীকার করিলেন।

রথযাত্রার পূর্ব দিবসে গুণ্ডিচামন্দির মার্জনাদির পর সকলকে লইয়া মহাপ্রসাদ সেবনে বসিলে পরিবেশনকারীদের মধ্যে একজন শ্রীজগদানন্দ পরিবেশন করিতে করিতে মহাপ্রভুর পাতে ভাল ভাল দ্রব্য আচম্বিতে দিয়া দেন; প্রভু তাহাতে রুষ্ট হইলেও ছলে বলে দিতে থাকেন জগদানন্দ; কিন্তু না খাইলে জগদানন্দ উপবাস করিবে এই ভয়ে তাহা খাইতে থাকেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজ হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে নীলাচলে আসিবার কালে গায়ে কণ্ডুরসা হইয়াছিল, সনাতন শ্রীহরিদাসের বাসায় উঠিলেন। সেখানে আসিয়া মহাপ্রভু নিষেধ সত্ত্বেও বারবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন তাহাতে মহাপ্রভুর গায়ে কণ্ডুরসার ক্লেদ লাগিয়া যায়। সে জন্য সনাতন খুব দুঃখ বোধ করেন। জগদানন্দ পণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, জগদানন্দ তাঁহাকে রথযাত্রার পর নিজ প্রভুদত্ত স্থান বৃন্দাবনে যাইতে পরামর্শ দেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন। যাঁহার যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ

প্রদান কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দসদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না। এতদ্দ্বারা তিনি সনাতনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। অবশেষে তিনি আরও কহিলেন, 'তুমি শুদ্ধভক্ত, তোমার দেহের ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়, তোমরা আমার লাল্য, আমি লালক, অতএব তোমার ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই। আমি সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করা উচিত নয়।'

শ্রীরামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-শিষ্য বলিয়া মহাপ্রভু এবং পরমানন্দ পুরী ইঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন। তিনি নীলাচলে আসিয়া পড়ায় জগদানন্দ জগন্নাথের প্রসাদ আনাইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। অবশেষে অবশিষ্ট প্রসাদ রামচন্দ্রপুরী নিজে পরিবেশন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁর পাতে দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। অবশেষে 'চৈতন্যের ভক্তগণ বহুত খায়' বলিয়া তিনি নিন্দা করিতে লাগিলেন।

জগদানন্দের অভিমানাদি-প্রেমবিবর্ত্ত

এক বৎসর জগদানন্দ শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদী বস্ত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। নীলাচলে আসিবার কালে শিবানন্দের গৃহ হইতে 'চন্দনাদি' নামক সুগন্ধি তৈল এক কলসী তৈয়ার করিয়া আনিয়া মহাপ্রভুর মস্তকে দিবার জন্য গোবিন্দকে প্রার্থনা করেন। মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার না করায়, জগদানন্দ সেই তৈল সহিত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুই দিবস উপবাস করেন। তাঁহাকে শীতল করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, জগদানন্দ অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করিয়া মহাপ্রভুকে সেবা করাইয়া নিজে প্রসাদাদি লইলেন।

বৃন্দাবন যাত্রা

ভিতরের দুঃখ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া মথুরা যাইবার জন্য প্রভুর আজ্ঞা ভিক্ষা করিলেন। প্রভু তাহা অঙ্গীকার না করিলেও পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা মাগিতে লাগিলে, অবশেষে স্বরূপ গোসাঞিঃর সহায়তার আজ্ঞা মিলিল। মহাপ্রভু জগদানন্দকে পথ বিষয়ে ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন রাগমার্গীয় ভক্তসঙ্গ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং সর্বদা সনাতন সঙ্গে থাকিবার উপদেশ দিলেন। সনাতনকে প্রভুর আগমন সংবাদ জানাইতে ও ভজনস্থান নির্বাচন করিয়া রাখিতে আদেশ পাঠাইলেন। পণ্ডিত কাশী হইয়া মথুরায় গমন করিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন ও উভয়ে একত্র থাকিতেন, কিন্তু পৃথক অভ্যাস মত পৃথক খাদ্য গ্রহণ করিতেন—সনাতন মাধুকরী ভিক্ষা ও পণ্ডিত দেবালয়ে পাক করিয়া খাদ্য গ্রহণ

করিতেন। পণ্ডিত সনাতনের সহিত দ্বাদশ বন পরিক্রমা করিলেন। একদিন পণ্ডিতের নিমন্ত্রণক্রমে সনাতন আসিবার কালে তাঁহার মস্তকে এক রক্তবস্ত্র দেখিয়া উহা মুকুন্দ সরস্বতী নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসী-প্রদত্ত জানিতে পারিয়া সনাতনের প্রতি ক্রোধ ও প্রহার-চেষ্টা প্রকাশ করিলেন। তাহা দেখিয়া সনাতন সন্তুষ্ট হইলেন। দুইমাস অবস্থানের পর জগদানন্দ পুরী যাত্রা কালে সনাতন মহাপ্রভুর জন্য রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধন-শিলা, শুষ্ক পক্ক পীলুফল ও গুঞ্জামালা পাঠাইলেন।

মহাপ্রভু কলার সরলাতে শয়ন করেন এবং তাহাতে তাঁহার দেহে ব্যথা লাগে অনুমান করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্র আনাইয়া তাহা গৈরিক রঙ করাইয়া তাহার মধ্যে শিমুল তুলা ভরাইয়া এক তুলি-বালিশ তৈয়ার করাইলেন। স্বরূপ দামোদরকে অনুরোধ করেন তিনি যেন নিজে যাইয়া মহাপ্রভুকে তাহার উপর শয়ন করান। মহাপ্রভু তাহা দেখিযা রোষাবিষ্ট হইলেন; গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন ঐগুলি জগদানন্দ তৈয়ার করাইয়াছেন, তাহাতে প্রভুর কিছু সঙ্কোচ হইলেও অঙ্গীকার করিলেন না। তাহা শুনিয়া জগদানন্দ খুব দুঃখ পাইলেন। স্বরূপ, এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন—শুষ্ক কদলীর পত্র চিরিয়া প্রভুর বহির্বাসে ভরিয়া শয্যা তৈয়ার করিলেন। প্রভু তাহা কোন মতে অঙ্গীকার করিলেন।

প্রতি বৎসর নবদ্বীপে প্রেরণ

মাতৃভক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মহাপ্রভু প্রতিবৎসর জগদানন্দকে প্রসাদী বস্ত্র ও মিষ্টান্নাদি সহ নবদ্বীপে পাঠাইতেন এবং পণ্ডিত তখন শচীদেবীকে মহাপ্রভুর সংবাদ জ্ঞাপন করিতেন। কিন্তু নবদ্বীপে ও শান্তিপুরে কিছুদিন থাকিয়া বিদায় লইবার কালে পণ্ডিতকে দিয়া অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর জন্য এক তরজা প্রহেলিকা পাঠাইলেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর দশাবৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভক্তগণ বিচার করিতে লাগিলেন যে,—'মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্রই অপ্রকট হইবেন।'

শ্রীনন্দন আচার্য্য

"চতুর্ভূজ পণ্ডিতনন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস।।"

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৪

"বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১১।৪৩

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই সমস্ত বর্ণনানুযায়ী জানা যায়—শ্রীনন্দন আচার্য্যের পিতা শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিত এবং বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস—তাঁহারা তিনভাই; ইহারা সকলে নবদ্বীপ বাসী ভট্টাচার্য্য ছিলেন। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস নীলাচলে নবদ্বীপের নিকট কিছুদিন অবস্থান করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে আত্ম-সঙ্গোপন লীলা করেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য চৈতন্য শাখায় গণিত হন। ইনি খঞ্জ ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিয়া আসিলে ভক্তগণ সকলে উল্লসিত হন। শ্রীনন্দন আচার্য্য খোঁড়া হইলেও সর্বাগ্রে যাইয়া প্রভুকে পূজা করেন।

"নন্দন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবুও আসে সকলের আগে।।"

জগতের লোক সকল দিবাভাগে বিষয় কর্মে মত্ত থাকে আর রাত্রিকালে নিদ্রায় যাপন করে।

"প্রভু বলে,—"ভাই সব, শুন মন্ত্রসার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার।।
আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সবে কীর্তন-মঙ্গল।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১০৬, ১০৭

ইহাতে সকল বৈষ্ণবগণের আনন্দ হইল এবং যে পার্ষদগণ সঙ্গে নিশায় কীর্তন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনন্দন আচার্য্যও ছিলেন।

নন্দনাচার্য্য গৃহে নিত্যানন্দপ্রভুর আত্মগোপন

প্রভু নিত্যানন্দ যেকালে শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, সেই কালে মহাপ্রভু গৌরসুন্দর নবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যে কালে সর্বক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, সেইকালে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর অনাগমনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই তৎকালাবধি বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন।

"নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি' করে বৃন্দাবনে বাস।।
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১২২-২৩

গৌর সুন্দর নিত্যানন্দের আগমনের পূর্বে সকল বৈষ্ণবের নিকট ইঙ্গিতে কোন মহাপুরুষোর আগমন-বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন, যদিও সেই বৈষ্ণব শ্রোতাগণ শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত বাক্যের মর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে—

"চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১৬০

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি নবদ্বীপস্থ সকল পল্লীতেই পরমানন্দে সেই মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, উপাধিক বা বাহ্যচিহ্নধারী কোন নূতন ব্যক্তিরই সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না। শ্রীগৌরলীলায় প্রচ্ছন্ন ভাবহেতু কৃষ্ণ-বলদেবকে সহসা কেহ চিনিতে পারে না। নিত্যানন্দও পরমগোপনীয় প্রচ্ছন্ন বলদেববস্তু।

অন্তর্যামী মহাপ্রভু নন্দনাচার্য্য-গৃহে নিত্যানন্দের আগমন ও অবস্থান জানিয়া তিনি স্বগণসহ তথায় গমনপূর্বক নিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলে বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা নিজ নিত্য সেব্য শ্রীগৌরসুন্দরের রূপাদি আস্বাদন লীলা করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত কৃষ্ণধ্যানসূচক ভাগবতোক্ত এক শ্লোক (১০।২১।৫) যথা—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীত কীর্ত্তিঃ।।"

পাঠ করিতে থাকিলে প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে নিত্যানন্দ বাহ্য প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণবগণ আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

নন্দনাচার্য্য ভবনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আত্মগোপন

শ্রীবাসগৃহে ব্যাস-পূজার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও ভক্তগণসহ কীর্ত্তন-বিলাসে প্রমত্ত থাকাকালে একদিন ঈশ্বর-আবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামাইকে অদ্বৈতের নিকট পাঠাইয়া নিজ প্রকাশবার্ত্তা জানাইবার জন্য আদেশ দিয়া বলিলেন যে, যাঁহার জন্য অদ্বৈত বহু আরাধনাদি করিয়াছেন, তিনি ভক্তিযোগ বিলাইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই সঙ্গে নির্জনে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমন সংবাদ ও তদীয় অপূর্ব প্রভাব জানাইতে বলিয়া স্বীয় পূজোপকরণ সহ সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভুকে আসিতে আদেশ করিলেন। রামাই অদ্বৈতগৃহে যাইয়া মহাপ্রভুর আদেশ যথাযথ বর্ণনা করিয়া পূজাপকরণ সহ সস্ত্রীক গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তা শুনিয়া অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী, পুত্র অচ্যুতানন্দ ও অনুচরবর্গসহ আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভু উপহারাদি সহ সস্ত্রীক যাত্রা করিয়াও মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে রামাইকে নিজ আগমনের কথা প্রভু সমীপে জানাইতে নিষেধ করিয়া "তিনি আসিলেন না" বলিয়া মহাপ্রভুকে জানাইতে আদেশ দান

করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্বান্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর আচার্য্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণুখট্টার উপর উপবেশন করিয়া অদ্বৈতের হৃদয়-মনোভাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। এমন সময় রামাই আসিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলে তিনি অদ্বৈতের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ-নিকটে আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পুনরায় আদিষ্ট হইয়া রামাই অদ্বৈত প্রভুকে আনয়ন করিবার জন্য নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে যাবতীয় সংবাদ দিলেন। তখন সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভু আনন্দে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ ও স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন করিয়া প্রভুর মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিলেন, অদ্বৈত প্রভু স্তম্ভিত হইয়া শ্রীগৌরহরির অসমোর্দ্ধ দয়ার মহিমা সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন পূর্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"

—প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলে অপূর্ব সঙ্কীর্ত্তনানন্দে অদ্বৈত আচার্য্যও প্রভুর ভাববিহ্বল নৃত্য দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে প্লাবিত হইলেন।

নন্দনাচার্য্য গৃহে মহাপ্রভুর গোপনে অবস্থান

মহাপ্রভু নবদ্বীপ নগরে ভ্রমণকালে সমস্ত লোক তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'মদনরূপ' দর্শন করিত। ব্যবহারিক জগৎ তাঁহাকে দাম্ভিকের ন্যায় দেখিত এবং বিদ্যাবল দর্শনে পাষণ্ডগণও ভীত হইত। যাঁহারা বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিতেন, তাদৃশ ভট্টাচার্য্যগণকে মহাপ্রভু তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিতেন না। শ্রীগৌরসুন্দর নগর-ভ্রমণকালে সেবকগণসহ গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেন। সেই সমস্ত পাষণ্ডগণ প্রভুর নিকট বিদ্যা প্রতিভায় পরাজিত হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া বিভাগীয় শাসনকর্ত্তার নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

"প্রভু বলে,—

"হৈল আজি পাষণ্ডী-সম্ভাষ।
সংকীর্তন কর যবে, দুঃখ যাউ নাশ।।"

রহিয়া রহিয়া বলে,—"আরে ভাই সব।
আজি কেনে নহে মোর প্রেম অনুভব।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১৬, ১৮

প্রেমমত্ত অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—তিলি, মালাকার প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত ভগবানের প্রেমবিলাস কথায় তুমি মত্ত থাক এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনার পরিবর্ত্তে নিম্ন জাতির সঙ্গ কর। আমি (অদ্বৈত) ও শ্রীবাস —আমরা কেহই তোমার প্রেম পাইতেছি না। অবধূত নিত্যানন্দ তোমার একমাত্র প্রেমভাজন হইয়াছেন; আমাকে প্রেম না দিলে আমি তোমার সকল প্রেম শোষণ করিব। প্রেম-প্রলাপে অদ্বৈতাচার্য্য এইরূপ উক্তি করিতে করিতে কৌতুকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু প্রেমশূন্যদেহ রক্ষার নিষ্ফলতা জানাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহাকে গঙ্গা হইতে উঠাইলেন। মহাপ্রভু লুক্কায়িত ভাবে থাকিবার বাসনায় নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশানুসারে এই সংবাদ কাহারও নিকট জানাইলেন না। ভক্তগণ মহাপ্রভুর কোন উদ্দেশ্য না পাইয়া বিরহ-দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভুও মহাপ্রভুর বিরহে কাতর হইয়া উপবাসী থাকিলেন। এদিকে মহাপ্রভু নন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলে নন্দনাচার্য্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীতির সহিত বিবিধ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপ্রভু নিজেকে সঙ্গোপন করিবার জন্য নন্দনাচার্য্যকে আদেশ করিলে, নন্দনাচার্য্য জানাইলেন যে, তিনি সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী-সূত্রে জীবহৃদয়ে এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে ক্ষীর সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিলেও ভক্তগণ তাঁহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তিনি কিরূপে তাঁহাকে গোপন করিবেন। মহাপ্রভু নন্দনের বাক্যে প্রীত হইয়া সেই রাত্রি নন্দন গৃহে কৃষ্ণ কথা রসে কাটাইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় একাকী শ্রীবাস পণ্ডিতকে আনিবার জন্য নন্দনাচার্য্যকে আদেশ করেন।

শ্রীবাসপণ্ডিত নন্দনাচার্য্য-গৃহে উপস্থিত হইলে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসকে সান্ত্বনা দান করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার নিকট অদ্বৈতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস অদ্বৈতের বিরহ-কাতরতা ও উপবাসের কথা জানাইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য বিরহ কাতরে ভক্তগণকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপাময় মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছাগত দেখিয়া নিজেকে মহা-অপরাধী জ্ঞানে অদ্বৈতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রেমমূর্চ্ছা হইতে উত্থিত হইয়া নিজের কুমতির জন্য মহাপ্রভুর নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং নিত্যকাল দাস্যভাবে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান লাভের জন্য আর্ত্তি জানাইলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীনন্দনাচার্য্যকে মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলায় সঙ্গীরূপে অবস্থানেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা,—যখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে (কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর) চাতুরী করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যে গৃহে শুভবিজয় করাইয়াছিলেন, সে সময় শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ যাঁহারা মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনন্দন আচার্য্যও ছিলেন। চাতুর্ম্মাস্যকালে যে সময় মহাপ্রভুর সেবার জন্য শ্রীরাঘব পণ্ডিত ঝালি লইয়া এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণও অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্য লইয়া পুরুষোত্তমে গিয়াছিলেন, সে সময় নন্দন-আচার্য্যও তাঁহার আনীত দ্রব্যের দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি যে সকল ভক্তগণের গৃহে মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নন্দন-আচার্য্য অন্যতম।

শ্রীনন্দন আচার্য্য শ্রীবাস অঙ্গনে ও কাজীদমনকালে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন সঙ্গী এবং শ্রীধর অঙ্গনে, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন লীলায়, শ্রীনৃসিংহমন্দির মার্জ্জন লীলায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান লীলায়, আইটোটা উপবনে মহাপ্রসাদ সেবালীলায় এবং শ্রীরথ যাত্রায় মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনের স্মৃতিতে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবন ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শ্রীনন্দন আচার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

শ্রীভবানন্দ রায়

ইনি শ্রীরায় রামানন্দের পিতা। পুরী হইতে পশ্চিমে ছয়ক্রোশ দূরে আলালনাথ বা ব্রহ্মগিরির নিকট ইঁহার বাসস্থান। জাতিতে ইনি শৌক্রকরণ। তাঁহার পঞ্চপুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়েক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়েক। প্রথম পরিচয় হইতেই তাঁহাকে (ভবানন্দকে) 'তুমি পাণ্ডু' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ও তাঁহার পঞ্চপুত্রকে 'পঞ্চপাণ্ডব' বলিয়াছিলেন। এই পঞ্চপুত্রই মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিলে প্রভুর ভক্তগণ তাঁহার চরণ দর্শনের জন্য সমাগত হইলেন। সেই সময় ভবানন্দ রায় চারিপুত্র সহ আগমন করিলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরিচয় করাইয়া দেন যে, ইনি রায় রামানন্দের পিতা এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রামানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। আরও বলিলেন, তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী, তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব। রায় ভবানন্দ দৈন্য করিয়া বলিলেন, আমি বিষয়ী, শূদ্র ও অধম। আপনি আমাকে স্পর্শ করিলেন, ইহা আপনার 'ঈশ্বর লক্ষণ'। আমি আমার গৃহ, বিত্ত, ভৃত্য, পঞ্চপুত্র সহ অদ্য হইতে নিজেকে আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। বাণীনাথ আপনার নিকট থাকিবে, যখন যাহা আজ্ঞা, তাহা সে পালন করিবে। তিনি প্রার্থনা করিলেন, নিজদাস জ্ঞানে আমাকে কোন সঙ্কোচ করিবেন না, যাহা ইচ্ছা তাহাই আজ্ঞা করিবেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—'সঙ্কোচের কোন ব্যাপার নাই, জন্মে জন্মে আপনি সবংশে আমার কিঙ্কর।' এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহার পুত্রগণের শিরে চরণ ধরিলেন। মহাপ্রভু বাণীনাথকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়েক মালজাঠ্যা দণ্ডপাট নামক রাজ্য খণ্ডের তহশীলদারের কার্য্য করিতেন, সেই বাবদ তিনি রাজাকে যত টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাকি পড়ে। সেই অপরাধে উড়িষ্যার মহারাজার বড়পুত্র অর্থাৎ যুবরাজ বড়জানা তাঁহাকে হত্যা প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত মঞ্চ, যাহার নিম্নভাগে নিষ্কাশিত খড়্গসকল রক্ষিত হয় সেই চাঙ্গে চড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য, যেহেতু সবংশে ভবানন্দ রায় মহাপ্রভুর সেবক সেই কারণে তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রত্যাশায় মহাপ্রভুর

কৃপাপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে জানাইলেন। মহাপ্রভু ইহার কারণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসধর্মের আদর্শরূপে মহাপ্রভু প্রাকৃত বিষয়কথায় ঔদাসিন্য বা নিরপেক্ষতা দেখাইয়া বলিলেন, 'রাজা তাহার প্রাপ্য লইবে, ইহাতে আমার কি করিবার আছে?' যদি সবার ইচ্ছা থাকে তাঁহাকে রক্ষা করিতে, তবে 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ' জগন্নাথকে প্রার্থনা জানাইতে বলেন। অতঃপর হরিচন্দন পাত্র যাইয়া রাজাকে সব জানাইলেন। রাজা বলিলেন, এই সব কথা আমি কিছুই জানি না। তুমি যাইয়া যাহাতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়, তাহাই কর; দ্রব্যই চাহি, প্রাণ নহে।' হরিচন্দন আসিয়া জানাকে জানাইলে গোপীনাথকে শীঘ্র চাঙ্গ হইতে নামানো হইল। এমন সময়ে কাশী মিশ্র মহাপ্রভুর নিকটে আসিতেই তিনি তাঁহাকে 'সোদ্বেগ-বচনে' বলিতে লাগিলেন 'ভবানন্দের গোষ্ঠী রাজদ্রব্য ব্যয় করায় গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার ব্যাপারে লোকেরা চারিবার আসিয়া আমাকে জানাইতে আসে। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, বিষয়ীগণের কথা শুনিয়া আমার মনে দুঃখ হয়, এখানে থাকিব না, আলালনাথে চলিয়া যাইব।' কাশী মিশ্র তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, 'আপনি কেন আলালনাথে যাইবেন, আপনি বসিয়া থাকুন, কেহ আপনাকে বিষয়ীর কথা শুনাইবে না।' রাজা প্রতাপরুদ্র কাশী মিশ্রের ভবনে আসিতেই কাশী মিশ্র তাঁহাকে মহাপ্রভুর আলালনাথে চলিয়া যাইবার ইচ্ছাপ্রকাশের কথা শুনাইলেন। রাজা বলিলেন,—

"ভবানন্দ-রায়—আমার পূজ্য-গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।১০৩

রাজা (কাশী মিশ্রকে) আরও বলিয়াছিলেন,—

"ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম।
ইঁহা সবাকারে আমি দেখি আত্মসম।।
অতএব যাহাঁ তাহাঁ দেই অধিকার।
খায়, পিঠে, লুটে, বিলায়, না করে বিচার।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।১২০-২১

ভবানন্দ রায় পঞ্চপুত্র-সহ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে পড়িতেই মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভবানন্দ বলিলেন,—'পূর্বে যেমন পঞ্চ-

পাণ্ডবকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই এই বিপদ হইতে আপনি আপনার কিঙ্কর আমাদিগকে পরিত্রাণ করাইয়া ভক্ত-বাৎসল্য প্রকাশ করিলেন।'

গোপীনাথ চরণে পড়িয়া রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন—

'বাকী কৌড়ি মুকুব হইল, বেতন দ্বিগুণ হইল, আবার 'বিষয়' দিয়া নেতবচী (পট্টবস্ত্র) পরাইয়া সম্মান করিলেন।

"চাঙ্গের উপরে তোমার চরণধ্যান কৈলু।
চরণ-স্মরণপ্রভাবে এই ফল পাইলুঁ।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৩৫

কিন্তু গৌরস্মরণের মুখ্যফল—গৌরপ্রীতি, গৌণফল—বিষয়সুখ। যেহেতু জড়বিষয়,—স্বয়ংই চঞ্চল, সুতরাং তৎসম্বন্ধি ফল 'মুখ' ফল নহে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সাধু জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে এই সাধু জনের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছিল; এই গোপাল ভট্ট শ্রীবৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামিগণের একজন; শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ইঁহারই পিতৃব্য। শ্রীভক্তিরত্নাকরে (১-৮৩) ত্রিমল্ল ও ভেঙ্কট ভ্রাতৃগণ সহ তাঁহার নাম পাওয়া যায়। পূর্বে তাঁহারা সকলেই শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসকে পরিবর্ত্তিত হন যখন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে গমনকালে চাতুর্ম্মাস্য কাল (বর্ষার চারিমাস) কাটাইবার সময় শ্রীরঙ্গমে তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন (শ্রীরঙ্গমে ভগবান শ্রীরঙ্গনাথ অবস্থান করেন। শ্রীগোপালভট্ট সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১।২) দেখা যায় শ্রীপ্রবোধানন্দকে তাঁহার গুরুরূপেও উল্লেখ আছে। ভক্তিরত্নাকরে তাঁহাকে এক মহান কবি ও সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ ও অসীম সদ্‌গুণ সম্পন্ন বলা হইয়াছে। তাঁহার প্রযত্নে ও প্রশিক্ষণে গোপাল এক মহান্ পণ্ডিত হইয়া উঠেন, বাল্যাবস্থাতেও তিনি মায়াবাদিগণের যুক্তি সকল খণ্ডন করিতে পারিতেন। প্রতিবেশীগণ প্রবোধানন্দকে উচ্চ-প্রশংসা করিত ও তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করেন ও বলিতেন যে তিনি 'পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবানের' অতীব প্রিয়পাত্র, যাঁহাকে ছাড়িয়া স্বপ্নেও অন্য কাহারও কথা তিনি জানিতেন না (ভক্তিরত্নাকর ১।১৪৯-১৫০)।

মাতা-পিতার দেহাবসানের পর শ্রীগোপাল ভট্ট প্রায় দুই বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা মত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তবে কবে শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রজে আগমন করেন তাহা সঠিক জানা যায় না যদিও তাঁহার অবস্থান হিসাবে ভজনের জন্য কাম্যবন দেখান হইয়াছে। সেখানে তিনি সুদীর্ঘকাল কাটাইয়াছিলেন ও শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান যেখানে কালীয় দহে তাঁহার সমাধি স্থান লক্ষিত হয়। যদিও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য গোপাল ভট্টের মত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বকালীন জীবনীগুলিতে যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবত , শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তিনি অধিক উল্লেখিত হন নাই, যেহেতু চরম দৈন্যতা হেতু তাঁহারা চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত হিসাবে নিজেদের নামোল্লেখে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়া ছিলেন, তথাপি তাঁহার গ্রন্থাদি হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে তিনি একান্ত অনুগত ভক্তগণের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার প্রণীত

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' গ্রন্থে মহাপ্রভুর প্রতি স্তবস্তুতিতে উল্লেখিত আছে যে তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার, তাহাতে খুব উদ্যোগপূর্ণভাবে ও প্রশংসাপূর্ণ ভঙ্গীতে অতীব শক্তিশালীভাবে ১৪৩টি শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরঙ্গমে প্রাপ্ত শিক্ষানুসারে তিনি নিজ প্রণীত রাধা-রস-সুধানিধিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি উচ্চতম প্রেম ও আন্তরিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীকবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় তাঁহাকে তাঁহার পূর্বতন ব্রজ লীলায় তুঙ্গবিদ্যা (শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ অষ্টসখীর একজন) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার একান্ত ভক্তিভাব তাঁহার গ্রন্থ সমূহে বজায় রাখিয়াছেন, যথা শ্রীবৃন্দাবন মহিমাব্রতম্, শ্রীনবদ্বীপশতকম্, সঙ্গীত-মাধবন্ ও আশ্চর্য্য রস প্রবন্ধম্। অধ্যাপক আফ্রেট তাঁহার আরও একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন 'বিবেক শতকম্'। তাঁহার গ্রন্থগুলি এতই চমৎকার যে উপরোক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে ভিন্ন এক সম্প্রদায়ের নামে চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এই সম্প্রদায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ও শ্রীরূপ-সনাতন ও তাঁহাদের গোঁড়া অনুরাগিবৃন্দের গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন। কিন্তু সম্প্রদায়ে প্রকৃত সমঝদার সেই অপরাধজনক ভাবে কৃত প্রচেষ্টাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহার ভাষার ধরণকে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার অন্যান্য গ্রন্থে ভক্তি ভাবযুক্ত প্রণয়লীলা প্রকাশভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং তাঁহারা এক পাণ্ডুলিপি খুব নির্ভুলভাবে প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, পাণ্ডুলিপিটি খুব চতুরতার সহিত জয়পুরের গোবিন্দ মন্দিরের গ্রন্থাগারে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এক মূল ও সঠিক গ্রন্থের পাশে রাখা হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদকত্বের আভ্যন্তরীণ যুক্তি সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে ও সেই সম্প্রদায়ের দাবীকে খণ্ডন করা হইয়াছে। নাভাজীর হিন্দি ভক্তমাল গ্রন্থেও প্রণয়শীল ভক্তির প্রকৃতি সহ তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিছু কিছু লোক আছে যাহারা জনৈক লালদাস বাবাজী প্রণীত বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থের অনুসরণে, কতকগুলি দৈবক্রমে সংঘটিত ঘটনাবলীর ঐক্যমত্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া এমন মত চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে শ্রীপ্রবোধানন্দ ও পূর্বে মায়াবাদী ছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট মায়াবাদের প্রতারণা পূর্ণতা বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া পরে ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন সেই পণ্ডিত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি (চৈঃ চন্দ্রাঃ ২৫-৫-১৬০)

কিন্তু তাঁহার নাম সমসাময়িক সাহিত্যে আর উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পরবর্ত্তী সাহিত্যসমূহে যথা শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতিতে উচ্চ-প্রশংসিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকটি গ্রন্থ আছে যাহা অতীব উচ্চ পর্য্যায়ের অসাধারণ চমৎকারিতাযুক্ত, যোগ্য, যাহা তাঁহাদের মতে একমাত্র প্রকাশানন্দের যোগ্যতায় সম্ভব। তাহাদের মধ্যে অধিকতর মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিক গভীরে প্রবেশ করিয়া সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে বেদান্ত সূত্রে ব্যবহৃত কিছু খাপ ছাড়া শব্দ সংগ্রহ করেন ও মায়াবাদিগণ যে অসুবিধা ভোগ করিয়াছে তাহার কিছু প্রসঙ্গ তাহাতে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন এই প্রকার সিদ্ধান্ত কখনই ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ঘটনার বিরুদ্ধে দাঁড় করান যায় না। তাঁহাদের যুক্তিকে নাকচ করিবার পূর্বে, আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রবোধানন্দের নাম প্রকাশানন্দে পরিবর্ত্তনটি কেন চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ পর্য্যন্ত করা হইল না, যেখানে প্রকাশানন্দের পরিবর্ত্তন এত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সেবক শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চা বা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তিকা অনুসারে মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকের আষাঢ় মাসে বা ১৫১১ সনে শ্রীরঙ্গম গমন করিয়াছিলেন। তিনি সহ এখানে তিনজন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ভ্রাতা ছিলেন ত্রিমল্ল, ভেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ এবং একটি বালক গোপালও; গোপালকে প্রশিক্ষণ দান ও দীক্ষাপ্রদানের ভার মহাপ্রভু শ্রীপ্রবোধানন্দের উপর অর্পণ করেন (ভক্তিরত্নাকর অনুসারে)। তিনি খুব বিশ্বস্ততার সহিত এই কর্তব্য পালন করেন এবং সেই ভ্রাতুষ্পুত্র শিষ্যকে এক মহান্ বৈষ্ণব পণ্ডিতে পরিণত করেন, তিনি খুব সাফল্যের সহিত বাল্যাবস্থা হইতেই মায়াবাদকে খণ্ডন করেন।

দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ সনে) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসী গমন করেন এবং বহুসংখ্যক শাঙ্কর সন্ন্যাসীর প্রধান শ্রীপ্রকাশানন্দকে পরাজিত করিয়া নিজ অনুগামীতে পরিবর্ত্তিত করেন। কি করিয়া আশা করা যায়, মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের দুই বৎসর কালের মধ্যে যে প্রবোধানন্দ জন্মসূত্রে ও দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত ও মহাপ্রভুর অনুগামীতে পরিণত, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য গোপালকে প্রশিক্ষণভার প্রাপ্ত, তিনি প্রকাশানন্দ হইয়া যাইবেন ও তদানীন্তন কালের মায়াবাদিগণের প্রধান কেন্দ্রে প্রায় এক সহস্র সন্ন্যাসীকে নিজ অনুগামী করিয়া তাহাদের প্রধান হইয়া বসিবেন?

এই প্রকার নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আশ্চর্য্যজনক অবস্থার পরিবর্ত্তন বিষয়ে কল্পনা শক্তি ও ধারণা করিতে অক্ষম, যাহাকে বলা যায় বাগদাদে সহস্র রজনীর গল্প অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যজনক।

এখানেই শেষ নহে, আমাদের বুদ্ধিমান পাঠকবর্গকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে অধিকতর বিস্ময়ের বস্তু অপেক্ষা করিতেছে! একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজ জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে কৃষ্ণনাম নৃত্যসহ সঙ্কীর্ত্তন সহকারে ভক্তিধর্ম প্রচার করিতে ছিলেন। ঘটনা শ্রীচৈতন্যভাগবতের দুইটি স্থানে (১।৩, ও ২।২০) লিপিবদ্ধ আছে। যখন একান্ত অনুরাগী ভক্ত মুরারী গুপ্তের গৃহে এক সমাধি অবস্থায় দিব্য প্রকাশে অন্যান্য কথার মধ্যে চিৎকার করিয়া বলেন, "বদমাস সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ কাশীতে বেদান্ত পড়ায় এবং গ্রন্থ ব্যাখ্যাকালে আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বলে বেদসকল আমার আকারকে স্বীকৃতি দেয় না। কি বেয়াদপি করিয়া বলে মিথ্যা আকার, আমার যে দেহের মহিমা ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্যগণ কীর্ত্তন করে এবং সকল প্রকার শুদ্ধি ও পবিত্রতার উৎস জ্ঞান করে ও যাহার মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে।" এইভাবে প্রভু ১৪৩৫ শকে (চৈঃ চঃ ১।৭, ও ২।২৫) প্রকাশানন্দকে পরাজিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কি করিয়া আশা করা যায় এই দুই তারিখের মধ্যে যথা ১৪৩৩ শকে মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রবোধানন্দ রূপে দেখিলেন যিনি শঙ্কর সম্প্রদায়ের মায়াবাদকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেন। সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে ১৪৩১ শকের বহুপূর্ব হইতে প্রকাশানন্দ মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, অতঃপর ১৪৩৩ শকে তিনি ছিলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের ভক্ত ও চৈতন্যানুগরূপে যুক্ত ছিলেন এবং পুনরায় ১৪৩৫ শকে তিনি শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী; এই ধারাবাহিক অসংগতি সমাধান করা যায় যাবৎ না প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দকে দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়, একজন উত্তর ভারতের ও অপরজন দক্ষিণ ভারতের? সুতরাং লালদাস বাবাজীর তত্ত্ব ও যাহারা তাহার কাল্পনিক সিদ্ধান্তকে সত্য ধারণা করিয়া নির্ভর করিয়া প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গণ্য করে, তাহা কোন যুক্তিতেই দাঁড়াইতে পারে না ও একেবারেই ভিত্তিহীন। পরিশেষে প্রার্থনা এই যে,—এই পবিত্র সাধু আমাদিগকে পরম চমৎকারিতাপূর্ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ প্রেম বুঝিবার মত যোগ্যতা প্রদান করেন।

শ্রী শ্রীধর ঠাকুর

শ্রীধর ছিলেন নবদ্বীপবাসী জনৈক থোড়-কলা-মোচা বিক্রয়োপজীবী নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। তাহাতে যাহা কিছু উপার্জন হইত, তাহার অর্ধেক গঙ্গার নৈবেদ্য প্রদান ও বাকি অর্ধেকের দ্বারা নিজপ্রাণ রক্ষা করিতেন। তিনি ছিলেন মহা সত্যবাদী ও উচিত মূল্যের অধিক তিনি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার মত বিষ্ণুভক্তকে লোকে চিনিতে না পারিয়া 'খোলাবেচা' মাত্র জ্ঞান করিতেন। সারা রাত্রি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া কাটাইতেন; তাহাতে পাষণ্ডীগণ বিরক্ত হইয়া বলিতেন— "মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে।।"

শ্রীধরের মন্দিরটি ছিল সরডাঙ্গা গ্রামের মায়াপুরের একপ্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির এক মাইল পূর্বদিকে ডেঙ্গা মাঠের উপর অবস্থিত; উহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে।

শ্রীধরের কুটীরে মহাপ্রভু

স্বীয় প্রিয়ভক্ত শ্রীধরের প্রতি নিমাইর অতীব প্রীতি ছিল। প্রত্যহই তাঁহার গৃহে আসিয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন করিতেন। প্রভু শ্রীধরকে বলিতেন, "শ্রীধর, তুমি তো অনুক্ষণ 'হরি হরি' বলিতেছ, লক্ষীকান্তকে সেবা করিয়া অন্ন-বস্ত্রে কত দুঃখ ভোগ করিতেছ। দেখ, লোকেরা চণ্ডী বিষহরির পূজা করিয়া খাওয়া পরায় কত সুখে আছে? তোমার বস্ত্রে দেখিতেছি দশ-বারটি গ্রন্থি।" তাহাতে শ্রীধর বলেন, "আমি ত' উপবাস করিয়া কাটাই না; ছোট বা বড়, যাহা হউক, বস্ত্র তো পরি। কাল সকলের সমানভাবেই কাটিয়া যায়। রাজার ঘরে রত্ন থাকে, দিব্য-খাওয়া পরাও পায়, পক্ষিগণও থাকে গাছের উপর, তাহারাও ত' অনাহারে থাকে না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় সকলেই নিজ কর্মফল ভোগ করে।" মহাপ্রভু অকারণে কলহ উৎপাদনের জন্য বলিলেন, "জানি, তোমার বিস্তর লুক্কায়িত ধন আছে, আমি তাহা সকলকে জানাইয়া দিব। যাহা হউক, তুমি এখন আমাকে কি দিবা বল।" শ্রীধর বলেন,—"আমি ত' খোলা বেচিয়া খাই, কি আর দিব, বল।" "তোমার পোতা ধন এখন থাকুক, এখন আমাকে বিনা কড়িতে কলা, মূলা, থোড় এই সব দাও"—বলিলেন মহাপ্রভু; শ্রীধর মহাপ্রভুর প্রহারের ভয়ে, বিনা মূল্যে কন্দ মূলাদি বিক্রয়ে অসামর্থ্য-সত্ত্বেও সহজ প্রেমবশে তৎসমুদয় দান করিলেন। কলহ ভয়ে বলিলেন, "কড়ি পাতি তোমায় কিছুই দিতে হইবে না;

থোড়, কলা, মূলা, খোলা আমি ভাল মনেই দিব; তবে আর আমার সঙ্গে ঝগড়া করিও না।'' নিমাই তাহাতে কলহ পরিত্যাগে সম্মতি জানাইয়া কন্দ মূলাদি প্রদানের জন্য শ্রীধরকে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহা দ্বারা মহাপ্রভু ইহাই বুঝাইলেন যে শ্রীধর যে পারমার্থিক ধনে ধনী, সম্প্রতি তিনি তাহা চাহেন না, কিন্তু তাহার বাহিরের দিকের যে ধন আছে তাহারই অংশ লাভে তিনি যত্ন করিতেছেন অর্থাৎ সাধকোচিত সেবাদ্বারা সম্প্রতি তাঁহার অভাব পূরণ হউক।

অতঃপর শ্রীধরকে নিমাইর সম্বন্ধে তাহার ধারণা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীধর নিমাইকে বিষ্ণুর অংশ (ব্রাহ্মণ) বলায় তিনি কৌশলে নিজস্বরূপতত্ত্ব গোপন করিয়া নিজেকে গোপ-নন্দন বলিলেন এবং নিজেকে গঙ্গার অধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিলেন। শ্রীধর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে—''তুমি এতাদৃশ ধৃষ্টলোক যে, লোকপাবনী গঙ্গাকে পর্য্যন্ত 'পাপনাশিনী' বলিয়া বিশ্বাস নাই। তোমার দেখিতেছি বয়স বাড়ার সহিত চাঞ্চল্যই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।''

শ্রীধরকে কৃপা

মহাপ্রভু পার্ষদগণসহ কীর্ত্তন-বিলাস আরম্ভ কালে শ্রীধর তাহাতে অংশ-গ্রহণকারী ছিলেন। নিজ 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব দর্শনার্থে শ্রীধরকে আনয়ন করাইতে গেলে শ্রীধর প্রভুর নাম-শ্রবণে মূর্চ্ছিত হন। বাহ্য পাইলে প্রভু বলিলেন, ''তুমি আমার বহু আরাধনা করিয়াছ। এই জন্মে আমার অনেক সেবা করিলে, তোমার দ্রব্য আমি অনেক খাইলাম।'' মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া থোড়, কলা, মূলা, খোলা অর্ধমূল্য দিয়া লইয়া আসেন। 'যে গঙ্গা তুমি পূজা কর, আমি তাঁহার পিতা; প্রত্যহ ক্রয় করিয়া গঙ্গাকে দ্রব্য দাও, আমাকে না হয় কিছু মূল্য ছাড়িয়া দিলে'' এই কথা নিমাইর মুখে শুনিয়া 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলিয়া কর্ণে হস্ত প্রদান করেন। ভক্তের দ্রব্য ভগবান্ এইভাবে কাড়িয়া খায়েন, অভক্তের দ্রব্যে উলটিয়াও চাহেন না। এই লীলা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীধরের খোলা-বেচা আর মহাপ্রভুর তাহা কাড়িয়া গ্রহণ। মহাপ্রভুর নিজ ঐশ্বর্য্য দর্শনে শ্রীধরকে আহ্বান জানাইলে এবং তাঁহাকে অষ্ট সিদ্ধি দান করিতে চাহিলে শ্রীধর উত্তর করিলেন, ''প্রভু, আরো ভাঁড়াইবা? থাকহ নিশিন্তে তুমি, আর না পারিবা।। চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২২১।।'' পুনরায় বর মাগিতে বলিলে, ''শ্রীধর বলয়ে, 'প্রভু দেহ' এই বর।। যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা পাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ। চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২২৩-২২৪।।'' মহাপ্রভু শ্রীধরকে এক মহারাজ্যের অধীশ্বর

করিতে চাহিলেও, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রভুর নাম-গান করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বেদগোপ্য ভক্তিযোগ প্রদান করিলেন। শ্রীধরের বরপ্রাপ্তি আখ্যানের কাহিনী শ্রবণ করিলে শ্রোতার প্রেমধন লাভ হয়।

শ্রীধর গৃহে জীর্ণ লৌহপাত্রে প্রভুর জলপান

কাজী-দলন দিবসে মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীধর গৃহে গমন করেন। তাঁহার ভাঙ্গা ঘরের দুয়ারে বহুতালিযুক্ত জলপূর্ণ এক লৌহপাত্র দেখিয়া মহাপ্রভু ভক্ত প্রেম বুঝাইবার জন্য তাহার জলপান করিতে লাগিলেন। দরিদ্র শ্রীধর গৌর-সুন্দরের অযাচিত সেবা গ্রহণ-দর্শনে স্বীয় দারিদ্র নিবন্ধন নিজেকে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'শ্রীগৌরসুন্দরের যোগ্য সম্ভাষণ আমা দ্বারা হইল না, সুতরাং আমাকে মারিবার জন্যই—হৃদয়ে দুঃখ দিবার জন্যই মহাপ্রভু বলপূর্বক ফুটা লৌহপাত্রে জল পান করিলেন।'

মহাপ্রভু শ্রীধরের বাক্য শুনিয়া তাঁহার জীর্ণপাত্রে জলপান করায় শ্রীধরের কৃষ্ণ সেবাবৃত্তি আরও উন্মেষিত হইল, কৃষ্ণবিস্মৃতি নাশ হইল, বহির্জগতের সুখানুসন্ধান রহিত হইয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শরীর শোধিত হইল বলিলেন। জনার্দন—ভাবগ্রাহী; তিনি জড় জগতের ঐশ্বর্য্যদ্বারা সেবিত হইবার পরিবর্ত্তে জীবের নিষ্কপট হৃদয়ের সেবা গ্রহণ করেন।

শ্রীধরের জলপানের পর মহাপ্রভু প্রেম ভাবে স-গোষ্ঠী নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীধর দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ''কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়'' বলিয়া 'হায় হায়' করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব দিবস শ্রীধরের লাউ ভোজন

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব রাত্রিতে সুকৃতি শ্রীধর এক লাউ হাতে আসিয়া ভেট দিলেন ও আর এক ভাগ্যবান্ দুগ্ধ ভেট দিয়া গেলেন। প্রভু জননীকে দুগ্ধ লাউ রন্ধন করিতে বলিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাহা গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে স্বীয় শয়ন ঘরে গমন করিলেন। পর দিবস প্রভুর গৃহত্যাগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যত ভক্তগণ প্রভু-বিরহে বিষাদ-গ্রস্ত হইলেন—শ্রীধরও প্রভুর অঙ্গনে পড়িয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

শ্রীরথযাত্রা সমাগত হইলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে অগ্রণী করিয়া গৌড়ের অগণিত ভক্তসহ শ্রীধরও নীলাচলে গমন করিয়া মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিলেন।

শ্রীমুরারী গুপ্ত

'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় এই সাধুজনকে শ্রীহনুমানজীর অবতার বলা হইয়াছে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীরামসীতার সেবায় প্রবল অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে তাঁহার বাসস্থান মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠের নিকটে একটি মন্দিরে নিত্য সেবার জন্য রাম-সীতার মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর প্রায় সমবয়সী ছিলেন ও শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের সংস্কৃত একাদেমীতে সহপাঠী ছিলেন। মহাপ্রভুর নদীয়া লীলায় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর ধামে ও সন্নিহিত স্থানে কার্য্যকলাপের নিত্য সময়ের সহচর ছিলেন, এই জন্য সেখানে অবস্থান কালীন মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল, সেইগুলি তিনি সংস্কৃতে প্রণীত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' (যাহা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের অতীব বিখ্যাত ও বৃহদাকার বাংলা গ্রন্থ হইতে ভিন্ন তাহাতে) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবনী লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্বতন তাঁহাদিগকে তাঁহার গ্রন্থ হইতে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার ভক্তির আবেগ ছিল অত্যধিক, এমনই যে পাছে মহাপ্রভু তাঁহার পূর্বেই এই পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করেন সেজন্য তিনি আত্মহননের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।

বিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় মহাপ্রভু প্রায়ই, ছাত্র হিসাবে জ্যেষ্ঠ হইলেও, প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিতেন, এবং তাঁহাকে নিজ পাঠ না দিতে নীরবে কাজ করিয়া যাইতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, বৈদ্য হিসাবে রোগিগণের পরিচর্য্যা করুক, শাস্ত্রীয় পঠনে মাথা না ঘামাইতে বলেন। একদিন মুরারী মুখের মত উত্তর দান করিলে, অবশ্য নম্রভাবে মহাপ্রভু তাঁহাকে সেই দিবসের পাঠ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন, পূর্বের নিয়মাবলী হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া। মুরারী ভালভাবেই তাহা বলিলেন; কিন্তু প্রভু অপর একটি সিদ্ধান্ত জানাইলেন, যাহা মুরারী খণ্ডন করিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি নিজের সিদ্ধান্তকেই খণ্ডন করিলেন ও পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া মুরারী বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, মানুষে এই প্রকার অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে না, যতই তাহার মধ্যে ঈশ্বর দত্ত প্রতিভা থাকুক না কেন। তাহা ছাড়া তাঁহার দেহের উপর সস্নেহে রক্ষিত হস্তস্পর্শে তাঁহার প্রতি খুবই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং

অধিকতর প্রেমভক্তি জাগরিত হইল এবং আরও আরও সত্য উপলব্ধি হইতে লাগিল।

মহাপ্রভু গয়াতে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ অভিনয়ান্তে ফিরিয়া আসিলে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহেতে মিলিত হইবার জন্য যাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এই মুরারী; সেখানে তাঁহারা সকলে পরম বিস্ময়ে ও হর্ষের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার স্বভাবের অমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—যে মানুষ প্রত্যেককে, তা' সে যত বড়ই পণ্ডিত হউক না কেন, অনায়াসে বিতর্কে পাণ্ডিত্য প্রতিভা বলে পরাজিত করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন সেই তিনি অদৃষ্টপূর্ব কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হইয়াছেন। সেই সংক্রান্ত এক শ্লোক শ্রবণ করিয়া নিজ দশ অবতারের মধ্যে তৃতীয় অবতার বরাহ রূপের ভাবে ভাবিত হইয়া এক দিবস মুরারীগুপ্তের গৃহে আসিলেন; শ্রীরামচন্দ্র যেমন হনুমানকে ভালবাসিতেন তেমনভাবে মুরারীকে ভালবাসিতেন। মুরারী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিয়া সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইলেন, তখন তিনি 'শূকর' 'শূকর' বলিয়া চীৎকার করিলেন, তাহাতে মুরারী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মহাপ্রভু সরাসরি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শূকর আকার ধারণ করিয়া মুরারীকে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। মুরারী বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন। প্রভু তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিলেন এতদিন ধরিয়া তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি না। তখন মুরারী বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ও রোরুদ্যমান অবস্থায় নিজের অপদার্থতার কথা জানাইয়া বহুবার প্রণাম করিতে লাগিলেন ও বলিলেন যে যখন বেদ সকল তাঁহাকে ভালভাবে জানিতে পারে নাই সেক্ষেত্রে তাঁহার মত এক নগণ্য জীব কি করিয়া ভগবানের মহিমা অবগত হইবেন। তাহাতে প্রভু ইঙ্গিত দিলেন যে অনেক বেদপাঠক কিছু কিছু মন্ত্রের (যথা শ্বেতাশ্বতর ৩-১৯) প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে হস্তপদহীন, মুখহীন, চক্ষুহীন ইত্যাদি মনে করে। অতঃপর রোষপ্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন; "কাশীতে এক বদ্‌মাশ আছে, নাম তাহার প্রকাশানন্দ (শাঙ্কর সন্ন্যাসীগণের প্রধান ও শিক্ষক) যে আমার দেহকে মায়াময় বলিয়া আঘাত করে। হে মুরারী, যাহা সত্য তাহা শ্রবণ কর; আমি যজ্ঞ বরাহ (বিষ্ণু) যিনি ধরণীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এবার আমি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার জন্য অবতার হইয়াছি। যাহারা আমার ভক্তগণকে ঘৃণা করে তাহাদিগকে আমি বিনাশ

করিব, ভক্ত দ্রোহ আমি সহ্য করিতে পারি না।" ইহাতে মুরারী অভিভূত হইয়া পড়িলেন ও উচ্চঃক্রন্দন-সহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ভগবানের মহাপ্রকাশ কালে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলে মুরারীকে ডাকিয়া তাঁহার রূপ দর্শন করিতে বলিলেন। মুরারী প্রভুকে (নিজ ইষ্টদেব) রামচন্দ্ররূপে দর্শন করিলেন, সীতাদেবী বামে ও লক্ষ্মণ দক্ষিণে, চতুর্দ্দিকে বানর প্রধানগণ করজোড়ে স্তুতিতে রত; তিনি নিজ তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ হনুমানরূপে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া মুরারী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাগত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিয়া আরও সাবধানতার সহিত তাকাইতে বলিলেন তাঁহার ও তাঁহার আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহের দিকে, মুরারীকে উঠানো হইলে তিনি তাকাইয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে কাঙ্খিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মুরারী অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া ইহাই প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার যেন চিরকাল ধরিয়া তাঁহাতে ভক্তি থাকে এবং বর্ত্তমান জন্মের মত অন্যান্য সকল জন্মে তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে জন্ম লাভ হয়। প্রভু তাহাই মঞ্জুর করিলে ভক্তগণের মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনি উত্থিত হইল। অতঃপর ভগবান্ 'মুরারী গুপ্ত' নামের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন মুরারী (কৃষ্ণ) তাঁহার হৃদয়ে লুক্কায়িত অবস্থায় আছেন।

একবার মুরারী শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া প্রথমে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ও পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাপ্রভু জানাইলেন তাঁহার ক্রম ভুল হইয়াছে, মুরারী কারণ জানিতে চাহিলে তাঁহাকে পরদিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রাত্রে মুরারী স্বপ্নে দেখিলেন যে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবলরামরূপে হস্তে লাঙ্গল ও গদা লইয়া, তাঁহার পিছনে হস্তে পাখা লইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যিনি বলিলেন তিনি কনিষ্ঠতর। পরদিবস শ্রীবাস অঙ্গনে যাইয়া প্রথমে তিনি নিত্যানন্দকে ও পরে মহাপ্রভুকে প্রণাম জানাইলে তিনি বলিলেন যে মুরারী শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে সত্য জানিতে পারায় খুশী হইয়াছেন। মুরারী গৃহে ফিরিয়া আসিলে এক পুলকে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে পরিবেশিত খাদ্য সকল চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে "হে কৃষ্ণ, খাও' বলিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুষে প্রভু তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিলেন, যেহেতু তাঁহার গর হজম হইয়াছে। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন পূর্ব দিবস মুরারীর তাঁহার নামে ছড়ানো

খাদ্য অতি মাত্রায় ভোজন করায় এই উপসর্গ। প্রভু নিজেই তাঁহার ঔষধ বলিয়া দিলেন যে বৈদ্যের জল দ্বারা তাহা নিরাময় হইবে, এই বলিয়া জোর করিয়া মুরারীর জলপাত্র লইয়া পেট ভরিয়া পান করিলেন। এই পরম করুণায় মুরারী জ্ঞান হারা হইলেন, সমগ্র পরিবার দৈব প্রেমাতিশয্যে কাঁদিয়া উঠিল।

এই প্রবন্ধের সূচনায় উল্লেখিত আর এক ঘটনা যাহাতে মহাপ্রভুর প্রতি মুরারীর প্রেমের ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়। একদিন তাঁহার মনে উদ্বেগপূর্ণ চিন্তা জাগিল যে ভগবান্ তাঁহার অবতার লীলার কি যে করিবেন কেহ তাহা জানিতে পারে না। যে সীতাদেবীর জন্য রামচন্দ্র রাবণকে সবংশে নিধন করিলেন, তাঁহাকেই তিনি পরিত্যাগ করিলেন; যে যাদবগণ কৃষ্ণের নিজ প্রাণতুল্য প্রিয় ছিলেন তাঁহাদিগকে নিজে চক্ষের সমক্ষেই ধ্বংস করিলেন। সেই জন্য মুরারী মনস্থির করিলেন মহাপ্রভু পার্ষদ ভক্তবৃন্দকে লইয়া মত্ত থাকিতে থাকিতেই নিজ দেহ ত্যাগ করা সমীচীন হইবে। এই চিন্তায় মুরারীর মনে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিল। নিজ ঘরে একটি ধারাল দা (কাটারি) রাখিয়া দিলেন ও কল্পিত বিচ্ছেদ বেদনা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সেই রাত্রেই জীবনাবসান ঘটাইবেন, কারণ মনে আশঙ্কা জন্মিয়া ছিল যে মহাপ্রভু হয়তো তাঁহার পূর্বেই এ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবেন। সন্ধ্যার পূর্বে সর্বজ্ঞ প্রভু মুরারীর নিকট আসিতেই তিনি (মুরারী) তাঁহার সমক্ষে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। কথা বলিতে বলিতে প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে তাঁহার একটি অনুরোধ রক্ষা করিবে কি না। মুরারী অঙ্গীকার করিলে প্রভু তাঁহাকে কাটারিটি লইয়া আসিতে বলিলেন। মুরারী বিস্মিত হইলে প্রভু নিজেই সেই গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কোন্ দোষের জন্য তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাও? তুমি অনুপস্থিত থাকিলে কাহাদের সহিত আমার লীলা হইবে?" তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এ প্রকার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে ও এ-প্রকার পরিকল্পনার কথা যেন চিন্তাও না করে—যদি তাঁহার প্রতি তাঁহার (মুরারী) কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে। মুরারী অঝোরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও প্রভু চরণ সেই অশ্রুজলে সিক্ত করিলেন। প্রভু মুরারীকে তাঁহার আলিঙ্গন হইতে সহজে ছাড়িতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর জীবনী লেখক শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন যে সৌভাগ্য ছিল মুরারীর, যাহা শ্রীলক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তও প্রার্থনা করেন।

চাঁদকাজীকে দমনকালে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন মুরারী, এই চাঁদকাজী ছিলেন তদানীন্তন কালের মুসলমান শাসনকর্ত্তা যিনি এক ভক্তের সঙ্কীর্ত্তন কালে ব্যবহার যোগ্য মৃদঙ্গ ভঙ্গ করেন ও কীর্ত্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি অন্যান্য ভক্তগণ সহ খুব বিলাপ করিয়াছিলেন এবং এই হৃদয় বিদারক ঘটনার পর প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আগমন করিলে তিনি শচীমাতাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গমন করিয়াছিলেন; সেখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত স্তবস্তুতি পাঠ করিতে বলেন ও তাহা শ্রবণ করিয়া খুব প্রশংসা করেন। প্রতি বৎসর তিনি অন্য ভক্তসঙ্গে পুরীতে গমন করিয়া সেখানে মহাপ্রভুর সহিত প্রায় চারিমাস কাল কাটাইতেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাবলীতে অংশ গ্রহণ করিতেন, যথা মহাপ্রভু পরিচালিত শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতেও।

শ্রীশিবানন্দ সেন

শ্রীশিবানন্দ সেন ২৪ পরগণা জেলার কুমারহট্ট বা হালিসহর নিবাসী ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্ত। তথা হইতে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন (যাহা শ্রীকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরে অদ্যাপি বর্তমান)। তাঁহার পুত্র পরমানন্দ (পুরী দাস) 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় ১৭৬ শ্লোকে— "পুরা বৃন্দাবনে বীরা দূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিণায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকা মম।।"—যিনি ব্রজলীলায় বীরাদূতী গোপিকা, তিনিই গৌরলীলা পুষ্টির জন্য শিবানন্দ সেন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইভাবে নিজ পিতৃপরিচয় দিয়াছেন। ইনি প্রতি বর্ষে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া যাতায়াত ব্যয় বহন ও তত্ত্বাবধানপূর্বক মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে লইয়া যাইতেন। ইঁহার তিন পুত্র—চৈতন্য দাস, রাম দাস ও পরমানন্দ (কবি কর্ণপুর)। কর্ণপুরের দীক্ষা গুরুদেব (ইঁহার গুরু পুরোহিত) শ্রীনাথ পণ্ডিত (ইনি কাঁচড়াপাড়া নিবাসী) মহাপ্রভু কৃপাপাত্র ছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণসেবা দেখিয়া ত্রিভুবন তাঁহার বশে ছিল।

কুমারহট্ট বা হালিশহরে যেখানে শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্রীপাট বিদ্যমান সেই হালিসহরে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ আবির্ভূত হওয়ার সুবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানের মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে ভক্তগণও মৃত্তিকা লইতে থাকায় এক পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়—বর্তমানে ইহা 'চৈতন্য ডোবা' নামে সুবিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক শ্রীমায়াপুর নদীয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলে শ্রীবাসপণ্ডিত নিজ পরিবার লইয়া চলিয়া গিয়া এই কুমারহট্টে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেন প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরে এখনও সেবিত হইতেছেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীখঞ্জ ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি গৌরভক্তগণও এই কুমারহট্টে বাস করিতেন।

বৈদ্যকুলকে ধন্য করিবার জন্য শিবানন্দ সেনের মত বৈষ্ণবের এই কুলে আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করিতে থাকাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রা কালে এই ক্ষেত্রে আসিতেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূরণ করিয়া সেই গৌড়ীয় ভক্তগণকে পুরীতে আনয়ন, তাঁহাতের যাতায়াত ব্যয়, আহার, বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান শ্রীশিবানন্দের কৃত্য ছিল।

'ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সঙ্গে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে।।
চলিলা মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লৈয়া আপ্তগণ।'

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।৫, ১৫

'শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান।।
সবার সর্বকার্য্য করেন, দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে ওড়িয়া পথের সন্ধান।।'

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৯-২০

শ্রীশিবানন্দ সেন উড়িষ্যার সমস্ত পথঘাট বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। নির্দিষ্ট পথ ও নদী ঘাটের যাত্রিগণের প্রদেয় 'কর' প্রদানের ব্যবস্থা (ঘাটি) সমাধান তিনিই করিয়া যাত্রিগণকে নিশ্চিন্তে লইয়া যাইতেন।

তৃতীয় বৎসরে গমনকালে শিবানন্দ সেন তাঁহার পত্নী ও পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসকে লইয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পুরী গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে—

'শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।।
শিবানন্দের বালক, নাম চৈতন্যদাস।
তিঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস।।

* * *

শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি' দেন সবারে বাসস্থান।।
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দরশনে।।'

—মঃ ১৬।২২-২৩, ২৬-২৭

গৃহস্থগণের কুটুম্ব ভরণের জন্য সঞ্চয় করিবার লৌকিক কর্তব্য বুঝাইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে তাঁহার অতি প্রিয় চট্টগ্রামবাসী অত্যন্ত উদার স্বভাব বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ব্যয়বাহুল্য স্বভাবকে সঙ্কোচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক রূপে (সরখেল রূপে) নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

'শিবানন্দ সেন কহে খরিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান।।
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে।
সেই দিন ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে।।
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়।।
ইহার ঘরের আয় ব্যয়, সব তোমার স্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে।।'

—চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৩-৯৬

শ্রীশিবানন্দ সেনের সহিত আগমনকারী একটি কুঁকুরের অলৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জানাইয়াছেন যে—পুরীর পথে আসিতে নদীপার হইবার কালে ওড়িয়া মাঝি কুকুরকে নৌকায় চড়াইতে অস্বীকার করায় শিবানন্দ সেন কুকুরটির জন্য দশ পণ কৌড়ি দিয়া পার করাইয়াছিলেন। সেবক কোন একদিন কুকুরকে খাদ্য দিতে ভুলিয়া গেলে এবং কুকুরকে খুঁজিয়া না পাইয়া শিবানন্দ দুঃখী হইয়া উপবাসী ছিলেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত অবস্থায় নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া জগন্নাথ দর্শনাদি করিলেন; অতঃপর প্রসাদ সেবন করিবার পর সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। পরদিবস ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে কুকুরটিকে মহাপ্রভুর নিকট দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে কুকুরটিকে নারিকেল প্রসাদ দিয়া "কৃষ্ণ" "হরি" কহ—এইরূপ বলিলে কুকুরটি "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" উচ্চারণ সহকারে প্রসাদ পাইতে লাগিল। শিবানন্দ সেন কুকুরটিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সদৈন্যে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ঘটনাটির পর কুকুরটি অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কুকুরটি সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

"আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা।।
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাইয়া করিলা মোচন।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ১।৩২-৩৩

সে সময়ে মুলুক বিভাগ করিয়া এক এক স্থানে যমন-রাজদিগের তহশিল কাছারি ছিল, 'অম্বিকা' (বর্দ্ধমান জেলায় কালনা নগরের সংলগ্ন এক পল্লী বিশেষ) নামক স্থানে একটি মুলুক ছিল। এই স্থানটিকে তখন 'অম্বুয়া মুলুক' বলা হইত, সেই স্থলে 'নকুল ব্রহ্মচারী' নামে এক পরম বৈষ্ণব থাকিতেন। তাঁহার গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈলে তাহার হৃদয়ে মহাপ্রভুর আবেশ হয়। সে জন্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে তাঁহার গ্রহগ্রস্তের ন্যায় হাসেন, কাঁদেন, নাচেন ও হুঙ্কার করেন। মহাপ্রভুরই মত তাঁহার কান্তি ও প্রেমাবেশ প্রকটিত হইল। ব্রহ্মচারী যাঁহাকেই দেখেন তাঁহাকেই বলেন,—'কহ কৃষ্ণনাম'। তাঁহাকে সকল দিক হইতে লোকজন দেখিতে আসিতে লাগিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া শিবানন্দ সেন মনে সন্দেহ লইয়া আসিলেন। পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় দূরে অবস্থান করিয়া বিচার করিলেন 'যদি নিজেই আমাকে ডাকিয়া পাঠান ও আমার ইষ্ট-মন্ত্র কি তাহা বলিয়া দেন, তবে জানিব তাঁহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের আবেশ হইয়াছে। অসংখ্য লোকের সংঘট্ট, তাহার মধ্যে নকুল ব্রহ্মচারী 'শিবানন্দ', 'শিবানন্দ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। লোকজন শিবানন্দের খোঁজ করিল, শিবানন্দ নকুল ব্রহ্মচারী নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন।

'ব্রহ্মচারী বলে—তুমি করিলা সংশয়।
এক-মনা হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয়।।
'গৌরগোপালমন্ত্র' তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করিয়াছ অন্তর।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩০-৩১

সাক্ষাৎ দর্শন প্রদান করিয়া নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইয়া এবং প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্মুখে 'আবির্ভূত' হইয়া মহাপ্রভু লোকসমূহ নিস্তার

করিলেন। (১) শ্রীশচীর গৃহ-মন্দিরে, (২) শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তন-স্থলে, (৩) শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে কীর্তনস্থলে এবং (৪) শ্রীরাঘব ভবনে—এই চারিটি স্থানে মহাপ্রভু নিত্য 'আবির্ভাব' প্রকটিত করিতেন।

শিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন এক বৎসর মনে উৎকণ্ঠা লইয়া একলাই মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া দুইমাস নিকটে রাখিয়া গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিয়া বলিয়া দিলেন, এ বৎসর যেন গৌড়দেশ হইতে কেহ না আসেন, কারণ এ বৎসর তিনি স্বয়ংই পৌষমাসে গৌড়দেশে যাইবেন ও শ্রীঅদ্বৈতাদির সহিত মিলিত হইবেন। আর শিবানন্দকে বলিতে বলিলেন, এই পৌষমাসে আচম্বিতে তিনি তাঁহার নিকট আসিবেন। শ্রীজগদানন্দ সেইস্থানে আছেন, তিনি মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিবেন। শ্রীকান্ত আসিয়া এই সংবাদ পরিবেশন করিলে ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য যাইতে উদ্যোগ লইতেছিলেন, রহিয়া গেলেন। শিবানন্দ, জগদানন্দ আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পৌষ মাস আসিল, তথাপি আসিতেছেন না দেখিয়া দুইজনে দুঃখিত হইলেন। এমন সময় হঠাৎ প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (নৃসিংহানন্দ) সেই স্থানে আসিয়া পড়িলেন, তাঁহাদিগকে দুঃখী দেখিয়া কারণ জানিতে চাহিলে তাঁহারা সব বলিলেন। তাহা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে আনাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর অলৌকিক প্রভাব তাঁহাদের জানা ছিল। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী দুই দিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিয়া দেখিলেন মহাপ্রভু পানিহাটিতে আসিয়াছেন, পরদিন মধ্যাহ্নে শিবানন্দ সেনের গৃহে আসিয়া পৌঁছাইবেন। কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া তিনি শিবানন্দকে রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। নৃসিংহানন্দ প্রাতঃকাল হইতে বহুপ্রকার ভোগরন্ধন করিয়া শ্রীজগন্নাথ, শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনৃসিংহদেবের তিনটি পৃথক ভোগের ব্যবস্থা করিয়া ভোগ নিবেদনের পর ধ্যান করা মাত্র মহাপ্রভু আসিয়া তিনটি ভোগই গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট কিছুই থাকিল না। তাহা দর্শন করিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী আনন্দে বিহ্বল হইলেন। যদিও জগন্নাথ-নৃসিংহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে তত্ত্বগত ভেদ নাই, তথাপি ইষ্ট নিষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'নৃসিংহদেব আজ উপবাসী রহিলেন'। শিবানন্দ সেন ঐরূপ বলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী বলিলেন—

"তিনজনের ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ২।৭১

তাহা শুনিয়া শিবানন্দের সংশয় হইল। শিবানন্দের দ্বারা ভোগসামগ্রী আনাইয়া পুনরায় রন্ধন করিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহদেবকে ভোগ দিলেন। বর্ষান্তরে যখন শিবানন্দ ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে আসিলেন, মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণের সম্মুখে নৃসিংহানন্দের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইলে ভোজন।
কভু নাই খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ২।৭৭

ভক্তগণ উহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলে এবং শিবানন্দ সেনের সন্দেহ দুর হইল। শিবানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপার ইহা আরও এক নিদর্শন।

পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও শিবানন্দ সেনের প্রতি অশেষ কৃপা ছিল। হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের পর মহাপ্রভুর প্রেমবিকার রাত্রিদিনে অধিকভাবে প্রকটিত হইল। প্রতি বৎসরের মত সেই বৎসরও গৌড়দেশের ভক্তগণ পুরীতে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। ভক্তগণ পুরীতে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। ভক্তগণ নবদ্বীপ আসিয়া মিলিত হইলেন। মহাপ্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণের সহিত পুরী যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ সেন পত্নী ও তিনপুত্রকে লইয়া চলিলেন। উড়িষ্যার পথের অভিজ্ঞতা থাকার জন্য শিবানন্দ সেন সকলকে সুখে লইয়া যাইতেন এবং ঘাটি সমাধান করিতেন। ঘাটি সমাধান করিয়া সকলকে ছাড়াইয়া শিবানন্দ সর্বশেষ আসিতেন। সেইবার সব কিছু সমাধান করিয়া শিবানন্দের আসিতে অনেক বিলম্ব হইলে গ্রামের ভিতরে বাসস্থান না পাইয়া এক বৃক্ষতলে ভক্তগণ অবস্থান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রাকৃত ব্রজবালক বেশে যেন ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন এইরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—'তিনপুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল। 'ভোকে মরি' গেনু মোরে বাসা না দেওয়াইল।' নিত্যানন্দের অভিশাপ শুনিয়া শিবানন্দের পত্নী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ ঘাটি সমাধান করিয়া ফিরিয়া আসিলে অভিশাপ-হেতু ক্রন্দনরতা পত্নীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর

পাদপদ্ম সন্নিধানে শিবানন্দ উপনীত হইলে নিত্যানন্দ প্রভু পদাঘাত করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া পদাঘাতচ্ছলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও দুর্লভ পাদপদ্ম শিবানন্দ সেনের মস্তকে স্থাপিত হইল। শিবানন্দ সেন নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঘাতরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং শীঘ্র গোয়ালার ঘরে যাইয়া বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানে আনিয়া হৃষ্টচিত্তে শ্রীশিবানন্দ স্তুতি করিলেন,—

"আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্যফল দিলা।।
শাস্তিচ্ছলে কৃপা কর,—এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা?
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
সে চরণ স্পর্শ পাইলা মোর অধম তনু।।
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ১২।২৭-৩০

শিবানন্দের স্তব শুনিয়া নিত্যানন্দ প্রভু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিত্যানন্দের সব আচরণই বিপরীত প্রকৃতির, ক্রুদ্ধ হইয়া লাথি মারিয়া তাহার হিত সাধনই করেন। ইহাই বুঝানো হইতেছে যে নিত্যানন্দের (গুরুর) ক্রোধাভাসই প্রচ্ছন্ন পরম কৃপা ও নিত্যকল্যাণ সূচক।

এদিকে শিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন তাঁহার যে মাতুল শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বলিয়া খ্যাত তাঁহাকে নিত্যানন্দ গোসাঞি মস্তকে পদাঘাত করায় অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া একাকী দ্রুতপদে পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া পেটাঙ্গি (জামা) গায়ে থাকা অবস্থায় মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিলে সেবক গোবিন্দ তাঁহাকে শাসন করিয়া আগে পেটাঙ্গি খুলিতে বলিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু শ্রীকান্তের মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ আস্যাছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক, যাতে ইহার সুখ।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ১২।৩৮

"দুঃখ পাঞা আসিয়াছে" মহাপ্রভুর এই বাক্য শুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন "মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ"। তিনি স্বীয় মনোভাব-জ্ঞাতা মহাপ্রভুকে অন্তর্যামী-জ্ঞানে পদাঘাত সংবাদ গোপন করিলেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ সকলে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। শিবানন্দ সকলকে বাসাঘর দেওয়াইলেন ও সকলকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইলেন।

শিবানন্দ তিনপুত্রকে লইয়া মহাপ্রভুর দর্শন করিলে পর শিবানন্দ সেনের সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় মহাপ্রভু প্রভূত কৃপা করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নাম 'পরমানন্দ' বলিয়া সেন জানাইলেন। পূর্ব্বে যখন শিবানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন—

"এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিহ তাহার।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ১২।৪৭

ঘরে যাওয়ার পর মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম হইলে প্রভুর আজ্ঞায় নাম রাখিলেন—'পরমানন্দ দাস'।

"প্রভু আজ্ঞায় ধরিলা নাম—'পরমানন্দ-দাস'।
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ১২।৪৯

সেই বালককে শিবানন্দ যখন মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আনিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ তাহার মুখে ধরিলেন। সগোষ্ঠী শিবানন্দের ভাগ্যের তুলনা মেলা ভার। তিনি গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন—

"শিবানন্দের 'প্রকৃতি', পুত্র—যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ১২।৫৩

এক বৎসর শিবানন্দ তাঁহার পত্নী ও কনিষ্ঠ পুত্র পুরীদাসকে লইয়া রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আগমন করিলে মহাপ্রভু বালকাবস্থা-প্রাপ্ত সেই পুরীদাসকে 'কৃষ্ণ কহ' 'কৃষ্ণ কহ' এইবার বার বার বলিলেও তাহাকে কিছুতেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলেন না, শিবানন্দ সেনও অনেক যত্ন করিয়া উচ্চারণ করাইতে

পারিলেন না। মহাপ্রভু বলিলেন, আমি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত জগতে সকলকে কৃষ্ণনাম বলাইলাম, কিন্তু ইহাকে কেন পারিলাম না? এই কথা স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করায় স্বরূপ পুরীদাসের মৌনাবলম্বনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, আপনি বালককে কৃষ্ণনাম মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, সেই জন্য মন্ত্র লাভ করিয়া তাহা মুখে প্রকাশ না করিয়া মনে মনে জপ করিতেছে, এই আমার অনুমান। প্রভুপাদ অনুভাষ্যে জানাইয়াছেন—"শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্তমন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না; শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছি।" অন্য একদিন মহাপ্রভু পুরীদাসকে 'পড়, পুরীদাস' বলিয়া আদেশ করিলে, বালক গোপীহৃদয়ভূষণ কৃষ্ণের জয়-সূচক এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসোমাহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি।।"

[যিনি—শ্রবণ যুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।]

সাত বৎসর বয়সের শিশু অধ্যয়ন বিনা ঐ প্রকার শ্লোক উচ্চারণ করিল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী গুরু যদুনন্দন আচার্য্যকে তাঁহারই অপর শিষ্য বিগ্রহার্চ্চন ত্যাগ করায় তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য রঘুনাথকে লইয়া যাইতে যাইতে অর্দ্ধপথে রঘুনাথ গুরুর চরণে নিবেদন করিলেন যে, 'আপনি ঘরে যান, আমি সেই ব্রাহ্মণকে সাধ্য-সাধনা করিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি।' এই ছলে বুদ্ধিমান্ রঘুনাথ সুযোগ গ্রহণ করিয়া গুরুর নিকট কৃষ্ণভজনের জন্য বিদায়াজ্ঞা লইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিলেন। পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদার রঘুনাথকে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া দশজনকে শিবানন্দ সেনের নিকট পাঠাইলেন। তাহারা রঘুনাথের সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। চাতুর্মাস্যের শেষে শিবানন্দ সেন ভক্তগণ সহ গৌড়ে ফিরিয়া আসিলে পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদার জানিতে পারিলেন যে, রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি ও তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিতেছে। ভক্তগণ পুনরায় যখন পুরীযাত্রা করেন, রঘুনাথের মাতাপিতা দুঃখিত হইয়া রঘুনাথের সেবার জন্য চারিশত মুদ্রা, দুই

ভৃত্য ও এক ব্রাহ্মণ শিবানন্দ সেনের সহিত পুরীতে পাঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঐ সব নিজের জন্য অঙ্গীকার করিলেন না। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর তাহা উল্লেখ করিয়া রঘুনাথের মহিমা প্রচুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহ হইতে মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস মন্দিরে আগমন করেন, সে সময় শ্রীবাস ভবনে প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গসনে।।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১৮

ঐশ্বর্য্য বিত্ত প্রভৃতির সদ্ ব্যবহার শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবার দ্বারাই হয়। শ্রীশিবানন্দ সেনের আচার-ব্যবহার হইতে জানা যায়, তাঁহার ভূ-সম্পত্তির ব্যবহার এইভাবেই হইয়াছিল। তিনি যথা সর্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ভক্তগণের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যাবতীয় পরিকর, পুত্র ও ভৃত্য সকলেই শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেনের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঠিক সন, তিথি এবং মাতা-পিতা ও পত্নীর নাম কিছুই জানা যায় না।

শ্রীপরমানন্দ পুরী

"পুরী পরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা"—যিনি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীউদ্ধব, তিনি শ্রীপরমানন্দ পুরীরূপে গৌরলীলায় অবতীর্ণ (গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ১১৮ শ্লোকঃ) "ত্রিহুতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ। নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস।।" চৈঃ ভাঃ আদি ২।৪৩

তিনি ত্রিহুত দেশে আবির্ভূত। (ত্রিহুত মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ছাপরা প্রভৃতি ত্রিহুত জেলার মধ্যে। সুতরাং ত্রিহুত বিহার প্রদেশের অন্তর্গত) প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী "ত্রিহুত দেশোৎপন্ন বিপ্র" এইরূপ তাঁহার পূর্বপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের সন-তিথি বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ইঁহার দীক্ষাগুরু।

"মাধব পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রেমরসময়।।"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।১৭৮

ইনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম মর্য্যাদার পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় নবম পরিচ্ছেদে শ্রীপরমানন্দ পুরীকে ভক্তি কল্পতরুর মধ্যম মূলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার (ভক্তিকল্পতরুর) প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ।

"শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৮।১১

অতএব ভক্তিকল্পতরুর স্কন্ধ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহতীর্থ, সুখানন্দ পুরী—এই নয়জন ভক্তিকল্পতরুর নয়টি মূল তরুকে নিশ্চল করিয়াছেন। এই নয়টি মূলের মধ্যমূল শ্রীপরমানন্দ পুরী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মালী হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ভক্তিকল্প তরুর স্কন্ধ হইয়াছেন—ইহাই পরম রহস্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে ঋষভ পর্বতে আসিয়া পৌঁছিলে সে স্থানে তাঁহার সহিত শ্রীপরমানন্দ পুরীর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। পরমানন্দ পুরী তখন ঋষভ পর্বতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিতেছিলেন। (ঋষভ পর্বত—'দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলার একপ্রান্তে। মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে 'আনাগড়মলয় পর্বত' কুটকাচলের উপবনে যে-স্থলে ঋষভদেব দাবানলের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে 'পাল্‌নি হিল' নামে খ্যাত।' —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। স্থানীয় নাম—বরাহপর্বত) শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীপরমানন্দ পুরীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলে, পুরী গোস্বামী পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিন দিন ধরিয়া কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে কাটাইয়া পুরী গোস্বামী জানাইলেন যে তিনি পুরুষোত্তম ধাম দর্শনান্তে গৌড়ে গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে গৌড়দেশ হইতে পুনরায় নীলাচলে আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছা সেতুবন্ধ হইতে সত্ত্বর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

প্রভু কহে—তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে।।
তোমার নিকটে রহি—হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয়।।
এতবলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা।।
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৭২-৭৫

শ্রীপরমানন্দ পুরী ঋষভ পর্বতে কয়েকদিন থাকার পর গঙ্গাস্নান করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীজগদানন্দাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক কালাকৃষ্ণদাস মারফৎ নবদ্বীপে প্রেরিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণ শ্রীশচীমাতার অনুমতিক্রমে নীলাচল যাইতে উদ্যোগী হইলেন। সেই সংবাদ শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ অবগত

হইয়া শ্রীমায়াপুরে শচীমাতার গৃহে অবস্থানকালে শচীমাতার হস্তে ভোজনাদি করিয়া, মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার উৎকণ্ঠায় ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই গৌড়দেশ হইতে পুরী আসিলেন। মহাপ্রভু পুরীর চরণ বন্দনা করিলে, তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয়।।
পুরী কহে,—তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হইতে চলি' আইলাঙ্ নীলাচল-পুরী।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৯৭-৯৮

শ্রীপুরীপাদের জন্য মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ভবনে একটি নির্জন ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সেবার জন্য একটি সেবকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্যকালে যে সমস্ত পার্ষদ ভক্তগণের সহিত অবস্থান করিতেন তাঁহাদের মধ্যে এই পুরীপাদ ছিলেন অন্যতম। পুরীগোস্বামী পূর্বে কাশীমিশ্র ভবনে থাকিতেন, পরে তিনি জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমে একটি মঠে আসেন। পুরীপাদ একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন, কিন্তু তার জল ভাল ছিল না—এ জন্য তাঁহার মনে দুঃখ ছিল। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ভঙ্গীক্রমে পুরীকে কূপের জলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পুরী বলেন—"জল হৈল যেন ঘোর কর্দ্দমের রূপ" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৩৭)। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থনা করেন—

"জগন্নাথ মহাপ্রভু মোরে এ বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৪২)

মহাপ্রভুর সেই প্রার্থনায় ভোগবতী গঙ্গা অলক্ষ্যে সেই কূপের মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ দেখিলেন কূপ নির্মল জলে পূর্ণ।

"সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিল কূপের ভিতরে।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।২৪৬)

ভক্তগণ কূপটিকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু সত্বর সেখানে আসিয়া নির্মল জল দেখিয়া বলিলেন,—

"শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান।
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাস্নান ফল।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নির্মল।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।২৫২)

মহাপ্রভু স্বয়ং কূপের জলে স্নান ও কূপের জল পান করিলেন। পুরীগোস্বামী ছিলেন প্রভু অন্ত প্রাণ, মহাপ্রভুরও প্রাণ সেই সেই পুরী গোস্বামী। পুরীপাদ প্রত্যহ প্রভুকে দর্শন করিয়া অতঃপর অন্য কৃত্যাদি করিতেন। প্রভু বলিতেন—

"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞ্রির প্রীতে।।
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞ্রিরে মাত্র।
সেই হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র।।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।২৫৫, ২৫৭)

পুরীপাদকে দূর হইতে দেখিবা মাত্র মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া—

"আজি ধন্যলোচন, সফল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব ধর্ম।।
প্রভু বলে,—"আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।১৭১-১৭২)

এইভাবে ভগবান মহাপ্রভু ভক্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। প্রকৃতি সম্ভাষণহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ ও নিজগৃহে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন—সে জন্য দুঃখী হরিদাস তিনদিন উপবাসী রহিলেন। স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণ তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া অনুরোধ করিতে যাইয়া তীব্র

ভর্ৎসনার মুখে পতিত হন। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর দর্শন না পাইলে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিলে ভক্তগণ শেষ পর্য্যন্ত পরমানন্দ পুরীকে প্রার্থনা জানান যাহাতে তিনি এ-বিষয়ে কিছু করেন; যেহেতু মহাপ্রভু নিজ গুরুদেবের গুরু-ভ্রাতারূপে পরমানন্দ পুরীকে গুরুর ন্যায় পূজ্য বুদ্ধি করেন, সেই কারণে ছোট হরিদাসের জন্য পরমানন্দ পুরী নিবেদন করিলে যদি বা কিছু সুরাহা হয়—এই প্রত্যাশায়। তাহাতে মহাপ্রভু পুরীর বাক্যকে অমর্য্যাদা না করিয়া হরিদাসকে গৃহে প্রবেশের আদেশ দান করিয়া নিজে স্বয়ং আলাল নাথে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মহাপ্রভু চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ অপ্রস্তুত হইয়া মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া আলালনাথে গমন হইতে নিবৃত্ত করিলেন ও বলিলেন ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তাঁহার ইচ্ছাতে প্রতিবন্ধকতা করা উচিত নহে। গুরুদেবের ভ্রাতা যে গুরুবৎ পূজ্য সেই শিক্ষা মহাপ্রভু নিজ আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিলেন। গুরুবর্গের অমর্য্যাদা করা প্রতিকূল।

'মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারো সহিতে।'

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৬)

গুণ্ডিচামার্জন লীলা, রথযাত্রা উৎসব, শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি প্রভৃতি লীলাতে শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ উৎসবেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরথযাত্রার পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে এবং স্বরূপ দামোদর, শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি দশজন সন্ন্যাসীকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া একমাস ধরিয়া মহাপ্রসাদাদি ভোজন করাইয়াছিলেন। (দশজন সন্ন্যাসী, যথা— (১) শ্রীপরমানন্দ পুরী, (২) শ্রীস্বরূপ দামোদর, (৩) শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, (৪) শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, (৫) শ্রীবিষ্ণুপুরী, (৬) শ্রীকেশবপুরী, (৭) শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, (৮) শ্রীনৃসিংহতীর্থ, (৯) শ্রীসুখদানন্দ পুরী ও (১০) শ্রীসত্যানন্দ ভারতী। একমাস নিমন্ত্রণে মহাপ্রভুকে পাঁচদিন, শ্রীপরমানন্দ পুরীকে পাঁচদিন, স্বরূপ দামোদরকে চারদিন ও অন্যান্য সন্ন্যাসীকে দুইদিন করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা করাইয়া ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ও পুরীবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীপরমানন্দ পুরীকে পূজ্যবুদ্ধিতে মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে সর্বাগ্রে শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ

ভারতী প্রভৃতি গুরুবর্গের কপালে চন্দন লেপন করিয়া মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; গুণ্ডিচা-মার্জন লীলায় গুরুবর্গকে জল আনয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই, ভক্তগণ-আনীত জলের দ্বারা মহাপ্রভু ও গুরুবর্গ গুণ্ডিচামন্দির ধৌতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জলভরি।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১২।১০৯)

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধানে দেখা যায়—শ্রীপরমানন্দ পুরী "গোবিন্দ বিজয়" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গপুরী

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডরপুর বা পণ্ডরপুর মুম্বইপ্রদেশে শোলাপুর জিলার অন্তর্গত মহকুমা,—শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল সোজা পশ্চিমে। এখানে বিঠ্ঠল্ বা বিঠোবাদের ঠাকুর আছেন। তিনি—চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি। পঞ্চদশ-শক-শতাব্দীতে এখানে 'তুকারাম' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। পাণ্ডরপুর নগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরঙ্গপুরীর মিলন হয়। পাণ্ডরপুরে একজন বিপ্র মহাপ্রভুকে তাঁহার গৃহে খুব প্রীতির সহিত বহুবিধ উপচারে সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অপর বিপ্রগৃহে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর অবস্থান-সংবাদ জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু তাঁহার দর্শনে সেখানে গমন করিলেন। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেই তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক বিকারাদি দেখা দেয়। তাহা দেখিয়া শ্রীরঙ্গপুরী বিস্মিত হইয়া 'উঠহ শ্রীপাদ' বলিলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীরঙ্গপুরী বিচার করিলেন ইনি নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্বে শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্য্যন্ত একক কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই ঐকান্তিক শ্রীরাধা-দাস্যমূলে বিপ্রলম্ভরসে কৃষ্ণপ্রেম অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেননা "ভক্তকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর"—শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত প্রিয় সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতরুচি ভক্তেরই এই কৃষ্ণপ্রেমেতে অধিকার।

দুইজনে রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করিতে করিতে এক সপ্তাহ কাটাইলেন। কথা প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কথা শ্রীরঙ্গপুরী জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু জানান তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ। শ্রীরঙ্গপুরী জানাইলেন,—তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সহিত নদীয়ায় আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণকালে শ্রীশচীদেবীর পাচিতা অপূর্ব মোচার ঘণ্ট খাইয়াছিলেন। শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যে যেন জগন্মাতা, মহাপতিব্রতা ব্রাহ্মণী। সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইতে পুত্রসম স্নেহ করেন। তাঁহার এক যোগ্যপুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম 'শঙ্করারণ্য'। এই তীর্থে তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, পূর্বাশ্রমে তিনি মোর জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র পূর্বাশ্রমে আমার পিতা। এই মত দুইজন ইষ্টগোষ্ঠী করিবার পর শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা দর্শন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

"মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি রসময়।
যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়।।
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী আদি যত।
মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত।।"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২২৭২-৭৩

কাহারও মতে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল এবং শ্রীরঙ্গপুরী জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রপুরী

শ্রীরামচন্দ্রপুরীর পূর্বাশ্রমের মাতা-পিতার পরিচয় ও জন্মস্থান সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি যে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য, এই পরিচয়-মাত্র পাওয়া যায়।

নীলাচলে স্ব-ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া লীলা করিতেছিলেন। এমন সময় এই রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি মহাপ্রভু সমীপে আগমন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া ইঁহাকে মহাপ্রভু এবং পরমানন্দ পুরী সম্মান করিলেন, সেখানে অবস্থানরত পরমানন্দ পুরী তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন আর পুরী-গোসাঞি তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইলেন। তিনিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'কৃষ্ণ' স্মরণ করিলেন। সন্ন্যাসিগণকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা "ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায়ঃ" বলিয়া কৃষ্ণস্মরণ করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে জীবকে আশীর্বাদ ও নমস্কার করিবার বিধি নাই। তিনজনে কিছু সময় ইষ্টগোষ্ঠী করিবার পর মহাপ্রভুর পার্ষদ জগদানন্দ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভিক্ষার জন্য তিনি জগন্নাথের প্রসাদ আনান, নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভোজন করিলেন। ভিক্ষার পর জগদানন্দকে অবশেষ প্রসাদ ভক্ষণ করিবার জন্য বলিয়া নিজেই আগ্রহ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন ও পুনঃ পুনঃ খাওয়াইয়া এইবার যথার্থ শুদ্ধ বৈরাগ্যবান্ গৌরগণের বৈরাগ্যহীন জ্ঞানে নিন্দা করিয়া বলিলেন,—

"শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
'সত্য' সেই বাক্য—সাক্ষাৎ দেখিনুঁ এখন।।
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা করে ধর্মনাশ।
বৈরাগী হঞা এত খায়, বৈরাগ্যের 'ভাস'।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।১৩-১৪

শ্রীরামচন্দ্র পুরীর স্বভাব এই যে, আগ্রহ করিয়া খাওয়াইয়া পরে নিন্দা করে। শ্রীরামচন্দ্রপুরীর পূর্ব বৃত্তান্ত এই যে—তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ অন্তর্ধান কালে রামচন্দ্রপুরীর আগমন হইয়াছিল। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন রত থাকিয়া 'মথুরা না পাইনু' বলিয়া দুঃখে ক্রন্দন করিতেছিলেন।

সেই সময় উপস্থিত শুষ্কজ্ঞানী রামচন্দ্র পুরী গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ভয় না করিয়া বলিলেন—

"তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।১৯

তাহা শুনিয়া মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া 'দূর, দূর পাপী' বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। মাধবেন্দ্র বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকৃপা পাইলাম না, মথুরাও পাইলাম না বলিয়া নিজ দুঃখে মরিতেছি, আর এই মূর্খ আমাকে জ্বালা দিতে আসিল। তুই আমাকে মুখ দেখাবি না, যেখানে ইচ্ছা হয় চলিয়া যা'। তোকে দেখিয়া মরণ হইলে আমার অসদ্গতি হবে। কৃষ্ণ না পাইয়া আপন দুঃখে জ্বলিতেছি, আর এই মূর্খ আমাকে 'ব্রহ্ম' উপদেশ দিতে আসিল।" রামচন্দ্রপুরী নিজগুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর দেখিয়াও লৌকিক-বিচারক্রমে প্রাকৃত-অভাব জন্য শোককাতর জানিয়া নির্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুরুকে অবজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপেক্ষার জন্য রামচন্দ্র পুরীর শুষ্কজ্ঞান- বাসনা জন্মিল ও তাহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা করিতে থাকিলেন। কারণ শুষ্ক-ব্রহ্মেতে কৃষ্ণের সম্বন্ধ নাই, সে জন্য নিষ্ঠার সহিত পরনিন্দায় আসক্তি আসিল।

অপরদিকে অপর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে সেবা করিতে থাকেন, স্বহস্তে মলমূত্রাদি মার্জন করেন, নিরন্তর কৃষ্ণনাম স্মরণ করেন ও কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করাইতে থাকেন। তাহার পরে পুরীপাদ ঈশ্বরপুরীকে আলিঙ্গন করিয়া 'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন' বলিয়া বর দিলেন; সেই হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী 'প্রেমের সাগর' হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী সর্বনিন্দাকারী হইলেন। এই দুইজনে মহতের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী হইয়া রহিলেন। জগদ্গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ ...." শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্ধান করিলেন। এইভাবে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ পৃথিবীতে 'প্রেমাঙ্কুর' রোপণ করিয়া গেলেন আর প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ হইল মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীরামচন্দ্রপুরী নীলাচলে থাকিয়া পরছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সন্ন্যাসিগণ কোথায় থাকেন, কি করেন, কি পরিমাণ ভোজন করেন ইত্যাদি অনুসন্ধান করিতে থাকেন। মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে, তৎকালোচিত প্রথা অনুযায়ী চারিপণ কৌড়ি ধার্য্য ছিল। তাহাতে মহাপ্রভু, কাশীশ্বর ও গোবিন্দ—এই তিনজন প্রসাদ সেবা করিতেন। ভক্তগণ প্রত্যহ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। কেহ যদি গৃহে ভিক্ষা না করাইয়া ভিক্ষার জন্য মূল্য দিতে ইচ্ছা করিতেন, তিনি চারিপণ কৌড়ি প্রদান করিতেন। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন ইত্যাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে ফল হইল এই যে, মহাপ্রভুর যতেক গুণ তাহা স্পর্শও করিতে পারিল না। ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কোথাও ছিদ্র পাইলেন না। সন্ন্যাসী হইয়া যাহারা মিষ্টান্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-বারণ কেমন করিয়া হইবে? মহাপ্রভু কিন্তু গুরুবুদ্ধিতে যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন। যত নিন্দা করিতেন মহাপ্রভু সব কিছু জানা সত্ত্বেও সম্ভ্রম ও আদর প্রদর্শন করেন। একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর গৃহে আগমন করিয়া পিপীলিকা দেখিয়া কিছু বলেন ঃ "রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকা সকল বেড়াইতেছে। অহো! বিরক্ত সন্ন্যাসিদিগেরই এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা।" এই কল্পিত নিন্দা করিলেন। পিপীলিকা তো সর্বত্রই বেড়ায়, দোষ লাগাইবার জন্য বিতর্ক উঠান। জগদ্গুরু আচার্য্যরূপী মহাপ্রভুর ভয় ও সঙ্কোচ হইল। স্বীয় দৈনিক ভিক্ষা-সঙ্কোচন ও গোবিন্দের নিকট তৎপরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন ও তাহার অধিক লইলে এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইলেন। সকল ভক্তগণকে মহাপ্রভুর এই কঠোর আদেশ জানাইয়া দেওয়ায় ভক্তগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একদিন এক বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে গোবিন্দ এক-চৌঠি ভাত, পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন মাত্র অঙ্গীকার করিলেন; ইহাতে সেই বিপ্র খুব দুঃখিত হইলেন। সেই ভাত-ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক পাইলেন, অবশিষ্ট অর্দ্ধ গোবিন্দ পাইলেন। প্রভু ও গোবিন্দ উভয়েই অর্দ্ধ ভোজন করেন, তাহা দেখিয়া ভক্তগণ ভোজন (অন্ন-জল) ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে নিজজন জ্ঞানে অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। এইভাবে কিছু দিন গত হইলে রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভু-সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে যতি-ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান দান করিবার জন্য বলিলেন,—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে 'ইন্দ্রিয়তর্পণ'।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৬২

যদি যথাযোগ্য উদর ভরণ হয় কিন্তু 'বিষয়' ভোগ না করা হয়, তবে সন্ন্যাসীর জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয়—এই বলিয়া মহাপ্রভুকে জ্ঞান দান করিলেন যে সর্বাবস্থায় যুক্তবৈরাগ্যেই সিদ্ধিলাভ হয়। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৬।১৬-১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে—" হে অর্জুন! অনেক ভোজনে 'যোগ' হয় না; একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও 'যোগ' হয় না এবং অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা-ত্যাগ দ্বারাও 'যোগ' হয় না। আহার-বিহার-কর্ম সকল চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণাদি উপযুক্তরূপে নিয়মিত হইলে দুঃখ-নাশক 'যোগ' হয়।"

মহাপ্রভু অমানি-ধর্মের আদর্শ বজায় রাখিয়া দৈন্যোক্তি সহকারে বলিলেন, "আমি অজ্ঞ বালক, আমি আপনার শিষ্য, আমাকে যে শিক্ষা দেন, সে আমার পরম সৌভাগ্য।" রামচন্দ্রপুরী জানিতে পারিলেন ভক্তগণও অর্দ্ধ ভোজন করেন।

একদিন পরমানন্দপুরী প্রমুখ ভক্তগণ মহাপ্রভুকে পরিমিত অন্ন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়া রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব ও ব্যবহারের নিন্দা করিয়া বলেন, রামচন্দ্রপুরী নিন্দুকস্বভাব, তাঁহার কথায় অন্ন ত্যাগ করিয়া কি লাভ হইবে? পুরীর স্বভাব অন্যকে যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াইয়া পুনরায় তাহাকে নিন্দা করে। 'পরস্বভাব কর্ম্মানি ন প্রশংসেন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।' (ভাঃ ১১।২৮।১)—এই শ্লোকে পূর্ববিধি 'প্রশংসা করিবে না' এবং পরবিধি 'নিন্দা করিবে না' দেখা যায়। পূর্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝায় যে, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে; পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না কিন্তু এক্ষত্রে শ্রীরামচন্দ্রপুরী পূর্ববিধি পালন করিয়াছেন, পরবিধি 'অন্যের নিন্দা করিবে না' পালন করেন নাই। সুতরাং রামচন্দ্রপুরী পরবিধির সূত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই। তাঁহার কথায় অন্ন ত্যাগ না করিয়া পূর্বের ন্যায় ভক্তগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সমীচীন। মহাপ্রভু লোকশিক্ষকরূপে বলিলেন, —'রামচন্দ্রপুরীর কথায় রুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই; যতির পক্ষে জিহ্বা-লাম্পট্য অন্যায়, প্রাণরক্ষার জন্য মাত্র আহার গ্রহণ।'

ভক্তগণ মিলিতভাবে বহু যত্নের সহিত সঙ্কল্প পরিত্যাগের চেষ্টা করায় সকলের আগ্রহে মহাপ্রভু চারিপণ কৌড়ির স্থলে দুইপন অর্থাৎ অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন।

অভক্ত বর্ণ-ব্রাহ্মণ ও পাঙ্‌ক্তেয়-ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভুর ভিক্ষা-গ্রহণ-রীতি ছিল এইরূপ—

"অজোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপন।।
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু 'প্রসাদ' আনে, কিছু পাক করে ঘরে।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৮৬-৮৭

[অজোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না।]

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীভগবান আচার্য্য ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে মহাপ্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। কোনপ্রকার সঙ্কোচন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রপুরীকে কখনও লৌকিক মর্য্যাদা প্রদান করেন, কখনও বা তৃণবৎ উপেক্ষাও করিয়াছেন।

"কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায়।।
ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধির অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব—মনোহর।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৯২, ৯৩

অচিন্ত্য ঈশ্বরের সকল আচরণই নিত্য, শিবদ ও সুন্দর।

রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে দিন কত থাকিয়া নীলাচলে ভগবদাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদে ভক্তগণের মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা যেন হঠাৎ পড়িয়া গেল। অতঃপর প্রাকৃত শুষ্ক বৈরাগ্য বিধি ত্যাগ করিয়া গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ সর্বাত্ম দ্বারা প্রভু সন্তোষণে ব্যাপৃত হইলেন; ভক্তগণ পুনরায় মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, স্বচ্ছন্দে সকলে প্রসাদ ভোজন করেন ও মহাপ্রভুও পূর্ববৎ নর্তন-কীর্তন করিতে লাগিলেন।

গুরুকে অবজ্ঞার জন্য গুরুর উপেক্ষা ফলে জীবের বিষ্ণুবিরোধ বা পাষণ্ডিত্ব দেখা দেয়। গুরু উপেক্ষা করিলে এইরূপই ফল হয় ও ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে গিয়া ঠেকে। যদিও মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রপুরীকে গুরুবুদ্ধিতে তাঁহার দোষগ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাহার ফল দ্বারা লোককে শিক্ষা দিলেন, অর্থাৎ অপরাধী রামচন্দ্রের ব্যবহার দ্বারা প্রভু লোকশিক্ষা করাইলেন।

শ্রীরামচন্দ্রপুরীর নীলাচলে আগমন ও তথা হইতে প্রস্থানের বিবরণী সমূহ হইতে শিক্ষণীয় বিষয় এই—

গুরুবৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে ভক্তিসাধন পথে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়। অনর্থযুক্ত জীব দৈবী মায়ায় মোহাবিষ্ট হইলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও মহাজ্ঞানী মনে করিয়া দাম্ভিক হইয়া গুরু-বৈষ্ণবকে সংশোধন ও উপদেশ প্রদানে ধৃষ্ঠতা দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির উন্নতির জন্য সম-আশয় যুক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ বা সেবা করা কর্তব্য। গুরুদেবের সম্বন্ধ ধারণ করেন বলিয়া গুরুদেবের গুরুভ্রাতাকে গুরুবৎ পূজা করা উচিত। তাঁহার আদেশ বা নির্দেশ সমীচিন মনে না হইলেও তাঁহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার বা শাসনবাক্য প্রয়োগ কখনই উচিত নহে। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত শিষ্যগণ সকলে একই পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন তাহা আশা করা যায় না। বাহ্যতঃ গুরুপদাশ্রয়পূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিলেই প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় না। সৎ-শিষ্য গুরুদেবের শাসনকে স্ব-পর কল্যাণকর বলিয়া বোঝেন। পরছিদ্রান্বেষণ বিশেষ-ভাবে বিষ্ণুবৈষ্ণবের নিন্দা বা ছিদ্রান্বেষণ করিলে ভক্তির প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়। পরন্তু সাধক নিজের দোষক্রুটি দেখিবেন, তাহা হইলেই ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। 'যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা।।' গুরুর চরণে অপরাধ হইতেই পরছিদ্রান্বেষণ, পরনিন্দা ও শুষ্কজ্ঞান প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বারাণসীতে মহাপ্রভুর লুকাইয়া থাকার কথা বলিয়াছেন ঃ

রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১০৫

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে জানাইয়াছেন, 'শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শূদ্র চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া থাকিবার কথা অবগত আছেন। রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য, তাঁহার মায়াবাদের প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্তগণের সঙ্গে অন্যত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রপুরী সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সুতরাং যতি-জীবনে সেই মঠে অবস্থানে বহির্জ্জগতে দোষারোপের অবকাশ ছিল না।

শ্রীগোবিন্দ দাস

শ্রীকবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১১৬) উল্লেখিত তালিকা অনুসারে এই সাধুজনটি বৈকুণ্ঠের এক পার্ষদ সেবক শ্রীপুণ্ডরীক। পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থানকালে তিনি ছিলেন মূল সেবক। তিনি একাধারে খাদ্য পরিবেশক, ভাণ্ডারী ও সব কিছু। পূর্বে তিনি মহাপ্রভুর গুরু অভিনয়কারী শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের সেবক ছিলেন, তাঁহার গুরুভ্রাতা কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীরও সেবক ছিলেন। এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণকালে এই দুইজনকে আদেশ করিয়া যান যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহারা যেন তাহার শিষ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেবা করেন। পূর্ব জন্মে ইহারা শ্রীকৃষ্ণের দুইজন সেবক ছিলেন ভঙ্গুর ও ভৃঙ্গার নামে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ১৩৭ এ উল্লেখ অনুসারে। পুরীতে মহাপ্রভুর সেবক-গণের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোবিন্দ এবং অপর তিনজন ছিলেন কাশীশ্বর, রামাই ও নন্দাই যাঁহারা তাঁহার (গোবিন্দের) নির্দেশ মত কাজ করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পর যখন তাঁহারা ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট হইতে তাঁহার নিকট আসেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে সেবকরূপে অঙ্গীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ তাঁহারা, তাঁহার বিচারে নিজ গুরুভ্রাতাবৎ মান্য। কিন্তু যখন শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বুঝাইলেন যে তাঁহার গুরুর আদেশ তখন তিনি মানিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে সেবার সৌভাগ্য দান করিলেন। খাদ্য পরিবেশনাদি ব্যতীত গোবিন্দ মহাপ্রভুকে স্নানাদি ও দেহমর্দ্দনাদি করাইতেন ও করিতেন, কাশীশ্বর বলশালী হওয়ায় মহাপ্রভু পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনে যাইবার কালে ভীড়ের স্পর্শ হইতে বাঁচাইতে দেহরক্ষীর কার্য্য করিতেন এবং রামাই ও নন্দাই গোবিন্দকে সহায়তা করিবার জন্য জল আনয়নাদি অন্যান্য কাজকর্ম করিতেন। তাঁহারাও পূর্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের জল বাহক ছিলেন; পয়োদা ও ভারিদা (গৌ. গ. দী. ১৩৯)।

গোবিন্দ মহাপ্রভু-সংক্রান্ত সব কিছুর ভারপ্রাপ্ত আপ্ত সহায়কের মত কার্য্য করিতেন। তিনি বঙ্গদেশ হইতে আগত ভক্তগণকে যথা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ইত্যাদিকে স্বরূপ দামোদরসহ মাল্যাদি প্রদান প্রভৃতি, হরিদাস ঠাকুরকে দৈনিক ও বিশেষ অনুষ্ঠানাদির মহাপ্রভুর অবশেষ মহাপ্রসাদ সরবরাহ, মন্দির প্রবেশের পূর্বে মহাপ্রভুর পদপ্রক্ষালণের জন্য জলপাত্র বহন, মহাপ্রভুর আদেশ মত দরিদ্রগণকে

ভোজন করান যখন তাহারা ভক্তি প্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিত, উড়িষ্যা হইতে অন্যান্য ভক্তগণ সহ বৃন্দাবন গমন কালে সঙ্গে গমন, কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অভ্যর্থনাদি, অন্যান্য ভক্তজন সহ মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভ, পাণিহাটির রাঘব পণ্ডিতের আনীত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ (যাহা মহাপ্রভু সম্বৎধর ধরিয়া আহার করিতেন), ভক্তগণ প্রদত্ত দ্রব্যাদি যথাসময়ে পরিবেশন ইত্যাদি।

একবার বঙ্গদেশের ভক্তগণ যথারীতি চারিমাস অবস্থানের জন্য নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, সেসময় তিনি তাঁহাদের পরিমুণ্ডা কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেসময় তাঁহারা চরম সময়ে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, সে সংবাদ জানাইলে তাহা বন্ধ করেন। মহাপ্রসাদ সম্মানের পর মহাপ্রভু অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ বিলাস লাভের জন্য গম্ভীরার দ্বারদেশে এমন ভাবে শয়ন করিয়া পড়েন যাহাতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে বা বাহিরে আসিতে পারিবে না। দেহের ব্যাথা ও ক্লান্তি উপশমের জন্য গোবিন্দ আসিলে তিনি ভিতরে প্রবেশে সক্ষম হইলেন না, সে সময় একটু স্থান দিবার জন্য পাশ ফিরিতে বলিলে মহাপ্রভু অতীব ব্যথার অজুহাতে তাহাতে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। প্রভুকে সেবার জন্য ডিঙাইয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। তখন গোবিন্দ একটি বস্ত্রদ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি পদদ্বয়, কোমর প্রদেশ, পৃষ্ঠদেশ এমনভাবে মর্দন করিতে লাগিলেন যাহাতে তিনি দুইদণ্ড (একঘন্টার কিছু কম সময়) পর্য্যন্ত নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু জাগরিত হইলে গোবিন্দ মহাপ্রসাদ সম্মান না করিয়া ঘরের মধ্যে থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। গোবিন্দ অতি বিনীত ভাবে জানাইলেন তিনি যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া রাখায় বাহির হইতে পারেন নাই। যখন তাঁহাকে বলা হইল যেভাবে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল সেইভাবেই বাহির হইল না কেন, গোবিন্দ মনে মনে বলিয়াছিলেন;“ সেবা তো আপনাকেই প্রদান করিতে হইবে, তাহাতে ‘আমার কোনও পাপ বা অপরাধ ঘটেও তাহা হইলেও। আপনাকে সেবাকার্য্য প্রদানে যদি কোটি অপরাধও করিতে হয় তাহা আমি গ্রাহ্য করি না; কিন্তু নিজের সুখ-সুবিধার জন্য যদি অপরাধের আভাসও ঘটে তাহাতে আমি ভীত।” এই ঘটনাকে স্মরণ করিয়া চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০।১০০)। ভক্তিশাস্ত্রের ইহা অতি সূক্ষ্ম গূঢ় অর্থ, যাহারা ভুক্তির জন্য

(এখানে ও স্বর্গে) ধর্মীয় সুকৃতি লাভের প্রবণতাযুক্ত তাহারা ইহা বুঝিবে না, কিন্তু যে সমস্ত প্রকৃত ভক্ত সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন তাঁহারাই বুঝিবেন।" অন্য এক প্রসঙ্গে, তিনি এই বিষয়বস্তুটি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন। (চৈঃ চঃ আদি ৪।১৯৯-২০১), "ভক্ত সুখবোধ করেন যখন তাঁহার দ্বারা সেবিত ভগবান সুখী হন, তাঁহার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছায় কোন ব্যাপার নাই। ইহাই নিরুপাধি বা নির্গুণ প্রেমের নিয়ম। ভগবানের সেবার দরুণ যদি তাঁহার নিজের সুখ বোধ হয় তখন তিনি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন।" ইহাতেই বুঝা যায় গোবিন্দের চরিত্র কত সাধুজনোচিত।

শ্রীকৃষ্ণের লীলায় সর্বজন বিদিত এক কাহিনী আছে কিভাবে তিনি সন্দীপনী মুনির টোলে পঠদ্দশার বাল্যবন্ধু সুদামা বিপ্রের নিকট হইতে একমুষ্টি চিড়া জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া চর্বণ করিয়াছিলেন এই বলিয়া "আমার ভক্ত আমার জন্য প্রীতি সহকারে সংগ্রহ করে, যে যাহা কিছু হউক পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, তাহা আমি তৃপ্তি সহকারে আহার করি" (ভাঃ ১০।৮১।৪১)। অর্জুনকেও তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, (গীতা ৯।২৬)। এই প্রকার আচরণ আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনেও দেখিতে পাই—যখন তিনি তাঁহার ভক্ত শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল মুষ্টি লইয়া চর্বণ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন "আমি তোমার নিকট হইতে এই ভগ্ন তণ্ডুল আহার করি, কিন্তু অভক্তের নিকট হইতে অমৃত তুল্য খাদ্যাদিও গ্রহণ করি না।" তাঁহার আহরণের প্রতিদানে ভক্তগণকে কিছু দিতেও প্রস্তুত থাকেন। নীলাচলেও বঙ্গদেশের ভক্তগণ তাঁহার জন্য বহু মূল্যবান ও বিশেষরূপে প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী ও স্থানীয় ভাবে ক্রীত মহাপ্রসাদাদি তাঁহাকে নিবেদন করিতেন। তাঁহারা ঐগুলি গোবিন্দের নিকট দিতেন ও তিনিও সময় মত তাঁহাকে এক এক করিয়া পরিবেশন করিতেন (যে জন্য ভক্তগণ তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া রাখিতেন)। গোবিন্দ এক এক করিয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া সেইগুলি ভবিষ্যতে আহরণের জন্য সরাইয়া রাখিতে বলিতেন। খাদ্যবস্তুগুলির দাতাগণ যখন গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে তাঁহাদের দ্রব্যগুলি মহাপ্রভু আহার করিয়াছেন কিনা, তখন তাঁহাদিগকে তুষ্ট করার জন্য এড়াইয়া যাওয়ার মত উত্তর দিতেন। এইরূপ পরিস্থিতির কথা গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জানাইলে, তিনি সকল সামগ্রী লইয়া আসিতে বলেন ও শতাধিক লোকের আহার যোগ্য সামগ্রীগুলি একের পর এক (ও নিবেদকের নাম করিয়া করিয়া)

পরিবেশন করিতে থাকিলে একাসনে বসিয়া ভক্ষণ করিলেন। বস্তুগুলি মাসাধিক কাল পূর্বে প্রদত্ত হইলেও সবই এমনকি ডাবের জলও টাট্‌কাই ছিল। আশ্চর্য্য ব্যাপার হইলেও তাহা কেবল মাত্র ভগবানের জন্যই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

গোবিন্দ সর্বদাই মহাপ্রভুর কাছে কাছে থাকিতেন, যখন যাহা প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করিবার জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই যাইতেন। ইহ জগতে অবস্থানের শেষের দিকে মহাপ্রভু প্রায় দিবা-রাত্রির সর্বক্ষণ দিব্যোন্মাদ দশায় অবস্থান কালে নিজে দেহের কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কখনও ব্রজের গোবর্দ্ধন পর্বত মনে করিয়া চটক পর্বতের দিকে ধাবিত হইতেন, কখনও বৃন্দাবনের যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রের দিকে দৌঁড়াইতেন, গোবিন্দ সর্বদাই তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন, আবার কখনও নিরুদ্দেশ হইলে স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্যগণের সহিত তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইতেন।

মহাপ্রভু এজগৎ হইতে অপ্রকট হইলে গোবিন্দ অতীব দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া নিদারুণ বিচ্ছেদ বেদনায় কালাতিপাত করিতেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন শ্রীনিবাসাচার্য্য নীলাচলে আসিয়া ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে এবং পথে যাইতে যাইতেই সংবাদ পাইলেন মহাপ্রভুর তিরোভাবের কথা, তখন তিনি আসিয়া দেখেন যে প্রভুর ভক্তগণ প্রবল দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত, আরও দেখিলেন যে শ্রীগোবিন্দ এমন কৃশ হইয়া গিয়াছেন যে বাতাহত হইলেই যেন পড়িয়া যাইবেন, তিনি (গোবিন্দ) তাঁহাকে অতীব স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এই ভাব লইয়া যে ভবিষ্যতে (পরবর্ত্তী) প্রজন্মে ইনিই মহাপ্রভুর শিক্ষার নেতৃস্থানীয় প্রচারক। ইহার পর গোবিন্দ অধিক দিন বাঁচেন নাই।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত

এই সাধুজন ও তাঁহার ভ্রাতা আর একজন সাধুভক্ত শ্রীল বাসুদেব দত্তের আবাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রসালে ও অম্বস্থ (বৈদ্য) জাতির অন্তর্গত এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের, মুকুন্দ ছিলেন কনিষ্ঠ। তদানীন্তন সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র ও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে তাঁহারা বসতি স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহারা রেল শহর কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী কুমারহট্টে স্থানান্তরিত হন, স্থানটি কলকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে ও শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের আদি বাসস্থান।

শ্রীমুকুন্দদাস গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন। তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন যাঁহাকে মহাপ্রভু খুব পছন্দ করিতেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রায়ই খেলাচ্ছলে কৌতুক করিয়া কূটপ্রশ্ন করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার উত্তরকে খণ্ডন করিতেন ও স্বয়ংই খুব দক্ষতা দেখাইয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেন, এমন শুধু মুকুন্দের বেলায় নহে, উপরন্তু উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রগণকেও, এমনকি শিক্ষককেও যিনি খুব খুশী হইতেন যে তিনি এমন একজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছাত্রকে লাভ করিয়াছেন। মুকুন্দ ছিলেন খুব ভক্তিস্বভাবাপন্ন ও বাল্যকাল হইতেই অদ্বৈত সভার একজন সদস্য, শহরের মধ্যে ইহাই (এই সভাই) ছিল একমাত্র স্থান যেখানে ভগবানের ভক্তগণ প্রতিসন্ধ্যায় সমবেত হইয়া অদ্বৈত আচার্য্যের মুখে ভক্তি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন ও শ্রীকৃষ্ণের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী মুকুন্দ সকল শ্রোতাগণকে মুগ্ধ ও তাহাদের মধ্যে ভক্তিভাব উদ্রেক করিতেন, যাহা এমনই অধিকমাত্রায় যে সে সভায় তাহারা অন্য সব কিছুই ভুলিয়া যাইত তাহাতে কেহ আনন্দে নৃত্য করিত, কেহ হাস্য করিত ও মাটিতে গড়াগড়ি দিত যখন তাহারা ভুলিয়া যাইত যে তাহাদের বস্ত্রাদি যথাযথ স্থানে আছে কি না। সে সময় তাহারা সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টাদি ভুলিয়া যাইত। এই বৈষ্ণবগণ মনে মনে খুব দুঃখবোধ করিত যে নিমাই পণ্ডিত তাহাদের মধ্যে নাই ও তাহারা আন্তরিকভাবে ইচ্ছা পোষণ করিত যে এমন একজন সুপণ্ডিত সুদর্শন, স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট জন সেখানে উপস্থিত থাকুন সেই সভার একজন হিসাবে। মহাপ্রভু তখন নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন ও মানুষজনকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে একজন অতি

উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতরূপে যিনি সকল সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন, শুধু প্রতিবেশীগণের মধ্যে নহে উপরন্তু বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকেও। একদিন দ্বিপ্রহরে গঙ্গাস্নানে যাইবার কালে মুকুন্দ মহাপ্রভুকে দেখিলেন তখন তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার এক সঙ্গীকে বলিলেন; ‘‘আমি জানি কি কারণে সে আমার নিকট হইতে পলাইয়া যাইতেছে; যাহারা ভক্তির প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন তাহাদের সহিত যোগাযোগ পছন্দ করে না, যাহাদের মধ্যে সে আমাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া গণ্য করে। সে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি পাঠ করে, আর আমি আধ্যাত্মিক নহে এমন সব গ্রন্থাদি পঠনে ও শিক্ষণে ব্যস্ত, সেই জন্য আমা হইতে দূরে সরিয়া যায়।’’ তখন মহাপ্রভু চিৎকার করিয়া ডাকিলেন ‘‘ওহে মুকুন্দ, কতকাল তুমি আমাকে এড়াইয়া যাইবে, কোথায় যাইতে পারিবে তুমি?’’ ইহার গূঢ় অর্থ এই যে মহাপ্রভু অবিলম্বেই তাঁহার ভগবত্ত্বা প্রকাশ করিবেন। সে সময় মুকুন্দ ও সকল ভক্তগণ তাঁহাকে পূজা করিতে থাকিবে। তাহারই কি ইঙ্গিত দিয়া আরও বলিলেন, ‘‘আর কিছুকাল শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া যাও তখন তুমি আমার মধ্যে বৈষ্ণবতার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। আমি পৃথিবীর মধ্যে এমন এক মহান্ বৈষ্ণব হইব যে ব্রহ্মা, শিবাদিগণও আমার দ্বারে আসিবে। বন্ধুগণ, আমার এই ঘোষণা শ্রবণ কর, আমি সকলের অপেক্ষা এক উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব হইব, আর যাহারা আমার নিকট হইতে পালাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিবে।’’

ইত্যবসরে যখন শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ নিজেকে গোপন করিয়া অদ্বৈত সভায় আগমন করেন এবং অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ চিনিয়া ফেলিলেন যে তিনি একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, তখন শ্রীমুকুন্দ যথারীতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমাব্যঞ্জক এক শ্লোক কীর্ত্তন করেন; তাহাতে তিনি এমনই বিচলিত হইয়া পড়েন যে তাঁহার মধ্যে প্রেমোল্লাসের লক্ষণসমূহ দেহে স্পষ্ট হইয়া পড়িল, ভক্তগণ যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হইল।

ঘটনাক্রমে একদিবস মহাপ্রভুর সহিত মুকুন্দের দেখা হইয়া যায়, তখন মহাপ্রভু তাঁহার হস্তধারণ করেন, যে তিনি তাঁহাকে আর ছাড়িয়া দিবেন না যতক্ষণ না তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা হয়। মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন করিলেন ও তাঁহার সমস্ত উত্তর খণ্ডন করিলেন, তখন মুকুন্দ একটু চিন্তা করিলেন;

"ব্যাকরণেই নিমাই পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠত্ব, ইহাতে ইনি অপরাজেয়। সুতরাং আমি তাঁহাকে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিব, তাহাতে অস্বস্তিতে পড়িয়া আর আমাকে বিরক্ত করিবে না।" তিনি এখন অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিবার প্রস্তাব দিলে মহাপ্রভু সেই অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন যে কোন বিষয়ের উপর তিনি প্রশ্ন করিতে যাহা খুশী প্রশ্ন করিতে পারেন, কোন আপত্তি নাই, মুকুন্দ তখন খুব কঠিন ধরণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সেই বিষয়ের উপর জটিল প্রশ্ন করিলেন। মহাপ্রভু তখন তাঁহার উদ্ধৃতির ভিতর অলঙ্কার ত্রুটি সকল দেখাইয়া দিলেন, তাহাতে মুকুন্দ যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার নিজ বিদ্যাবত্তার দ্বারা যে যে বিষয়ের উপর মহাপ্রভু তাঁহাকে খণ্ডন করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইলে, মহাপ্রভু সহাস্য বদনে তাঁহাকে গৃহে যাইতে বলিয়া আগামী কল্য তাহা পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতে বলিলেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ও খুব কৌতুহলী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; "এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য কোন মনুষ্যের মধ্যে থাকা সম্ভব? এমন কোন বিষয়বস্তু নাই যাহাতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দক্ষতাসম্পন্ন নহেন। এমন এক মহান্ যখন কৃষ্ণে ভক্তি সম্পন্ন হন, তখন আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।"

কালক্রমে যখন তিনি (মহাপ্রভু) গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, যদিও নিজে সকলের প্রভু, তিনি ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ লীলার অভিনয় করিলেন। তিনি দাম্ভিক পণ্ডিত হইতে অতীব অধৈর্য্যশালী কৃষ্ণানুসন্ধানকারী পূর্ণ রূপান্তরিত হইলেন, চক্ষে সর্বদা দর দর অশ্রুধারা, মনে এক উল্লাসময় ভাব, বিচ্ছেদ জ্বালায় সদাই ক্রন্দনরত, "কোথায় কৃষ্ণ, কখন আমি তাঁহাকে পাইব?" বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ খুবই আনন্দিত হইলেন, তাঁহারা প্রত্যহ তাঁহাকে ঘিরিয়া সমবেত হইতেন। মুকুন্দ প্রায় সকল ভক্তিমূলক শ্লোকাদি গান করিতে থাকেন, তাহাতে মহাপ্রভুর উদ্দীপনা বর্দ্ধিত হইত, তখন তিনি তাঁহাকে আরও আরও উচ্চারণ করিতে বলিতেন।

অতঃপর মাঝে মাঝে মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা হইত, তখন স্বল্পকালের জন্য তিনি ভগবত্ত্বা প্রকাশ করিতেন। তাহাদের মধ্যে একবার তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে বাপ বলিতেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ ভক্তগণ অবাক্ হইয়া

ভাবিতেন ইহা কাহার নাম হইতে পারে। অতঃপর স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইতেন তখন তাঁহারা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "প্রভু, আপনার কোন্ ভক্তের জন্য এই করুণ আহ্বান? আমাদের কি সেই সৌভাগ্য হইবে এমন এক ভক্তের হদিশ জানিতে যাঁহার জন্য আপনি এত অধীর হইয়াছেন?" মহাপ্রভু সানন্দে উত্তর দিলেন তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক পরমভক্ত ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ বংশ জাত, যাঁহার শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরেও বসতি ছিল। বাহ্যতঃ তিনি পৃথিবীর সাধারণ লোকের মত আমোদ-প্রমোদে আসক্ত ভাব প্রদর্শন করিতেন, সর্বদা ধনী লোকের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন ও বহু বহু মূল্যবান্ সামগ্রী বেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার অবিলম্বেই আগমনের সম্ভাবনা। যিনিও ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী সেই শ্রীমুকুন্দ জানাইলেন তিনি আসিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভু আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যে সেই মহান্ বৈষ্ণবের জন্য মহাপ্রভু এত অধীর হইয়াছেন, তাঁহার ঘনিষ্ঠতম পার্ষদগণের একজন শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন, তাই তিনি মুকুন্দকে বলিলেন তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাইতে। উভয়ে বিদ্যানিধির গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি (বিদ্যানিধি) আগ্রহভরে জানিতে চাহিলেন বিষ্ণুভক্তিতে উজ্জ্বল আকৃতির সঙ্গী গদাধরের পরিচয়। গদাধরের মনে এক সন্দেহ দেখা দিল এমন এক ফুলবাবুর প্রকৃতির বিদ্যানিধি, যিনি এক বহু মূল্যবান পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট যাহার চারিদিকে সুগন্ধী দ্রব্যাদির গন্ধ, বহু ভৃত্য সেবিত একজন ভক্তরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। শ্রীমুকুন্দ গদাধরের মন বুঝিতে পারিয়া ভাগবতের এক শ্লোক (৪-২-২৩) যাহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম কারুণ্য প্রকাশক, উচ্চারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যানিধি অশ্রুবিগলিত ধারায় পালঙ্ক হইতে পড়িয়া গেলেন, দেহে সর্বপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল, সমস্ত মূল্যবান্ আসবাবপত্র পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন ও উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন যে তিনি এহেন করুণাময় ভগবানের কৃপার পাত্র হইতে পারিলেন না। গদাধর বিস্মিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে সন্দেহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, যদি তিনি স্বীকৃত হন, দীক্ষা লাভ করিতে ও শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু এই বিষয়ে জানিতে পারিয়া খুব প্রীত হইলেন। সেই রাত্রেই বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন ও আসিলেন একান্ত একাকীই ও পথের সকল লোকের অ-গোচরে। মহাপ্রভুকে দর্শন মাত্রই আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মুকুন্দ এখন শ্রীবাসাঙ্গনে একজন নিয়মিত কীর্ত্তনীয়া (মহাপ্রভুর সহিত) এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানকালে তিনিই মূল গায়ক-যথা হরিবাসর (শ্রীএকাদশী) তখন দিবারাত্র সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতেন, পুনরায় মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া মহাপ্রকাশ (একটানা একুশ ঘন্টা যাবৎ আত্ম প্রকাশ) এর সময় ইত্যাদি। এই উপলক্ষ্যে মহা অভিষেক (সহস্র কলস জল দ্বারা স্নান ঋক্ বেদ হইতে পুরুষ সূক্ত উচ্চারণ) ভক্তগণের নিবেদিত ভুরিভুরি খাদ্য দ্রব্যাদি দ্রুত ভোজন, অতঃপর ভক্তগণকে একের পর এক প্রত্যেককে ডাকিয়া অন্যের অজ্ঞাত ও কাজে কাজেই নিজের জ্ঞাত নয়-পূর্ব ইতিহাস কথন; তিনি বর্ণনা করিলেন এমন কি নিজ আবির্ভাবের পূর্বে তিনি কিরূপে কোন অসুবিধা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। এইভাবে নিজ ভগবত্ত্বা প্রমাণিত করিয়া তাঁহাকে যথা-ইচ্ছা বরপ্রদান। মুকুন্দকে অবশ্য ডাকা হয় নাই, যদিও অন্য কোন ভক্ত অবশিষ্ট ছিলেন না ও তিনি ডাক পাইবার আশায় যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বিষয়টি শ্রীবাস পণ্ডিত উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) জিজ্ঞাসা করিলেন কি কারণে মুকুন্দ তাঁহার মহাপ্রকাশ দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিলেন যদিও তিনি সকল ভক্তগণের অতীব প্রিয়, ও মহাপ্রভুর প্রিয় গায়ক। ইহাতে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন সে দ্বিমুখী (খড় জাঠিয়া) কখনও দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া গোপন দৈন্য, আবার অন্যত্র বিরোধিগণের বিরুদ্ধেও যদি সুযোগ আসে, তাহা প্রয়োগ। যখন বৈষ্ণব গণের মধ্যে অবস্থান করে তখন খুব বিনয়ী ভক্ত, আবার যখন মায়াবাদি-গণের মধ্যে থাকে সে উহাদিগকে সমর্থন করে ও ভক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; সুতরাং ভক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করায় মহাপ্রভু তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না। বাহির হইতে সবকিছু শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ তাহার প্রতি আরো আরোপিত দোষসমূহ নিজের কাছে স্বীকার করিলেন ও মনস্থির করিয়া ফেলিলেন এমন এক মোক্ষী জীবনকে আর রাখিবেন না। সাশ্রুনয়নে বিলাপ কারী ক্রন্দন করিতে করিতে, যাহার ফলে তাঁহার চতুর্দিকস্থ ভক্তগণও সমবেদনায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, শ্রীবাসপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন তিনি কি কোনকালে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে মহাপ্রভুর উত্তর পাইলেন সে নিশ্চয় দর্শন পাইবে এক কোটি জন্মের পর, যাহা শুনিয়া মুকুন্দ আনন্দে লম্ফ প্রদান করিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, "আঃ, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব," ইহাতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া মুকুন্দকে

ভিতরে আসিতে আদেশ দিলেন, তখন সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে নিজেকে ভুলিয়া গেল, তখন ভক্তগণ তাহাকে দৈহিকভাবে মহাপ্রভুর সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিলেন, ভক্তগণও আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ, তোমার সকল দোষ বিগত হইয়াছে এস, আমাকে দর্শন কর ও নিজ বর লইয়া যাও।" কোনও কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া মুকুন্দ মহাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, "উঠ মুকুন্দ, উঠ; আর বিন্দুমাত্রও তোমার দোষ অবশিষ্ট নাই, অবাঞ্ছিত লোকের সহিত সঙ্গের কুফল একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার হাতে আমার পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তুমি আমার কৃপা লাভ করিবার জন্য অস্বাভাবিক দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তুমি আমা প্রদত্ত কোটি জন্মের সময়সীমা পার করিয়া ফেলিয়াছ। আমার কথার নিশ্চিত পূরণের দৃঢ়তম বিশ্বাস লইয়া তুমি সময় সীমাকে এক বিন্দুতে আনিয়া ফেলিয়াছ ও আমাকে তোমার হৃদয়ে সর্বকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ।" মহাপ্রভুর মুখে এই প্রকার উৎসাহ ব্যঞ্জক কথাগুলি শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ ক্রন্দন করিতে করিতে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "কি দুরাত্মা আমি যে ভক্তিকে প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করিয়াছি আমার এই পাপিষ্ঠ নীচ মুখ দিয়া! হে প্রভু, আপনাকে দর্শনের অনুমতি দিলেও আমি কি আনন্দ লাভ করিব? সেই সমস্ত অভক্ত জনগণ যথা দুর্যোধন, হিরণ্যকশিপু, কংস ইত্যাদি কি আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিল আপনাকে দেখিয়াও? যে ভক্তি দ্বারা শ্রীশিব, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাসদেব, প্রভৃতি নিত্যকালের পরম সুখ লাভ করিয়াছেন, সেই ভক্তিকে আমি অস্বীকার করিয়াছি, এমন অনিষ্টকর মন আমার। অসংখ্য জন্মের পরও আমি কি করিয়া পরম সুখ পাইতে আশা করিতে পারি? মহাপ্রভু তখন জানাইয়া দিলেন যে তিনি মুকুন্দের ভক্তিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন ও তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন সে প্রতি জন্মেই তাঁহার পার্ষদ ভক্ত হইবে।

মুকুন্দ এখন মহাপ্রভুর সকল অনুষ্ঠানেই একজন নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন ও এমনই এক স্থায়ী পার্ষদ হইয়া পড়িলেন যে, যে পাঁচজনের নিকট নিজ সন্ন্যাস গ্রহণের প্রতিজ্ঞা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন, যে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প তিনি করিয়াছিলেন জনসাধারণকে ব্যাপকহারে পার্থিব (সংসার) জীবন হইতে উদ্ধার করিবার মানসে। ইহা শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ মনে খুবই আঘাত পাইয়া ছিলেন। যে রাত্রি শেষে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করেন পরদিবসের

সেই প্রভাতে অন্যান্য ভক্তগণ সহ মুকুন্দ মহাপ্রভুর গৃহকে মহাপ্রভু হীন দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন, অতীব শোকে ও দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনিও অপর জন যাঁহাদিগকে মহাপ্রভু পূর্ব হইতেই আদেশ দিয়াছিলেন তাঁহারা কন্টক নগর (কাটোয়া) যেটি কেশব ভারতীর আবাস স্থল ও যাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের উদ্দেশে রওনা দেন, মহাপ্রভু কৃষ্ণের সন্ধানে উল্লাসময়ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন, মুকুন্দ সেই অল্প জনা কয়কের (৩।৪ জনের) মধ্যে ছিলেন। নীলাচলে (শ্রীজগন্নাথ পুরী) যাত্রার পথে মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের আলয়ে যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি দ্বিপ্রহরে আহার কালে হরিদাস ঠাকুর ও মুকুন্দকে তাঁহার সহিত থাকিবার জন্য ডাকেন, যদিও তাঁহারা, তিনি নিত্যানন্দসহ ভোজন কালে কাটোয়া হইতে বরাবরই মহাপ্রভুর সহিত থাকেন। সেই তিনজনের মধ্যে মুকুন্দ ছিলেন একজন যাঁহারা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের সঙ্গে সেখান হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত ছিলেন। নীলাচলে মুকুন্দ একজন মূলকীর্ত্তন গায়করূপে মহাপ্রভুর সহিত থাকিতেন—শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা উৎসবে ও অন্যত্র অন্যান্য অনুষ্ঠানে। মহাপ্রভু একাকী দক্ষিণ দেশ এবং উত্তর প্রদেশে মথুরা , বৃন্দাবন, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ কালে, শ্রীমুকুন্দ অন্যান্য ভক্তগণসহ পুরীতেই ছিলেন মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রত্যাশায়। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর বঙ্গদেশের ভক্তগণের সহিত সেখানে ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য মুকুন্দকে প্রেরণ করা হয়—বঙ্গদেশ হইতে এই ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে আগমন করিতেন।

শ্রীগদাধর দাস

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গদাধর-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'ইনি শ্রীরাধার কান্তি, শ্রীগদাধর পণ্ডিত যেমন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীগদাধর দাসও তেমনি শ্রীমতীর অঙ্গশোভা। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরের তিনি দ্যুতিস্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশেও তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যথা—

"রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ-গদাধরঃ।।
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ।
সাপি কার্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং।।"

(গৌঃ গঃ ১৫৪-৫৪)

—'পূর্বকালে যিনি শ্রীরাধিকার ভূষণস্বরূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনি এক্ষণে গৌরাঙ্গের নিকট দাসবংশ গদাধর। ব্রজে যিনি বলরামের প্রিয়তমা পূর্ণানন্দা ছিলেন, তিনি কার্য্যবশতঃ গদাধরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।'

তিনি (গদাধর) গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ ব্রজের মধুর রসের রসিক, নিত্যানন্দগণ—শুদ্ধভক্তি-প্রধান সখ্যাদি রসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুর-রসের রসিক ছিলেন।

যদিও ভাগীরথী তীরে আড়িয়াদহ (কলিকাতা হইতে ৮ মাইল দূরে) তাঁহার শ্রীপাট ছিল, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর কাটোয়ায় চলিয়া আসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান উল্লেখ করিয়াছেন, নবদ্বীপে অবস্থানকালে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তবে তাঁহারা অন্তর্ধান করিলে তিনি কাটোয়াতে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কাটোয়াতে যাহা মহাপ্রভুর বাটি বলিয়া খ্যাত, তাহাই গদাধর দাসের দেবালয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে, মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়া গৌড়দেশে শান্তিপুরে কুমারহট্টে ভক্তগণের সহিত মিলিত হন ও পাণিহাটিতে রাঘবভবনে বিজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় গদাধর দাসের

সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। স্নেহাবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু স্বীয় শ্রীপাদপদ্ম গদাধর দাসের মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। "প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। শ্রীচরণ তুলিয়াছিলেন তা'ন শিরে।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৯৪)

গৌড়দেশে প্রেম বিতরণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নীলাচল হইতে প্রেরণ করিবার কালে গদাধর দাস, রামদাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস, পুরন্দর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণও সঙ্গে ছিলেন। নীলাচল হইতে আসিবার সময় নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের বিভিন্নপ্রকার অতীব ভাবাবেশ প্রকাশ পাইয়াছিল। নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন শ্রীগদাধর দাসের মধ্যে অপ্রাকৃত রাধার ভাব বিদ্যমান। গদাধর গোপীভাবে প্রমত্ত হইয়া 'দই চাই, দই' বলিয়া মাথায় গঙ্গাজলের কলসী লইয়া চিৎকার করিতে করিতে অট্ট অট্ট হাস্য করিয়াছিলেন। "হইলা রাধিকাভাব—গদাধর দাসে। দই কে কিনিবে? বলি' অট্ট অট্ট হাসে।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৩৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও গৌড়দেশে আসিয়া গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিবার সময় একদিন গদাধরের গৃহে আসিয়া দেখেন গদাধর দাস গোপীভাবে বিভাবিত মস্তকে গঙ্গাজলের কলসী লইয়া "দুধ নেবে গো, দুধ" বলিয়া নিরন্তর ডাকিতেছেন। [শ্রীগদাধর দাস আপনার স্বরূপসিদ্ধিতে নিরন্তর বাস করিয়া বাহ্যে সখীর বেষ গ্রহণ করেন নাই। তিনি সর্বদাই গোপীর ভাবে মগ্ন থাকিলেও বেষে কপটতা দেখান নাই। —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর] তাঁহার এই ভাব দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গদাধর-মন্দিরের বালগোপাল মূর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন।

গদাধর দাসের মন্দির দান লীলাক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল—কারণ একবার তাঁহার মন্দিরে কীর্ত্তনীয়া শ্রীমাধবানন্দ ঘোষ দানখণ্ডলীলা কীর্ত্তন করিলে শ্রীনিত্যানন্দের অদ্ভুত ভাবাবেশ প্রকটিত হইয়াছিল। আড়িয়াদহ গ্রামে এক প্রবল পরাক্রমশালী কাজী বাস করিতেন। তিনি ছিলেন ধর্ম্মের বিরোধী, হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিদ্বেষযুক্ত। গদাধর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া এক রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়াই কাজীকে হরিনাম করিতে আদেশ দিলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দিব্যমূর্ত্তি ও দিব্যভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কাজীর ক্রোধ প্রশমিত হইয়া গেল ও বদনে সখ্যভাব প্রকাশ পাইল। কাজী বলিলেন—ঠাকুর! তুমি এখন এলে কেন?

শ্রীগদাধর বললেন—তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

কাজী—কি কথা আছে, বল।

শ্রীগদাধর—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আপামর জনসাধারণকে হরিনাম দিয়েছেন। সেই মধুর হরিনাম তুমি নিচ্ছ না কেন?

কাজী—কাল হরিনাম নেব।

গদাধর—কাল কেন আজই নাও। আমি এসেছি তোমাকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জন্য। পরম মঙ্গলময় এই হরিনাম তুমি লও। অদ্যই তোমার সমস্ত পাপ-তাপ থেকে তোমায় আমি উদ্ধার করিব।

কাজী গদাধরের বাণী শুনে আসিয়া বলিলেন—কাল আমি হরিনাম করব, আজ তুমি ঘরে যাও।

তাহাতে গদাধর আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন—'আর কালি কেন? এই ত' বলিলা হরি আপন বদনে।। আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ। যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ।।' (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৪০৯-১০) তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে গদাধর দুর্দ্দান্ত কাজীকে উদ্ধার করিলেন।

যে সময় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নিত্যানন্দের আদেশে চিড়া-দধি মহোৎসব করিয়াছিলেন, সে সময় গদাধর দাস তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগদাধর দাসের শিষ্য ছিলেন শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।

কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শ্রীগদাধর দাসের তিরোভাব। কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতে কেশব ভারতীর সমাধির নিকটেই গদাধর দাসের সমাধি স্থান।

শ্রীরাঘব পণ্ডিত

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের নিবাস বাংলার উত্তর ২৪ পরগণাস্থিত পাণিহাটী গ্রামের গঙ্গা-তীরে। তিনি গৌর কল্পতরুর মুখ্য-শাখার একজন। তাঁহার এক মুখ্য-শাখা 'মকরধ্বজ কর'। তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী বার মাস যে সমস্ত নিসক্‌রী আচারাদি ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করিতেন, তাহা এবং অন্য সংগৃহীত দ্রব্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্যভোগের জন্য প্রীতি সহকারে এক পেটরায় বা পাত্রে (ঝালিতে) ভরিয়া শ্রীরাঘবাদি দ্বারা নীলাচলে প্রেরণ করিতেন। ইহাকে রাঘবের ঝালি বলা হইত।

পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা

মহাপ্রভু শান্তিপুরের অদ্বৈত ভবন হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাস ভবনে গমন করেন; শ্রীবাসের ভবন হইতে পাণিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত ভবনে শুভ বিজয় করেন। সে-সময়ে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সেবা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রাণনাথকে দর্শন করিবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে প্রভুও তাঁহাকে ধরিয়া প্রেমাশ্রুতে সিঞ্চিত করিলেন। প্রভু বলিলেন, রাঘব আলয়ে আসিয়া তিনি গঙ্গা স্নানের মত সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি পণ্ডিতকে কৃষ্ণের জন্য ভোগরন্ধন আদেশ দিলে, পণ্ডিতও প্রীতি সহকারে বহুবিধ রন্ধন করিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও আপ্তগণসহ ভোজনে বসিয়া রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

রাঘব পণ্ডিতকে শ্রীগৌরসুন্দর নিভৃতে বসাইয়া বলিলেন যে, 'শ্রীনিত্যানন্দ আমার দ্বিতীয় কলেবর। অতএব তুমি সাবধানে শ্রীনিত্যানন্দকে সেবা করিলে মহাযোগেশ্বরের সেবালব্ধ দুর্লভ বস্তুও সুলভে পাইবে।' মকরধ্বজ কর প্রতিও তিনি বলিলেন, 'তুমি রাঘব পণ্ডিতকে প্রীতিপূর্ণ সেবা করিলে তাহাতে আমাকেই সেবা করা হইবে।'

নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে আসিয়া সপার্ষদ পাণিহাটী গ্রামে রাঘব মন্দিরে আসিয়া উঠিলেন। মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ ভ্রাতৃ-ত্রয়ের কীর্ত্তনে নিত্যানন্দ প্রভু হুঙ্কার সহকারে নৃত্য করিতে করিতে খট্টার উপরে উপবেশন করিয়া রাঘবের প্রতি আদেশ দিলেন তাঁহার অভিষেক করিতে। শ্রীনিত্যানন্দ জাগতিকগণের উদ্ধারের জন্য প্রেম প্রচাররূপ শুভ আরম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরাঘবেন্দ্র (মকরধ্বজ কর) শিরের উপর ছত্র

ধারণ করিলেন। নিত্যানন্দ অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নের জন্য রাঘব পণ্ডিতকে আদেশ দিলেন। নিত্যানন্দের ইচ্ছায় জম্বীরের বৃক্ষে কদম্বফুল ফুটিয়াছিল। তাহা দ্বারা মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলাতে পরাইলে নিত্যানন্দ প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন।

নীলাচল যাত্রা

রথযাত্রার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে নীলাচল যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পুরী পৌছিয়া গুণ্ডিচামার্জনান্তে মহাপ্রভু সগণ প্রসাদ সম্মানার্থ বসিলেন। রথযাত্রা দিনে মহাপ্রভু ৪ সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন বিভাগ করিয়া দিলেন। প্রথম দলে মূল গায়ক শ্রীস্বরূপও তাঁহার ৫ জন দোহার রহিলেন—দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দানন্দ। জগন্নাথ সুন্দরাচলে আসিলে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-লীলা স্ফূর্ত্তি হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গণসহ যে জল-খেলা হইয়াছিল সে-সময় দুই-দুই জনে জলযুদ্ধ হইয়াছিল; তাহাতে রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে বক্রেশ্বরের জলখেলা হইয়াছিল।

রথযাত্রা শেষে মহাপ্রভু সকল ভক্তগণের গুণগান করিলেন। রাঘব পণ্ডিতের প্রসঙ্গে বলিলেন,—

'ইহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম।।
আর দ্রব্য রহু, শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি' নারিকেল বিকায় তথা।
বাটিতে কত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন, যথা মিষ্ট নারিকেল।।
এক এক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশ ক্রোশ হইতে আনায় করিয়া যতন।।
প্রতিদিন পাঁচ-সাত ফল ছোলাঞা।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাইঞা।।
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি' সংস্করি'।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে, মুখ ছিদ্র করি'।।

কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি'।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি'।।
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত--হরষিত।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে শতপাত্র পূরিত।।
শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন।।
কভু শস্য খাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে।।
একদিন ফলদশ সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লঞা।।
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল।
ফল-পাত্র-হাতে সেবক দ্বারে ত' রহিল।।
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল।।
পণ্ডিত কহে,—দ্বারে লোক করে গতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি' লাগে উপর ভিতে।।
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা।।
এত বলি' ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ-জিনিয়া।।
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি' ভোগ লাগাইল।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৬৯-৮৫)

'এত বলি' রাঘবের কৈল আলিঙ্গনে।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯২)

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্বভৌম নানাপ্রকার বাধা জন্মাইতে থাকেন। ক্রমে গৌড়ীয় ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর নীলাচলে আসলেন। এবার বৈষ্ণব-গৃহিণীসকল শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী রাঘবের ঝালি সাজাইয়া বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন।

রঘুনাথ দাসের প্রতি কৃপা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীরঘুনাথ দাস যখন চিড়াদধি মহোৎসব লাগাইতে ছিলেন সে সময় রাঘব পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিতের আনীত প্রসাদ প্রভু রাত্রে স্বীকার করিবেন বলিয়া রাখিয়া দিলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের আহ্বানে স্বয়ং আসিয়া চিড়া মহোৎসবের দ্রব্যাদি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শ্রীরাঘব পণ্ডিত দুই-ভাইয়ের অবশেষ রঘুনাথকে দিলেন। রাঘব পণ্ডিতের দ্বারা রঘুনাথ শ্রীনিত্যানন্দ চরণে নিজ উদ্ধারোপায় প্রার্থনা করিতে, শ্রীনিত্যানন্দ রঘুকে আশীর্বাদ করিলেন, অচিরেই সে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়া শ্রীস্বরূপের হস্তে ন্যস্ত হইবেন।

প্রতি বৎসরই শ্রীরাঘব পণ্ডিত নিজ ভগিনী দময়ন্তী কর্ত্তৃক প্রস্তুত যে অসংখ্য প্রকার প্রভু প্রিয় ভোগ সামগ্রী পাঠাইতেন তাহার বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১০ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ঝালির 'মুনসিব' হইতেন 'শ্রীমকরধ্বজ কর'।

দময়ন্তী

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তীদেবী। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ১৬৭ শ্লোক—"গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা।" যিনি পূর্বে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ সামগ্রী তৈয়ার করিতেন এবং ধনিষ্ঠা নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি গৌর-অবতারে শ্রীরাঘব পণ্ডিত নামে খ্যাত। যিনি কৃষ্ণ-অবতারে "গুণমালা" নামে গোপী ছিলেন, তিনি অধুনা গৌর-অবতারে দময়ন্তীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মহাপ্রভুর বার মাসের ভোগ্য সামগ্রী তৈয়ার করিয়া দিতেন। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় গৌড় দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে গমন করিতেন। প্রভুর সেবার জন্য প্রত্যেকে কিছু না কিছু তৈয়ার করিয়া লইয়া যাইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম।।' সুতরাং ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাপ্রভুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সুখ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকেন। মহাপ্রভু যে সেই সাক্ষাৎ ভগবান তাহা রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তী অবগত ছিলেন। তথাপি মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহাদের প্রীতি এমনই প্রবল ছিল যে, কোন সময়ে কোন দ্রব্যটি আহার করিলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সেই সমস্ত হিসাব বিচার করিয়া দময়ন্তী দেবী সারা বৎসর ধরিয়া তদুপযোগী দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতেন; এবং সেই সব দ্রব্য ঝালি সাজাইয়া পুরীতে লইয়া যাইয়া মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিতেন। মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ সেই সমস্ত সামগ্রী যত্ন করিয়া রাখিয়া দিতেন ও তাঁহার ভোজনের সময় প্রতিদিন কিছু না কিছু দিতেন। দ্রব্য প্রস্তুত কালে মহাপ্রভুকে 'মনুষ্য' বুদ্ধিতে পাছে গুরুভোজনে উদরে 'আম্ জন্মে তাহা নিবারণার্থ 'সুখ্‌তা' প্রস্তুত করিয়া অতীব গাঢ় গৌর-প্রীতির নিদর্শন স্থাপন করিয়াছে। রাখবের ঝালির বিবরণ দেখিলে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণনৈবেদ্য প্রস্তুত করিবার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। যথা—

আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি নাম।
নেম্বু-আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান।।
আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্তা।
যত্ন করি' গুণ্ডা করি' পুরাণ সুখ্‌তা।।

'সুখ্‌তা' বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুখ্‌তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে।।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুখ্‌তাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ হয়।।
'মনুষ্য'-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
'গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায়।।
সুখ্‌তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ।'
সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস।।
ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া।।
শুণ্ঠীখণ্ড, নাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি' বস্ত্রের কুথলী-ভিতর।।
কোলি শুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব, আর শত প্রকার 'আচার'।।
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজলি।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিলা সকলি।।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার।
অমৃত-কর্পূর আদি-অনেক প্রকার।।
শালিকাচটি-ধান্যের ''আতপ'' চিঁড়া করি।
নূতন-বস্ত্রের বড় কুথলী সবভরি'।।
কতেক চিঁড়া হুড়ুম করি' ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া।।
শালি-ধান্যের তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত-চূর্ণ কৈলা চিনি পাক দিয়া।।

কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস।।
শালি-ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাক উখ্‌ড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া।।
ফুট্ কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইলা।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈলা।।
কহিতে না জানি নাম এজন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষদ্রব্য সহস্র প্রকার।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।১৫-২০, ২২-৩৩)

রাঘব পণ্ডিতের আজ্ঞায় দময়ন্তী এই সব প্রস্তুত করিতেন। দুই জনেরই মহাপ্রভুতে পরম ভক্তি। সংক্ষেপে ইহাকেই "রাঘবের ঝালি" বলা হয়। এই ঝালির উপর শীলমোহর লাগাইয়া দেওয়া হইত যাহাতে অন্য কোন লোক খুলিতে না পারে। এই ঝালি বহিতে তিনজন ভারবাহী লাগিত। পাণিহাটী গ্রামবাসী মকরধ্বজ কর রাঘবের ঝালির মুন্‌সিব (পরিদর্শক, পরিচালক) হইয়া অতি তৎপরতা সহ ঝালিগুলিকে প্রাণপণ রক্ষা করিতে করিতে চলিতেন। এইভাবে ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তীর প্রীতিপূর্ণ-সেবা অঙ্গীকার করিতেন।

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান

তৎকালে নবদ্বীপের নগরে বুদ্ধিমান খান ও মুকুন্দ সঞ্জয় নামক দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল বিষয়ে আঢ্য ও সমৃদ্ধ ছিলেন। ধনীলোকের গৃহে নানাবিধ ঔষধি ও চিকিৎসকগণ অবস্থান করিতেন। নিঃস্ব বা নিঃসম্বল জনগণ তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া ঔষধ পথ্যাদি লাভ করিতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় অপ্রাকৃত লীলাবিলাস-প্রদর্শন মানসে যে সকল প্রেমবিকার উদয় করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্য ঔষধ প্রয়োগে উপশম হইবার নহে। শরীর ও মানস-রোগ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপর ক্রিয়া করে। সাত্ত্বিক বিকারাদি অনিত্য ও অচিৎ উপাধিদ্বয়ে ক্রিয়া-বিশিষ্ট হয় না। পরন্তু জীবাত্মার সেবোন্মুখী প্রবৃত্তি সমূহ ভগবৎ সমর্পিত অপ্রাকৃত দেহাদি-সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। কৃত্রিম জড় শরীরগত বিকারের সহিত আত্মবিদ্‌গণের ভক্তিবিকার সম্পূর্ণ পৃথক্। মূঢ় জনগণ 'দেহে আত্মবুদ্ধি' করিয়া সাত্ত্বিক বিকারাদি প্রদর্শনের ছলনায় কৃত্রিমভাবে দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের সঞ্চালনাদি দ্বারা জড় প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বাসনা করে। যে দিন বায়ুরোগচ্ছলে মহাপ্রভুর অন্তর্দশায় প্রেম-বিকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া বন্ধুগণ নিমাই এর ইহা বায়ুর বিকার জ্ঞান করিযা প্রতিকার করিতে আসিতে লাগিলেন তখন বুদ্ধিমন্তখান ও মুকুন্দ সঞ্জয় ও প্রতিকার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর প্রতিবেশী একান্ত অনুগত ভক্ত শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্—

"চৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক প্রধান।।"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১০।৭৪)

দ্বিতীয়বারে প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত বিবাহোপলক্ষে বররূপী প্রভুর পক্ষে থাকিয়া তৎ-সক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছিলেন।

" প্রথমে বলিয়া বুদ্ধিমন্ত - মহাশয়।
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৬৯)

তাহাতে মুকুন্দ-সঞ্জয় বিবাহ ব্যয়ভার আংশিক ভাবে বহনের আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বুদ্ধিমন্ত খান বলেন, এ বিবাহে দরিদ্র-ব্রাহ্মণোচিত রীতি অনুযায়ী জাঁক জমক-বিহীন স্বল্প, সামান্য আয়োজন হইবে না, এমন মহা-সমারোহের সহিত

প্রভুর বিবাহ সম্পাদনের ব্যবস্থা করিব যেন লোকে ইহাকে এক রাজকুমারের মত আয়োজনাদি দেখে। বর বধূ গৃহে আসিলে পর মহাপ্রভু বুদ্ধিমন্ত খানকে আলিঙ্গন দান করিলেন, তাহাতে বুদ্ধিমন্ত অপার আনন্দিত হইলেন।

যে সময়ে মহাপ্রভু প্রতিরাত্রে শ্রীবাসমন্দিরে (কোনদিন চন্দ্রশেখর ভবনে) কীর্তন বিলাস আরম্ভ করেন, সেই সময়ে যে সকল পার্ষদ ভক্তগণকে লইয়া তাহা সম্পাদন করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খানও ছিলেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সমীপে ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে শঙ্খ, কাঁচুলী, পট্টশাড়ী, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাযোগ্য বেশ সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া পার্ষদগণ কে কি বেশ গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন। প্রভুর আদেশানুসারে বুদ্ধিমন্ত খান সমস্ত বেশ সজ্জিত করিলেন।

দেখা যাইতেছে বুদ্ধিমন্ত খান শ্রীবাস মন্দিরে, শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন লীলায় এবং জগাই মাধাই উদ্ধারের পর সগণ মহাপ্রভুর জলকেলি লীলায় সঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করিলে যে সকল ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান। গৌড়দেশের ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য পুরুষোত্তম ধামেও গিয়াছিলেন। গৌড় দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবার জন্য যে সকল দ্রব্য লইয়া পুরীতে আসিতেন, মহাপ্রভু প্রত্যেকের নৈবেদ্য প্রীতির সহিত ভোজন করিতেন। উক্ত প্রেমিক ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিমন্ত খান। আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা পালনই ছিল শ্রীবুদ্ধিমন্ত খানের বিষয় বস্তু।

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান শ্রীচৈতন্য শাখার অন্তর্গত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থে গোদ্রুম-দ্বীপান্তর্গত শ্রীসুবর্ণ বিহারের মাহাত্ম্য বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"সত্যযুগে শ্রী সুবর্ণসেন নামে এক ধার্মিক রাজা সুবর্ণ বিহারে অবস্থান করিতেন। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে প্রেমভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণ সেন রাজা একদিন নিদ্রাকালে সপার্ষদ শ্রীগৌর গদাধরের দর্শন লাভ করিলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি বিরহে ক্রন্দন করিতে থাকিলে দৈববাণী হইল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুনঃ কলিতে যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন তিনি বুদ্ধিমন্ত খান নামে তাঁহার পার্ষদরূপে পরিগণিত হইয়া গৌরলীলার পুষ্টিসাধন করিবেন।"

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত

"পুরা বৃন্দাবনে চোটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ।
শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুসেবকৌ।।"

—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৩৭

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত পূর্বলীলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-ভৃত্য ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর নামে চেট সেবক (জল আনয়নকারী সেবক) ছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর লীলায় কাশীশ্বর ও গোবিন্দ নামে আবির্ভূত হন। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে চাতরা গ্রাম কাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট। তাঁহার পিতা শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য কাঞ্জীলাল কানুবংশোদ্ভূত বাৎস্য গোত্রীয়। "চৌধুরী" ছিল ইঁহাদের রাজ-উপাধি, যে জন্য চাতরা গ্রামের কাশীশ্বর পণ্ডিতের দেবালয় সেখানে অবস্থিত তাহাকে চৌধুরীপাড়া বলা হয়। সেই মন্দিরে কাশীশ্বর পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আছেন। কাশীশ্বর পণ্ডিত ছিলেন খুব বলবান। বল্লভপুরস্থিত শ্রীরুদ্রপণ্ডিত তাঁহার ভাগিনেয়। চৌধুরী পাড়ায় যেখানে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের দেবালয়, সেখানে দোলযাত্রার সময় উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ উভয়েই শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

"ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর।।
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলচলে প্রভুস্থানে মিলিলা আসিয়া।।
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে।।
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর।।
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য গহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী-বলবানে।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩৮-১৪২

মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন।।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লঞা।

ঈশ্বর পুরীপাদের অপ্রকটকালের পূর্বে কাশীশ্বর ও গোবিন্দ উভয়কেই আজ্ঞা দেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত হইতে।

"গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার।" এই বিচার চিন্তা করিয়া, সুতরাং গুরুর সেবকের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ অনুচিত, পুনশ্চঃ গুরুর আজ্ঞা পালন না করিলেও অপরাধ, সুতরাং কি করণীয় এই সিদ্ধান্ত মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (সার্বভৌম) 'গুরুর আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়' এইরূপ বলিলে মহাপ্রভু কাশীশ্বর ও গোবিন্দের সেবা অঙ্গীকার করিয়া উপরোক্তরূপে সেবাভাব প্রদান করিলেন।

কাশীশ্বর ছিলেন অতি বলবান, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইবার কালে তিনি ভীড় ঠেলিয়া পথ সুগম করিতেন, তাহাতে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ কাহারও স্পর্শ হইত না।

পুরীতে শ্রীরথযাত্রাকালে যখন মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতেন সেসময় ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য যে তিনটি মণ্ডল রচনা করা হইত তাহার দ্বিতীয়টিতে কাশীশ্বর মুকুন্দাদি ভক্তগণ সহ থাকিতেন, যথা—

"কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ।।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।৮৯

পুরুষোত্তমধামে ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তনান্তে তাঁহাদিগকে লইয়া মহাপ্রভু যখন মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিতেন তখন সাতজন পরিবেশনকারিগণের মধ্যে কাশীশ্বর পণ্ডিত ছিলেন অন্যতম।

'স্বরূপ গোঁসাই জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর।।
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।'

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সগোষ্ঠী নীলাচলে শুভাগমন সংবাদ জানিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু গমন করিবার কালে কাশীশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণে সুখী হইয়া মহাপ্রভু শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে পুরী হইতে শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবার আদেশ করেন। তাহাতে শ্রীকাশীশ্বর মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তখন একটি স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ তাঁকে প্রদান করেন ও সেই বিগ্রহের সহিত ভোজন করিলেন; তাহাতে কাশীশ্বরের বিশ্বাস হয়। এ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে ২য় তরঙ্গে উল্লিখিত আছে; —

কাশীশ্বর কহে প্রভু তোমারে ছাড়িতে।
বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে।।
কাশীশ্বর হৃদয় বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি।।
প্রভু সে বিগ্রহসহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ তৈল।।
গৌর-গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তারে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা।।
শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করেন অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া।।

মহাপ্রভু জানাইয়া দিলেন এ বিগ্রহের নাম হবে 'গৌর-গোবিন্দ'। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত বিগ্রহ লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীগোবিন্দদেবের দক্ষিণে সেই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া প্রেমভরে সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত কার্ত্তিক মাসের শুক্লা-চতুর্দ্দশী তিথিতে তিরোধান লীলা করেন। (মতান্তরে, আশ্বিন মাসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা তিথিতে ইঁহার তিরোভাব)।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত

ভারতের পূর্বাঞ্চলে গৌহাটীতে (প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীকমলাক্ষ ভট্ট ছিলেন তাঁহার পিতা। মাতা-পিতা উভয়েই পরম বিষ্ণু ভক্ত। তাঁহাদের অপ্রকটে শ্রীজগদীশ প্রভু স্বীয় ভার্য্যা দুঃখিনী ও ভ্রাতা হিরণ্য পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার তীরে বসবাসের উদ্দেশ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ- সন্নিধানে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের খুবই অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য ছিল।

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১৯২ ও ১৪৩ শ্লোকানুসারে ঃ

"অপরে যজ্ঞপত্নৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ।
একাদশ্যাং যয়োর নং প্রার্থয়িত্বা ও খসৎপ্রভুঃ।।"
"আসাদ্ ব্রাজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ।
সোহয়ং নৃত্যবিনোবেদী শ্রীজগদীশাখ্যঃ পণ্ডিতঃ।।"

—শ্রীকৃষ্ণলীলায় যাঁহারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী ছিলেন, তাঁহারাই শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতরূপে গৌরলীলাপুষ্টির জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন।

ব্রজে রসকোবিদচন্দ্রহাস নর্ত্তকরূপেও শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পূর্ব্বলীলার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি শ্রীচৈতন্যশাখা ও নিত্যানন্দশাখা—উভয়ের মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন। "জগদীশ পণ্ডিত—পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন-প্রাণ।।"

নিমাইর প্রতি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ও শচীমাতার যে প্রকার বাৎসল্য প্রেম, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ও দুঃখিনী মাতারও অনুরূপ বাৎসল্য ভাব ছিল। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয় তাহা শ্রীমহাপ্রভু বাল্যলীলাচ্ছলে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবজ্জন্মদিন, একাদশী ও কতিপয় দ্বাদশীকে 'শ্রীহরিবাসর' বলা হয় । শ্রীহরিবাসর-দিবসে শ্রীহরির সেবকগণ সকল কর্ম হইতে বিরত হইয়া উপবাসাদি মুখে হরি সেবাব্রত অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সাক্ষাদ্ভগবান বলিয়া প্রভু এবার সেবকগণেরই পালনীয় শ্রীহরিবাসরে উপবাসাদি লীলা প্রদর্শন না করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ লীলা করিয়াছিলেন।

সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলাচ্ছলে সকলকে হরিনাম লওয়াইতেন। শচীমাতা ও অন্যান্য সকলে হাতে তালি দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিলে শিশু নিমাইর ক্রন্দন থামিয়া যাইত। একবার একাদশী তিথিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা এবং অন্যান্য সকলে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলেও শিষ্য নিমাইর ক্রন্দন থামিল না; তাহা দেখিয়া সকলেই বিচলিত হইয়া পড়েন এবং স্নেহসিক্ত হইয়া নিমাই এক্ষণে কি চাহিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে শিশু নিমাই জানাইলেন—"জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে আজ বিষ্ণুর জন্য যে নৈবেদ্য তৈয়ার হইয়াছে, তাহা আমি খাইতে চাহি এবং তাহা পাইলেই আমার কান্না থামিবে।" তাহা শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই শিশু জানিল কি করিয়া যে আজ একাদশী এবং একাদশীতে জগদীশ পণ্ডিত বিষ্ণুর জন্য নৈবেদ্য রচনা করিয়াছেন ইহাই বা কেমন করিয়া অবগত হইল? জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া তাঁহার গৃহে বিষ্ণু নৈবেদ্যের বিপুল আয়োজন দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাকে জানাইলেন যে তাঁহার নিমাই এ বিষ্ণু-নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য বায়না ধরিয়াছে এবং তাহা না পাইলে তাহার কান্না থামিবে না। এই দিবসে বিষ্ণু নৈবেদ্য-গ্রহণ যে পুত্রের পক্ষে অকল্যাণকর হইবে এই প্রকার ভয়ের কথাও জানাইলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নিত্যপার্ষদ। তিনি অনুভব করিলেন নন্দনন্দন শ্রীগোপালই নিমাইরূপে উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত নৈবেদ্য শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে অর্পণ করিলেন। দুই বিপ্র বোলে, 'বাপ, খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার'। ভক্ত প্রদত্ত নৈবেদ্য পাইয়া নিমাইর ক্রন্দন থামিল, তিনি পরমানন্দে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়।।
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৭০-৭১)

"ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়।
অভক্তের দ্রব্য পানে উলটি না চায়।।"

মহাপ্রভু প্রতি নিশায় শ্রীবাস মন্দিরে, অথবা কোন দিন চন্দ্রশেখর ভবনে কেবল পার্ষদগণ সঙ্গে যে কীর্তন বিলাসারম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীজগদীশ পণ্ডিতও ছিলেন (চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১১৫)। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের বিশুদ্ধ ভক্তিতে বশীভূত ছিলেন, শ্রীমহাপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও পণ্ডিতের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে নিজজনবোধে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন। নিত্যানন্দ প্রভু পাণিহাটিতে যে চিড়াদধি মহোৎসব করিয়াছিলেন, সে কালে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু তথায় উপস্থিত ছিলেন। জগাই-মাধাইকে উদ্ধারের পর মহাপ্রভু ভক্তগণসহ গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিয়া বিভিন্ন জলক্রীড়া করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও (দ্রঃ চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৩৩৭) শ্রীজগদীশ পণ্ডিতও একজন। কাজীদলন দিবসেও নগর কীর্ত্তনকালে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত অংশ গ্রহণকারী (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৫০)। মহাপ্রভু শ্রীধরগৃহে গমন ও লৌহপাত্রে জলপান কালে ভক্তগণের যে আনন্দ-ক্রন্দন উত্থিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যেও ছিলেন—

"জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর, গরুড়, কান্দয়ে সর্ব জন।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৫২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু কৃষ্ণভক্তি ও যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ধর্ম প্রচারকল্পে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র আর শ্রীগৌরহরি ও শ্রীজগন্নাথ অভিন্ন তত্ত্ব। পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু প্রেমে আপ্লুত হইলেন। পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীজগন্নাথ বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু বিরহ ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীজগন্নাথ কৃপা পরবশ হইয়া স্বপ্নে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ লইয়া সেবা করিবার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। তদানীন্তন মহারাজকে শ্রীজগন্নাথদেব নবকলেবর সময়ে তাঁহার যে শ্রীবিগ্রহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল তাহা শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুকে প্রদান করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। মহারাজ জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁহার ভারী বিগ্রহ কি প্রকারে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীজগন্নাথদেব এইরূপ নির্দ্দেশ দেন—তিনি শোলার ন্যায় হাল্কা হইবেন,

নববস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া একটি যষ্ঠির সাহায্যে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, যেখানে স্থাপন করিবার ইচ্ছা, সেইখানেই রাখিতে হইবে। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে শ্রীমূর্ত্তিবহন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের চক্রদহের অন্তর্গত গঙ্গার তটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাদে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু একজন ব্রাহ্মণ সেবকের স্কন্ধে জগন্নাথকে রাখিয়া গঙ্গায় স্নান ও তর্পণের জন্য গমন করিলে অকস্মাৎ শ্রীজগন্নাথদেব অত্যন্ত ভারী হইলেন। সেবক তখন স্কন্ধে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্তিকায় নামাইয়া রাখিলেন। জগদীশ প্রভু স্নান ও তর্পণান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন শ্রীজগন্নাথদেব অবতরণ করিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে শ্রীজগন্নাথদেব সেইখানেই অবস্থান করিতে ইচছা করিয়াছেন। চক্রদহ একটি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থান। পৌরাণিক যুগে উক্ত স্থান 'রথবর্ম্ম' নামে খ্যাত ছিল। দ্বাপরান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শ্রীপ্রদ্যুম্ন এক সময়ে সম্বরাসুরকে উক্ত স্থানে নিধন করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে উহা 'প্রদ্যুম্ন নগর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্ত্তীকালে সগর বংশ উদ্ধার মানসে ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়নকালে উক্তস্থানে তাঁহার রথচক্র প্রোথিত হওয়ায় 'প্রদ্যুম্ন নগর' 'চক্রদহ' নামে প্রচারিত হয়। অধুনা উক্তস্থানই 'চাকদহ' নামে খ্যাত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম ধাম হইতে শ্রীজগন্নাথদেব যশড়া শ্রীপাটে শুভবিজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইলে অগণিত নরনারী যশড়া শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য আসিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথদেবের অবস্থিতি যশড়া শ্রীপাটে হওয়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু, শ্রীমায়াপুরে তাঁহার গৃহে না যাইয়া যশড়াতে অবস্থানের সঙ্কল্প করেন। প্রথমে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে তথায় একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই মন্দির জীর্ণ হইলে উমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের সহধর্মিণী মোক্ষদা দাসী শ্রীমন্দিরের সংস্কার করেন। মন্দিরটি চূড়াবিহীন সাধারণ গৃহাকার। শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরাধাবল্লভ জীউ ও শ্রীগৌর-গোপাল বিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন। যে যষ্ঠির সাহায্যে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা জগন্নাথ মন্দিরে অদ্যাপি রক্ষিত আছে। শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব প্রতিবৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুবিশাল ময়দানে শ্রীস্নানযাত্রার

বেদী আছে। মূল মন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ স্নানযাত্রা তিথিতে উক্ত বেদীতে শুভবিজয় করিলে স্নানযাত্রা মহোৎসব তথায় সম্পন্ন হয়। ময়দানে মেলার প্রসিদ্ধি আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। পাঁচশত বৎসরের পুরাতন একটি জীর্ণ দোলমঞ্চও আছে। উক্ত দোল মঞ্চে দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহগণ শুভবিজয় করেন।।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু ও তাঁহার সহধর্মিণীর বাৎসল্য প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যশড়া শ্রীপাটে দুইবার শুভপদার্পণ করত সংকীর্ত্তন বিহার ও মহোৎসব করিয়াছিলেন। যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু যশড়া হইতে নীলাচলে যাইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময় দুঃখিনী মাতা বিরহকাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃখিনী মাতার বিরহ দুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহরূপে তথায় বিরাজিত থাকিতে স্বীকৃত হন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামভদ্র গোস্বামী তাঁহার পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

যশড়া শ্রীপাটে কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজ কিছুদিন অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব পৌষী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে। তাঁহার তিরোভাব দিবস পৌষী শুক্লা তৃতীয় তিথিতে যশড়া শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীমহেশ পণ্ডিত

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১২৯ অনুসারে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত দ্বাদশ গোপালে অন্তর্গত ৭ম গোপাল 'মহাবাহু সখা', "মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুর্ব্রজে সখা।" তাঁহার শ্রীপাট প্রথমে জিরাটের পূর্বপারে মসিপুরে ছিল। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে যাওয়ায় তথা হইতে শ্রীপাট সুখ সাগরের নিকটবর্ত্তী বেলে ডাঙ্গার স্থানান্তরিত হয়। গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গারও শ্রীপাট গঙ্গাগর্ভে চলিয়া গেলে উহা ১৩১৪ বঙ্গাব্দের প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত পাল পাড়ায় অবস্থিত হয়। তাহার পরই সর্বশেষ চাকদহের নিকটবর্ত্তী কাঁঠালপুলিতে স্থানান্তরিত হয়। (গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩ সংখ্যায় 'প্রাপ্ত পত্র' দ্রষ্টব্য।) ইনি শ্রীচৈতন্যশাখা ও শ্রীনিত্যানন্দ শাখা এই উভয় শাখায় গণিত হন। কেহ কেহ বলেন মহেশ পণ্ডিত যশড়া শ্রীপাটের শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা তিন ভাই—জগদীশ, হিরণ্য ও মহেশ। (চৈঃ চঃ আঃ ১১।৩২ অনুভাষ্য)

মহেশ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ সহচর ছিলেন। পাণিহাটিতে চিড়া-দধি মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর বলেন, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে গমন করেন, তখন তিনি মহেশ পণ্ডিতের চরণ দর্শন করেন।"

মহেশ পণ্ডিত আসি অতিশয় স্নেহে।
নরোত্তম বিদায় করিয়া স্থির নহে।।

(ভক্তিরত্নাকর ৮।২২০)।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেমন পতিত পাবন, উদার ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ মহেশ পণ্ডিতও অত্যন্ত উদার ও পতিতপাবন হইয়া জীবোদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্য অধ্যায় ৫।৭৪৪ "মহেশ পণ্ডিত অতিপরম মহাত্মা", শ্রীপাটের মন্দিরটি এক সামান্য গৃহাকারে জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শালগ্রাম বিরাজিত। মন্দির সম্মুখে মহেশ পণ্ডিতের ফল সমাজ বেদী।

পৌষী কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোধান।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

যিনি পূর্বে নন্দ মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি পুরাণ সকলের অর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত। (গৌঃ গঃ ১০৬)

শ্রীদেবানন্দের বাসস্থান ছিল শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা শ্রীমহেশ্বর বিশারদের গৃহের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে। চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।৯৮ এর গৌড়ীয় ভাষ্যে বলা হইয়াছে নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত এক উপনগরী কুলিয়া। বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরই প্রাচীন কুলিয়া যাহাকে অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলা হয়। নবধা ভক্তির পীঠ স্বরূপ নবদ্বীপধামের অন্তর্গত পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র 'কোলদ্বীপ'কে চলিত কথায় কুলিয়া বলা হয়। 'কোল' শব্দের অর্থে বরাহ। সত্যযুগে বাসুদেব বিপ্রকে ভগবান্ বরাহ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের টোলবাড়ীটি ছিল কুলিয়া গ্রামে।

দেবানন্দ পণ্ডিত বহুগণে গুণবান্ ও শান্ত স্বভাব ছিলেন; সুতরাং লোকে তাঁহাকে বহুমানন করিতেন। তিনি ভাগবত পাঠ করিবা সন্ন্যাসীর মত ব্রত বিশিষ্ট হইয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। কিন্তু ভক্তিহীনতা বশতঃ তাঁহার ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্যে ভক্তসেবা বিমুখতা দেখা গিয়াছিল। এইজন্য কৌমার্য ব্রত ধারণ করিয়াও বা ত্যাগের পথে চলিয়াও তিনি সেই সকল সৎগুণের ফল লাভ করিতে পারেন নাই। যাহারা দেবানন্দের নিকট শুধুমাত্র শব্দসিদ্ধি লৌকিক বিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য যাতায়াত করিত, তাহারা ভাগবত পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভজনচেষ্টা বুঝিতে পারে নাই। তিনি (শ্রীবাসপণ্ডিত) ভাবাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে দেবানন্দ পণ্ডিতের পাষণ্ড ছাত্রগণ তাহাদের পাঠের শ্রবণে ব্যাঘাত হইতেছে বিচার করিয়া তাঁহাকে সভা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। সেই গর্হিত কার্য্যে দেবানন্দ পণ্ডিত বাধা না দেওয়ায় তাঁহার বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়া যায়। শ্রীবাসের রোরুদ্যমান অবস্থার বিরাম না হওয়ায় ছাত্রগণ শ্রীচৈতন্যের নিতান্ত প্রিয়জন শ্রীবাসকে জগৎপাবন বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। শ্রীবাসের চিন্ময় কলেবরে যে সকল সাত্ত্বিক ভাবসমূহ দেখা গিয়াছিল, উহাই জগতে সকল প্রকার পবিত্রতা আনয়ন করেন—ইহা ছাত্রগণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পাঠাগারের বাহিরে নিক্ষেপ করায় তাহাদের পাঠের সুযোগ হইয়াছিল। দেবানন্দ পণ্ডিতের যদি কিছুমাত্র ভগবৎ সেবোন্মুখতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি অবোধ

ছাত্রগণকে ঐরূপ ভক্তিহীন ক্রিয়ায় যোগদান করিতে নিষেধ করিতেন। সুতরাং দেবানন্দ পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ—সকলেই বিষয় রোগনিরত, তর্কহত পাঠক মাত্র ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দকে দেখিয়াই ভক্তের নির্য্যাতন স্মরণ করিয়া তাহাকে বলেন;—শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনে হৃদয় দ্রব হয়, কেবল বহির্জগতের ভোগ পরায়ণ ব্যক্তিগণই কঠিন হৃদয় পোষণ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের সর্বতোমুখী চেষ্টা যে-কালে প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে তুমিও তোমার ছাত্রগণ না বুঝিয়া তাঁহাকে ভাগবত-শ্রবণ-কার্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তকে দেখিবার জন্য হরশীর্ষে অবস্থিতা গঙ্গাদেবীও নিমগ্না হইয়া নদীরূপে প্রকটিতা হন। সুতরাং তুমি যে তোমার ছাত্রগণের দ্বারা বলপূর্বক শ্রীবাসকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেই অপরাধসকল তোমাকে সঙ্গতভাবে ভগবদ্ বিমুখ করিয়াছে।' দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতের ব্যাখ্যাতা ছিলেন, তথাপি জন্ম-জন্মান্তরে ভাগবতের তাৎপর্য্য গ্রহণের সুকৃতি কখনও লাভ করেন নাই। যাহা হউক, শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন। প্রভুর বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া তাঁহার সুকৃতির উদয় হইল। ভগবান্ বিষ্ণু যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা মুক্তি লাভ করে। সুতরাং দেবানন্দের প্রতি ভগবানের ঐই বাক্যদণ্ড পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সৌভাগ্যলাভের জনক হইয়াছিল।

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এই চারিমূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। সাধারণতঃ বহির্বিচারে শ্রীঅর্চা-বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্য-বুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিয়াও উক্ত চারিমূর্ত্তি, ইঁহারা জগতের ভোগ্যবস্তুর বিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃভাব-সম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব, চিন্ময় জ্ঞান-প্রদাতা বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর প্রতি দেবানন্দ পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল না। বহু সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের বহুপ্রকারে সেবা করার ফলে মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মুখে মহাপ্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন হয়। এই বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে তিনি শুদ্ধভক্তিতে অনুরাগী হন।

"ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দকে ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিতের অধিক সৌভাগ্য এই যে, তিনি মহাপ্রভুর দণ্ডরূপ কৃপা লাভ করিয়া ছিলেন।

"চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতি সে পায়।
যারে দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায়।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৭৮

কোলদ্বীপ বা কুলিয়া অপরাধভঞ্জন পাট বলিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন হইয়া ছিল। গোপাল-চাপালের অপরাধকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব পৌষী একাদশী তিথিতে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্ট

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ১৩।১৯-এ তাঁহার গৌড়ীয় ভাষ্য টীকায় জানাইয়াছেন—"মহা দ্বিগ্বিজয়ী—শব্দে কেহ কেহ বলেন যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গলা ভট্টের শিষ্য কেশব ভট্ট বা কেশব কাশ্মীরীই এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এ বিষয়ে কালগত বিচারে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'ক্রমদীপিকা'-লেখক কেশব ভট্টের গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এই কেশব ভট্টকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীতে আচার্যরূপে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রমদীপিকা গ্রন্থের লেখক কেশব ভট্ট নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ধারার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকিলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের লেখক মহোদয় সে কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন।" পুনশ্চঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার ১৬ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকের টীকায় তিনি (প্রভুপাদ) তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"দিগ্বিজয়ী কাশ্মীর দেশীয় (কেশব) নামক পণ্ডিত। ইনি তৎকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ প্রতিভা দ্বারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে বহির্গত হইয়া অবশেষে গৌড়দেশে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ভগবদ্ভজনের জন্য প্রবেশ করেন। তিনি নিম্বার্ক রচিত বেদান্ত দর্শনের 'পারিজাত' ভাষ্যের টীকাকার শ্রীনিবাস আচার্য্যের 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' টীকায় 'কৌস্তুভপ্রভা' নাম্নী টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ তরঙ্গে নিম্বাদিত্যের শিষ্য পরম্পরায় ২৯তম সংখ্যায় 'কেশব কাশ্মীরী' নাম উল্লেখ আছে। সেই ভক্তিরত্নাকরে আছে—

'সরস্বতী দেবীর করিয়া মন্ত্র জপ।'
'হৈল সর্ব্ববিদ্যাস্ফূর্ত্তি বাড়িল প্রতাপ।।
সমদিশা জয় করি 'দিগ্বিজয়ী' খ্যাতি।
কাশ্মীর দেশস্থ অতিশিষ্ট বিপ্র জানি।।
সর্ব্ব ত্যাগ করি' প্রভু আজ্ঞায় চলিলা।
বর্ণি লীলা ভোগ 'লঘুকেশব' নামেতে।।'

—বৈষ্ণব মঞ্জুষা (১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক শিরোরত্নরূপে বিরাজ করিতে-ছিলেন, তখন সরস্বতীদেবীর বর প্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত সর্বদেশরাজ্যের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থিত পণ্ডিতবর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্য মহা দম্ভভরে তথায় আগমন করিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলী এইরূপ দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলে তিনি ছাত্রগণকে বলিলেন, 'ভগবান্ অহঙ্কারীর দর্প নিত্যকালই হরণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই নম্র হয়। হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, ব্যপণ প্রভৃতি রাজগণ 'মহা-দিগ্বিজয়ী' বলিয়া অত্যধিক অহংকারে প্রমত্ত হওয়ায়, অবশেষে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন। অতএব নবদ্বীপে সমাগত ঐ দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান্ অচিরেই চূর্ণ করিবেন।' এই বলিয়া প্রভু সেইদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবেশনপূর্বক দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ণচন্দ্রবতী সেই নিশার প্রাক্কালে দিগ্বিজয়ী প্রভুর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অতি অদ্ভুত তেজঃ কান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জানিতে পারিলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটী কথা বলিয়া পরে যথোচিত শিষ্টাচার ও সুকৌশলের সহিত তাঁহাকে পাপ নাশিনী গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন—

প্রভু কহে, "তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি, যাহা তুমি না কর বর্ণনা।।
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হৌক পাপ-বিমোচন।।"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।৭৭-৭৮

দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া শতমেঘ গর্জন ধ্বনির ন্যায় দ্রুতগতিতে অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই মহা দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ অদ্ভূত কবিত্ব শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী প্রহর কাল ঐরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হইলে, প্রভু

তাহাকে সেই সকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবা মাত্রই প্রভু সেই বর্ণনায় আদিতে, মধ্যে ও অন্তে শব্দ, অলঙ্কার ও নানাবিধ বিষয়ে অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন।

প্রভু বলে,—"এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হইতে বিষম অপার।।
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি'।
বোল দেখি?" কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।৯৪-৯৫

প্রশ্ন শুনিয়া সাক্ষাৎ বাণীর বরপুত্র হইয়াও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হতবুদ্ধি হইয়া অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক উত্তর প্রদান করিতে লাগিলে শ্রীগৌরসুন্দর পণ্ডিত যাহাই বলে তাহাতে দোষ দেখাইতে লাগিলেন। তখন দিগ্বিজয়ী অপ্রতিভ ও নিজ বাক্য-বোধেই অশক্ত হইয়া—

"সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।"
আপনে না বুঝে বিপ্র, কি বোলে আপনে।।

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।৯৮

পরা বিদ্যা বা সরস্বতী অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ যুক্ত ভোগবাঞ্ছা প্রবণ জীবগণের নিকট স্বীয় স্বরূপ গুপ্ত বা লুক্কায়িত রাখিয়া ছায়ামূর্ত্তি দুষ্টা সরস্বতী রূপে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বরাদি প্রদান করেন। তাদৃশ লব্ধবর অতীব পণ্ডিত অভিমানী ব্যক্তিগণ ত্রিভুবন বিজয়ে সমর্থ হইলেও বরদাপতি হইবার যোগ্য। যে শুদ্ধা সরস্বতী দেবীর নিষ্কপট করুণা-কটাক্ষে বিষ্ণুভক্তিরূপ পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে, তাঁহার পক্ষে মানুষকে জড়রাজ্যে দিগ্বিজয়ী প্রভৃতি বরপ্রদান অতীব অনায়াস সাধ্য ও অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার।

দিগ্বিজয়ী প্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না; ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পরদিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—'ষড়্ দর্শনে অসামান্য

পণ্ডিতগণকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন, কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকবশতঃ শেষকালে শিশু-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে আজ পরাভূত হইতে হইল! —ইহার কারণ কি? হয় ত' বা সরস্বতীদেবীর নিকটেই তাঁহার কোন প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে।' ভাবিয়া সরস্বতী মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতী দেবী দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন এবং বলিলেন,—'নিমাই পণ্ডিত সামান্য মর্ত্য পণ্ডিত নহেন,—সাক্ষাৎ সর্ব-শক্তিমান স্বয়ং ভগবান্; সরস্বতী দেবী তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি পরাবিদ্যার ছায়াশক্তি মাত্র, সেই ছায়া শক্তিরূপা সরস্বতী নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন, তিনি শ্রীনারায়ণেরই অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করেন মাত্র।' দেবী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, পণ্ডিত এতদিনে প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্র-জপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ীকে শীঘ্রই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জাগরিত হইয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ কাকূক্তি করিয়া স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত ও সরস্বতী দেবীর উপদেশ প্রভুকে জানাইলেন। সরস্বতীপতি প্রভুও দিগ্‌বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল পরাবিদ্যারই উপাদেয়তা এবং দিগ্বিজয় বা জড় প্রতিষ্ঠাদি মূলা অপরাবিদ্যার হেয়তা প্রভৃতির বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

"'দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে, সেই বিদ্যা সত্য' কহে।।
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।।
এতেক ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল।।
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮)

এই সকল কথা উপদেশ করিয়া প্রভু সরস্বতী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন। প্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দেহে যুগপৎ ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইল,—তিনি পরাভক্তি লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া "তৃণাদপি সুনীচ" হইলেন। নিমাই পণ্ডিত এইরূপে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিলে নবদ্বীপবাসি পণ্ডিতগণ তাঁহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'বাদি সিংহ'-পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সর্ব্বত্র তাঁহার অসামান্য সৎকীর্ত্তি বিঘোষিত হইল।

শ্রীবল্লভাচার্য্য

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারাণসীতে অন্ধ্রদেশ হইতে আগত লক্ষ্মণ বাত্তার ও এল্লাম্মা গারু বাস করিতেন। মুসলিমগণ বার বার আক্রমণ করার জন্য তাঁহারা তিন সন্তান লইয়া দক্ষিণদেশের দিকে যাত্রা করেন। সেই সন্ধিক্ষণে এল্লাম্মা গারু গর্ভবতী ছিলেন এবং এক বনের মধ্যে দিয়া গমনের পরিশ্রান্তিতে তাঁহার এক মৃত সন্তান প্রসব হয়। সেইটিকে একটি বৃক্ষের ঝোপে রাখিয়া মুক্ত মনে পথ চলিতে থাকেন। পরদিবস এক স্বপ্ন দেখিয়া খুব চিন্তান্বিত হন, ফলে যেখানে তাঁহারা শিশুটিকে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেস্থানে ফিরিয়া আসেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখেন যে শিশুটি রক্ষণস্বরূপ অগ্নি পরিবৃত জীবিত আছে। এই চতুর্থ শিশুর আবির্ভাব দিব্য জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল। চারি বৎসর দক্ষিণদেশে বাসের পর তাঁহারা বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন এই যুবা বল্লভের উপনয়ন সংস্কার করিলেন ও তাহাকে শ্রীমাধবানন্দের গুরুকুলমে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। একাদশ বর্ষ বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মন হিন্দুত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্যমূলক ধারায় যথা, অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত, একান্তভাবে নিমজ্জিত থাকে। 'সত্য' উপলব্ধি করিবার জন্য এক ব্যাপক তীর্থযাত্রায় পদব্রজেই বহির্গত হইবার জন্য মনস্থ করিলেন ও মাতার অনুমতি লাভ করিলেন। প্রারম্ভ হইতে শ্রীবল্লভ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদকে সমর্থন করেন নাই। তবে তিনি শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের মতবাদকে পূর্ণ সমর্থন করিতেন। সেইকালে বিজয়নগর রাজ্য শ্রীকৃষ্ণ দেবরায়ার রাজত্ব সর্বদিক দিয়া প্রচুরভাবে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে ছিল, সেই রাজ্যে শ্রীবল্লভের মাতুল সরকারী এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার সেখানে অবস্থানের সুযোগ হইল ও সেই সঙ্গে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের দার্শনিক সত্যের অন্তনির্হিত মূল্য বিষয়ে শিক্ষণ লাভের সুযোগও হইল। তিনি সকল প্রকার শাস্ত্র-পণ্ডিতের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতেন এবং মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে অদ্বৈতবাদিগণের মায়াবাদের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া নিজের বক্তব্য প্রামাণ্য যুক্তি ও উদ্ধৃতি দ্বারা কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তিনি ভারতের দক্ষিণ ভাগটিকে খুব পছন্দ করিতেন যেহেতু সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন আগে হইতেই ছিল ও রামেশ্বরম গমন করিলেন। অতঃপর তিনি পশ্চিমদিকে গমন করিয়া মালাবার ও কনড়ের মধ্য দিয়া গমন করিয়া কৌণ্ডেন্য নদীর সন্নিহিত

এক আশ্রমে অবস্থান করেন, সেইস্থানে তিনি কোণ্ডিন্য মহর্ষি প্রচারিত ভক্তিধর্ম মনের মধ্যে গ্রহণের সুযোগ পাইলেন।

দক্ষিণভারতে এই একাদিক্রমে তীর্থযাত্রার পর বিজয়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিলে শাসনকর্ত্তা কৃষ্ণ দেবরায়ার সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং স্বর্ণসম্পদ দান করিয়া তাঁহার প্রধান পুরোহিত করিয়া রাখিলেন। অতঃপর বিদায় লইয়া ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলেন। পাণ্ডারিপুরে আসিয়া তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিলেন। পাণ্ডারিপুরের মন্দিরটি শ্রীবল্লভকে খুবই আকর্ষণ করিল। কিছুকাল তিনি সে স্থানে অবস্থান করিলেন ও বিটোবা রুক্মিণীর দর্শনে সুখ ভোগ করিলেন। মাতার অনুমতিক্রমে তিনি বিবাহ করিলেন। হিমালয় হইতে কেপ কমোরিণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণের পর তিনি ব্রজভূমিতে পৌঁছাইয়া গিরিরাজ পর্বত দর্শন করিলেন, পর্বতটি তাঁহার কাছে এক দিব্য মন্দির বলিয়া মনে হইল; শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত গিরিধারী গোপালের মূর্ত্তিটি কয়েক সহস্র বৎসর এক গুহায় অবস্থানের পর সেখানে হইতে আনীত হইয়া তাঁহার জন্য নির্মিত এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন ও নিয়মিত সেবা-পূজা চলিতে থাকে, পরবর্ত্তীকালে উদয়পুরের নিকট নাথদ্বারে স্থানান্তরিত হন। বাংলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদানীন্তন শ্রীবল্লভের সমসাময়িক উভয়েই বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমায় নিমজ্জিত। পূর্বোক্ত জন রাধাকৃষ্ণের ও পরবর্ত্তীজন বালগোপাল সেবায় মগ্ন। উভয়ের মধ্যে কয়েকবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল ও পরস্পরের শ্রদ্ধা বিনিময় হইয়াছিল। একবার শ্রীচৈতন্য বল্লভের কুটীরে অধিক বেলায় গমন করিলে ও বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া সত্বর তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং পত্নীকে আদেশ করিলেন অতিথিকে সন্ধ্যা পূজার জন্য রক্ষিত নৈবেদ্য নিবেদন করিত। পত্নী তাহাই করিলেন যদিও পতির এই প্রকার ব্যত্যয় দর্শনে বিব্রত বোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পিছনে নীরব সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ সেই নিবেদিত পবিত্র ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিতেছেন তাহা প্রকাশিত হইল এবং শ্রীবল্লভ তখন পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পূজার যোগ্য মহত্ত্ব দর্শন করার জন্য। অধিকাংশই অদ্বৈতবাদী বারাণসীর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিবাহিত জীবন যাপনকারী শ্রীবল্লভের চিরকাল সেখানে অবস্থানের বিরোধিতা করিল এবং তাঁহার তীর্থ যাত্রার সাফল্যকে ও আত্মিক অনুভূতিকে স্মরণীয় রাখার উপযুক্ত

তাহা অনুমোদন করিল না এবং এক বিশাল ভোজে ৩০০০ লোককে আপ্যায়িত করিয়া সেই উপলক্ষ্যে উৎসব দানকেও পছন্দ করিল না। কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়া পরে এলাহাবাদের নিকট আড়াইল গ্রামে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের নিকট ২০ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তিন প্রকার তুলসীগাছ আপনা আপনি সেখানে জন্মিয়াছে ও মনে করিলেন স্থানটি শ্রীকৃষ্ণের স্থায়ী আবাস, এইখানে বসিয়াই তিনি ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবতের ভাষ্যসকল প্রণয়ন করেন। বল্লভের মতানুসারে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান উর্দ্ধে ফলদানের ক্ষমতার দিক দিয়া ভক্তির বহু নিম্নস্থানে অবস্থান করে। বল্লভের প্রথায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির পূজা অপরিহার্য্য। তিনি সকল শিষ্যকে "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মাম্" মন্ত্রটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রদান করিতেন। ভাগবত পুরাণের বিশেষ মূল্য তিনি প্রচার করিতেন। গৃহে গৃহে পূজা অনুষ্ঠিত হয় ও ভগবানের দর্শনের জন্য সকলে সেখানে সমবেত হয়। মুর্ত্তিটিকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অনুভূত হয়, শুধু প্রতীক নহে। বল্লভ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পদ্ধতিতে বাৎসল্য প্রেমের প্রাধান্য, যেমন শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের রাধা-কৃষ্ণের মধুর ভাবের, সেখানে শ্রীচৈতন্য শ্রীকীর্ত্তনের উপর অধিক জোর দিয়াছেন এবং ভক্তিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন।

সুতরাং পরিষ্কার এই যে বল্লভের ধর্মবিশ্বাস হিন্দুর সংস্কৃতি ও ধর্মের নির্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের করুণার উপর তাঁহার জোর তাঁহার দর্শনের মৌলিক বস্তু। রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে কিছু অংশে তাঁহার সম্প্রদায় ও শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাঁহার পুত্রদ্বয় গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলনাথ এবং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি হইবে তাহা জানাইবার জন্য অনুরোধ করেন। যে গ্রানাইট প্রস্তরের উপর তিনি উপবেশন করিতেন তাহাতে লিখিয়াছেন; "যদি কৃষ্ণচিন্তা হইতে তুমি দূরে থাক, তবে কাল তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে গ্রাস করিবে এবং তোমার দেহ, মন ও জীবনকে ধ্বংস করিবে।"

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষ

শ্রীগোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ—এই তিন ভাই উত্তর রাঢ়ীয় শৌক্র কায়স্থ কুলোদ্ভূত। (চৈঃ চঃ অঃ ৫ম অঃ)—

"সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।।
যাহারে কহেন বৃন্দাবনেরর গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম।।
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।।"

চৈঃ ভাঃ অঃ (৫/২৫৭-২৫৯)

গৌরগণোদ্দেশের ১১৮ শ্লোক অনুসারে—

" 'কলাবতী'; 'রসোল্লাসা,' 'গুণতুঙ্গা' ব্রজে স্থিতা।
শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্য তা মতাঃ।।
গোবিন্দ মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমম্।"

ব্রজলীলায় যিনি 'কলাবতী' তিনি গৌর লীলায় 'শ্রীগোবিন্দ ঘোষ'।

গৌড়ে প্রচারে আসিবার সময় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষ আসিয়া ছিলেন। কিন্তু শ্রীগোবিন্দ সে সময় নীলাচলেই মহাপ্রভুর নিকটে ছিলেন। "প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ" (চৈঃ চঃ আঃ ১০। ১১৮)। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের শাখায় গণিত হইয়াছেন।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ তমলুকে, শ্রীমাধব ঘোষ দাঁইহাটে এবং শ্রীগোবিন্দ অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট করেন।

শ্রীক্ষেত্রে রথাকর্ষণ কালে মহাপ্রভুর সহিত ৭টী কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটিতে (চতুর্থ এই গোবিন্দ মূল গায়ক ছিলেন এবং সাক্ষাৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে প্রধান নর্ত্তকরূপে লাভ করিয়া ছিলেন। চতুর্থ দলের মূল গায়ক গোবিন্দ; দোহার ১। (ছোট?) হরিদাস, ২। বিষ্ণুদাস, ৩। রাঘব, ৪। মাধব, ৫। বাসুঘোষ; নর্ত্তক শ্রীবক্রেশ্বর।

মহাপ্রভুর যখন নর্ত্তনেচ্ছা হয় তখন যে নয়জনকে লইয়া কীর্ত্তনদল গঠন করেন তাহাদের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ একজন—অপর আটজন—শ্রীবাস, রামাই, রঘু, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ। (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৭৩)

শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীহরিবাসরে উষাকালে কীর্ত্তন ও নৃত্যের শুভারম্ভে

"লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১৪২)

কাজী দলন দিবসে নগর সঙ্কীর্ত্তনে কীর্ত্তনকালে (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।১৫২) "গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য্য। শুক্লাম্বর-আদি যে যে জানে এই কার্য্য।" হইতে বুঝা যায় এই গোবিন্দ ঘোষও সঙ্গী ছিলেন এবং মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন, যথা ঃ—"মুরারি, মুকুন্দ দত্ত, রামাই গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, বাসুদেব—আদি ভক্তবৃন্দ।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।২০৯)। গৌরাদেশে নীলাচল হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়াগমন পূর্ব্বক রাঘব ভবনে অবস্থান কালে গোবিন্দাদির কীর্ত্তন প্রসঙ্গে, পূর্ব্বে উক্ত চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৫৯ মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব ভ্রাতৃত্রয়ের নৃত্য প্রসঙ্গে,—"মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই। গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর নিতাই।। " বক্তব্য এই যে শ্রীমাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষেরা সকলেই কীর্ত্তন তৎপর ছিলেন। পার্থিব কীর্ত্তনীয়াগণ যেরূপ জড়বিচারপর হন, ইঁহাদের তদ্রূপ বিচার ছিল না। তজ্জন্যই ইঁহারা "বৃন্দাবনের গায়ক" বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রাকৃত বিচার সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে হরিসেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধিলাভ করে। বিশেষতঃ মাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ—ইঁহারা ব্রজের মধুর রসের আশ্রয় বিগ্রহের কায়ব্যূহ।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৬ হইতে দেখা যায়—গৌড়ীয় ভক্তগণ তৃতীয় বৎসরে নীলাচলে আসিতে উদ্যোগী হইতে শ্রীগোবিন্দও যাত্রা করিয়াছিলেন—"আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই। বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দ তিন ভাই।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে ইনি প্রাপ্ত কৃষ্ণশিলা হইতে অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকটিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে—তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র স্বধাম প্রাপ্ত হইলে তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর কে পিণ্ড দিবে, সেই সময়

শ্রীগোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন—"তুমি চিন্তা করিও না, আমি পিণ্ড দিব।" শ্রীগোবিন্দ ঘোষ তিরোধান লীলা করিলে পরদিবস শ্রীগোপীনাথ তাঁহার পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। আজও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করেন। চৈত্র কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোধান হয়। শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্লা দ্বিতীয়াতে অপ্রকট হন।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের রচিত একটি পদাবলী ঃ—

হে হে রে নদীয়া বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসরিয়া গোরাচাঁদে ফিরাও।।
তো সূবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।।
কি শেল হিয়ায় হয় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।।
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস।।
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া।।

শ্রীবাসুদেব বিপ্র

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জানাইছেন—'দক্ষিণ-পূর্ব রেল (পূর্ব নাম বি.এন্ আর লাইন) অন্তর্গত উড়িয্যার গঞ্জাম জেলাতে চিকাকোল রোড (বর্ত্তমান নাম শ্রীকাকুলাম রোড) ষ্টেশন হইতে আটমাইল পূর্ব্বে 'কূর্ম্মাচলম্' বা 'শ্রীকূর্ম্মম্'। তেলেগু ভাষিগণের ইহা শ্রেষ্ঠ তীর্থ যেখানে শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তি আছেন। শ্রীরামানুজ কূর্ম্মমূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিতে পারিয়া তাঁহার সেবা প্রকাশ করেন। এই মন্দির শ্রীমাধ্ব-মঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগর রাজের অধিকারে ছিল।

দাক্ষিণাত্য নিবাসী শ্রীবাসুদেব বিপ্র অতীব দীন হীনরূপে অবস্থান করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষাদেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকট ভজন পরায়ণ' অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণ নাম প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিযা দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড় প্রতিষ্ঠারূপ বিযয তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথদাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মাগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীনিরোত্তম, শ্রীল মধ্বরামানুজাদির বহু শিষ্য করণকে ভক্তি অঙ্গের বাধক ও বিষয় তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিযা অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ অলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইয়া গৌরানুগত্য পূর্বক যাহাতে নিজ ভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্য রূপে শ্রীগৌরাঙ্গের হইয়া শিক্ষাপ্রদান। শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৩০ শ্লোকে)।

মহাপ্রভুই বাসুদেব বিপ্রের মহিমা জগতকে জানাইয়া দেন, তিনিই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে 'কূর্ম্ম' নামক বিপ্রকে ধন্য করিয়াছিলেন। সর্বাঙ্গ গলিতকুষ্ঠ বাসুদেব বিপ্র যখন জানিতে পারিলেন যে মহাপ্রভু 'কূর্ম্ম' বিপ্রের গৃহে আছেন, তখন তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথায় আসিলেন। কিন্তু আসিয়া শুনিলেন মহাপ্রভু তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া তিনি অতীব

দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সর্বান্তর্যামী মহাপ্রভু অনেক দূরপথ চলিয়া গেলেও ভক্তবিপ্রকে দর্শন দান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শে বিপ্রের কুষ্ঠব্যাধি দূর হল, পরম সুন্দর সুপুরুষ দেহ হইলেন। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠব্যাধিকে অগ্রাহ্য করিযা তাঁহাকে পরম প্রিয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন। বড় অদ্ভূত চরিত্র এই বাসুদেব বিপ্র। গলিত কুষ্ঠ সর্ব অঙ্গময়, পোকায় ভর্ত্তি সর্বশরীর, পুঁজরক্ত খাইতে খাইতে পোকাগুলি পড়িয়া গেলে তিনি সেগুলিকে আবার উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। —'বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়। সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ, তাতে কীড়াময়।। অঙ্গ হইতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়। উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞ।।' চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১৩৬-৩৭। প্রভুস্পর্শে সুন্দর দেহ লাভ করিয়া বিপ্রের মনে বিস্ময় জাগিল। তখন তিনি ভাগবতের ১০।৮১।১৫ শ্লোকে শ্রীসুদামা বিপ্রের উক্তি স্মরণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন

> "ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকতনঃ।
> ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্থাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ।।"

—কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, বিপ্রাধম, আর কোথায় সে শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ। অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

বহু স্তুতি করিয়া বাসুদেব বিপ্র নিবেদন করিলেন—'হে দয়াময়, জীবে এই গুণ থাকে না, কেবল তোমাতেই আছে। আমাকে দেখিয়া দুর্গন্ধে লোকে দূর হইতে পলায়ন করে; তুমি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে এতদিন আমি ভালই ছিলাম, এইবার এই সুন্দর দেহের জন্য আমার মনে অহঙ্কার জন্মাইবে।' প্রভু তাঁহাকে আচার্য্য হইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশপূর্ব্বক জীবোদ্ধার করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন—

> "—কভু তোমার না হবে অভিমান।
> নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম।।
> কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১৪৭-৪৮)

এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু চলিয়া গেলে দুই বিপ্র গলাগলি করিয়া প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহাই 'বাসুদেবোদ্ধার' লীলা এবং সেই হইতে মহাপ্রভুর নাম হইল 'বাসুদেবামৃতপ্রদ।' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃক অচৈতন্য-জীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেই সকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণ সেবায়-উন্মুখ জীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন। এইরূপে অচ্যুত গোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌত-পন্থা-প্রসার দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারবাদ মাহাত্ম্য প্রদর্শন লীলা।"—শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৫২ শ্লোক উদ্ধৃত "এই লীলা" বিষয়ক অনুভাষ্য।

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া থানার অন্তর্গত 'ছন্‌হরা'-নামক গ্রামে এবং শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট মেখলা-গ্রামে হইতে দশ ক্রোশ দূরে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৪০ শ্লোক অনুসারে 'ব্রজে যাঁহারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন, এক্ষণে সেই দুই জন মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত নামে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গায়ক।' ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-গায়কৌ।। ইনি (শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর) শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীশিবানন্দ সেনের অতি প্রিয়তম সুহৃৎ ছিলেন। হাওড়া-কাটোয়া লাইনে 'পূর্বস্থলী' ষ্টেশন হইতে একমাইল দূরে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী-সুত ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভূমি 'মাম্‌গাছি' গ্রামে ইঁহার স্থাপিত শ্রীমদন গোপালের অর্চাবিগ্রহ একটি জীর্ণ মন্দিরে অদ্যাপি বর্ত্তমান। কুমার হট্টে বা কাঞ্চনপল্লীতে আসিয়া ইনি শ্রীবাসও শিবানন্দের সহিত বাস করিতেন। ইঁহার ব্যায় বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দকে ইঁহার 'সরখেল' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হইয়া ব্যয়ভার সমাধান বা লাঘব করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ৯৩-৯৬) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ভ্রাতা। প্রেমবিলাস মতে ইনি অম্বষ্ঠকুলোদ্ভূত এবং মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

"চট্টগ্রামদেশে চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে খ্যাত হয়।।
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত।।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন।
দুই আসি বাস নবদ্বীপে করিলেন।।"

শ্রীহরি-বিমুখ জীবের দুর্গতি ও দুর্দশা দর্শনে ইঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কাতর প্রার্থনা—

"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার।।

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৬০-১৬৩)

"জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিত চাহে জীব ছাড়াইয়া।।"

বাসুদেব দত্তের অতি অদ্ভূত জীব দুঃখ কাতরতার কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

"ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার।।
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ, ধরে সর্ববল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল?
তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৬৭-৬৯ শ্লোকের অনুভাষ্যে)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'পাশ্চাত্যরাজে খৃষ্টভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, তাঁহাদের গুরু একমাত্র মহামতি যীশুখৃষ্টই জীবের সর্বপাপভার গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীগৌরপার্ষদ মধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ন্যায় তদপেক্ষা অনন্ত কোটী গুণে অধিকতর উন্নত ও উদার সার্ব্বজনীন প্রেম ভাব জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের মধ্যে জড়ীয় স্বার্থত্যাগরূপ 'নিঃস্বার্থ', বিষ্ণুসেবারূপ চিন্ময় 'পরার্থ' ও 'স্বার্থ' অপূর্ব্বভাবে একমত্র সম্মিলিত। তিনি গৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ বাস্তব বস্তু নিরস্তকুহক স্বয়ং ভগবজ্ জ্ঞানে সমগ্র জীববৃন্দের কৃষ্ণ বৈমুখ্যরূপ ভবরোগ (শুধু 'পাপ' নহে, সর্ব্বপ্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতম 'অপরাধ' রাশি) নিজস্কন্ধে গ্রহণ-পূর্বক তাঁহাদের ভবরোগ মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিষ্কপটভাবে প্রার্থনা করিয়া যে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাহা সমগ্র জগতে, শুধু জগতে কেন, সমগ্র চতুর্দ্দশভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী এবং জ্ঞানীরও কল্পনাতীত। মায়াবশে দ্বিতীয়াভিনিবেশ নিবন্ধন ভেদবুদ্ধি

হেতু হিংসাবৃত্তি প্রধান জীবগণ দ্বৈত জগতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর্শকেই বহুমানন করে বলিয়া তাঁহাদের অধিকাংশই কুকর্ম্মী ও কুজ্ঞানী; তাহারা বৈকুণ্ঠসেবক বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের নরকভোগ বাঞ্ছা শ্রবণে নৈসর্গিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বভাব মূলে উল্লাস প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে একজন 'পুণ্যবান্ সৎকর্ম্মী' অথবা 'ব্রহ্মজ্ঞানীর' সমপর্য্যায়ে জ্ঞান করিয়া প্রচুর সম্মান বা প্রতিষ্ঠা প্রদান করিলেও, দত্ত ঠাকুর তদপেক্ষা যে অনন্তকোটি গুণে অধিক 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, ইহা আদৌ অতিরঞ্জিত প্রশংসা বাক্য বা অর্থবাদ নহে, অতি নিরপেক্ষ সত্য কথা। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় "পরদুঃখদুঃখী" গৌরদাসগণের আগমনে পৃথিবী ধন্যা, শুধু প্রপঞ্চ নহে, সমগ্র জীবকুলও ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ন্যায় অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তি বিশিষ্ট মহাভাগবতের গুণবর্ণন কার্য্যেই কবি ও ঐতিহাসিকের লেখনী জড়ানুসন্ধান রহিত হইয়া স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ-সার্থকতা সম্পাদন করে,—মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাস এতই "মহতোঽপি মহীয়ান্ ও গরীয়সোঽপি গরীয়ান্"।

পুনশ্চঃ পূর্বোদ্ধৃত ১৬৭-১৬৯ শ্লোকের অনুভাষ্যে তিনি (সরস্বতী ঠাকুর) বলেন—

"প্রভু বাসুদেবকে বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-সর্বশক্তি মান; তিনি সমস্ত জীবকে জীবের জড়ভোগবাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন। তুমি যখন সমদৃক্ হইয়া, উচ্চাবচ সমস্ত জীবের পক্ষ হইতে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিলে, তখন তোমার প্রার্থনানুসারে পাপভোগ ব্যতীতই সকলের উদ্ধার হইবে; তদ্বিনিময়ে তোমাকে তাহাদের জন্য পাপফল ভোগ করিতে হইবে না। তুমি যাঁহাদের মঙ্গলবাঞ্ছা করিবে, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব' হইবেন এবং বৈষ্ণবের প্রাক্তন দুষ্কৃতি সমূহের ফলভোগ হইতেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা পাপ-পুণ্যের সেবা বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক হইবেন।"

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিবাস চট্টগ্রামে হইলেও শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহার একটি গঙ্গাবাস বাটী ছিল। ভগবদাকর্ষণে পুণ্ডরীক তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপের বাড়ীতে অনেকের অজ্ঞাতসারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ কেহই পুণ্ডরীকের বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে তখন পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। পুণ্ডরীকের প্রগাঢ় প্রেমসেবা-মহিমা বৈদ্য উপাধ্যায় মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুর জানিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রস্তাবক্রমে প্রতিরাত্রে শ্রীবাস মন্দিরে কীর্ত্তন বিলাস কালে বহু বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরও তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন; কাজী-দলনে যাত্রা কালেও অগণিত ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীবাসুদেব নগর সঙ্কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণকারী।

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর—জগতের প্রত্যেকেরই হিতকারী, সর্ব্বভূতে কৃপালু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কথিত পঞ্চরস-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরসে প্রমত্ত। মহাভাগবত বলিয়া সকলের অদোষদর্শী ও সকলের মঙ্গল বিধানে অতি ব্যগ্র এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি,—ইংরাজীতে যাঁহাকে "Greater altruist" (মহান পরার্থপর ব্যক্তি) বলা যায়। অচেতন পদার্থবৎ অতি কঠিন হৃদয় ব্যক্তিও বাসুদেবের আর্দ্রতা লক্ষ্য করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইত। শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের নিকট বিক্রীত বলিয়া জ্ঞান করিতেন অর্থাৎ আপনাকে বাসুদেবের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন—

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।।
দত্ত আমা যথা বেচে, তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই।।
বাসুদেব দত্তের বাতাস যা'র গায়।
লাগিয়াছে, তাঁরে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়।।
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল।
এ দেহ আমার-বাসুদেবের কেবল"।।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।২৭-৩০)

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অনুগৃহীত যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। গৌড় ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুসহ রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরী গমন কালে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টালিকার উপর হইতে যে সময় শ্রীগোপীনাথাচার্য্য সকল বৈষ্ণব পরিচয় প্রদান করিতে-ছিলেন সে সময় রাজাও তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বাল্য সঙ্গী মুকুন্দ (দত্ত) অপেক্ষা বাসুদেব দত্তে অধিকতর প্রীতি ছিল। প্রভু তাঁহাকে (বাসুদেবকে) দেখিয়া বলেন—

যদ্যপি মুকুন্দ আমা-সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাঁহা হইতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১৩৮)

বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। তাই বাসুদেব বলিলেন—মুকুন্দ আমার পূর্ব্বেই আপনার চরণ আশ্রয় করিয়াছে, আমি পরে করিলাম, সুতরাং মুকুন্দের পারমার্থিক জন্ম আমার পূর্ব্বে হইয়াছে, তজ্জন্য আমি কনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম। মহাপ্রভু বাসুদেবকে আদেশ করেন দক্ষিণদেশ হইতে আনীত দুই পুস্তক 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কর্ণামৃত' শ্রীস্বরূপের নিকট হইতে লইয়া লিখিয়া লইতে। রথযাত্রার প্রারম্ভে যে চারি সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় দলে মুকুন্দ মূল গায়ক ও ৫ জন দোহারের মধ্যে বাসুদেব দত্ত ছিলেন। গুণ্ডিচার নিকটবর্ত্তী এক উদ্যান আইটোটায়—

প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।৯৮)

চাতুর্ম্মাস্য শেষে ভক্তগণ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত ও জগদানন্দ শ্রীশচী সকাশে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর সংবাদ তাঁহাকে পরিবেশন কালে শচীমাতা—

বাসুদেব, মুরারী গুপ্ত জগদানন্দে পাঞা।
আনন্দে রাখিলা ঘরে না দেন ছাড়িয়া।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।৯৮)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর

তাঁহার উপর অত্যাচারিগণের বিরুদ্ধে বিজয়ী

সাধুগণের মধ্যে অন্যতম এই সাধুটি পাঁচ শতাব্দীরও পূর্বে অধুনা বাংলাদেশস্থ যশোহর জেলার বূঢ়হন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মত প্রামাণ্য গ্রন্থাদির (যেগুলি তাঁহার প্রায় সমসাময়িক) বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে, তিনি মুসলমান পরিবারে জন্মিয়া-ছিলেন।

বাল্যকালের প্রারম্ভ হইতেই তিনি হরিনামে খুব অনুরক্ত ছিলেন এবং যেখানেই হরিনাম হইত, সেখানেই তাঁহার গতিবিধি লক্ষিত হইত। পরাম্পরাগত-ভাবে শুনা যায় এক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গ করিবার নিমিত্ত তিনি সংসার-প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন, সেই সাধুটির সহিত তিনি দীর্ঘকাল কাটাইতেন ও তাঁহারই আদেশে বূঢ়হন হইতে দূরে, তবে একই জেলায় বেনাপোলে একটি পাতার ঘর নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি তুলসীসেবা করিতেন ও দিবা-রাত্র উচ্চৈঃস্বরে তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। কালক্রমে শুদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহ ও দিবারাত্র কীর্ত্তনের ফলে সে স্থানের ও দূর-দূরান্ত হইতেও বিশ্বাস, সম্মান ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, যেগুলি ভক্তগণ না চাহিলেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

কিন্তু হিংসুক ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি সর্বত্রই থাকে এবং প্রায় নিকটবর্ত্তী একস্থানে কেহ কেহ বলেন স্থানটির নাম কাগজা পুকুরিয়া, রামচন্দ্র খান নামে এক কুখ্যাত শয়তান বৈষ্ণব বিদ্বেষী জমিদার ছিল এবং হরিদাসের প্রভূত সম্মান তাহার কাছে অসহ্য ছিল। প্রভূত ধনসম্পদ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেহ তাহাকে সম্মান করিতেন না, যদিও ভয় করিতেন; কিন্তু এই ভিক্ষান্নজীবী হরিদাস সকলশ্রেণীর লোকের নিকট উচ্চ সম্মান লাভ করিতেন। তাহাতে খানের প্রভূত অন্তর্দাহ হয়। খান বহুপ্রকারে চেষ্টা করে যাহাতে ঠাকুর হতাদর প্রাপ্ত হন ও অপদস্থ হন, কিন্তু কোনই ফল হয় না। কিন্তু তাহার অহঙ্কার তাহাকে থামিতে দেয় নাই, তাহার মনে জেদ্ জাগে তাঁহাকে লোকের সম্মান হইতে চ্যুত করিতে। অবশেষে সে স্থির করে বেশ্যার মোহিনী মায়ার ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহার পতন ঘটাইতে, তারপর তাঁহাকে দুশ্চরিত্র বলিয়া ঘোষণা করা, সে সময় মানুষ তাঁহাকে সম্মান হইতে বিচ্যুত করিবে ও তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া প্রমাণ করিবে। সে

তাহাদিগকে প্রভূত অর্থ ও উপহারাদির প্রলোভন দেখাইয়া ঠাকুরের বৈরাগ্য ভাঙ্গাইয়া দিয়া তাঁহাকে এক ঘৃণার পাত্রে পরিণত করিতে বলিয়া দিল, যাহাতে তাহার নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে।

বেশ্যাগণও ঠাকুরকে এক মহান্ সাধু হিসাবে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখিত এবং খানের প্রস্তাব শুনিয়া তাহারা একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল পাছে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে যাইয়া ভগবানের অসন্তোষের কারণ হইয়া নিজেদের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। কিন্তু খানের প্রভূত পরিমাণ অর্থের প্রলোভন ও তাহার আদেশ অমান্য করার জন্য তাহার লোকজনদের হস্তে নিগৃহীত হইবার ভয়ে খুব দোটানায় পড়িয়া গেল ও চিন্তা করিতে লাগিল এমতাবস্থায় কি করা যায়। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল যে ছিল খুব দয়ালু হৃদয় আবার অতীব সুন্দর; সে বলিল,—"যদি আমরা কেহই জমিদারের প্রস্তাব স্বীকার না করি, তাহা হইলে আমরা সকলে ধ্বংস হইয়া যাইব, কিন্তু যদি আমি সাধুর নিকট গমন করি তাঁহার অভিশাপে একমাত্র আমিই ধ্বংস হইব, আর তোমরা সকলে রক্ষা পাইয়া যাইবে; অতএব ঝুঁকিটা আমিই লইব।" এই কথা বলিয়া সে খানের প্রস্তাব অঙ্গীকার করিল। খানও অতীব খুশী হইয়া মনে করিল যে, এমন পরমা সুন্দরী ও নিপুণা রমণী তাহার মোহিনী হাবভাব প্রদর্শন করিয়া তিন দিবসের মধ্যে ঠাকুরের পতন ঘটাইয়া নিজ দূরভিসন্ধি পূরণে সক্ষম হইবে। তাহার সঙ্গে একজন চাপরাশি পাঠাইবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাঁহাকে তাহার সহিত লিপ্ত অবস্থায় হাতেনাতে ধরা যায়, কিন্তু সে (বেশ্যাটি) সেই প্রস্তাব ফিরাইয়া দিয়া জানাইল দিল সাধুর পতন ঘটাইবার পর খানের লোককে সঙ্গে লইবে। সেইদিন সন্ধ্যাকালেই সে ঠাকুরের কুটিরে গমন করিল, অতীব সুসজ্জিত ও বিবিধ সুগন্ধী ও প্রসাধন দ্রব্যাদি অঙ্গে লেপন করিয়া। অতীব ভক্তিভাব দেখাইয়া তাঁহার দ্বারস্থিত তুলসী বৃক্ষে প্রণাম করিয়া ঠাকুরকেও প্রণাম করিল। ঠাকুরের নিকট হইতে প্রাথমিক সম্ভাষণ লাভ না করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত দেহকে কিঞ্চিৎ অনাবৃত করিয়া সে দ্বারপ্রান্তে বসিয়া রহিল ও অতীব মধুর স্বরে জানাইল তাঁহার মত সুন্দর যুবকের সহিত কিছুকাল যাপন করিতে সে অতীব উদ্গ্রীব। ঠাকুর তাহাকে জানাইলেন এখন তিনি নামসংখ্যা জপে ব্যস্ত থাকায় ও তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সহিত কথা বলিবার অবসর পাইবেন না, সেহ জন্য সেই সময় পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে ও সেই নামকীর্তন শ্রবণের

জন্য বলিলেন। এদিকে রাত্রির অবসান হইল, তখন ফিরিয়া গিয়া খানকে জানাইল যে, সেই সাধু সন্ধ্যাকালে তাহার প্রস্তাব মত কাজ করিবেন। পরের রাত্রিও একইভাবে কাটিয়া গেল, ঠাকুর তাহাকে জানাইলেন পরদিবসে তাঁহার কোটি নামের ব্রত পূর্ণ হইবে, তখন তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিয়া পরদিবস আসিতে বলিলেন। তৃতীয় রাত্রিও কাটিয়া গেল, সে সময়ের মধ্যে বেশ্যাটির মনেরও পূর্ণ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সে তখন ঠাকুরের করুণা প্রার্থনা করিল, যাহাতে সে জাগতিক বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে; তাঁহার উপদেশ সে যাচ্ঞা করিল। তখন ঠাকুর নিজ কুটীরটি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং তাহার যাহা কিছু সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবানের নামকীর্তন করিতে ও শ্রীতুলসী সেবা করিতে পরামর্শ দিলেন। সে তখন তাহার যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া একখানি মাত্র বস্ত্র নিজের জন্য রাখিয়া দিল।

হরিদাস ঠাকুরের পর্য্যায়ের এমন শুদ্ধভক্তের এমনই পবিত্রীকরণের ও উন্নীত করণের প্রভাব যে, সেই বেশ্যাটি এক পুণ্যবতী সাধ্বীতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। ঠিক যেমন জঘন্য পাপী জগাই-মাধাই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইয়া পুণ্যবান সাধুতে পরিণত হইয়াছিল, কুখ্যাত দস্যু রত্নাকর নারদের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া ঋষি বাল্মিকী হইয়াছিলেন। সেও নিজ গুরুদেবের মত প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম কীর্তন করিত ও বিশুদ্ধ সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করিত। জনসাধারণ তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরকে পূর্ব হইতেও অধিকতর শ্রদ্ধা সহ প্রশংসা করিতে লাগিল। ইহাতে রামচন্দ্রের অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। কালক্রমে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করণের ফলস্বরূপ মুসলিম উজীরের হাতে শাস্তি ভোগ করিল। তাহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা হইলে, তাহার গৃহ বাজেয়াপ্ত হইল ও গৃহস্থিত রমণীগণ লাঞ্ছিত হইল।

বেনাপোল হইতে হইতে ঠাকুর হরিদাস গঙ্গার পারে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহ শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়ায় আগমন করিলেন। তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে কখনও নৃত্য, কখনও হাস্য, কখনও সিংহের ন্যায় গর্জন ও চিৎকার করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কখনও কখনও তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্পন, রোমাঞ্চ ইত্যাদি দেখা যাইত, কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। ফুলিয়া অধিবাসিগণ অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ ও তাঁহারা তাঁহাকে

একজন প্রকৃত সাধু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে একটি গোফা (অর্থাৎ বৃক্ষ-পত্রাচ্ছাদিত এক গুহার আকারে গর্তের মত)তে স্থান করিয়া দিল, যেহেতু তিনি বাসস্থানের জন্য অধিকতর সুন্দর স্থানের পক্ষে ছিলেন না। স্থানীয় কাজী (মুসলমান বিচারক ও শাসনকর্তা) তাঁহার বিরুদ্ধে গৌড় দেশের বাদশাহের নিকট অভিযোগ পেশ করিল যে ঠাকুর মুসলমান বংশে জাত হইয়াও হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করিতেছেন এবং বাদশাহ নিজে যেন তাঁহার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। অতএব ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল, বাদশাহ তাঁহার দেহের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া তাঁহাকে একটি সম্মানীয় আসনে বসিতে দিল। বাদশাহ তাঁহাকে অতীব ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল তিনি মুসলিম বংশে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াও কেন হিন্দুদিগের আচার-আচরণ অবলম্বন করিয়াছেন ও তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন পবিত্রীকরণের প্রার্থনা কলমা পাঠ করিয়া নিজ পাপ স্খালন করিতে ও মুসলিম আচারাদি পুনরায় অনুষ্ঠান করিতে। হরিদাস ঠাকুর বুঝাইয়া বলিলেন সকলের জন্য ভগবান্ এক, যদিও আঞ্চলিক ও প্রথাগত পার্থক্যের জন্য মানুষ তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নামকরণ করে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আচার-অনুষ্ঠানাদি দ্বারা ভজনা করে। ভগবান্ তাঁহার মনকে যে ভাবে পরিচালিত করিতেছেন সেই ভাবেই তিনি করিতেছেন; যদি কোন হিন্দু বা ব্রাহ্মণ মুসলমান জীবিকা অঙ্গীকার করে, হিন্দুরা কখনও তাহাকে বিরক্ত করে না, কারণ তাহারা জানে যে তাহাকে বিরক্ত করা পবিত্র কাজ হইবে না। সেখানে উপস্থিত সকল মুসলমানগণ তাঁহার যুক্তি শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইল, কেবলমাত্র সেই পাপী কাজী ব্যতীত। সে ঠাকুরকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য চাপ দিতে লাগিল নচেৎ ঐ শয়তান (যে ভাষায় সে ঠাকুরকে অভিহিত করিয়াছিল) অপর সকলকে তাহারই মত শয়তানে পরিণত করিবে, যাহার ফলে সমগ্র মুসলমান জাতির পক্ষে এক অসম্মানজনক পরিস্থিতি হইবে। এইভাবে কাজী দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বাদশাহ ঠাকুরকে পুনরায় বলিল কলমা পাঠ করিয়া পুনরায় মুসলমান হইয়া যাইতে; নচেৎ কাজীগণ তাঁহাকে কঠোর শাস্তিপ্রদান করিবে। প্রত্যুত্তরে ঠাকুর বলিলেন,—“যদিও তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হয়, তথাপি আমি বদনে হরিনাম ত্যাগ করিব না।” তাহাতে বাদশাহ কাজীর দিকে তাকাইয়া তাহার মত প্রকাশ করিতে বলিলেন, সে রায় প্রদান করে ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলা হউক। তাহার

ডিক্রিকে বাদশাহ শীলমোহর প্রদানের অপেক্ষা না করিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ দিল মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সেই আদেশ মত কার্য্য করিতে। তাহারা তাঁহাকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করিতে করিতে বাজারে লইয়া গেল। এদিকে ঠাকুরের দেহে ব্যথার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তিনি সর্বদাই সানন্দে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকের লোকজন এই প্রকার অমানুষিক আচরণে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতে থাকে, কেহ কেহ অত্যাচারের তীব্রতা কমাইবার জন্য উৎকোচ প্রদানের ইচ্ছা জানাইয়া সেই নিষ্ঠুরগণকে অনুনয় করিল। ঠাকুরও প্রহ্লাদের পিতা কর্তৃক তাঁহার উপর অত্যাচারের ন্যায় অক্ষতই রহিয়া গেলেন। তিনি অবশ্য সেই লোকগুলির উপর ভগবানের শাস্তি নামিয়া আসিবে চিন্তা করিয়া কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার জন্য যেন তাহাদিগকে শাস্তিভোগ না করিতে হয়, কারণ তাহারা অজ্ঞের মতই এইরূপ আদেশ পালন করিতেছে।

বেশ কিছু সময় পরে সেই নিষ্ঠুর জহ্লাদগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এত প্রচণ্ড প্রহারের পরও ঠাকুর মরিল না দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল; পরন্তু মাঝে মাঝে তিনি হাস্য করিতেছিলেন। তাহাদের মনে হইল ইনি পীর (আধুনিক কালের সাধু) না কি! তাহারা ভীত হইয়া জানাইয়া ফেলিল যে, যদি তাহারা তাঁহার মৃত্যু ঘটাইতে না পারে, তাহা হইলে কাজী তাহাদিগের মৃত্যু ঘটাইবে। তখন ঠাকুর তাহাদিগকে বলিলেন, যদি তাঁহার জীবদ্দশা তাহাদিগের মৃত্যুর (বিপদের) কারণ হয় তাহা হইলে তিনি এখনই মৃত্যুবরণ করিতেছেন; এই বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই দেখা গেল না। তাঁহাকে মৃত দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে লইয়া বাদ্‌শাহের দরবারে গমন করিল, বাদশাহ তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে আদেশ দিল। কিন্তু নিষ্ঠুর কাজী তাহাতে বাধাপ্রদান করিয়া বলিল ইহাতে তাহার মঙ্গল করা হইবে, সে আদেশ দিল নিকটবর্তী গঙ্গায় তাঁহাকে নিক্ষেপ করিতে। তাহা করা হইলে ঠাকুর গঙ্গায় ভাসিতে লাগিলেন এবং কিছু সময়ের মধ্যে তিনি নিজ স্থান ফুলিয়ার নিকট আসিয়া গেলেন। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি উচ্চস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তীরে উঠিয়া পড়িলেন। সে স্থানের সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল, বিশেষতঃ কাজীর লোকজন তাঁহার নিকট নত হইল ও তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধু বলিয়া মনে করিল। বাদশাহও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং সে

তাহা (ক্ষমা) প্রাপ্ত হইল। কাজী আদেশ জারি করিয়া গেল ভগবন্নাম গ্রহণে কেহ যেন তাঁহাকে ব্যাঘাত না ঘটায় ও তিনি যেন স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। অতঃপর ঠাকুর ফুলিয়ায় প্রবেশ করিলেন—উচ্চৈস্বরে কীর্তন করিতে করিতে সেখানকার ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সকলে পরম আনন্দিত হইল ও 'হরি' 'হরি' বলিতে লাগিল, তখন ঠাকুর দীর্ঘদিন পর হরিনাম শ্রবণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি চিহ্নসকল লক্ষিত হইল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তাঁহার কষ্টের জন্য কেহ যেন দুঃখিত না হয়, কারণ ইহা ভগবানের নিন্দা শ্রবণজনিত নিজ অপরাধের ফলস্বরূপ। কিন্তু কাজী ও সেই দুর্বৃত্ত জহ্লাদগণ, যাহারা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিল না, তাহারা স্বল্পকালের মধ্যেই স-বংশে ধ্বংস হইয়া গেল। যদিও ঠাকুর তাহাদিগের উপর কোনও শাস্তির ইচ্ছাপ্রকাশ করেন নাই বা তাহাদিগকে শত্রুজ্ঞানও করেন নাই, কারণ তাঁহার চক্ষে সকলেই সমান, ইহাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ; তাহাই সকল সাধুর হওয়া উচিত।

অতঃপর শ্রীহরিদাস ঠাকুর বনবাস, দিবা-রাত্র কৃষ্ণধ্যান ও তিন লক্ষ হরিনাম করিবার জন্য একটি গোফা (ভূতলস্থিত একজনের মত ক্ষুদ্র কক্ষ) পাইলেন। এইভাবে তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষটি বৈকুণ্ঠসম (ভগবানের ধাম) হইল। ভিতরে তলদেশে বাস করিত এক বিশাল সর্প, যাহার দেহ হইতে নির্গত বিষাক্ত বাষ্পে সেই সীমানার মধ্যে আগত সকল প্রাণীর জ্বালা অনুভব হইত। ঠাকুরকে দর্শনে আগত কোন ব্যক্তিই বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; ঠাকুর নিজে কিন্তু এ-সব কিছুই জানিতেন না। ব্রাহ্মণগণ সেই কক্ষের অসহ্য অনুভূতির বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিলেন ও স্থানীয় বড় বড় বৈদ্যগণ তাহাদিগকে উপদেশ করিল ভিতরে নিশ্চয়ই কোন বিশাল সর্প অবস্থান করিতেছে। বিষয়টি তাহারা ঠাকুরের নিকট উত্থাপন করিল ও কাছাকাছি অন্যত্র কোথায় বাসাঘর লইবার জন্য জোর করিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ঃ 'আমি এখানে কোন অসুবিধা বোধ করি না। কিন্তু আমি আপনাদের সকলের কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, অতএব যদি সেই সর্প এস্থান ত্যাগ করিয়া না যায়, তবে কল্যই আমি এস্থান ত্যাগ করিব। সেই দিকে অধিক মনোযোগ না দিয়া আর সময় নষ্ট না করিয়া তিনি কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, তাহার জন্য ঠাকুর সেই স্থান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া সেই কক্ষের

তলদেশ হইতে সেই সর্প বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সেখানে উপস্থিত সকলেই দেখিতে পাইল যে বিশাল সর্পটির দেহ বিশাল ও হলুদ, নীল, সাদা প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে গঠিত এবং মস্তকোপরি এক উজ্জ্বল মণি অবস্থিত। ব্রাহ্মণগণ অতীব ভীত হইয়া 'কৃষ্ণ'নাম জপ করিতে লাগিল। এক্ষণে সেই সর্পটি চলিয়া যাওয়ায় আর পূর্ব্বের মত (অস্বস্তিকর) অনুভূতি থাকিল না। তাহারা সকলে আনন্দিত হইল, ঠাকুরের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং তাহারা ঠাকুরের সর্বত্র প্রকাশিত শক্তিশালী প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল।

উপরোক্ত ঘটনার মত আরও একটি বিস্ময়াবহ ঘটনা ঘটিয়া ছিল। একবার এক ডঙ্কা বা লোককে যে সর্পের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাকে এক সাপুড়িয়া ও তাহার দল (যাহারা বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীত সহযোগে অদ্ভুত নৃত্যকুশলাদি দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করিত) এক রাজপ্রাসাদে লইয়া যায়। ঘটনাক্রমে ঠাকুর সেখানে আসিয়া দর্শকগণের মধ্যে দাঁড়াইলেন, সেই দল যখন কালীয় দমন লীলা গান করিতেছিল, সেই প্রভাবিত লোকটি সেই গীতবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেছিল। হরিদাস ঠাকুর নিজ প্রভুর গুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়েন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া এক হুঙ্কার ছাড়িয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেই ডঙ্কা ঠাকুরকে নৃত্য করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও তাঁহার দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি দেখা দিল ও পরম হর্ষ লাভ করিয়া চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল, তখনও ডঙ্কা করজোড়ে দণ্ডায়মান ছিল। ঠাকুরের এই প্রকার মানসিক অভিনিবেশ দর্শন করিয়া পথিক-দর্শকগণ পরম পুলকিত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া দেহে ধারণ করিতে লাগিল। ইহাতে ব্রাহ্মণ কুলজাত এক দর্শকের মনে ঈর্ষা উৎপন্ন হইল। তাহার মনে হইল মূর্খ লোকেরা ঠাকুরের ধূলায় গড়াগড়ি ও নৃত্য দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার ইচ্ছা হইল ঠাকুরের অনুকরণ করিয়া সেও অনুরূপ সম্মানের ভাগী হইবে। যখন সে পতিত হইল ও মূর্চ্ছাগতের মত পড়িয়া রহিল, তখন ডঙ্কা তাহাকে বেতের দ্বারা প্রচণ্ড প্রহার করিল, তখন শয়তানটি যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া পলাইল। তখন লোকেরা সেই ডঙ্কাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, হরিদাসের নৃত্যকলে সে করজোড়ে দণ্ডায়মান ছিল,

অথচ সেই ব্রাহ্মণকে কেন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হইল? তখন যে সর্প ডঙ্কার দেহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনপূর্বক এইভাবে বলিল ঃ "আপনারা সকলে হরিদাস ঠাকুরের দিব্য প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে খুব সম্মান দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এই শয়তান্ ব্রাহ্মণ হিংসা তাড়িত হইয়া তাঁহাকে অনুকরণ করিয়াছিল ঠাকুরের প্রাপ্য সম্মান হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সেই সম্মানের ভাগী হইতে। লোকটি ছিল ভণ্ড, তাহার প্রাপ্য আমি মিটাইয়াছি। নৃত্যরত ঠাকুরকে দর্শন করিলে জগতের বন্ধন শিথিল হইয়া যায় ও যে নিরন্তর তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে পারিবে, সে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করিবে।" সর্পটি ডঙ্কার মুখে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

অন্য একবার ঠাকুর যথারীতি উচ্চকণ্ঠে নাম করিতে করিতে পরিভ্রমণকালে যখন হরি-নদী গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, জন্মসূত্রে এক ব্রাহ্মণ অশ্রদ্ধা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল যে হরিনাম মনে মনে জপ্য, উচ্চার্য্য নহে, ভগবানের সেই নাম তিনি কেন উচ্চকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। তদুত্তরে ঠাকুর বিনীতভাবে বলিলেন ঃ "শাস্ত্রানুসারে যাহা আপনি আমাপেক্ষা ভাল জানেন, নাম উচ্চকণ্ঠে কীর্তিত হইলে তাহাতে মনে মনে জপ অপেক্ষা শতগুণ সুকৃতিসম্পন্ন হওয়া যায়, আর কোনও শাস্ত্র তাহা নিন্দা করে না।" লোকটি উদ্ধতভাবে তাহার কারণ জানিতে চাহিলে ঠাকুর আরও বলিলেন, "কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে সমস্ত প্রকার প্রাণী এমন কি নীচজন্ম কীট পর্য্যন্ত যাহারা জিহ্বায় নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদের পর্য্যন্ত সুকৃতি লাভ হয় ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করাইয়া পরবর্তীকালে অধিকতর শ্রেয়ঃ জীবন লাভ করতঃ ভগবানে ভক্তিযাজনে সুযোগ লাভ করে। সুতরাং উচ্চ সংকীর্তন দ্বারা অপরেরও মঙ্গল হয়, কিন্তু জপ করিলে কেবল জপকারীর সুবিধা হয়। ঠিক যেন যে ব্যক্তি বহু লোককে নানাপ্রকার ভোগের দ্বারা প্রতিপালন করে সে অবশ্যই যে শুধু নিজেকে করে তাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ; তেমনই উচ্চকীর্তনকারী মাত্র জপকারী অপেক্ষা অনেক শ্রেয়ঃ; সেই জন্য পুরাণ সকল বলিয়াছেন নীরব জপ অপেক্ষা উচ্চঃস্বরে কীর্তন শতগুণে শ্রেয়ঃ।" সেই মেকী ব্রাহ্মণ তাহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া কর্কশ ভাষায় ঠাকুর হরিদাসকে বলিল "আজকাল এই নীচকুলজাত হরিদাসও দর্শনের ব্যাখ্যাকার হইয়াছে। কালে কালে বৈদিক প্রথাগুলিও জাহান্নামে যাইতেছে। শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন এই যুগের শেষে শূদ্রও শাস্ত্রব্যাখ্যাতা

হইবে, তাহাই আজ শেষের দিকের জন্য অপেক্ষা না করিয়াও সত্য হইয়াছে। যদি তোমার কথা সত্য প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে তোমার নাক কাটিয়া ফেলা হইবে ও নুড়িতে ঘসিয়া দেওয়া হইবে।” তাহাতে ঠাকুর মৃদু হাস্য করিয়া উচ্চকীর্তন করিতে করিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ঘটনার বিবরণকারী শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের ভগ্নীর নাতি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই প্রকার মেকী ব্রাহ্মণগণকে রাক্ষস বা দানব আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—পুরাণ সকলের শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে, অল্প কিছু দিনের মধ্যে সেই লোকটি ঠাকুরকে অপমান করার শাস্তিস্বরূপ বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে নিজের নাসিকা খসিয়া পড়িল।

ইহার কিছুদিন পরে যেখানে অদ্বৈতের সভা হয়, সেই শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে ঠাকুর গমন করেন, সেই সভায় ভক্তগণকে লইয়া প্রভু জনগণের ভগবৎ-বৈমুখ্যের জন্য এবং তাঁহার আন্তরিক পূজার পরও ভগবানের অবতরণের বিলম্বের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ ঠাকুরকে সভার মধ্যে একজনরূপে পাইয়া অতীব প্রীত হইলেন, সেই সভায় গীতা ও ভাগবতের শিক্ষা লইয়া আলোচনা এবং যে অধিকাংশ অভক্ত জনসাধারণ কীর্তনের বিরোধী ছিলেন সেই কীর্তন চলিত।

যে সময় ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন, সে সময় হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীঅদ্বৈত সেই সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে সকলের মুখে উচ্চকণ্ঠে হরিনাম শ্রবণ করিয়া উল্লসিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত অনুমান করিলেন সম্ভবতঃ তাঁহার প্রার্থনায় ফল হইয়াছে এবং প্রভু অবতরণ করিয়াছেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত একমত হইলেন এবং উভয়ে অতীব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রগ্রহণের উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া দরিদ্রগণকে প্রভূত অর্থদান ও পত্নী সীতাদেবীর মারফৎ নবজাত শিশুর জন্য প্রচুর উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

শ্রীদাস গোস্বামীর গৃহে ও অদ্বৈতের স্থানে প্রকাশ অবলম্বনে

শ্রীহরিদাস ঠাকুর অধিকাংশ সময় অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গেই থাকিতেন—কখনও শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে ও কখনও (কয়েক মাইল দূরে) শান্তিপুরে। কখনও কখনও তিনি আশ-পাশের স্থানসমূহে বিচরণকালে শ্রীহরিনামের মূল্য নিজের আচরণ দ্বারা ও আগ্রহী লোকজনকে উপদেশক্রমে বুঝাইয়া দিতেন। এবম্প্রকার ভ্রমণ প্রসঙ্গে একবার তিনি ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে কয়েক মাইল দূরে বর্তমান সপ্তগ্রাম

ষ্টেশনের নিকট চাঁদপুরে আসিয়াছিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। এই আচার্য্য প্রভু ভক্তিমত্ত্বার জন্য শ্রীঠাকুরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের মত এক ধনী পরিবারে পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। তাহাদের সন্তান শ্রীরঘুনাথ (যিনি পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীগণের মধ্যে একজন হইয়াছিলেন) তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন। বালকটি অতি বুদ্ধিমান (যাহাকে সহজে শিখানো যায় এমন) ও ধর্মীয় ভাবাপন্ন দেখিয়া ঠাকুর তাহার প্রতি খুব প্রসন্ন হইলেন। ইহাতেই তাহার মধ্যে ঐকান্তিক ভক্তির বীজ বপন হইয়া গেল, যাহার ফলে এমন মহীরুহ জন্মায়, যাহা হইতে ফুল-ফল জন্মিয়া সেই গন্ধে অতি উচ্চ পর্যায়ের ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

একদিন মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের অনুরোধে শ্রীবলরাম আচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন তাহাদের গৃহে আগমন করিয়া বহু পণ্ডিতজন ও অন্যান্যগণের এক সভায় শ্রীনামকীর্তনের মহিমা কীর্তন করেন। ঠাকুর সভায় উপস্থিত হইলে সভাস্থ কেহ কেহ মত প্রকাশ করিল যে, শ্রীহরির নাম উচ্চারণে পাপ ক্ষয় হয়, কেহ বলিল তাহাতে বন্ধনমোচন হয়। তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, ঐগুলি শ্রীনামের মুখ্যফল নহে, উহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম লাভ হয়, তাহাদিগের উক্ত ফলগুলি আনুষঙ্গিক ভাবেই লাভ হইয়া থাকে। একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলেন, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে অন্ধকার ম্লান হইয়া আসিলে যেমন মানুষ চোর ও ভূতের ভয় হইতে মুক্ত হয়, তেমন শ্রীনাম-সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভে ঐ সমস্ত ফলগুলি লাভ হইয়া থাকে এবং পূর্ণ উদয় হইলে তাহার ভগবৎপ্রেম লাভ হয়; যাহার কাছে বন্ধনমোচন ফল অতি তুচ্ছ। সেই সভায় গোপাল চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল, যিনি মজুমদারগণের জমিদারির এক কর্মচারী। সে ঠাকুরের এই কথায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে দুর্নাম করার ভঙ্গিতে তাঁহাকে বক্তব্য প্রমাণ করিতে চ্যালেঞ্জ জানায়, নচেৎ তাঁহার নাক কাটিয়া ফেলা হইবে। সেখানে উপস্থিত সকলেই ঠাকুরের মত সেই পুণ্যবান সাধুকে অসম্মান করার বিরুদ্ধে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করিয়া দেয়। মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় সেই ব্রাহ্মণকে ধিক্কার প্রদান করিলেন—ঠাকুরের সমক্ষে নিজেকে এক পণ্ডিত বলিয়া জাহির করার প্রতিবাদে তাহার জন্য দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন; শ্রীবলরাম আচার্য্য তাহাকে এক অহঙ্কারী নির্বোধ ব্যক্তি বলিয়া তিরস্কার করিলেন। তাহারা

সকলে ঠাকুরের পদতলে পতিত হইল। ঠাকুর তাহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, ইহা এক দুর্ঘটনামূলক ও তাহারা নিতান্তই অজ্ঞ। তিনি ব্রাহ্মণের কোন দোষ দর্শন করিলেন না, তাঁহার মতে সে অনভিজ্ঞ ও নিজেকে যুক্তিবাদী বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রলোভন সামলাইতে পারে নাই। তিন দিবসের মধ্যে সেই নীচ ব্রাহ্মণ সর্বদেহে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া হস্তাঙ্গুলী, পদাঙ্গুলী ও নাসিকা খসিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল ও ভগবানের প্রিয়জন বলিয়া ঠাকুরের মহিমা বিষয়ে আরও দৃঢ় প্রত্যয় জাগিল। ঠাকুরের কিন্তু অভিপ্রেত ছিল না যে লোকটির শাস্তি হউক, তথাপি ভগবান্ তাহাকে শাস্তি দিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঠাকুর খুব দুঃখিত হইলেন এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজ জীবনধারণের জন্য দৈনিক প্রসাদ পাইতেন। তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর আচার্য্যকে জানাইলেন তাঁহাকে প্রত্যহ প্রসাদ যোগাইবার ফলে তাঁহার (আচার্য্যের) সামাজিক অসুবিধা হইতে পারে ও সমাজ তাঁহাকে বহিষ্কার করিতে পারে কারণ তিনি মুসলিম বংশোদ্ভূত। আচার্য্য ঠাকুরের আশঙ্কাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, যেহেতু তিনি শাস্ত্রনির্দেশ মত চলিতেছেন সে জন্য তিনি লোকে কি বলিবে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসাবে তাঁহাকে খাওয়াইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের সমফল লাভ হয়। এমন কি আচার্য্য পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে বার্ষিক তর্পণকালে প্রধান শ্রাদ্ধ-পাত্র সেই ঠাকুরকেই নিবেদন করিতেন, ঐ এলাকায় সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে যোগ্য ব্রাহ্মণ একজনও ছিল না।

মায়াদেবীর পরীক্ষা ও মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল

এই সাধুর চরিত্রের বিশুদ্ধিতার এক নূতন পরীক্ষা হইল, এইবার মায়াদেবী এক জ্যোৎস্না রাত্রে অসামান্য সুসজ্জিতা হইয়া গঙ্গার তীরে সেই গোফায় মায়াদেবী আগমন করিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যেমন ঘটনা বেনাপোলে বেশ্যার ঘটিয়াছিল একইপ্রকার এবারও হইয়াছিল। তৃতীয় রাত্রি শেষে সেই রমণী নিজের পরিচয় প্রকাশ করিলেন যে, তিনি মায়া। একমাত্র তাঁহাকেই (ঠাকুরকে) প্রকৃত সাধুর নিষ্ঠাবান্ পথ হইতে তিনি তাঁহার মোহিনী মায়ার দ্বারা প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না। তিন রাত্রি ধরিয়া ঠাকুরের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া

শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের জন্য তাঁহার পদতলে পতিতা হইলেন। আমাদিগের বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে, এইপ্রকার সাধুরূপী গুরুর কৃপা ব্যতীত আমাদিগের মূল প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তাহা লাভ হইতে পারে না।

এইভাবে ঠাকুর নিরন্তর পরম সুখদ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন—কখনও শ্রীঅদ্বৈত মায়াপুরে অবস্থানকালীন সেইখানে, কখনও ফুলিয়ার গোফায়, কখনও শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সঙ্গে, আবার কখনও কখনও এখান ওখান পরিভ্রমণ করিতে করিতে হরিনামের মহিমা প্রচার কালে। এদিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু জন্ম ও শৈশবের পর এক মহান্ পণ্ডিত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং পরলোকগত পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদনের ছলে বিষ্ণুপাদপদ্মে পূজা প্রদানের জন্য গয়ায় গমন করিলেন। সেখান হইতে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া পাণ্ডিত্য প্রতিভা হইতে শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন অর্থাৎ নবদ্বীপ-মায়াপুরের ভক্তগণের পরম আনন্দের বস্তু হইয়া (নিজস্বরূপে) প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ- বিরহে (যাহা তাঁহার নিজস্বরূপ) কাতর এবং তাঁহারা খুব আনন্দিত হইলেন যে, তিনি শুধু তাঁহাদের সহিত সঙ্কীর্তন-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই, উপরন্তু প্রতিরাত্রে শ্রীবাস অঙ্গনে দুর্দণ্ড কীর্তন সহকারে নৃত্যে তাঁহাদিগের নেতৃত্ব দান করিতেছেন এবং প্রায়শঃই নিজ দৈবসত্ত্বা প্রকাশ করিতেছেন। এইবার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর স্থায়ীভাবে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের অদ্বৈত ভবনে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুকে প্রায় সদাই কীর্তনাদিতে ব্যাপৃত রাখিতেন ও তাঁহাকে আনন্দিত অন্তরে রাখিতেন।

এক দিবস মহাপ্রভু সাতপ্রহর (অর্থাৎ একুশ ঘণ্টা) একটানা নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন; সেই সময় প্রত্যেক ভক্তকে বিশেষ কৃপা করা হইয়াছিল, সে সময় তিনি তাহাদের (ভক্তগণের) পূর্ব জীবন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—যাহা কেবল তাঁহারই জ্ঞাত। এই বিশেষ প্রকাশটি ভক্তগণের মধ্যে 'মহাপ্রকাশ' নামে বিদিত। যথারীতি শ্রীবাস অঙ্গনে রাত্রিকালীন নৃত্যকীর্তনের পর মহাপ্রভু বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শালগ্রাম শিলাগুলিকে গ্রহণ করিলেন ও শ্রীবিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন। অতঃপর তিনি নিজ বর্তমান অবতারের কথা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তিনি খাদ্যবস্তু চাহিলেন, তাহাতে স্তূপীকৃত খাদ্যসামগ্রী খুব শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নিবেদন করা হইল। প্রায় দুইজনের উপযোগী খাদ্যাদি আত্মসাৎ করিলেন এবং যতই অল্পমাত্র হউক কাহারও নিবেদিত বস্তু প্রত্যাখ্যান

করেন নাই। নিয়মিত পূজা, ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্ত পাঠ সহকারে প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানাদি, পঞ্চপ্রদীপে আরতি ইত্যাদি সহকারে তাঁহাকে পূজা করা হইল। অতঃপর মহাপ্রভু প্রত্যেককে নাম ধরিয়া ডাকিলেন ও তাহাদিগকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। যখন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ডাক পড়িল, তাঁহাকে মনে করাইয়া দেওয়া হইল (তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে) মুসলমান জহ্লাদের হস্তে কি ভাবে তাঁহার উপর বাইশ বাজারে অত্যাচার করা হইয়াছিল। তিনি আরও বলিলেন, "তোমার উপর অত্যাচারীগণকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের উপর সদিচ্ছার জন্য আমি বাধাপ্রাপ্ত হইলাম, সেইজন্য তোমার দেহকে নিজদেহ দ্বারা আবৃত করি।" মহাপ্রভু অতঃপর নিজ পৃষ্ঠদেশে সেই শয়তানগণের প্রহারের চিহ্নগুলি দেখাইলেন। ইহাতে ঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর ডাকে তাঁহার জ্ঞান ফিরিল। কিন্তু এক গভীর সম্মোহিত অবস্থা তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল ও সেই অবস্থায় তিনি এক সুদীর্ঘ স্তবস্তুতি পাঠ করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতি শরণাগতজনের প্রতি তাঁহার করুণা, যথা দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ প্রভৃতির কথা স্মরণ করিলেন। যদিও তিনি জানাইলেন তাঁহার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন যে, দ্বারদেশে কুকুরের মত তিনি যেন ভগবানের ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট পাইতে পারেন। ঠাকুর ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইয়া গেলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে এই বর দিলেন যে, যে কেহ তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া অনুরক্ত হইবে, সে তাঁহাকে (ভগবানকে) লাভ করিবে ও সর্বদা তাহার সহিত অবস্থান করিবে। সেই সময় ভগবানের দান শ্রবণ করিয়া প্রত্যহ ভক্তের মধ্যে শিহরণ জাগিল। এই বিবৃতির পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে হরিদাসের মহিমা কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মা ও শিবও হরিদাসের মত ভক্তের নিত্যসঙ্গ কামনা করেন। স্বর্গের দেবতাগণ তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন ও গঙ্গাদেবীও নিজেকে পবিত্র করিতে তাঁহার নিমজ্জন ইচ্ছা করেন।"

নদীয়া ও নীলাচলে মহাপ্রভুর সমস্ত ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ

পবিত্র সাধু-শিরোমণি এই হরিদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ নিত্যানন্দপ্রভুর সহযোগীরূপে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের দ্বারে দ্বারে অনিচ্ছুক নাগরিকগণের মধ্যে হরিনাম প্রচারণে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রতি গৃহস্থকে বলিলেন—"সেব কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-বিষয়ে শিক্ষা কর।" উভয়কে সন্ন্যাসী দেখিয়া গৃহস্বামিনীগণ তাঁহাদের জন্য ভিক্ষাদ্রব্য লইয়া আসে, তাঁহারা দুইজনে অবশ্য বলেন, তাহাদের ভিক্ষা কেবলমাত্র কৃষ্ণসেবা, তাঁহার নাম গ্রহণের দ্বারা; অন্য কিছু নহে। সজ্জনগণ তাঁহাদের উপদেশমত কার্য্য করিল; আর কেহ কেহ বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করিতে থাকে। আর যাহারা শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণকে লইয়া প্রতি রাত্রে কীর্তন করিতেন, সে স্থানে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় সেই দুই স্বর্গীয় দূতগণকে নিন্দা করিয়া বলিল, তাঁহাদের সহিত সঙ্গদোষে নিমাই পণ্ডিত নষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

প্রচার পরিক্রমায় ভ্রমণকালে একদিন তাঁহারা সর্বপ্রকার পাপাচরণকারী দুই মদ্যপের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা পথকেই নিজ বাসাঘর বানাইয়াছিল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর তাহাদিগকে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করিতে দেখিলেন, নিজেদের মধ্যে মারামারি করিতেছিল ও অত্যধিক মদ্যপানহেতু দাঁড়াইতেও অক্ষম। স্থানীয় লোকজনদের নিকট হইতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, সেই দুই ভ্রাতা, নাম—জগাই ও মাধাই এক উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভুত, কিন্তু দুঃসঙ্গক্রমে অধঃপতন ঘটিয়াছে। ইহা দেখিয়া প্রভুদ্বয়ের সদয় হৃদয় বিগলিত হইল, তাঁহারা নিজদিগের মধ্যে আলোচনা করিলেন কি ভাবে এই দুই পারমার্থিক ভাবে ও সামাজিকভাবে পতিতাত্মাকে প্রভুর ভক্তে রূপান্তরিত করা যায়। তাঁহারা তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া তাহাদের কীর্তনের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিতেই প্রচণ্ড কুপিত হইয়া উঠিল ও তাহাদের মধ্যে একজন মাধাই কলসির ভগ্ন অংশ দ্বারা নিত্যানন্দকে আঘাত করায় প্রচুর রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল। সেই সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে শ্রীবাস অঙ্গনে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহারা তাঁহার খুব ঐকান্তিক ভক্তে রূপান্তরিত হইল। তাহাদের জীবনের গতির আমূল পরিবর্তন ঘটিল; ইহাতে সকলে বিস্মিত হইল ও বুঝিতে পারিল যে, মহাপ্রভু সত্য সত্যই ভগবান্।

এইভাবে ঠাকুর সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি প্রচারের ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন ও জনসাধারণ পার্থিব বন্ধনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিত্য সুখের সন্ধান পাইলেন। মহাপ্রভু যখন সর্বপ্রথম নগর সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে শুদ্ধভক্তি প্রচার আরম্ভ করেন সে সময় হরিদাস ঠাকুর একটি অংশকে পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে মহাপ্রভু কর্তৃক কাজী-

দলনের কথা উদ্দিষ্ট হইয়াছে—যে মুসলমান শাসনকর্তা সঙ্কীর্তনের খোল ভগ্ন করিয়া হরিকীর্তনের বিরুদ্ধে নির্দেশনামা জারি করিয়াছিল। সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রাটি হইয়াছিল বিশাল, তাহাতে বহু সহস্র লোক অংশগ্রহণ করিয়াছিল। শোভাযাত্রাটি তিনটি অংশে বিভক্ত হইয়া তিনজনের পরিচালনাধীন ছিল, যথা—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাসপণ্ডিত; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

মহাপ্রভু বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভক্তিমূলক নাটকেরও প্রবর্তন করেন, তাহাতে ঠাকুর হরিদাসকে কোটালের (বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল) অংশ অভিনয় করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং মহাপ্রভু নিজে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। সেখানে উপস্থিত সকল দর্শক-শ্রোতা-ভক্তগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে অত্যাশ্চর্য্য উপায়ে তিনি (হরিদাস ঠাকুর) ব্যাখ্যা করেন কেন তিনি সেখানে প্রেরিত হইয়াছেন এবং নাটকের বিষয়বস্তু বুঝাইয়া বলেন।

অন্য এক সময়ে ঠাকুর অদ্বৈতপ্রভুর সহিত শান্তিপুরে অবস্থানকালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে লইয়া সহসা সেখানে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয়। কিছুক্ষর পর মহাপ্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর চরণে ও শ্রীহরিদাস অদ্বৈতের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হইল, যেন একটি সেতুর শৃঙ্খলের তিনটি অংশ, তাহাতে নিত্যানন্দ অতীব উল্লসিত হইলেন। উঠিয়া অদ্বৈতকে তাঁহার পদতলে পতিত দেখিয়া অসন্তোষের ভাব দেখাইলেন এবং অদ্বৈত করজোড়ে কৃষ্ণস্তুতি আবৃত্তি করেন। সেখানে কয়েক দিবস যাবৎ শ্রীহরিনাম-প্রচার বিষয়ে কিছু কথাবার্ত্তা বলার পর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে লইয়া নবদ্বীপ-মায়াপুরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেখানকার বৈষ্ণবগণ যাঁহারা তাঁহার অবর্তমানে দুঃখের সহিত দিন কাটাইতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে মহাপ্রভুকে পাইয়া পুনরুজ্জীবিত হইলেন, আর মহাপ্রভু তাঁহাদিগের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিলেন।

এইবার মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ উদ্দেশ্যে চিরতরে নবদ্বীপ-মায়াপুর ত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু নিজ সঙ্কল্প সকলের কাছে গোপন রাখেন, একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত। এমন কি প্রিয়তম ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকেও জানানো

হয় নাই, পাছে তিনি অতীব বিলাপ সহকারে বিষণ্ণ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করা অতীব কষ্টকর হইবে, যদিও যে রাত্রি শেষে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করেন, সেই রাত্রে মহাপ্রভুর প্রতি অতীব স্নেহভক্তি পোষণ করিতেন সেই ঠাকুর ও শ্রীগদাধর তাঁহার সন্নিকটেই শয়ন করিয়াছিলেন। জাগ্রত হইয়া তাঁহারা মহাপ্রভুকে খুঁজিয়া পাইলেন না। গৃহে ও ভক্তগণের মধ্যে বিলাপের রোল উঠিল। অদ্বৈত ও হরিদাস সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন।

নবদ্বীপ-মায়াপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে কাটোয়ায় যেখানে তিনি শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, সেখানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে শ্রীনিত্যানন্দ মাতা শচীদেবী ও ভক্তগণকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের স্থানে লইয়া আসিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, সেইখানেই মহাপ্রভু নীলাচলে যাত্রার পূর্বে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। শান্তিপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ হইতে লোকজন যখন শুনিলেন মহাপ্রভুর আগমনের কথা, তখন তাঁহার দর্শন লাভের আশায় কাতারে কাতারে গমন করিয়াছিলেন— তাঁহার ভগবত্ত্বা বিষয়ে তাঁহারা লোকমুখে অবগত হইয়াছিলেন। দিনের শেষে মহাপ্রভু কীর্তন আরম্ভ করিলে নিত্যানন্দকে ধরিয়া শ্রীঅদ্বৈত নৃত্য করিতে থাকেন, পশ্চাতে শ্রীহরিদাস নৃত্য করেন।

পরদিবস সকালে মাতা শচীদেবী ও নবদ্বীপ-মায়াপুরের ভক্তগণ আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অতিথি হইলেন। তথাপি ভগবৎকৃপায় তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত রহিল, পূর্ণই রহিল। মহাপ্রভু মাতাকে ও অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য অধিক দূরে নহে, পুরীতেই অবস্থান করিবেন, তথায় প্রতি বৎসর ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিবেন আর যাঁহারা যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা সংবাদ পাইতে পারিবেন। বিদায় লইবার পূর্বে তিনি সকলকে অনুরোধ করিলেন নিয়মিত কীর্তন চালাইয়া যাইতে এবং সর্বদা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা (কৃষ্ণের গুণ ও মহিমা বর্ণনে), কৃষ্ণ আরাধনায় (তাঁহাকে সেবাবৃত্তিতে পূজায়) নিযুক্ত থাকিতে। তাহাতে হরিদাস বিলাপ করিয়া জানাইলেন যেহেতু মহাপ্রভু এখন নীলাচলে অবস্থান করিবেন, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া কি ভাবে থাকিবেন, সেখানে মুসলমান বংশজাত বলিয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবেন না—সে সময় উড়িষ্যা ও বাংলা পরস্পর বিরোধী প্রদেশ ছিল। প্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তিনি জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন

এই বিষয়টির সমাধান করিতে, যাহাতে ঠাকুর মহাপ্রভুর সহিত পুরীতে অবস্থান করিতে পারেন।

নীলাচলে মহাপ্রভু মাত্র দুইমাস অবস্থান করিয়া প্রায় একাকীই দক্ষিণ ভারতে প্রচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি সেখানে সকলের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর মহাপ্রভুর একমাত্র সঙ্গী কালা কৃষ্ণদাসকে মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া সেখানকার সকলকে প্রত্যাবর্তন সংবাদ জানাইবার জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া মাতা শচীদেবী, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীহরিদাস প্রভৃতি যেন দেহে প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। কালা কৃষ্ণদাস হরিদাসের নিমিত্ত আদেশ লইয়া আসিয়াছিলেন যে তিনি যেন শ্রীঅদ্বৈতের পরিচালনাধীন ভক্তগণের সহিত বাংলা হইতে পুরীতে আগমন করেন, সেখানে আসিয়া তিনি পৃথিবীখ্যাত শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব প্রত্যক্ষ করিবেন এবং মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া সারা জীবন অতিবাহিত করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া হরিদাস ঠাকুর উল্লসিত হইলেন।

প্রায় দুইশত ভক্ত নীলাচলে আগমন করিলে মহাপ্রভু পথ মধ্যে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিলেন। একে একে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করার পর জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাস কোথায়, কারণ মিলনস্থল হইতে তাঁহাকে দেখা যাইতেছিল না। ঠাকুর সেইখানে না আসিয়া পথে দণ্ডবৎ পড়িয়া ছিলেন। কেহ যখন তাঁহাকে মহাপ্রভুর নিকটে লইয়া যাইতে আসিলেন, তখন তিনি জানাইলেন, "যেহেতু আমি নীচকুলজাত, আমার মন্দিরের ভিতরে যাইবার অধিকার নাই, পাছে জগন্নাথের ভৃত্যগণের সহিত স্পর্শ হইয়া যায়। যদি কোন নির্জনস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে আমি একাকী থাকিতে পারি।" মহাপ্রভু নিজে আসিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ঠাকুর কুণ্ঠিত হইয়া পিছু হঠিতে চাহিলে মহাপ্রভু বলিলেন, "আমি নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করি; তুমি পবিত্রকরণের স্থান-স্বরূপ। তুমি হরিনামের মধ্য দিয়া সকল তীর্থস্থানে স্নান করিতেছ; সর্বদা তপশ্চর্য্যার মত পবিত্র কর্ম করিতেছ; তুমি ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীগণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে পবিত্রকরণের ক্ষমতা রাখ।" অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে সিদ্ধ বকুল নামে এক উদ্যানে লইয়া গেলেন। যেহেতু সেখানে এক অতি প্রাচীন

বকুল বৃক্ষ ছিল এবং তিনি এক সিদ্ধ মহাত্মারূপে পরিচিত ছিলেন। স্থানটি অতীব নির্জন ও মহাপ্রভুর নিজ বাসস্থান গম্ভীরার পিছনে। মহাপ্রভু বলিলেন, —"নির্জন এইখানে অবস্থান করিয়া তুমি কৃষ্ণনাম জপ কর। আমি প্রত্যহ তোমার সহিত দেখা করিব ও মহাপ্রসাদ তোমার নিকট আসিবে। জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া প্রণাম করিবে।" এই ভাবে ঠাকুরের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বরাবরের জন্য অবস্থানের ব্যবস্থা হইল।

তাঁহার গৌরবময় অন্তর্ধান পর্য্যন্ত পুরীতে

শ্রীহরিদাস ঠাকুর পুরীতে আগমনের পূর্বে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ সহ অপর সাতজন পার্ষদ ভক্তগণ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন বৃন্দাবন দর্শনের ভাণ করিয়া, তখন তাঁহারা বাংলার তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের নিকট রামকেলীতে আগমন করিয়া তদানীন্তন মুসলমান রাজা হুসেন শাহের অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী দবির খাস ও সাকর মল্লিক নামধারী দুইভ্রাতা রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হন। এই দুই ভ্রাতা পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর অনুগামী হইয়া বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামিগণের মুখ্য দুইজন হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অবশ্য এই যাত্রায় বৃন্দাবন গমন করেন নাই, যেহেতু দুইভ্রাতা বিনীতভাবে পরামর্শ দেন যে, এত লোকজন লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা ঠিক নহে, কারণ ইতিমধ্যেই যে যে স্থান অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভু আসিয়াছেন সকল স্থান হইতেই মানুষ যোগদান (অনুসরণ) করিতে করিতে বিরাট ভিড় হইয়া গিয়াছিল।

পুরীতে সিদ্ধবকুলে ঠাকুরকে বাসাঘর দেওয়ার কিছুদিন পর রথযাত্রা উৎসব সমাগত হইল। পূর্বদিন মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মার্জন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, যাহা দ্বারা রথযাত্রা দিবসে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া (গুণ্ডিচায়) যে মন্দিরে অবস্থান করিবেন তাহা যেন যত দূর সম্ভব নিখুঁতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। ইহা দ্বারা মহাপ্রভু ভক্তগণকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, ভগবানকে ধ্যানের জন্য হৃদয়কে সর্বতোভাবে অন্য চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিবার উপযোগী করা। ইহাতে স্বয়ং মহাপ্রভুও ভক্তগণকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। নিকটস্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে সন্তরণ লীলা ও স্নানাদির পর তাঁহাকে ও ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। সে সময় তিনি বার বার হরিদাসের নামোচ্চারণ করিয়া ডাকিলে হরিদাস ভক্তগণ সঙ্গে একত্র বসিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া

সকলের তৃপ্তিপূর্বক ভোজনের শেষে কিছু প্রসাদ দিতে বলিলেন। নামাচার্য্য এই হরিদাস ঠাকুরের দৈন্য দেখুন!

পরদিবস রথের যাত্রা শুরু হইবার প্রাক্কালে মহাপ্রভু ভক্তগণকে সাতটি দলে ভাগ করিয়া দিলেন, তাহাদের মধ্যে একটির তত্ত্বাবধানে হরিদাস ঠাকুর এবং তিনি একইকালে সকল দলের সহিত রহিলেন, সকলেই ভাবিতে লাগিলেন প্রভু অসামান্য কৃপা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই দলের সহিত অবস্থান করিতেছেন। মহাপ্রভুর যখন নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল, তখন সবদলগুলিকে একত্রিত করা হইল এবং নয়জন মূল গায়কগণের মধ্যে ঠাকুর ছিলেন একজন; এই গীতবাদ্য মহাপ্রভুর নৃত্যের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এমনই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে, তাহাতে স্বয়ং জগন্নাথদেবও মুগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য রথের গতি স্তব্ধ করিয়া দিতেছিলেন।

গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের উচ্চ পদাধিকারী মন্ত্রীত্বের পদ হইতে অব্যাহতি লইয়া প্রয়াগ ও কাশী হইতে ভক্তির দর্শন সম্বন্ধে উপদেশাদি লাভ করিয়া যথাক্রমে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীদ্বয় পুরীতে আলাদা আলাদাভাবে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন, তখন তাঁহারা তীব্র দৈন্যবশতঃ ঠাকুরের নির্জন আবাসেই আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও চাকুরীতে থাকাকালীন দৈবক্রমে মুসলমানদিগের সংস্পর্শে থাকায় নিজদিগকে অস্পৃশ্য মনে করিতেন এবং পাছে জগন্নাথের সেবকগণের সহিত স্পর্শ হইয়া যায়, তাই তাঁহারা হরিদাসের বাসাকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ মহাপ্রভু যখন হরিদাসের কুটিতে আসিতেন, সেই সময় হরিদাস সহ শ্রীরূপ বা শ্রীসনাতন যিনিই থাকিতেন তাঁহাকেও আলিঙ্গন করিয়া যাইতেন।

একবার শ্রীসনাতন সেখানে অবস্থানকালীন মহাপ্রভু তাহাকে জানাইলেন যে, সনাতনের দেহ তাঁহার নিজ দেহ। মহাপ্রভু চলিয়া গেলে ঠাকুর সনাতনকে জানাইলেন ঃ "তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, কারণ তোমার দেহকে তিনি তাঁহার নিজদেহ বলিয়া জানাইলেন।" তাহাতে সনাতন উত্তর দিয়াছিলেন ঃ "তোমার মত ভাগ্যবান্ কে আছে? প্রভু নিজনাম প্রচারের জন্য অবতরণ করিয়াছেন এবং তাহা তিনি তোমার দ্বারাই করিতেছেন। তুমি সকলের গুরু, অতএব নামাচার্য্যরূপে পৃথিবী-পূজিত।"

একদিন মহাপ্রভু যথারীতি সিদ্ধবকুলে আসিয়া হরিদাসের বাসায় আসিলেন। শ্রীনামের মহিমা বুঝাইবার জন্য হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিদাস, এই কলিযুগে বহুপ্রকার বর্ণ অথবা বিরোধী অ-হিন্দু আছে, তাহারা গো-ব্রাহ্মণের শত্রু ও স্বভাবের পবিত্রতা নাই, তাহারা কি ভাবে উদ্ধার লাভ করবে?" ঠাকুর হরিদাস বলিলেন,—"হে প্রভো! তাহাতে আপনার উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। আপনার ভক্ত যেমন বলিয়া থাকেন 'হা রাম', 'হা রাম' (আপনার প্রতি পরম প্রীতিবশতঃ, তাহারাও তেমনি অন্যায়কারীদের প্রতি বিরক্ত হইয়া 'হারাম, হারাম' বলিয়া থাকে); ইহা নামাভাস (ঐশ্বরিক নামের প্রতিফলন), যদিও ইহা অন্য কিছুর প্রকাশভঙ্গী মাত্র, তথাপি নামের শক্তি ব্যর্থ হয় না, ইহাতে ফল হইবেই। জঘন্য পাপী অজামিলও মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া নিজপুত্রকে 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখন বিষ্ণুদূতগণ বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিয়া যমরাজের দূতগণকে হঠাইয়া দিয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা (যমদূতগণ) তাহাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। নামাভাসের ফলে এই অজামিলের সমস্ত পূর্বপাপ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল ও তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন—যেমন শাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে খুশী হইয়া একটু অন্যভাবে প্রশ্ন করিলেন, "পৃথিবীতে বহুপ্রকার জীব বর্তমান—সজীব ও নির্জীব; তাহারা কি ভাবে মুক্তি লাভ করিবে?" উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "হে ভগবন্! তাহা আপনার কৃপার মাধ্যমে; কারণ নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া আপনি এমন অনেককেই উদ্ধার করিয়াছেন। বৃন্দাবন যাত্রাকালে আপনার একমাত্র সঙ্গী বলভদ্র ভট্ট আমাকে জানাইয়াছেন। ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি আসিতে ভট্ট ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কোনও ক্ষতি করে নাই। মহাপ্রভু ও তাঁহাকে নিরাপদে যাইতে দিয়াছিল। কখনও কখনও বার বার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে আপনাকে সঙ্গদান করিয়াছিল, আবার কখনও হরিণ ও ময়ূরের দল ব্যাঘ্রদলের সঙ্গে সঙ্গে আপনার আদেশে 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিল। নিজ নিজ বৈরীভাব ত্যাগ করিয়া তাহারা সানন্দে প্রেমে পরস্পরকে চুম্বন করিয়াছিল। বৃক্ষ ও লতাগুলিও প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহারাও প্রতিধ্বনির আকারে 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে উল্লসিত ভাবের মধ্য দিয়া দিব্য প্রেমের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রভো, আপনার নামে সচল বা অচল সকল প্রাণীরই উদ্ধার হইতেছে।" মহাপ্রভু এখানেও না থামিয়া আরও একটি

বিষয় উত্থাপন করিলেন যথা—সকলেই যদি উদ্ধার হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবী ত' শূন্য হইয়া যাইবে। হরিদাস বলিলেন,—"যখন এই জগতের প্রাণী সকলে উদ্ধার হইয়া গেলে, আপনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য জগৎ (ভুবন) হইতে এখানে প্রেরণ করিবেন ও তাহারা একই পন্থায় মুক্তি লাভ করিবে। এই প্রক্রিয়া চিরকাল চলিতে থাকিবে, কারণ ভুবনসমূহ অসংখ্য; ঠিক এমনই হইয়াছিল যখন আপনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে অযোধ্যাকে ও কৃষ্ণরূপে ব্রজকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।" অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণ সমক্ষে ঠাকুরের বহু গুণাবলীর কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, কারণ ভক্তগণের মহিমা কীর্তনে তিনি সর্বদা উল্লসিত হন, বিশেষতঃ হরিদাস যখন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। ইহাতে আমাদের স্মরণে আসে হরিদাস প্রভুর কত প্রিয় ও মহাপ্রকাশ দিবসে কাজীর জহ্লাদগণের হস্তে নিগৃহীত হরিদাসের আঘাত কি ভাবে নিজ পৃষ্ঠপ্রদেশে দেখাইয়াছিলেন।

এইবার আমরা ঠাকুরের পবিত্রতম চরিত্রের উপসংহারে আসিব, যাহার সমান কোথাও বড় একটা মেলে না। এক দিবস গোবিন্দ তাঁহার জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে দেখিতে পাইলেন তিনি মালিকায় সংখ্যানাম ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি প্রণাম জানাইয়া তাহা হইতে কয়েকটি কণা লইয়া বলিলেন নিয়মিত সংখ্যাপূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রসাদ পাইতে পারেন না। তখন মহাপ্রভু তাঁহার নিকট আসিলেন ও ভাল আছেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবনত হইয়া প্রণাম জানাইয়া তিনি জানাইলেন দৈহিকভাবে তিনি সুস্থ কিন্তু মানসিকভাবে নহেন, কারণ তিনি পূর্ণ সংখ্যায় হরিনাম করিতে পারিতেছেন না। মহাপ্রভু তাঁহাকে সংখ্যা কমাইয়া দিতে বলিলেন, কারণ এখন তাঁহার মধ্যে বার্দ্ধক্য জনিত দুর্বলতা আসিয়াছে। তাহা ছাড়া তিনি ইতঃপূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছেন, (তিন লক্ষ) নামের সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই; নিজে বাস্তবে দেখাইয়া তিনি যথেষ্টভাবে নামের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, যেহেতু জনসাধারণের উদ্ধারের জন্য তাঁহার অবতরণ এবং তাহা তিনি প্রভূতভাবে সার্থক করিয়াছেন। হরিদাস তখন বলিলেন, "হে প্রভো! আপনি এমনই করুণাময় যে, আমাকে আপনি নিজ ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, নীচ বংশজাত, ঘৃণ্য দেহ তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমাকে অতীব কৃপাপরবশ হইয়া অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। আমার মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে যে, আপনি নিজেকে খুব অল্পদিনের মধ্যে এ জগত হইতে সরাইয়া লইবেন। আমার প্রার্থনা, তাহা যেন আমার পূর্বে

না হয়। সুতরাং আমার ইচ্ছা এখনই এ দেহ ত্যাগ করিতে, আপনার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া; আপনার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে ও মুখে আপনার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যেন তাহা হয়। কৃপা করিয়া আমার এই প্রার্থনা আপনি পূরণ করুন, যদি আপনার মনে হয় তাহা যোগ্য।" সাধুজনোচিত উপলব্ধি দ্বারা ঠাকুর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি (মহাপ্রভু) আর অধিক দিবস এ পৃথিবীতে থাকিবেন না; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অনুমান সত্যে পরিণত হইয়াছিল কারণ তিনি মাত্র আটচল্লিশ বৎসরের অধিক থাকেন নাই। উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস, করুণাময় কৃষ্ণ অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূরণ করিবেন; কিন্তু এভাবে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার ঠিক হইতেছে না।" হরিদাস বলিলেন, "হে প্রভো! আপনার লীলা সহায় হইতে কোটি কোটি ভক্ত আছেন, আমার চলিয়া যাওয়াতে বিশেষ কিছু হইবে না, ঠিক যেমন পিপীলিকার মত এক ক্ষুদ্র প্রাণীর মৃত্যু হইলে পৃথিবীর বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। সুতরাং কৃপাপূর্বক আমার প্রার্থনা পূরণ করুন।" পরদিবস সকালে ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার সংবাদ কি, তাহাতে হরিদাস বলিলেন —প্রভু, যেমন আদেশ করিবেন। মহাপ্রভু ভক্তগোষ্ঠীর সম্মুখে হরিদাসের বহু গুণাবলীর কথা কীর্তন করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার চরণে প্রণতঃ হইলেন। হরিদাস তখন মহাপ্রভুকে সম্মুখে উপবিষ্ট করাইলেন, নিজ চক্ষু তাঁহার বদনকমলে নিবিষ্ট করিলেন, তাঁহার চরণ বক্ষে ধারণ করিলেন, ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তখন চক্ষের অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইতে লাগিল। উচ্চস্বরে সঙ্কীর্তনের মধ্যে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া বহির্গত হইল; যাহাতে ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যুর কথা আমাদের মনে পড়ে। এখানে লক্ষিতব্য যে, ভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশ উচ্চ ব্রাহ্মণ- কুলোজাত হইয়াও তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন, যদিও তিনি তাঁহাদের জ্ঞান অনুসারে নীচকুলজাত ও ইহাই শিক্ষণীয় যে, জন্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে বৈষ্ণব সকলেরই পূজ্য।

অতঃপর সেই দেহটি হস্তে ধারণ করিয়া উঠানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেহটিকে এক শকটে লইয়া সমুদ্রতীরে গমন করা হইল। সম্মুখে মহাপ্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন, পিছনে ভক্তগণ। মহাপ্রভু বলিলেন—এখন হইতে সমুদ্র পবিত্র হইল। ভক্তগণ প্রত্যেকে তাঁহার (হরিদাসের) পদধৌত জল গ্রহণ

করিতে লাগিলেন। সেখানে বালুকার মধ্যে গর্ত করিয়া তাঁহার দেহটিকে শায়িত করা হইল। মহাপ্রভু নিজ হস্তে তাহাতে বালুকা প্রদান করিলেন, পরে ভক্তগণও তাহাই করিলেন। অতঃপর তিনি নৃত্য সঙ্কীর্তন করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিলেন। সমগ্র পুরী শহরটি সঙ্কীর্তনের শব্দে মুখরিত হইল। মহাপ্রভু স্বয়ং মন্দিরস্থ সম্মুখ দরজায় নিজ উত্তরীয় পাতিয়া দোকানিদের নিকট মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন ও মহোৎসব করিলেন এবং নিজ হস্তে সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট ভক্তগণকে প্রচুর পরিমাণ প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। ভক্তগণ হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মানকারী ভক্তগণকে এই বর প্রদান করিলেন যে, যাহাদের শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে, যাহারা নৃত্য করিয়াছে, কীর্তন করিয়াছে, ভক্তগণের অনুগমনে দেহে বালুকা প্রদান করিয়াছে ও তাহার সম্মানে যাহারা মহোৎসবে যোগদান করিয়াছে, তাহারা সত্বর কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিবেন; শ্রীহরিদাসকে দর্শনের এমনই শক্তি। মহাপ্রভু আরও বলিলেন,—"সে কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গদান করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণের একান্ত ইচ্ছায় তাহাতে ছেদ পড়িল। সে ভীষ্মের মত স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিল। সে ছিল পৃথিবীর এক চূড়ামণি-স্বরূপ। তাহার অভাবে পৃথিবী মণিহারা হইল।" অতঃপর তিনি হরিদাসের নামে সকলকে হর্ষধ্বনি করিতে করিতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন—যাহার মধ্যস্থলে মহাপ্রভু নৃত্য করিতে থাকিলেন, তখন ভক্তগণ চিৎকার করিয়া "ভগবানের নাম-মহিমা প্রচারকারী হরিদাসের জয় জয়।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই বলিয়া বিবরণ উপসংহার করিয়াছেন ঃ "এইভাবে শ্রীহরিদাসের নির্যাণ বর্ণনা সমাপ্ত হইল, যে কেহ ইহা শ্রবণ করিবে তাহারই গভীর প্রেম সহ কৃষ্ণে ভক্তি লাভ হইবে।"

ছোট হরিদাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সাধুটির বিবরণ উল্লেখিত আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরীতে ছিলেন সে সময় তাঁহার দুই জন কীর্ত্তনীয়া ছিলেন যাঁরা ছিলেন মধুর কণ্ঠী বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস। পরবর্ত্তীজনের বিবরণ এখানে বিবৃত হইবে। পার্থিব ব্যাপারে তিনি ছিলেন বীতস্পৃহ, মহাপ্রভুর যথাসময়কালীন ভাব অনুযায়ী যথোপযুক্ত কীর্ত্তনের মাধ্যমে তাঁহার সেবা করিতেন। শাস্ত্রে তৌর্যত্রিক নামক (কণ্ঠ, যন্ত্র ও নৃত্য) সঙ্গীত ঘৃণিত ও প্রকাশ্যভাবে নিন্দিত ও ভব্য লোকের মাঝে পরিবেশনের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে যদি না উহা ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে করা হয় এবং সেক্ষেত্রে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে; নচেৎ পার্থিব আনন্দ উপভোগের জন্য কামনা সৃষ্টিকারী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ছিলেন সেই জন্য তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে অতীব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

শ্রীভগবান আচার্য নামে এক ভক্ত ছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের জন্য পুরীতে বাস করিতেন; মাঝে মাঝে তিনি অতি উত্তম উত্তম ভোজ্য পরিবেশন করিবার জন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন; তিনি মহাপ্রভুর এমনই ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন যে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। এমনই এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি ছোট হরিদাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। যদিও তিনি শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে প্রচুর পরিমাণ প্রসাদ আনাইয়া ছিলেন, তথাপি অনেক ভোজ্য বাড়ীতেও প্রস্তুত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ছোট হরিদাসকে বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী শ্রীমাধবী দেবীর নিকট হইতে কিছু শ্রেষ্ঠমানের তণ্ডুল আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন, এই সন্ন্যাসিনী ও তাঁহার ভ্রাতাগণ মহাপ্রভুর খুব ঘনিষ্ঠ পার্ষদগণের মধ্যে একজন ছিলেন। সেই আদেশ পালন করিয়া হরিদাস তাঁহার নিকট হইতে তণ্ডুল আনয়ন করেন। আচার্য তাহা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হন ও অতীব প্রীতি সহকারে রন্ধনও করেন। মহাপ্রভু মন্দির হইতে আনীত ও গৃহে পাচিত সুস্বাদু প্রসাদগুলির সম্মানার্থে তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কোথা হইতে এত সূক্ষ্ম চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে। যখন তাঁহাকে জানান হইলে যে মাধবী দেবীর নিকট হইতে আনানো হইয়াছে, মহাপ্রভু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন কে উহা আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে শ্রীআচার্য বলেন ছোট হরিদাস আনিয়াছেন।

মহাপ্রভু নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সর্বসময়ের সেবক গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন ছোট হরিদাসকে যেন আর আসিতে দেওয়া না হয়। এই আদেশে গোবিন্দ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কারণ তিনি জানিতেন ছোট হরিদাস তাঁহার অতীব প্রিয়পাত্র। তাঁহার অপরাধ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, কেন তাঁহার দ্বার মানা হইল বুঝিতে পারিলেন না। অপর কেহই তাহা জানিতেন না। পর পর তিন দিবস হরিদাস নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ ভক্তগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু বলেন বৈরাগী হইয়া যে নারীর সহিত কথা বলে আমি তাহার মুখ দর্শন করিতে পারি না। অদম্য ইন্দ্রিয় সকল সদাই উপভোগের সামগ্রী আবাহনে উৎসুক। এমনকি কাষ্ঠনির্মিত নারীমূর্ত্তিও মুনিগণের মনকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে। শাস্ত্রসমূহ (যথা ভাগবত ৯।১৯।১৫ ও মনু ২।২১৫) বলেন 'কোনও রমণীর সহিত নির্জনে থাকিবে না, এমনকি সে যদিও মাতা, ভগ্নী বা কন্যাও হয়; কারণ প্রবল ইন্দ্রিয়সকল বিজ্ঞ লোকেরও মন হরণ করে। হতভাগ্য জীব (অর্থাৎ যাহার ত্যাগের মনোভাব এখনও অপক্ক অবস্থায়) ভণ্ড ত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয় চালিত হইয়া স্ত্রীলোকগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।' এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন যাহাতে এই বিষয় লইয়া আর কথা বলার সুযোগ না হয়। তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া ভক্তগণ নীরব হইলেন। অন্য এক দিবস একই সময়ে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া হরিদাসের পক্ষে কিছু বলিয়া তাহাকে (হরিদাসকে) কৃপা প্রদর্শন করিতে বলিলেন যেহেতু তাহার অপরাধ খুব গুরুতর নহে ও তাহার ভাল শিক্ষা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে সে আর এমন অপরাধ করিবে না। তাঁহাদের যুক্তি ছিল মাধবীর কাছে চাউল ভিক্ষা ছাড়া তাহার অন্য কোনও মতলব ছিল না, তাহার উদ্দেশ্য ছিল মহাপ্রভুকে সুখদান করা। যদিও তাহার পক্ষে ইহা কিছুটা অসঙ্গত আচরণ হইয়াছে, তথাপি যদি কোনও বৈরাগী নিজ স্বার্থে নারীর সহিত কথা বলে সেই প্রকার গর্হিত কার্য কিছু হয় নাই। উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন; "আমার মনও আমার বশে নহে; সুতরাং অপরিণত বয়স্ক সন্ন্যাসী কি ভাবে নারীর সহিত কথা বলার কালে নিজ মনকে বশে রাখিবে? তোমরা নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ কর, এই সমস্ত অবান্তর কথা বন্ধ কর; নচেৎ তোমরা আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না।" তাহা শুনিয়া সকলে কর্ণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ও সেই স্থান হইতে

নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর স্নানের নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর এহেন ক্রিয়া হেঁয়ালীর মত যাহা অনুধাবন করা অতীব কষ্টকর।

অপর এক দিবস ভক্তগণ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপরমানন্দ পুরীর সহিত মিলিত হইলেন, তাঁকে মহাপ্রভু খুবই শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা শ্রীহরিদাসের পক্ষে প্রার্থনামূলক অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়া তিনি মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কি। তিনি (পুরী) হরিদাসকে কৃপা প্রদর্শন করিতে বলেন, তাহাতে মহাপ্রভু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, "সম্মানীয় মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সকল বৈষ্ণবগণকে লইয়া এখানে অবস্থান করুন ও আমাকে আলালনাথে (কয়েক মাইল দূরে এক নিরিবিলি স্থান) যাইতে দিন, সেখানে গোবিন্দকে লইয়া একাকী থাকিব।" মহাপ্রভু যাইতে উদ্যত হইলে, পুরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, আপনার বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত কেহ নাই। আপনার সকল ক্রিয়াই মানব কল্যাণের নিমিত্ত, যাহা আমাদের বোধের বাহিরে, কারণ আপনার মত গম্ভীর।" পুরী চলিয়া গেলে ভক্তগণ হরিদাস যেখানে উপবাস করিতেছিলেন সেখানে গমন করিলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, 'হে হরিদাস, শ্রবণ কর ও বিশ্বাস কর যে আমরা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি এখন জেদের বশে; পরবর্তী কোন সময়ে তিনি তোমার উপর সদয় হইবেন। যেহেতু তিনি কৃপাময়। যদি তুমি জেদ ধরিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার জেদ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি উপবাস ভঙ্গ কর ও স্নানাহার কর, তাঁহার রাগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইবে।' হরিদাস সেই মত পালন করিলেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে মন্দিরে গমন করেন সে সময় হরিদাস তাঁহার সম্মুখে না আসিয়া দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করেন।

মহাপ্রভু করুণা সিন্ধু; কিন্তু কে ইহা বুঝিতে পারিয়াছে? প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি কি তাহা মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য তিনি নিজ ভক্তগণের উপর শাস্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন মায়ার ত্রিগুণের অতীত প্রকৃত বৈষ্ণবগণের উচ্চ স্থান কোথায় ও ভবিষ্যতের মেকী বৈষ্ণবগণের রীতি-নীতি কেমন দাঁড়াইবে যাহা শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী কারণ সেইগুলি অশিষ্ট ও অধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমাধবী দেবী অতীব

উচ্চ গুণরাজি সমন্বিত মহাভাগবত ছিলেন। মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণের পক্ষে তাঁহার নিকট চাউল ভিক্ষা করা কোন অনুচিত কার্য্য হয় নাই; তথাপি পাছে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রতারণামূলক ও ভণ্ড মিছা-বৈষ্ণবগণ অ-বৈষ্ণবোচিত পন্থাকে বৈষ্ণব ধর্মে বলিয়া প্রচার করে ও মানুষকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে অসৎ পথকে সৎপথ বলিয়া প্রতারিত করে, সেই আশঙ্কায় মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাগুরুর অভিনয় করিয়া বাহ্যিক ভাবে নিজপ্রিয় পার্ষদভক্ত হরিদাসের উপর অতি কঠোর দণ্ড প্রদান লীলা প্রদর্শন করেন। মহাপ্রভু কলিযুগে জীবগণের দুর্বলতা পূর্ব-অনুমান করিয়া এই প্রকার সাংঘাতিক শাস্তিমূলক আদেশ জারী করিয়াছিলেন ও এই ভাবে নিজের কৃপা প্রদর্শন করেন যাহার পিছনে কোন অসৎ কিছু লুক্কায়িত নাই। (এই অনুচ্ছেদটি এই বিষয় বস্তুর উপর শ্রীপ্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর মহাশয়ের বিবৃতি অবলম্বনে)।

ইহা দেখিয়া সকল ভক্তের মনে ভীতির সঞ্চার হইল ও তাঁহারা স্বপ্নেও রমণীর সহিত বাক্যালাপ ছাড়িয়া দিলেন। এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল; তথাপি মহাপ্রভু হরিদাসের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিলেন না। এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার প্রাক্কালে এক রাত্রে হরিদাস হতাশ হইয়া প্রয়াগ-তীর্থের উদ্দেশ্যে গমন করিয়া ত্রিবেণীতে অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম স্থলে গমন করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ পুনঃ প্রাপ্তির দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। এই মুহূর্ত্তেও তিনি অপ্রাকৃত দেহে মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন ও অদৃশ্যভাবে রহিলেন। সেই দেহে অন্যের অশ্রুত তিনি মহাপ্রভুর প্রীতির জন্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাস কোথায়? তাহাকে এখানে আনয়ন কর।" তাঁহারা বলিলেন, 'বর্ষপূর্ত্তির সময় একরাত্রে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় তাহা কেহ জানে না।' তাহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন, তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে বিস্ময়ের উৎপাদন হইল। অন্য এক দিবস শ্রীস্বরূপ দামোদরের মত মহাপ্রভুর নিকটতম কিছু ভক্তগণ বহুদূর হইতে আগত সুমধুর সুরে হরিদাসের কণ্ঠে কীর্ত্তন শুনিতে পাইলেন কিন্তু কোন কীর্ত্তনীয়াকে দেখা গেল না। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীগোবিন্দ অনুমান করিলেন হরিদাস আত্মহত্যা করিয়াছেন হয় বিষ ভক্ষণ করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে এবং সেই পাপে তিনি ব্রহ্ম দৈত্য হইয়াছেন। সকল সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার

করিয়া লন সেই শ্রীস্বরূপ দামোদর বলেন ঃ ‘এই অনুমান ভুল তিনি সারা জীবন কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছেন, মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়াছেন ও শ্রীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কখনও নরকপ্রাপ্তি হইতে পারে না, কারণ পরমসুখ তাঁহার প্রাপ্য। ইহা মহাপ্রভুর কিছু অদ্ভুত লীলা; পরে ইহা জানিতে পারিবে।’

এক বৈষ্ণব প্রয়াগ হইতে (মহাপ্রভুর জন্মস্থান) শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে আগমন করিলেন, তিনি হরিদাসের ঘটনা জানাইলেন, তিনি কি সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া অন্যান্যগণ সহ শ্রীবাস পণ্ডিত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তাহার পর প্রায় এক বৎসর পর বঙ্গদেশের ভক্তগণ শ্রীশিবানন্দের তত্ত্বাবধানে যথারীতি পুরী আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীপাদ শ্রীবাস হরিদাসের বর্ত্তমান অবস্থিতি কোথায় জানিতে চাহিলে উত্তরে মহাপ্রভু বলেন—“ ‘স্বকর্মফলভুক্ পুমান’—প্রতিটি মানুষ নিজ কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে।” অতঃপর শ্রীবাস হরিদাস সম্বন্ধে পূর্বশ্রুত কাহিনী বিবৃত করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু খুব উল্লসিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “স্ত্রীলোক দর্শনের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।” অতঃপর শ্রীস্বরূপ ও অন্যান্যগণ একত্রে বসিয়া আলোচনায় বিচার করিলেন পবিত্র ত্রিবেণীর গুণে হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট আসিতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একটি লীলার মাধ্যমে অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন, যেমন তিনি এখানে করিলেন, যথা তাঁহার অপার করুণার প্রকাশ, প্রকৃত বৈরাগ্যের মূল্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, তাঁহার প্রতি তাঁহার নিজ ভক্তগণের গভীর অনুরাগ প্রদর্শন, পবিত্র স্থানের মহিমা, নিজ ভক্তগণকে আত্মসাৎ, বৈষ্ণবগণের অবস্থা ও চরিত্র কি প্রকার নিষ্কলঙ্ক হওয়া উচিত—যে জন্য ইহা প্রদর্শন করিলেন পার্থিব আসক্তির অতি সূক্ষ্মতম স্পর্শেও কি প্রকার বিষময় ফল হইতে পারে, যদিও তাঁহার (মহাপ্রভুর) ভক্ত হইতে আগ্রহী তথাপি পার্থিব ভোগাদি একান্তভাবে পরিহারে এমনকি তলানি পর্যন্ত—তাহাদের প্রতি অনীহা, বাহ্যিকভাবে পরিত্যাগের ভাব দেখাইয়াও হরিদাসের মত শুদ্ধ ভক্তের সেবা অঙ্গীকার—অবশ্য লোকশিক্ষার জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে। মোটের উপর ছোট হরিদাস ছিলেন মহাপ্রভুর শুদ্ধ ও অতীব সাধু প্রকৃতির ভক্ত।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম-সাময়িক শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শঙ্কর সম্প্রদায়ের এক দণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার পথে কাশীতে অবস্থানকালে মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ তাঁহাকে নিন্দা করিতে থাকেন। সন্ন্যাসীগণের স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে—"সন্ন্যাসী তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ 'গান, 'নর্ত্তন' ও 'বাদন' কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন এবং সর্বদা বেদান্ত অনুশীলন করিবেন"। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শাঙ্কর মতবাদ শ্রবণ করিতে না দেখিয়া পক্ষান্তরে কৃষ্ণগানাদি মত্ত হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া কাশীর সন্ন্যাসীগণ তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্মে অনভিজ্ঞ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাকে 'মূর্খ সন্ন্যাসী' জ্ঞান করিয়া ভাবিতেন যে সন্ন্যাসী 'নিজধর্ম' জানেন না। এই সব শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মনে মনে হাসিয়া কাহাকেও সম্ভাষণ না করিয়া উপেক্ষা করিয়া মথুরা গমন করিলেন। পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়া শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান ও তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্বাহন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে সনাতন গোস্বামী আসিয়া মিলিত হইলে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করেন—

"কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৫০

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন। এমন সময়ে এক বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করেন—'আমি সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি আসিলে আমার মনষ্কাম পূর্ণ হয়।' আমি জানি, আপনি সন্ন্যাসী-গোষ্ঠীতে গমন করেন না, তথাপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আপনি এই নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করুন। মহাপ্রভু হাসিয়া অঙ্গীকার করিলেন—ইহা কেবলমাত্র সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য এক ভঙ্গী মাত্র। নির্দিষ্ট দিনে মহাপ্রভু সন্ন্যাসীমণ্ডলী মধ্যে সেই বিপ্র ভবনে গমন করিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসীর গণ সেখানে বসিয়া আছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের মধ্যে 'তীর্থ, 'আশ্রম' ও 'সরস্বতী'—এই তিন সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু মহাপ্রভু 'ভারতী' সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উচ্চ সম্প্রদায়স্থিত বলিয়া বিচার করিলেন; মহাপ্রভু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর

অমানী ও মানদধর্ম জানাইতে গিয়া আপনাকে হীন-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান করিলেন। মহাপ্রভু সভায় প্রবেশ করিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িয়া কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন—যেন 'মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যাভাস' এবং সকল সন্ন্যাসীর মন আকর্ষণ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ন্যাসী-প্রধান শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"এইখানে আসুন, অপবিত্র স্থানে বসিলেন কেন?' প্রভু দৈন্যোক্তি করিয়া বলিলেন—"আমি হই হীন-সম্প্রদায়। তোমা সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না যুয়ায়।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৬৪)। তখন প্রকাশানন্দ নিজে সম্মান করিয়া হাত ধরিয়া সভা মধ্যে বসাইলেন। প্রকাশানন্দ বলিলেন, আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কেশব ভারতীর শিষ্য আপনি। এই স্থানে থাকিয়াও আমাদের নিকট আসেন না কি কারণে? সন্ন্যাসী হইয়া আপনি নর্ত্তন-গায়ন করেন, ভাবুকগণকে সঙ্গে লইয়া কীর্তনাদি করেন, সন্ন্যাসীর ধর্ম বেদান্ত পঠন, ধ্যান করেন না। আপনার প্রভাব দেখিয়া মনে হয় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; তথাপি হীনাচার করেন কেন? মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন, 'গুরু আমাকে মূর্খ দেখিয়া বলিলেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি 'কৃষ্ণনাম' জপ করিতে থাক। সেই কৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসার মোচন হইবে, কৃষ্ণনাম হইতে কৃষ্ণের চরণ লাভ হইবে। কলিকালে নাম বিনা আর কোন ধর্ম নাই। নাম লইতে লইতে আমার মন ভ্রান্ত হইল। ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি না, মদমত্তের ন্যায় হাসি, কান্দি, নাচি, গাই। আমার এই সমস্ত ভাব গুরুচরণে নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এমনই স্বভাব। ইহাই কৃষ্ণনামের ধর্ম, ভালই হইল তুমি এই পরম পুরুষার্থ লাভ করিলে। তোমার প্রেমেতে আমি কৃতার্থ হইলাম। এইভাবে তুমি নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্তন কর, আর কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়া সকলকে উদ্ধার কর।' প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনিয়া সকলের মন ফিরিয়া গেল, তাঁহারা বলিলেন, 'আপনি যাহা কিছু বলিলেন সবই সত্য। কৃষ্ণ সেই পায়, যাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হয়। তথাপি আপনার নিকট জানিতে চাহি, আপনি বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন? প্রভু বলিলেন, বেদান্তসূত্র ঈশ্বর বচন, শ্রীনারায়ণ ব্যাসরূপে তাহা রচনা করিয়াছেন কিন্তু গৌণবৃত্তিতে আচার্য্য শঙ্কর যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিলে সর্বনাশ হয়। শ্রীশঙ্করের তাহাতে দোষ নাই, তিনি ঈশ্বরাদেশে মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ করিলেন, মায়াধীশ বিষ্ণুকে মায়িক জ্ঞান পাষণ্ডতা।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৩১৫)

শ্রীশঙ্কর প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আরও শাস্ত্র আলোচনার পর সন্নাসীগণ সকল ব্যাখ্যাই স্বীকার করিলেন ও বলিলেন—

"বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ--পূর্ব্বে যে কৈঁলু নিন্দন।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪৮)

তাঁ' সবার অপরাধ ক্ষমা করিয়া মহাপ্রভু সকলকে কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়া কৃপা করিলেন। চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও শ্রীসনাতন অতীব আনন্দিত হইলেন।

যে দিন মহাপ্রভু সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে কৃপা করিলেন, সেইদিন হইতে বহু তার্কিকেরা প্রভু সহ তর্কার্থ আগমন করিলে সকলের কুতর্ক খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তপূর্ণ অকাট্য-যুক্তিবলে ভক্তিকে সার করিলেন। তাঁহার উপদেশ লইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দের এক শিষ্য সভাস্থলে সমালোচনা-মুখে প্রভুকে 'নারায়ণ' জ্ঞানে বেদান্তের চিদ্‌বিলাস ব্যাখ্যার স্তুতি ও শঙ্করের মতবাদকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যই দৃঢ় সত্য, কলিকালে সন্ন্যাস দ্বারা 'সংসার' জয় করা যায় না। ভক্তিই মুক্তিদাত্রী ও নামাভাসই মুক্তিপ্রদ। প্রকাশানন্দের শিষ্যের দ্বারা মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে প্রকাশানন্দ সরস্বতী নানা যুক্তি দ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। পঞ্চনদে স্নানের পর মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্যে প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িয়া আপনার পূর্ব কার্য্যের ধিক্কার এবং বেদান্তসঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রহ্মসম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ শিখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য; তাহা দেখাইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে সন্ন্যাসিগণ 'ভক্ত' হইলেন।

এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা-বশে কাবেরী-প্রবাসী ব্যঙ্কট ভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে। ভক্তমাল নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এই প্রকার ভ্রমদোষ প্রবেশ করায়, অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রমদোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে। উদ্ধারান্তে প্রকাশানন্দের 'প্রবোধানন্দ' নামপ্রাপ্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য

ব্রজে যিনি ছিলেন মধুরেক্ষণা, গৌরলীলায় তিনি শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তি অধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুরে যেঁহো ব্রহ্মচারী।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৪৬

সন্ন্যাসিগণের পাকাদি ব্যবহারিক কর্ম্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। তাঁহারা গৃহস্থের নিকট ঐগুলি গ্রহণ ও স্বীকার করেন। সন্ন্যাসিগণ—গুরু, ব্রহ্মচারিগণ—শিষ্য। বলভদ্র মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবন গমন কালীয় ব্রহ্মচারীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

যে বৎসর পুরীতে রথযাত্রা দেখিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হয়, সে সময় রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত মহাপ্রভু যুক্তি করিলেন যে, তিনি কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া রাত্রে উঠিয়া একাকী বনপথে যাত্রা করিবেন। তথাপি রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর সঙ্গে এক উত্তম ব্রাহ্মণ লইতে অনুরোধ করেন। ভক্তের সুখেই ভগবৎপ্রীতি ও ভগবৎপ্রীতিতেই ভক্তসুখ। বনপথে যাইতে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ (যাঁহার অন্ন ভোজ্য অর্থাৎ যাঁহার অন্নভোজনে দোষ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ) পাওয়া যাইবে না। স্বরূপ বলিলেন, অতএব এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এক স্নিগ্ধ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সাধু ও আর্যা এবং তাঁহার সঙ্গী বস্ত্র ও জলপাত্র বহন করিবার জন্য সঙ্গে যাইবেন। তাঁহার অনুরোধ মানিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। শেষ রাত্রে উঠিয়া মহাপ্রভু লুকাইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু বনপথে গমনকালে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রভুকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিত। পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকর প্রভৃতির মধ্য দিয়া আবেশে যাইবার কালে বলভদ্রের মনে মহাভয় হইল। একদিন এক শায়িত ব্যাঘ্রের গায়ে প্রভুর চরণ লাগিতে সেই ব্যাঘ্র মহাপ্রভুর আদেশে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। অন্য একদিন মহাপ্রভু নদীতে স্নান করিবার কালে একদল মত্তহস্তী জলপান করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের গায়ে জল ছিটা দিয়া 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিলে তাহারাও 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমে নাচিতে গাহিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন। পথে যাইবার কালে প্রভুর সঙ্কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মৃগীগণ প্রভুর সঙ্গে চলিতে লাগিল। এমন সময় পাঁচ-সাতটি ব্যাঘ্র তথায় আসিয়া মৃগীগণ সহ চলিতে লাগিল। মহাপ্রভু

তাহাদিগকে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিলে ব্যাঘ্র, মৃগ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। এইভাবে ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম যত আছে সকলকে কৃষ্ণনাম দিয়া প্রেমে উন্মত্ত করিলেন। মহাপ্রভুর মুখে কীর্ত্তিত শ্রীনাম-শ্রবণকারীর কৃষ্ণভক্তি লাভ ও তন্মুখে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তনধারায় লোকসকল উদ্ধার লাভ করিতে লাগিল। এইভাবে প্রভুর গমনপথে শ্রবণ-কীর্তন পরম্পরায় সকলের বৈষ্ণবত্ব লাভ হইতে লাগিল। যদিও মহাপ্রভু বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রেম চেষ্টা গোপন করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি প্রভুর দর্শন ও নাম-কীর্ত্তন শ্রবণেই লোকের ভক্তি লাভ হইতে লাগিল। এমন কি ঝাড়িখণ্ডে নিতান্ত কৃষ্ণবহির্মুখ লোকসকলও উদ্ধার হইল। মহাপ্রভুর মহাভাগবতোচিত ব্রজলীলার উদ্দীপন হইল—

"বন দেখি' ভ্রম হয় এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন'।।
যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি'।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৫৫-৫৬

বলদেব ভট্টাচার্য্য পথে যাইতে যাইতে শাক-ফল-মূল যেখানে যাহা পান, তাহাই প্রভুসেবার জন্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। পথে গমনকালে পাঁচ-সাতজন আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন। সকলেই যথাসাধ্য মহাপ্রভুর সেবা করিতে থাকেন। বনপথে ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রীতির ভোজ্যবস্তু বন্য-ব্যঞ্জন পাক করেন যেখানে যেখানে লোকের বসতি নাই, সেই সব স্থানের জন্য ভট্টাচার্য্য দুই-চারিদিনের অন্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। ভট্টাচার্য্য নিজেকে 'দাস' জ্ঞানে প্রভুর সেবা করিতে থাকেন ও সঙ্গী বিপ্র জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহন করিয়া চলেন।

ভট্টাচার্য্যকে মহাপ্রভু পূর্ব বৃন্দাবন যাত্রা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—'আমি বহু দেশে গমন করিলাম, বনপথে কোথাও কোন কষ্ট পাই নাই। কৃষ্ণকৃপায় আমি খুব সুখ পাইলাম, ভট্টের সেবা-চেষ্টায় প্রভু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 'তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইলাম'। বলভদ্র বলিলেন, আপনি কৃষ্ণ, দয়াময়, আমি অধম জীব, কৃপা করিয়া আমাকে লইয়া আসিলেন ও আমার হাতে ভিক্ষা অঙ্গীকার করিলেন—'অধম কাকেরে কৈলা গরুড় সমান'। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভু 'কাশী'তে আসিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবার সময়

তপন মিশ্রের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। প্রভু তাঁহাকে লইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন, অতঃপর বিন্দুমাধব দর্শন করিলেন। তপন মিশ্র মহাপ্রভুকে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন ও তাঁহার চরণোদক সবংশে পান করিলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে সম্মান করিয়া পূজা করিলেন। প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে ভিক্ষা করাইলেন ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে দিয়া পাক করাইলেন, সংবাদ পাইয়া মিশ্রের সখা ও প্রভুর পূর্বদাস শ্রীচন্দ্রশেখর সেখানে আসিলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য, লিখনবৃত্তিধারী ও বারাণসীবাসী। চন্দ্রশেখর প্রভু সমীপে স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন, এই বারাণসী হরিভজন-কথা-বিহীন ও শুষ্ক-মায়াবাদীর আবাস, শুধু তপন মিশ্র কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করান। ভক্তবশ ভগবান্ দুই ভৃত্যের বশ হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও দশ দিন অবস্থান করিলেন ও তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মায়াবাদী অবৈষ্ণব বিপ্রের নিমন্ত্রণ 'আজি মোর হইয়াছে নিমন্ত্রণে' বলিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিতেন। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসিপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাহা বলিলে তিনি প্রভুর অনেক নিন্দা করিলেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া প্রভুকে সেই কথা বলিলে এবং প্রকাশানন্দাদির মুখে 'কৃষ্ণনাম' না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রভু তদুত্তরে মায়াবাদকে অপরাধ বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং মায়াবাদীর সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু কাশী হইতে প্রয়াগপথে মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে, তাঁহাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা স্বীকার করিলেন এবং ভিক্ষার জন্য বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে রন্ধন করাইলেন।

মহাপ্রভু যমুনার ২৪ ঘাটে স্নান করিলেন। সেই বিপ্র সঙ্গে দ্বাদশ বন দর্শন করিলেন ও শুক-শারীর বার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

আরিট্ গ্রামে আসিয়া মহাপ্রভু রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করিলেন। গোবর্দ্ধনে তিনি 'হরিদেব' দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল দর্শন করিবেন না। এই জন্য অন্নকূট গ্রাম হইতে ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' করিয়া গোপাল গাঠোলী গ্রামে আসিলেন। তথায় মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। এক রাজপুত কৃষ্ণদাস প্রভুর দর্শনে আসিলেন ও বৈষ্ণবকিঙ্কর হইবার বাসনা নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভুর সহিত কৃষ্ণদাস অক্রূর তীর্থে আসিলেন।

বৃন্দাবনে কালিয়দহে কৃষ্ণ পুনরায় প্রকট হইয়াছেন বলিয়া গুজব রটিয়া গেল। এই ভ্রান্ত বাক্যে সরলমতি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও মতিভ্রম হইল। ভট্টাচার্য্য সন্ধ্যাকালে কালিয়দহে কৃষ্ণদর্শনে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে শাসন করিয়া বলিলেন, 'তুমিও কি মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইয়া গেলে? তুমি পণ্ডিত হইয়াও একটু বিবেচনা করিতে পারিলে না?' পরদিন প্রাতঃকালে প্রকৃত ঘটনা জানা গেল যে, কৈবর্ত্ত্যগণ নৌকা লইয়া দেউটি জ্বালিয়া দহের জলে মাছ ধরিতেছে। দূর হইতে লোকের ভ্রম হয় নৌকা কালিয়নাগ, জেলেটি কৃষ্ণ ও দীপটি মণি বলিয়া মনে করে। এইবার বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ভ্রম দূর হইল, তিনি প্রভুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহাপ্রভু পুনরায় একদিন অক্রূর ঘাটে আসিয়া স্নান করিলেন। গোপ-গোপীগণের এখানে ব্রহ্মলোক দর্শন হইয়াছিল। মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য দিবারাত্র অত্যধিক ভিড় হইতে থাকায় সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুত্র ঠিক করিলেন মহাপ্রভুকে অন্যত্র লইয়া যাইবেন। তাঁহারা প্রয়াগ অভিমুখে যাইবার জন্য ও তথায় মাঘস্নান করিবার প্রস্তাব দিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও ভক্তগণের ইচ্ছায় বৃন্দাবন ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার কালে মহাপ্রভু এক বৃক্ষতলে বসিলেন। সেখানে রাখাল বালকগণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার কৃষ্ণস্মৃতি হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ও মুখে ফেনোদ্গম হইতে থাকে। সেই সময় সেই পথ দিয়া দশজন পাঠান সৈন্য যাইতেছিল, প্রভুর মূর্চ্ছাদশা দেখিয়া চারিজনকে বন্দী করিল। ভট্টাচার্য্য ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটি ভীত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল কিন্তু সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুত সেই দেশেরই অধিবাসী তাঁহারা ভয় পাইল না। কৃষ্ণদাস রাজপুত বলিলেন—আমি যদি এখান হইতে চিৎকার করি, তাহা হইলে দুইশত তুর্কী এখনই আসিয়া পড়িবে ও তোমাদিগকে মারিয়া ঘোড়া ও তৎপৃষ্ঠস্থিত আসনাদি সব লুটিয়া লইবে। তাহা শুনিয়া পাঠানগণ মনে ভয় পাইল। এমন সময় মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন ও 'হরি' 'হরি' বলিতে লাগিলেন ও প্রেমাবেশে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই ম্লেচ্ছগণ প্রভুকে কহিল এই ঠক্ চারিজন আপনাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া আপনার ধন লুণ্ঠন করিয়াছে। মহাপ্রভু জানাইলেন উহারা ঠক্ নহেন, আমার সঙ্গী আর আমি ভিক্ষুক; কোন ধনাদি নাই। মৃগী ব্যাধিতে আমি মাঝে মাঝে অচেতন হইয়া পড়ি, এই চারিজন

আমাকে পালন করেন। দলের একজন ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর অনেক কথোপকথন ও শাস্ত্র-বিচার হইলে প্রভু 'কোরাণ'-শাস্ত্র হইতেই কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন। পাঠান দলপতি বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। সেইস্থানে এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম' বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এইভাবে মহাপ্রভু পশ্চিমে অসিয়া যবনাদিকে ধন্য করিলেন। মহাপ্রভু সোরোক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন ও গঙ্গাতীর পথে প্রয়াগে গমন করিলেন।

সানোড়িয়া বিপ্র ও রাজপুত কৃষ্ণদাসকে মহাপ্রভু বিদায় দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা জোড়হস্তে বলিলেন প্রয়াগ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে গমন করিব, আপনার চরণদর্শন আর পাইব কোথায়? এইটি ম্লেচ্ছদেশ, পাছে কেহ উৎপাত করে আর ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত মানুষ, সেই পরিস্থিতিতে কথা বলিতে জানেন না। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলেন, সেই দুইজন সঙ্গে চলিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 'পশ্চিমদেশ'কেও প্রেমে ভাসাইলেন। এইভাবে প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীতে দশদিন মকর স্নান করিলেন। ত্রিবেণীতে অবস্থানকালে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপ ও বল্লভ—এই দুই ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদপাত্রকে পাওয়াইয়াছিলেন। কাশীতে ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর সঙ্গীরূপে বরাবর ছিলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে যাত্রাকালে সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টায় পূর্ব্ববৎ ঝাড়িখণ্ডের পথে গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে কলিকালে সদুরাচার অন্ত্যজাদির উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করায় নানাবিধ উপায় বর্ণনা প্রসঙ্গে উচ্চ সঙ্কীর্তনের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তিনি বলভদ্রের মুখে শুনিয়াছেন যে, ঝাড়িখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাইবার কালে উচ্চ সঙ্কীর্তন শ্রবণের ফলে স্থাবর-জঙ্গম, পশু-পক্ষী কি ভাবে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল।

শ্রীসনাতন গোস্বামী একাকী ঝাড়িখণ্ডের বনপথে পুরীতে আসিয়াছিলেন। সেই বৎসর সনাতনকে ক্ষেত্রে রাখিয়া পর বৎসর দোলযাত্রা শেষে বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলে সেই আজ্ঞা অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। যাইবার পূর্বে মহাপ্রভু যে পথে গিয়াছিলেন, সেই সব বিবরণ শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছিলেন।

শিখি মাহিতি

'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'র ১৮৯ শ্লোকে "রাগলেখা ও কলাকেলী নাম্নী যে দুইজন পূর্বে শ্রীরাধার দাসী ছিলেন, সেই দুইজন যথাক্রমে শিখি মাহিতি ও তাঁহার ভগিনী মাধবী বলিয়া জানিবে।"

'রাগলেখা কলাকেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরাস্থিতে।
তে জ্ঞেয় শিখি মাহাতী তৎস্বসা মাধবীক্রমাৎ।।'

"মাধবী দেবী-শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩৭

এই শ্লোকের অনুভাষ্যে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"শিখি মাহিতি ও ইঁহার ভগিনী মাধবী দেবী উভয়েই মহাপ্রভুর উৎকলবাসী অন্তরঙ্গ অধিকারী ভক্ত; যথা চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে ১৩ সর্গ ৮৯-১০৯ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শিখি মাহিতি (মহান্তি) নামক এক বিমলকান্তি, করুণহৃদয় মহাত্মা বাস করেন। তিনি নীলাচল তিলক শ্রীজগন্নাথের দাস স্বরূপ (শ্রীজগন্নাথের সেবক এবং মন্দিরের লিখনাধিকারী অর্থাৎ দেউলকরণ) ছিলেন 'মুরারি মাহিতি' নামক ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শুদ্ধবুদ্ধিমতী মাধবী দেবী। প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী—উভয়েই গৌরসুন্দরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সহজাত নিশ্চলা শুদ্ধবুদ্ধি কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের বিস্মৃতি পোষণ করেন নাই। সম্প্রতি বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ গৌরচন্দ্ররূপে এই ধরণীতলে উদিত হইয়া এই ভ্রাতা ভগিনীর শুভ গৌরস্নেহরাশি নিয়ত বিধান করিতেছেন। নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের প্রেমভৃত্য নিজ অগ্রজ শিখি মাহিতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করাইবার জন্য ইঁহাদের নিরতিশয় যত্ন দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শিখি মাহিতি কিছুতেই গৌরভজনে রত হইলেন না।

অপর এক দিবস অনুজগণের উপদেশক্রমে ও নিয়ত বহু আলোচনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে, তিনি রজনীশেষে চকিত হইয়া 'গৌরপাদপদ্ম-দর্শনকারী অনুজগণ তাঁহাকে জাগরিত করিতেছে' এইরূপ একটি স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এহ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনে পুলক প্রযুক্ত ও হর্ষহেতু দ্বিগুণ চকিত হইয়া ক্রমশঃ অশ্রুপূর্ণ

নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্বক অনুজদ্বয়কে দেখিলেন জাগ্রত হইয়াই সমীপাগত ঐ মহৎ অনুজদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। শিখি মাহিতি তাঁহাদিগকে কহিলেন, —'ভাই, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উহা অতি বিচিত্র। শ্রীশচীসুতের মহিমা যে অপ্রমেয়, অদ্যই কেবল আমার তাহাতে প্রত্যয় হইল। দেখিলাম, গৌরসুন্দর নীলাচলচন্দ্রকে দর্শনপূর্বক তাঁহাতে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ ও পুনঃ পুনঃ বহির্গত হইয়া আবার তাঁহাকে দেখিতেছেন,—এইরূপ লীলা বিস্তার করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এখনও পরমেশ্বর গৌরসুন্দরকে তদবস্থই দেখিতেছি, আমার লোচন কি ভ্রান্ত হইতেছে? হায়, সেই অসীম কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর আমাকে জগন্নাথদেবের সমীপগত দেখিয়া আমার নামগ্রহণপূর্বক দীর্ঘ উন্নতি ললিত বাহু দ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে উৎপুলকিতাঙ্গ হইয়া শিখি অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রেম গদ্‌গদ বাক্যে ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রভুর দর্শন নিমিত্ত জগন্নাথ দর্শনে যাইতে কহিলেন। তখন তিনজনেই সম্মত হইয়া নীলাচল-পতির দর্শন জন্য গমন করিলেন। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ শিখি মাহিতি প্রভুকে স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলেন, চতুর্দিকে গৌর-সুন্দরকে ঠিক তদ্রূপ ভাব বিশিষ্ট দর্শন করায় তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইল। মহাবদান্য মহাপ্রভুও তাঁহাকে 'তুমি মুরারির অগ্রজ' এই বলিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, শিখি মাহিতিও গৌরসেবাময়-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। তদবধি শিখি মাহিতি গৌরপাদপদ্মগন্ধে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অভীষ্টদেব শ্রীগৌরের সেবা করিতে লাগিলেন।

শিখি মাহিতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সাড়ে তিনজন ভক্তের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

"প্রভু লেখা করে, যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিনজন।
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায়-রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজনে।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৫-১০৬

মাধবী দেবী

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা অনুসারে পূর্বে মাধবী দেবী শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'কলাকেলী' নাম্নী শ্রীরাধার কিঙ্করী ছিলেন।

উৎকলবাসী দেউলকরণ শ্রীশিখি মাহিতির কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।

মাধবী দেবী—শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩৭

আলালনাথের নিকট বেন্টপুর গ্রামে শ্রীভবানন্দ রায়ের গৃহের নিকট শ্রীমাধবী দেবী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট করেন। তথায় অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি সেবিত হইতেছেন। শ্রীভবানন্দ রায়ের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীশিখি মাহিতি যাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমাধবী দেবী। মহাভাগবত মাধবী দেবী ছিলেন বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে কেবল সাড়ে তিনজন শ্রীমতীর গণ—

প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিনজন।।
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৫-১০৬

শ্রীভগবান্ আচার্য্য মাঝে মাঝে গৃহে রন্ধন করিয়া একাকী মহাপ্রভুকে ভোজন করাইতেন। এক আচার্য্য মহাপ্রভুর ভোজনের জন্য ছোট হরিদাসকে মাধবী দেবীর নিকট হইতে—

"মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনীস্থানে গিয়া।
শুক্ল চাউল এক মান আনহ মাগিয়া।।
মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী।।"

এরূপ শুনা যায়, শ্রীমাধবী দেবী 'শ্রীপুরুষোত্তমদেব' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন—শ্রীমাধবী দেবী মহারাজ প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পাঞ্জিয়া অর্থাৎ মাদলা পাঞ্জীর লেখিকা নিযুক্তা হইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের জন্ম হয় উৎকলদেশে বিপ্রকুলে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান অনুসারে ইনি প্রথমে শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, পরে উড়িষ্যাবাসী হইলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য শাখায় গণিত। তাঁহার আদর্শ গৃহস্থোচিত পুণ্যময় জীবন ও আভিজাত্যাদি পূর্ণ সামাজিক উচ্চতম মর্য্যাদা হরির ও হরিজনের সেবায় নিয়োগ করিয়া সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য মহাপ্রভু নীলাচলে ইঁহাকে অশৌক্র বিপ্রকুলে অবতীর্ণ কৃষ্ণ ভক্তিরস-শিক্ষক চূড়ামণি মহাভাগবতবর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রায় রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং ইনিও শিষ্যরূপে বৈষ্ণবাচার্য্যের সমীপে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করেন। 'প্রদ্যুম্ন মিশ্রে গৌরহরির আবেশ' বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় "আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্ন সঙ্গকে।।" (৭৪)। শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত ৫ম অধ্যায় উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের সাগর।
আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।।"

অন্ত্য ৯ম অধ্যায়ে—"শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেম ভক্তির প্রধান।" আবার শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১০।৪৩—

"প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইহ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথের 'মহাসোয়ার' ইঁহ দাস 'নাম।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পুরীবাসী ভক্তগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার কালে প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে উপরোক্ত বৈষ্ণব প্রধানরূপে কীর্ত্তন করেন। (মহাসেবায়ার—প্রধান পাককর্ত্তা, মহানসাধিকারী)।

একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র অতি দৈন্য সহকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করায় মহাপ্রভু বলেন—কৃষ্ণকথা আমি ভাল জানি না, তুমি রায় রামানন্দের নিকট যাইয়া শ্রবণ কর, তিনি ভাল জানেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায়ের গৃহে গমন করিলে সেবক তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলেন, যেহেতু রায় রামানন্দ বর্ত্তমানে ব্যস্ত আছেন। রায় রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ' নামে এক নাটক রচনা

করেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করিবার জন্য দুই দেব কন্যা অর্থাৎ নবীনা দেব দাসীকে (যাহাদিগকে এখন 'মাহারী' বলে, তাহা দিগকে) আনাইয়া সেই নাটকের অভিনয় যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই দুই কন্যা প্রধানা-গোপীদিগের লীলা অভিনয় করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রধানা-গোপীরূপে সেব্য-বুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীর ভাব গ্রহণ করিয়া ভাবী অভিনয়ের গীত সেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রীরামানন্দ আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া তাঁহাদের দেহ সংস্কার ও মণ্ডনাদি অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিতেছিলেন, সেবক মিশ্রের আগমন বার্ত্তা জানাইতেই রামানন্দ শীঘ্র আসিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য মিশ্রের চরণে যে অপরাধ হইল বলিয়া তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে আপনার আগমনে আমার ঘর পবিত্র হইল; আপনি আজ্ঞা করুন আপনার এই কিঙ্কর কি করিতে পারে। অসময় দেখিয়া মিশ্র সেইদিন কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু জানিতে চাহিলেন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে কি না। মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত সমূহ মহাপ্রভুকে বলিলেন। অমানি ধর্ম্মের আদর্শ শিক্ষক ভগবান্ দৈন্যসহ আপনা অপেক্ষা স্ব ভক্তের অধিকতর কৃষ্ণানুরাগ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিলেন,—

আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি।।
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৩৫-৩৬)

"রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন।।
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি।।
স্নানাদি করায়, পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গযত, তার দর্শন স্পর্শন।।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ।।

নির্ব্বিকার দেহ-মন-কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকারম।।
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার।।”

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৩৭-৪২)

অতএব ফলের দ্বারা কারণানুমান হয়। গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তুর প্রাকৃত গুণস্পর্শ রাহিত্য-হেতু রামানন্দ অপ্রাকৃত চিদানন্দতনু। সুতরাং মহাভাগবত শ্রীরামানন্দ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনে অধিকারী—ইহা বলিয়া মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দের নিকট হইতে কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র তথায় গমন করিলে রায় জিজ্ঞাসা করিলেন কি জন্য আসা হইয়াছে তাহা আজ্ঞা করুন। মিশ্র বলেন মহাপ্রভু আপনার মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি যে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাত্মক কথা দক্ষিণভারতে বিদ্যানগরে হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিতে চাহিলে তাহা শ্রীরায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃতকৃতার্থ হইয়া অপূর্ব্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বিষয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন।

“শ্রীরামানন্দপ্রভু—প্রাকৃত লোকচক্ষে প্রবৃত্তি মার্গীয় গৃহস্থ; গৃহস্থাশ্রমী-লীলায় শ্রীরামানন্দ প্রাকৃত লোকের ভোগময়ী দৃষ্টিতে ‘বিষয়ী’ হইলেও অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাই তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত মনের সর্ব্বক্ষণ উপাস্য বিষয় হওয়ায় তিনি—কৃষ্ণবিষয়ী। তিনি ত্যক্ত বিষয় নির্গুণ সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণ প্রতীতি হীন জড়বিষয় ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণ বিষয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ। ব্রাহ্মণ—ত্রিবর্ণের গুরু ও সন্ন্যাসী—আশ্রমত্রয়াবস্থিত ব্রাহ্মণের গুরু। তাঁহাদের পদ-মদোত্থ প্রাকৃত গর্ব খর্ব করিবার জন্য প্রাকৃত লৌকিকী-দৃষ্টিতে সর্ব-নিম্নবর্ণ ‘শূদ্র’ বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব নিম্নাশ্রমী ‘গৃহস্থ’ বলিয়া পরিচিত শ্রীরামানন্দ-রায় প্রভু দ্বারা প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক শৌক্র ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করাইলেন এবং গৃহীত সন্ন্যাস স্বয়ং মহাপ্রভুও শ্রীরামানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন।”—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী তাঁহার অনুভাষ্যে।

শ্রীজয়দেব

শ্রীজয়দেব বিরচিত গীত-গোবিন্দ (১।২) বলেন—"জয়ং সর্ব্বোত্তকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণং দেবঠতি জ্যোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকাশয়তীতি"—যিনি স্বভক্তিবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেও প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোথাও বলা হয় একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে আবার কোথাও উল্লেখিত যে, তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকট ছিলেন। আবির্ভাবস্থান সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়; অধিকাংশগণের মতে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়; অপর কেহ বলেন উৎকলদেশে, অপর কাহারও মতে দাক্ষিণাত্যে। বীরভূম জেলার সিউড়ি হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রাম। উল্লেখিত হয় যে, এই অজয় নদ হইতে শ্রীজয়দেব শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাও বলা হয়, এই অজয় নদের তীরে কুলেশ্বর শিবের স্থানে বসিয়া তাঁহার বিশ্রাম ও সাধন ভজন হইত।

শ্রীজয়দেবের পিতার নাম শ্রীভোজদেব ও মাতা বামাদেবী, যখন শ্রীজয়দেব বঙ্গদেশের রাজা শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন, তখন তিনি নবদ্বীপে গঙ্গাতটে রাজার রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার গীতগোবিন্দে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ছাড়াও শ্রীলক্ষ্মণসেনের আরও তিনজন সভাপণ্ডিত যথা, শ্রীউমাপতিধর, আচার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন ও কবি-ক্ষ্মাপতি, যাঁহারা সকলেই মহাকবি ও শ্রীজয়দেবের মিত্র। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—শ্রীজয়দেব শ্রীলক্ষ্মণ সেনের রাজপ্রাসাদের নিকট অবস্থানকালে শ্রীজয়দেব রচিত 'দশাবতার-স্তোত্র' রাজা শ্রীলক্ষ্মণ সেন শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার অপর সভাপণ্ডিত গোবর্দ্ধন আচার্য্যের নিকট হইতে যখন শ্রীজয়দেবের সেই রচনার কথা জানিতে পারেন তখন রাজা রাজবেশ ত্যাগ করিয়া শ্রীজয়দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীজয়দেবের মধ্যে মহাপুরুষসুলভ অলৌকিকত্ব দর্শনে রাজা আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন। রাজা নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলে অতীব বিষয়বিরক্ত শ্রীজয়দেব তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি পুরুষোত্তম ধামে চলিয়া যাইবেন বলিয়া রাজাকে জানান। নবদ্বীপ না ছাড়িয়া যাইতে রাজা প্রার্থনা করিলেন এবং নবদ্বীপ

মণ্ডলের অন্তর্গত চাঁপাহাটী গ্রাম তাঁহার উপযুক্ত স্থান বলিয়া সেখানে একটি কুটীর নির্মাণ করাইয়া দেন ও দৈন্য সহকারে জানাইয়া দেন যে, তাঁহার (জয়দেবের) অনুমতি ব্যতীত তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন না। মহাপ্রভুর পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথ মহাপ্রভুকে যে রূপে সত্যযুগে চম্পকবর্ণে দর্শন করিয়াছিলেন, ভক্ত শ্রীজয়দেবও অনুরূপ প্রথমে শ্রীরাধাগোবিন্দ, পরে শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু চম্পক বর্ণস্বরূপ (সুবর্ণকান্তি স্বরূপ) শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য-প্রকাশ তখনও হয় নাই, তথাপি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতি প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাব উদিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীজয়দেবকে দর্শন দান করিয়া পুরুষোত্তমে যাইতে আদেশ দেন। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ পালনের জন্য, শ্রীনবদ্বীপধাম ত্যাগ করিয়া যাইতে মানসিক বিরহ ভোগ করিলেও পুরুষোত্তম ধামে গমন করেন। তথায় তিনি শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রেই অতিবাহিত করিবার কালে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসপূর্ণ কাব্য গ্রন্থ ‘‘শ্রীগীতগোবিন্দ’’ বা ‘অষ্টপদী’ রচিত হয়। শ্রীমহাপ্রভু জয়দেবকে নিজরূপ চম্পকবর্ণে দর্শন দানকালে জানাইয়াছিলেন যে তিনি নবদ্বীপধামে যখন প্রকটিত হইবেন, তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীতে যাইয়া তাঁহার রচিত ‘গীতগোবিন্দ’ আস্বাদন করিবেন।

শ্রীজয়দেব অল্প বয়স হইতেই উদাসীন ছিলেন; পরে অবশ্য পদ্মাবতী নাম্নী এক গুণবতী রমণীর পাণি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বিবাহ বিষয়ে এক কিংবদন্তী শুনা যায় জগন্নাথ দেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা স্বীয় তনয়াকে লইয়া উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জয়দেব তাহা অস্বীকার করেন। অনন্যোপায় হইয়া পদ্মাবতীর পিতা কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া চলিয়া যান। তথাপি জয়দেব পদ্মাবতীকে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে বলেন। তখন পদ্মাবতী অতীব বিনীতভাবে বলিলেন, ‘‘জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট সমর্পণ করিয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব, সুতরাং অন্য কাহাকেও স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না; এক্ষণে আপনি আমাকে ছাড়িলেও, আমি আপনাকে ছাড়িব না। সর্বদা নিকটে থাকিয়া আপনার চরণ সেবা করিব।’’ উপায়ান্তর না হইয়া শ্রীজয়দেব

তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি এক নারায়ণ বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করিলেন, এইবার তাঁহার (শ্রীজয়দেবের) হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেম-বন্যা বহিতে লাগিল। কথিত হয় যে—"বদসি যদি কিঞ্চিদপি "ইত্যাদি পর্য্যন্ত লিখিয়া " দেহি পদপল্লবমুদারং" এই কথাগুলি লিখিতে যাইয়া জয়দেব ভাবিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মাথায় রাধা পা রাখিবেন; এই ভাবটি সংগত নয়। এই চিন্তা করিয়া লেখা অসম্পূর্ণ রাখিয়া স্নান করিতে বাহিরে গমন করিলেন। পদ্মাবদী দেখিলেন কিয়ৎক্ষণ পরেই জয়দেব স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রচিত গ্রন্থে কি যেন লিখিলেন এবং তাহার পর অন্নাহার করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিতেছেন, এমন সময়ে জয়দেব ফিরিয়া আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার আহারের পূর্বে আজ আহার করিতেছ কেন?' পদ্মাবতী উত্তর দিলেন, "সে কি? তুমি স্নানান্তে আহার করিয়া বাহিরে যাইলে পর আমি তো প্রসাদ পাইতেছি, আহার করিবার আগে তুমি পুঁথিতে কি যেন লিখিলে?" জয়দেব অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিলেন ও দেখিলেন যে—"দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই কথাগুলি নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই কথাগুলি লিখিয়া গীতাংশ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অনন্তর ভক্তি গদগদ্ স্বরে পদ্মাবতীকে বলিলেন, "তুমি অতি ভাগ্যবতী, তাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছ ও তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছ। আমিও তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া তিনি পদ্মাবতীর ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ করিলেন।

শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে প্রবাদ আছে—এক মালিনী পুরুষোত্তম ধামে বসিয়া শ্রীজয়দেব রচিত "শ্রীগীতগোবিন্দ" ভাবে বিভোর হইয়া গান করিতেছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব সেই গীতে আকৃষ্ট হইয়া তথায় গমন করিয়া যতক্ষণ গীতগোবিন্দ গান হইল, ততক্ষণ শ্রবণ করিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তদানীন্তন উৎকলরাজ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার অঙ্গে ধুলা ও উত্তরীয় কাঁটা ভর্ত্তি দেখিলেন। তাহা দেখিয়া পূজারী পাণ্ডাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। সেবকগণ ইহাতে ভীত হইলেন। জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে জানাইলেন, তাঁহার অঙ্গে ধূলা-কাঁটার জন্য কেহই দায়ী নহেন, তিনি নিজেই মালিনীর নিকট গীতগোবিন্দ শুনিতে গিয়াছিলেন,

তাহাতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ধূলা-কাঁটা লাগিয়াছে। উৎকলরাজ তাহা জানিতে পারিয়া মালিনীকে আনাইবার জন্য শিবিকা পাঠাইয়া দিলেন। মালিনীকে জগন্নাথের সম্মুখে গীতগোবিন্দ গান করিবার জন্য আদেশ করিলেন। অদ্যপিও মালিনী বংশীয় রমণীগণ জগন্নাথ মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথদেবের সম্মুখে প্রত্যহ গীতগোবিন্দ গান করিয়া শুনাইয়া থাকেন। পুরুষোত্তম ধামবাসী ভক্তগণ মালিনী স্থলে 'দেবদাসী' বলিয়া থাকেন।

অনেক অলৌকিক ঘটনা শ্রীজয়দেব সম্বন্ধে শোনা যায়। জয়দেব অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সেবা করিতেন। তিনি একদিন নিজ কুটীরের খড়ের চাল ছাইতে ছিলেন, সে সময় ভয়ানক রৌদ্র। ভক্ত যেমন ভগবানে ভক্তিমান্, ভগবানও তদ্রূপ ভক্তেতে ভক্তিমান। ভক্তের কষ্ট দেখিয়া চাল ছাওয়ার কাজ যাহাতে শীঘ্র শেষ হয় তজ্জন্য ভগবান্ নিজেই যাইয়া চালের বাঁধন ফিরাইয়া দড়ি যোগাইয়া দিতে লাগিলেন। জয়দেব ভাবিলেন, বোধ হয় পদ্মাবতীই এইরূপে সাহায্য করিতেছেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে নীচে নামিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে তিনি অন্য কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, চাল ছাইতে সাহায্য করেন নাই। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ঠাকুর ঘরে যাইয়া দেখিলেন রাধামাধবের হাতে ঝুল-ময়লা, বুঝিলেন ইহা রাধা-মাধবেরই কার্য্য। তখন তিনি রাধা-মাধবের চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অপর এক ঘটনা, এই জয়দেবের প্রাণধন শ্রীরাধা-মাধবের সেবা ও উৎসবের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশান্তর যাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে কতিপয় দস্যু তাঁহার অর্থাদি অপহরণ করিয়া হস্তপদ কাটিয়া তাঁহাকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে; দারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে থাকেন; তৃতীয় দিবসে দৈবক্রমে এক রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া সেই কূপমধ্যে হইতে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া কূপমধ্য হইতে ক্ষত বিক্ষত জয়দেবকে উদ্ধার করিয়া স্বীয় প্রাসাদে আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাজারাণীর যত্নে জয়দেব ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পরম ভক্ত জানিয়া এবং সুকণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর গীতগোবিন্দ শুনিয়া পত্নী পদ্মাবতীকে রাজা প্রাসাদে আনানো হইল। রাজারাণী উভয়েই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীজয়দেবমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণে ও বৈষ্ণবসেবায় জীবন ধন্য করিতে

লাগিলেন। একদিবস জয়দেবের নির্য্যাতনকারী সেই দস্যুগণ বৈষ্ণববেশে রাজভবনে অতিথি হইল। জয়দেব উহাদিগকে চিনিতে পারিয়াও যথাযোগ্য সম্মানের সহিত অতিথিসেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দস্যুগণ জয়দেবের মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ধরা পড়িবার ও দণ্ডিত হইবার ভয়ে আতিথ্য স্বীকার না করিয়াই চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে জয়দেব তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া রাজাকে বলিয়া তাহাদিগকে বহু অর্থাদি প্রদান করাইলেন এবং সঙ্গে লোকজন দিয়া বিদায় দিলেন। দস্যুগণ কিছুদূর গিয়া রাজ-অনুচরগণকে বলিল—'আপনাদিগের আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। তবে আপনাদিগকে একটি গুপ্ত রহস্য জানাইতেছি, আপনারা গোপনে ইহা রাজাকে জানাইবেন। রহস্যটি এই—বৈষ্ণব হইবার পূর্বে আমরা এক রাজার অনুচর ছিলাম, রাজা কোন এক বিশেষ কারণে আপনাদের ওই মোহান্ত বাবাজীকে (অর্থাৎ জয়দেবকে) হত্যা করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ দেন আমরা তাঁহার হস্তপদ কাটিয়া দেই, এই গুপ্তরহস্য প্রকাশিত হইবার আকাঙ্খায় আপনাদের ঐ মোহান্ত রাজাকে অনুরোধ করিয়া আমাদিকে বহু অর্থ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিলেন।' এইরূপ সম্পূর্ণ সাজানো মিথ্যাকথা বলিতে বলিতে ধরিত্রীদেবী এই মহাপাপিষ্ঠদিগের ভার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহারা অতি অদ্ভূতভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। ভাঃ ৮।২০।৪ এ পৃথিবীদেবী বলিয়াছিলেন যে, "অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম আর নাই। আমি অসত্যবাদী নর ব্যতীত (মেরুমন্দরাদি) যাবতীয় (গুরু) ভার বহন করিতে নিজেকে সমর্থা বলিয়া মনে করি।" সেইজন্য ধরিত্রীদেবী এই মহাপাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী দস্যুগণের ভার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। উহারা মহাপুরুষের সম্বন্ধে মিছাকথা বলিতেই ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। রাজভৃত্যগণ জয়দেবের ন্যায় মহাভাগবতচরণে অপরাধিগণের অদ্ভুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা নিবেদন করিল। তখন রাজার প্রশ্নে জয়দেব সেই দস্যুগণের নির্য্যাতন কাহিনী সমস্তই বর্ণনা করিয়া কহিলেন— "রাজন্! সাধুগণ দোষিগণের দোষের প্রতিশোধ লইবার জন্য পরহিংসার প্রবৃত্ত হন না, শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীভগবানের অমোঘ বিধানে তাহাদিগকে কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইল।

শ্রীজয়দেব পত্নী ও রাজমহিষীর সম্পর্ক ছিল অতি সৌহার্দ্যপূর্ণ। সে সময় সহমরণ প্রথা ছিল। মহিষী নিজ ভ্রাতার মৃত্যুতে ভ্রাতৃবধূর সহমরণ জন্য বিলাপ করিতে থাকায় পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন—'স্বামীর মৃত্যুতে পতিব্রতা পত্নীর প্রাণ শরীরে থাকে না।' পদ্মাবতীর এই কথাটি শ্রবণ করিয়া সেই বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার জন্য একদিন তাঁহাকে তাঁহার স্বামী জয়দেবের মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন। সেই দারুণ সংবাদ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পতিব্রতা সতী পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করিলেন। মহিষী নিজেই ইহার কারণ মনে করিয়া অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীজয়দেবকে তাঁহার পত্নীর প্রাণদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভক্ত শ্রীজয়দেব পদ্মাবতীর কর্ণে কৃষ্ণনামামৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। উভয়েরই অত্যদ্ভুত মহত্ত্ব দর্শন করিয়া রাজা-রাণীর সহিত সমগ্র রাজপরিবার শ্রীজয়দেব-পদ্মাবতী-চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাইতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীজয়দেব বৃন্দাবন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া রাজা-রাণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরাধামাধব জীউকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কেশীতীর্থের উপকণ্ঠে শ্রীরাধামাধব জীউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত গীতগোবিন্দ গান শ্রবণে ধামবাসী ভক্তবৃন্দ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। এক মহাজন কেশীঘাটের উপর তাঁহার শ্রীরাধামাধবের জন্য একটি মন্দির করিয়া দেন।

কাহারও মতে, শ্রীজয়দেব জগন্নাথক্ষেত্রে, কাহারও মতে বৃন্দাবনে শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন জয়দেব শেষজীবন জগন্নাথ ক্ষেত্রে অতিবাহিত হইয়াছিল। আবার ইহাও শুনা যায়, শ্রীজয়দেব দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া স্বীয় জন্মভূমি কেন্দুবিল্বগ্রামে আসিয়া সাধনভজন করেন। গঙ্গাস্নান করিতে তাঁহাকে বহুদূর যাইতে হইত; দৈবক্রমে একদিন গঙ্গাস্নানে যাইতে না পারিয়া অত্যন্ত কাতর হইলে গঙ্গাদেবী কেন্দুবিল্বগ্রামে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করেন। কথিত হয় যে স্বীয় জন্মভূমিতেই তাঁহার সাধনলীলার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁহার স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য অদ্যপি প্রতিবর্ষে ঐ কেন্দুবিল্ব গ্রামে মাঘ-সংক্রান্তির দিন মেলা বসে।

জয়দেবের কেন্দুবিল্ব গ্রামে আসিয়া শেষজীবন অতিবাহিত করার কথা জানা গেলেও তাঁহার প্রাণধন শ্রীরাধামাধবের সেবা, তাঁহার তিরোধানের পর জয়পুররাজ শ্রীরাধামাধব বিগ্রহকে লইয়া জয়পুরের ঘাটি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যপি শ্রীরাধামাধব জয়পুররাজ্যে সেবিত হইতেছেন। শ্রীজয়দেব পৌষী কৃষ্ণ-ষষ্ঠী তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শেষলীলায় শেষ দ্বাদশ বৎসর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া গূঢ় প্রেমরস আস্বাদন কালে শ্রীজয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিতেন।

"শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রিদিনে।।
বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।৪১-৪২)

"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১১৫)

"যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয়।।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায় রামানন্দ।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৫-৬)

"ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হইল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
'স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।'
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ গীতি,
শুনি' প্রভু জুড়াইল কান।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৬২)

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক, গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ।
"শ্রীজয়দেবেকৃতহরিসেবে ভণতি পরম রমণীয়ম্।
প্রমুদিত হৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃত কমনীয়ম্।।"

—এই গীত গোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীরাধা গোবিন্দের শৃঙ্গার-রসময়ী গ্রন্থ ইহা একমাত্র সুকৃতিশালী জনের সেব্য।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসুকুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদবলীং শৃণু সদা জয়দেব সরস্বতীম্।।"

—যাদের মন শ্রীহরির লীলা-স্মরণে সরস, শ্রীহরির দিব্যলীলাবলী শ্রবণের জন্য ব্যাকুল, তাঁরা শ্রীজয়দেব সরস্বতী লিখিত এ মধুর পদাবলী শ্রবণ করুন।

শ্রীঈশান ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে আদি ১০।১১০ এ তাঁহাকে গণনা করা হইয়াছে, যথা—

"শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্।।"

ইহারই অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বলিয়াছেন—"সেবিলেন সর্ব্বকাল তাহারে ঈশান। চতুর্দ্দশলোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্।। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।৭৪)। পুনশ্চঃ বৈষ্ণব বন্দনায়—

"বন্দিব ঈশানদাস করজোড় করি'।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।।"

ভক্তিরত্নাকরে ১২ তরঙ্গে—

"নিমাই চাঁদের অতি প্রিয় সে ঈশান।"

ঈশান ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহভৃত্য। ভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তেরই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর এই সেবা প্রমাণ করে যে তিনি মহা-ভাগ্যবান্। তিনি মহাপ্রভুকে বাল্যকালে ক্রোড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও তাঁহার সকল প্রকার বালচাপল্য সহ্য করিতেন ও সকল প্রকার আব্দার পূর্ণ করিতেন। মহাপ্রভুও ঈশানকে ছাড়া একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। ভক্তিরত্নাকরে ১২।৯৫-৯৭-এ দেখা যায়—

"ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া গণ।
নিমাই চান্দের অতি প্রিয় যে ঈশান।।
ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কুণ ঠাঁই।।
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুঁটি করে তা ঈশান সমাধয়।।"

শ্রীবলদেবাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সেবার সুযোগও তিনি লাভ

করিয়াছিলেন। শচীগৃহে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভোজনে বসিবার পূর্বে ঈশান পাদধৌত করিবার জল দিতেন।

"ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন।।"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।৫৯

ঈশান ভগবানের পার্ষদ, সুতরাং তিনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ, এই তত্ত্ব জানিয়া তিনি অতীব প্রীতির সহিত মাতা যশোদার অভিন্ন স্বরূপ শচীমাতার গৃহের যাবতীয় সেবা করিতেন। শচীদেবীর স্নেহ লাভে তিনি ধন্য। শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায় ঈশান দাসের মহিমা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

"বন্দিব ঈশান দাস করজোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যারে স্নেহ কৈল বড়ি।।"

—১২।৯৪

"বিপ্র কহে এই দেখি' আইলু ঈশানে।
কি বলিব, কে বা না বুঝয়ে তাঁর গুণে।।
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা তেঁহো সর্বত্র বিদিত।
শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত।
সেবিলেন সর্বকালে আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান্।।
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নের কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল।।

—১২।৯০-৯৩

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর তাঁহার গৃহ, জননী শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দেখাশুনার ভার ঈশানের উপরই পড়িয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের ৭৩ পয়ারে—
"ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার। যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার।।"

ইহার গৌড়ীয় ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"প্রভুর গৃহভৃত্য ঈশান বিক্ষিপ্ত অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গৃহাদি নির্মুক্ত করিলেন। ঈশানের ভাগ্যের সীমা নাই। তিনি প্রভুর জননীর সেবাকার্য্যে চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরও ভৃত্য ঈশান তাঁহার প্রভু জননী ও প্রভু পত্নীর সেবা লাভ করিয়া জগতের ধন্য ভৃত্যগণের মধ্যে পরমধন্য বা ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন।"

ঈশান ঠাকুর দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সকল ভক্তগণ অন্তর্দ্ধান করার পর তিনি অপ্রকট হন। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী সমূহ দেখাইয়াছিলেন। ঈশান যখন সেই লীলাস্থল সমূহ দেখাইয়াছিলেন তখন সেগুলি একেবারেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, ইহাতেই অনুমান করা যায় তিনি কত দীর্ঘজীবি ছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে ১১।৭২১ বলেন—

"প্রায় নবদ্বীপে গুপ্ত হইল সকলে।
প্রভুর ঈশান মাত্র আছেন একলে।।"

শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নবদ্বীপ ধামে ঈশান ঠাকুরের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া যখন শ্রীখণ্ডে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত মিলিত হইতে আসিলেন, তখন সংবাদ পাইলেন ঈশান ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন—

"পথে আসি লোকমুখে করিনু শ্রবণ।
ঈশান ঠাকুর হইলা সঙ্গোপন।।"

ভক্তিরত্নাকর ১৩।২১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীশচীমাতার অন্তর্দ্ধান লীলার পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ও শ্রীঈশান ঠাকুরকে শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে পাঁচটি নামে পরিচিত, যথা— বংশীবদন, বংশীদাস, বংশী, বদন ও বদনানন্দ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। ১৪১৬ শকব্দায় (কাহারও মতে ১৪২৭ শকাব্দায়) মধু পূর্ণিমা (চৈত্র পূর্ণিমায় ইঁহার আবির্ভাব। ''বংশীশিক্ষা'' গ্রন্থে পাওয়া যায়—

''চৌদ্দ শত ষোল শকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্বলোকে গায়।।''

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৭৯ বলেন—'যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী ছিলেন, তিনি বংশীদাস ঠাকুর নামে আবির্ভূত'',—''বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাস ঠক্কুরঃ।।'' শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্পৃষ্ট যে বংশীর সৌভাগ্যের কথা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন সেই ব্রজের চিন্ময় বংশীর অবতার শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর ।কলিয়াতে ৪ টি পাড়া—তেঘরি, বেঁচি, যাড়া বেদড়াপাড়া ও চিনেডাঙ্গা। প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশ-পরম্পরায় শ্রীযুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়ের তিনপুত্র — (১) শ্রীমাধব দাস (ছ কড়ি) চট্টোপাধ্যায়, (২) শ্রীহরিদাস (তিনকড়ি) চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীকৃষ্ণ-সম্পত্তি (দু কড়ি) চট্টোপাধ্যায়। ''শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে'' (কবি কর্ণপুর লিখিত) উল্লেখ করা হইয়াছে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে সাত দিন অবস্থান করিয়া শ্রীনবদ্বীপবাসিগণকে কৃপা করিয়া ছিলেন ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। এই ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় শ্রীবংশী বদনানন্দ ঠাকুরের পিতা; মাতার নাম শ্রীচন্দ্রকলা দেবী। কথিত হয় যে, বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উপস্থিত ছিলেন। এই ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাপ্রভুর অতীব অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র বংশীকেও তিনি খুব স্নেহ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার পর শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষক-সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ৪।২০-২৪ এ উল্লেখিত আছে, শ্রীবংশীবদন প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীশচীমাতার নিকট গিয়াছিলেন—

"শ্রীবংশীবদন দেখি' বিনা পরিচয়।
মনে বিচারয় শ্রীনিবাস এ নিশ্চয়।।
নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল।
শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল।
শ্রীবংশীবদন ধরি' করিলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ নেত্র জলে।।
শ্রীনিবাস ভূমি পড়ি চাহে প্রণমিতে।
শ্রীঠাকুর বংশী না ছাড়য়ে কোল হইতে।।
শ্রীঈশ্বর বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ে জানাইতে।
চলিলেন শ্রীবংশীবদন সাবহিতে।।"

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর গৃহস্থ-লীলা করেন। তাঁহার দুইপুত্র শ্রীনিত্যানন্দ দাস ও শ্রীচৈতন্যদাস বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর একান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের খ্যাতি ছিল। শ্রীবংশীবদন সেবিত বিগ্রহ শ্রীপ্রাণবল্লভ। পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ইচ্ছায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ পূর্ব হইতেই বিরাজিত ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের পর শ্রীমূর্ত্তিসেবা ফুলিয়া পাহাড়পুরে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার বংশধরগণ যে সময় শ্রীজাহ্নবা মাতার কৃপাশ্রয়পূর্বক শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া আশ্রয় করেন, তখন মালহানবাসী সেবায়েতদিগের হাতে শ্রীমূর্ত্তিসেবা কুলিয়া গ্রামে ছিল। বংশীবদন ঠাকুর শেষ জীবনে বিল্বগ্রামে যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ ইঁহারই বংশধর বলিয়া কথিত হয়। বংশীবদনের পুত্র শ্রীচৈতন্য দাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশচীনন্দন। "শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা এই রামচন্দ্রকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন এবং দীক্ষাদান করে খড়দহ গ্রামে রেখে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।" (গৌড়ীয় ২২।৩০-৩৭) শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পৌত্র ও চৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ব্রজধামে প্রস্কন্দন তীর্থে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পাইয়াছিলেন। বাঘ্নাপাড়ায় (বর্দ্ধমান জেলা) ইনি উক্ত বিগ্রহদ্বয় স্থাপিত করেন।

পদকর্ত্তা শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর রচিত একটি গীতি—

"আর না হেরিব, প্রসর কপালে,
অলপ তিলক কাচ।
আর না হি হেরিব, সোনার কমলে,
নয়ন খঞ্জন নাদ।
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে,
ভকত চাতক লৈয়া।।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে,
আমরা দেখিব চাইয়া।।
আর কি দু'বাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবে এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া, ফুকরি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই।।
নিদয় কেশব, ভারতী আসিয়া,
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, না দেখি' কেমনে,
রহিব নদীয়া মাজ।।
কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ বায়।
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিয়া,
বংশী গড়াগড়ি যায়।।"

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা, নৌকাবিলাস, বনবিহার লীলাদির বহু বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর (শ্রীরামদাস)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা ১১ পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গণ-সকল বর্ণন প্রসঙ্গে ১১।১৩ শ্লোকে লিখিত আছে—

"শ্রীরামদাস আর, গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।"

ইহার অনুভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে—

শ্রীরামদাস (অভিরাম)—ঠাকুর অভিরাম নিত্যানন্দৈক প্রাণ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজের শ্রীদাম সখা, গৌরগণোদ্দেশে ১২৬ শ্লোক—"পুরা শ্রীদামনামা সীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ।।" ভক্তিরত্নাকরে (চতুর্থতরঙ্গে) শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের কথা লিখিত আছে। অভিরাম ঠাকুর পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দের আদেশে আচার্য্য ও ভক্তিধর্ম প্রচারক ছিলেন। "অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড। যাঁরে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড।। নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর।।" ইনি প্রণাম করিলে বিষ্ণু শিলা বা বিষ্ণু অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শীলা বা মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত বলিয়া একটি প্রবাদ অদ্যপি প্রচলিত।

হাওড়া-আম্তা লাইনে চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 'হেলানার হাট' অতিক্রম করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। বর্ষাকালে পথ জলমগ্ন হয় বলিয়া কোলাঘাট হইতে ষ্টীমারে রাণীচক; তথা হইতে ৭।। মাইল উত্তরে খানাকুল। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া উহা 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট একটি বকুল-বৃক্ষ; এই স্থানটি 'সিদ্ধবকুলকুঞ্জ' নামে অভিহিত। শুনা যায়, এই স্থানে সর্বপ্রথমে অভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবলদেব, শ্রীমদনমোহন (একক!) একখানি সওয়া হাত উচ্চ ও প্রায় একহাত প্রশস্ত কষ্টিপাথরে বস্ত্রহরণলীলা, কদম্ববৃক্ষ, যমুনা ও ধেনুবৎসগণসহ শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ এক সঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন—এইরূপ

অৰ্চ্চা-বিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত নৃত্যাবেশে অভিরাম ঠাকুরের একটি শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীব্রজবল্লভ (যুগল-মূর্ত্তি) সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপাল মূর্ত্তিও আছেন।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখস্থিত পুষ্করিণীখননকালে উক্ত গোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। তদবধি উক্ত পুষ্করিণীটি "অভিরামকুঞ্জ" নামে বিদিত। বর্ত্তমানে যে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, তাহারই ঠিক দক্ষিণে একটি পুরাতন নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের উচ্চদেশে একটি প্রস্তরফলকে ১১৮১ সালে ঐ মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া খোদিত রহিয়াছে। মন্দির-নির্ম্মাতার কোনও নামোল্লেখ নাই। শুনা যায় পার্শ্বস্থ গ্রামের পরলোকগত 'নছিরাম সিংহ গয়লা' নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে এখানে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন ও মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে খড়ের ঘরে এই স্থানেই শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেন।

শ্রীগোপীনাথের মন্দিরের উত্তরেই স্থানীয় কায়স্থ-চৌধুরীগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবল্লভ জীউর প্রাচীন মন্দির।

বর্ত্তমান মন্দিরের প্রস্তরফলকে খোদিত রহিয়াছে—"শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ সন ১২১৯ সাল মাঘ যাহা মন্দির তৈয়ারী, সন ১৩০৮ সালে মেরামত মাহা বৈশাখ।" শুনা যায় হুগলী জেলার আরামবাগ থানার নিকট মাধবপুরবাসী পরলোকগত পুণ্ডরীকাক্ষ রায় নামক এক ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে একটি বিস্তৃত পাকা নাটমন্দির। মেদিনীপুর জেলার ধীবরগণ ১২৬৩ সালে এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন; উহা ভগ্ন হইলে ১৩২০ সালে পুনরায় উহারা সংস্কার করিয়া দেন।

সেবায়েতগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সময় হইতেই এখানে সিদ্ধ চাউল ভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কি, মুড়ি পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। আর একটি অভিনব প্রথা এই যে, ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় মন্দিরের দরজা খোলা থাকে ও সর্বসমক্ষে শয়ন দেওয়া হয়। অধুনা প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গল আরতি করিবার রীতি নাই।

বর্ত্তমানে ৩৬/৩৭ ঘর সেবায়েত আছেন। কথিত আছে, মন্দিরের মধ্যে লোহার সিন্দুকে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুক আছেন এবং উহা উক্ত সেবায়েতগণের সমস্ত চাবি দ্বারা উক্ত সিন্দুকে আবদ্ধ;

উহা—দুইহাত দীর্ঘ এবং জরি দিয়া জড়ান,—মহোৎসবের সময় সকল সেবায়েতগণের একসঙ্গে অভিমত হইলে উহা বাহির করা হয়। "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুকের কথা ভক্তি রত্নাকরে (৪র্থ তরঙ্গে) লিখিত আছে যে, ঐ চাবুক দিয়া অভিরাম ঠাকুর যাহাকে আঘাত করিতেন, তাহারই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত, একদা শ্রীনিবাসাচার্য্য অভিরাম-ভবনে আগমন করিলে ঠাকুর অভিরাম তিনবার শ্রীনিবাসের গাত্রে ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখন অভিরাম পত্নী বিপ্র কন্যা মালিনী দেবী হাসিয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, ধৈর্য্য ধর; শ্রীনিবাস—বালক তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।"

হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, আমতা এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপর, কোতলপুর প্রভৃতি গ্রামে ইঁহার বংশগণ (শৌক্র বা শিষ্য শাখাগত?) রহিয়াছেন।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর অত্যন্ত তেজীয়ান্ শক্তিশালী আচার্য্য ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকালে তিনি বহু পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

"অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁরে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড।।
নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁক কৃপা মনোহর।।"

—ভক্তিরত্নাকর

"রামদাস অভিরাম—সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী।।

—চৈঃ চঃ ১।১০।১১৬

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত ৩২ জনের বাহিত ও ভক্তিরত্নাকরে লিখিত একশতাধিক জনের বাহিত একখানি বৃহৎ কাষ্ঠকে যিনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় উঠাইয়া বাঁশীর ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন।

"শতাধিক লোকে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে।।"

—ভক্তিরত্নাকর ৪।১২৩

এইরূপ অলৌকিক লীলা দর্শনে ভক্তগণ মহাবিস্মিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল অভিরাম ঠাকুর রচিত ''শ্রীবীরভদ্রাষ্টকে ও গঙ্গাস্তোত্রে উল্লেখিত আছে যে, যাঁহার প্রণামে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য শিলা বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত তাঁহার প্রণাম শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী ও শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

অনেকে বলেন পুরীর বালি মঠটি ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। চৈত্র কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে ইঁহার তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে খানাকুলে কৃষ্ণনগরে মহোৎসবে বহু লোকের সমাগম হয়।

শ্রীপরমেশ্বরী দাস (শ্রীপরমেশ্বর দাস)

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৩২ সংখ্যা অনুসারে শ্রীপরমেশ্বরী দাস দ্বাদশ গোপালের মধ্যে অর্জ্জুন সখা ("নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাস পরমেশ্বর")। ইনি বৈদ্যকুলোদ্ভূত। ইঁহার শ্রীপাট আটপুর—হাওড়া আমতা রেল লাইনে চাঁপাডাঙ্গা শাখায় আটপুর ষ্টেশনের এবং বর্দ্ধমানরাজ তেজ বাহাদুরের দেওয়ান পরলোকগত কৃষ্ণ কুমার মিত্রের স্থাপিত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। পূর্বে ইহার নাম 'বিশখালা' ছিল। মন্দিরের সম্মুখেই বহুল ছায়াপূর্ণ একসঙ্গে দুইটি বকুলবৃক্ষ ও পৃথক একটি কদম্ব বৃক্ষে এবং তদুভয়ের মধ্যে প্রদেশে পরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি ও তদুপরি তুলসীমঞ্চ সুশোভিত। যে বকুল-বৃক্ষদ্বয় শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময়ে ছিল, তাহারই শাখা হইতে বর্ত্তমানের বৃক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। প্রতি বৎসর কদম্ব বৃক্ষে একটি ফুল হয়, তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ-পূজা হয়। পরমেশ্বরী ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশীয়-গণই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। হুগলী জেলার চণ্ডীতলা ডাকঘরের অন্তর্গত গরলগাছা-গ্রামের ইঁহাদের কেহ কেহ বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্বেও ইঁহাদের অনেক শৌক্র ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল। কালপ্রভাবে সাংসারিক লোকের ন্যায় ইঁহারা বৈদ্য ব্যবসায় অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণ বংশীয় সকলেই ধীরে ধীরে ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি—'অধিকারী'। শ্রীরাধিকা প্রসন্ন অধিকারী কবিরাজ মহাশয় ও নটবর অধিকারী মহাশয়ের বিধবা ও পুত্রসন্তান হীনা শাশুড়ীই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। ইঁহাদের জ্ঞাতিবর্গের 'গুপ্ত' উপাধি। ইঁহারা নিজ দিগকে সাধারণ 'বৈদ্য' অভিমান করিয়া দেবল-ব্রাহ্মণের দ্বারা ঠাকুর পূজা করাইতেছেন। অধুনা আটঘর সেবায়েত আছেন এবং আটঘর মিলিত হইয়া দুইঘর হইয়াছেন। পূর্বে বিগ্রহ সেবার জন্য প্রচুর জমির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সমস্ত জমিই ইঁহারা হারাইয়াছেন। এক্ষণে সামান্য দেবোত্তর দ্বারা অতিকষ্টের সহিত বিগ্রহ সেবা চলিতেছে। মন্দিরে একই সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন, দেখা যায়। সম্ভবতঃ বলদেব-বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত। সম-সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীমতীসহ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অবস্থান—তত্ত্ববিরোধপূর্ণ ব্যাপার। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আঃ ১১।২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের 'অনুভাষ্যে')।

শ্রীপরমেশ্বরী দাস নিত্যানন্দ লীলা পুষ্টির নিমিত্ত একজন প্রধান পার্ষদ ও নিত্যানন্দের জীবন সদৃশ ছিলেন।

"নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বরী দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৩২)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে আটপুর গ্রামে পরমেশ্বরী দাসের সেবিত শ্রীগৌরবিগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন—

"পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বরী দাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।।
সত্বর ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৯৫-৯৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াও কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নীচ-মূর্খ-পতিত সকলকে উদ্ধারের জন্য গৌড়দেশে যাইতে আদেশ করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজগণ সহ গৌড়দেশ যাত্রা করিলেন। সেই সময় শ্রীরামদাস, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, পুরন্দর পণ্ডিত ইঁহারা সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত ছিলেন। পথ চলাকালে নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভাবের প্রকাশ হইল। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন—

"কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বরী দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস।।
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন।।
পথ চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব-পারিষদ আগে হৈলা প্রেমময়।।

সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কা'র দেহে কত ভাব নাহি তা'র অন্ত্য।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৩২-২৩৫)

"কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরী দাস দুইজন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ।।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২৪০)

এ প্রসঙ্গে শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার গৌড়ীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন—"শ্রীপরমেশ্বরী দাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস—উভয়েই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবক। সুতরাং তাঁহাদের যে গোপালভাব, তাহা ব্রজের দ্বাদশ গোপালের ভাব জানিতে হইবে। কৃষ্ণগোপাল ভাব নহে।"

শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে পাওয়া যায় যে, শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা যখন খেতুরী মহোৎসবে যাত্রা করেন, সে সময় শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরও তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।

"গৌরাঙ্গ নকড়ি কৃষ্ণদাস, দামোদর।
শ্রীপরমেশ্বরী বলরাম বিজ্ঞবর।।
শ্রীমুকুন্দ, দাস বৃন্দাবন আদি করি।
এ সবায় সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী।।"

(ভঃ রঃ ১০।৩৭৬-৭৭)

শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার সহিত ব্রজধামেও গমন করেন। তাঁহার কৃপায় বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের সহিত শ্রীরাধিকার মিলন দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতার আদেশে তিনি আটপুরে শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

"তরা আটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ।।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
রাধাগোপীনাথ সেবা করিল প্রকাশ।।"

(ভঃ রঃ ১৩।২৪৫-২৪৬)

পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের এমন অলৌকিক শক্তি ছিল যেমন বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিত হইয়াছে—

"পরমেশ্বরদাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন-স্থানে।।"

কোন এক সময়ে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকট আক্না মহেশ গ্রামে শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই এর শ্রীপাটে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল। শ্রীপরমেশ্বরী দাস সেইস্থানে প্রেমে নৃত্য করিতেছিলেন। সেই উচ্চ সংকীর্ত্তন ধ্বনি ও নৃত্যাদি দেখিয়া কয়েকজন পাষণ্ড ব্যক্তির গাত্র দাহ উপস্থিত হইলে সেই কীর্ত্তনস্থলীকে অপবিত্র ও ভক্তগণকে শায়েস্তা করিবার জন্য একটি মৃত শৃগালকে কীর্ত্তন মধ্যে নিক্ষেপ করে। কিন্তু ভক্তপ্রবর পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর সংকীর্ত্তন বন্ধ করিলেন না, তাঁহার সেই সংকীর্ত্তন প্রভাবে মৃত শৃগালও জীবিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে থাকে। তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলেন।

শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের স্মরণেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত আছে—

"পরমেশ্বরী দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁর যে করে স্মরণ।।"

(আদি ১১।২৯)

শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর কিছুকাল খড়দহে এবং বৃন্দাবন হইতে আগমনকালে পুরী জেলার গরলগাছা গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খড়দহে আসিলে ইনি তাঁহাকে পুরীর রাস্তার বিবরণ দিয়াছিলেন।

শ্রীজাহ্নবামাতা বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের জন্য যে শ্রীরাধা মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর ছিলেন। তিনি শ্রীজাহ্নবামাতার অতি প্রিয় সেবক ছিলেন।

শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব পালিত হয় বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

হুগলী (পঃ বঙ্গ) জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রামে ১৪০৩ শকাব্দে (১৪৮১ খৃষ্টাব্দে) পিতা শ্রীকরদত্ত ও মাতা ভদ্রাবতীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীউদ্ধারণ দত্ত শৌক্র সুবর্ণ বণিককুলে অবতীর্ণ হন। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১২৯ শ্লোক—"সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।" যেমন স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশ্রীশচীদেবীকে আশ্রয় করিয়া অবতরণ কালে তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য কৃষ্ণপার্ষদগণও শ্রীগৌর পার্ষদবৃন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ রূপে বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রামে অবতীর্ণ হইলে শ্রীবলদেবের পার্ষদগণও শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীবলদেবের সখ্যরসের মুখ্য পার্ষদগণ দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত। উক্ত দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবাহু সখা। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর উক্ত দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সেই সুবাহু সখা। বৈষ্ণব যে কুলে অবতীর্ণ হন সেই কুল পবিত্র, বসুন্ধরা ধন্যা ও জননী কৃতার্থা হন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবির্ভাবে সুবর্ণ বণিক কুল পবিত্র হইল। সামাজিক বিচারে ঐ কুল 'অবর-কুল' নামে প্রসিদ্ধ। অবরকুলে আবির্ভূত হইয়া তিনি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপাত্র ছিলেন, তাঁহার আদর্শে অবরকুলোদ্ভূত জনগণ স্ব-স্ব-বর্ণভিমানের অধমতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালোয়ার, ভাঙ্গারী প্রভৃতি অবর বৈশ্য জাতিগুলিও হরিজন পরায়ণ হইয়াছিলেন। সুবর্ণবণিক-কুল স্বভাবতঃ অশিক্ষিত, মূর্খ ও সর্বদা জড়ীয় কনক-চিন্তারত থাকায় কলুষিত চিত্ত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রকটকালে যাবতীয় বণিককুলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে নিত্যানন্দ বিরোধী ঐ বণিককুলেই উদ্ভূত কোন কোন ভক্তনামধারী হরিবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।

পূর্বে 'সপ্তগ্রাম' বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম—ইহাদের সমষ্টি বুঝাইত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ "কতদিন থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ সঙে।। উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন প্রভুর ত্রিবেণীর তীরে।। কায়মনবাক্যে

নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ।। যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।”

সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্ত সেবিত মহাপ্রভুর ষড়্ভূজ মূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। অপর সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও সিংহাসন বেদীর নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চ্চিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীমন্দির সম্মুখে একটী বৃহৎ নাটমন্দির। নাটমন্দিরের প্রতিস্তম্ভে স্মৃতিরক্ষক প্রস্তরফলকে মন্দির-নির্মাতা ও শ্রীপাটের সংস্কারকগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। নাটমন্দিরের সম্মুখেই একটি সুশীতল ছায়াপূর্ণ মাধবীমণ্ডব। মাধবীমণ্ডপের দুই পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ—একটিতে উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য ও অপরটিতে প্রস্তরফলকে চতুর্যুগের চারিটি তারকব্রহ্ম নাম খোদিত রহিয়াছে।

১২৮৩ খৃষ্টাব্দে নিতাইদাস বাবাজী নামক জনৈক ভিক্ষু শ্রীপাটের জন্য ১২ বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। তৎপর কাহারও কাহারও বিশেষ চেষ্টায় শ্রীপাটের সেবা কিছুদিন চলিলেও ক্রমশঃ সেবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরে ১৩০৬ সালে হুগলির ভূতপূর্ব সাব্‌জজ বলরাম মল্লিক ও কলিকাতাবাসী বহু ধনী সুবর্ণ বণিকের সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীপাটের সেবার কিছু পরিপাট্য দেখা যায়।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক পূর্বে একটি ভগ্নকুটীরে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি এখন সপ্তগ্রাম-শ্রীপাটে নাই। তাঁহার আলেখ্যই এখন পূজিত হইতেছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, উদ্ধারণ ঠাকুরের পূর্বের শ্রীমূর্ত্তি এখন হুগলী বালী-নিবাসী শ্রীমদন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে এবং ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম ঐ গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন।

ঠাকুর উদ্ধারণ কাটোয়া হইতে দেড় মাইল উত্তরে ‘নৈহাটী’ গ্রামে রাজা নৈরাজার দেওয়ান রূপে কার্য্য করার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আজও দাঁইহাট ষ্টেশনের নিকট উক্ত রাজবংশের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের চিহ্ন আছে। ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যেখানে বাস করিতেন, তাহার নাম অদ্যপিও উদ্ধারণপুর নামে প্রসিদ্ধ। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীনিতাই-গৌর-বিগ্রহ বনওয়াড়ীবাদের রাজধানীতে নীত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। এইস্থানের মন্দিরের পশ্চিমে (কাহারও মতে বৃন্দাবনে) ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান। শ্রীঠাকুরের পুত্রের নাম শ্রীনিবাস দত্ত। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বতোভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সেবার আদর্শ

প্রদর্শন করিয়াছে। তাঁহার শুদ্ধ প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি সেবন করিতে বড়ই সুখ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবীদেবী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়তম শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে যদি আমরা পূজা করি, সেবা করি, তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন করি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা অতি শীঘ্র আমরা লাভ করিতে পারিব, কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইয়া আমাদের জীবনকে সার্থক করিতে পারিব।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পতিত পাবনত্বের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।।
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার।।"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা প্রচুর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত পাপী অপরাধী জীবের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তের লীলা করিলেও স্বরূপতঃ ভগবত্তত্ত্ব। তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার কৃপাশক্তির মূর্ত্তিস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরম পতিত-পাবন, আবার তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ পরম পরম পতিত পাবন। বস্তুতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তের মধ্যমেই কৃপা করেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ হওয়ায় পরম পরম পতিত পাবন, যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব অনায়াসে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সেবা লাভ করিতে পারে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

"উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার।।"

১৪৬৩ শকাব্দে পৌষী (মতান্তরে অগ্রহায়ণী) কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব হয়। তাঁহার বংশে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা হুগলী, কলকাতা প্রভৃতি বহুস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম দাস

"সদাশিব কবিরাজ মহা ভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম।।
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।।"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৪১-৭৪২)

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ১৩১ শ্লোকে "সদাশিব সুতো নাম্না নাগরঃ পরুষোত্তমঃ। বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দামা যে বল্লবো ব্রজে।।"—ব্রজে যিনি 'দাম' নামক গোপ ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৈদ্যবংশোদ্ভব সদশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তম। 'দাম' দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজলীলায় শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী। কংসারি সেন, তাঁহার পুত্র সদাশিব কবিরাজ, তাঁহার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর, তাঁহার পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর—এইভাবে চারিপুরুষ পর্য্যন্ত ইঁহারা সিদ্ধ গৌরভক্ত পার্ষদ ছিলেন। এইরূপ চারিপুরুষ ধরিয়া সিদ্ধ পার্ষদত্ব অতীব বিরল। কংসারি সেন ব্রজলীলায় 'রত্নাবলী', সদাশিব কবিরাজ 'চন্দ্রাবলী' —এমনই সিদ্ধ পরিচয় গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় দেওয়া আছে।

কেহ বলেন, কংসারি সেনের নিবাস পূর্বরেলের গুপ্তিপাড়ায়, কিন্তু অধুনা তাহার কোন চিহ্ন তথায় পাওয়া যায় না। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের শ্রীপাট পূর্ব্বে চাকদহ ও শিমুরালী ষ্টেশন হইতে সমদূরবর্ত্তী সুখসাগরে ছিল। প্রথমে বেলেডাঙ্গা গ্রাম ধ্বংস হইলে, সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ সকল আনীত হন। পরে তাহাও গর্ভগত হইলে ঐ স্থানে শ্রীজাহ্নবামাতার যে গাদি ছিল, সেই গাদির শ্রীবিগ্রহগণের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরেরও শ্রীবিগ্রহ সাহেব ডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হন। বেড়িগ্রামও ধ্বংস হইলে জাহ্নবা মাতার গাদির শ্রীবিগ্রহ সমূহের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ চাঁন্দুড়ে গ্রামে বিরাজ করিতেছেন। ভাগীরথী তীরে চাঁন্দুড়ে গ্রাম—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ও চাকদহ থানার অধীন, এবং 'সিমুরালি' ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে এবং পালপাড়া হইতে এক মাইল পথ। পুরাতন সুখসাগর নদীগর্ভ গত

হওয়ায় নূতন সুখসাগর এই চাঁন্দুড়ে গ্রাম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে কালীগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত।

জিরাট নিবাসী শ্রীমাধবাচার্য্য (মাধব চট্টোপাধ্যায়) কাহারও মতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাহারও মতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর এবং কাহারও মতে এই পুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'বৈষ্ণববন্দনা' লেখক শ্রীদেবকী নন্দন দাস যে ইঁহারই শিষ্য ছিলেন, সে বিষয়ে 'বৈষ্ণব বন্দনা'য় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমান মন্দিরটি মৃন্ময়-প্রাচীরযুক্ত একটি খড়ের গৃহ। মন্দিরগৃহে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম সুভদ্রা, নিতাই-গৌর দুই-দুইটি বিগ্রহ, গোপীনাথ, জাহ্নবামাতা, বালগোপাল, রাধাগোবিন্দ—পাঁচটী যুগল, রেবতী ও বলরাম এবং শালগ্রাম বিরাজিত। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকটি শ্রীমূর্ত্তি পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, আর বাকী শ্রীমূর্ত্তি জাহ্নবা-দেবীর গাদির,—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই শ্রীপাটটী 'বসু-জাহ্নবার পাট' নামেও খ্যাত। চাঁন্দুড়ে শ্রীপাটের নিম্নলিখিত সেবায়েত মহন্তগণের নাম পাওয়া যায়— (১) গোপাল দাস মহান্ত, (২) রামকৃষ্ণ, (৩) বিহারিদাস, (৪) রামদাস, (৫) গোপালদাস ও (৬) বর্ত্তমান বৃদ্ধ সেবায়েত —সীতানাথ দাস।

সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর। পুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্রই কানু ঠাকুর। কেহ কেহ ইঁহাকে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বলেন। ইঁহার নিবাস—বোধখানা। পূর্ব্বরেলের 'ঝিকরগাছা ঘাট' ষ্টেশনে নামিয়া কপোতাক্ষ নদ দিয়া নৌকাযোগে অথবা স্থল পথে দুই বা আড়াই মাইল দূরে শ্রীপাট বোধখানা। কানু ঠাকুরের বংশীয়গণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে 'নাগর পুরুষোত্তম' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'দাস পুরুষোত্তম' বলিয়া যিনি গৌরগণোদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় 'স্তোককৃষ্ণ', তিনিই কানু ঠাকুরের পিতা। পুরুষোত্তমের পত্নীর নাম 'জাহ্নবা' ছিল। ঠাকুর কানাই (কানু) এর আবির্ভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। নিত্যানন্দ প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া পুরুষোত্তমের গৃহে আসিয়া দ্বাদশ বর্ষের শিশুকে স্বীয় ভবন খড়দহে লইয়া যান।

কানু ঠাকুরের বংশীয়গণে মতানুসারে ১৪৫৭ শকে, বাংলা ৯৪২ সালে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবারে রথযাত্রার দিনে ঠাকুর কানাই আবির্ভূত হইয়াছেন। শিশুকাল হইতে ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি পরায়ণতা দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নাম "শিশু কৃষ্ণদাস" রাখিয়া ছিলেন।

শিশু কৃষ্ণদাস পঞ্চম বর্ষে ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ ব্রজবাসিগণ শিশু কৃষ্ণদাসের ভাবাদি দর্শনে তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই' নাম প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণপদের একটি নূপুর পদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন, 'যে-স্থানে এই নূপুর পতিত হইয়াছে, সেইস্থানে বাস করিব'। যশোহর জেলায় 'বোধখানা' নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, তদবধি ঠাকুর কানাইর বোধখানা আসিয়া বাস।

ইঁহাদের বংশ পরম্পরায় আর একটি জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক শতবর্ষ পূর্ব্বে সদাশিবের কোন পূর্বপুরুষ কর্ত্তৃক 'প্রাণবল্লভ' বিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন। এই 'প্রাণবল্লভ' এখনও বোধখানায় সেবিত হইতেছেন।

'বর্গীর হাঙ্গামার সময় ঠাকুর কানাই এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানগণ ভিন্ন বংশীবদন প্রমুখ অন্য পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত 'ভাজনঘাট' নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। ঠাকুর কানাই-এর কনিষ্ঠ সন্তানগণের মধ্যে 'হরিকৃষ্ণ গোস্বামী' নামে জনৈক ব্যক্তি 'বর্গীর হাঙ্গামা' মিটিবার পর বোধখানায় আসেন। ইনি 'প্রাণবল্লভ' নামে আর একটি নূতনবিগ্রহ স্থাপন করেন। এখনও বোধখানা গ্রামে ঠাকুর কানাই এর জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশীয়গণের মধ্যে প্রাচীন ''শ্রীপ্রাণবল্লভের'' এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশীয়গণের মধ্যে নূতন প্রতিষ্ঠিত শ্রীপ্রাণবল্লভের সেবা হইতেছে। ভাজনঘাটে ''শ্রীরাধাবল্লভ'' বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে দেখা যায় যে, কানু ঠাকুর খেতুরির উৎসবে জাহ্নবা দেবী ও বীরভদ্র প্রভুর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর ও কানু ঠাকুরের বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ সমূহ সুখসাগর গ্রাম ধ্বংসের পরে চাঁন্দুরিয়ার আনীত হইয়া বর্ত্তমানে জিরাটের গঙ্গা-বংশীয়গণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অন্যান্য বিগ্রহগণের সহিত সেবিত হইতেছেন। কানু ঠাকুরের শিষ্যগণ মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদীর ধারে গড়বেতা নামক গ্রামে বাস করেন। সামবেদীয় কৌথুমী শাখার রাঢ়ি শ্রেণীয় 'শ্রীরাম'-নামক একটি ব্রাহ্মণ কানাই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে—

কাহার মতে পুরুষোত্তম দাসের উপাধি 'নাগর', আবার কাহারাও মতে ইঁহার নিবাস স্থানের নাম 'নাগর' (নাগর—বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চাঁন্দুড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দটি মৌজা পাঁচনগরে থাকায় উহাকে কেহ কেহ নাগরদেশ বলেন।) হওয়ায় ইনি 'পুরুষোত্তম-নাগর'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি এক সময় প্রেমোন্মত্ত হইয়া সর্পবিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার কোন বিকার হয় নাই। এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদগণের অনেকের মধ্যেই এইরূপ অলৌকিক শক্তি দেখা যায়।

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১২৮ অনুসারে 'কমলাকর পিপ্পলাই নাম্নাসীদ্ যো মহাবলঃ'। ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গত 'মহাবল' শ্রীগৌরলীলার নিত্যানন্দ পার্ষদ 'কমলাকর পিপ্পলাই' হুগলীর শ্রীরামপুরের অনতিদূরস্থ মাহেশের 'শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার আবির্ভাব হয় সুন্দরবনে 'খালিজুলি' গ্রামে, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান মতে ১৪১৪ শকাব্দে ৮৯৯ বঙ্গাব্দে। রাঢ়ীয় শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। ভ্রাতার নাম নিধিপতি পিপ্পলাই তাঁহার পিতৃদেব ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। 'খালিজুলি' গ্রামে আবির্ভূত হইলেও শ্রীরামপুর হইতে আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী মাহেশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১১।২৪ শ্লোক—

"কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত।।"

—এর অনুভাষ্যে শ্রীসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ; চতুর্ভূজের দুই পুত্র নারায়ণ ও জগন্নাথ; নারায়ণের পুত্র—রাজীব লোচন। তাঁহার সময়ে জগন্নাথের সেবায় অর্থকৃচ্ছ্রতা হয় (ঢাকার নবাব ওয়ালিশ সা (সুজা?) ১০৬০ সালে জগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি প্রদান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথ পুর গ্রামে ঐ জমি আছে। জগন্নাথের নাম হইতেই ঐ মৌজার নাম 'জগন্নাথপুর' হইয়াছে।

প্রবাদ আছে, কমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া কমলাকরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কোনও প্রকারেই তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া নিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃ পরিবারবর্গের সহিত মাহেশ আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখনও মাহেশ গ্রামে কমলাকর পিপ্পলাই বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশঘর দ্বিজবাস করিতেছেন।

কিংবদন্তী আছে, 'ধ্রুবানন্দ' নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া নিজ হস্তে পাক করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা করায়, রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে

গঙ্গাতীরে মাহেশ-গ্রামে গিয়া শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠান্তর তাঁহাকে নিত্য নিজহস্তে ভোগ প্রদান পূর্ব্বক মনস্কাম পূর্ণ করিতে বলিলেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথ বলরাম ও শুভদ্রাদেবী আসিতেছেন দেখিতে পাইয়া শ্রীবিগ্রহত্রয়কে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের উপযুক্ত সেবক হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ দেবের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি' গ্রাম নিবাসী 'শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই' নামক শ্রীজগন্নাথদেবের এক পরমভক্ত বৈষ্ণব শিরোমণি পরদিবস প্রাতে মাহেশে আগমন করিলে তাঁহাকে যেন সেবাভার দেওয়া হয়। ধ্রুবানন্দ পরদিবস প্রাতে কমলাকরের সাক্ষাৎ পাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার প্রদান করিলেন। কমলাকর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার অধিকার লাভ করিবার পর 'অধিকারী' উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্ন প্রকার গ্রামীর মধ্যে 'পিপ্পলাই' অন্যতম।

ভগবান্ ভক্তেরই সেবা অঙ্গীকার করেন। কমলাকর পিপ্পলাই শ্রীজগন্নাথ-দেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ গৃহপরিজনবর্গ সকলই ত্যাগ করিয়া মাহেশে চলিয়া আসিলেন। ভক্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা প্রাপ্তিকেই পরমধন বলিয়া বিচার করেন। ভক্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকার লীলা করিলেও, তাঁহারা সাধারণ বিষয়ী গৃহীর ন্যায় নহেন। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা ভগবদ্ বিরহে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভগবানের নির্দ্দেশমাত্র পরমোল্লাসে সংসার-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত হইতে পারেন। এই সংসার ত্যাগ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত, জ্ঞানীযোগিগণের ন্যায় কষ্ট কল্পিত নহে।

কমলাকর পিপ্পলাইর কন্যা বিদ্যুন্মালার সহিত মাহেশ নিবাসী শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তাঁহাদের কন্যা নারায়ণী দেবী। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সহিত নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। মাহেশের অধিকারিগণের মতে কন্যার নাম 'রাধারাণী'।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীবীরভদ্র প্রভু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, —হুগলী জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রাম নিবাসী যদুনাথাচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুন্মালার (লক্ষ্মীর) গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতীকে এবং তাঁহাদের পালিতা কন্যা নারায়ণীকে শ্রীবীরভদ্রপ্রভু বিবাহ করেন।

শ্রীমলাকর পিপ্পলাই ১৪৩৯ শকাব্দে পানিহাটীতে দণ্ডমহোৎসবে, খেতুরী মহোৎসবে এবং কাটোয়ায় দাসগদাধর-প্রদত্ত মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

"কমলাকর পিপ্পলাই বড় ভাবের উদ্দাম।
নিত্যানন্দ দিলা যাঁরে পাণিহাটী গ্রাম।।"

—বিজয়খণ্ডে

খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবাদেবী সগণে খেতরী উৎসবে যোগদানের সময় কমলাকর পিপ্পালাই যে উপস্থিত ছিলেন তাহা শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে (১০।৩৭৫) উল্লিখিত আছে—

"শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই।
নৃসিংহ, চৈতন্য, জীব, পণ্ডিত কানাই।।"

বৈষ্ণবাচারদর্পণে উল্লেখিত হইয়াছে ইনি কন্যাকে বিবাহ দিয়া বৃন্দাবনধাম যান এবং তথায় অবস্থানকালে অপ্রকট হন। মাহেশের অধিকারিগণ বলেন কমলাকর পিপ্পলাইর তিরোধান ১৪৮৫ শকাব্দে ৯৭০ বঙ্গাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে।

শ্রীকালিয়া কৃষ্ণদাস (কালা কৃষ্ণদাস)

"প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।।"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য পঞ্চম অঃ ৭৪০

কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গ সখা ব্রজে।"

—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৩২

—ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গত অন্যতম 'লবঙ্গ' সখা। ইঁহার শ্রীপাট 'আকাইহাট গ্রাম —বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া-থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং কাটোয়া হইতে 'নবদ্বীপ কাটোয়া' রাজপথের ধারে অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে কাটোয়া-স্টেশনে নামিয়া দুই মাইল অথবা কাটোয়ার পূর্ব ষ্টেশন দাঁইহাটে নামিয়া প্রায় এক মাইল পথ। আকাই হাট-গ্রামটি অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া লোক জনের বাস বিরল। শ্রীপাট অধুনা শ্রী হীন। কালা কৃষ্ণদাসের সমাধি মন্দিরটি কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া চাপা পড়িয়াছে। রাস্তা হইতে আম্রবাগানের মধ্য দিয়া যাইলে সম্মুখে একটি ভগ্ন কুঠুরি দেখা যায়। কুঠুরির মধ্যে শ্রীবিগ্রহের শূন্য বেদী ও কুঠুরির পূর্ব দক্ষিণ কোনে একটি খড়ের চালা তাহার মধ্যে সেবায়েতগণের সমাজ। বর্ত্তমান সেবায়েত হরেরাম দাস বাবাজীর পরবর্ত্তীজন। দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী—ইহাই "নূপুংকুণ্ড"। প্রবাদ, এই পুষ্করিণীতে, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দাত্মজ রঘুনন্দন ঠাকুরের, কাহারও মতে নিত্যানন্দ প্রভুর নূপুর পতিত হইয়াছিল। শুনা যায়, ঐ নূপুর এবং আকাই হাট-শ্রীপাটের শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগোপালজিউ, আকাই হাট হইতে তিনক্রোশ দূরে কড়ুই-গ্রামে মহান্তবাটীতে অদ্যপি আছে। ১২০০ সালের হস্তাক্ষর লিখিত একখানি শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং ১১৭১ সালে লিখিত একখানি শ্রীচরিতামৃত আছে। চৈত্র মাসে কৃষ্ণা-দ্বাদশী-বারুণীর দিবস এখানে শ্রীকালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন হয়।

পাবনা জেলান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বেড়া বন্দরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর উত্তর-তীরে সোনাতলা-গ্রাম-নিবাসী 'গোস্বামী' মহাশয়গণের মতে, কালা-কষ্ণদাস ঠাকুর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ভরদ্বাজ-গোত্র এবং ভাদড়-গ্রামী। আকাইহাট হইতে কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচার উপলক্ষে

পাবনা আগমন করেন। যে স্থানে তিনি আশ্রম করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্নচিহ্ন আছে। পরে এই স্থানে তাঁহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। আকাইহাটে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করেন এবং কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সোনাতলা-গ্রামে অবস্থান-কালে তাঁহার 'শ্রীমোহনদাস'-নামে এক পুত্র জন্ম; তাঁহাকে মাতুলালয়ে সোনাতলা বা ভাদুটী-মথুরাপুর গ্রামে রাখিয়া এবং সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার গৌরাঙ্গদাস-নামে আর এক পুত্র জন্মে। শ্রীবৃন্দাবনে জন্মহেতু গৌরাঙ্গ দাসের অপর নাম বৃন্দাবনদাস। পরে জ্যেষ্ঠপুত্র মোহনদাসের নিকট তাঁহাকেও পাঠাইয়া দেন এবং সম্পত্তির ছয় আনা অংশ লইতে আদেশ দেন। গৌরাঙ্গদাস শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ জীউর অনুরূপ শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রকাশপূর্বক জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সহিত সেবা করিতে থাকেন।

কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীবিজয়গোবিন্দ গোস্বামী প্রমুখ বংশধরগণ অধুনা পাবনা জেলায় সোনাতলা প্রভৃতি স্থানে আজও বর্ত্তমান।

সোনাতলা গ্রামস্থিত আশ্রম-বাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট এবং পুষ্করিণীর ঘাট এখনও দেখা যায়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ—শ্রীকালাচাঁদ জিউ পালাক্রমে কালা কৃষ্ণদাসের বংশধরগণের দ্বারাই সেবিত হন। এখানে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশীতে কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হয়।

"কালা কৃষ্ণদাস * বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন।।"

—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১১।৩৭

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত যাত্রাকালে মহাপ্রভুর কৌপীন, বহির্বাস, জলপাত্র বহনের জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে দিয়াছিলেন, তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কালা-কৃষ্ণদাস হইতে পৃথক্ ব্যক্তি—শ্রীল প্রভুপাদ চৈঃ চঃ মঃ ৭।৩৯ অনুভাষ্য।

শ্রীসুবুদ্ধি রায়

শ্রীসুবুদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পূর্বে সুবুদ্ধি রায় গৌড়দেশের রাজা ছিলেন। সে সময়ে হুসেন সাহ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন। শ্রীসুবুদ্ধি রায় এক দীর্ঘিকা খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই কাজের 'মুনসীফ্' করিলেন হুসেন সাহকে। একদিন হুসেন সাহের বিশেষ ভুলের জন্য সুবুদ্ধি রায় তাহার পৃষ্ঠে চাবুক মারেন। কালক্রমে হুসেন সাহ গৌড়ের বাদশা হইলেন, কিন্তু হুসেন সাহ পূর্ব উপকারের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ সুবুদ্ধি রায়কে বিশেষ সম্মান করিতেন। সেই চাবুক মারার চিহ্ন হুসেন সাহের পৃষ্ঠে ছিল। হুসেন সাহের বেগম পতির অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সুবুদ্ধি রায় রাজা থাকাকালে বাদশাহকে চাবুক মারিয়াছিলেন। তিনি (বেগম) ক্রুদ্ধ হইয়া সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ড দিবার জন্য পতিকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হুসেন সাহ তাহাতে রাজি না হওয়ায় রায়ের জাতিনাশ করিতে বলিলেন। জাতিনাশ করিলে সুবুদ্ধি রায় প্রাণত্যাগ করিবেন, এই জন্য বাদশাহ তাহা করিতে অস্বীকার করিলে বেগম আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। অনন্যোপায় হইয়া বাদশাহ সুবুদ্ধি রায়কে করোঁয়ার পানি (অর্থাৎ যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে) সেই মুসলমানস্পৃষ্ট জল সুবুদ্ধি রায়ের মুখে দেওয়া হইয়াছিল। সুবুদ্ধি রায়ের পূর্বেই বিষয় ত্যাগের ইচ্ছা ছিল, এই ছল পাইয়া (জাতিনাশ-ছলে) তিনি পরিবারদিগকে ত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট রায় কি ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, তাহা জানিতে চাহিলে তাঁহারা কহিলেন তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীধামে পদার্পণ করিলে সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকট আনুপূর্বিক সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করিতে উপদেশ দিলেন—

"প্রভু কহে,—'ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন।।
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।।

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি।।”

—চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৯১-৯৩

মহাপ্রভুর আদেশে সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাপথে প্রয়াগ, অযোধ্যা হইয়া নৈমিষ্যারণ্যে আসিয়া কিছুদিন অবস্থানের পর সেখান হইতে মথুরায় আসিয়া জানিলেন যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সুবুদ্ধি রায় মর্মাহত হইলেন। মহাপ্রভুর বিরহে সুবুদ্ধি রায়ের বৈরাগ্য ও ঔদাসিন্য দেখা দিল। তিনি বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া জঙ্গল হইতে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মথুরায় বিক্রয় করিতেন, তাহাতে যে সামান্য মাত্র উপার্জন হইত, তাহা দ্বারা তিনি চানা মাত্র চিবাইয়া জীবনধারণ করিতেন। তাহার মধ্য হইতে পয়সা জমা করিয়া তদ্দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে দধি-অন্নাদি খাওয়াইতেন।

“শুষ্ক কাষ্ঠ আনি’ রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে।।
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা।
আর পয়সা বাণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া।।
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি’ তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দন।।”

—চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৯৭-৯৯

সুবুদ্ধি রায়ের বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবসেবার চেষ্টা দেখিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী খুব প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সুবুদ্ধি রায়কে সঙ্গে লইয়া ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলসমূহ দেখাইয়াছিলেন।

“রূপ-গোসাঞি আসি’ তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা।
আপনা সঙ্গে লঞা ‘দ্বাদশ বন’ দেখাইলা।।”

—চৈঃ চঃ মঃ ২৫।২০০

শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের পবিত্র চরিত্র হইতে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, অর্থশালী ব্যক্তি হইলেই বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা করিবে, এইরূপ নহে। সেবার প্রবৃত্তি থাকিলেই

দারিদ্র্য থাকিলেও ভগবদিচ্ছাক্রমে বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবার জন্য দ্রব্যের অভাব হয় না।

যে সময়ে সনাতন গোস্বামী কাশী হইতে প্রয়াগে আসিয়া রাজপথ দিয়া মথুরা গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু গঙ্গাতীর পথে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করায় উভয়ের সাক্ষাৎকার হয় নাই। সনাতন গোস্বামী মথুরায় আগমন করিয়া সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম দুই ভাই গঙ্গাপথে আর রাজপথে সনাতন আসায় তিন ভাইয়ের মিলন হয় নাই। সনাতনের প্রতি রায়ের পূর্বাশ্রমোচিত ব্যবহারে অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধীয় স্নেহে সনাতনের উহাতে অপ্রীতি বা ঔদাসিন্য দেখা দিয়াছিল। কৃষ্ণান্বেষণকারী মহাবৈরাগী সনাতন প্রভু বৃন্দাবনের প্রতি বৃক্ষে, প্রতি কুঞ্জে দিবা রাত্র কাটাইতেন।

শ্রীসুবুদ্ধি রায় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া খুব দীনভাবে গোস্বামিগণের সহিত অবস্থান করিয়া বৈরাগ্যের ও নিষ্ঠার সহিত শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের মাতৃ-পিতৃ পরিচয়, জন্মস্থান প্রভৃতি কিছুই জানা যায় না। তাঁহার তিরোধান তারিখও অজ্ঞাত।

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়

বিহারপ্রদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত ত্রিহুতে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি অনেকগুলি ভক্তিরসপূর্ণ শ্লোক রচনা করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী নিজ রচিত পদ্যাবলীতে রঘুপতি উপাধ্যায়ের শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু ইঁহার রচিত শ্লোক শ্রবণে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় প্রয়াগধামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় তিনি আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইনি আনন্দিত হইয়া স্বরচিত একটি শ্লোক পাঠ করিয়া শোনান।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।"

—ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন; (আমি কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, —যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন (পদ্যাবলীতে ১২৭ শ্লোক) চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৯৬; প্রেমাবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর আরও শুনিতে চাহিলে উপাধ্যায় কহিলেন—

কম্প্রতি কথরিতুমিশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়তু।
গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটি-বিটং ব্রহ্ম।।

(পদ্যাবলীতে ৯৯ শ্লোক) চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৯৮)

—কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেহ বা তাহা প্রতীতি করিবে যে সূর্য্যতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রহ্ম লীলা করেন?

রঘুপতির শ্লোক পঠনে প্রভুর প্রেমাবেশ হইল, তাহাতে উপাধ্যায় বিস্মিত ও মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান হইল এবং তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল যে, ইনি 'মনুষ্য নহেন', ইনি নিশ্চয়ই 'কৃষ্ণ'।

"প্রভু কহে, উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান" কায়?
'শ্যামমেব পরম রূপং' কহে উপাধ্যায়।।

শ্যাম-রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়।।
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়।।
রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়।।

মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া বলিলেন—

"—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এতবলি' শ্লোক পড়ে গদ গদ-স্বরে।।

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১০১-১০৬)

—শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর বয়সই ধ্যেয়, আর আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ রস।

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে রঘুপতি উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলে, তিনি প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। রঘুপতি উপাধ্যায়ের সৌভাগ্য দেখিয়া বল্লভ ভট্ট ও তাঁহার গৃহের সকলেই বিস্মিত হইলেন।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ

পিতা (ব্রজের চন্দ্রিকা) শ্রীচিরঞ্জীব সেন ও মাতা শ্রীসুনন্দার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীগোবিন্দ (কবিরাজ)। শ্রীগোবিন্দ মাতৃ জঠরে অতিরিক্ত মাস অবস্থান করার ফলে মাতার অতিশয় কষ্টের কথা দাসী মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজকে (যাঁহার আলয়ে শ্রীগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন ও যিনি ছিলেন এক শাক্ত) জানান হইলে, তিনি সে সময়ে দেবীপূজায় নিযুক্ত থাকায় সংবাদ দাতা দাসীকে চক্ষের ইঙ্গিতে দেবী যন্ত্রটিকে সুনন্দাকে দেখাইতে বলেন। কিন্তু দাসী সুনন্দাকে পান করাইলে পর তিনি সুখে প্রসব করেন। "শীঘ্র যন্ত্র-ধৌত করি জল পিয়াইল।" (ভক্তিরত্নাকর ৯।১৪৯১)

গোবিন্দ কবিরাজের জন্মের পর পিতা শ্রীচিরঞ্জীব সেন অপ্রকট হন। তখন হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ পিতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে প্রতিপালিত হন। এই মাতামহের সঙ্গ প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ শাক্ত-ভাবাপন্ন হন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। গোবিন্দ ঘোর শাক্ত হইয়া পড়েন। যে জন্য তিনি ভগবতী ব্যতীত অন্য কথা বলিতেন না, কোন পূজাও করিতেন না ও সকলকে ভগবতী উপাসনার উপদেশ প্রদান করিতেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহ প্রাপ্তির পর শ্রীগোবিন্দের মতি বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন—শক্তি উপাসনা মার্গে ভববন্ধন হইতে কি মুক্ত হওয়া যায় না? ঠিক এই সময়ে দৈববাণী হইল—

হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি।।

(ভক্তিরত্নাকরর ৯।১৫৯)

তখন শ্রীগোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন শ্রীকৃষ্ণভজন ছাড়া অন্য কোন মার্গে বা অন্য কোন উপাসনার দ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয় না।

অতঃপর শ্রীগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য খুবই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁহার অনুগ্রহে ধন্য হইয়াছেন সেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ

আশ্রয় করিতে ব্যাকুল হইলেন। শ্রীআচার্য্যের চরণ আশ্রয় করিবার মানসে যাজিগ্রামে যাইবার উদ্যোগ লইলে জানিতে পারিলেন শ্রীআচার্য্য বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দের মনে খেদ ও উপস্থিত হইল; মনে বিচার করিলেন—

"বৈষ্ণবগণেও মোর হিত চিন্তা কৈল।
কহিল পিতার বার্ত্তা তাহা না শুনিল।।
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্যমান।
চৈতন্যচন্দ্রের ভক্তগুণের নিধান।।
এ হেন সন্তান, হৈয়া গেনু ছারে খারে।
এ কেবল কর্মদোষ কি বলিব কারে।।"

(ভক্তিরত্নাকর ৯।১৬৬)

এতদ্ব্যতীত যদিও দেবী স্বয়ং অহৈতুকী কৃপা করিয়া কৃষ্ণ ভজনে করতে উপদেশ করিলেন, তাতে কৃষ্ণ ভজনে কিছুটা মতি হইলেও সদ্‌গুরু কোথায় পাইব?

শ্রীগোবিন্দের মনে যখন এইরূপ খেদ উপস্থিত হইল সেই সময় পুনরায় এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—

হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে।
অভিলাষ পূর্ণ হবে অল্প দিবসে।।

(ভক্তিরত্নাকর ৯।১৭২)

এদিকে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে বৃন্দাবন হইতে শ্রী আচার্য্যকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কুমারহট্ট নগরে কনিষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দের কাছে আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণভজন উৎকণ্ঠা জানিয়া অতীব খুশী হইয়া জানাইলেন যে শ্রীআচার্য্যপাদ আসিয়া পড়িলেই সব বাসনা সিদ্ধ হইবে। তিনি গোবিন্দকে কুমারহট্ট নগর হইতে তেলিয়া বুধরী গ্রামে গিয়া বাস করিতে বলিলেন; শ্রীগোবিন্দ বুধরিগ্রামে আসিয়া বসতবাটী নির্মাণ করেন।

এদিকে ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড় দেশে আগমন করিয়া সুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ সঙ্গে অবস্থান করায় গৌড়দেশে শ্রীহরিকীর্ত্তন বন্যা আরম্ভ হইল। ক্রমে শ্রীআচার্য্য তেলিয়া বুধরীতে আগমন করিলে শ্রীগোবিন্দ শ্রীল আচার্য্যকে অতি ভক্তিভরে আমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। করুণাময় শ্রীআচার্য্য ঠাকুর তাঁকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন।

"রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন গোবিন্দে।।"

(ভক্তিরত্নাকর ১০।১৭১)

গৌড় দেশে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা প্রতিভা অতি অদ্ভুত। তিনি "সঙ্গীত মাধব" নামে এক নাটক রচনা করেন। তাঁহার আরও কয়েকখানি সংগীত রচনা গ্রন্থ (যেমন "গীতামৃত" প্রভৃতি) বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার সংগীত রচনা শক্তি ও সুকণ্ঠী গায়ক হিসাবে খ্যাতি—উভয়েরই প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ও জাহ্নবা মাতা প্রভৃতি তাঁহার ভক্তিময়ী সংগীত শ্রবণে পরম সুখী হইয়া তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিলভাষাযুক্ত পদাবলীর অনুসরণে গীত রচনা করেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সম্বলিত গীত রচনা করেন। শ্রোতাগণের হৃদয় জয়কারী বহু সংগীতের মধ্যে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

শরণাগতির দৈন্যাত্মক একটী গীত—

"ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানব, জনম সৎসঙ্গে,
তরহু এ ভব সিন্ধু রে।।
শীত আতপ, বাত বরিষণ,
এদিন যামিনী জাগি রে।

বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে।।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমল দল জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন
পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন সখিজন, আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে।।

শ্রীগৌর-বিষয়ক পদ কীর্ত্তন

কন্দল কনয় কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গ অবিরল পুলক জাতি।।
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তাহা বহি যায়।।
দেখ দেখ গোরা গুণ মণি।
করুণায় কো বিধি মিলওল আনি।।
জপি জপায় মধুর নিজ নাম।
গাই গাওয়ায় আপন গুণ গান।।
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কহিছেঁন পেখুলু ঐছন পর রঙ্গ।।
আপহি ভোরি ভুবন কর ভোর।
নিজপর নাহি সবারে দেই কোর।।
ভাসল প্রেমে সকল নরনারী।
গোবিন্দ দাস বলে যাঁউ বলিহারী।।

—০—

সবহুঁ গায়ত সবহুঁ নাচত
সবহুঁ আনন্দে মাতিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতল,
বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া।
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত
চলত কত কত ভাতিয়া।
বদন গদ্ গদ্ মধুর হাসতদ
খসত মতিম পাতিয়া।।
পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হরি
দেওত পুর্ণ প্রেম যাচিয়া।
অরুণ লোচনে বরুণ ঝর তঁহি
এ তিনভুবন ভাসিয়া।।
এ সুখ সায়রে লুবধ জগজন
মুগধ দিন রাতি জাগিয়া।
দাস গোবিন্দ রঙত অনুক্ষণ
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া।।

—০—

বিরহ গীত—

মাধব তুহুঁ রহিল মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল দুকুল কলরব
কানু কনু করি ঝুর।।
যশোমতি নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ বেণু ধেনু সব বিছুরল
বিছুরল নগর বাজার।।

কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই

তরুগণ মলিন সমান।

শারি শুক পীক, ময়ূরী না নাচত,

কোকিল না করতঁহি গান।।

বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব

দশদিশ বিরহ হুতাশ।

সহজে যমুনা জল হোয়ল অধিক

কহতহি গোবিন্দ দাস।।

* *

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পদাবলী গীতসংখ্যা পদ কল্পতরুতে ৪৬০।

তাঁহার জন্ম ১৪৫৯ শকে, অপ্রকট ১৫৩৫ শকে আশ্বিন মাসে শুক্ল প্রতিপদে। তাঁহার পত্নীর নাম মহামায়া, পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম।

শ্রীদেবকীনন্দন দাস

শ্রীদেবকীনন্দন দাসের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কুমারহট্ট বা হালি শহরে বাস করতেন। তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন শ্রীসদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, সেহেতু শ্রীদেবকীনন্দন দাসও ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার ভুক্ত।

বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

ইষ্টদেব বন্দিত শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার যে গুণ অনুপম।।
সর্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে।।
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ।।

শ্রীমনোহর দাস কৃত 'অনুরাগবল্লী'তেও দেখা যায়—

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়।
দেবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়।।
তেঁহো যে করিল বড় বৈষ্ণব বন্দনা।।

শ্রীদেবকীনন্দন দাস ছিলেন বিশেষ পদকর্ত্তা। তিনি বাংলায় বৈষ্ণব-বন্দনা ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় 'বৈষ্ণব-অভিধান' রচনা করেন। তাঁর সুবিখ্যাত বৈষ্ণব-বন্দনাটি হল—

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ।।
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত।।

মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি।।
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ।।
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস।।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।।
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ।।
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি।।
তথাপি মূকের ভাগ্য, মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ-দাস।।
সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমধন লুটে।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়।।

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীভগবান্ আচার্য্য উঃ ২৪ পরগণা জেলার হালিসহর নিবাসী। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য শাখায় গণনা করা হয়। ইনি খঞ্জ ছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৭৪ অনুসারে 'খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্যকে গৌরাঙ্গের কলা বলা হয়।' আচার্য্য ভগবান্ খঞ্জ কলা গৌরস্য কথ্যতে)। শ্রীচৈতন্যশাখা বর্ণনে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ভগবান্ আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া "ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী। শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি।।" (আদি ১০।১৩৬)। ইনি অত্যন্ত উদার ও সরল ছিলেন, ইঁহার ধনাঢ্য পিতা শতানন্দ খাঁ যেমন ভয়ানক বিষয়ী ছিলেন, ইঁহার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য তদ্রূপ মায়াবাদী ছিলেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছিলেন পরম বৈষ্ণব, সুপণ্ডিত ও সখ্যভাবযুক্ত। স্বরূপ দামোদরের সহিত তাঁহার সখ্য ব্যবহার, তিনি ছিলেন গোপ অবতার, একান্তভাবে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ঘরে ভাত সহ বিবিধ ব্যঞ্জন পাক করিয়া একলে মহাপ্রভুকে লইয়া ভোজন করাইতেন। ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত পড়িয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া প্রভুপদে মিলন করাইলে অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ পাইলেন না; কিন্তু যেহেতু ভগবান্ আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেজন্য তিনি বাহ্যে প্রীত্যাভাস দেখাইতেন। গোপালের মুখে বেদান্ত ও ভাষ্য শুনিবার জন্য স্বরূপ দামোদরকে প্রস্তাব দেওয়াতে স্বরূপ প্রেমক্রোধ প্রকাশ করিয়া ভগবান আচার্য্যকে ভৎর্সনা করিলেন এবং মায়াবাদ দোষ বর্ণন ও গর্হণ করিলেন। শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের প্রতি শুদ্ধ বিষ্ণুভজনেচ্ছুর ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বলিতে গিয়া বলিলেন—

> "বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
> সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে।।

মায়াবাদ-বিষয়ে তীব্রতা বর্ণন ও শ্রবণে পতনাশঙ্কা আছে জানাইয়া আরও বলিলেন—

> মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
> মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৯৫-৯৬)

যাঁহার প্রাণধন কৃষ্ণ, এমন যে মহাভাগবত, তিনিও যদি মায়াবাদ-পূর্ণ শারীরক ভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও চিৎ অবনত হইয়া ভক্তিচ্যুত হয়। আচার্য্য লজ্জা ও ভয় পাইয়া গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। অন্য একদিন ভগবান্-আচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখি মাহিতির ভগ্নির নিকট হইতে এক মান সরু অন্ন আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবী ছিলেন বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী। সমগ্র প্রভু ভক্তের মধ্যে কেবল সাড়ে তিনজন শ্রীমতীর গণ যথা-স্বরূপ গোসাঞি, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতি ও অর্দ্ধজন তাঁহার ভগিনী (মাধবী দেবী)। ভগবান্ আচার্য্য প্রভুপ্রিয় অন্যান্য ব্যঞ্জন সহ সেই সরু চাল রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে পরিবেশন করিলে, প্রভু জানিতে চাহিলেন এত সরু তণ্ডুল কোথায় পাওয়া গেল; যখন জানিলেন তাহা মাধবী দেবীর নিকট হইতে ছোট হরিদাসকে দিয়া আনা হইয়াছে, তখনই মহাপ্রভু গৃহে আসিয়া গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, 'আজ হৈতে ছোট হরিদাসে এখানে আসিতে দিবে না।' ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে—

"প্রভু কহে, "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার প্রকৃতি হয়ে মুনেরপি মন।।
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৭, ১১৮, ১২০)

ভগবান্ আচার্য্যের পূর্ব পরিচিত বাংলাদেশ নিবাসী বিপ্রবেশী এক প্রাকৃত কবি মহাপ্রভুর চরিত্র লইয়া নিজ লিখিত এক নাটক মহাপ্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা হইল। মহাপ্রভুর নিয়ম ছিল প্রথমে স্বরূপ দামোদর শুনিয়া অনুমোদন করিলে তবে তিনি শুনিতেন। কারণ যদি তাহাতে 'রসাভাস' বা সিদ্ধান্ত বিরোধী কিছু থাকে তবে তাঁহার মনে ক্রোধ জন্মে। ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ দামোদরকে নাটকটি শুনিতে অনুরোধ করায় কৃষ্ণ তত্ত্ববিৎ শ্রেষ্ঠ অন্তর্যামী আচার্য্য স্বরূপ কর্ত্তৃক ভগবান্ আচার্য্য ভৎর্সিত হইলেন। তথাপি ভগবান্ আচার্য্য দুই তিন দিন আগ্রহ দেখাইতে

থাকিলে কবি নান্দী শ্লোক পড়িয়া তাহার ব্যাখ্যা করিবার পর স্বরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া (১) বিষ্ণুতে জীববুদ্ধি ও (২) ঈশ্বরের দেহ দেহী ভেদ নির্দ্দেশরূপ অপরাধ দেখাইয়া দিলেন। তাহা শুনিয়া সভাসদ্‌গণ চমৎকৃত হইলেন।

ন্যায়শাস্ত্রে ভগবান্ আচার্য্য ''ন্যায়াচায্য'' উপাধি লাভ করেন। অল্প বয়স হইতেই বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহার পিতা নবদ্বীপবাসী মধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। তথাপি পুত্র সংসারের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নীলাচলে উপস্থিত হন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলে পুনরায় তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার দুই পুত্র—রঘুনাথ ও রমানাথ। কিন্তু সংসার বিরক্ত আচার্য্য পুত্র ও পত্নীকে নিজ শ্যালক ও শিষ্যবর্গের নিকট রাখিয়া সর্বক্ষণ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সমীপে অবস্থানের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করেন।

একবার মহাপ্রভু নীলাচলে চটক পর্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন জ্ঞানে চটক পর্বত অভিমুখে দ্রুত দৌড়াইলে কোলাহল করিতে করিতে সকল ভক্তগণ পশ্চাতে ধাবমান্ হইলেন, আর খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্য ধীরে ধীরে চলিয়াছিলেন।

শ্রীকালিদাস

এই সাধুটি শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের এক মহান্ ভক্ত, অতীব নিষ্ঠাবান ভক্তরূপে যাঁহার বৈশিষ্ট্য নিজ ঘনিষ্ঠ পার্ষদগণের মধ্যে, মহাপ্রভু সবিশেষ বর্ণনা করিতেন (চৈঃ চঃ ৩।১৬)। তিনি কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্যকিছু জানিতেন না, এমনকি অন্যের সহিত আচরণকালেও সর্বদা উচ্চারণ করিতেন। তিনি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সর্বকার্য্য করিতেন। তিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর (চৈতন্য মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ পার্ষদগণের মধ্যে একজন) জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন। সুতরাং তিনি উচ্চ বংশীয়। জন্মসূত্রকে সম্মানের দাবীদার না হইয়া, তিনি যত নীচ কুলে জন্ম হউক না কেন গ্রাহ্য না করিয়া সকল বৈষ্ণবকে গুরুজ্ঞান করিতেন। বরাবর তিনি উচ্ছিষ্ট ভোজনে আনন্দ পাইতেন, যদি বা পাওয়া যায় এবং তাহা গোপনে হইলেও। তিনি বঙ্গদেশের প্রায় সকল বৈষ্ণবের বিভিন্ন সময়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। তিনি ছিলেন মহাভাগবত (শুদ্ধতম প্রকৃতির মহান ভক্ত), সরল প্রকৃতির ও উদার স্বভাব। ব্রাহ্মণবংশ জাত অথবা নীচবংশ জাত, এমনকি সামাজিক ভাবে অস্পৃশ্য হইলেও সে যদি বৈষ্ণব হয় কালিদাস তাঁহার নিকট ভাল উপহার লইয়া যাইতেন ও তাহার ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট মাগিতেন। অধিকংশ সময়ে তিনি তাহা সহজে পাইতেন না, কিন্তু নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়া ও গোপনে বৈষ্ণবের অজ্ঞাতসারে পাত্ররূপে ব্যবহৃত পত্র চাটিতেন যদিও তাহা জঞ্জাল পাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়।

তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজনের কার্য্যপ্রণালী বুঝাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার এক দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। ভুমিমালী জাতির (অর্থাৎ ঝাড়ুদার শ্রেণীর) ঝড়ু নামে এক প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার মহান্ বৈষ্ণবত্বের সংবাদ পাইয়া কালিদাস সেই সময়কার শ্রেষ্ঠজাতীয় কিছু আম লইয়া শ্রদ্ধা জানাইতে গেলেন ও সেইগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া নীচু হইয়া প্রণাম জানাইয়াছিলেন, তাহাতে ঝড়ু খুব লজ্জা বোধ করেন ও নিজভাগ্য বিষয়ে আত্মসন্দেহী হইলেন ও তাহা অত্যন্ত খারাপ বিবেচনা করিলেন, কারণ একজন উচ্চবংশীয় মানুষ নত হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিবেন! কালিদাস জানাইলেন যে ঝড়ু এক মহান্ বৈষ্ণব; সমাজের নেতৃস্থানীয় যে ব্রাহ্মণ তাহাদের নিকট হইতেও নম্রতা সহকারে

সম্মান পাইবার যোগ্য। এইরূপ কিছু কথোপকথনের পর (যে নামে তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত সেই) ঝড়ু ঠাকুর অতীব বিনয় সহকারে বলিলেন যে কালিদাসের মত উচ্চ শ্রেণীর অতিথিকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা জানাইতে একান্ত অযোগ্য এবং তিনি এমন একজন অতিথির আতিথেয়তা করিতে স্থানীয় কোনও এক ব্রাহ্মণের গৃহে ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করেন, যাহাতে তিনি নিজে এমন এক যোগ্য অতিথিকে এমতাবস্থায় যত দূর সম্ভব অভ্যর্থনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারেন। কালিদাস উত্তরে, বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; যে আমি একজন পারমার্থিক ভাবে ভগ্নচিত্ত ব্যক্তি, যে দেহ আমার মত পাপীকেও পবিত্র করিতে পারে সেই পবিত্র দেহ দর্শন করিয়া পারমার্থিক সুকৃতি লাভ করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার সাধুজনোচিত অবয়ব দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়াছি এবং আমার জীবনটাই ভিতরে ভিতরে বেশ পরিমাণ মত পবিত্র বোধ করিতেছে, কারণ বৈষ্ণবের দর্শন পাপীকেও পবিত্র করে, কিন্তু গঙ্গার স্পর্শ হইলে পবিত্র হওয়া যায়, শুধু দর্শন দ্বারা নহে। একটি জিনিষ আমি সাহস করিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি কৃপা করিয়া আপনার পবিত্র পদধূলি আমার মস্তকে প্রদান করুন।" তাহাতে ঝড়ুঠাকুর ভয়ে কম্পিত হইলেন এই চিন্তা করিয়া যে এমন একটি প্রস্তাব শ্রবণ করাও তাঁহার পক্ষে পাপজনক ইহাতে তাহাকে নরকবাস করিতে হইবে। করদ্বয় জোড় করিয়া তিনি বলিলেন, "হে দয়াময় আপনি অসঙ্গত কথা বলিবেন না, তাহা আমার জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমি এমনই এক নীচ কুলজাত আর আপনি উচ্চ বংশ হইতে উদ্ভুত। এমন এক চিন্তাও আমাকে আরও নীচে নামাইয়া দিতেছে।" তখন কালিদাস, সেই সাধু ভক্ত, কিছু শ্লোক পাঠ করিলেন যাহাতে প্রকৃত ভক্তের উচ্চ গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। হরিভক্তি-বিলাসে এক শ্লোকে বলা হইয়াছে, "চারিবেদে পারঙ্গত হইয়াও সে আমার প্রিয় নহে, যদি সে আমাতে ভক্তিমান না হয়, কিন্তু শ্বপচ বা চণ্ডালও আমার অতিপ্রিয় যদি সে ভক্ত হয়। তাহার নিবেদিত দ্রব্য আমার গ্রহণযোগ্য এবং সে আমারই মত পূজ্য।" শ্রীপ্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৭-৯-১০) "যে শ্বপচ ভগবানে ভক্তিমান, নিজ মন, বাক্য, কর্ম, সম্পদ এমনকি নিজ জীবন তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছে সে দ্বাদশ গুণাবলী ভূষিত কোন এক

ব্রাহ্মণ হইলেও যেহেতু নিজ উচ্চ বংশের গর্বে গর্বিত, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" পুনরায় মাতা দেবহুতি ভগবানের অবতার কপিলদেবকে বলেনঃ "যে শ্বপচের জিহ্বা তোমার নাম উচ্চারণ করে সে পরম গৌরবান্বিত। তাহার মত লোকেরা যাহারা তোমার নাম উচ্চারণ করে তাহারা পবিত্র এবং সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ও হোমযজ্ঞ, পবিত্র নদীতে স্নান ও বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন; তাহারা পূজ্য-স্থানীয়।" এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ঝড়ু ঠাকুর বলিলেনঃ "শাস্ত্র সকল এই সমস্ত উক্তি করিয়াছে তাহা সত্য, যথা যাহাদের কৃষ্ণে ভক্তি আছে তাহারা নীচ নহে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, একদিকে আমার নীচ জন্ম, অন্যদিকে আমি কৃষ্ণভক্তি বিহীন। সুতরাং বৈষ্ণবগণের যে যোগ্যতা আছে আমার তাহা নাই। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া এমন কথা আর উচ্চারণ করিবেন না; কারণ একে আমি নীচ, অতি মন্দ এবং আপনার মত মহাত্মার মুখ হইতে এই সমস্ত কথা উচ্চারিত হইলে আমাকে আরও দ্রুত নরকে নিক্ষেপ করিবে। সুতরাং এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে অনুগ্রহ করিয়া বিরত হউন।"

তখন কালিদাস ঠাকুরের প্রতি নত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। ঠাকুর প্রতি প্রণাম জানাইয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গদান করিয়া বিদায় জানাইলেন। অতঃপর তিনি নিজ কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর কালিদাস নিকটবর্ত্তী স্থানে নিজেকে (লুক্কায়িত) রাখিলেন ও কিছু সময় পরে ফিরিয়া আসিয়া পথে ঠাকুরের পদচিহ্নিত স্থানের ধূলায় নিজেকে সিঞ্চিত করিলেন। ইত্যবসরে ঠাকুর তাঁহার জন্য রেখে যাওয়া আম মনে মনে নিবেদন করিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী সেইগুলিকে খাওয়ার মত তৈয়ার করিয়া এক কদলীবৃক্ষের খোলায় করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। ঠাকুর সেইগুলি ভক্ষণ করিলেন এবং অষ্টি ও বল্কল সেই খোলায় রাখিলেন সেইগুলি হইতে রসাল অংশ গ্রহণ করিয়া। তাঁহার স্ত্রীও তাহাই করিলেন; অতঃপর খাওয়ার পর আমের অষ্টি ও বল্কল সেই খোলায় ভরিয়া গৃহের বাহিরে জঞ্জাল ফেলিবার স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কালিদাস লুকানো স্থান হইতে আসিয়া সেই সমস্ত অষ্টি ও বল্কলগুলি সেই স্থান হইতে সংগ্রহ করিলেন। যখন তিনি মুখ দিয়া চূষণ করিতেছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ তাঁহার মধ্যে জাগরিত হইল ও নিজেকে পবিত্রীকৃত বোধ হইল। এইভাবে কালিদাস বঙ্গদেশের অধিকাংশ বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট খাইলেন শাস্ত্রের এই নির্দেশ

মানিয়া যে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, বৈষ্ণব পদধূলি ও পদধৌত জল মানুষকে ভগবানে ভক্তি যাজনে সহায়তা করে।

যখন তিনি নীলাচলে (পুরীতে) আসিলেন ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন ও ভক্তি নিবেদন করিতে, তখন প্রভু নিজ বিচক্ষণতা বলে ভালভাবেই জানিতে পারিলেন কালিদাসের স্বভাব, তাহাতে তিনি তুষ্ট হইলেন। প্রত্যহ মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে যাইতেন, তখন কালিদাস এক জলপাত্র লইয়া তাঁহার পিছন পিছন যাইতেন, মহাপ্রভু যথারীতি দর্শনের পূর্বে সেই জল পাত্র হইতে নিজ পদধৌত করিতেন একটি গর্ত্তের উপরে—মন্দির চত্বরের বাহিরে মহাপ্রভু নিজসেবক গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন কেহ যেন তাঁহার পাদধৌত জল গ্রহণ না করে। সেই নিকটতম পার্ষদ অবশ্য এক কৌশল করিয়া তাহা লইতেন। একদিন মহাপ্রভু যখন পাদপ্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন কালিদাস নিজ দুই হস্ত যুক্ত করিয়া গর্ত্তের মত করিয়া পদতলে ধরিলেন। বিনা বাধায় সেই জল তিনি একবার, দুইবার ও তিনবার পান করিলেন, তাহার পর প্রভু তাঁহাকে আর লইতে নিষেধ করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা এতক্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। সর্বজ্ঞ প্রভু সকল বৈষ্ণবের হৃদয় অবগত ছিলেন। কালিদাসের এই সুকৃতি মহাপ্রভুকে তুষ্ট করিল। যে সুযোগ অন্যে পায় নাই কালিদাস তাহা লাভ করিল।

যখন মহাপ্রভু মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিলেন কালিদাস অবশিষ্টের আশায় দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। প্রভুর এক ইশারায় গোবিন্দ তাহা প্রদান করিলেন। ইহাই হইতেছে বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট সেবনের মহিমা যাহা দ্বারা কালিদাস স্বয়ং মহাপ্রভুর অবশিষ্ট লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সাধু কালিদাসের এই মহাসৌভাগ্য স্মরণ করিয়া, সাধু গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমাদের মত লোকের জন্য, ভগবানে শুদ্ধাভক্তির মাধ্যমে যাহারা পরমমঙ্গল লাভেচ্ছু লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণবগণের আহারের পর অবশেষ অংশ ভক্ষণ কর, তবেই তোমরা বহু আকাঙ্খিত ভগবানের কৃপালাভে সক্ষম হইবে। কৃষ্ণের অবশেষের নাম মহাপ্রসাদ, আর বৈষ্ণব সাধুগণের অবশেষের নাম মহা-মহাপ্রসাদ। বৈষ্ণবের পদধূলি, বৈষ্ণব পাদ প্রক্ষালন জল

বৈষ্ণবের ভুক্ত শেষ—এই তিনটি ভক্তি প্রদান করিতে অতীব শক্তিশালী। এইগুলির আন্তরিক সেবায় মানুষ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে এবং শাস্ত্রসকল বার বার ইহার উচ্চপ্রশংসা করিয়াছে। সুতরাং ভক্তির সাধকগণকে বার বার অনুরোধ করা যাইতেছে গভীর বিশ্বাস লইয়া এই তিনটি অভ্যাস করিতে; এই তিনটি হইতে নিরপরাধে কৃষ্ণনাম লব্ধ হয়; একমাত্র যাহা হইতে সর্বোচ্চ পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়। আর এই সাধু কালিদাস এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপ। নীলাচল হইতেই বাংলায় অবস্থিত কালিদাসকে এমন গভীরভাবে কৃপা করিয়াছিলেন যে তাহা অন্য কেহ জানিতে পারে নাই।

শ্রীঝড়ু ঠাকুর

শ্রীঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালী (হড্ডী বা হাঁড়ি) কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীপাট শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থলী কৃষ্ণপুর, যাহা (সপ্তগ্রাম, যথা—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর) হুগলী জেলার এই সপ্তগ্রামের অন্তর্গত-সেখান হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে এক মাইল পশ্চিমে 'ভেদো' বা ভদোয়াগ্রামে। শ্রীকালিদাস ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর এক বিশিষ্ট ভক্ত, তিনি কায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন। দেবানন্দপুর—শ্রীপাটের ডাকঘর। শ্রীকালিদাসের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ প্রথমে শঙ্খনগরে ছিলেন, অধুনা সেই বিগ্রহ ত্রিবেণীতে জনৈক রামায়েৎ দ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীকালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয় বলা হইয়াছে 'পুলিন্দ কন্যা মল্লী'। 'পুলিন্দ তনয়া মল্লী কালিদাসেঽনাভবৎ'—গৌঃ গঃ ১৯০।

পরবর্ত্তী বর্ষে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত রঘুনাথদাসের এই জ্ঞাতি খুড়া শ্রীকালিদাস আসিয়াছিলেন।

"তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালদাস রাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তোঁহো নাহি জানে আন।।
মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেত' চালায় ব্যবহার।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।৫-৬)

অর্থাৎ কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত স্বীয় ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া কালিদাস স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুর যে প্রকার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত বলা যায়। বৈষ্ণবে বিশ্বাসী ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ অতীব প্রসন্ন হন এবং তাহাকে ভগবানের অদেয় কিছু থাকে না। গৌড়দেশে অবস্থিতি কালে কালিদাস উচ্চ ও নিম্নবর্ণের সমস্ত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন। বৈষ্ণবগণ যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও সকলের পূজ্য। বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি করিলে নরকগতি লাভ হয়। শ্রীকালিদাস কোন উত্তমবস্তু লইয়া ভক্তগণের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহাদের সেবার জন্য প্রদান করিতেন এবং ভক্তগণের আহারের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ

প্রার্থনা করিতেন। যাঁহারা নিজ উচ্ছিষ্ট দিতেন না, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট তিনি লুকাইয়া গ্রহণ করিতেন। আহারের পর ভক্তগণ যেখানে পাত্রাদি ফেলিয়া দিতেন সেখানে গোপনে গোপনে যাইয়া তিনি সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ চাটিয়া খাইতেন। ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালী কুলে আবির্ভূত হইলেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। একদিন কালিদাস তাঁহার গৃহে যাইয়া সস্ত্রীক তাঁহাদিগকে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া সুমিষ্ট আম্রফল ভেট প্রদান করিলেন। ঝড়ুঠাকুর কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ অতিথি জ্ঞানে বহু সম্মানপূর্বক অতি দৈন্যভরে বলিলেন,—'আমি অতি নীচ জাতি; কিভাবে আপনার সেবা করিব? যদি আজ্ঞা দেন ব্রাহ্মণের ঘরে রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেই। যেখানে আপনি যদি কৃপা-পূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন, তবে আমি কৃতার্থ হইব।' ঝড়ু ঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত সদৈন্য বাক্য শুনিয়া কালিদাস বলিলেন,—'অতীব পতিত অধম আমি। বহু সৌভাগ্যফলে আপনার দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি কৃপাপূর্বক আপনার পদধূলি আমার মস্তকে অর্পণ করুন।' তাহা শুনিয়া ঝড়ুঠাকুর আরও সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইলে কালিদাস (ইতিহাস সমুচ্চয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া) বলিলেন,—'চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই 'ভক্ত' হয়, এরূপ নহে। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র; ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।' পুনরায় ভাঃ ৭।৯।৯ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, ''কৃষ্ণ পাদপদ্ম বিমুখ দ্বাদশ গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভুত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি; কেননা সেই শ্বপচকুলোদ্ভুত ভক্ত স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।' পুনশ্চ ভাঃ ৩।৩৩।৮ শ্লোকোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া জানাইলেন, 'হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।'

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় ১৬।২৮-২৯ শ্লোকের অনুভাষ্যে মহাভারত বনপর্বের ১৮০, ২১১ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্বের ১৬৩ অঃ, ভাগবতের ৪।২১।১২, ৭।১১।৩৫, পাদ্মে শ্লোক সকল, গারুড়ের শ্লোক প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণতা নিত্য অনুস্যুত জানা যায়। অতএব নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তিমান্

হইলে আর তাঁহার নীচ জাতিত্ব থাকিতে পারে না। 'বৈষ্ণব' নহি—ইহা ঝড়ু ঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত উদারতা এবং আপনার নিরভিমানিত্ব—জ্ঞাপকমাত্র, 'আমা-ব্যতীত অন্য সমুদয় কৃষ্ণভক্তেরই শাস্ত্রীয় সত্যানুসারে উত্তমাধিকার; আর কেবলমাত্র আমিই ভক্তিহীন এবং নীচকুলোদ্ভুত; আমার উচ্চাধিকার লাভের শক্তি নাই' ইত্যাদি ভক্তোচিত দৈন্যোক্তিই বাস্তবিক দেহাত্মবুদ্ধিমুক্ত মহাভাগবতগণের স্বভাব।

কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে ঝড়ুঠাকুর তাঁহার পশ্চাতে কিছুদূর অনুগমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালিদাস সেই সুযোগে ঝড়ু ঠাকুরের চরণচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়িয়াছে, সেখান হইতে ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ লালসায় কালিদাস একটি স্থানে নিজেকে গোপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঝড়ুঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্ত কালিদাসের নিবেদিত আম্রফল কলার ডোঙ্গায় রাখিয়া মনে মনে কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। ঝড়ু ঠাকুরের পত্নী কৃষ্ণের নিকট অর্পিত আম্রপ্রসাদ ডোঙ্গা হইতে উঠাইয়া পতিকে দিলেন। ঝড়ু ঠাকুর পরম সন্তোষে আম্রফলটি চুষিয়া আঠিটি ডোঙ্গায় রাখিযা দিলেন। সতী সাধ্বী বৈষ্ণব স্ত্রী পতির উচ্ছিষ্ট সম্মান করিলেন, আর আমের অবধি ও চোকলা ডোঙ্গাতে রাখিয়া উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। সঙ্গোপনে অবস্থিত কালিদাস উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে ডোঙ্গাটি উঠাইয়া আমের আঠি, চোকলা, এমনটি খোলটিও চুষিয়া খাইলেন। বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে করিতে কালিদাস প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িলেন।

'তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা লাজ।
যাহা হইতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ।।
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হইলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান'।।
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত শেষ—এই তিন সাধনের বল।।
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।

তাতে বার বার কহি, শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন সেবন।।
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস।।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।৫৮-৬৩)

গৌড়ভক্তগণ সহ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন ভক্ত কালিদাস। মহাপ্রভু প্রতিদিন জগন্নাথ-দর্শনে যাইবার কালে সিংহদ্বারের উত্তর কপাটের অন্তকালে বাইশ পহাচের নীচে গোবিন্দ বাহিত কমণ্ডলু হইতে জল দ্বারা যখন পাদ প্রক্ষালন করিতেন, সেই সময় কালিদাস মহাপ্রভুর সম্মুখেই এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পান করিলে মহাপ্রভু পুনরায় পাদোদক গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কঠোর নির্দ্দেশ ছিল তাঁহার পদজল কেহ যেন স্পর্শ না করে। কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কৌশলে তাহা গ্রহণ করিতেন, অন্য কেহ গ্রহণে সাহসী হইত না। সর্বান্তর্যামী মহাপ্রভু কালিদাসের বৈষ্ণব প্রীতির কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে মহাকৃপা করিলেন।

"সর্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস, জানেন অন্তর।।
সেই গুণ লইয়া প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইল।।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৪৮-৪৯)

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনান্তে কাশী মিশ্র ভবনে নিজগৃহ আগমন করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেন। সেই সময় মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণের জন্য কালিদাস বহির্দ্বারে বসিয়া আছে, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে ইশারা করিলে গোবিন্দ কালিদাসকে মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র দিলেন।

"বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণে এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৭)

শ্রীবিজলী খাঁন (পাঠান বৈষ্ণব)

জাতিতে পাঠান মুসলমান হইলেও শ্রীবিজলী খাঁন মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। সঙ্গত কারণেই তাঁহাকে মহাপ্রভুর সম-সাময়িক বলা যাইতে পারে। তাঁহার পিতা রাজার ন্যায় ধনী ছিলেন।

রথযাত্রা দর্শনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডের বনপথে যে বৎসর বৃন্দাবন যাত্রা করেন, সে সময় শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁহার সঙ্গে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও এক ভৃত্য ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া ছিলেন। বৃন্দাবন যাইবার পথে তিনি অক্রূর ঘাটে আসিয়া যমুনায় ঝাঁপ দেন ও বহুক্ষণ ডুবিয়া থাকেন, যিনি বৃন্দাবনে মহাপ্রভুকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন সেই রাজপুত বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস তাহা দেখিয়া আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠেন, তাহা শুনিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে জল হইতে উঠাইলেন। মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডলে দ্বাদশবন ভ্রমণ করিবার কালে তাঁহার প্রেমাবেশ লক্ষগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মহাপ্রভুর ঐ প্রকার প্রেমবিকার দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভীত হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে মাঘ মাসে মকর পঞ্চদশী পূর্ণিমায় স্নানযোগের কথা বলিয়া মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে গঙ্গাতীর পথে ‘সোরোক্ষেত্র’ (মথুরা হইতে সর্ব নিকটবর্ত্তী গঙ্গা তীরেই ‘সোরোক্ষত্র’) হইয়া প্রয়াগে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীর পথবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। এই প্রস্তাব মহাপ্রভুকে দেওয়াতে যদিও বৃন্দাবন ত্যাগে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি ভক্ত-ইছা পূরণ করিবার জন্য মধুর-বাক্যে বলিলেন ‘তোমরা আমাকে বৃন্দাবন দর্শন করাইয়াছ, তোমাদের ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না; যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহাই আমি করিব। যাইবার কালে সঙ্গিগণের পথ ভ্রান্তি দেখিয়া সকলকে লইয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন। নিকটেই গাভীগণ চরিতেছে দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলা স্মরণ হইল। হঠাৎ এক বংশীধ্বনি শুনিয়াই তাঁহার প্রেমমূর্চ্ছা হয়। অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। এমন সময় দশজন অশ্বারোহী পাঠান আসিয়া পড়িল, তাহারা ঘোড়া হইতে নীচে নামিয়া বিচার করিল—এই সন্ন্যাসীর নিকট অনেক সুবর্ণ ধন ছিল, এই চারিজন (কৃষ্ণদাস রাজপুত, মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য সনোড়িয়া বিপ্র, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গি-ব্রাহ্মণ) দস্যু ইঁহাকে ধুতুরা

খাওয়াইয়া মারিয়া সব ধন লুট করিয়াছে। তিনি চারিজনকে বান্ধিয়া মারিতে গেলে রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণ ভীত না হইয়া উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করিযা সেই অশ্বারোহীগণের সর্দ্ধার পাঠান বিজলী খাঁনকে বুঝাইয়া বলিলেন যে—তিনি মাথুর ব্রাহ্মণ, যে যতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি তাঁহার গুরু, ব্যাধির দরুণ যতি কখনও মূর্চ্ছিত হন, আবার কখনও সুস্থ হন; তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেই যতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে; তাঁহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত সত্য জানা যাইবে। পাঠান বলিল তোমরা দুইজন মাথুর ব্রাহ্মণ তাহা না হয় কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, তাহা হইলে এই দুইজন গৌড়ীয়া ভয়ে কাঁপিতেছে কেন, নিশ্চয়ই ইহারা দোষী হইবে। রাজপুত কৃষ্ণদাস বিপদ বুঝিয়া পাঠানকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—'আমার ঘর এই গ্রামে, নিকটেই আমার দুইশত সৈন্য আছে, একশত কামান আছে, এখনই চিৎকার করিলে তাহারা আসিয়া পড়িবে, তোমাদের সব লুটিয়া লইবে, গৌড়ীয়ারা বাটপাড়, না তোমরা বাটপাড়, তীর্থবাসীকে লুট করাই তোমাদের কাজ।' ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে তিনি মহা প্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর হুঙ্কার শুনিয়া ও অদ্ভূত নৃত্য দেখিয়া পাঠানগণ ভয় পাইয়া চারিজনকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মহাপ্রভুকে নিজ জনের বন্ধন দেখিতে হয় নাই। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুকে আশ্বস্ত করিয়া বসাইলে পাঠান মুসলমানগণকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। পাঠানগণ মহাপ্রভুর অপূর্ব শ্রীমূর্ত্তি ও প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সন্দেহের কথা জানাইয়া বলিলেন—চারিজন ঠগ মহাপ্রভুকে ধুতরা খাওয়াইয়া পাগল করিয়া সব লুটিয়া লইয়াছে। মহাপ্রভু তাহাদিগকে বুঝাইলেন—তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার নিকট কোন ধন নাই, চারিজন তাঁহার সঙ্গী, মৃগী ব্যাধিতে কখনও তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন, চারিজন তাহাকে রক্ষা ও পালন করেন। পাঠানগণের মধ্যে কালবস্ত্র পরিহিত একজন নিজেকে পীর বলিয়া পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর দর্শনে প্রীত হইয়া কিছু শাস্ত্র বিচার করিলেন। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্রানুযায়ী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন মহাপ্রভুও তাঁহাদেরই শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া প্রথমে ভগবানের সবিশেষত্ব, পরে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বিচারাদি সব খণ্ডন করিয়া ভগবৎপ্রেমই যে জীবের সর্ব্বোত্তম, তাহা স্থাপন করিলেন। মহাপ্রভুকে

দেখিয়াই পাঠানগণ প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সাধ্য-সাধন বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাঁহারা আরও আকৃষ্ট হইলেন। শাস্ত্র বিচারক পাঠানের জিহ্বায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৃষ্ণনামের উদয় হইল। মহাপ্রভু পাঠান পীরের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তাঁহার কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হইয়াছে, তিনি পবিত্র। মহাপ্রভু সকলকে কৃষ্ণনাম করিতে বলিলে সকলেই কৃষ্ণনাম করিলেন। শাস্ত্রবিচারক পাঠানকে কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন 'রামদাস'। রাজকুমার বিজলী খাঁন ভৃত্য-পাঠানের সৌভাগ্য দেখিয়া নিজেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকেও কৃপা করিলেন।

তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
সেই ত' পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা।।
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।।
সেই বিজলী খাঁন হইল 'মহাভাগবত'।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২১০-২১২)

শ্রীমীনকেতন রামদাস

শ্রীমীনকেতন রামদাসের মাতা-পিতা, আবির্ভাব সাল ও স্থান বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ৬৮ অনুসারে "দুই সহোদর নিশঠ ও উন্মুখ এই নিত্যানন্দ-বূৎহেতে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে দুই জন মীনকতন ও রামদাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" (অমূং প্রাবিশতাং কার্যাৎ সহজৌ নিশধৌল্মুকৌ। মীনকেতন রামাদিব্যূহঃ সঙ্কষর্ণোহপরঃ।।" অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা মীনকেতন ও রামদাস দুইজন পৃথক্ ব্যক্তিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁহার রচিত 'ভক্তিরত্নাকরে' একই ব্যক্তির নাম যে মীনকেতন রামদাস তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অনুমান হয় শ্রীবলদেব -লীলায় যাঁহারা নিশঠ ও উন্মুখ তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দ লীলায় মীনকেতন রামদাস নামে একই ব্যক্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন।

"অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৬২)

একবার শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ঝামটপুর গৃহে অহোরাত্র সংকীর্তনে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমীনকেতন রামদাস আগমন করেন। তিনি ছিলেন মহাভাগবত (বা পরমহংসাবস্থা); সকল বৈষ্ণবগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। কেহ নমস্কার করিলে তিনি কাহারও উপর চড়িতেন, কাহাকেও বংশী মারেন, আবার কাহাকেও বা চাপড় মারেন। তাঁহার চক্ষে সর্বদাই অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাহাতে সকলের মনও আর্দ্র ও নয়নসিক্ত হইত। প্রেমোন্মত্তাবস্থায় "নিত্যানন্দের" নাম লইয়া হুঙ্কার করিতে থাকিলে সকলের হৃদয় দিব্যানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর গৃহে গুণার্ণব মিশ্র নামে একজন বিপ্র শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতেন। তিনি ভগবদ্ বিগ্রহের শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিলেও ভগবদ্ভক্তের মর্য্যাদা-দানে আগ্রহান্বিত ছিলেন না। শ্রীমূর্ত্তিসেবক এই মিশ্র অঙ্গনে বসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের দাসকে সম্ভাষণ না করায় শ্রীমীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া

বলিলেন যে, 'এই গুণার্ণব মিশ্র-দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূত।' তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ নৈমিষ্যারণ্য-ক্ষেত্রে বলদেবকে দেখিয়া রোমহর্ষণ সূত ব্যাস-গাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভাষণ করেন নাই, গুণার্নব মিশ্রও সেইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। গুণার্ণব মিশ্রের মনে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি শ্রীমীনকেতনের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই কার্য্যে শ্রীমীনকেতনকে অভিমানী বলিব। ভক্তগণ দোষারোপ করেন না। এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার মীনকেতনের সহিত কিছু বাদানুবাদ হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না। সেই জন্য কবিরাজ গোস্বামী ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, ''দুই ভাই এক অনু সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্বনাশ।।'' 'চৈতন্য নিত্যানন্দের একজনকে মানিতেছ ও অন্যজনকে মানিতেছ না,—ইহাই তোমার পাষণ্ডতা ও ভণ্ডতা।' মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তের অপমানহেতু গৌরনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্বনাশ ও অধঃপতন হইল। মীনকেতন রামদাসের পক্ষ হইয়া ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করায় এই টুকুমাত্র গুণে সন্তুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু কবিরাজ গোস্বামীকে স্বপ্নে নিজের স্বরূপ দর্শন ও শ্রীবৃন্দাবনধাম বাস প্রদান করিলেন।

খেতুরী উৎসবে শ্রীনিত্যনন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিত নিত্যানন্দ পার্ষদগণের যাঁহারা গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মীনকেতন রামদাস অন্যতম। শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন, রামদাসাদি বৈষ্ণবগণের দর্শনে ত্রিভুবন পবিত্র হয়।

শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী

"সেবায় অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ।।
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর।।
সবার সম্মান কর্ত্তা , করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত।।
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস।।
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য।।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে কর প্রকাশ।
তাঁ'র, প্রিয় শিষ্য ইঁহ—পণ্ডিত হরিদাস।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৮।৫৪-৫৭, ৫৯-৬০

শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর গোস্বামীর শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষিতা শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনুভাষ্যে জানাইয়াছেন যে অষ্টসখীর অন্যতমা 'সুদেবী সখী' শ্রীগৌরাবতারে শ্রীঅনন্ত আচার্য্য (গৌ- গঃ দীঃ ১৬৫)। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীগঙ্গামাতা মঠের গুরু পরম্পরায় শ্রীঅনন্তাচার্য্য 'বিনোদ মঞ্জরী' এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীহরি দাস পণ্ডিত গোস্বামী—যাঁহার অন্যনাম "শ্রীরঘু গোপাল"—শ্রীরাসমঞ্জরী নামে কথিত হইয়াছেন। শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য—(১) শ্রীল লক্ষ্মীপ্রিয়া (গঙ্গামাতার মাতুলানী), (২) শ্রীগঙ্গামাতা (পুঁটিয়ার রাজকন্যা)।

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' সংক্ষিপ্তভাবে ও শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'শ্রীক্ষেত্র' কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর পবিত্র জীবন-চরিত বিষয়ে কিছু জানা যায়।

রাজশাহী জেলার (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) পুঁটিয়ার রাজা শ্রীনরেশ নারায়ণের একমাত্র কন্যা শচীদেবী (শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর পিতৃদত্ত নাম। আ-শৈশব তিনি পরমা ভক্তি পরায়ণা ও সংসার বিরক্ত। তাঁহার মাতা-পিতা কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতেন তিনি জানাইয়া দেন মরণশীল কোন ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না। পিতা মাতা ইহাতে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার (শচীদেবীর) মাতা স্বধামগতা হইলে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে ও পরে বৃন্দাবন ধামে আসিলেন। সেখানে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে গোস্বামী ঠাকুর তাঁহাকে রাজকন্যা জানিয়া প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেও পরে শচীদেবীর বৈরাগ্য ও ভজনার্ত্তি দেখিয়া চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে বুধবার গোবিন্দজীর মন্দিরে অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন। তিনি মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করতঃ তীব্র বৈরাগ্যের সহিত জীবন যাপন করিতেন। শচীদেবী সংবৎসরকাল বৃন্দাবনে কাটাইবার পর, অতঃপর শ্রীগুরুদেবের আদেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠা গুরুভগ্নী স্নিগ্ধা ভজনপরায়ণা পরমাবৈষ্ণবী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী (যিনি প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন) তাঁহার সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিয়া ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন।

কয়েক বৎসর রাধাকুণ্ডে ভজনের পর তিনি ভজনপ্রৌঢ়া হন। গুরুদেব শ্রীহরিদাস গোস্বামী শচীদেবীকে শ্রীপুরীধামে প্রেরণ করেন ও তথাকার শ্রীসার্বভৌমের গৃহে অবস্থান করতঃ ভজন করিতে বলেন। সার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহটিতে বহুদিন লোকজন না থাকায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। তথায় কেবলমাত্র বাসুদেব সার্বভৌম সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম বিরাজিত ছিলেন। সেখানে তিনি শ্রদ্ধালু জনের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন ও ভজন করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। প্রসঙ্গত শ্রীশচীদেবী গৃহে অবস্থান কালেই একাগ্রভাবে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন, পরে রাধাকুণ্ডে বৈষ্ণবগণের সহিত ভাগবত আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রপাঠ পারঙ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিপ্লুত অপূর্ব্ব ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ ও তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া বহু ভক্তের সমাবেশ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার যশঃ ছড়াইয়া পড়িলে পুরীর তদনীন্তন

রাজা শ্রীমুকুন্দদেবও তাঁহার নিকট ভাগবত শ্রবণের জন্য আসিয়া যোগ দিলেন ও তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে তাঁহাকে কিছু অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ঠিক সেই রাত্রেই রাজা স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন, শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানটি শচীকে অর্পণ করিতে। (শ্বেতগঙ্গা— উৎকল খণ্ডের বর্ণনানুসারে জানা যায়—ত্রেতাযুগে 'শ্বেত' নামে একজন শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের ন্যায় তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিন রাজা প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজার সময়ে উপস্থিত হইয়া দেবতাগণ প্রদত্ত সহস্র সহস্র দিব্য উপহারসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে ছিলেন, তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির তুচ্ছদ্রব্য সমূহ কি জগন্নাথদেব গ্রহণ করিবেন? রাজার হৃদয়ে আর্ত্তি ও দৈন্যভাবযুক্ত চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি দেখিতে পাইলেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ শ্রীজগন্নাথদেবকে দিতেছেন এবং শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবিজয়বিগ্রহগণ পরমানন্দে উহা গ্রহণ করিতেছেন। রাজা তদ্দর্শনে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। শ্বেতরাজা বহুকাল নিষ্ঠার সহিত শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের বরে রাজা অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী মুক্তিক্ষেত্রে মৎস্য-মাধবের সম্মুখে 'শ্বেত-মাধব' নামে বিখ্যাত হইলেন। শ্বেতমাধবের নামানুসারে এই দীর্ঘিকার নাম হয় 'শ্বেতগঙ্গা'। শ্বেতগঙ্গায় ভক্ত 'শ্বেতমাধব', 'ভগবান মৎস্যমাধব' সরোবরের তীরে নবগ্রহের মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন) পরদিন প্রাতেঃ রাজা পরমোল্লাসে শচীদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশের কথা জানাইলেন। শচীদেবী নিতান্ত বিষয় বিরক্ত হইলেও গুরুর আদেশ স্মরণ করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য উক্তস্থান গ্রহণ করিলেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। যেখানে ভগবানে যথার্থ প্রীতি ও ভগবদ্ সেবাতে স্বার্থ-বোধ, সেখানে কোনও প্রকার কষ্টই কষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না, বরং সেবার সুযোগ উপস্থিত হইলে উহাতে ভক্তের আনন্দই হয়।

একবার কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হইল, শচীদেবীর সেই গঙ্গাস্নানের জন্য ইচ্ছা জাগিল। কিন্তু গুরুদেবের নির্দ্দেশ শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করা। শ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করে তিনি গঙ্গাস্নানে যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীশচীকে স্বপ্নে বলিলেন

—"শচী, কোন চিন্তা করিবে না, যে দিন বারুণী স্নান হবে, সেদিন তুমি শ্বেত গঙ্গায় স্নান কর। গঙ্গাদেবী তোমার সঙ্গ প্রার্থিনী হইয়া শ্বেতগঙ্গায় আসিবে।" তিনি যাইতে না চাহিলেও শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শচীদেবী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সকলের অলক্ষে মধ্যরাত্রিতে শ্বেতগঙ্গার অবগাহন স্নানের জন্য ডুব দিতেই সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদেবী প্রকটিত হইয়া স্রোতের দ্বারা ভাসাইয়া শচীদেবীকে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। শচীদেবী সাক্ষাদ্ভাবে গঙ্গা ও গঙ্গায় স্নানকারী ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণকে দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন, 'চতুর্দ্দিকে স্নান কোলাহল হইতেছে, তিনি তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া স্নান করিতেছেন।' কোলাহল শুনিয়া মন্দিরের দ্বাররক্ষকগণ জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা মন্দিরাভ্যন্তরে কোলাহল শব্দ শুনিয়া পরিছাগণকে খবর দিলেন। পরিছাগণ মহারাজকে জানাইলে মহারাজ মন্দির খুলিবার জন্য আদেশ দিলেন। মন্দিরের দ্বার উন্মোচন হইলে দেখা গেল মন্দিরাভ্যন্তরে লোকজন কোলাহল কিছুই নাই, একা শচীদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। জগন্নাথের সেবকগণ প্রথমে বিষয়টা বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীজগন্নাথের ধনরত্ন অপহরণের জন্য শচীদেবী মন্দিরে লুক্কায়িত ভাবে ছিলেন, এখন সকলের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছেন। মহাভাগবতের প্রতি সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিন্দা করিতে থাকিলে তাঁহারা বহুপ্রকার রোগশোকের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। শ্রীজগন্নাথের সেবা পরিচালনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। শ্রীজগন্নাথদেব রাজা মুকুন্দদেবকে স্বপ্নে জানাইয়া বলিলেন,—'তিনিই শচীদেবীর শুদ্ধাভক্তিতে বশীভূত হইয়া নিজ পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃত করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়াছিলেন। শচীদেবীর নিকট ক্ষমা চাহিলে এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে তাহাদের সমস্ত অপরাধ বিদূরিত হইতে পারিবে।' রাজা মুকুন্দদেব পরিছা প্রভৃতি সমস্ত জগন্নাথের সেবকগণ শচীদেবীর নিকট উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনান্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদবধি শচীদেবী 'গঙ্গামাতা' নামে প্রসিদ্ধা হইলেন এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থানটি 'গঙ্গামাতা মঠ' নামে সাধারণ্যে প্রচারিত হইল।

রাজা মুকুন্দদেব ও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ গঙ্গামাতার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি (গঙ্গামাতা) জগন্নাথদেবের আজ্ঞা পালনের প্রতীক হিসাবে শুধুমাত্র রাজাকেই দীক্ষা দিলেন। গুরুদক্ষিণা হিসাবে রাজা গঙ্গামাতাকে

ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না; রাজা পুনঃ পুনঃ সেবার সুযোগের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন, তিনি বৈষ্ণব সেবার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র দুইভাণ্ড মহাপ্রসাদ, একভাণ্ড তরকারী, একটী প্রসাদীবস্ত্র ও দুই পণ কপর্দিকা (১৬০ পয়সা) প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ধূপের পর মঠে প্রেরণের অনুমতি দিলেন। সেই ব্যবস্থা সেই প্রসাদ রাজভোগাদি গঙ্গামাতা মঠে নিয়মিতভাবে প্রেরিত হইতেছে।

একবার মহীরথ শর্ম্মা নামে এক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্বেতগঙ্গার তীরে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণাদি করিতে আসেন এবং শ্রীগঙ্গামাতার মহিমাদি শ্রবণে তাঁহার চরণ দর্শন করতে যান। শ্রীগঙ্গামাতা পণ্ডিতকে বহু সম্মান দান করিয়া আসনে বসাইয়া আগমনের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সরলতার সহিত নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সরলতা দর্শনে শ্রীগঙ্গামাতা তাঁহাকে ভাগবত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ অতীব মুগ্ধ হইলেন। তিনি গঙ্গামাতার চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে এক শুভদিনে তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করিলেন। ধনঞ্জয়পুরের অধিবাসী এই মহীরথ শর্ম্মা গঙ্গামাতার আদেশে গঞ্জাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামপ্রেম প্রচার করিতেন।

রাজস্থান জয়পুর নিবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীচন্দ্র শর্ম্মার গৃহে 'শ্রীরসিক রায়' শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন। সেবাপরাধ ফলে তিনি নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ করেন উক্ত বিগ্রহের সেবা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গঙ্গামাতাকে দিলে তাঁহার অপরাধ ও ভয় দুর হইবে। সেই আজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্মণ শ্রীরাধারাণীসহ শ্রীরসিকরায় বিগ্রহকে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপনীত হইয়া সেই বিগ্রহগণের সেবা তাঁহাকে প্রদান করিতে চাহিলে গঙ্গামাতা প্রথমে উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, যেহেতু তাঁহার পক্ষে রাজসেবা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব পর ছিল না। পরে সেই ব্রাহ্মণ তুলসীকাননে 'শ্রীরসিকরায়' বিগ্রহকে রাখিয়া চলিয়া যান; রসিক রায় নিজেই তাঁহার সেবা-সম্পাদনের জন্য গঙ্গামাতাকে স্বপ্নে আদেশ দেন। স্বপ্নাদেশ পাইয়া পরমোল্লাসে গঙ্গামাতা শ্রীবিগ্রহগণের প্রাকট্য মহোৎসব সম্পন্ন করেন।

শ্রীগঙ্গামাতা মঠে পাঁচটি যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন—শ্রীশ্রীরাধা রসিকরায়, শ্রীশ্রীরাধা শ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীশ্রীরাধা-

রমণ। উপরন্তু শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম, নৃত্যরত শ্রীগৌরমূর্ত্তি ও নাড়ুগোপাল বিগ্রহগণও সেবিত হইতেছেন।

গঙ্গামাতা মঠের প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারে শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী ইং ১৬০১ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে আবির্ভূতা হইয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

গঙ্গামাতা মঠের শাখাগুলি—পুরীতে হাবেলী মঠ, গোপাল মঠ ও কটক জেলায় টাঙ্গী নামক স্থানে শ্রীগোপাল মঠ।

হরিভক্ত যে কোনও জাতিতে, যে কোনও বর্ণে, যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইলেও সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বপূজ্য, তাহার অন্যতম উদাহরণ গঙ্গামাতা গোস্বামিনী।

শ্রীরসিক রায় জীউ

রাজস্থানের জয়পুর নগরীতে শ্রীচন্দ্রশর্ম্মা নামে এক সৎধর্মশীল ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে শ্রীরসিক রায় নামক এক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ছিলেন। দারিদ্র হেতু ব্রাহ্মণ ঠিকমত শ্রীবিগ্রহের সেবাদি করিতে পারিতেন না। শ্রীজগন্নাথ একরাত্রে ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বলেন—তোমার ঘরে যে রসিক রায় শ্রীবিগ্রহ আছে তাঁহার উপযুক্ত সেবাদি হইতেছে না। তুমি তাহাকে শীঘ্রই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্বেত গঙ্গার তটস্থিতা গঙ্গামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দাও, অন্যথায় তোমার অকল্যাণ হইবে। ভগবানের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র ব্রাহ্মণ রসিক রায়কে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে আগমন পূর্বক অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ দর্শনে গঙ্গামাতা খুব সুখী হইলেন। ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত কিছু শ্রবণ করিয়া গঙ্গামাতা বলিলেন—আমি ভিখারিণী, মাধুকরী-জীবি। কি করিয়া সেবা চালাইব ? আপনি শ্রীবিগ্রহ লইয়া যান, আমাকে অপরাধী করিবেন না। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া অনেক চিন্তা করিয়া শ্রীরসিক রায়কে রাত্রে গঙ্গামাতার তুলসী কাননে রাখিয়া পলায়ন করেন।

এদিকে শ্রীরসিক রায় স্বপ্নে গঙ্গামাতাকে বলেন—আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। ব্রাহ্মণ আমাকে তুলসী কাননে রেখে চলে গিয়েছে। আমার এখনও ভোজন হয় নাই। আমাকে কিছু ভোজন করাও।

স্বপ্ন দেখিয়া গঙ্গামাতা চমৎকৃত হইলেন। স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার নিকট হইতে কিছু ভোজন করিতে চাহেন। তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া সত্ত্বর স্নানাদি করিয়া তুলসী কাননে আগমন পূর্বক শ্রীরসিক রায়কে বিরাজিত দেখিলেন। গঙ্গামাতা শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন ও শীঘ্রই স্নানাদি করাইয়া কিছু ভোগ লাগাইলেন। তিনি দেখিলেন ক্ষুধার্ত্ত রসিক রায় সমস্ত উপকরণ দ্রুত ভোজন করিলেন; তাহা দর্শনে গঙ্গামাতা আনন্দাশ্রুতে ভাসমানা হইলেন। অতঃপর নূতন বস্ত্রাদি পাতিয়া ঠাকুরকে শয়ন করাইলেন।

প্রাতঃকাল হইলে ভক্তগণ আসিয়া শ্রীরসিক রায়কে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। গঙ্গামাতা খুবই প্রীতিসহ বহুপ্রকার অন্ন-ব্যঞ্জন পিঠাপানাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। শ্রীবিগ্রহসেবায় শ্রীগঙ্গামাতার প্রতিদিন চারিপ্রহর সময় লাগিয়া যাইত।

কিছুদিন ভিক্ষা করিয়া শ্রীরসিকরায়ের সেবা করিতে করিতে বয়স অধিক হইয়া যাওয়ায় তাঁহার খুবই পরিশ্রম হইত। শ্রীরসিক রায় তাঁহার পরিশ্রম দর্শনে কৌশলে ধনী বণিকদিগের নিকট হইতে দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতেন। বয়স হওয়াতে সেবার ত্রুটি হইতেছে মনে করিয়া তিনি শ্রীরসিক রায়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলেন যে তিনি পরিচর্য্যা করিতে অক্ষম। তাহা শুনিয়া রসিক রায় স্বপ্নে বলেন— তোমার সেবায় আমি সুখী, তুমি দুঃখ করিও না। আরও কিছুদিন তুমি সেবা চালাইয়া যাও।

অনন্তর কিছুদিন পরে গঙ্গামাতা শ্রীরসিক রায়কে পুনরায় জানাইলেন যে তিনি আর থাকিতে চাহেন না। প্রাণ ত্যাগ করিবার সময় যেন তিনি তাঁহার নাম করিতে করিতে চলিয়া যাইতে পারেন। শ্রীরসিক রায় বলিলেন—কোনও চিন্তা করিও না। উপযুক্ত শিষ্যের হাতে আমার সেবাভার অর্পণ করিয়া আমার ধামে চলিয়া আইস। অতঃপর বনমালীদাস নামক এক শান্ত ভক্তের হস্তে রসিক রায়ের সেবাভার অর্পণ করিয়া গঙ্গামাতা ১২০ বৎসর বয়সে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীরসিক রায়ের শ্রীচরণচিন্তা ও রূপমাধুরীদর্শন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

নদীয়া জেলার দেবগ্রামে এক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে ১৬৩৮ সালে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব। আজন্ম প্রতিভাবান শ্রীবিশ্বনাথ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরাট পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মুর্শিদাবাদের এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ছিলেন শিক্ষাগুরু ও পরবর্ত্তীকালে দীক্ষাগুরু।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকটের প্রায় ৬০ বৎসর পরে তিনিই এক দিকে অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্র বলরাম ও তাঁহার বংশধরগণ ও অপরদিকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরূপ কবিরাজের দ্বারা সৃষ্ট প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। এ সময় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিত বাংলাভাষায় কিছু গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। ১৬৭০ সালে ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে ব্রজেতে বৈষ্ণবগণের প্রচার কার্য্য বেশ ধাক্কা খাওয়ার সংবাদ পাইয়া, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কেন্দ্রস্থল ব্রজের উদ্ধারের জন্য কালবিলম্ব না করিয়া বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া বৈষ্ণবগণকে উদ্দীপিত করেন। যদিও তিনি আর বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, তথাপি ব্রজে বসিয়াই শেষ জীবন পর্য্যন্ত বাংলা ও ওড়িষ্যার প্রচার কার্য্যে নেতৃবর্গকে উপদেশ নির্দ্দেশাদি পাঠাইতেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রচার আন্দোলনের এই সময়টি ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ—যার পিছনে ছিল তাঁহার নিজ সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও সর্বোপরি শ্রীরূপ, সনাতন, জীব প্রমুখ গোস্বামীবর্গের লিখনের অপ্রাকৃত গূঢ়তত্ত্ব সকলের মধ্যে খুব গভীরে প্রবেশপূর্বক সেইগুলির ব্যাখ্যা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন। তাহার ফলস্বরূপ তিনি অচিরেই ব্রজমণ্ডলে সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলেন। বিভিন্নস্থানে যে সমস্ত অসংখ্য মঠাদি ছিল সেই সেই স্থানে সাময়িক অবস্থানপূর্বক তথাকার বৈষ্ণবগণকে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাইতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে সকলকে কোনও স্থানে একত্রিত করিয়া মত বিনিময় করিতেন—এই ভাবে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক নূতন জীবনের সঞ্চার করেন। এই উদ্দেশ্যে তাহার কেন্দ্র স্থাপিত হয়—মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, যাবট, গোবর্দ্ধন, ইত্যাদি স্থানে। রাধাকুণ্ডে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করেন; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে প্রদত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা এই মন্দিরে এখন নিত্যপূজিত, এখনও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি ও দার্শনিক হিসাবে তাঁহার ছিল বিরাট পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা। তাঁহার প্রণীত বহুগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ছিল সেইগুলির খুব স্পষ্টতা ও সরলতা। সাধারণ লোকের কাছে কষ্টবোধ্য শ্রীরূপ গোস্বামি লিখিত যেসব অতীব গূঢ় রস সাহিত্য, সেগুলিকে তিনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্বারা সরল করিয়াছেন।

প্রায় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—

১। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত—পরস্পর পরিপূরক দুই পূর্ণবস্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম ক্রীড়ার বিবরণ সমৃদ্ধ—যাঁহার ২৩ অধ্যায়ের মধ্যে আছে ২৯২৯ শ্লোক।

২। মাধুর্য্য কাদম্বিনী—ভগবানের সেবা লাভের উপায় সম্বলিত পদ্যে ও গদ্যে ৬৪৩টি শ্লোক।

৩। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃতম্।

৪। সঙ্কল্প কল্পদ্রুম। এই গ্রন্থটিকে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের পরিপূরক বলা যায়। ১০৪ শ্লোকে বর্ণিত গ্রন্থটিতে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীগণের আনুগত্যে ও তাঁহার গুরুপরম্পরান্তর্গত শ্রীলোকনাথ ও শ্রীনরোত্তমের নিয়ামকত্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্য প্রিয়সখীভাবে রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা প্রণালী।

৫। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা। ৬। চমৎকারচন্দ্রিকা। ৭। সাধ্য-সাধন কৌমুদী। ৮। গৌরাঙ্গ স্মরণ দশকম্। ৯। ব্রজরীতি চিন্তামণি কাব্যম্। ১০। প্রেম সম্পূটম্ কাব্যম্। ১১। গীতাবলীঃ গান। ১২। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, ১৩। স্তবামৃত লহরী। ১৪। সুবোধিনী টীকা শ্রীকবিকর্ণপুরের 'অলঙ্কার কৌস্তভের' উপর টীকা। ১৫। আনন্দচন্দ্রিকা—শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণির' টীকা। ১৬। শ্রীরূপগোস্বামী লিখিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর উপর টীকা। ১৭। দানকেলি কৌমুদীর উপর টীকা। ১৮। ললিত মাধবের উপর টীকা। ১৯। বিগদ্ধমাধব নাটকের উপর টীকা। ২০। হংসদূত কাব্যমের উপর টীকা। ২১। গোপালতাপনী উপনিষদের উপর টীকা। ২২। ব্রহ্মসংহিতার (৫ম অধ্যায়) উপর টীকা। ২৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিন্দু শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর সংক্ষিপ্ত সংযোজন। ২৪। উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ। ২৫। নরোত্তম ঠাকুরের প্রেমভক্তি বিলাসের উপর সংস্কৃত টীকা। ২৬। সারার্থ দর্শিনী—শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র ১২টি স্কন্ধের উপর বিশদ টীকা। ২৭।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার উপর সারার্থ দর্শিনী টীকা। ২৮। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপর টীকা। ২৯। সুখ বর্দ্ধিনী--কবি কর্ণপুরের 'আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূ'র উপর টীকা; এই গুলি ব্যতীত আরও বহু গ্রন্থাদি আছে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ তাঁহার 'মন্ত্রার্থদীপিকা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে—'কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণস্বরূপ সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর হয়।'—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক রচিত পয়ারে এই 'সাড়ে চব্বিশ' কি ভাবে হয় তাহা অনেক গবেষণা করিয়াও নির্ণয় করিতে না পারায়—মনে করিলেন যে "মন্ত্রাক্ষরের অর্থ যদি অবগত হইতে না পারি, তাহা হইলে মন্ত্রদেবতার সাক্ষাৎ কিরূপে পাইব? সুতরাং মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া দেহত্যাগের নিমিত্ত অন্ন-জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে পড়িয়া রহিলাম। এইরূপ অবস্থায় রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইলে আমার তন্দ্রা উপস্থিত হইল। তখন কি দেখিলাম! না—শ্রীবৃষভানুরাজ-নন্দিনী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিতেছেন, 'হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উত্থিত হও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য, সে যে আমার নর্ম্মসহচরী; আমার অনুগ্রহে সে আমার অন্তর সমস্তই জানে; তাহার বাক্যে কোনও সন্দেহ করিও না। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত, অন্য কেহ এই মন্ত্রাক্ষরের অর্থ অবগত হইতে পারে না। 'বর্ণাগমভাস্বৎ'-নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপরে তুমি ঐ গ্রন্থ দেখিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিও। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ 'বর্ণাগম ভাস্বৎ' গ্রন্থ দেখিয়াই অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিয়াছে।'

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর এইরূপ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, চেতনা লাভ করতঃ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম। আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল এবং 'হা রাধে! হা রাধে! বলিয়া বারম্বার বিলাপ করিতে লাগিলাম। অনন্তর শ্রীরাধিকার এই আদেশবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত যত্নবান্ হইলাম। অর্দ্ধাক্ষর নিরুপণ বিষয়ে শ্রীরাধিকার আদেশ-বাণী, যথা—'যে 'য' কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে, সেই 'য' কারই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর। এতদ্ ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং প্রত্যেক অক্ষরই পূর্ণচন্দ্র।' অতএব এই লক্ষণ অনুসারে 'কামদেবায়' পদের 'য' কারের পর 'বিদ্মহে' পদের 'বি' অক্ষর থাকায়, এই 'কামদেবায়' পদের 'য' কার হইতেছ অর্দ্ধাক্ষর—ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র।

এই নির্দ্দেশ অনুসারে কামগায়ত্রীয় 'কামদেবায়' পদের অন্তস্থিত 'য' কারই ('য' ই) হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর, কারণ এই 'য'-কারের পরেই 'বিদ্মহে' পদের 'বি' অক্ষর 'হইয়াছে।''

পূর্বোক্ত (২৬) সারার্থ দর্শিনী' টীকা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে—যদিও শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি তাহা একটি ধারাবাহিক টীকা নহে। একমাত্র শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গৌড়ীয় দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের আলোকে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিটি শ্লোকের ধারাবাহিক টীকা দ্বারা ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের উপর লিখিত 'বৈষ্ণবী তোষণী' টীকাকে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। খুব সাবধানতার সহিত শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভগুলির উপর বেশী জোর দিয়াছেন। শ্রীরূপ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য গোস্বামিগণের গ্রন্থ হইতেও প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়াছেন ও শ্রীধর স্বামীর টীকারও উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার বহু শিষ্য ও ছাত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ যোগ্যতম ব্যক্তি, যিনি তাঁর পরবর্ত্তীকালে গৌড়ীয় ধর্ম প্রচারকার্য্যে পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন।

১৭০৬ সাল নাগাদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধ অবস্থায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যোগ্যতা বা প্রামাণিকতা লইয়া জয়পুরের রাজসভায় রামানন্দী সম্প্রদায় এক কূট বিতর্ক উঠাইলেন যে—যেহেতু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোনও আচার্য্য সে পর্য্যন্ত বেদান্তের উপর কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। জয়পুরের তদনীন্তর রাজা জয়সিংহ (২) শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে গল্‌তায় আসিয়া উন্মুক্ত সভায় তাহার মীমাংসা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু অতিবৃদ্ধ শ্রীবিশ্বনাথের তথায় গমন করা সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি তাঁহার যোগ্যতম ছাত্র কৃষ্ণদেব সার্বভৌম ও বলদেব বিদ্যাভূষণকে বিচারের সভায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা রামানন্দী সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিজয় পতাকা লইয়া ফিরিয়া আসেন।

এই গৌরবময় ঘটনার পর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্রখ্যাত দার্শনিক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন মাঘ মাসের বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

বলা হয় যে শ্রীবলদেব উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার রেমুণার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে খণ্ডাইত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই এবং যৌবনে বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধুগণের অধীনে বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার ইতিহাসও জানা যায় নাই। পরম্পরাগত ভাবে আমাদের জানা আছে, যেমন শিক্ষা পরম্পরায় কথিত হইয়া আসিতেছে যে, তিনি ১৬২৬ শকে (১৭০৪ সালে) গলতায় রামানন্দী সাধুগণকে এক শাস্ত্রীয় বিতর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং অবশেষে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপের উৎকলিয়া বল্লরীর উপর টীকার তারিখ শক ১৬৮৬ (১৭৬৪ সাল) দেখিয়া মনে হয় ইহাই তাঁহার সর্বপেক্ষা সাম্প্রতিকতম কালের রচনা। গল্‌তার এই বিখ্যাত ঘটনার জন্য তাঁহাকে সুবিখ্যাত 'গোবিন্দ ভাষ্য' (বেদান্তের উপর গৌড়ীয় ভাষ্য) রচনা করিতে হয়। তাঁহার বয়স তখন অন্ততপক্ষে কুড়ি বৎসর হইবে। নির্ভরযোগ্য কিছু ঐতিহাসিক সুত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহা ধরিয়া লওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে তিনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর আশির দশকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ধর্মের প্রতি পূর্বানুরাগ নিশ্চয় সেই বালেশ্বর জেলায় জন্মগ্রহণের ফলে যে স্থানটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ মুরারির গৌড়ীয় ধর্মের ব্যাপক প্রচার দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছিল। সেই প্রচার উদ্যম রসিকানন্দ পুত্র রাধানন্দ, পৌত্র নয়নানন্দ ও অন্যান্যগণ দ্বারা উজ্জীবিত রাখা হইয়াছিল। এই নয়নানন্দ ছিলেন বলদেবের পরম গুরুদেব, তাঁহার (বলদেবের) সাক্ষাৎ গুরু ছিলেন শ্রীরাধা-দামোদর। রাধা-দামোদর তখন শ্রীশ্যামানন্দ প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর কুঞ্জ নামক মঠের ভারপ্রাপ্ত। বলদেব তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করেন এবং নিজগুরু রাধাদামোদরের অধীনে বেদান্ত, বিশ্বনাথের অধীনে ভাগবত এবং পীতাম্বরের অধীনে অন্যান্য শাস্ত্রাদি অনুশীলনে নিয়োজিত হন (সিদ্ধান্তরত্ন টীকা ৮-৩৫)। এই তিন শিক্ষক শাস্ত্রজ্ঞানে প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পন্ন ও পারমার্থিক জীবনে অতীব উচ্চ স্তরের। কৃষ্ণদাস ছিলেন তাঁহার সহচর ছাত্র। জীব ও সনাতন যেমন জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,তেমনই বিশ্বনাথ ও অন্যান্যগণ বলদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,

যাঁহার (বলদেবের) সহিত আগ্রহ ও জ্ঞানের সঠিক পরিধিতে জীবের সহিত হুবহু মিল লক্ষিত হয়। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তাঁহাকে জীব গোস্বামীর অবতার বলা হয়। আমরা দেখিতে পাইব যে, জীব গোস্বামী যেমন শ্রেষ্ঠ এক দার্শনিক ও বৈয়াকরণিক ছিলেন, বলদেবও তেমন ছিলেন।

তাঁর সিদ্ধান্তরত্নে (পাদ ৮, শ্লোক ৩৫) পীতাম্বর সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন; 'পীতাম্বরের কৃপায় এইগ্রন্থে যাঁহারা বেদান্ত অনুশীলন করিয়াছেন সেই অন্যজনগণের দর্শন সমূহ সংগ্রহ করিয়াছি। গ্রন্থটি বিজ্ঞ জনগণকে প্রীত করুক। মনে হয় এই পীতাম্বর ভাগবত-তত্ত্ব দীপ-প্রকাশবরণ ভঙ্গ গ্রন্থের গ্রন্থকার (কৃত পাণ্ডুলিপি সকলের কীলহর্ণের তালিকা)। এই পাণ্ডুলিপিটি ১৭৯৬ সনে নকল করা হইয়াছিল। গ্রন্থটির মধ্যে ২৯৯০ শ্লোক আছে।

শ্রীবলদেবের অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রচণ্ড মনোবল ছিল—শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের আক্রমণ-প্রবণ বিদ্বেষ হইতে সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে নয়, উপরন্তু নিজ বুদ্ধি শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিতেও। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেবের যুগ ছিল দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাল। বলদেবের জীবন কাল দুইটি বৃহৎ জয়ের জন্য খুবই উল্লেখযোগ্য—একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বে এবং অপরটি ভাষ্য ও নিরপেক্ষ প্রবন্ধের আকারে বেদান্ত ও উপনিষদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যাখ্যা।

রাধা-দামোদর ও বলদেবের আমল পর্য্যন্ত, গৌড়ীয় বিশেষজ্ঞগণ নূতন ধারার বিষয়ে নিজস্ব রচনা সকল সৃষ্টির বিষয়ে স্ব-নির্ভরশীল ছিলেন, কিন্তু সেগুলির মূল্য ছিল কেবল মাত্র নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু এই আওতার বহিরের লোক বড় একটা ইহার গুরুত্ব দিত না ও ইহার অনুগত ছিল না যেমন তাহারা বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাপারে করিত। সেইজন্য বলদেব স্থির করেন জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম প্রামাণ্য শাস্ত্রগুলির উপর টীকা প্রণয়ন করিয়া তাহাদের আগ্রহ সৃষ্টি করিবেন। দেশের উপর গৌড়ীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত আরোপ করিতে এবং বেদান্ত ও উপনিষদ সমূহ এবং অন্যান্য প্রচীন গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গ যে ইহাকে সমর্থন করে তাহা জগৎকে দেখাইবার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে বেদান্ত ও উপনিষদগুলির উপর টীকা ও প্রবন্ধাদি রচনা করিবেন। যদি বলদেব গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগুলির উপর বিশাল সংখ্যক গ্রন্থাদি প্রণয়ন না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর লোক গৌড়ীয়

সম্প্রদায়কে এই বলিয়া অবহেলা করিত যে এই ধর্মের বেদান্ত ও উপনিষদের উপর কোন ভিত্তি নাই। অতএব এইটির কোন মূল্য নাই, সুতরাং গ্রহণযোগ্যও নহে। ভারতীয়গণের ধর্মীয় মন অতীব রক্ষণশীল ও যাহা বেদান্ত ও প্রাচীন শাস্ত্রাদির সমর্থন পুষ্ট নহে, তাহা যতই মহৎ হউক না, সেই প্রথা স্বীকার করিতে চাহে না। বলদেব প্রভু না আসিলে মানুষ গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া ভুল বুঝিত। যদি বলদেব তাঁহার শক্তপোক্ত দার্শনিক গ্রন্থগুলির দ্বারা ভিত্তি রচনা না করিতেন, তাহা হইলে গোস্বামীগণের অত্যাশ্চর্য্য সম্পদগুলি সাধু-সন্ত জনের যথোপযুক্ত গুণমানের বিচার হইতে বঞ্চিত হইতেন।

বলদেব বিজয়ী হইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার বিজয়ী ছাত্রগণকে (বলদেব ও কৃষ্ণদেবকে) অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্প্রদায়ের কাজকে আগাইয়া লইয়া যাইতে তিনি যে এই দুইজন অভিজ্ঞ নেতাকে রাখিয়া যাইতেছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি অতীব সুখী হইলেন। বলদেবের বহুমুখী গুণাবলীর জন্য তাঁহার জীবৎকাল অতীব অসাধারণ। লেখক হিসাবে তিনি নিজেকে বহু গুণান্বিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। প্রচারের ব্যাপারে তিনি শ্রীজীবের মতই উৎসাহী। তিনি একজন আদর্শ সন্ন্যাসী। বিশ্বনাথের অপ্রকটের পর তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনকে মূলকেন্দ্র ব্রজ হইতে সফলভাবে পরিচালনা করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের সাফল্যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার অবদান কিছু কম নহে। উড়িষ্যার নেতৃবর্গের মধ্যে বলদেব অতীব গুরুত্বপূর্ণ—শুধুমাত্র ইতিহাসের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আন্দোলনের পরিচালন ব্যাপারে নহে উপরন্তু প্রভুত পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা সম্প্রদায়কে খুব সমৃদ্ধ করিতেও। তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। শ্রীরূপের 'উৎকলিকাবল্লরী'র উপর তাঁহার টীকার তারিখ শক ১৬৮৬ (১৭৬৪ সন) সে সময় তিনি হয়তো ৮৬ বৎসর বয়স্ক। মনে হয় এইটিই তাঁহার সাম্প্রতিকতম গ্রন্থনা। এই গ্রন্থনার কয়েক বৎসর পরে যদি তিনি অপ্রকট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রায় ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে বলদেবকে দ্বিতীয় জীব (গোস্বামী) বলা যাইতে পার। খুবই সত্য কথা যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। বলদেবের আগ্রহ ও জ্ঞানের পরিধিকে জীবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই দুই আচার্য্য দর্শনের উপর অতি বলিষ্ঠ লিখন, সর্বোৎকৃষ্ট বৈয়াকরণিক এবং কাব্য রচনায় কম গুরুত্ব-

পূর্ণ নহেন। শ্রীজীব সম্প্রদায়ের মজবুত দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আর বলদেব সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট লিখনগুলির অভ্যন্তরে অঙ্কিত করিয়াছেন।

জীব ও বলদেব উভয়েই মৌলিক লেখক ছিলেন। পরবর্ত্তী জন তাঁহার পূর্বসূরীর শ্রেষ্ঠ আনুগত্য করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের যুক্তিকে খণ্ডন করিতে তাঁহার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

বলদেবের গ্রন্থসমূহ

তিনি দর্শন, ব্যাকরণ ও কাব্য, অলঙ্কার ও আনুষঙ্গিকভাবে ইতিহাস লইয়া গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার লিখন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—মৌলিক গ্রন্থাদি ও পূর্বতন গ্রন্থাদির উপর টীকা। সংক্ষেপে সেগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

গোবিন্দ ভাষ্য

বলদেবের প্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাগ্রে রচিত ও অতি প্রসিদ্ধ। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের আলোকে বেদান্তের উপর লিখিত টীকা। এ-বিষয়ের উপর সমস্ত সুবিখ্যাত লেখকগণের মধ্যে অতি আধুনিকতম হওয়ায় তিনি ইহার (বেদান্তর) মধ্যে নিহিত সকল প্রকার চিন্তাধারার পর্যালোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং নিজ মতবাদের চরমোৎকর্ষতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতের চিন্তাধারার বিস্ময়কর কার্য্যকে পুনর্বিচারের জন্য তাঁহার জ্ঞানোদ্দীপ্ত গুণাবলী সঠিকভাবে প্রয়োজনানুরূপ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তুলনামূলক উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইয়াছিলেন। দার্শনিক লেখক হিসাবে এই ভাষ্যে ও অন্যান্য গ্রন্থনায়, তিনি শঙ্করের দর্শনের বিরুদ্ধে নিজের ঘটনার বিবরণকে যথাযথ ভাবে বিতর্কমূলক ভাবে সাজাইয়া সম্প্রদায়ের মতবাদকে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা সম্বন্ধীয় প্রধান সমর্থনযোগ্য বিতর্ককে মায়াবাদিগণের কেবলাদ্বৈতবাদের উপর অক্রমণ বলিয়া সংক্ষেপে বলা যায় যাঁহারা বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষ, জগৎ মিথ্যা ও জীবের বাস্তব সত্তা নাই ইত্যাদি। অতি অবশ্যই আস্তিক্যবাদের প্রশংসনীয় পক্ষ সমর্থন ছাড়াও বলদেবের যুক্তি সকল অনেকাংশেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের দিকেই নির্দেশ করে—যে ঈশ্বরের ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ, যদিও মানব-মনীষায় অচিন্ত্যনীয়,একই কালে অভেদ ও ভেদ যুক্ত। তিনি বিশদভাবে ইহা দেখাইয়াছেন,

যদি দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এই দুইটি একান্তভাবে ও অপরটির ক্ষতি স্বীকার করিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে কি প্রকার দার্শনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। দার্শনিক ভাবে বলিতে গেলে, মধ্বের দ্বৈতবাদ অথবা শঙ্করের একান্ত ভাবে অদ্বৈতবাদ শ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে পুরাপুরি যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না, যে শ্রুতিতে উভয় প্রকার মতই প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীবলদেব তাঁহার লেখায় খুব আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিয়াছেন শ্রুতির এই দুই আপাতবিরোধী মতের সামঞ্জস্য করিতে। শ্রুতির যে অংশটি তাঁহার অদ্বৈতবাদের পক্ষে সেই অমীমাংসিত অর্থের উপরেই শ্রীশঙ্কর নির্ভর করিয়াছেন আর মধ্ব সেইগুলিই উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাঁহার দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে। তাঁহাদের উভয়েই শ্রুতির যে যে অংশ নিজ নিজ মতবাদের পক্ষে সেইগুলিকেই উল্লেখ করিয়া, যেগুলি বিরুদ্ধে গিয়াছে সেগুলিকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। শ্রীবলদেব ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় শ্রুতির প্রতিটি উক্তিই সমভাবে ধর্তব্য ও সমান মূল্য আছে। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের মধ্যে তিনি উভয় মতকেই স্থান দিয়াছেন। বলদেবের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যার গুরুত্ব নিহিত রহিয়াছে এই সত্যের মধ্যে যে কোনপ্রকার তর্কশাস্ত্রসংগত ত্রুটি না রাখিয়া দুইটি বিষয়কেই সামঞ্জস্যের মধ্যে আনয়ন করা। বলদেবের এই ভাষ্য ও অন্যান্য রচনায় প্রকাশ পায় পূর্ণাঙ্গতা, স্পষ্টতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য তাঁহার যুক্তি প্রদর্শনের দান। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের উপর বলদেবের এই কেন্দ্রীয় বার্ত্তার কাছে নতি স্বীকার না করিয়া পারি না। ভারতের আস্তিক্যবাদের দার্শনিক সাহিত্যে তাঁহার রচনা এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বলদেবের গ্রন্থসম্পাদনাদির মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভারতের অন্যান্য স্বীকৃত চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতীয় ধর্মীয় সমাজে এক দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য স্থান লাভ করে। বলদেবের বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি করণের ক্ষমতা বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁহার দর্শনভিত্তিক লিখনগুলির একটা নিজস্ব স্বাভাবিক চমৎকারিতা আছে এবং দার্শনিক চিন্তাধারায় ও অভিজ্ঞতায় অব্যক্ত উজ্জ্বলতার চিরস্থায়ী উৎস বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি রামানন্দী সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার বিতর্কের ফলেই তাঁহাকে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। কথিত হয় ইহা অষ্টাদশ দিবসে রচিত হইয়াছিল। অন্য এক মতানুসারে ইহা শেষ করিতে তাঁহার তিনমাস সময়

লাগিয়াছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে যখন তিনি রাধা-দামোদর ও পীতাম্বর গুরুগণের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময় তিনি বৈষ্ণব ছাত্রগণের জন্য উহার টীকা প্রণয়নের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। গল্‌তায় বিপক্ষীয় দলের সহিত কথোপকথন কালে ইহা শেষ করিবার সুযোগ হয়। বেদান্তের উপর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত টীকা। তিনি সিদ্ধান্তরত্নে বলিয়াছেন যে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে এই ভাষ্য রচনার আদেশ দেন (৮-৩১) যাহা তিনি তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছেন ও তাঁহারই নামে নামকরণ করিয়াছেন। বলদেব শ্রীরূপ গোস্বামীর এই শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে পূজা করিতেন, যে জন্য তাঁহার অপর এক নাম গোবিন্দ দাস বা গোবিন্দের ভৃত্য।

এই গোবিন্দ ভাষ্য টীকার উপর তিনি নিজেই এক উপ-টীকা রচনা করিয়াছেন। এই উপ-টীকাটি তাঁহার সহ-লিখন নহে কারণ তাঁহার 'সিদ্ধান্তরত্ন' বা 'ভাষ্যপীঠক' (ইহার প্রারম্ভে) উল্লেখিত হইয়াছে যাহা 'গোবিন্দভাষ্য' নাম দ্বারা উল্লেখিত (শ্লোক ৮-৩১)। এই উপ-টীকা রূপ-সনাতন প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে প্রণাম দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে "যাঁহারা মায়াবাদের অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়াছেন।" অতঃপর শ্রীজীবের গুণকীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন ঃ 'যে জীব শাঙ্খ্য, পাশুপত, বিবর্ত অন্যান্য সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রতিপক্ষীয় সকল চিন্তাশীলগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তিনি আমার আশ্রয় হউন।' তিনি শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও অন্যান্যগণকে প্রণাম জানাইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। বলদেব বিষয় বস্তু আরম্ভ করিবার পূর্বে মধ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মধ্ব হইতে শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে আচার্য্যগণের তালিকা পেশ করিয়াছেন—মধ্বের সাক্ষাৎ শিষ্যদ্বয় পদ্মনাভ ও নরহরি হইতে আরম্ভ করিয়া। মনে হয় কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা হইতে তালিকাটি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত গোপালগুরুর সাধনা-পদ্ধতি এবং ধ্যানচন্দ্র, চৈতন্যদাস, মনোহর দাসের লেখা হইতেও।

শ্রীবলদেব পূর্বেই আমাদিগকে জানাইয়া রাখিয়াছেন যে তাঁহার টীকায় তাঁহার মতামত ও যুক্তি শ্রীচৈতন্যদেব অনুমোদিত শ্রীভাগবত পুরাণের আনুগত্যে রচিত হইবে এবং মধ্বের মতানুসারে (শ্রীচৈতন্যশারী স্বীক্রতা মাধ্ব মুন মতানুসারতঃ) অর্থাৎ অন্য কথায় বলিতে গেলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের টীকার দর্শন মূলতঃ মধ্বের প্রণালী যাহা ভাগবত শিক্ষণের দ্বারা পরিমার্জিত এবং

যাহার উপর শ্রীচৈতন্য বিশেষ ভাবে জোর দিতেন যাহাতে দর্শনের নিজস্ব প্রথার রূপ দেওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত দর্পণ

সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্য পীঠক

গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেবের আলোচিত নয়টি প্রতিষ্ঠিত নীতি (বা সত্য)কে সমর্থন ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য তাঁহার যুক্তিসম্বলিত মৌলিক সম্পাদনা এইটি। এ বিষয়ে তিনি বলেনঃ 'সিদ্ধান্তরত্নের এই সুবর্ণ আসন বেদান্তের ভাষ্যের আধার হউক যাহা কৃষ্ণকে প্রকাশিত করে ও যাহার মধ্যে নয়টি সত্য নিহিত আছে।' (৮-৩২)।

ইহাতে আটটি পাদ বা অধ্যায় আছে, যথা ঃ—

(১) জীবের অতিশয় বাঞ্ছনীয় বস্তু (পরম পুরুষার্থ), (২) ভগবানের ঐশ্বর্য্য, (৩) পরতত্ত্ব বিষ্ণুর পরম সত্যত্ব, (৪) তিনি সর্ববেদের বিষয় বস্তু (সর্ববেদ বেদত্ব), (৫) নির্বিশেষ ব্রহ্মত্ব খণ্ডন, (৬) কেবলানুভূতির খণ্ডন, (৭) অতিশয় বাঞ্ছনীয় বস্তুর স্বপক্ষে যুক্তি সকল(ভক্তি)।

গ্রন্থকার শ্রীশ্যামসুন্দর (শ্রীকৃষ্ণকে), শ্রীচৈতন্য, ব্যাস, রূপ ও সনাতনকে প্রণাম জানাইয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। শেষোক্ত দুইজন চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া মায়াবাদের অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে তিনি শ্রীগোবিন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বলদেব তাঁহার দর্শনের মৌলিক তত্ত্ব গ্রন্থের শেষ শ্লোকে সংজ্ঞা দিয়া বলেন—'আমার ভ্রমরবৎ হৃদয় পুষ্পবৎ সিদ্ধান্তরত্নের ভগবৎ-প্রেম মধু অথবা তত্ত্বসমূহের যে পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত করাইতে শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক আনীত এবং আনন্দ তীর্থ (মধ্ব) কর্ত্তৃক প্রচারিত তাঁহার মধুপানে ব্যাপৃত থাকুক।'

প্রমেয়রত্নাবলী

নয়টি তত্ত্বসম্বলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত ইহা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। সেইগুলি এইঃ (১) বিষ্ণু পরতত্ত্ব; (২) বিষ্ণুকে বেদের মাধ্যমে অথবা বেদের বিষয় বস্তুতে জানা যায়; (৩) জগৎ সত্য;(৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন; (৫) আত্মা সকলের মধ্যে তাহাদের পদ মর্যাদা হিসাবে অর্থাৎ সম্বন্ধ বা বদ্ধানুসারে ক্রমোন্নতির ধাপ আছে; (৬) জীবগণ বিষ্ণুর দাস; (৭)

বিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভে মুক্তি; (৮) সেই মুক্তি লাভের পন্থা অবিচ্ছেদ ভক্তি; (৯) শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও সিদ্ধান্তই তিনটি প্রমাণ। গ্রন্থকার মধ্ব হইতে উপরোক্ত নয়টি সত্যকে গ্রহণ করিয়া কঠ, শ্বেতাশ্বতর, গোপাল, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, ঈশাবাস্য উপনিষদ সমূহ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র, মহাভারত, গীতা, হরিবংশ, গৌতমীতন্ত্র, জীতনাতস্তোত্র, স্মৃতি, বেদান্ত সূত্র, বেদের কৌথুমী অংশ, ব্রহ্মসংহিতা হইতে উদ্ধৃতি দ্বারা সেই সকল সত্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত করিয়াছেন। চারিটি স্বীকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোন একটির আনুগত্য প্রদর্শনের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া পদ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তিনটি প্রধান বিগ্রহ গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনকে প্রণাম জানাইয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা দ্বারা গ্রন্থকারের বিশ্বাস যে তিনি অতিসূক্ষ্ম এই নয়টি সত্য বিষয়ে লিখিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সহ শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম জানাইয়াছেন। পরবর্ত্তী পাঁচটি শ্লোকে তিনি মধ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উৎস নিরূপণ করিয়া মধ্ব হইতে শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত আচার্য্যগণের তালিকা পেশ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই নয়টি সত্যকে পরস্পর নয়টি অধ্যায়ে বিস্তৃত করিবার পূর্বে পরপর নাম করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার বলেন, 'মধ্ব আনন্দ রচিত এই নয়টি সত্যরত্ন বিজ্ঞগণ তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করুন।' শ্রীচৈতন্যের প্রতি নিম্নোক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। "যিনি মুরারির (রসিক) আত্মা ও যাঁহার কৃপায় গজপতি (প্রতাপ রুদ্র) দোষশূন্য ও শান্ত (নিরাভয় ও নিভৃতিমান) হইয়াছিলেন সেই শ্রীচৈতন্য - - - - - - - -।" এই শ্লোকটি সিদ্ধান্ত দর্পণের প্রারম্ভেও দেখা যায়, বলদেব এই চিন্তা করিয়া আনন্দিত মনে হয় যে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার দেশ উড়িষ্যার সম্রাট। সংস্কৃত টীকা 'কান্তিমালা' সহ প্রমেয়রত্নাবলী গোকুল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং কলিকাতা গৌড়ীয়মঠও প্রকাশ করিয়াছেন। 'কান্তিমালা' টীকার প্রণেতা নিজেকে পণ্ডিত সুলভ পদবী 'বেদান্ত-বাগীশ' বলিয়া লিখিয়াছেন।

শ্রীবলদেব নিজে সিদ্ধান্তরত্নের উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন (গীতার উপর বলদেবের টীকার গৌড়ীয় মঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা)।

সিদ্ধান্তদর্পণ

বেদান্তের উপর লিখিত এই গ্রন্থটিতে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিসমূহ; বলদেবের বিজ্ঞ শিষ্য নন্দন মিশ্র ইহার উপর এক টীকা লিখিয়াছেন। উক্ত টীকার শেষ শ্লোকে ইহার গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

দশটি উপনিষদের উপর টিকা

শ্রীবলদেব দশটি প্রধান উপনিষদের উপর টীকা-সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, তৈতরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, মুণ্ড, বৃহদারণ্যক (বলদেবের গীতার উপর টীকার গৌড়ীয় মঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা)। গৌড়ীয় মঠ ঈশোপনিষদের উপর বলদেবের টীকা তাহার মধ্যে মধ্বের টীকা সন্নিবেশিত করিয়া ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'বেদার্কদিধীতিঃ' প্রকাশ করিয়াছেন।

গীতার উপর তাঁহার টীকা

বলদেব অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের আলোকে গীতার উপর এক চলমান টীকা রচনা করিয়াছেন। যথারীতি টীকার শেষে নাম দেওয়া হইয়াছে। গৌড়ীয় মঠ তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

কথিত হয়, তিনি ভাগবতের উপর টীকা রচনা করিয়াছেন (বলদেবের গীতার গৌড়ীয় মঠ সংস্করণের মুখবন্ধ)।

দর্শনের উপর বলদেবের অন্যান্য গ্রন্থ নিম্নগুলি

শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভের উপর তাঁহার টীকা। কলকাতায় শ্রীশ্যামলাল ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

গোপালতাপনীর উপর টীকা।

রূপের লঘুভাগবতামৃতের উপর তাঁহার টীকা। ইহা কলকাতা হইতে অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪১২ চৈতন্যাব্দে।

তাঁহার ব্যাকরণ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি

'ব্যাকরণ কৌমুদী' নামক একটি ব্যাকরণ সংক্রান্ত নিবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন, যাহা এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপি রাধাচরণ বিদ্যাবাগীশের নিকট (গৌড়ীয় খণ্ড-১, সংখ্যা ১০, পৃ-২)।

কাব্যসম্বন্ধীয় তাঁহার গ্রন্থাবলী

'ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী'ঃ বৃন্দাবনে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের চরিতের প্রশংসা সূচক এক কবিতা। উহাতে ২২৪ টি শ্লোক ৭ টি বৃষ্টি বা অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। (মিত্রের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির উপর বিজ্ঞপ্তি—খণ্ড-৭, নং ২৫১২, পৃঃ ২৩৩)। গৌড়ীয়ের সম্পাদক ইহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিত বলিয়া আরোপ করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, সংখ্যা ১৮, পৃঃ ৮)। কিন্তু মিত্রের বিজ্ঞপ্তির শেষ শ্লোকের পাণ্ডু-লিপিতে বলদেব বিদ্যাভূষণের নামে আছে। ইহার সাতটি অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে ঃ (১) কৃষ্ণের ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্যের বিবরণ; (২) ভগবানের আবির্ভাবের বিবরণ; (৩) বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব, নন্দ ও অন্যান্যগণের জন্মবৃত্তান্ত; (৪) রাধিকার জন্মের বিবরণ; (৫) কৃষ্ণের জন্মের পর উৎসবাদির বিবরণ; (৬) কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর কাল ও কংস বধ; (৭) কৃষ্ণের প্রতি মুনিগণের স্তোত্র উচ্চারণ; (৮) কৃষ্ণের গোকুলে আগমন ও তথায় তাঁহার ক্রীড়াদির বিবরণ।

সাহিত্য কৌমুদী

'ভারতের কাব্য লক্ষণ' এর উপর বলদেবের এই টীকা, যাহার উপর বলদেবের পূর্বে আরও কয়েকজন 'কাব্যপ্রকাশ', 'কাব্যপ্রদীপ' প্রভৃতি টীকাও রচিত হইয়াছে, তিনি শেষে লিখিয়াছেন, ''আমি সমগ্র কাব্যলক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহা ভারতের সূত্রগুলির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা, যাহা বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বিদ্যমান মম্মতা ও অন্যান্যগণের টীকা সকলের সাহায্যে প্রণীত হইয়াছে''। অধ্যাপক পিটার পিটারসন পরিষ্কারভাবে ভ্রান্ত ধারণাকে প্রকাশ করিয়াছেন যে কারিকাগুলির উপর বলদেব তাঁহার সাহিত্য কৌমুদী রচনা করিয়াছেন তাহা মম্মতা কর্ত্তৃক লিখিত (মুম্বই এলাকায় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সকলের অনুসন্ধানে পিটারসনের দ্বিতীয় রিপোর্ট। এপ্রিল ১৮৮২-১৮৮৪, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির মুম্বই শাখার অতিরিক্ত সংখ্যার জার্নালে প্রকাশিত, ১৮৮৪ পৃঃ ১০-১২)।

অলঙ্কার এর উপর এই নিবন্ধ নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীচৈতন্যকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া শ্রীবলদেব আরম্ভ করিয়াছেন, 'আমি সেই আনন্দ সমুদ্র বিষ্ণুকে পূজা করি, যাঁহার কৃপা বলে, যখন তিনি আমাদিগের ভিতরে শ্রীচৈতন্যরূপে বিরাজ করেন, গজপতির পাপ সকল ধৌত হইয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ করেন।

তাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না; তথাপি তাঁহার সাধু-সন্তগণ বশ করেন'। পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি ইহার শিরোনামের ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'আমার এই গ্রন্থনায় বিজ্ঞজনগণ পাইবেন (১) সুত্রস্ ভরতু লিখিয়াছেন (২) সংক্ষিপ্ত টীকা ও উদাহরণ যাহার একমাত্র মূলভাব কৃষ্ণের প্রশংসা; তাঁহাদের বিবেচনার জন্য ইহাই শিরোনাম'।

দশটি অধ্যায়ের এই পুস্তকে তিনি একটি অতিরিক্ত অধ্যায় (যাহাতে অন্য কেহ আলোচনা করিয়াছেন এমন বিষয় সম্বলিত) সংযোজন করিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ "কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে কিরণ প্রদান করুন, তাঁহার কৃপায় তাঁহার বিশ্বস্তজনের কিছুই অভাব হয় না। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভারতের গ্রন্থে যে সমস্ত নিয়মাবলীর অভাব আছে তাহা আলোচিত হইবে।

ইহা ১৮২৫ সনে কাব্যমালায় মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার টীকা—'কৃষ্ণান্দিনী'।

নিজ 'সাহিত্য কৌমুদী'র উপর বলদেব 'কৃষ্ণান্দিনী' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক পিটার পিটারসন আলোয়ারের মহারাজার সংগ্রহাবলীর ভিতর ইহার পাণ্ডুলিপির বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন (রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির (১৮৮৪) মুম্বাই শাখার অতিরিক্ত সংখ্যার জার্নাল, খণ্ড ১৭, নং ৪৪, পৃঃ ৯৯-১০০)।

অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর বলদেবের অন্য একখানি গ্রন্থ—

জয়দেবের চন্দ্রালোকের টীকা (গীতার উপর বলদেবের টীকার গৌড়ীয় মঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা)।

ছন্দ কৌস্তভ

ইহা ২৭০ টি শ্লোকের কবিতায় রূপান্তরকরণের এক বিস্তৃত নিবন্ধ। বিভিন্ন ছন্দ গুলি স্তবক দ্বারা কৃষ্ণের প্রশংসায় বিবৃত হইয়াছে। 'নিত্যং নিবসতু হৃদয় চৈতন্যাত্ম মুরারি' ইত্যাদি নামক বিখ্যাত শ্লোক দিয়া আরম্ভ হইয়াছে, এইটি বলদেবের লিখনে খুবই সাধারণ। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার বলদেবের গুরু রাধা-দামোদরকে আরোপ করিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঠিক হয় নাই (সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সকলের বিজ্ঞপ্তি, অষ্টম খণ্ড, পৃ ২২, নং ২৫৭০)। ইহার গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে রাধাদামোদরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি (রাধা-

দামোদর) ব্রাহ্মণ পরিবারের এক রত্নস্বরূপ ও শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম ব্যক্তি ইত্যাদি (দ্বিজকুলতিলক শ্রীমন্‌রাধাদামোদর হরেঃ প্রেষ্ঠ)। ইহাতে খুবই পরিষ্কার বুঝা যায় রাধাদামোদরের শিষ্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং ইহার গ্রন্থকার অবশ্যই রাধাদামোদর ভিন্ন অন্য কেহ হইবেন। ইহার দুইটি পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যাভূষণ (বলদেব) এর নাম আছে-ইহার গ্রন্থকাররূপে (অযোধ্যায় অবস্থিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সকলের তালিকা, পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ কর্ত্তৃক সংকলিত, ৮-৬, ১৪-৪০)। ইহার একটি টীকা আছে নাম 'ছন্দ কৌস্তভ' টীকা—লেখক কৃষ্ণরামা (উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহের বেসরকারী গ্রন্থাগার সমূহে রক্ষিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সকলের তালিকা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সরকারের আদেশক্রমে সংকলিত, খণ্ড ১, পৃঃ ৬১৬-৬১৭। বারাণসীতে মুদ্রিত। পাণ্ডুলিপিটি বারাণসীর শ্রীবেণী দত্তের হেফাজতে)।

গীতার উপর বলদেবের টীকার গৌড়ীয় মঠ সংস্করণের সম্পাদক ইহার উপক্রমণিকায় আমাদিগকে জানাইতেছেন যে বলদেব নিজেই নিজের ছন্দ কৌস্তভের উপর একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কাব্য কৌস্তভ

ইহা কাব্যের উপর নিবন্ধ (বলদেবের গীতার উপর টীকার গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ এর উপক্রমণিকা)।

শ্রীরূপের নাটক চন্দ্রিকার উপর তাঁহার টীকা ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরূপের স্তবমালার উপর তাঁহার টীকা। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি ইহা শক ১৬৮৬ (১৭৬৪ সন)-এ লিখিত হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন সম্পাদকগণ মুদ্রিত করিয়াছেন।

অনুমান হয়, বলদেব ও তাঁহার মিত্র কৃষ্ণদেব সার্বভৌম সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের পূর্বেই নির্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পরবর্তী দুই প্রজন্মের শিষ্যগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে অতীব উল্লেখযোগ্য হইতেছেন বৃন্দাবন চন্দ্র চক্রবর্তী, বাঁকাবিহারী বিদ্যাভূষণ ও অন্যান্যগণ।

বৃন্দাবন চক্রবর্তী শব্দ-বিদ্যার্ণব, তর্কালঙ্কার

আমরা দুইখানি তারিখ সম্বলিত পুস্তক পাইয়াছি যেগুলি তাঁহার তারিখ নির্দ্ধারণে আমাদের সহায়ক হইতে পারে। তাঁহার শিষ্য বাঁকাবিহারী রঘুনাথ

দাসের স্তবমালার 'স্তত্রাবলিকা কারিকা' নামীয় টীকার বৃন্দাবন চন্দ্র শব্দ-বিদ্যার্ণব তর্কালঙ্কারকে নিজ গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাঁকাবিহারীর এই গ্রন্থ ১৬৪৪ শকে (১৭২২ সনে) সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৃন্দাবনের নিজের গ্রন্থনা 'সদানন্দ' যাহা কৃষ্ণদাসের 'গোবিন্দ লীলামৃত' এর উপর টীকা তাহার তারিখ দেওয়া আছে শক ১৭০১ (১৭৭৯ সন)। মনে হয় ১৭২২ সনে তাঁহার বয়স অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর হইবে, সে সময় তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে নিজ গুরু ও মহাপণ্ডিত হিসাবে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা ধরিয়া লইতে পারি তিনি সম্ভবতঃ ১৬৯০ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 'সদানন্দ' গ্রন্থলিখন শেষ করিবার (১৭৭৯ সন্) অন্ততঃ কয়েক বৎসর পর যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়সে ৯০ বৎসরের অধিক বয়সে নির্য্যাণ প্রাপ্ত হন। 'সদানন্দ' গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি নিজেকে কৃষ্ণদেব সার্বভৌমের শিষ্য এবং বিশ্বনাথের প্রশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার শিক্ষায়তনের উপাধি সকল দেখিয়া মনে হয় তিনি শ্রুতি ও ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'দিধিতি প্রকাশিকা'-য় তর্কালঙ্কার পদবী ব্যবহার করিয়াছেন (দিধিতি প্রকাশিকা কবিকর্ণপুরের অলঙ্কার কৌস্তভের উপর এক টীকা)। এই গ্রন্থে তিনি পিতা রাধাচরণ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানবান ব্যক্তি ও কবি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বৃন্দাবনে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব বংশ বলিয়া মনে হয়, নচেৎ তিনি অল্পবয়সে বাঁকা বিহারীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিতেন না। মনে হয় জীবনের প্রথম দিকে তিনি বঙ্গদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে বৃন্দাবনে। তাঁহার লিখন হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় তিনি বৃন্দাবনে এক সাধু জীবন যাপন করিতেন। তিনি বৃন্দাবনে নিজ গুরু কৃষ্ণদেবের সহিত কাজ করিয়াছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর বাঁচিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের আগ্রহের পরিধি অতি বিস্তৃত, অবশ্যই। শ্রুতি ও ন্যায় শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ব্যতীত, তিনি একজন কাব্য লেখক ছিলেন।

তাঁহার প্রবন্ধাবলী

আমরা এ যাবৎ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ-সকলের যথেষ্ট সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরম্পরাগত মতবাদে বুঝা যায় তিনি বিশালাকার গ্রন্থের লেখক ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা নিম্নোক্তগুলি জানিঃ—

দিধিতি প্রকাশিকা

ইহা কবিকর্ণপুরের অলঙ্কার কৌস্তভের উপর টীকা। ইহাতে তিনি নিজ পিতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহা হইতে বুঝা যায় যে তখনও তিনি গৃহেই ছিলেন ও সাধু হইয়া যান নাই, কারণ সাধুগণ সাধারণতঃ নিজ পিতাগণের নাম উল্লেখ করেন না। মনে হয় এইটি তাঁহার গোবিন্দ লীলামৃতের টীকা 'সদানন্দ' অপেক্ষা পূর্বের গ্রন্থনা, যাহাতে (সদানন্দে) তিনি নিজেকে ত্যাগী সাধু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং গুরুর সহিত সম্বন্ধ সূত্রে নিজের কথা বলিয়াছেন, যেমন ত্যাগী সাধুগণ করেন।

ইণ্ডিয়া অফিসে বৃন্দাবনের 'দিধিতি প্রকাশিকা'র এক সুন্দর পাণ্ডুলিপি আছে (এগেলিং এর তালিকা নং ২৪০)।

সদানন্দ বিধায়িনী

কৃষ্ণদাসের গোবিন্দ লীলামৃতের উপর তাঁহার বিখ্যাত টীকা। তারিখ শক ১৭০১ (সন ১৭৭৯) ও বৃন্দাবনে লিখিত। প্রারম্ভে নিজ পারমার্থিক পরম্পরা সময়ানুক্রমিক ভাবে প্রদান করিয়াছেন (বৈষ্ণব মঞ্জুষা প্রথম খণ্ড পৃ-২)।

গোবিন্দ ভাষ্য

(ইহা প্রণয়নের ইতিহাস)

প্রাচীন রাজধানী অম্বরের অতি নিকটস্থ গল্‌তা (বামটি)-তে অবস্থিত গোবিন্দদেবের রামানন্দীয় সম্প্রদায়ের ও গৌড়ীয় গোস্বামী পুরোহিতগণের মধ্যে এক প্রচণ্ড বাদানুবাদ দেখা দেয়। আমরা জানি মুসলিম মূর্ত্তিভঙ্গকারীদের নিগ্রহ হইতে বাঁচাইবার জন্য অম্বরের রাজপুত্র রূপ গোস্বামীর গোবিন্দদেবকে গল্‌তায় স্থাপন করেন। উত্তর ভারতের রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রধান কার্যালয় ছিল পৈহারী কৃষ্ণদাস (যিনি মানসিংহের প্রপিতামহ পৃথ্বিরাজকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন) এর আমল হইতেই এই গল্‌তায়। অম্বরের রাজকুমার রামানন্দী সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য জমি দান করিয়াছিলেন (বর্ত্তিপ্রকাশিকা টীকা-নাভাজীর ভক্তমালার উপর, গৌড়ীয় সংখ্যা ৬-পৃঃ ২০৬)। রাজা জয়সিংহ (১) গল্‌তায় এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করাইয়া মানসিংহের গুরু রূপের গোবিন্দদেবকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। রামানন্দী সম্প্রদায় যখন দেখিলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায় অম্বরের রাজকুমারের

অধিকতর প্রীতিভাজন হইয়াছেন তখন তাঁহারা অবশ্যই অতীব ক্রোধান্বিত হইল। পূর্ব্বকালে রাজা মানসিংহ ও তাঁহার পরবর্ত্তী অধস্তনগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভুগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকিতেন! সেইজন্য রামানন্দী সম্প্রদায় তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বৈরী প্রকাশে সাহস দেখাইতে পারিতেন না। গল্‌তার গোবিন্দ মন্দিরের গৌড়ীয় গোস্বামী পুরোহিত গণের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রশমিত হইতে থাকে ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ সাধারণ পুরোহিতে পর্য্যবসিত হয়, তখন স্থানীয় রামানন্দী সম্প্রদায়ের পণ্ডিত স্থানীয় সাধুগণ নানা প্রকার ছলে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে থাকে যাহাতে তাঁহাদিগকে গোবিন্দ মন্দিরের সেবা হইতে বঞ্চিত করা যায় ও সেই স্থান হইতে গৌড়ীয়গণকে বিতাড়িত করা যায়। রাজকুমার জয়সিংহ শুনিলেন যে গৌড়ীয়গণের পুরোহিতের কার্য্য করিবার মত যোগ্যতা নাই, যেহেতু তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইবার মত কোন গুণ নাই, তখন তিনি অতিশয় বিব্রত হইলেন। তাঁহারা পদ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিতর্ক উঠাইলেন, "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রস্তে নিষ্ফল মতঃ অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি কত্বরঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক বৈষ্ণবঃক্ষিতি-পাবনঃ কত্বারস্তে কলৌভাব্যঃ সম্প্রদায় প্রবর্তকঃ"—যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন স্বীকৃত আস্তিক্যবাদী সম্প্রদায়ের আনুগত্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাহা উক্ত শাস্ত্র অনুসারে এই কলিযুগে সংখ্যায় চারিটি যাহা চারিজন যথাক্রমে চারিজন মহান আচার্য্য যথা বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, রামানুজ ও মধ্ব যাঁহারা আবার রুদ্র, সনৎকুমারগণকে, লক্ষ্মীকে ও ব্রহ্মাকে তাঁহাদের যথাক্রম প্রথম গুরু রূপে স্বীকার করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মন্ত্র কার্য্যকরী হয় না। গৌড়ীয়গণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া আরও জানায় যে তাঁহাদের দার্শনিক প্রথা বেদান্ত ও উপনিষদের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত তাহা প্রমাণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। মন্দিরস্থ বাঙ্গালী পুরোহিতগণ নিজেদেরকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন, কিন্তু রাজা জয়সিংহ (২) ছিলেন এক মহান্ পণ্ডিত ব্যক্তি, তিনি নিজ হইতে গৌড়ীয় পুরোহিতগণকে বিতাড়িত করিয়া রামানন্দী সম্প্রদায়ের হাতে বিগ্রহ সেবার ভার অর্পণ করিতে রাজি হইলেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রধানগণের সহিত বিতর্ক করেন। সুতরাং তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে গল্‌তায় আসিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন ও বিপরীত পক্ষকে স্তব্ধ করিয়া দিতে, যদি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়,

তাঁহার মতবাদের দৃঢ়তা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়া নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে। বিশ্বনাথ তখন অতি বৃদ্ধ হওয়ায় গল্‌তায় আসিতে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু তাঁহার নবীন শিষ্য বলদেব ও কৃষ্ণদেবকে পাঠাইলেন; ইঁহারা ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে দুই উদীয়মান তারকা।

এই বিতর্কে মোটামোটি দুইটি প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছিল, গৌড়ীয়গণ মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কিনা, যদি হয় তাহা হইলে তাঁহারা মূল সম্প্রদায়ের সহিত দর্শনে ও আচার-অনুষ্ঠানে ঐক্য প্রমাণ করিতে হইবে; অথবা তাঁহারা নিরপেক্ষ কিনা, যদি হয় তাহা হইলে তাঁহাদের বেদান্তের উপর টীকা অবশ্যই থাকিতে হইবে। ইহাই প্রতিষ্ঠিত রীতি যে কোন সম্প্রদায় নিজেকে নিরপেক্ষ প্রমাণ করিতে সেই বেদান্তের সূত্র সকল হইতে নিজেদের পক্ষে উহার সমর্থন বা সামঞ্জস্য প্রমাণ করিতে হইবে। গৌড়ীয়গণের এক অদ্ভুত অবস্থান ছিল, তাঁহাদের ঐতিহাসিক মূল ছিল মধ্ব সম্প্রদায় হইতে, কিন্তু তাঁহাদের সূত্রের ভাষ্যকে নিজস্ব বলিয়া গৃহীত হয় নাই, কারণ তাঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকেই স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্ব শুদ্ধদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিতেন নিজেদের সূত্রভাষ্যে। গৌড়ীয়গণ তাঁহাদের দর্শন ও আচার অনুষ্ঠানে মধ্বের সহিত এমনই প্রভেদ ছিল যে, অন্যান্য সম্প্রদায়গণ তাঁহাদিগকে মধ্ব বলিয়া গণ্য করিতেন না। শ্রীচৈতন্য অথবা ষড়্‌গোস্বামীগণ কেহই পুরাপুরিভাবে মধ্বের সূত্র ভাষ্যকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের স্বীকৃত মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই অথবা তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব টীকাও রচনা করেন নাই। এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে গোস্বামীগণ মধ্বের টীকা ও মত নিজেদের মতের পক্ষ সমর্থনে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এই বুঝায় না যে তাঁহারা পুরাপুরি সেগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা মধ্ব হইতে যেমন গ্রহণ করিয়াছেন তেমনই রামানুজ, শ্রীধর ও অন্যান্য আচার্য্যগণেরও কিছু কিছু করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য বারাণসীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের সহিত আলোচনায় ও অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গে ভাগবত পুরাণকে বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে কিভাবে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতে ও জীব গোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে, চৈতন্যের মতকে আরও শক্তিশালী করিতে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ভাগবতকেই বেদান্তের

প্রামাণ্য ভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে ভাগবত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একান্ত অধিকার ভুক্ত নহে। ইহা এক প্রাচীন গ্রন্থ ও প্রতিটি বৈষ্ণব ইহাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। রামানন্দী সম্প্রদায় দাবী করে যে হয় গৌড়ীয়গণ মধ্বের সহিত তাঁহাদের একত্ব প্রমাণ করুন ও তাঁহার ভাষ্য ও পূজা-অর্চনাদির ধারা স্বীকার করুন এবং যথাযথ ভাবে অথবা তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব টীকা (বেদান্তের উপর) প্রকাশ করুন যদি তাঁহাদিগকে এক নিরপেক্ষ সম্প্রদায়রূপে স্বীকার করিতে হয়।

বলদেব এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ও তাঁহাদের মতবাদ ও দর্শনের মৌলিক বিষয় বস্তুগুলির সাম্প্রদায়িক উৎস নির্ণয় করিলেন ও মধ্বের মধ্যেও নির্ণয় করিবার কালে গৌড়ীয়গণের মতবাদ ও আচরণের মূলঅবদান ও পার্থক্যসূচক দিক্‌গুলির উপর জোর দিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহাদের (গৌড়ীয়দের) প্রথাকে মধ্বগণের অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপিত হয়। পূর্বেই অমরা গৌড়ীয় ও মধ্বগণের মিল বিষয় গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছি যখন মধ্ব ও তাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত তুলনামূলক অবতারণা করা হইয়াছিল। শ্রীবলদেব প্রথমে গৌড়ীয় ও মধ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পত্রালাপ প্রদর্শন করেন যাহাতে পরবর্তী সম্প্রদায়ের প্রবর্তিত নয়টি 'সত্য' বিষয়ে কথা ছিল, যথা; (১) বিষ্ণু সবার ঊর্দ্ধে, (২) বিষ্ণুকে বেদের মাধ্যমে জানা যায়, (৩) জগৎ সত্য, (৪) জীব সকল বিষ্ণু হইতে ভেদযুক্ত, (৫) তাহারা বিষ্ণুর দাস, (৬) আত্মা সকলের মধ্যে কি মুক্তদশা, কি বদ্ধদশা তাহাদের অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তনের ধাপ আছে, (৭) বিষ্ণুর চরণেও মুক্তি, (৮) ভক্তি দ্বারা তাহা লভ্য হয়, (৯) শ্রুতি, সিদ্ধান্ত, ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি—এই তিনটি প্রমাণ। বলদেব প্রতিপক্ষকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন গৌড়ীয়গণ তাঁহাদের নিজস্ব পন্থায় এই বিষয়গুলিকে আরও উন্নত ধরণের করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহাদের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রবর্তন করার পরিণতি লাভ হয়। গৌড়ীয়গণ মধ্ব হইতে ভেদ যুক্ত নহেন, কিন্তু বিপরীত পক্ষে জীবে ও ঈশ্বরে ভেদের মাধ্ব দর্শনের ভিত্তিতে আংশিক ভাবে তাঁহাদের মতবাদের ভিতের উপর গাঁথনি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অন্যত্র আমরা মন্তব্য করিয়াছি যে যদিও মধ্ব শুদ্ধদ্বৈতবাদ দর্শনের প্রবর্তক, যাহা তাঁহার সকল প্রকার লিখনের (রচনার) মূলভাব, তথাপি তিনিই

সর্বপ্রথম 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের ধারণা প্রদাতা ও উল্লেখকর্তা—যাহা তাঁহার ভাগবত তাৎপর্য্যে (১১-৭-৫১) উল্লেখিত হইয়াছে, সেখানে তন্ত্রের উপর এক প্রাচীন গ্রন্থনা 'ব্রহ্মতর্কে'র এক শ্লোক উদ্ধৃতি করিয়াছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী জানিতেন যে মধ্বাচার্য্যের ভাগবত তাৎপর্য্যের মধ্যে তাঁহার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র সূত্র রহিয়াছে, তাঁহার ষট্ সন্দর্ভের প্রারম্ভে তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে তিনি মধ্বের তাৎপর্য্য অনুসরণ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে লিখিত বিবরণ 'ব্রহ্মতর্ক' ইত্যাদিতে গ্রহণ করিয়াছেন ও সেগুলি সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যদিও পরবর্তী গ্রন্থটির মূলটির অনুশীলন করিতে পারেন নাই।

বলদেব পরবর্তীকালে এই আলোচনা তাঁহার 'সিদ্ধান্তরত্ন', 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ ভাষ্যের টীকায় ও অন্যান্য গ্রন্থাদিতেও করিয়াছেন, যাহাতে তিনি মধ্বের প্রতি চরম আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়াছেন, যদিও রামানন্দী সম্প্রদায়ের স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে গৌড়ীয়গণ মধ্ব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাদের দার্শনিক প্রথায় কিছু কিছু ব্যাপারে মধ্বের প্রতি তাঁহারা ঋণী, তথাপি তাঁহারা দাবি করিয়া বসিলেন বলদেবকে তাঁহাদের নিজস্ব কোন টীকা দেখাইতে হইবে, যখন মতবাদীয় ভাবে মধ্ব যাহা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও অধিক বক্তব্য তাঁহাদিগের আছে এবং তাঁহাদের নিজস্ব উজ্জ্বল এক দার্শনিক পদ্ধতি আছে, যাহা তাঁহারা মার্জিত ও উন্নত করিয়াছেন। ইহা সত্য যে যদিও মধ্ব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি ইহার উপর তিনি গুরুত্ব দেন নাই। তিনি নিজেকে শুদ্ধদ্বৈতবাদের প্রিয় মতবাদের উপর আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন—যাহা এমনভাবে অদ্বৈতবাদের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন যাহা গৌড়ীয়গণেরই বিশেষত্ব। রামানন্দীয় পণ্ডিতগণের ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্যরূপে স্বীকৃতি দান না করায়, বিপক্ষীয়গণকে স্তব্ধ করিতে বলদেবকে 'গোবিন্দ ভাষ্য' রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কথিত আছে যে বলদেবকে অষ্টাদশ দিবস সময় দেওয়া হইয়াছিল সূত্রভাষ্য পেশ করিবার জন্য। বলদেব তাঁহার 'ভাষ্য পীঠকে' আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে স্বয়ং ভগবান্ গোবিন্দ এক স্বপ্নে তাঁহাকে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন সেই ভাষ্য লিখনের জন্য (৮-৩১)। বলদেব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভাষ্য লেখা শেষ করেন

ও রাজকুমারের প্রশংসা অর্জন করেন এবং পুনরায় রামানন্দীয় সম্প্রদায়ের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হন ও তাঁহাদের সকল প্রকার যুক্তিকে স্তব্ধ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের চরমোৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়ীয় জগৎ প্রতিপক্ষীয়গণের হাতে অসম্মানের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য বলদেবের নিকট ঋণী ও সকল সন্দেহাদি নিরসন পূর্বক প্রভুত্বব্যঞ্জক সম্প্রদায়রূপে স্বীকৃতির জন্যও। সন্দেহ নাই যে যদি রূপগোস্বামীর গোবিন্দদেব যিনি সম্প্রদায়ের প্রধান বিগ্রহ তাঁহাকে বিপক্ষীয় সম্প্রদায়ের অধিকারভূত হইতে হইত এবং যদি বাঙ্গালী পুরোহিতগণ অম্বর হইতে বিতাড়িত হইতেন তাহা হইলে পশ্চিম ভারতে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে এক বিরাট ধাক্কা খাইতে হইত। গৌড়ীয় মিশনের ব্যাপক সাফল্য অন্য সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি করে যাহার ফলে শ্রীজীবের অপ্রকটের পর এবং বিশ্বনাথ ও বলদেবের আগমনের পূর্বে সুযোগ গ্রহণ করে, সেই সময় টুকুর মধ্যে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্রজে এমন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইয়াছিল, যিনি উগ্র সম্প্রদায়ের উৎপাত রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন।

শ্রীউদ্ধব দাস

ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা যথা—

"কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর উদ্ধব দাস।
জিতমিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৩

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রী উদ্ধবদাস নামে আরও দুইজন বৈষ্ণবের নাম উল্লেখিত আছে।

(১) নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের তটে কুটীরে থাকিয়া ভজন করিতেন। ইনি সনাতন গোস্বামীর অনুগত ছিলেন। (২) মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞাগ্রামবাসী শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীউদ্ধব দাস। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীকৃষ্ণকান্ত মজুমদার।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীযদুনাথ দাস কৃত শাখা নির্ণয়ামৃত ৩৫ উক্ত হইয়াছে—

"অতি দীনজনে পূর্ণ প্রেমচিত্ত প্রদায়কম্।
শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্।।"

দ্রষ্টব্য ঃ "অনুভাষ্য" শ্রী চৈঃ চঃ আঃ ১২।৮৩

শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে বার্দ্ধক্য হেতু গোবর্দ্ধনে যাইয়া গোপালদেবের দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। গোপালদেবকে দর্শনের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া গোপাল ম্লেচ্ছের ভয়রূপ ছল উঠাইয়া মথুরাতে শ্রীবল্লভ ভট্টের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথের গৃহে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীগোপালদেবের দর্শন সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী যে সকল ভক্তগণের সহিত মাসাধিক কাল গোপালদেবের শ্রীমূর্ত্তি মথুরার বিঠ্‌ঠলনাথের গৃহে দর্শন করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীউদ্ধব দাস ছিলেন অন্যতম।

ভক্তিরত্নাকরে ষষ্ঠে তরঙ্গে—

"শ্রীউদ্ধব—মধ্যে গতি গৌড়ে যাঁর।।"

শ্রী চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৫১—

"শ্রীউদ্ধব দাস, আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপাল দাস, আর দাস নারায়ণ।।"

ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে ১৩৩৩ সংখ্যায়—

"শ্রীউদ্ধব দাস, মাধবাদি যে যে ছিলা।
পরস্পর মিলি সবে মহা হর্ষ হৈলা।।"

শ্রীউদ্ধব দাস বৃন্দাবনে বাস করিতেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীরাঘব গোস্বামী বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা কালে ইঁহার কুটীরে আসিতেন। আর ইনিও পরম আদরের সহিত তাঁহাদের সেবা-সৎকার করিতেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীজীব গোস্বামী প্রদত্ত গোস্বামিগণের গ্রন্থ সম্পূট গো-শকটে রাখিয়া মথুরা হইতে উত্তরবঙ্গাভিমুখে বিদায়কালে যাঁহারা তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীউদ্ধব দাস অন্যতম। ভক্তিরত্নাকর ষষ্ঠ তরঙ্গ ৫১৪ সংখ্যায়—

"শ্রীগোবিন্দ, বাণী কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যার।।"

শ্রীদামোদর পণ্ডিত (দামোদর ব্রহ্মচারী)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে (১৫৯) বলা হইয়াছে—"ব্রজে যিনি প্রখরা শৈব্যা ছিলেন, তিনি দামোদর পণ্ডিত, কোন কার্য্যবশত, সরস্বতীদেবীও তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।"

চৈঃ চঃ আঃ ১০।৩১ অনুসারে তিনি শ্রীচৈতন্যের গণে গণিত হন।

"দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড।।"

শ্রীমহাপ্রভু যৎকালে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুরে (শ্রীনিত্যানন্দের চাতুরী ক্রমে) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে আনীত হইয়াছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা শচীমাতা সহ মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এবং শচীদেবীর আজ্ঞা মত শান্তিপুর হইতে নীলাচলে অবস্থানের জন্য মহাপ্রভুর সঙ্গী হিসাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীমুকুন্দ দত্ত সহ শ্রীদামোদর পণ্ডিতও সঙ্গীরূপে ছিলেন।

নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। যে বাসুদেব সার্বভৌম সেকালে মায়াবাদী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন সেই বাসুদেব মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে মায়াবাদবিচার ত্যাগ করিয়া এমনই শুদ্ধভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন যে তিনি 'মুক্তি' শব্দটি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারিতেন না, পরিবর্ত্তে 'ভক্তি' শব্দটি প্রয়োগ করিতেন। তিনি শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত মারফৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমাব্যঞ্জক যে দুইটি শ্লোক যথা 'বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তি যোগ ....' ও 'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ ....' তালপত্রে লিখিয়া মহাপ্রভুর দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া তিনি সেইগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, তবে শ্রীমুকুন্দ দত্ত পূর্বেই সেই শ্লোক দুইটি বাহিরভিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহা সংরক্ষিত হইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের কণ্ঠহার হইয়া রহিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে অবস্থান করিয়া বৈশাখ মাসে একাকী দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিবেন মনস্থ করিলে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ বিরহ সন্তপ্ত হইলেন। সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু

কৃত্রিম নিন্দাচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি।।
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার।।
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণ কৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে।।

—(চৈঃ চঃ মঃ ৭।২৫-২৭)

এই বলিয়া দামোদর ব্রহ্মচারীর নিরপেক্ষতায় মহাপ্রভু কটাক্ষ করিয়াছিলেন; আর নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রতি বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে,—"আমি-নর্ত্তক, তুমি—সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তণ আমার।।
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লইয়া আইলে অদ্বৈত ভবন।।
নীলাচলে আসিতে, পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য্য-ভঙ্গ।।
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে।।
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কথা।।
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম্ম।
তিনবারে শীতে স্নান ভুমিতে শয়ন।।
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি 'মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে।।'

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৮-২৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিয়া আসার সংবাদ পাইলে—

"প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায়।।
জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ।।"

—চৈঃ চঃ মঃ ৯।৩৩৯-৩৪০

ইঁহারা সকলেই আলালনাথে যাইয়া মিলিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কালা কৃষ্ণদাসের (কৃষ্ণদাস বিপ্রের) আচরণ সম্বন্ধে বাসুদেব সার্বভৌমকে জানাইয়া তাহাকে আর সঙ্গে না রাখিয়া বিদায় দিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে বলিয়াছিলেন কারণ তাহার অপরাধ ছিল এই যে সে দক্ষিণ ভারতে ভট্টথারি স্ত্রীগণের দ্বারা প্রলোভিত হইয়া মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, মহাপ্রভু তাহাকে কোনমতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কালা কৃষ্ণদাস ক্রন্দন করিতে থাকায় নিত্যানন্দ জগদানন্দ, মুকুন্দের সহিত দামোদর পণ্ডিত কালা কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে এই যুক্তি স্থির করেন যে মহাপ্রভুর দক্ষিণ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসার সংবাদটি নবদ্বীপে যাইয়া শচীমাতা, অদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে জানাইবে। তাঁহারা সংবাদ শুনিয়া পরমোল্লসিত হইলেন। পরে শ্রীদামোদর পণ্ডিত পুরী হইতে গৌড়দেশে আসিয়া কালা কৃষ্ণদাসের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

দামোদর পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর গৌরবযুক্ত প্রীতি, কিন্তু দামোদরের ছোট ভাই শঙ্কর পণ্ডিতের প্রতি গৌরবহীন শুদ্ধা প্রীতি। শঙ্কর পণ্ডিতের হিতের জন্য তাঁহার দেখাশুনার ভার মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। শঙ্কর পণ্ডিত শেষলীলাতে মহাপ্রভুর সম্মুখে থাকিতেন এবং রাত্রে মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করিতেন। কোন কোন দিন মহাপ্রভু শঙ্কর পণ্ডিতের অঙ্গের উপর শ্রীচরণ রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন।

পুরীতে সিদ্ধ-বকুলে যাইয়া দামোদর পণ্ডিত নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের সহিতও মিলিত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

একদিবস মহাপ্রভু নিজ আবাসে ভক্তগণকে ভোজন করাইবার জন্য স্বয়ং পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলে, ভক্ত কেহই প্রসাদ সেবা করা হইতে বিরত থাকিলে, স্বরূপ দামোদরের প্রার্থনায় মহাপ্রভু নিত্যানন্দাদি সহ প্রসাদ সেবা করিতে বসিলে ভক্তগণও নিঃসঙ্কোচে প্রসাদ সেবা করিয়া ছিলেন, সেই সভায় স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত পরিবেশন করিয়াছিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে বা বাসুদেব সার্বভৌম নিত্যানন্দাদি ভক্তগণের সহিত যুক্তি স্থির করিলেন যে মহাপ্রভুর সহিত মিলনের কথা সরাসরি না বলিয়া রাজ ব্যবহারের কথা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিবেন। 'মহাপ্রভু কৃপা করিলে রাজ্য ছাড়িয়া রাজা ভিখারী হইবেন' ইত্যাদি প্রগাঢ় ভক্তির কথা ব্যক্ত করিলে মহাপ্রভু অন্তরে দ্রবীভূত হইলেও বাহিরে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেন যাহার মধ্যে দামোদর পণ্ডিতের সম্বন্ধেও মন্তব্য করিলেন।

'তোমা সবার ইচ্ছা,—এই আমারে লঞা।
রাজাকে মিলহ ইঁহ কটকেতে গিয়া।।
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন।।
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে।।'

—চৈঃ চঃ মঃ ১২।২৩-২৫

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া দামোদর পণ্ডিত অভিমানভরে বলিলেন,—মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উনি সবই জানেন, সাধারণ ক্ষুদ্র জীব এ বিষয়ে তাঁহাকে কি বিধি দিতে পারে; তিনি স্নেহবশ, রাজা তাঁহাকে স্নেহ করেন, একদিন তিনি অবশ্যই রাজার সহিত মিলিত হইবেন; ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র হইলেও স্বভাবে তিনি প্রেম পরতন্ত্র।

পুরীতে রথযাত্রাকালে রথাগ্রে সাত সম্প্রদায়ের নৃত্য কীর্ত্তনে প্রথম সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনে পাঁচজন দোহারের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত একজন ছিলেন। মূল কীর্ত্তনায়া স্বরূপ দামোদর এবং নর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

গৌড় দেশের ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর গৃহিনীগণ সহ নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নীলাচল হইতে যাত্রাকালে মহাপ্রভুর সঙ্গীগণের অন্যতম ছিলেন পণ্ডিত দামোদর। যদিও সেই বৎসর সনাতন গোস্বামীর উক্তি চিন্তা করিয়া কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে যাওয়া হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তর ভারত, বৃন্দাবন ধাম পরিভ্রমণ করিয়া যখন বলভদ্র সহ পুনঃ ঝাড়িখণ্ডপথে আঠার নালায় ফিরিয়া আসিলেন, সে-সংবাদ পাইয়া ভক্তগণ আসিয়া নরেন্দ্র সরোবরে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। সে কালে শ্রীদামোদর পণ্ডিতও মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভ করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম ধামে ওড়িশাদেশীয় কোন সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি সুন্দর দর্শন পুত্র প্রত্যহ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইত, প্রণাম করিত ও অত্যন্ত প্রীতিভরে কথা বলিত। মহাপ্রভুও পুত্রটিকে স্নেহ করিতেন। মহাপ্রভুর সহিত ছেলেটির হৃদ্যতা দামোদর পণ্ডিতের সহ্য হইল না। দামোদর একদিন সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎভাবে বলিয়া দিলেন ঃ

"অন্যোপদেশে পণ্ডিত—কহে গোসাঞির ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি'।।
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরষোত্তমে হইবে।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১১-১২)

দামোদর পণ্ডিতের এই রহস্যোক্তির তাৎপর্য্য মহাপ্রভু জানিতে চাহিলে দামোদর পণ্ডিত খুলিয়া বলিলেন,—'আপনিও স্বচ্ছন্দে আচরণ করেন, আপনাকে কে কি বলিতে পারে, কিন্তু মুখর জগতের মুখ আচ্ছাদন করিতে পারিবেন কি? পণ্ডিত হইয়া বিচার করেন না কেন? বিধবা ব্রাহ্মণীর ছেলের সহিত এত প্রীতি করেন কেন? ব্রাহ্মণী তপস্বিনী সতী হইলেও তাঁহার দোষ তিনি সুন্দরী যুবতী। আপনিও পরম সুন্দর যুবক। ছেলেটির সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা মুখর, ইহা কি বুদ্ধিমত্তা?' ঐরূপ বলিয়া দামোদর পণ্ডিত চুপ করিয়া থাকিলে মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।।"

মহাপ্রভু একদিন দামোদর পণ্ডিতকে শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইতে বলিলেন,—

"তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান।।

তোমা-সম ‘‘নিরপেক্ষ’ নাহি মোর গণে।
‘নিরপেক্ষ’ নাহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।।”

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।২২-২৩)

নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট যাইতে বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন মধ্যে মধ্যে পুরীতে আসিয়া মিলিত হইতে এবং শচীমাতা কোটি প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া একটি গূহ্য শুনাইতে বলিলেন—“শচীমাতার গৃহে মহাপ্রভু বার বার আসেন মিষ্টান্নাদি ভোজন করিতে। মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে বার বার শচীমাতা ভোগ দেন, মহাপ্রভুও সব খান, শচীমাতা শূন্যপাত্র দেখিয়া বিরহ-দশায় ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন ভোগ দেন নাই, পুনরায় স্থান সংস্কার করিয়া ভোগ দেন, মহাপ্রভু পুনরায় যাইয়া ভোজন করেন। শুদ্ধ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া মহাপ্রভু শচীমাতার নিকট সর্বদাই বিরাজিত আছেন।”

মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে জগন্নাথের প্রসাদ দিয়া নবদ্বীপে যাইয়া শচীমাতা ও সকল ভক্তগণকে দিতে বলিলেন। ভক্তগণ দামোদর পণ্ডিতের সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া ভয়ে ভয়ে চলিতেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। প্রভুর গণের মধ্যে কাহারও অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন দেখিলেই দামোদর পণ্ডিত বাক্যদণ্ডের দ্বারা মর্য্যাদা স্থাপন করিতেন।

‘এই ত’ কহিল দামোদরের বাক্যদন্ত।
যাহার শ্রবণে ভাগে ‘অজ্ঞান’ ‘পাষণ্ড’।।’

যে সকল গৌরপার্ষদগণের প্রচারফলে কৃষ্ণনামপ্রেম জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত অন্যতম। মহাপ্রভু তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন,—

‘কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার।
ইঁহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার।।”

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৫০)

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে জানা যায় দামোদর পণ্ডিতের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের মিলন হইয়াছিল।

“তথা দামোদর পণ্ডিতের দরশনে।
হইয়া অধৈর্য্য প্রণমিলা সে চরণে।।”

(ভঃ রঃ ৮।৯৩)

শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী বা শ্রীনৃসিংহানন্দ

"শ্রীনৃসিংহ উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা 'নৃসিংহানন্দ" করি।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।৩৫

" 'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী'—তাঁর নিজ নাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম কৈলা গৌরধাম।"

—চৈঃ চঃ আঃ ২।৫৩

'প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত ভক্তকে পরস্পর বৈশিষ্ট্যবিহীন অর্থাৎ একই প্রকার সেবক বা অভিন্নরূপে দেখা যায় কিন্তু নৃসিংহানন্দের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হওয়ায় তাঁহাকে ঠিক শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় অন্যান্য সকল ভক্ত অপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক ঈশ্বর-চেষ্টাযুক্ত কৃষ্ণপ্রেমময়রূপ শ্রীশিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্ত দর্শন করিলেন। "—চৈঃ চঃ আঃ ১০।৫৭

শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর 'অনুভাষ্য' শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৮।১২—

"চলিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সঙ্গে কথা কয়।।"

হইতে জানা যায়, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহদেবের সহিত সাক্ষাৎভাবে কথা বলিতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন-যাত্রা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৌশলে তাঁহাকে গঙ্গা তীরবর্ত্তী শান্তিপুরে শ্রী অদ্বৈতভবনে লইয়া যান। তথা হইতে মহাপ্রভু পুরী যাত্রাকালে সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত ছিলেন। পুরী হইতে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া তিনি গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন-যাত্রার সংকল্প করেন। গৌড়দেশে যাইয়া শ্রীসার্ব্বভৌম-ভ্রাতা শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি গৃহে অবস্থান, কুলিয়া গ্রামে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীগোপাল-চাপালের অপরাধ ভঞ্জন, রামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন; শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রত্নদ্বারা পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া

গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই-নাটশালা' পর্য্যন্ত আসিয়া আর পথ বাঁধিতে পারিলেন না, ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায়। শ্রীনৃসিংহানন্দ (শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী) বুঝিতে পারিলেন মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিবেন। বৃন্দাবন যাইবেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকসমূহ নিস্তার করিবার জন্য যেভাবে তিনি সাক্ষাৎ দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব দ্বারা, যথা 'সাক্ষাৎদর্শন' প্রদান করিয়া, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইয়া এবং প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্মুখে 'আবির্ভূত' হইয়া প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। (১) শ্রীশচীর গৃহমন্দিরে, (২) শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনস্থলে, (৩) শ্রীরাঘব ভবনে ও (৪) শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে—এই চারিটি স্থানে মহাপ্রভু নিত্য 'আবির্ভাব' প্রকটিত করিতেন। গৌরগণোদ্দেশে ৭৪ শ্লোকে—"আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়া মিশ্রে প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞকে"—প্রদ্যুম্ন মিশ্রেও তাঁহার আবেশ জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্লোকটির অনুভাষ্যে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী উড়িষ্যাগামী প্রদ্যুম্ন মিশ্র সম্বন্ধে প্রয়োগ না করিয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানেও শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাঁহাকে 'গৌরের আবেশ' বলা হইয়াছে। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অধ্যায়ে—"যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ," ও অন্ত্য ৯ম অধ্যায়ে—"সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়।"

" 'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছে ত রাখিল।।
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।৫৮-৫৯

শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিলা, তাহা শুন মন দিয়া।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৬

শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন এক বৎসর প্রভুকে দর্শনের উৎকণ্ঠায় একাকী পুরুষোত্তমে গমন করেন। তথায় তিনি দুইমাস কাল অবস্থানের পর মহাপ্রভু তাঁহাকে এই আদেশ দান করিয়া গৌড়ে প্রেরণ করেন, যে এই বৎসর পৌষমাসে তিনি স্বয়ং গৌড়ে গমন করিয়া, অদ্বৈতাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইবেন। ভক্তগণ যেন এবৎসর পুরীতে না আসেন। শ্রীশিবানন্দকেও এই সংবাদ জানাইতে বলেন ও জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন এইরূপ বলেন। শ্রীকান্ত আসিয়া সেই সংবাদ ভক্তগণকে পরিবেশন করিলে ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পৌষমাস প্রায় অতিক্রান্ত হইতে চলিল, তথাপি সে পর্য্যন্ত মহাপ্রভু না আসিয়া পড়ায় শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীজগদানন্দ দুঃখিত ও হতাশ হইলেন। সেই সময় সহসা নৃসিংহানন্দ তাঁহাদের নিকট আসিয়া ও তাঁহাদিগকে দুঃখী দেখিয়া, তাহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি তৃতীয় দিবসে মহাপ্রভুকে সাক্ষাতে উপস্থিত করাইবেন। শ্রীশিবানন্দ ও জগদানন্দ যেহেতু শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রভাব বিষয়ে অবগত ছিলেন তাই তাঁহারা, তাহা বিশ্বাস করিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ দুইদিন ধ্যানমগ্ন থাকার পর শিবানন্দকে বলিলেন মহাপ্রভু পাণিহাটিতে আসিয়াছেন, আগামী কল্য মধ্যাহ্নে কুমারহট্টে তাঁহার বাটীতে আসিয়া পড়িবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শিবানন্দকে পাক-সামগ্রী আনিতে বলিয়া বলিলেন যে তিনি ভিক্ষা দিবেন। শিবানন্দ তাঁহার চাহিদা মত সামগ্রীসকল আনিয়া দিলেন। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সকাল হইতে নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর প্রভৃতি বহু সামগ্রী পাক করিয়া জগন্নাথের জন্য একটি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য আরও একটি এবং নিজ ইষ্টদেব নৃসিংহদেবের জন্য তৃতীয়টি পৃথক্ পৃথক্ ভোগ নিবেদন করিলেন। অতঃপর বাহিরে ধ্যান করিলেন। প্রদ্যুম্নের ধ্যানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শীঘ্র আসিয়া তিনটি ভোগই খাইলেন, কিছু অবশিষ্ট রহিল না। তাহা দেখিয়া প্রদ্যুম্ন অন্তরে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেও বলিলেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৬৩-৬৫)—

"হাহা কিবা কর" বলি করয়ে ফুৎকার।।
"জগন্নাথ তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ?
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জিয়ে কৈছে দাস?"

তিনটি ভোগ একত্রে ভোজন লীলা দ্বারা মহাপ্রভু প্রদ্যুম্নকে সর্ব-বিষ্ণুতত্ত্ব সহ স্বীয় অভেদ বা ঐক্য প্রদর্শন করিলেন—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি।
জগন্নাথ-নৃসিংহসহ কিছু ভেদ-নাই।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৬৭

মহাপ্রভু ভোজন করিয়া পাণিহাটিতে গেলেন। এদিকে নৃসিংহানন্দ 'হা হুতাশ' করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁহার দুঃখের কারণ জানিতে চাহিলেন। নৃসিংহানন্দ জানাইলেন যে মহাপ্রভু একাকী তিনটি ভোগই গ্রহণ করিলেন, তাহাতে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীনৃসিংহদেব উপবাসী থাকিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীশিবানন্দের চিত্তে সংশয় উপস্থিত হইল। শ্রীনৃসিংহানন্দের ইচ্ছায় শ্রীশিবানন্দ সেন রন্ধনের দ্রব্য দিলে নৃসিংহানন্দ পুনরায় রন্ধন করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে ভোগ দিলেন।

বর্ষান্তরে শ্রীশিবানন্দ সেন ভক্তগণসই নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট পৌছাইলে মহাপ্রভু পৌষ মাসে তাঁহার (শিবানন্দের) বাটীতে শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রদত্ত ভোগ গ্রহণের কথা বলিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

"একদিন সভাতে প্রভু বাত্ চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা।।
"গত বর্ষে পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন।।"
শুনি সভ্যগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ২।৭৬

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নবদ্বীপবাসী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যশাখায় গণিত হন। 'পূর্বে যিনি যজ্ঞপত্নী ছিলেন, তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যাঁহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি পূর্বে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।' (গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৯১)

তাৎকালিক জগদ্বাসীর কৃষ্ণসেবামূলক কৃষ্ণ-কীর্তন-নর্তন-বাদন বা কার্ষ্ণ-তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাহেতু শুদ্ধভক্তমুখে নামকীর্তন-শ্রবণে ভোগের ব্যাঘাত-হেতু নামবিরোধী পাষণ্ডীর ভয় ও দুশ্চিন্তাহেতু জীবহিতৈষী ভক্তগণ কৃষ্ণসমীপে দুঃখ নিবেদন করিতেন। মহাবিষ্ণুর অবতার লোকশাসক অদ্বৈতপ্রভু ক্রোধাবেশে প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিলেন, হে শুক্লাম্বর, হে গঙ্গাদাস, হে শ্রীবাস! শ্রবণ কর; কৃষ্ণ-প্রতীতির অভাবে জগদ্বাসীর এইরূপ দুর্বুদ্ধি হইয়াছে, আমি সকলের সমক্ষে কৃষ্ণকে আনিয়া দেখাইব এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া সকলকেই উদ্ধার করিবেন। তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের সহিত তিনি কৃষ্ণসেবার প্রয়োজনীয়তা সমগ্র জগবদ্বাসীকে বুঝাইয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহাপ্রভু গয়া-রহস্য বর্ণনমুখে সর্বপ্রথম কৃষ্ণবিরহ-প্রেম-বিকার প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণের সমীপে তিনি তীর্থকথা বর্ণনা করিয়া পরদিবস শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীমান-শ্রীবাস-গদাধর-সদাশিবাদি ভক্তবৃন্দের সম্মেলনে মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহ-প্রেম প্রদর্শন করিলেন। সেই অপূর্ব-প্রেমবিকার দর্শনে ও শ্রবণে ভক্তগণের বিস্ময় উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাসের প্রস্তাব দিয়া বলিলেন,—

প্রভু বলে,—ভাই সব, শুন মন্ত্রসার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার।।
আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল
নিশায় করিব সবে কীর্ত্তন-মঙ্গল।।

—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।১০৬-১০৭

সেই কীর্তন-বিলাসারম্ভ হইতেই বহু চৈতন্য-ভৃত্যগণের মধ্যে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী অন্যতম। জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু গঙ্গা স্নানার্থ গমন করিয়া তথায় বিবিধ জলক্রীড়াকালেও শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন।

শ্রীবাসগৃহে নিশা-কীর্তনকালে একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে উপবিষ্ট থাকাকালীন ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর আগমন লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরকে দেখিয়া প্রভু তদীয় গুণাবলী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 'শুক্লাম্বর' নামধারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ভিক্ষুক ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে অর্পণান্তর তদবশেষ দ্বারা দেহরক্ষা করিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণনাম-গুণকীর্তনে নিযুক্ত থাকায় কিছুমাত্র দারিদ্র্য দুঃখ অনুভব করিতেন না। বহির্মুখ লোক তাঁহাকে একজন ভিক্ষুক বলিয়াই জানিত; যেহেতু চৈতন্যকৃপা-পাত্র ব্যতীত অন্য কেহই তদীয় সেবককে চিনিতে পারে না। মহাপ্রভুর সেই ঈশ্বর আবেশকালে শুক্লাম্বরের ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া চিবাইতে থাকিলেন। নিকৃষ্ট কণাযুক্ত চাউল মহাপ্রভু ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া শুক্লাম্বর স্বীয় সর্বনাশের আশঙ্কা জানাইলে মহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে বলিলেন—"তুমি জন্মে জন্মে আমার দরিদ্র ভক্ত। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহপতি হইবার বাসনা তোমার নাই। ব্রহ্মচারি-রূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তুমি আমাকে তোমার ভৈক্ষ্য দ্রব্যসমূহ অর্পণ কর। তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের যে প্রাকৃত-শাব্দিক অহঙ্কার, তাহা হইতেও তুমি নির্মুক্ত। তুমি পারমহংস্যধর্মে অবস্থিত হইয়া অকিঞ্চন তুর্য্যাশ্রমের বর্ণ গ্রহণ করিয়াছ। সুতরাং পূর্ণ শরণাগত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু। তোমার যাবতীয় কায়মনোবাক্য বা চেষ্টা আমাকে সম্পূর্ণভাবে দিতে সমর্থ হইয়াছ। আমি তোমার নৈবেদ্য সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি। তোমার আমাকে সমর্পণ করা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে ভোগপর অভিনিবেশ নাই। সুতরাং আমি বলপ্রকাশ করিয়াই তোমার সর্বস্ব হরণ করিয়াছি, তজ্জন্যই তুমি গরীব।" শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে নিম্নোদ্ধৃত ১৬।১২২-১২৩ শ্লোকের গৌড়ীয়ভাষ্যে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ঃ—

"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্মে জন্মে।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম।। ১২৩।।
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই।। ১২৪।।

প্রভু কর্তৃক শুক্লাম্বরের ঝুলিস্থ চাউল ভক্ষণে শুক্লাম্বর দুঃখ করিয়া বলিলেন—

"শুক্লাম্বর বলে, 'প্রভু কৈলা সর্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ।।'
প্রভু বলে, তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি না চাঙ।।

—ঐ ১২৬-১২৭

সুকৃতি শুক্লাম্বর মহাপ্রভুকে সুখে তণ্ডুল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ইহাই বুঝাইলেন ঐকান্তিক ভক্তের কার্য্যাবলী কৃষ্ণেচ্ছাজনিত।

"প্রভু বলে,—শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি!
তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদা বিহরি।।
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার।।
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান।
নিশ্চয় জানিহ 'প্রেমভক্তি মোর প্রাণ'।।"

—ঐ মধ্য ১৬।১৩৪-১৩৭

শুক্লাম্বরকে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি বরদান শুনিয়া ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বৈদিক নৈবেদ্যদানবিধি অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভুর শুক্লাম্বর-তণ্ডুল গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, অর্চনপথাপেক্ষা অনুরাগ পথের মহিমা অধিক ও কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুক্লাম্বর উহা মহাপ্রভুর ছলনা মাত্র জ্ঞান করিয়া প্রভু-সমীপে অনেক কাকুতি করেন; কিন্তু প্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা দর্শনে শুক্লাম্বর ভক্তগণ-সমীপে বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা শুক্লাম্বরের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে

আলগোছে রন্ধন করিয়া দিবার জন্য যুক্তি প্রদান করেন। শুক্লাম্বর স্নান সমাধান করেন এবং জল উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে তণ্ডুল ও থোড় প্রভৃতি অসংস্পৃষ্টভাবে প্রদানপূর্বক শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে থাকেন। তখন লক্ষ্মীদেবী ভক্ত-অন্নে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিলেন। প্রভু আপ্তগণ-সঙ্গে শুক্লাম্বর-গৃহে আগমনপূর্বক নিজ হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন। তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে অন্নের স্বাদুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি কৃপা দর্শনে ভক্তগণ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে সকলে প্রসাদ-পাত্র তুলিয়া লইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কিয়ৎক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তথায়ই শয়ন করিলেন। ভক্তগণও প্রভুর অনুসরণ করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকাল নিকটবর্তী হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে রথযাত্রা দর্শনার্থ গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে যাত্রাকালে অগণিত গৌড়ীয় ভক্তগণের মধ্যে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীও একজন।

শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে।।

—চৈঃ ভাঃ ম ১৭।১৫১

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব

উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জী হইতে জানা যায়, গঙ্গাবংশীয় রাজা কজ্জলভানু বিজয়যাত্রাকালে রাজ্যে অনুপস্থিত থাকাকালে তাঁহার মন্ত্রী শ্রীকপিলেন্দ্রদেব রাজ সিংহাসন দখল করেন। শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের (অথবা কপিলেশ্বর দেবের) পত্নী শ্রীপার্বতীদেবী। তাঁহাদের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দেব। এই পুরুষোত্তম দেবের পুত্র মহারাজ প্রতাপরুদ্র জননী শ্রীপদ্মাবতী দেবী সহ শ্রীপ্রতাপরুদ্র গৌর পার্ষদ ও গদাধর শাখার অন্তর্গত। প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের রাজধানী ছিল কটকে। পত্নীগণ ও সকল রাজপুত্র সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁহার পত্নীগণের মধ্যে শ্রীগৌরী পট্টমহিষীছিলেন, তাঁহার গর্ভজাত, ভক্তিরত্নাকর ৬।৬৫ অনুসারে, অন্যতম ও জ্যেষ্ঠপুত্র 'পুরুষোত্তম জানা'।

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১১৮ বলেন,—পুরাকালে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীজগন্নাথদেবের পূজক ছিলেন, তিনি এক্ষণে বিভবশালী প্রতাপরুদ্র নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বন্ধে জানা যায় যে—ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধে কোন সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সূর্য্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন মালবদেশের অধিপতি, তাঁহার রাজধানী অবন্তীনগর। তাঁহার রাজ-পুরোহিত বিদ্যাপতিও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব প্রথম পরার্দ্ধে পতিত জীবকে উদ্ধার কল্পে নীলমাধবরূপে নীলাচলে প্রকটিত হন। শবরদেশের অধিপতি বিশ্বাবসু তাঁহার সেবা করিতেন। এই ভগবান্ নীলমাধবই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসুকে অবলম্বন করিয়া শ্রীজগন্নাথরূপে প্রকাশ লীলা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে কৃপা করিবার জন্য বাঙ্কি মোহনায় তিনটি দারুব্রহ্মের আবির্ভাব হয় যাঁহারা বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথরূপে প্রকটিত হন।

রাজা প্রতাপরুদ্রের পুরোহিত শ্রীকাশী মিশ্র, যাঁহার গৃহে মহাপ্রভু বাস করিতেন। সম্প্রতি উহা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। যে সময় মহাপ্রভু নীলাচলে আগমন করেন, সেই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে ছিলেন না। কটকে ফিরিয়া আসিলে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শনের জন্য নীলাচলে আসিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন, স্ত্রীদর্শন ও তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ নিষিদ্ধ। রাজানুগ্রহ প্রার্থী স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ বাসনায় রাজার সহিত মিলন আকাঙ্খা করেন। মহাপ্রভু বৈধ বিচার

জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভোগযোগ্যা স্ত্রীর দর্শন ও রাজানুগ্রহ-প্রার্থনা মূলে রাজার দর্শন ও তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিতেন না। সেইজন্য কোন ভক্তই উৎকল সম্রাটকে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইতে সাহস করিতেন না। রাজা বলেন, যদি তোমরা ভয় পাও তাহা হইলে অগোচরে দর্শন করাও। রাজার আর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণ যুক্তি করিলেন—

"যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে।
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে।।
রাজাও পরমভক্ত—সেই অবসরে।
দেখিলেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে।।"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১৪৫-৪৬)

রাজাও আড়ালে থাকিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত না হইয়া নর্তনশীল গৌরসুন্দরকে দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশ করিয়া উপবেশন করিলে রাজাও অলক্ষিতে চলিয়া গেলেন। রাজা নৃত্য দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। তবে লালা-ধূলাব্যাপ্ত অঙ্গ দর্শনে রাজার মনে সন্দেহ জাগিল। মহাপ্রভুর 'এ-সকল কৃষ্ণভাব না বুঝিয়া' রাজা "ঈশ্বর মায়ায়" মর্ম না জানিয়া সন্দেহ জাগরিত হইলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। গৃহে যাইয়া রাজা শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিলেন।

স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে।।
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা ধারা বয়।।
দুই নাসায় জল পড়ে, নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর।।
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে'—"এ কি রূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা!"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১৬৭-১৭০)

স্বপ্ন-দর্শনকালে রাজা জগন্নাথের চরণ স্পর্শ করিতে গেলে জগন্নাথদেব অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "রাজা, এ তো ঠিক হইতেছে না। তোমার অঙ্গ

কর্পূর, কস্তুরী, গন্ধ, চন্দন, কুঙ্কুমে লেপিত, কিন্তু আমার শরীর দেখ—ধূলা-লালা-ময়" (ঐ ১৭২)। "আমি নাচিবার কালে আমার অঙ্গে ধূলা-লালাময় দেখিয়া তুমি ঘৃণা করিয়াছিলে।" সেই ক্ষণে রাজা দেখিলেন সেই সিংহাসনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বসিয়া আছেন।

রাজা জাগরিত হইয়া চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন আমি মহা অপরাধী, পাপী, দুরাচার; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বর-অবতার তাহা জানিতে পারিলাম না, এই জানিয়া তিনি প্রভু চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এস্থানে বিচার্য্য এই যে প্রতাপরুদ্রের প্রাক্তন কৃষ্ণ-বৈমুখ্য কারণে যে সকল অপরাধ ছিল, তাহা বিদূরিত হইলেও নিজ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর তিনি অধিক নির্ভর করায় নিজ-বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, —ভক্তমাত্র জ্ঞান করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমায়ায় তাঁহার বিচার বিবর্তগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথ তাঁহার নিকট স্বপ্নে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে রাজা বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজার জ্ঞান হইল শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-অভেদ।

রাজা প্রতাপরুদ্র যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপাত্র তাহা প্রায় সকল চরিত গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে। শ্রীরায় রামানন্দকৃত 'শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক', শ্রীকবিকর্ণপুর রচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি অসাধারণ শৌর্যবীর্যশালী রাজা ছিলেন। তৎকালীন বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীরায় রামানন্দের, শ্রীকাশীমিশ্রের ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব বর্ত্তমানের অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পিতা শ্রীপুরুষোত্তম দেব শ্রীজগন্নাথের একান্ত শরণাগত ভক্ত ছিলেন। কথিত হয়, শ্রীজগন্নাথদেব যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রাজাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দেবের সহিত কাঞ্চীনগরের রাজকুমারীর (পদ্মাবতীর) বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে কাঞ্চীরাজা পাত্র দেখিতে পুরীতে আসিলেন। সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় পুরুষোত্তমদেবকে স্বর্ণমার্জ্জনী দ্বারা রথের জন্য রাস্তা মার্জন করিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিলেন ও একজন ঝাড়ুদার চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন। কাঞ্চীরাজা গণেশের ভক্ত ছিলেন,

জগন্নাথের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। তাহা জানিয়া শ্রীপুরুষোত্তম দেব বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া কাঞ্চীরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেও প্রথমবার জয় লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হইলে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে সহায়তা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে, তিনি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এইবার তিনি জগন্নাথ- বলরামের সহায়তায় জয়লাভ করিয়া কাঞ্চীরাজার মাণিক্য সিংহাসনটি হরণ করিয়া জগন্নাথের সেবায় সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চীরাজা নিজকন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব রথযাত্রাকালে সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের রাস্তা ঝাড়ুদিতে থাকিলে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমদেবের রাজত্ব ছিল। অতঃপর ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা প্রতাপরুদ্র রাজত্ব করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন গৌরী, তাহা ছাড়াও আরও চারজন—শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা নামে মহিষী ছিলেন।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যে কালে রাজা প্রতাপরুদ্র কটকে ফিরিয়া আসিলেন, সে সময় মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজা সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—

শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা,–তেঁহো মহা কৃপাময়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।৫)

তাঁহাকে দর্শন করাইবার জন্য সার্বভৌমকে অনুরোধ জানাইলে, সার্বভৌম জানাইলেন—

বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জন।
সপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজদরশনে।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।৮)

— তেঁহো স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নহে পরতন্ত্র।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৫)

ইহা শুনিয়া রাজা সার্বভৌমকে অনুরোধ করিলেন পুনরায় মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলে একবার তাহার দর্শনাকাঙ্খা জ্ঞাপন করিতে। সার্বভৌম প্রতাপরুদ্রের

সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করেন। সার্বভৌমকে ডাকিয়া রাজার স্বীয় প্রভুকৃপাপ্রাপ্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সার্বভৌম জানাইলেন যে তিনি (মহাপ্রভু) রাজদর্শনে দৃঢ় ও অচলা বিতৃষ্ণা জ্ঞাপন করিলে, রাজা দুঃখ করিয়া বলিলেন—

পাপী-নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই-মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার।।
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবে জগৎ নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার।।
তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন।।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা ধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯)

রামানন্দ রায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণ ব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের এক উপায় বলিয়া দিলেন। গৌড় ভক্তগণ গৌড় হইতে আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু আলালনাথ হইতে পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ প্রভু দত্ত মালা লইয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবাগমন দেখিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের ইচ্ছামতে শ্রীগোপীনাথচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। রাজা বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটী ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ সকল ভক্তকে সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত-ভাব মহাপ্রভুকে জানাইলেন। তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দ প্রভু একটি বহির্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দ রায় অন্য এক দিবস রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন; রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেষ দেখিয়া মহাপ্রভু তাহাকে

কৃপা করিলেন। রথযাত্রাকালে রথ বলগণ্ডি পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে উদ্যানের নিকটবর্ত্তী উপবনে মহাপ্রভু নৃত্য পরিশ্রমের কিছু শান্তি করিলেন। এই উদ্যানে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইলে সার্বভৌমের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা প্রতাপরুদ্রদেব একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া ভাগবত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর পদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃপা করিলেন। "এই কথামৃতং" শ্লোক শ্রবণে আপনাকে প্রচুর লাভবান জ্ঞানে—

"তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিলুঁ আলিঙ্গন।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।১১)

মহাপ্রভু পরিচয় জানিতে চাহিলে প্রতাপরুদ্র নিজেকে দাসের দাস বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজ ঐশ্বর্য্যরস দেখাইলেন। এদিকে জগন্নাথের রথ চলিবার কালে গৌড় ভক্তগণ রথ টানিলেও রথ চলিল না। এখন রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র লইয়া ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইয়া মহা মহা মল্লগণকে রথ চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেও কেহই রথ টানিতে পারিল না। ব্যস্ত হইয়া রাজা মত্ত-হস্তিগণকে লাগাইলেন তবুও রথ চলিল না। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন যে রথ কোনমতেই নড়িতেছে না। তখন মহাপ্রভু সমস্ত হস্তিগুলিকে সরাইয়া দিয়া নিজগণকে রথের কাছি টানিবার জন্য দিয়া রথের পিছনে আসিয়া মাথা লাগাইতেই রথ হড়্ হড়্ করিয়া চলিতে লাগিলেন। নিমেষে রথ গুণ্ডিচার দ্বারে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভুর প্রভাব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রেমাবেশ হইল।

শ্রীনন্দোৎসব দিবসে মহাপ্রভু গোপবেশে ভক্তগণ সহ ব্রজলীলা অভিনয় কালে রাজা প্রতাপরুদ্র লীলার সঙ্গীরূপে ছিলেন। বিজয়া দশমী দিনে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে রায় রামানন্দের সহিত কটকে আসিয়া এবং উপবনে বকুলবৃক্ষ তলে রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এখানে ও রাজার আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ কৃপাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি গৌরসুন্দরের এক নাম হয় "শ্রীপ্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা"। ভবানন্দ রায়ের পুত্র

গোপীনাথ পট্টনায়েক রাজার অর্থ নষ্ট করায় প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইয়া বধের ব্যবস্থা করিলে ভক্তগণ গোপীনাথের প্রাণরক্ষার জন্য মহাপ্রভুর নিকটে আসিলে মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া আলালনাথ যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভুকে পুরীতে রাখিবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন।

এত শুনি' কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা।।
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটি চিন্তা মনিলাভ নহে তার সম।।
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন?
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৯৪-৯৬)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধস্তন রাজগণ—

১। কালুয়া-প্রতাপ, ২। কথারুয়া-প্রতাপ, ৩। গোবিন্দ-বিদ্যাধর, ৪। চক্র-প্রতাপ, ৫। নরসিংহদেব, ৬। রঘুরামদেব, ৭। মুকুন্দদেব হরিচন্দন, ৮। রামচন্দ্রদেব, ৯। পুরুষোত্তমদেব, ১০। নৃসিংহদেব, ১১। হরেকৃষ্ণ দেব, ১২। গোপীনাথদেব, ১৩। ২য় রামচন্দ্র দেব, ১৪। বীর কেশরীদেব, ১৫। ২য় দিব্য-সিংহদেব, ১৬। ৩য় মুকুন্দদেব, ১৭। তৃতীয় রামচন্দ্র দেব, ১৮। ২য় বীরকেশরী দেব, ১৯। ৩য় দিব্যসিংহদেব, ২০। ৪র্থ মুকুন্দদেব, ২১। ৪র্থ শ্রীরামচন্দ্রদেব, ২২। ৩য় বীর কেশরীদেব, ২৩। ৪র্থ দিব্যসিংহদেব।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য

এই সাধু ব্যক্তিটি প্রাথমিক জীবনে তাঁহার কালের এক মহান্ পণ্ডিত ছিলেন। যে মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপের সীমান্ত অঞ্চল তাহার অন্তর্গত বিদ্যানগরের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ছিলেন তিনি (শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌম)। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় তাঁহাকে পূর্বজন্মে 'বৃহস্পতি' বলা হইয়াছে। 'সার্বভৌম' পদবীটিই বুঝাইতেছে যে, তিনি একাধিক বিষয়ের প্রতি উচ্চ পর্য্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের প্রচলন ছিল না যেহেতু উচ্চ পর্য্যায়ের পুস্তকের তখন অভাব ছিল, গৃহে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি মিথিলায় গমন করেন, এই মিথিলা ছিল মহত্তম নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের অধীনস্থ উক্ত বিষয়ের তদানীন্তন কালের বিশ্ববিদ্যালয়। সে স্থানের পণ্ডিতগণ ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে আগত ছাত্রগণকে সেই সমস্ত গ্রন্থের নকল করিতে দিতেন না, পাছে ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের একচেটিয়া খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে। বাসুদেবের মেধার ধারণ ক্ষমতা ছিল অনবদ্য, তিনি তাঁহাদের সমস্ত গ্রন্থই মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন ও বহু ছাত্রকে সেই বিষয় শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন—যতদিন পর্য্যন্ত না নবদ্বীপ ন্যায়-শাস্ত্রের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিল এবং দেশের সব স্থান হইতে ছাত্র আসিতে লাগিল। তিনি শাঙ্কর মতবাদের বেদান্ত শাস্ত্রেও দক্ষতা লাভ করিলেন এবং ইহাতেও তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। এইভাবে তিনি পণ্ডিতগণের সর্বাপেক্ষা কাঙ্খিত 'সার্বভৌম' পদবী লাভ করিলেন। সমগ্র ভারতব্যাপী তাঁহার খ্যাতি ফলে তিনি পুরীতে উড়িষ্যা ও তৈলঙ্গ দেশের (অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশে) রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন।

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজ সঙ্গীগণকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়া নীলাচলে (পুরীতে) জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহগণকে (শ্রীজগন্নাথ-বলরাম ও সুভদ্রা) দর্শন করিবার প্রবল আর্ত্তি লইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাদিগকে বাহুবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের দিকে দৌঁড়াইয়া আসিতে হর্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অজ্ঞ দ্বাররক্ষীগণ তাঁহাকে প্রহারে উদ্যত হইল, কারণ তাহাদের চক্ষে ইহা এক অপরাধ। এমন সময়ে দৈবক্রমে শ্রীসার্বভৌম সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে

নিষেধ করেন, তাহারাও ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইনি নিশ্চয়ই নিজ শহর নবদ্বীপের সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইবেন; যাঁহার বিষয়ে তিনি শুনিয়াছেন যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু বহুক্ষণ বাহ্যজ্ঞান লাভ না করায়, সেই অবস্থাতেই সার্বভৌম তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার মানসে এ-বিষয়ে তিনি দ্বাররক্ষীগণের সহায়তা লইলেন, তাহারাও মহাপ্রভুকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সঙ্গীগণ মন্দিরের প্রধান তোরণে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম খুব প্রীত হইয়া সঙ্গীগণকে অভ্যর্থনা জানাইলেন ও মহাপ্রভুর পরিচয় বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন, তাঁহাদের দলের নেতা শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম জানাইলেন। শ্রীসার্বভৌমের আদেশে তাঁহার পুত্র চন্দ্রশেখর দ্বাররক্ষীগণ সহ নিত্যানন্দ ও ভক্তগণকে মন্দিরের ভিতরে লইয়া গেলেন দর্শনের জন্য ও অনুরোধ করিলেন তাঁহারা যেন মহাপ্রভুর মত আচরণ না করেন।

মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা তখনও মহাপ্রভুকে মূর্চ্ছাগত দেখিলেন, কারণ এই অবস্থায় তিনি দিবাভাগের প্রায় তিনভাগ কাটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তখন রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম উচ্চঃস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি জাগিয়া উঠিলেন ও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি ভাবে তিনি এখানে আসিলেন। অতঃপর যখন সার্বভৌমের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল, তখন তিনি তাহাকে ধরিয়া বলিলেন যে, জগন্নাথ অতীব কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সান্নিধ্যে আনিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া সার্বভৌম তাঁহাকে এক অতীব উচ্চ পর্য্যায়ের অসাধারণ ভক্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। এমন সময়ে সার্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি নবদ্বীপ হইতে মহাপ্রভুকে জানিতেন এবং তাঁহার অনুরাগী ছিলেন ও তাঁহার ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। মহাপ্রসাদ সম্মাননার পর যখন তাঁহারা মিলিত হইলেন তখন সার্বভৌম জানিয়া খুশি হইলেন যে, মহাপ্রভুর দাদা মহাশয় শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী নিজ পিতা বিশারদের সহপাঠী ছিলেন আর ইতিমধ্যে তিনি এক উচ্চস্তরের ভক্ত হইয়াছেন তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু অতীব দৈন্যপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, তিনি ছিলেন বেদান্তের শিক্ষক ও সন্ন্যাসীগণের হিতৈষী এবং তাঁহাকে এক বিপদ

হইতে রক্ষা করার জন্য তাঁহার প্রতি বাধিত। সার্বভৌমের উপদেশানুসারে গোপীনাথ তাঁহাদিগের জন্য যথোপযুক্ত বাসাঘর দান করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়ে শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীসার্বভৌমের মধ্যে আলোচনা হয়, সার্বভৌমের মনে এক চিন্তা ছিল যে, এই নবীন যৌবনে মহাপ্রভু কি ভাবে সন্ন্যাস জীবনের পবিত্রতা বজায় রাখিবেন, সুতরাং তাঁহার বৈরাগ্য যথোপযুক্তভাবে বজায় রাখার জন্য তিনি নিয়মিতভাবে তাঁহাকে বেদান্ত শিক্ষা দিবেন। গোপীনাথ তাঁহাকে কড়া জবাব দিয়া বলিলেন মহাপ্রভুর মধ্যে ভগবত্ত্বার সকল লক্ষণই বর্তমান, নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি বলেন,—'যদিও আপনি বেদান্তের ও অন্যান্য শাস্ত্রের এক খ্যাতনামা শিক্ষক, তথাপি ঈশ্বরের কৃপালেশের অভাবে আপনার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ও ভগবানের বিষয়ে তাত্ত্বিক সত্য বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ।' আরও বলিলেন—'যদিও আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, সমস্ত প্রকার মানসিক গুণাবলী শোষণকারী উল্লাসময় প্রেমের গভীর প্রকাশ, যাহা সাধারণ মানুষে একান্তই দুর্লভ, তথাপি আপনি প্রকৃত জ্ঞানমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন থাকাতে সে বিষয়ে একেবারেই অনুভূতিহীন।' সার্বভৌম বলিলেন,—"নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্য এক মহান্ ভক্ত। এই কলিযুগে বিষ্ণুর কোন অবতার নাই, যে জন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে ত্রিযুগী বলা হইয়াছে।" গোপীনাথ উত্তরে বলিলেন যে,—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমহাভারত দুইটি প্রধান শাস্ত্র এবং ঐগুলিতে প্রমাণ আছে যে, যদিও কলিতে লীলাবতার নাই, প্রতি যুগে যুগাবতার আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ভাঃ ১০।৮।১৩, ১১।৫৩।৩১-৩২, মহাভারত দানধর্মের ১৪৯ অধ্যায়, বিষ্ণুসহস্রনামের শ্লোক ৯২ ও ৭৫ উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজ বক্তব্য শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

যখন গোপীনাথ লক্ষ্য করিলেন তথাপি সার্বভৌম মহাপ্রভুর ভগবত্ত্বাকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার শিক্ষক হইতে চাহিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া মনে ব্যথিত হইলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি সার্বভৌমের দয়া ও তাঁহার মঙ্গলের জন্য সদিচ্ছার কথা উল্লেখ করিলেন। একদিন সার্বভৌম বেদান্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং মহাপ্রভুও খুব বাধ্য ছাত্রের মত একটানা সাতদিন শ্রবণ করিলেন; তারপর সার্বভৌম বলিলেন তিনি কেন চুপ করিয়া আছেন, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা তিনি

বুঝিতেছেন কিনা তাহা তো বুঝা যাইতেছে না। তখন মহাপ্রভু বলিলেন, বেদান্তের শ্লোকগুলি বেশ বোধগম্য, কিন্তু তাঁহার কৃত ব্যাখ্যায় শ্লোকের প্রকৃত অর্থ চাপা দিয়া এক বিক্ষেপাত্মক ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে এবং তাহা শ্রীব্যাসদেব প্রণীত বেদান্ত শাস্ত্রে নিষ্ঠা সহকারে অনুসৃত উপনিষদ সমূহের মধ্যে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর বিরুদ্ধ। বেদান্ত শাস্ত্রে যে 'নির্বিশেষ' এর কথা উল্লেখিত আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে জড় জাগতিকতাকে গোপন করিয়া ব্রহ্মের অপ্রাকৃত আকারের কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদ ও পুরাণসমূহ হইতে উদ্ধৃতি সহকারে মহাপ্রভু সূত্রগুলির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন ও অদ্বৈতবাদের দর্শনকে খণ্ডন করিয়া ভগবানের ভগবত্ত্বা প্রমাণ করিলেন। মহাপ্রভু ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে নিত্য ও স্বরূপতঃ ভেদকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যাহা শুধুমাত্র ঐ সম্প্রদায়ের উক্ত চলিত রীতিগত নহে। অতঃপর তিনি শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং ভগবানের আদেশানুসারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্তরে ছিলেন এক প্রকৃত ভক্ত—যাহা তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাহাতেই তাঁহার অন্তরের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অবশেষে সার্বভৌম সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া নিজেকেই ধিক্কার প্রদান করিলেন এ যাবৎ ভক্তির পথকে অবজ্ঞা করিবার জন্য। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজের ষড়ভূজ মূর্ত্তি (দুইটি শ্রীকৃষ্ণের, দুইটি শ্রীরামচন্দ্রের ও দুইটি নিজের বাহুযুগল সমূহ) দেখাইলেন। তৎক্ষণাৎ সার্বভৌম তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর কৃপায় সমগ্র সত্যটি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে জাগরিত হইল এবং মুহূর্ত মধ্যে একশত এক শ্লোক সম্বলিত স্তুতি পাঠ করিয়া (যাহাকে বলা হয় "শ্রীচৈতন্যশতকম্") তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতে তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাঁহার মধ্যে ভগবৎপ্রেমের উদয়ের ভাব প্রকাশ পাইল। শ্রীগোপীনাথ সার্বভৌমের এই পরিবর্তন দেখিয়া পরম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সার্বভৌমও গোপীনাথের সহিত সম্বন্ধসূত্রে ভগবানের কৃপা লাভের জন্য প্রশংসা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া ভাগবতের (১০।১৪।৮) শ্লোক পাঠকালে 'মুক্তিপদে' পদটি পরিবর্তিত করিয়া 'ভক্তিপদে' বলিলেন। এই পরিবর্তন কারণ মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি (সার্বভৌম) বলিলেন,

মুক্তি ভক্তির মত উত্তম নহে, ভক্তগণ মুক্তি কামনা করেন না। উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—'মুক্তিপদে' বলিতে ঐ স্থানে স্বয়ং ভগবানকে বুঝানো হইয়াছে, যাঁহার মুক্তি লাভ করা করা যায়। তথাপি সার্বভৌম সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ তিনি বলিলেন, 'মুক্তি' পদটি ভক্তের কাছে বিরক্তিজনক, যাহাতে ইহাই মনে করাইয়া দেওয়া হয় জীবের ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়ার কথা, কিন্তু ভক্তিতে মনের মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দের অনুভূতি জাগে। মহাপ্রভু সার্বভৌমের মধ্যে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন যে, অদ্বৈতবাদের নির্ভীক সমর্থক হইতে ভক্তির গোঁড়া সমর্থকরূপে পরিণত হইয়াছেন, নিঃসন্দেহে এক মহান সাধু!

সার্বভৌম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় ভগবানের সেবার জন্য পারিবারিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতাকে তুচ্ছ করিয়া এক আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত হইয়া গেলেন। ইহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একদিবস শ্রীসার্বভৌমের দারুণ পীড়াপীড়িতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহেতে আহারের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিমতী তাঁহার স্ত্রীও পতির সহিত সুস্বাদু ও মুখরোচক ভোজ্যাদি তৈয়ার করিতে সহায়ক হইলেন। দ্বিপ্রহরে মহাপ্রভু আগমন করিলে তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এতপ্রকার পদ কৃষ্ণকে নিবেদন করিবার জন্য তৈয়ার হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সার্বভৌম উত্তরে বলিলেন ইহা ভগবৎ(মহাপ্রভু)দত্ত শক্তিতে নিবেদনের জন্য এই সমস্ত ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছে। বহুপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য তাঁহাকে পরিবেশন করা হইয়াছে দেখিয়া আপত্তি তুলিলেন। তদুত্তরে সার্বভৌম বলেন,—"আপনার পক্ষে ইহা যৎসামান্যই হইয়াছে, কারণ মহাপ্রভু পুরীতে শ্রীজগন্নাথরূপে দিনে ছাপান্ন বার ভোগ গ্রহণ করেন, প্রতিবারে শত শত ভার ভোজ্য নিবেদন করা হয়, দ্বারকাতে ষোড়শ সহস্র পত্নীর ও অষ্টাদশ মাতার গৃহে প্রত্যহ আহার করেন, বৃন্দাবনে বেশ কয়েকজন খুড়ীমা ও খুড়ার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত দৈনিক দুইবার আহার করেন এবং গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে পর্বত প্রমাণ খাদ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; সে সকলের তুলনায় এই আহার্য্য বিন্দু মাত্র।" ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি আহারে বসিলে সার্বভৌমের কন্যা শাঠীর পতি অমোঘ বিস্ময়প্রকাশ করিল যে, সন্ন্যাসী হইয়া একা এক ডজনের ভুরিভোজ্য করিতেছেন। তাহা শুনিয়া সার্বভৌম যষ্ঠি হস্তে তাহাকে তাড়া করিতে সে পলাইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, সার্বভৌমের স্ত্রী, শাঠীর মাতা কর্ত্তৃক আহুত তিনি মহাপ্রভুকে এভাবে অসম্মান

করায় দুঃখে বক্ষে ও কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং বার বার অভিশাপ দিতে লাগিলেন যে, শাঠী বিধবা হউক।

এখানে একটি কথা গভীরভাবে বিবেচ্য। সমাজে জামাতাকে যথেষ্ট সমাদর করা হয় ও তাহার সুখ-সুবিধার প্রতিও সযত্নে লক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া তাহার জীবনকে নিজ পুত্রের মত মূল্যবান মনে করা হয়। কিন্তু দেখুন, কি ভাবে সার্বভৌম তাঁহার নিকট হইতে তাহাকে যষ্ঠি হাতে বিতাড়িত করিলেন, যেন সে সেখানে প্রদত্ত আহারাদি ভোজন করিতে আসিয়াছে। যে শাঠীর মাতার নিকট তাঁহার যে জামাতা সার্বভৌম অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, তিনি তাহার মৃত্যুকামনা করিলেন! এ সবই একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। এহেন ধার্মিক দম্পতি, বিশেষতঃ যাঁহারা সামাজিকভাবে অনেক উচ্চস্তরের ও সম্মানীয়, তাঁহাদের আচরণের সামঞ্জস্য কি করা যাইতে পারে? ব্যাখ্যা এই। সামাজিক রীতি-নীতির বিষয়ে ভক্তের বাধ্যবাধকতা নাই। তিনি গৃহস্থ হিসাবে সমাজে বাস করিতে পারেন কিন্তু তিনি সমাজস্থ নহেন। তাঁহার একমাত্র চিন্তা ভগবানের সুখবিধান করা, যাহার জন্য নিজ অমূল্য জীবনও তিনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে পারেন। যাহারা অভক্ত তাহাদের ব্যাপারেও ভক্তের কিছু করণীয় নাই তিনি গুরু (বলির প্রতি শুক্রাচার্য্যের মত) হইলেও, হিরণ্যকশিপুর মত প্রহ্লাদের পিতা হইলেও অথবা (কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের) মাতা হইলেও—যেমন ভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ৫।১৮), ভগবানের বা তাঁহার ভক্তের প্রতি নিন্দাকারীকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে—যেমন শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন (ভাঃ ১০।৭৪।৪০)। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কুৎসা করিয়া অমোঘ তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট নিজেকে শত্রু হইতেও অধম প্রতিপন্ন করিয়াছে যেহেতু তাঁহারা ছিলেন মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত। এই কারণেই শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর অসন্তোষের কারণ হওয়ায় নিজ শাশুড়িকে চুলের মুঠি ধরিয়া বহিষ্কার করিয়া-ছিলেন। এই সমস্ত ভক্তগণের চরিত্র (আচরণ) সাংসারিক লোকের সামাজিক বা নাগরিক পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচার করা যাইবে না। দেখা গেল পরদিনই অমোঘ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল। সার্বভৌম ইহাকে ভগবানের চরণে অপরাধের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া মনে করিলেন ও ভাগবতে (১০।৪।৪৬) শুকদেবের উক্তিঃ "জীবন, উন্নতি, যশঃ, ধর্ম, লোকবল ও মঙ্গল—এই সমস্তই শেষ হইয়া যায়, যাহারা ভগবান্ বা তাঁহার ভক্তগণের বিরুদ্ধে নিজসীমা লঙ্ঘন করে।"

শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের নিকট মহাপ্রভু জানিতে পারিলেন তাঁহাকে অসম্মান করায় সার্বভৌম দম্পতি উপবাস করিতেছেন। মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন অমোঘ অসুস্থ। অমোঘের বক্ষে হস্ত রাখিয়া মৃদুভাবে তাহাকে বলিলেন,—"কৃষ্ণের আসন হৃদয়ে, বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার উচিত নহে। উঠ, কৃষ্ণের নাম লও, সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে, তখন ভগবান্ তোমার প্রতি সদয় হইবেন।" অমোঘ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মুখে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে তাহার দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা গেল। সে তখন ভগবানের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও অতি দুঃখিত হইয়া নিজের গাল দুইটিতে চপেটাঘাত করিতে লাগিল যতক্ষণ না সেগুলি ফুলিয়া যায়। মহাপ্রভু তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এই বলিয়া যে একমাত্র সে নহে, এমনকি সার্বভৌমের গৃহের পরিচারক ও কুকুরও তাঁহার প্রিয়। অতঃপর তিনি সার্বভৌমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে সার্বভৌম ভগবানের চরণ ধারণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে স্নান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিতে বলিলেন। তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, অমোঘের হৃদয় শুদ্ধ হইয়াছে ও সে বৈষ্ণব হইয়াছে। শাঠির মাতাকেও শান্ত করা হইল।

সার্বভৌমের কট্টর পণ্ডিতম্মন্য অদ্বৈতবাদী হইতে উদ্যোগী এক বৈষ্ণব ও মহান্ সাধুতে পরিবর্তনের ফলে উড়িষ্যার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এমন কি রাজাও মহাপ্রভুর একান্ত অনুরাগী হইতে আকৃষ্ট হইলেন।

ভগবানের নিত্যসঙ্গী যিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়াইয়াছিলেন

আমাদের জানিয়া রাখা উচিত, শ্রীসার্বভৌমের মাধ্যমেই উড়িষ্যা তৈলঙ্গের রাজা প্রতাপরুদ্র ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার মহান্ ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন।

একদিবস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকথায় রত ছিলেন, সেই সময় শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের সেবক শ্রীগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সদ্গুরু আশ্রয় না করিলে প্রকৃত পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয় না লোকজনকে সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি (মহাপ্রভু) গয়ায় গমন করিয়া এই ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ-রূপ অভিনয় করেন। গোবিন্দ নিজের পরিচয়

প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, তিনি গুরুর কর্তব্যকর্ম সাধনাদি ব্যাপারে সহায়ক ছিলেন এবং ইহলোক ত্যাগ করিবার ঠিক পূর্বে তাঁহাকে আদেশ দিয়া যান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে যেন অনুরূপভাবে সেবা করেন। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীসার্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন পুরী গোস্বামী কেন চতুর্থ বর্ণের শূদ্রকে নিজ কর্তব্যকর্মসাধন ব্যাপারে স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, 'ঈশ্বরপুরীপাদের মত অতি উচ্চ পর্য্যায়ের ব্যক্তিবর্গ শাস্ত্রীয় বিধি- নিষেধের ঊর্ধ্বে এবং তাঁহাদের কৃপা বেদের অনুশাসনের অন্তর্গত নহে, তাঁহাদের কাছে জাতি-বর্ণের কোন বিচার নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিদূরের নিকট হইতেও অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রেম ও আদরের সহিত সেবাই তাঁহার করুণার একমাত্র কারণ। স্নেহের বশ্যতায় ভগবানের আচরণ নিয়ম-নীতির সহিত খাপ খায় না, তিনি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা সম্ভ্রম পূর্ণ ব্যবহার অপেক্ষা আদরের সহিত আচরণকে কোটিগুণ আনন্দ লাভ করেন। এই সমস্ত কথা বলিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলে তিনিও উপস্থিত সকলকে দণ্ডবৎ করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌমের নিকট প্রশ্ন উঠাইলেন, যখন গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার, অপরদিকে গুরুর আদেশ তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিতে, সে বিষয়ে তাঁহার কি কর্তব্য ? সাবভৌম শেষের পক্ষে মত দান করিলেন এই যুক্তিতে, গুরুর আদেশ অমান্য করাকে শাস্ত্র অনুমোদন করে না। তাহাতে মহাপ্রভু গোবিন্দকে নিজ সেবায় অঙ্গীকার করিলেন।

যাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যাঁহাকে তিনি সেই কারণে গুরুর সম্মান প্রদান করিতেন সেই শ্রীকেশব ভারতীর সহ-শিষ্য শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী একবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহার চরণে প্রণতঃ হইলে ভারতী তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি (মহাপ্রভু) 'সচল ব্রহ্ম' কিন্তু মন্দিরের জগন্নাথ 'অচল'। মহাপ্রভু প্রতিবাদ করিয়া ঘটনাটি শ্রীসার্বভৌমের দ্বারা মীমাংসার জন্য জানাইলেন, তখন সার্বভৌম শ্রীভারতীর কথা সমর্থন করিয়া বিষ্ণুর সহস্রনামের ৯২ ও ৭৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, গৌরবর্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুই স্বয়ং বিষ্ণু। ইহার তাৎপর্য্যকে এড়াইবার জন্য শুধু বলিলেন অতি স্তুতি নিন্দার তুল্য।

যখন মহাপ্রভু প্রচার উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ভারতে ছিলেন, সেই সময় উড়িষ্যা ও তৈলঙ্গের রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেন ও তাঁহার

দর্শনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সার্বভৌম বলিলেন, মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন, কিন্তু ইহা করা খুব কঠিন ব্যাপার; কারণ নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী হিসাবে রাজার সহিত মিলিত হইবার আশা করা যায় না। রাজার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ, যেহেতু সার্বভৌমের মত পণ্ডিত অগ্রগণ্য তাঁহাকে সেইভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলে ও বহুদিন বাদে তাঁহার দর্শন পাইয়া অতীব আনন্দিত, একদিন সার্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট অতীব আত্মসঙ্কোচ ও ইতস্ততঃ সহকারে নিবেদন করিলেন যে, রাজা তাঁহার দর্শন কামনায় অতীব ব্যাকুল; তাহাতে তিনি আপত্তি জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেন সেই কথা পুনরায় বলিলে তিনি এইস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবেন। রাজা তাঁহার রাজধানী কটক হইতে ফিরিয়া আসিলে সার্বভৌমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার পক্ষ হইয়া দর্শনের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে কিনা, সার্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর কঠোর ভাবে অস্বীকারের কথা জানাইলে রাজা অতীব বিষণ্ণ হইলেন ও বলিলেন তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের ও জীবনের কোনটিই প্রয়োজন নাই। সার্বভীম উভয় সঙ্কটে পড়িলেন এবং আগামী রথযাত্রা দিবসে রথ ও জগন্নাথের সম্মুখে মহাপ্রভু কঠোর নৃত্যের পর পরিশ্রান্ত হইয়া পুষ্পোদ্যানে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া শায়িত থাকিবার সময় রাজা রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণব বেশে রাস পঞ্চাধ্যায়ের (ভাঃ ১০।২৯ হইতে ৩৩) শ্লোক উচ্চারণ করিলে বাহ্যজ্ঞান হারা হইলেও কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে (রাজাকে) আলিঙ্গন দান করিবেন।

কিছু দিন পর প্রায় দুইশত ভক্ত বঙ্গদেশ হইতে মহাপ্রভুর দর্শনে আগমন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে প্রাসাদের ছাদ হইতে অবলোকন করিতে লাগিলেন ও সার্বভৌমকে অনুরোধ করিলেন ভক্তগণের পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় প্রদান করিতে, সেই সময় শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য তথায় উপস্থিত থাকায় প্রত্যেকের নাম ধরিয়া পরিচয় দিলেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি মুখ্যজনদের বিশদে বিবরণ দিলেন—যেহেতু তিনি নবদ্বীপ-মায়াপুরে অবস্থানকালীন সকলেরই পরিচয় জানিতেন। যখন রাজা দেখিলেন ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শনের পূর্বে মহাপ্রভুর বাসার দিকে যাইতেছেন, তিনি সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, প্রেমের ইহাই সাধারণ রীতি এবং উদ্বেগ ও আগ্রহের

সহিত তাঁহারা প্রথমে মহাপ্রভুর নিকট যাইতেছেন, যাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা মন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন। যখন মহাপ্রভুর পরিচালনায় ভক্তগণ উচ্চ সঙ্কীর্তন করিতে করিতে মন্দির পরিক্রমা করিতেছেন, রাজা সে সময় ছাদের উপর হইতে সবই প্রত্যক্ষ করিলেন ও মহাপ্রভুকে দর্শনের আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল।

ইত্যবসরে শ্রীল সার্বভৌম মুখ্য মুখ্য ভক্তগণকে রাজার প্রচণ্ড আগ্রহের কথা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে রাজার প্রগাঢ় আগ্রহে ও ভক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহাদের সন্দেহও হইল মহাপ্রভু তাঁহার নিকটে এ-প্রকার প্রস্তাব পেশ করিতে অনুমতি দিবেন কিনা। নিত্যানন্দ প্রভু তখন অগ্রণী হইয়া জানাইলেন যে, রাজা দর্শনের জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং ব্যর্থ হইলে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী হইবেন; তাহাতে মহাপ্রভু অন্তরে কিছুটা কোমল হইয়াছেন, তথাপি বাহ্যতঃ ভয় দেখাইলেন আর যদি পীড়াপীড়ি করা হয় তাহা হইলে তিনি চিরতরে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু রাজার নিকট তাঁহার ব্যবহৃত এক খণ্ড বস্ত্র পাঠাইবার অনুমতি আদায় করিলেন, তাহা পাইয়া রাজা অতীব গভীর উৎসাহিত হইলেন ও সেইটিকে স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রতীকরূপে পূজা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণ ভারতস্থিত রাজ্যের শাসনকর্তা শ্রীরামানন্দ রায় আসিয়া পড়িলেন, তিনি অনেক পূর্বেই মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশে যাত্রাকালে এক মহান্ ভক্ত হইয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর আদেশে পরবর্তী লোককে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তিনি রাজার নিকট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র পেশ করিয়া বাকি জীবন মহাপ্রভুর সহিত কাটাইতে চাহিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা আনন্দিত হইলেন, তাঁহাকে মহাপ্রভুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া পূর্ণ বেতন সহ চিরদিনের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিলেন। এতদ্ব্যতীত অতীব আগ্রহের সহিত তাঁহাকে বলিলেন তাঁহার (রাজার) মধ্যস্থ হইয়া তিনি যেন চেষ্টা করিয়া মহাপ্রভুর দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার (মহাপ্রভুর) চরণসেবার সুযোগ দান করেন। রামানন্দ রাজার প্রার্থনা নিবেদন করিয়া জানাইলেন তাহার চরম প্রতিজ্ঞার কথা, এমন কি ব্যর্থ হইলে নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত; তাহাও জানাইলেন। মহাপ্রভু আরও একটু কোমল হইয়া রাজার পুত্রকে

আনিতে বলিলেন, কিন্তু রাজাকে নহে। কারণ 'রাজা' উপাধিটি তাঁহার আপত্তিকর। রামানন্দ রাজপুত্রকে আনয়ন করিলেন, কৃষ্ণকায় সুন্দর দর্শন সেই রাজপুত্র মহাপ্রভুর মনে কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করাইয়া দিল। মহাপ্রভু তাহাকে গভীর আলিঙ্গনও করিলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শ লাভেই রাজপুত্রের ভিতর পূর্ণপ্রেম সঞ্চারিত হইল এবং সে নৃত্য করিতে লাগিল ও তাহার মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগুলি দেখা গেল। তাহার সৌভাগ্য দর্শনে ভক্তগণ খুব উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু তাহাকে শান্ত করিয়া প্রত্যহ আসিতে বলিলেন। পুত্রের মধ্যে পরিবর্ত্তন দর্শনে রাজা খুব খুশি হইলেন।

পরবর্তী রথযাত্রা দিবসে, রথগুলি যাত্রারম্ভের প্রাক্কালে রাজা সোনার ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন ও পথের উপর চন্দন জল ছড়াইতে লাগিলেন। ঝাড়ুদারের এই নীচসেবা দর্শনে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই সেবা দেখিয়া মহাপ্রভু খুব প্রীত হইলেন ও তাঁহার প্রতি আরও প্রসন্ন হইলেন। রথ চলাকালীন যখন মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন দলকে সাত ভাগে ভাগ করিয়া সকলেরই সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকেন তখন প্রত্যেকেই মনে করিতে থাকেন মহাপ্রভু তাহার দলে রহিয়াছেন, জগন্নাথও এই দৃশ্য খুব উপভোগ করিলেন ও ঘন ঘন রথ থামাইয়া দিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে থাকেন। মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার এই প্রকার রহস্যজনক লীলার অর্থ বুঝিতে পারিলেন ও সার্বভৌমের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার ইঙ্গিত দিলেন। সার্বভৌম ও রাজার গুরু কাশী মিশ্র রাজার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। নৃত্যকালে মহাপ্রভু সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িলে একবার তিনি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে রাজা সেই ভীড়ের মধ্যে উপস্থিত থাকায় পতন নিবারণের জন্য ধরিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হওয়ায় রাজা কর্তৃক স্পৃষ্ট হওয়ায় বাহ্যতঃ অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে রাজা ভীত হইয়া পড়েন, কিন্তু শ্রীসার্বভৌম তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন অন্তরে অন্তরে তিনি রাজার উপর খুবই প্রীত, যদিও বাহ্যতঃ তিনি অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহার অনুগামীর প্রতি এই শিক্ষা যে, তাহারা যেন বিষয়ীলোকের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে। তিনি তাঁহার (রাজার) উদ্দেশ্য পূরণের আশ্বাস প্রদান করিলেন, যখন সেই উপযুক্ত ক্ষণ আসিবে।

রথগুলি বলগণ্ডি (বিগ্রহগণকে বিশেষ ভোগ নিবেদন-স্থান) পৌঁছাইলে সেখানে বামপার্শ্বে পুষ্পোদ্যান আছে সেখানে রথের চারিদিকে বিশাল জন-সমাবেশ ছিল, প্রতি ভক্ত, তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাগণ নিজ নিজ ভোগ নিবেদনের জন্য আগ্রহী; তখন মহাপ্রভু সঙ্কীর্তন ও নৃত্য বন্ধ করিয়া সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, সেখানে নৃত্যের ও উচ্চ সঙ্কীর্তনের পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত হইয়া সঙ্গীগণ সহ বিশ্রাম লাভের জন্য উপবেশন করিলেন, মৃদু বায়ু সঞ্চালনের দ্বারা বাতাস ভোগ করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্যের পরিবেশ তাঁহার মধ্যে বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। তিনি উল্লাসজনিত মূর্চ্ছাগত হইলেন। এই সময়ে সার্বভৌমের ইঙ্গিতে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ত্যাগ করিয়া এক সাদাসিধা বৈষ্ণবের বেশে এবং করজোড়ে সকল ভক্তগণের অনুমতিক্রমে তাঁহার চরণ ধরিয়া ধীরে ধীরে পাদ সম্বাহন করিতে করিতে রাসলীলা শ্লোক (ভাঃ ১০।৩১ অঃ) আবৃত্তি করিতে থাকিলেন, তখন অতীব প্রীত হইয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতে বলিলেন ও নবম শ্লোক আবৃত্তি করিতেই যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত বিবৃত হইয়াছে, তখনই মহাপ্রভু উঠিয়া পড়িয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, যেমন সার্বভৌম পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে কৃপাসমুদ্রে স্নান করাইলেন যদিও সেই ব্যক্তি যে রাজা সেই জ্ঞান তিনি প্রকাশ করেন নাই। রাজার সৌভাগ্য দর্শনে সকলে আনন্দিত হইলেন।

অন্য এক ঘটনাক্রমে যখন মহাপ্রভু নন্দোৎসব পালন করেন (অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মদিবসের পর) এক রাখালের বেশে সজ্জিত হইয়া এবং স্কন্ধের উপর একটি বাঁকে দুগ্ধ ও দধির ভাড় চাপাইয়া, সে সময় শ্রীসার্বভৌম ও রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সঙ্গী গোপের ন্যায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যখন মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনে যাইবার জন্য খুব ব্যগ্র হন, কোন না কোন অজুহাতে রাজার একান্ত অনুরোধে শ্রীসার্বভৌম ও রামানন্দ তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু মহাপ্রভু যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন, তখন রাজা তাঁহার পথ সুগম করিবার নিমিত্ত সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ভক্তগণ সকলে তাঁহার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হইলেন কিন্তু সেই বেদনা প্রবলতমরূপে মহাপ্রভুর নিকটতম আবাল্য ভক্ত ও সুহৃদ গদাধর পণ্ডিত, তিনি নৌকায় আরোহণের পূর্বে মূর্চ্ছাগত হইলেন। সার্বভৌমকে তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সার্বভৌম অতিকষ্টে সান্ত্বনা দান করিয়া তাঁহার সহিত নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মোটের উপর সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সার্বভৌম মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে ছিলেন, যথা—রূপ গোস্বামী লিখিত নাটকের চমৎকারিতা পরীক্ষার ব্যাপারে, উহাদের প্রণয়শীল রসাস্বাদ, কাব্যিক সৌন্দর্য্য, কবিত্বসুলভ শব্দ নির্বাচন কৌশল, চমৎকার ভাষা ও কল্পনার প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে—যাহার সবই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিগণ সুলভ,—আরও শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীসনাতন গোস্বামী আত্মহননের ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দান (তাঁহার ক্ষোভ ছিল, যে জীবন প্রভুর সেবাই নিয়োজিত না হইয়া তাঁহার চরণে অপরাধের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে)—নামাচার্য্য হরিদাসকে উচ্চ প্রশংসা ও তাঁহার পবিত্র দেহটিকে স্বয়ং মহাপ্রভু কর্তৃক সমাধিস্থ করিবার সময়। শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্মুখে মহাপ্রভু কর্তৃক সার্বভৌমকে প্রশংসা দর্শনের ছয়টি শাখায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য, তথাপি ভগবানের পরম ভক্ত—এমন সংমিশ্রণে জগতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ভবিষ্যতের পণ্ডিতগণের জন্য তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহার মত ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া পরম মঙ্গলের অধিকারী হওয়ার জাজ্বল্যমান উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়েক

শ্রীরায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায়। পুরী হইতে পশ্চিমে ছয়ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট ইঁহার বাসস্থান। ইনি জাতিতে শৌক্র-করণ। তাহার পঞ্চপুত্র—

রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক গোপীনাথ।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।১৩৩

সুতরাং গোপীনাথ পট্টনায়ক ভবানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি পাণ্ডু, গৌরলীলায় তিনি রায় ভবানন্দ। রায় ভবানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন (চৈঃ চঃ আঃ ১০ ম পঃ)। রায় ভবানন্দের পঞ্চপুত্রই মহাপ্রভুর প্রিয় পাত্র ছিলেন। ব্রহ্মগিরি আলালনাথ হইতে অল্পদূরে বেন্টপুর গ্রাম; সেই গ্রামে রায় ভবানন্দ ভূম্যাধিকারীরূপে বাস করিতেন। ভবানন্দের অধস্তনগণ চৌধুরী পট্টনায়ক পদবীতে খ্যাত হইয়া অদ্যবধি বেন্টপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

গোপীনাথ পট্টনায়েক মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ মালজাঠ্যা দণ্ডপাট (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) রাজখণ্ডের তহশীলদার ছিলেন; তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া রাজাকে অর্থ দিতেন। একবার তাহাতে দুইলক্ষ কাহন কড়ি রাজস্ব বাকী পড়িয়া যায়। সেই রাজস্ব না দেওয়ায় 'বড় জাম' (উৎকল ভাষায় মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র) গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙে উঠাইয়া খড়্গের উপর ফেলিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন। যেহেতু রায় ভবানন্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভু সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন সেই সূত্রে গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রাণ সঙ্কটে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহার (মহাপ্রভুর) নিকট আবেদন করেন। তাঁহাকে শাস্তি দিবার কারণ মহাপ্রভু জানিতে চাহিলে ভক্তগণ সমস্ত কথা প্রকাশ করেন। তাঁহারা জানান, 'গোপীনাথ পট্টনায়কের যে দুই কাহন কড়ি বাকী পড়িয়াছে, সেই কড়ি দিতে পারিবেন না, দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে শোধ করিবেন; তজ্জন্য তিনি রাজার নিকট ১০।১২ টি ঘোড়া আনিয়াছেন; মহারাজ তাঁহার যোগ্য রাজপুত্রকে ঘোড়ার সঠিক মূল্যায়নের জন্য পাঠাইয়াছেন;

রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য অনেক কম বলেন; তাহাতে গোপীনাথের ক্রোধ জন্মে; যে রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহার এক বদভ্যাস এই যে তিনি গ্রীবা উঠাইয়া বার বার উপরের দিকে তাকান; গোপীনাথ ক্রোধে রাজপুত্রের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া বলেন, তাঁহার ঘোড়া ঘাড় উঠায় বটে, কিন্তু উপরের দিকে তাকায় না, সুতরাং তাহার মূল্য কম হইতে পারে না, অর্থাৎ রাজপুত্র অপেক্ষা গোপীনাথ পট্টনায়কের ঘোড়ার মূল্য বেশী; এপ্রকার পরিহাসবাক্যে রাজপুত্রের ক্রোধ জন্মে; তিনি কড়ি আশয়ের জন্য গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার অনুমতি লইলেন; তিনি এখন গোপীনাথকে চাঙ্গে উঠাইয়াছেন নিম্নে খড়্গে ফেলিয়া প্রাণনাশ করিবেন বলিয়া।' সমস্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু নিরপেক্ষভাবে বলিলেন, ইহাতে রাজার কি দোষ, রাজকৌড়ি দিতে পারে না, দোষী ব্যক্তির দণ্ড তো হইবে; তাঁহার কি করিবার আছে? পুনরায় ভবানন্দ রায়ের সমস্ত গোষ্ঠীকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে ইত্যাদি বলিয়া আর একজন জানাইলেন, তাহাতে স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণও প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু উপদেশ দেন 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা' করিতে সমর্থ শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইতে বলেন, অন্তর্য্যামীসূত্রে মহাপ্রভুর প্রেরণাবলে রাজা প্রতাপরুদ্রের সেবক শ্রীহরিচন্দন পাত্র মহারাজের নিকট আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইলেন এবং গোপীনাথের প্রাণ দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য আবেদন করিলে মহারাজ জানাইলেন যে এই সমস্ত ঘটনা তিনি জানেন না, তিনি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিতে আদেশ দেন। মহাপ্রভুর কৃপায় গোপীনাথ মুক্ত হইলেন। 'গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দভ্রাতা। রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা।।' চৈঃ চঃ মঃ ১।২৬৫। বাণীনাথ পট্টনায়কাদি প্রভৃতিকে যখন বান্ধিয়া লইয়া যায় সে সময় বাণীনাথ কি করিতেছিল জানিতে চাহিলে সংবাদদাতা কহেন—

"সে কহে—'বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম।।
সংখ্যা লাগি' দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা।।
শুনি' মহাপ্রভু হইল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা ছদ্ম বন্ধ।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ৯।৫৬-৫৮

ভবানন্দ রায়ের বংশধরগণের রাজ বিষয়ে অন্যায়ভাবে ব্যয়ের ও তাহার জন্য রাজদণ্ডাদেশ হইতে মুক্তির জন্য বার বার মহাপ্রভুর নিকটে আগমনের কথা রাজপুরোহিত ও রাজার গুরু শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট জানাইয়া নিজ দুঃখ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু আলালনাথে যাইয়া নির্জনভজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকাশীমিশ্র তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইয়া ক্ষেত্র ছাড়িয়া না যাইতে আবেদন করিলেন। ঘটনাগুলি আনুপূর্বিক শ্রীকাশীমিশ্রের শুনিয়া মহারাজ গোপীনাথকে কেবলমাত্র রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই, তাহাকে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তি ও বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়েক মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়া—রাজসম্মানোচিত মস্তকে নেতধটী বিভূষিত হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন—

"বাকী-কৌড় বাদ, আর দ্বিগুণ বর্ত্তণ কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা।।
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রসাদ।
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ—এসব প্রসাদ।।
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ।।
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা।।
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল।।
রাম-রায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয়।।
শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু মোতে 'বিষয়' না হয়।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৩০-১৩৯)

গোপীনাথের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলেন—

তুমি যদি সন্ন্যাসী হও তোমার কুটুম্বগণের ভরণ পোষণ কে করিবে?

"মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ—'মোর নিজদাস'।।
কিন্তু মোর করিহ এক 'আজ্ঞা' পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন।।
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেইধন করিহ নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মেতে ব্যয়।।
অসদ্বায় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৪১-১৪৪)

প্রভু এই কথা বলিয়া সকলকে আলিঙ্গন বিদায় দিলেন—

"সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি কর সব ভক্ত উঠি গেলা।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৪৬)

শ্রীসদাশিব পণ্ডিত

শ্রীসদাশিব পণ্ডিত ছিলেন নবদ্বীপবাসী। মহাপ্রভুর কীর্তনলীলায় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে আসিয়া এই সদাশিব পণ্ডিতের গৃহে প্রথম অবস্থান করিয়াছিলেন।

সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি।
যাঁ'র ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি।।

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৯

সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।৩৪

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রভু ইঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তকে শুক্লাম্বর গৃহে নিজের কৃষ্ণভজন-কথা বলিয়াছিলেন। যে নিমাই পণ্ডিত কিছুদিন পূর্বে মহা-তার্কিক চূড়ামণি ছিলেন এবং বৈষ্ণবদিগকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাদি দ্বারা উড়াইয়া দিতেন, সেই নিমাই পণ্ডিতই এখন পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন।

সকলকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

'শুক্লাম্বর-গৃহে কালি মিলিবা সকালে।।
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা' সবা' স্থানে দুঃখ করিব গোহারি *।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।৬৯-৭০

শ্রীমান্ পণ্ডিত ও গদাধর পণ্ডিতও শুক্লাম্বর গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

'সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর।।'

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।৮১

---

* গোহারি—জ্ঞাপন, নিবেদন, সহানুভূতি লাভোদ্দেশ্যে প্রতিকার বা সুবিচার প্রার্থনা।

মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমবিকার দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ বিস্মিত ও পরস্পর বিবিধ প্রকার মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জগতের লোক সকল দিবাভাগে বিষয় কর্মে মত্ত থাকে, আর রাত্রিকালে নিদ্রায় যাপন করে; কিন্তু প্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ রজনীতে নিদ্রা না গিয়া প্রতি নিশায় শ্রীবাস-মন্দিরে অথবা কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর ভবনে সারা রাত্রি যে কীর্তন বিলাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার বহু ভক্তগণের মধ্যে সদাশিব পণ্ডিতও ছিলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলান্তে মহাপ্রভুর সহিত জলকেলিতেও সদাশিব একজন সঙ্গী ছিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয় ও নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইলে কে কি সাজ গ্রহণ করিবেন, সেই সজ্জা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন শ্রীসদাশিব পণ্ডিত ও বুদ্ধিমন্ত খানকে।

"সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু,—কাচ সজ্জ কর গিয়া।।"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।৭

মহাপ্রভুর আদেশ লাভ করিয়া সদাশিব পণ্ডিত প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন।

"আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।১৪

"সদাশিব, বুদ্ধিমন্ত খান দুইজনে।
নানা বেশ-দ্রব্য সজ্জ কৈল এইখানে।।
লক্ষ্মী কাচে নাচিবেন গৌর রায়।
হইবে কীর্ত্তন—যা'তে জগত মাতায়।।"

—ভক্তিরত্নাকর ১২।২৯০৩-০৪

কূৰ্ম্ম বিপ্ৰ

গঞ্জাম জেলার 'চিকা কোলরোড' ষ্টেশন হইতে আট মাইল পূর্ব্বে 'কূৰ্ম্মাচল' বা 'শ্রীকূর্ম্মম্'; ইহা তেলেগুভাষিগণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ ('গঞ্জাম ম্যানুয়েল')। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান; শ্রীরামানুজ যে কালে একাদশ-শক শতাব্দীতে কূৰ্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তিজ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

'কূৰ্ম্ম'—নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।।
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন।
সেই জল বংশ সহিত করিল ভক্ষণ।।
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইলা।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইলা।।"

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২১-১২৩

কূৰ্ম্মবিপ্রের পরম ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সকল প্রকার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বিপ্র তাঁহাকে নিজ গৃহে আনিয়া তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই পাদপদ্ম ধৌত জল সবংশে পান করিয়াছিলেন, অতঃপর অতীব প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া তাহার অবশেষ প্রসাদ রূপে পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বিপ্রের স্তবে প্রসন্ন হন এবং চলিয়া যাইবার কালে তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, মহাপ্রভু তাহা অনুমোদন না করিয়া তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করিতে এবং আচার্য্যরূপে সকলকে কৃষ্ণনাম করাইতে আদেশ করেন।

"প্রভু কহে—"ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা।।
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।।
কভু না বাধিবে তোমার বিরহ-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।"

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৭-১২৯

"এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা।।" ১৩০

ইহার অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেন।

"শ্রীমহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকট ভজন-পরায়ণ' অভিমান ত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড় প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মাগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম শ্রীল মধ্বরামানুজাদির বহু শিষ্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয় তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষাপ্রদান।"

অনুরূপভাবে এই কূর্ম্মক্ষেত্রেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়া পরম সুন্দর করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে সুন্দর শরীর লাভের জন্য তাঁহার অভিমান হইবে না; তাঁহাকেও কৃষ্ণনাম উপদেশের দ্বারা সকল জীবকে উদ্ধারের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মমহাপ্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাওয়ার পর কূর্ম্মবিপ্র ও বাসুদেব বিপ্র উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। বাসুদেবের চরিত্রের দ্বারা ভগবান্ জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন যে অনন্যভক্তের বাহ্য কোনও প্রকার কুরূপতা বা কদর্যাবস্থা ভগবান দেখেন না, তিনি কেবল অনন্যভক্তির দ্বারাই জিত হন।

সনোড়িয়া বিপ্র

সনোড়িয়া বিপ্রের জন্মস্থান ও মাতৃ-পিতৃ পরিচয় জানা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে মথুরায় আসিয়া পৌঁছাইলে বিশ্রামঘাটে স্নান ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবজীর মন্দিরে মূর্তি দর্শন করিলেন। সেইখানে তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য, গীত ও হুঙ্কার করিতে থাকিলে লোকে বিস্মিত হইলেন। সেই সময় এক বিপ্র মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকেন। উভয়েই বাহু উত্তোলনপূর্বক 'হরি' 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে থাকিলে লোকেরা মহাপ্রভুর প্রেমকে 'অলৌকিক' জ্ঞান করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন ইনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-অবতার। মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আর্য্য, সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; তুমি কোথা হইতে এই প্রেমধন পাইলে?' বিপ্র বলিলেন, 'শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরায় আসিয়া কৃপাপূর্বক আমার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে মন্ত্র-দীক্ষা দান করিয়া আমাকে শিষ্য করিলেন ও আমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গোপাল প্রকট করিয়া সেবা করিলেন, যাঁহার সেবা অদ্যপিহ গোবর্দ্ধনে হয়।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজগুরুর গুরুভ্রাতা হিসাবে গুরুজ্ঞানে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তাহাতে বিপ্র ভয় পাইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। মর্য্যাদারক্ষক মহাপ্রভু গুরুসমীপে দীনতা-প্রদর্শন করিয়া—

'প্রভু কহে, তুমি 'গুরু', আমি 'শিষ্য' প্রায়।
'গুরু' হঞা, 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায়।।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৭০

তাহাতে বিপ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি সন্ন্যাসী হইয়া ঐ প্রকার কথা কেন বলিতেছেন। আপনার প্রেম দেখিয়া অনুমান হইতেছে আপনি মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত।' বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত সম্বন্ধ জানাইয়া দিলেন। তখন সেই বিপ্র নিজগৃহে আনাইয়া নানাভাবে সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিজে রন্ধন না করিয়া ভট্টাচার্য্যের দ্বারা রন্ধন করাইবেন স্থির করিলেন। শুদ্ধভক্তির অনুকূল দৈববর্ণাশ্রমধর্ম পালক মহাপ্রভু যথার্থ শাস্ত্রতাৎপর্য্য কীর্তন দ্বারা লোকশিক্ষা

প্রদানের জন্য বলিলেন—'পুরী গোসাঞি আপনার ঘরে ভিক্ষা করিয়াছেন। আমাকে আপনি নিজে রন্ধন করিয়া ভিক্ষা দিন। বৃদ্ধ বিপ্র সনোড়িয়া কুলোদ্ভুত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মধ্য ১৭।১৭৯ শ্লোকের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন —'পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত—আগরওয়ালা, কালওয়ার, সানোয়াড় ইত্যাদি। তন্মধ্যে আগরওয়ালা অতি শুদ্ধ; কালওয়ার, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী নিজ নিজ কর্ম্মদোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোয়াড়দিগকে যাঁহারা যাজন করেন, তাহাদিগকে সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বলে। সানোয়াড় শব্দে সুবর্ণবণিক তাহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাই সানোয়াড় ব্রাহ্মণ। যাজনযোগে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসীগণ ভোজন করেন না। শৌক্রকুল সম্বন্ধে সেই বিপ্রের ঘরে সন্ন্যাসীগণ ভোজন করেন না, তথাপি পুরী গোসাঞি তাঁহার বৈষ্ণব বা শুদ্ধ ব্রাহ্মণজ্ঞানে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার ঘরে ভিক্ষা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার হস্তে ভিক্ষা করিতে চাহিলে সেই বিপ্র দৈন্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনাকে ভিক্ষা দিব, তাহা আমার বড় সৌভাগ্য। আপনি ঈশ্বর, আপনার নিকট বিধি-ব্যবহার বলিয়া কিছু নাই। তথাপি বিপ্র তৎকালীন সামাজিক প্রথানুসারে সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে ভোজন করিলে মূর্খ লোক সন্ন্যাসীকে নিন্দা করিতে পারে, এই চিন্তায় তিনি মহাপ্রভুকে ভোজন করাইতে সঙ্কুচিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বুঝাইলেন শ্রুতি-স্মৃতি ও ঋষিগণের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু ধর্ম সংস্থাপনের জন্য সাধুগণের আচরণ বুঝিয়া তাহা অনুসরণ করাই প্রকৃত ধর্ম। বৃদ্ধ বিপ্র মহাপ্রভুর ইচ্ছা বুঝিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন।

পুরী হইতে ঝাড়িখণ্ডের নির্জন পথ ধরিয়া বনপথে যাইবার কালে শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর সেবার জন্য শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে ও তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণকে ভৃত্যরূপে সঙ্গে দিয়াছিলেন। যখন তিনি দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিতেছিলেন, সে সময় 'কৃষ্ণদাস' নামে একজন রাজপুত বৈষ্ণবও মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গ লইয়াছিলেন। অক্রূর ঘাটে আসিয়া প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিয়া অনেকক্ষণ ডুবন্ত অবস্থায় থাকায় কৃষ্ণদাস আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিলে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া লইয়া অসিলেন। মহাপ্রভুর ঘন ঘন প্রেমবিকার দেখিয়া বলভদ্র ভীত হইয়া মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীসনোড়িয়া বিপ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন

মহাপ্রভুকে শ্রীব্রজমণ্ডল ভ্রমণে রাখা ঠিক হইবে না, মাঘ মাসে মকর পঞ্চদশী পূর্ণিমা স্নানের যোগের কথা বলিয়া বৃন্দাবন হইতে গঙ্গাতীর পথে সোরো ক্ষেত্র হইয়া মহাপ্রভুকে প্রয়াগে লইয়া যাইতে হইবে। কৃষ্ণদাস (রাজপুত) ও সনোড়িয়া বিপ্র গঙ্গাতীর পথের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। যেহেতু মহাপ্রভু সনোড়িয়া বিপ্রকে নিজ গুরুদেবের গুরুভ্রাতা হিসাবে পূজ্যবুদ্ধি করিতেন, সে জন্য তাঁহার পরামর্শ স্বীকার করিলেন। সদা কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত মহাপ্রভু স্থূলদৃষ্টিতে বৃন্দাবনের বাহিরে আসিলেও প্রেমের বিকার প্রকট হইতে লাগিল। পথশ্রান্তিবশতঃ পথে এক বৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বলিলে সেইস্থানে গাভীগণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার ব্রজলীলার স্ফূর্তি হইল। হঠাৎ কোন গোপ বংশীবাদন করিলে তাহা শুনিয়াই মহাপ্রভু মহাপ্রেমের আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রেমের বিকারবশতঃ মুখ হইতে ফেন নির্গত ও শ্বাসরুদ্ধ হইল। ঘটনাক্রমে সে সময় পাঠান মুসলমান বিজলী খাঁন দশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মহাপ্রভুর ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বিজলী খাঁন মনে মনে স্থির করিলেন—এই সন্ন্যাসীর কাছে বহু ধন ছিল, এই চারিজন দস্যু ধুতুরা খাওয়াইয়া ইঁহাকে মারিয়া ধন লুট করিয়াছে, চারিজনকে বাঁধিয়া মারিতে গেলে (বঙ্গদেশ হইতে আগত) বলভদ্র ও তাঁহার সঙ্গী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর সানোড়িয়া বিপ্র নির্ভীকভাবে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিজলীকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"যে সন্ন্যাসীকে আপনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিতেছেন, উনি আমার গুরু। ব্যাধির জন্য কখনও মূর্চ্ছিত হন, কখনও সুস্থ থাকেন। আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেই দেখিবেন সন্ন্যাসীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, তখন প্রকৃত সত্য জানিতে পারিবেন। আমি যেখান হইতে আসিয়াছি সেই বাদশাহের কাছে একশত লোক আছে।" বিজলী খাঁন মাথুর ব্রাহ্মণকে নির্ভীক ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া বলিল,—"তোমাদের কথা শুনিয়া বুঝিলাম তোমরা মাথুর ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই দুইজন এখানকার লোক নহে, ভয়ে কাঁপিতেছে—ইহারা নিশ্চয়ই দোষী।" রাজপুত কৃষ্ণদাস বিপদ বুঝিয়া বীরবিক্রমে পাঠানকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—"আমার ঘর এই গ্রামের নিকটেই, আমার দুইশত সৈন্য ও একশত কামান আছে, আমি চিৎকার করিলেই তাহারা এখনই আসিয়া পড়িবে ও তোমাদের সব লুট করিবে। গৌড়ীয়ারা বাটপাড়, না তোমরা বাটপাড়।" রাজপুতের নির্ভীক কথা শুনিয়া পাঠানের ভয় হইল। ইতিমধ্যে

মহাপ্রভুর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি মহাপ্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' 'হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অতি অদ্ভুত কীর্তন শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া পাঠানগণ ভয় পাইয়া চারিজনকে মুক্ত করিয়া দিল। মহাপ্রভু নিজজনের বন্ধন দেখিতে পান নাই। পাঠানগণ তাহাদের সন্দেহের কথা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—'আমার নিকট কোন ধন নাই। এই চারিজন আমার সঙ্গী। মৃগী ব্যাধিতে আমি কখন অচৈতন্য হইয়া পড়িলে এই চারিজন আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা ও পালন করেন।'

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানের পর গঙ্গাতীর পথে প্রয়াগে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সনোড়িয়া বিপ্রকে ও রাজপুত কৃষ্ণদাসকে তিনি বলিলেন,— "আপনারা পথ দেখাইবার জন্য মথুরা হইতে অনেক পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগকে আর কষ্ট দিতে চাহি না। আপনারা এখান হইতে ফিরিয়া যান।' তাঁহারা মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গ আবার আমাদের ভাগ্যে হইবে কি না জানি না, উপরন্তু ম্লেচ্ছদেশ হওয়ায় পথে অনেক উৎপাতের সম্ভাবনা আছে; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এখানকার স্থানীয় ভাষা জানেন না, এইজন্য আমরা আপনার সঙ্গে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইতে ইচ্ছা করি।" ঈষৎ হাসিয়া মহাপ্রভু তাহা অনুমোদন করিলেন।

কবি কর্ণপুর

এই সাধু প্রকৃতির বিখ্যাত চারণকবি মহাপ্রভুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান রেল কারখানা (কলিকাতার নিকটবর্ত্তী) কাঞ্চন পুরীর শিবানন্দ সেনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই সেন মহাশয় মহাপ্রভুর মহান ভক্তগণের একজন, তাঁহার তিনপুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও কর্ণপুর, তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের 'ভক্তশূর' রূপে এক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার দুইটি নাম ছিল পরমানন্দ পুরী (সংক্ষেপে পুরীদাস) ও কর্ণপুর, উভয় নামই মহাপ্রভু প্রদত্ত, পূর্বতন নামটি জন্মের বহু পূর্বে প্রদত্ত ও পরবর্ত্তীটি যখন তিনি সপ্তম বর্ষীয় শিশু মাত্র। প্রতি বৎসর শ্রীশিবানন্দ বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে (পুরীতে) মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে আসিতেন। এমনই এক আগমন কালে মহাপ্রভু ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে এক অত্যাশ্চর্য পুত্র তাঁহার হইবে যাহাকে 'পরমানন্দ' নামকরণ করিতে বলেন। পূর্ব ভবিষ্যৎ বাণীকৃত 'পরমানন্দ' নামক বালক মাত্র সাত বৎসর বয়স্ক হওয়ার কালে তাহার মাতা-পিতা অন্যান্য বহু ভক্তজন সঙ্গে পুরী গমন করেন সেই সময় বালক মহাপ্রভুর সম্মুখে প্রণতঃ হইয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে প্রণতঃ হইয়া মহাপ্রভুর চরণের এক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চূষণ করিতে থাকে। মহাপ্রভু তাহাকে বারবার বলেন 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে, কিন্তু বালক মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে বলা সত্ত্বেও তাহা করিল না। মহাপ্রভু বলেন, "আমি সজীব ও জড় সকলকেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইলাম কিন্তু এই বালকের ক্ষেত্রে তাহা হইল না, এ কেমন?" মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠতম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর এক তাৎপর্যপূর্ণ জবাব দিলেন, 'আপনি উহাকে "কৃষ্ণনাম মন্ত্র" প্রদান করিয়াছেন, আর মন্ত্র তো উচ্চার্য নহে, পরন্তু মনে মনে জপ্য। বালকের ক্ষেত্রে ঘটনাটি তাহাই বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্য এক দিবস মহাপ্রভু তাহাকে বলেন, "ওহে পুরীদাস, কৃষ্ণের এক স্তোত্র আবৃত্তি কর।" বালক তৎক্ষণাৎ পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি ছাড়াই স্বরচিত এক সংস্কৃতে রচিত স্তোত্র আবৃত্তি করিলেন, যাহার অর্থ দাঁড়ায় " যে শ্রীহরি বৃন্দাবনের রমণীগণের কর্ণের নীলকমল স্বরূপ, তাঁহাদের চক্ষের কজ্জল শ্রেষ্ঠ মণিরত্ন গ্রথিত বক্ষের মাল্য স্বরূপ ও সংক্ষেপে তাঁহাদের সকল প্রকার ভূষণ স্বরূপ, তাঁহার জয় হউক।" সে সপ্তম বর্ষীয় বালকের এখনও বিদ্যা-শিক্ষা কাল আরম্ভ হয় নাই তাহার মুখে এহেন সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ শ্রবণে উপস্থিত সকলেই

অত্যাশ্চর্যান্বিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রসঙ্গে এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার এমনই মহিমা যাহা ব্রহ্মা আদি দেবগণের জ্ঞানের সীমার উর্দ্ধে। বালক সূর্যালোক দর্শনের বহু পূর্ব হইতেই মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত যখন সে তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চূষণ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাহার মধ্যে অস্বাভাবিক শক্তি সঞ্চারিত হয় ও এইরূপ অত্যাশ্চর্য-জনক পাণ্ডিত্য দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে, কোন বিদ্যা-শিক্ষা লাভ না করিয়াও এবং মাত্র সপ্তম বৎসর বয়সেই।"

পরবর্ত্তীকালে তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অতি প্রসিদ্ধ ও সম্মানীয় সম্পাদনা করেন, যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিত মাহাত্ম্যম্, অলঙ্কার কৌস্তুভম্, ভাগবত দশমস্কন্ধ টীকা ইত্যাদি। প্রথম গ্রন্থটি একটি নাটক যাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ক্রিয়াদি যথাযথ ভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, যদিও নাটকে স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে কিছু ক্রমপর্য্যায় ব্যাপারে কিছু ত্রুটি দেখা দিয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভুর শিক্ষার উৎকর্ষতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র যে লঙ্ঘন লক্ষিত হয় না। গ্রন্থটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের কাছে মহৎ সম্মান ও আদরের বস্তু হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির পূর্ব অবতার গণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাঁহারা বর্ত্তমান অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ত্তমান অবতরণকালীন পার্ষদ ভক্তরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার তালিকার মৌলিকত্ব বিষয়ে ছলনার কথা শুরুতেই খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন, পরন্তু তিনি পাঠকবর্গকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে ঐগুলি স্বয়ং মহাপ্রভুর বাক্যাবলী ও লিখন হইতে লওয়া হইয়াছে, এছাড়া তাঁহার নিকটতম পার্ষদবর্গ যথা স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীমুরারি গুপ্ত, প্রভৃতির উক্তি বা লিখন হইতেও সংগৃহীত। এতদ্ ব্যতীত উহাতে গৌড়ীয়গণের গুরুপরম্পরাও লক্ষিত হয়—শ্রীব্রহ্মা হইতে শুরু করিয়া, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাসদেব, শ্রীমধ্বাচার্য ইত্যাদি। তৃতীয় গ্রন্থটি এক বিরাট চম্পূ অর্থাৎ এমন এক পঠন মধুর রচনা যাহাতে গদ্য ও পদ্য ভালভাবেই বর্ত্তমান, ইহা বাইশটি অংশে বিভক্ত। ইহাতে নন্দোৎসব হইতে রাস লীলা বিষয়ক কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে এমনই অভূতপূর্ব মনোরম মনোহারিত্ব উহাতে বজায় আছে যাহা কবিত্ব সাহিত্যের সুদক্ষ রসপণ্ডিতগণের নিকটও পরম আনন্দের উৎস হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে

তাঁহার সকল গ্রন্থনাগুলিই গুণগতভাবে ও সংখ্যাগতভাবে শ্রীচৈতন্য সাহিত্যকে উৎকর্ষ প্রদান করা। প্রতিটি উচ্চশিক্ষিত জনগণ—তাঁহার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ভক্তির জন্য, তাঁহার অসামান্য সাধু জীবন এবং প্রচুর পরিমাণে, সুমধুর ও জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য রাখিয়া যাওয়া, যাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে জানিতে আগ্রহী তাঁহারা অবনত মস্তকে ও গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার নাম স্মরণ করেন।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার পথে কাশীতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করার পর মথুরা যাত্রা করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থান কালে মায়াবাদিগণ মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া নৃত্য-গীতাদি করেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর নিজধর্ম যে বেদান্ত শ্রবণ, তাহা করেন না। এ সব নিন্দাদি উপেক্ষা করিয়া মহাপ্রভু মথুরা দর্শন করিয়া পুনরায় কাশীতে আসিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান ও তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্বাহণ করিতেন। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা মহাপ্রভুর নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সেই সময় এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া নিবেদন করিলেন, আমি সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, যদিও আমি জানি আপনি সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর নিকট গমন করেন না, তথাপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যদি এই নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করেন, তবে আমার সাধ পূর্ণ হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাসিদিগকে কৃপা করিবেন বলিয়া সেই বিপ্রের হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া সেইরূপ প্রার্থনা করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু হাসিয়া তাহা অঙ্গীকার করিলেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীমণ্ডলীর ভিতর গমন করিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া পাদ-প্রক্ষালন স্থানে বসিয়া পড়িয়া কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সন্ন্যাসিগণের মন আকৃষ্ট হইলে তাঁহারা সকলে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অপবিত্র স্থানে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আমি হীনসম্প্রদায়ভুক্ত, অতএব তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বসিবার উপযুক্ত নহি।' শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে—যে সকল ব্রাহ্মণ দশনামি দলে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাঁহারাই জগন্মান্য 'বৈদিক সন্ন্যাসী' বা যথার্থ শাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাসী।' সন্ন্যাসীপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সন্ন্যাসী ধর্ম যে বেদান্ত শ্রবণ, ধ্যান ইত্যাদি না করিয়া ভাবুকগণকে সঙ্গে লইয়া নর্তন, কীর্তনরূপ যে হীনাচার করা হয়, কি তাহার কারণ?' মহাপ্রভু বলিলেন, 'আমি মূর্খ, বেদান্ত শ্রবণের অধিকার আমার নাই, সেই জন্য আমার গুরু আমাকে সদাই 'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ করিতে আদেশ দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩-৭৪

সেই আজ্ঞা অনুসারে নাম লৈতে লৈতে আমি পাগল হইয়া হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই। সেই অবস্থা আমি গুরুর চরণে নিবেদন করিতেই গুরু বলিলেন,—'কৃষ্ণ-মহামন্ত্রের ইহাই স্বভাব। কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ—যাহার তুলনায় চারি পুরুষার্থ তৃণতুল্য। ভালই হইল তুমি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছ। এই জন্যই আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করি।'

প্রভুর মধুর বচন শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের মন ফিরিয়া গেল, যদিও বলিলেন এ পর্য্যন্ত সবই সত্য বলিয়া স্বীকার করতঃ বেদান্ত না শুনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলিলেন, বেদান্তসূত্র—ঈশ্বর বচন। শ্রীনারায়ণ ব্যাসরূপে তাহা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাহার মুখ্যবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া গৌণবৃত্তিতে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে সর্বনাশ হয়। ইহাতে আচার্য্যের দোষ নাই, তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞায় কলিযুগে জগতের লোককে মোহিত করিবার জন্য ইহা করিয়াছেন। মায়াধীশ বিষ্ণুকে মায়িক জ্ঞানই পাষণ্ডতা। 'বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।' বেদতরুর বীজ প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বর স্বরূপ। তাহা আচ্ছাদন করিয়া 'তত্ত্বমসি' স্থাপন করা হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্রে অভিধা বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণই স্বীকৃত। বেদই স্বতঃপ্রমাণ, তাহা লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি হয়।

সন্ন্যাসিগণ বলিলেন,—'আপনি যে অর্থ খণ্ডন করিলেন, তাহাতে কোন বিবাদ নাই, কিন্তু সম্প্রদায় অনুরোধে তাহা মানিয়া লইতে হয়।' ইহা বলিয়া তাঁহারা মুখ্যই ব্যাখ্যা করিতে বলায় মহাপ্রভু সবিশেষে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন— (১) ভগবান্ কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ', (২) শ্রবণাদি ভক্তিই 'অভিধেয়' বা উপায়, (৩) কৃষ্ণপ্রেমই উপেয় বা 'প্রয়োজন' বা পঞ্চম পুরুষার্থ।'

এই মত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণ বিনীতভাবে বলিলেন—

"বেদময়-মূর্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্বে যে কৈলুঁ নিন্দন।।"

এই মতে তাঁ-সবারে ক্ষমি' অপরাধ।
সর্ব্বাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ।।

—চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৪৮, ১৫০

চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও সনাতন ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কোন এক শিষ্য মহাপ্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধ ভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে, প্রকাশানন্দ নানা যুক্তি দ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। চৈতন্য-সিদ্ধান্ত বাণীই যে অনুসরণীয়া, তাহা জানাইতে বলিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার।।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৫৭

সেই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র সেই শুভ সংবাদ জানাইবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট গমন করিলেন। সে সময় কাশীতে দৈনিক নিয়মানুসারে পঞ্চনদে স্নানের পর মহাপ্রভু শ্রীবিন্দুমাধব হরিকে দর্শনের জন্য যাইতেছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র পথে যাইতে যাইতে ভক্ত প্রকাশানন্দের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন। বিন্দুমাধবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আবিষ্ট হইয়া নৃত্যকালে চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপন মিশ্র ও সনাতন নামসঙ্কীর্তন করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ লোক 'হরি' 'হরি' বলিতে থাকিলে স্বর্গ-মর্ত্য ভরিয়া মঙ্গলধ্বনি উঠিল। নিকটে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রকাশানন্দ কৌতুহলী হইয়া আসিয়া মহাপ্রভুর নৃত্য-প্রেম-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া শিষ্যগণ সহ 'হরি' 'হরি' বলিতে বলিতে তিনিও কীর্তন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভূত উপদেশ প্রদান করিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ জানাইলেন যে, মহাপ্রভু "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ...." শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া সকলে তাহা শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু সেই একষট্টি প্রকার অর্থের বিবরণ দিলেন। তাহা শুনিয়া লোকে চমৎকৃত হইলেন।

সীতা ঠাকুরাণী

শচীনন্দন শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া পরে একদিন অদ্বৈতপ্রভুর অনুমতি পাইয়া তাঁহার ভার্য্যা সীতাদেবী উপহারাদি লইয়া শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিলেন ও শিশু দর্শন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর মায়াপুরেও এক গৃহ ছিল, তথাপি নিজালয় উল্লেখ করায় তাঁহার শান্তিপুরে অবস্থানই বোঝানো হয়েছে। শিশুকে দেখিয়া সীতাদেবীর মনে হইল যেন সাক্ষাৎ গোকুলের কানু, শুধুমাত্র বর্ণের পার্থক্য। শিশুকে আশীর্বাদ ও রক্ষাকবচ-বন্ধনপূর্বক—

দুর্ব্বা, ধান্য, দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরঞ্জীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ভরে নাম থুইল 'নিমাই'।।

যেহেতু পার্বতী-মহেশের সহবর্ত্তিনী স্ত্রী-যোনিপ্রাপ্ত অশুভকারিণী প্রেত-যোনিগণ, অর্থাৎ অপদেবতা সকল পবিত্র নিম্ববৃক্ষ ও তৎ সংলগ্ন স্থানে যাইতে পারে না। অদ্বৈত আচার্য্য-ভার্য্যা সীতা ঠাকুরাণী জগৎপূজিতা আর্য্যা। তিনি পেটারি ভরিয়া নানা অলঙ্কার যথা—সোনার কটি-বলয়, রূপার পদাভরণ, সোনার চুড়ি, বালা, অনন্ত শঙ্খ নির্মিত বলয়, শাঁখা, ঘুন্‌সি, বিচিত্র রেশমী বস্ত্র, বুনা রেশমের পাড়বিশিষ্ট শিশুর পরিধেয় জামা, স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রাদি বহু ধন, গন্ধ-দ্রব্যাদি ইত্যাদি লইয়া সীতাদেবী শচীগৃহে আসিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে শাসন-মুখে প্রচুর কৃপা লাভের আশায় ভক্তিবিদ্বেষী মায়াবাদের আদর করিতে লাগিলেন। সুতরাং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সহিত সেখানে (শান্তিপুরে) গমন করিয়া ভক্তি-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিলেন। বহির্বিচারে অদ্বৈতপত্নী মহাপ্রভুকে বাহিরে নমস্কার অভিবাদন না জানাইয়া মনে মনে অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক আনুগত্য স্বীকার করিলেন। মহাপ্রভুর প্রশ্নে জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য নির্দেশে অদ্বৈতপ্রভু ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য আছে জানাইলেন এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ভক্তিপথে থাকিবার প্রয়োজন নাই, ইহাও বলিলেন। ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মহিমা অধিক বলায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য অদ্বৈতকে পিঁড়া হইতে প্রাঙ্গণে নামাইয়া ভূমিশায়ী করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতপত্নী বলিলেন, অদ্বৈত অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বধের নিষেধ আছে। অত্যন্ত প্রহার ফলে

যদি ব্রহ্মবধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য ঘাতকের অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য হইবে না। পতিব্রতার বাক্য শুনিয়া নিত্যানন্দ হাসিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন, আমি যদি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। তাহা শুনিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

মহাসতী পতিব্রতা অদ্বৈতগৃহিণীকে মহাপ্রভু 'মাতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করিয়া শীঘ্র যাইয়া রন্ধন করিতে বলিলেন। অতঃপর নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। মহাসতী যোগেশ্বরী অদ্বৈতগৃহিনী তাঁহাদিগকে ভোজনে বসাইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থানকালে অদ্বৈতাচার্য্য, সীতা ঠাকুরাণী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ প্রতি বৎসর সেখানে গমন করিতেন। যাইবার কালে সীতাদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় ভোজ্যাদি তৈয়ার করিয়া লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন।

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।১৩৪

শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন,—

শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর পিতা শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ি। সীতা ঠাকুরাণীর 'শ্রী' নামে এক ভগিনী ছিলেন।

নৃসিংহ ভাদুড়ি অতি উল্লাস অন্তরে।
দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে।।
আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগৎ পূজিতা।
সর্বত্র বিদিত নাম 'শ্রী' আর 'সীতা'।।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়ও—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সম্প্রতং।
সাতীরূপেণাবতীর্ণা 'শ্রী' নাম্নী তৎপ্রকাশতঃ।।

—ভগবতী যোগমায়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পত্নী সীতাদেবী ও তৎপ্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণা হইলেন।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ৪৪ শ্লোক বলেন—

"পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহানন্।
অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি সম্মতঃ।।
শ্রীজানকী রুক্মিণী বা লক্ষ্মী নাম্নী বৈ তৎসুতা।।"

—সীতা-পিতা জনকের অবতার বল্লভাচার্য্য। ইনি নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার এক কন্যা আছেন, যাঁহার নাম লক্ষ্মী,—যেন সাক্ষাৎ মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী। তিনি তাঁহার এই বয়ঃপ্রাপ্তা বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতেন। দৈব-ইচ্ছাক্রমে হঠাৎ গঙ্গাস্নানোপলক্ষ্যে আগত গৌর-সুন্দরের সহিত শ্রীলক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার হইয়া যায়। গৌরচন্দ্র নিজলক্ষ্মী চিনিতে পারিয়া হাসিলেন এবং লক্ষ্মীদেবীও মনে মনে গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। এইরূপে পরস্পরকে অঙ্গীকার করতঃ গৃহে গমন করিলেন। ঘটনাক্রমে ঘটকবর বনমালী আচার্য্য তৎকালে শচীগৃহে আগমন করিয়া শচীর নিকট নিমাইয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—"কুল, শীল, সদাচারে সর্বতোভাবে নির্দোষ এক ব্রাহ্মণ এই নবদ্বীপের ভিতর বাস করেন। তাঁহার এক কন্যা আছেন—রূপে, গুণে, স্বভাবে লক্ষ্মীপ্রায়। যদি অনুমতি করেন, এই সম্বন্ধ স্থির করি।" শচীমাতা বলিলেন, 'আমার পিতৃহীন বালক এখন পড়াশুনা লইয়া আছে, পড়ুক, তারপর চিন্তা করা যাইবে।' শচীদেবীর কথা বনমালীর অভিপ্রেত না হওয়ায় অপ্রসন্ন মনে তিনি চলিয়া গেলেন। দৈব- ইচ্ছায় পথে গৌরচন্দ্রের সহিত বনমালীর দেখা হইয়া যায়। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি (মহাপ্রভু) আলিঙ্গন করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন, কোথায় গিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার জননীর নিকট তোমার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া গমন করিয়াছিলাম; বুঝিতে পারিলাম না কেন তিনি (শচীদেবী) এবিষয়ে আগ্রহ দেখাইলেন না।' তাঁহার কথা শুনিয়া নিমাই মৌন রহিলেন ও গৃহে গমন করিলেন। জননীকে তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বনমালী আচার্য্যকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইলেন না কেন?' শচীমাতা ইহাতে পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া লইয়া পরদিন ঘটককে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন,—'গতকাল যে সম্বন্ধের কথা তুমি বলিয়া-ছিলেন, শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা কর।' ব্রাহ্মণ শচীমাতার পদধূলি লইয়া সেইক্ষণেই

বল্লভাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কন্যার বিবাহের শুভলগ্ন স্থির করুন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর পরম পণ্ডিত ও সর্বগুণের সাগর। তিনি আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র। যদি ইচ্ছা হয়, এই বিবাহের আয়োজন করুন।' তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বল্লভাচার্য্য বলিলেন, 'এ হেন কন্যার পতি বহু ভাগ্যে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হন, অথবা কমলা ও গৌরী কন্যার প্রতি সন্তুষ্টা হন, তাহা হইলে আমার সেইরূপ জামাতা আমার ভাগ্যে জুটিবে। আপনি ইহার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করুন। তবে একটি কথা বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে, আমি নির্ধন, কিছু দিবার শক্তি আমার নাই; কন্যামাত্র দান করিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া। এই বিষয়ে আপনি তাঁহাদের মত লইয়া আসিবেন।' বল্লভাচার্য্যের কথা শুনিয়া বনমালী শচীদেবীর নিকট আসিয়া শুভক্ষণে কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগ লইতে বলিলেন।

বিবাহ সম্বন্ধ শুনিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ আনন্দিত হইয়া উদ্যোগ করিতে শুরু করিয়া দিলেন। শুভদিনে বাসরে গীত-বাদ্য চলিতে লাগিল। বেদমন্ত্র মুখরিত বিপ্রমণ্ডলীর মধ্যে নিমাই পণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ও তিনি বিপ্রগণের যথারীতি সন্তোষ বিধান করেন। বল্লভাচার্য্য ভাবী জামাতার মাঙ্গল্য সম্পাদন করিয়া গেলেন।

পরদিবস শুভ পরিণয় দিবসে প্রভু স্নান-দান-পিতৃগণের পূজা ইত্যাদি সমাপন করিলেন। শুভক্ষণে নিমাই বল্লভগৃহে আগমন করিলেন ও বল্লভাচার্য্য যথারীতি জামাতা বরণ করিয়া সম্ভ্রম সহকারে আসনে বসাইলেন। শেষে সর্ব অলঙ্কার ভূষিতা কন্যা লক্ষ্মীকে নিমাইয়ের সমীপে আনয়ন করা হইল। লক্ষ্মী নিমাইকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলেন। সেব্য ও সেবিকা পরস্পর সন্দর্শনে আনন্দিত হইলেন। নিজপ্রভু চরণে লক্ষ্মীদেবী মাল্য প্রদান সহ আত্মনিবেদন করিলেন। শুভদৃষ্টির পর নবযৌবনে উপনীত ঈশ্বরের বামে ঈশ্বরীকে উপবেশন করানো হইল। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকাবতার বল্লভাচার্য্য গৌরকৃষ্ণ-করে অভিন্ন রুক্মিণী মহালক্ষ্মীকে সম্প্রদান করিলেন।

বিবাহ শেষে পরদিবস নিমাই সঙ্গে লক্ষ্মীকে লইয়া নিজগৃহে চলিলেন। সন্ধ্যাকালে নিজগৃহে আসিয়া পৌঁছিলে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণকে লইয়া পুত্রবধূকে ঘরে লইয়া আসিলেন। নিত্যসেব্য ঈশ্বর দম্পতির অপ্রাকৃত বিবাহ বিলাস শ্রবণে তদাশ্রিত বশ্যজীবগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা নাশ হয় ও স্ব স্ব স্বভাবে গৌরদাস্য

উপলব্ধি হয়। প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মীর অবস্থান হওয়ায় শচীগৃহ নারায়ণ ও মহালক্ষ্মীর ধাম অভিন্ন মহাবৈকুণ্ঠ হইল। লক্ষ্মীগৃহে আসা অবধি শচীদেবী নানাবিধ রূপে দর্শন ও ক্ষণে ক্ষণে কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পাইতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবীতে কমলার অধিষ্ঠান আছে। পূর্বের মত দরিদ্রতা দুঃখ আর এখন নাই। এই বধূ গৃহে পদার্পণ মাত্র কোথা হইতে না জানি আসিয়া সব মিলে। মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাময় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাতেই তাঁহার স্বরূপ গোপন রহিল। কারণ প্রাকৃত চেষ্টায় ঈশ্বরের লীলা-বৈচিত্র্য বোঝা যায় না। স্বতন্ত্র ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ মায়াধীশের কৃপা বা ইচ্ছা ব্যতীত মায়াবশ্য জীব দূরে থাকুক স্বয়ং লক্ষ্মীর ও প্রভুর ছন্নলীলা জানিতে পারেন না। সর্বশাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র ঈশ্বর কৃপা বলেই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে বশ্যের সামর্থ্য হয়।

নিমাই প্রত্যহ গ্রন্থানুশীলন লীলা শেষে গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণপূজা, তুলসী জলদান করিয়া ভোজনে বসিলে শচীমাতা নিজ পুত্রবধূ সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়ার পরিবেশন ও গৌর-বাসুদেবের ভোজন নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতেন। ভোজন শেষে নিমাই শয়ন করিলে লক্ষ্মী তাঁহার পাদ-সম্বাহন করেন।

আদর্শ গৃহস্থরূপে অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত (১) অভাবগ্রস্ত দুঃখীর প্রতি মুক্ত হস্তেদান, (২) অতিথি সম্মান, (৩) চতুর্থাশ্রমি-সম্মান প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া পুণ্যময় গৃহস্থোচিত ধর্মের পূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। একদিন শচীমাতাকে খবর পাঠাইলেন অতি শীঘ্র কুড়ি সন্ন্যাসীর ভোজনের বন্দোবস্ত করিতে। ঘরে কিছুই না থাকায় শচীদেবী চিন্তিত হইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে কোন জন সকল সামগ্রী আনিয়া হাজির করিলেন। তখন লক্ষ্মীদেবী পরম সন্তোষ মনে রন্ধন করিলেন। প্রভু স্বয়ং সন্ন্যাসীগণের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিলেন। ঘরে যত অতিথি আসিতেন, সকলকেই তিনি সেবা করিতেন। সেই সমস্ত অতিথিও পরম ভাগ্যবান্ যাঁহারা স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণের হস্তে অন্ন পাইতে থাকেন।

ভগবৎসেবা-বিগ্রহ লক্ষ্মীদেবীর আদর্শ পতি সেবা

লক্ষ্মীদেবী একাকিনী মহানন্দে যাবতীয় ভগবদ্ গৃহকর্ম সম্পাদন করিতেন। শচীদেবী পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবীর সুশীলতা-দর্শনে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মীদেবী ঊষাকাল হইতে যত গৃহকর্ম সকলই আপন হস্তেই করেন—ইহা ছিল নিত্যদিনের ধর্ম। তিনি ভগবৎপ্রীতির জন্য নরতনুধারিণী মহালক্ষ্মীর আদর্শ

গৃহিণ্যুচিত কৃত্যাদি যথা দেবগৃহে স্বস্তিকমণ্ডলী রচনা, শঙ্খ-চক্র অঙ্কণ, বিষ্ণু-পূজোপকরণ-সজ্জা যথা—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল ইত্যাদি সকলই করিতেন। নিরন্তর শ্রীতুলসীসেবা ও ততোঽধিক ভগবজ্জননীদেবীর সেবায় তাঁহার মনোনিবেশ ছিল।

স্বীয় সাধ্বী প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর সেবা দর্শন করিয়া গৌর-নারায়ণ অন্তরে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, যদিও মুখে কিছু বলিতেন না।

কোনদিন লক্ষ্মীদেবী প্রভুর চরণ তলে বসিয়া পাদ সম্বাহন করিতেন। শচীমাতা প্রভুর পদতলে পাদসম্বাহনরতা লক্ষ্মীর মধ্যে দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন, যেন অগ্নিপুঞ্জশিখা জ্বলিতেছে। কোন দিন শচীমাতা ঘরে-দ্বারে সর্বত্র মহাপদ্মগন্ধ সর্বত্রই পাইতেন। নবদ্বীপে ছন্ন লীলাকারী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ লীলা করেন, কেহ চিনিতে পারেন না।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিমাইয়ের পূর্ববঙ্গ উদ্ধার ইচ্ছায় মাতাকে বলিলেন, 'আমি কিছুদিন প্রবাসে গমন করিব'। আর লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন—"মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর।" গৌরনারায়ণ পূর্ববঙ্গে বিদ্যাবিলাস লীলায় মগ্ন রহিলেন। এদিকে নবদ্বীপে ঈশ্বরবিরহ বিধুরা সতী সাধ্বী ঈশ্বরী লক্ষ্মীদেবী মনোদুঃখে মৌনাবস্থা অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কাহাকেও কিছু বলেন না।

"নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন।।
নামে সে অন্ন মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে।।
একেশ্বর সর্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ।।
ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে।।
নিজ প্রতিকৃতি-দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে।।

প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়।।”

—শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১০০-১০৫

অনুক্ষণ ভগবৎপাদ-সেবন পরায়ণা মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর পতি বিরহ-সহনে অসামর্থ্যহেতু তচ্চরণান্তিকে গমনেচ্ছায় গৌরচরণ ধ্যানরতা মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী স্বধাম বিজয় অর্থাৎ অন্তর্ধান করিলেন।

এদিকে একাকিনী শচীমাতার ক্রন্দন শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়—যাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রতিবেশী সজ্জনগণ যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া শ্রদ্ধা ভরে অপ্রকট মহোৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এদিকে নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মাতাকে দুঃখিতা দেখিয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলে শচী অধোমুখে রহিলেন। আপ্ত প্রতিবেশিগণ লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় মহাপ্রভু ক্ষণেক হেঁটমাথা রহিলেন। নরলীলাভিনয়ে প্রথমতঃ পত্নীবিরহ দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরে তত্ত্বকথা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন—‘হে মাতঃ! আপনি দুঃখিত হইতেছেন কেন? যাহা ভবিতব্য, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? কালের অপ্রতিহত বেগ, কেহ কাহারও নহে, সংসার অনিত্য, সকল সংসার ঈশ্বরের অধীন; সুতরাং সংযোগ-বিয়োগ আর কে করিতে পারে? সুতরাং যাহা ঈশ্বর ইচ্ছায় হইল তাহার জন্য দুঃখ কেন? পতির জীবদ্দশায় অর্থাৎ সধবা অবস্থায় সাধ্বী নারীর গঙ্গাপ্রাপ্তি সৌভাগ্যের পরিচয়।’ এইভাবে মাতাকে প্রবোধ দান করিয়া নিজ কৃত্য স্বজনগণ সহ আত্মনিয়োগ করিলেন।

শ্রীমধু পণ্ডিত

শ্রীল মধু পণ্ডিতের বংশ পরিচয় বা আবির্ভাব তিরোভাব-কাল বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কথিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভ শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষির সহায়তায় ও অনুগ্রহে শ্রীমদনগোপাল, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ— এই তিন বিগ্রহকে এবং শ্রীবৃন্দাদেবী ও শ্রীগোপীশ্বর-শিবলিঙ্গকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কালক্রমে শ্রীধামের সহিত গুপ্ত হইয়া পড়েন। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তি সঞ্চার ও প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ মহাবন হইতে শ্রীমদন-গোপালকে, শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের গোমাটিলার নিকটস্থ যোগপীঠ (মতান্তরে শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড) হইতে শ্রীগোবিন্দদেবকে ও শ্রীল গদাধর গোস্বামীপাদের প্রণয়ী শিষ্য শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী ও শ্রীমধুপণ্ডিত বংশীবটের নিকটস্থ যমুনাতট হইতে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। সাধন দীপিকায়—

যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবটতটে শ্রীমদ্‌যমুনোপতটে শুভে।।

—শ্রীযমুনার উপতটস্থ মনোহারী বংশীবটতটে দয়ার সাগর গোপীনাথ মধু পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর বলেন,—

অহে বাপু শ্রীনিবাস! কহিতে কি আর।
প্রভু ভক্তদ্বারে কৈল আপনা প্রচার।।
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয়।।
দোঁহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা, কহি সাধ্য কার।।
বংশীবট নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়।।

(১।৪৭৪-৪৭৭)

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
মধুপণ্ডিতে তাঁর স্নেহ অতিশয়।।
অহে শ্রীনিবাস! গোপীনাথের দর্শনে।
কহিতে কে জানে যে আনন্দ বৃন্দাবনে।।

(১।৪৮০-৪৮১)

নিজাভীষ্ট সম্বন্ধাদিদেব—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতি।
মৎসর্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।।

—আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

নিজাভীষ্ট অভিধেয়াদিদেব—

দীব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।

—জ্যোতির্ম্ময়-শোভা বিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদের স্মরণ করি।

নিজভীষ্ট প্রয়াজনাধিদেব—

শ্রীমান্ রাস-রসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তু নঃ।।

—রাসরস প্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্ গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর বৃন্দাবনের অধিদেব; গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবায় অধিকার দান করিয়া আপনার নিজজন করিয়াছেন।

ভক্ত চাঁদকাজী

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"
প্রভু বলে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।
দশ পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।।

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩

নাগরিকগণ মহাপ্রভুর নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া উল্লাসে গৃহে কৃষ্ণনাম করিতে থাকেন। এইভাবে তিনি নগরে নগরে কীর্তন করাইতে লাগিলেন। ধর্মপ্রাণ কুলেরই গৃহে মৃদঙ্গ-শঙ্খাদি বাদ্যযন্ত্র ছিল। ঐগুলি শরৎকালে অথবা চৈত্র মাসে মহামায়ার পূজোপলক্ষ্যে বাজানো হইত। ঐ সকল পূজা সাময়িক ও জাগতিক বিষয় সুখ লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইত। এক্ষণে নিরন্তর হরিকীর্তন-কালে ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র নিযুক্ত হইল।

দৈবে একদিন চাঁদকাজী ঐ পথে গমন করিতে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ ধ্বনি শুনিতে পাইল। "কাজি বলে—ধর ধর, আজি করোঁ কার্য। আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।১০৩) যাহাকে পাইল কাজী তাহাকেই মারিল, মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিল ও দ্বারে অনাচার করিল। এইভাবে চাঁদকাজী শাসকসূত্রে ধর্মের আবরণে প্রজা-পীড়ন করিতে লাগিল। কাজী লোকজনকে বলিতে লাগিল—

"এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও, কার বল জানি।।
কেহ কীর্তন না করিহ সকলে নগরে।
আজি ক্ষমা করি যাইতেছোঁ ঘরে।।
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১২৬-১২৮

কাজী চলিয়া গেলে নাগরিকগণ অতীব দুঃখ পাইয়া মহাপ্রভুকে সব ঘটনা জানাইলেন।

"প্রভু আজ্ঞা দিল যাই' করহ কীর্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৩০

নাগরিকগণ মনে মনে ভীত হইয়া আছেন, তাহা বুঝিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, আজ নগরে নগরে কীর্তন করিব। সকলে নগরকে সজ্জিত কর, সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে দ্বীপ জ্বালাও। মহাপ্রভু তিন সম্প্রদায় করিয়া কীর্তন বিভাগ করিয়া দিয়া ঠাকুর হরিদাস অগ্রে, মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য ও পাছে গৌরচন্দ্র নিজে; প্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস, গোপীনাথ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্তকোটি ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এইভাবে কীর্তনমুখে নবদ্বীপ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কীর্তনধ্বনি ও লোকের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া কাজী ঘরে লুকাইয়া রহিলেন। উদ্ধত লোকজন কাজীর ঘর, উদ্যান প্রভৃতি ভাঙ্গিতে লাগিল। মহাপ্রভু কাজীর গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন এবং বিশেষ কোন ভব্যলোককে দিয়া কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী দূর হইতে অবনত মস্তকে আসিয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন।

মহাপ্রভু বলিলেন, আমি একজন অতিথিরূপে তোমার ঘরে আসিলাম, আর তুমি লুকাইয়া রহিলে এ কেমন ধর্ম তোমার? কাজী বলিল, আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন, আপনাকে শান্ত করা পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাকিলাম। এইবার শান্ত হইয়াছেন, তাই আসিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত অতিথিকে পাইলাম। নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা (কাকা), তিনি আপনার মাতামহ। সেই সম্বন্ধ করিয়া আপনি আমার ভাগিনা। ভাগিনার ক্রোধ মামা সহ্য করে, আর মাতুলের অপরাধ ভাগিনা লয় না। এইভাবে দু'জনার ঠারে ঠোরে কথা হইল, ইহার ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে পারে না।

প্রভু বলিলেন, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করিতে আসিলাম।

কাজী বলিল, যা' আপনার মনে আছে, বলুন।

প্রভু বলিলেন, তুমি গোদুগ্ধ পান কর, অতএব গাভী তোমার মাতা; বৃষ দ্বারা চাষ করাইয়া অন্ন উৎপাদন কর, অতএব বৃষ তোমার পিতা। মাতা-পিতাকে মারিয়া খাও, এ তোমার কেমন ধর্ম?

কাজী বলিল, আপনার শাস্ত্র যেমন 'বেদপুরাণ', তেমন আমার শাস্ত্র 'কোরাণ'। সেই কোরাণশাস্ত্রে 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' এই দুই মার্গের ভেদ আছে। নিবৃত্তি মার্গে জীববধের নিষেধ আছে, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা প্রবৃত্তি মার্গস্থিত, তাহারা শাস্ত্র আজ্ঞায় গো-বধ করিয়া পাপী হয় না। আবার দেখুন, আপনাদের বেদশাস্ত্রে গো-বধের বিধিবাক্য পাওয়া যায়। এই জন্যই বড় বড় মুনিগণ চিরদিন গো-বধ করিয়া আসিয়াছেন।

মহাপ্রভু বলিলেন, বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধি নাই, তবে যে গোবধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বাক্য দেখা যায়, সে সকল 'জরদ্গব' অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ গরু সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ,—বধ নহে, জরদ্গবের উপকার মাত্র। কলির ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ শক্তি না থাকায়, এখন গোবধ হইতে পারে না। অশ্বমেধ, গোবধ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি,—কলিকালে এই পাঁচটি নিষিদ্ধ হইয়াছে। তোমরা জীবন দিতে পার না, বধ মাত্র করিতে পার; অতএব নরক হইতে তোমাদের নিস্তার নাই। গরুর অঙ্গে যত লোম আছে, তত সহস্র বৎসর তোমাদিগের রৌরব নরকে পচিতে হইবে। তোমাদের শাস্ত্রকর্তা শাস্ত্রের মর্ম না জানিয়া ভ্রান্ত হইয়া সেই সব আজ্ঞা দিয়াছেন।

এ সব শুনিয়া কাজী নিরুত্তর রহিল, পরাজয় মানিয়া বলিল—পণ্ডিত! আপনি যাহা কহিলেন, সেই সবই সত্য; আমাদের শাস্ত্র আধুনিক, কল্পিত, বিচার সহ নয়—তাহা সব আমি জানি। কেবলমাত্র জাতি অনুরোধে সেই শাস্ত্রকে মানি। যবন-শাস্ত্র তিন প্রকার অর্থাৎ 'যু' (ইহুদি) দিগের পুরাতন পুঁথি, কোরাণ ও বাইবেল। এই সকল পুঁথিরই আদি পাওয়া যায়। কেহই বেদবাক্যের ন্যায় অনাদি নহে। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে যে বিচার আছে, তাহা মূলে দৃঢ় না হওয়ায় সন্দেহপ্রবণ।

মহাপ্রভু বলিলেন, তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করিতেছি, তুমি তাহার যথার্থ উত্তর দিবে, ছলনা করিবে না, আমাকে বঞ্চনা করিবে না। তোমার নগরে সদা সঙ্কীর্তন হয়, বাদ্য-গীত-নর্তন-সঙ্গীত হইয়া থাকে, তুমি কাজী, হিন্দুধর্ম-বিরোধে তোমার অধিকার আছে, তবে যে তুমি মানা কর না, ইহার কারণ বুঝিতে পারি না।

কাজী বলিল, সকলে আপনাকে 'গৌরহরি' বলে, অতএব সেই নামে আপনাকে বলিতেছি, গৌরহরি শুনুন, আপনি যদি নিভৃতে আসেন, তবে আপনাকে ইহার কারণ জানাইতে পারি।

মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি স্বচ্ছন্দে কহিতে পার, ইঁহারা সকলেই আমার অন্তরঙ্গজন।

কাজী বলিতে লাগিল যে দিন আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া কীর্তন করিতে নিষেধ ও মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিলাম, সেই রাত্রে এক মহাসিংহ—যাঁহার নরদেহ কিন্তু মুখ সিংহের মত, গর্জন করিতে করিতে অট্ট অট্ট হাসিতে হাসিতে আমার উপর চড়িয়া বুকে নখ দিয়া বলিতে লাগিল,—তুই মোর কীর্তন মানা করিস্, মৃদঙ্গের বদলে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করিব। তখন আমি চক্ষু বন্ধ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমাকে ভীত দেখিয়া সিংহ বলিল, সে দিন বেশি উৎপাত করিস নাই বলিয়া প্রাণে বধ না করিয়া ক্ষমা করিয়া গেলাম। পুনরায় যদি এরূপ করিস্, তবে তোকে সবংশে আর যবনগণকে নাশ করিব। এই বলিয়া সিংহ চলিয়া গেলেও আমি ভীত হইয়া রহিলাম। এই বলিয়া কাজী নিজের বুকে নখচিহ্ন দেখাইল। কাজী বলিল, ইহা আমি কাহাকেও বলি নাই। সেইদিন আমার এক পেয়াদা আসিল ও আমাকে জানাইল, 'আমি কীর্তন নিষেধ করিতে গেলাম, এক অগ্নি উল্কা আসিয়া আমার মুখে লাগিতেই আমার সব দাড়ি পুড়িয়া গেল।' এইরূপ যে পেয়াদা যায় তাহারও এই বিবরণ শুনিলাম। তাহাতে আমি মহাভয় পাইয়া কীর্তন নিষেধ না করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলাম। 'নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্তন হইবে' আমি বলিয়া দিলাম।

তাহাতে অনেক ম্লেচ্ছ আসিয়া অভিযোগ করিল, নগরে হিন্দুর ধর্ম ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে, 'হরি' 'হরি' ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। বাদশাহ শুনিলে তিনি তোমার আত্মীয় হইলেও তোমাকে দণ্ড দিতে পারেন।

কাজী আরও বলিল, হে গৌরহরি! আমি যে ম্লেচ্ছ পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এই উত্তর করিল,—'আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস', 'রামদাস', 'হরিদাস'—এই নাম পরিচয়ে হরি হরি বল, কিন্তু 'হরি' 'হরি' শব্দে 'চুরি করি', 'চুরি করি'—এই অর্থ হয়। তাহাতে বোধ হয় অন্যের ঘরে ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে 'হরি' 'হরি' 'হরণ করি', 'হরণ করি' এই কথা বলিয়া থাক। আমি এই পরিহাস যে দিন তাহাদিগের সহিত করিয়াছি,

সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'হরি' 'হরি' বলিতেছে। ইহার উপায় কিছু করিতে পারিতেছি না।' এইরূপে আরও পাঁচ-সাত জন পাষণ্ডী হিন্দু আসিয়া নিমাঞির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইতে আসিলে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়া ঘরে পাঠাইয়া দিলাম। কাজী মহাপ্রভুর প্রতি এই উক্তি করিল—

"হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও—হেন লয় মোর মন।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২১৫

তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

কাজী, 'তোমার মুখে কৃষ্ণনাম, এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেলা, হৈলা পরম পবিত্র।
'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান তুমি, বড়—পুণ্যবান।।'

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২১৭-২১৮

তাহা শুনিয়া কাজী মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল,—"আপনার কৃপায় আমার কুমতি দূর হইল, আমায় কৃপা করুন যাহাতে আপনাতে আমার ভক্তি থাকে।"

মহাপ্রভু বলিলেন,—তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ 'নদীয়ায় যেন কীর্তনে বাধা দান না করা হয়।'

কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাতে 'তালাক' দিব, কীর্তন না বাধিবে।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২২

তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু 'হরি' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, অপর বৈষ্ণবগণও হরিধ্বনি দিতে দিতে উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সঙ্কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। কাজীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহাপ্রভু অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ঘরে পাঠাইলেন।

অদ্যাপি 'খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ ভূখণ্ড শ্রীমায়াপুরে আছে এবং বামুনপুকুরে 'চাঁদকাজীর সমাধি'ও বিদ্যমান।

শ্রীজগাই-মাধাই

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে প্রতি দ্বারে গমন করিয়া 'কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা' প্রচাররূপ ভিক্ষা করিতে ও দিবসান্তে ফলাফল তাঁহাকে নিবেদন করিতে আদেশ করিলেন। গৃহস্থগণ সন্ন্যাসিদ্বয়কে স-সম্ভ্রমে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে তাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশানুরূপ 'কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা' করিবার অনুরোধরূপ ভিক্ষা মাত্র করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

একদিন উভয়ে মহান পাপিষ্ঠ মদ্যপ জগাই-মাধাইর দর্শন পাইলেন। দুই জনের দুর্গতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া পরমদয়াল পতিতপাবন নিত্যানন্দ হরিদাসের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাঁর অবতার।।

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৬২

শ্রীহরিদাসকে শ্রীনিত্যানন্দ নিজ মনোভাব জানাইলেন এবং সেই পাপীদ্বয়ের উদ্ধারের জন্য হরিদাসকে অনুরোধ করিলেন।

"—হরিদাস, দেখ দোঁহার দুর্গতি।।
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোহাঁর যমঘরে নাহিক নিস্তার।।
তুমি যদি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৬৩, ৬৪, ৬৬

হরিদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,—

"আপনার যে অভিলাষ, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের সম্পূর্ণ সমর্থনের বিষয়। জগাই-মাধাই মদ্যপানে বিভোর হওয়ায় লৌকিক নীতির কথা বা জাগতিক হিতের বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহে। তথাপি দয়াময় গৌরসুন্দরের আদেশ প্রতিপালনের জন্য আমরা নাম-প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া আপামর জন-সাধারণের নিকট ভগবদাজ্ঞা প্রচার করিতেছি। পরমার্থে অনভিজ্ঞ জনগণ সাধারণ

বিচার অবলম্বন করিয়া 'অসাধুর নিকট হরিকথা প্রচার করার আবশ্যক নাই'— এই সরল বিচারে ঠাকুর হরিদাসও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে জগাই-মাধাইর নিকট যাইতে নিষেধ করিল।

"তথাপিহ দুই জন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি'।
নিকটে চলিয়া দোঁহে মহা-কুতুহলী।।
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া।।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।।
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮১-৮৪

কৃষ্ণ ভজনে ব্যতীত ইতরসেবা সমূহ করিতে যাওয়া আচারহীনতা মাত্র। সেই জন্যই মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ প্রকাশ বিগ্রহের দ্বারা ও জগদ্‌বিধাতার দ্বারা সর্বত্র হরিসেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ-হরিদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগাই-মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া মাথা তুলিয়া চাহে ও 'ধর ধর' বলিয়া ধরিতে যায় আর নিত্যানন্দ হরিদাস ছুটিয়া পলায়নের চেষ্টা করেন; তাহারাও 'রহ রহ' বলিয়া পিছনে দৌঁড়াইতে থাকে। দুজনের শরীর স্থূল হওয়ায় জোরে দৌঁড়াইতে পারিতেছিল না; তথাপি বলিতে থাকে জগাই-মাধাইয়ের হাত হইতে কেমনে পার পাইবি; দুই প্রভু তখন 'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ-গোবিন্দ' বলিয়া ছুটিয়া পলাইতে থাকেন। তাঁহারা আসিয়া মহাপ্রভুকে সেই দিবসের বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু দস্যুদ্বয়ের বিষয় জানিতে চাওয়ায় গঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাস বলেন,—সে দুজনের নাম' জগাই মাধাই; তাহারা স্বধর্মপরায়ণ সুব্রাহ্মণের পিতা, কিন্তু অসৎসঙ্গ প্রভাবে তাহাদের পরহিংসা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি অপকর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। মহাপ্রভু বলিলেন, ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্যপান করা কর্ত্তব্য নহে। দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে।

মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে খণ্ড খণ্ড করিবেন বলায় নিত্যানন্দ বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিতে আমি আর আপনার আজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইব না।

ধার্মিকেরা নিজ স্বভাব হইতেই কৃষ্ণনাম বলেন। কিন্তু এই দুজন মন্দকর্ম ব্যতীত কোন ভাল কথা গ্রহণ করিবার পাত্র নহে। সুতরাং সর্বাগ্রে আপনি যদি এই দুইজনকে 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার 'পতিতপাবন'-নামের মহিমা সংরক্ষিত এবং আপনার বাক্যের সার্থকতা হয়।

"হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"হইব উদ্ধর।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার।।
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৩২-৩৩)

জগাই-মাধাই দস্যুদ্বয় নদীয়া নগরের নানাস্থানে স্ব-স্ব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীর ঘাটের নিকট আড্ডা করিল। প্রভুর কীর্ত্তনের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মদ্যপানের অনুষ্ঠান জাঁকাইয়া চলিল। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কৃষ্ণ কীর্ত্তন-বাদ্যকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গান' মনে করিয়া তাহাদের ন্যায় তামস-ভজনের আনুষ্ঠানিক সম্পূর্তার পূর্ণাঙ্গসিদ্ধির প্রশ্ন করিল। দস্যুদ্বয় বলিল, —"মঙ্গলচণ্ডীর গানের যত প্রকার দ্রব্য লাগে, তাহারা সব জোগাড় করিয়া দিবে।"

দস্যুগণের উদ্ধারের জন্য নিত্যানন্দ প্রভু নগর ভ্রমণান্তে রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাতে জগাই-মাধাই 'কেরে কেরে' বলিয়া উঠিতেই নিত্যানন্দ বলিলেন "আমি প্রভুর বাড়ী যাইতেছি", মদের বিক্ষেপে নাম জিজ্ঞাসা করাতে নিত্যানন্দ বলেন, "আমার নাম অবধূত", 'দুইজনকে উদ্ধার করিব' এইরূপ মনে ভাবিয়া নিশাতে সেই স্থান আগমন করেন। এদিকে 'অবধূত' নাম শ্রবণ মাত্র মাধাই কুপিত হইয়া মুটকী (ভাঙ্গাহাড়ী) তুলিয়া নিত্যানন্দ শিরে আঘাত করার ফলে তাহা ফুটিয়া গিয়া মাথা হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। মাধাই পুনরায় মারিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া নিবারণ করে ও বলে 'সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার?' ইহার প্রত্যক্ষদর্শী মহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া নিত্যানন্দ-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, মহাপ্রভু সপার্ষদ তথায় গমন করিয়াই রক্ত দেখিয়া ক্রোধে 'চক্র চক্র চক্র' বলিয়া প্রভু ডাকিলেন। চক্র আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় জগাই-মাধাই স্ব-স্ব চক্ষে তাহা দেখিতে পাইল। নিত্যানন্দ বলিলেন,—

"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই।।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর,—তুমি হও স্থির।।"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৮৮-৮৯)

জগাই বাধা দিয়াছে শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, 'নিত্যানন্দকে রাখিয়া তুই আমাকে কিনিলি, কৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন, আজ হইতে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হউক।' প্রভু তাহাকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন করাইলেন। তাহা দর্শন করিয়া জগাই মূর্ছিত হইল। মহাপ্রভু তাহার বক্ষে শ্রীচরণ দেওয়ায় তাহা ধারণ করিয়া সুকৃতি জগাই কাঁদিতে লাগিল।

জগাইয়ের পুরস্কার দেখিয়া মাধাই এর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। মাধাই বলিল, আমরা উভয়ে এক সঙ্গেই পাপকর্ম করিয়াছি। সুতরাং একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ—এইরূপ দুইপ্রকার বিচার ঠিক নহে।

মাধাইয়ের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করায় তাহার পরিত্রাণ হইবে না। তদুত্তরে মাধাই কৃষ্ণলীলা ও রাসলীলার কথা স্মরণ করিয়া বলিল, "পূর্ব পূর্ব অসুরগণ বিষ্ণু বিদ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মত অসুর পরিত্রাণ লাভ করিবে না কেন? তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—"বিষ্ণুবিদ্বেষ অপেক্ষা বিষ্ণুসেবক নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করা গুরুতর অপরাধ।'

মাধাই তখন জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে বলুন, আমি কি করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারি?" মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি 'নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া গিয়া পড়'। মাধাই তাহাই করিল, মহাপ্রভু মাধাইকে কৃপা করিবার জন্য নিত্যানন্দকে অনুরোধ করেন। নিত্যানন্দ বলেন, 'দেবগণের বিপৎকালে আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করেন, মানবাদি প্রাণীর সঙ্কট উপস্থিত হইলে আপনিই তাহাদিগকে রক্ষা করেন, এমনকি মানবাদি প্রাণীর ন্যায় চেতনবিশিষ্ট না হইলেও উদ্ভিদ সমূহকে রক্ষা করিবার শক্তি আপনার আছে। মাধাই আমার নিকট অপরাধ করে নাই। আমি জন্মে জন্মে আপনার সেবা করিয়াছি। কোন জন্মে যদি আমার সুকৃতি কিছু থাকে, তাহা আমি মাধাইকে দিলাম। সুতরাং আমার নিকট মাধাই এর যে অপরাধ,

সকলই আপনি ক্ষমা করিয়া মাধাইকে নিষ্কপট কৃপা করিয়াছেন। অতএব বিচার কাপট্যরূপ মায়া ত্যাগ করিয়া মাধাইকে অহৈতুকী কৃপা করুন।'

মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আক্রমণকারী মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাহাকে নিজশক্তি সঞ্চার করিলেন। নিত্যানন্দ-শক্তিবলে মাধাই সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলেন। ভগবানের সেবালাভরূপ শক্তিবিশিষ্ট জগাই-মাধাই প্রভুর আদেশ সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া আর কখনও পাপ করিবেন না। —এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

মহাপ্রভু তখন আজ্ঞা দিলেন,—

"দুই জনে তুলি' লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে।।
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৩১-৩২)

দস্যুদ্বয়ের দর্শন-স্পর্শনে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি জাগরিত হয়; কিন্তু ভগবৎ কৃপালব্ধ দস্যুদ্বয়ের পাপ-দর্শন অদ্য পাপ নিবৃত্তি কারিণী গঙ্গার স্পর্শনের ন্যায় পবিত্রতা লাভ করিল। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে নিজ-গণে গণনা করিয়া মহাপ্রভুর ভবনে লইয়া গেলেন। প্রভুর নিজ অন্তরঙ্গ জনগণ এবং আত্মসাৎকৃত দস্যুদ্বয় প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্যের প্রবেশ নিবারণ জন্য দ্বারবন্ধ হইয়াছিল। বহুজন্ম ধরিয়া হরিসেবার অনুকূলে অগ্রসর হইয়া জীবের যে মহাভাগবত অধিকার হয় না, তাহা ক্ষণমাত্রেই অনধিকারী দস্যুদ্বয়ের প্রাপ্যবিষয় হইল। সুতরাং এই শক্তি বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই।

শুদ্ধা সংস্বতীর কৃপায় জগাই-মাধাই বহুভাবে গৌরস্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিলেন—'এ দুইজন আর মদ্যপ নহে, আজ হইতে ইহারা আমার সেবক; তোমরা সকলে মিলিয়া ইহাদিগকে অনুগ্রহ কর।' মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া দুইভাই সকল ভক্তগণের চরণ ধরিলেন ও তাঁহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন ও প্রাপ্ত হইলেন। সকল বৈষ্ণবগণ জগাই-মাধাই এর প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মহাপ্রভু কীর্ত্তন ও জলক্রীড়া অন্তে সকলকে মালা-প্রসাদ-চন্দন প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন এবং জগাই-মাধাইকে সকল বৈষ্ণবের নিকট সমর্পণ করিয়া নিজ গলার মালা দুইজনকে দিলেন।

জগাই-মাধাই-উদ্ধার আখ্যায়িকার ফলশ্রুতি এই—

"যেই শুনে এই মহা-দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র-অবতার।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৩৯৪)

মহাপ্রভুর কৃপায় জগাই-মাধাই প্রত্যহ উষ্মাকালে গঙ্গাস্নানান্তর দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা নিজকৃত পূর্ব পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ ও গৌরনাম লইয়া ক্রন্দন করিতেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে নিরন্তর কৃপা ও আশ্বাসবাক্য প্রদান করিলেও তাঁহারা চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করার অপরাধ স্মরণ করিয়া নিরন্তর আত্মঘাত ও অনুতাপ ক্রন্দনাদি করিতেন। একদিন মাধাই নির্জনে নিত্যানন্দকে পাইয়া দন্তে তৃণধারণপূর্বক নিত্যানন্দের চরণযুগল ধারণ করিযা অশ্রুপূর্ণলোচনে বিবিধ সারগর্ভ বাক্যে স্তব করিতে করিতে স্ব-কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাধাই-এর কাতর প্রার্থনায় নিত্যানন্দ মাধাইকে সান্ত্বনা প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন। পুনর্বার মাধাই নিত্যানন্দ সমীপে নিজকৃত হিংসারূপ অপরাধের হস্ত হইতে নির্মুক্তির উপায় জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে গঙ্গাঘাট নির্মাণ ও গঙ্গাস্নানার্থ সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দের আদেশানুসারে মাধাই প্রত্যহ সজল নয়নে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, তথায় সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও তাঁহাদের নিকট স্ব-কৃত অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকল লোক বিস্মিত হইলেন। কঠোর তপঃ প্রভাবে মাধাইর 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতিলাভ হইল।

"নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই কাটে।।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্বলোকে গায়।।
এইমত কত কীর্ত্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৫।৯৩-৯৫)

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী

প্রথমতঃ শ্রীলোকনাথকে লইয়া আরম্ভ করা যাইতেছে। তিনি পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশের) অন্তর্গত যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার অতীব পুণ্যবান ব্রাহ্মণ মাতা-পিতা ছিলেন পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ও সীতাদেবী। তিনি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র। পিতা পদ্মনাভ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম মুখ্যপার্ষদ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। অতএব শ্রীলোকনাথ প্রকৃত বৈষ্ণব পরিবেশেই লালিত পালিত হইতে থাকেন। বালকাবস্থা হইতেই তাহার মধ্যে প্রবল ঐশ্বরীয় প্রেমের চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইতে থাকে, তাঁহার ছিল প্রখর বুদ্ধি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের প্রবল দক্ষতা; যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন সকলেই বিস্মিত হইতেন। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, মাধব, হরি প্রভৃতি নামসকল শ্রবণ করিতেন, তখন তাঁহার মন সেইদিকেই নিবিষ্ট হইয়া পড়িত ও চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইত। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার কোনও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত না, পরন্তু তাঁহার নিকট সেগুলি অপ্রীতিকর লাগিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাক্ সন্ন্যাস নাম) নাম সেই সময় নাগাদ দেশময় ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার এ সত্য সকলের পরিজ্ঞাত হয়। এই সকল যখন শ্রীলোকনাথ জানিতে পারিলেন এক ভাবপ্রবণতাপূর্ণ বিদ্যুতের ঝলক তাঁহার হৃদয়ে শিহরণ জাগাইয়া তুলিল যাহার মধ্যে পূর্ব সঞ্চিত ভক্তির সহজাত আবেগ ছিলই, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের পার্ষদ বা নিত্য ভক্ত। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের চরণে পতিত হইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। যত সময় যাইতে লাগিল ততই তাঁহার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার নিজ গৃহ হইতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্থান নবদ্বীপ মায়াপুর পায়ে চলা পথে দুইদিনের পথ। সর্বদাই, তিনি মিলিবার জন্য গৃহ ত্যাগের চিন্তা করিতে থাকেন ও উদাসীনমনা হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহার মধ্যে সদা-সর্বদা ঔদাসীন্যের কারণ বুঝিতে পারিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁহারা ছিলেন পুণ্যবান ধার্মিক; তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র পুত্রকে ছাড়িতে চাহিলেন না। মাতা সাশ্রুনয়নে তাঁহার মনে ক্রমশঃ দৃঢ়তা প্রাপ্ত সংকল্প পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুনয় করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না; ইহাতে বরং ইন্ধনে অগ্নি সংযোজিত হইল। তদানীন্তন কালের

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্ষদ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য হইলেও, তাঁহারা নিজেরাও তাঁহাকে দর্শনে আগ্রহী হইলেও, তাঁহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, পাছে তাঁহাদের এই পুত্র যদি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসে তাহা হইলে সে হাতের বাহিরে চলিয়া যাইবে ও তাঁহাদের সহিত আর গৃহে ফিরিবে না। তাঁহারা তাঁহার (পুত্রের) সহিত আলোচনা করিলেন যে ইহা তাঁহাদের পক্ষে এক মহান্ সৌভাগ্য যে তাঁহাদের পুত্র ভগবানে এমন ভক্তিমান; কিন্তু পিতা-মাতাকে নিজেদের উপর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াটা কি ভগবানের মনঃপুত হইবে? তাঁহাদের ইচ্ছা গৃহে থাকিয়াই ভগবানে ভক্তি যাজন করুক। তাহাতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহারাই বা তাহাকে ছাড়িয়া থাকিবেন কিভাবে? কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে আদৌ কার্য্যকরী হইল না। ব্যাপারটি দাঁড়াইল, প্রবল স্রোতের সম্মুখে বাধা রাখার মত যাহাতে স্রোতের বেগ আরও বর্দ্ধিত হয়।

তলে তলে তাঁহারা মতলব করিলেন যে, এখন বালক মাত্র হওয়া সত্ত্বেও, তাহার বিবাহ দিতে, এই আশায় যে তাহাতে সে সংসার জীবনে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা ভুল। শ্রীরঘুনাথের সাধু জীবন হইতে আমাদিগের জানা আছে যে তাঁহার মাতা-পিতাও তাঁহার সহিত পরমাসুন্দরী এক কন্যার বিবাহ দান করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে গৃহে আটক করিয়া রাখা যায় নাই, যখন তিনি কোন সুযোগে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেও। কিন্তু এক্ষেত্রে লোকনাথ তাঁহাদের (পিতা-মাতার) মতলবকে কার্য্যে পরিণত করিতে সুযোগ দিলেন না। তিনি ইহা জানিতে পারা মাত্রই ভিতর হইতে ধাক্কা আরও জোড়ালো হইল, আর একমিনিট ও অপেক্ষা না করিয়া প্রথম সুযোগ পাইতেই গৃহাদি ও পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, সকল বাধা বিপত্তি দূরে সরাইয়া, সেইমত দ্রুত গতিতে নবদ্বীপ মায়াপুরের দিকে দৌঁড়াইতে লাগিলেন। গোপিগণ যেমন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া পথে কি বাধা উপস্থিত হইতে পারে তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের মত।

তখন অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ মাস, সে-সময় উত্তর ভারতে দ্রুত শীত নামিয়া আসিতেছিল ও চন্দ্রালোকস্নাত রাত্রি, সে সময় ভিতর হইতে আহ্বান আসিল

জড়তা দূরে সরাইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া চলিয়া যাইতে, যিনি এতদিন ধরিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে অগ্রাহ্য করিয়া, দূরত্ব কমাইবার জন্য অসমান পথ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ও সকল প্রকার ক্লান্তির জন্য না দমিয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন। পর দিবস সন্ধ্যায় নবদ্বীপ মায়াপুরে পৌঁছান পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও থামেন নাই।

তাঁহার মনে সদা সর্বদা এক উদ্বেগ ছিল যে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে হইবে কি না, তিনি তাঁহাকে চরণে আশ্রয় দিবেন কি না। মনে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে তিনি সেই সৌভাগ্যের উপযুক্ত কি না, কারণ তিনি তাঁহার ভক্তগণের তুলনায় এক অতি নগণ্য প্রাণী। পুনরায় মনে হইল তিনি পরম করুণাময় ও তাঁহার মত ঘৃণ্য জীবের প্রতিও করুণাময়। মনের ভিতর এই প্রকার আলোড়ন লইয়া যে গৃহে মহাপ্রভু ছিলেন তাহারই দ্বার প্রান্তে উপনীত হইলেন যে গৃহটিকে কোন একজন জিজ্ঞাসা না করিতেও দেখাইয়া দিলেন। সেখানে পৌঁছিলে কিভাবে প্রবেশ করিবেন তাহা চিন্তায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সন্দেহে তাঁহার হৃদয় অপগত হইল, দেহ ভারাক্রান্ত হইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার শক্তি এমন কি জ্ঞান লুপ্ত হইল। কোন একজন শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, হরিদাস ও অন্যান্য পার্ষদ ভক্তগণ পরিবৃত উপবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সংবাদ দিলেন। মহাপ্রভু লোকনাথের আগমনের ইঙ্গিত পাইয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "প্রিয় লোকনাথ, তুমি এতদিন কেন আমাকে ভুলিয়াছিলে, তোমার কথা আমি বহুদিন যাবৎ চিন্তা করিতেছিলাম?" লোকনাথ এমনই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে নিজেকে আর স্থির রাখিতে পারিলেন না ও মহাপ্রভুর বক্ষের উপরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুনঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, তিনি শুধু মহাপ্রভুর চরণদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কথা বলিতে শব্দ জোগাইতে পারিলেন না। আগমনের পথে মনে মনে অনেক কিছু পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, যে তিনি ভগবানের চরণে এই সেই প্রার্থনা নিবেদন করিবেন, আরও তাঁহার মনের কষ্ট সমূহ তাঁহাকে নিবেদন করিবেন। কিন্তু কেবল ক্রন্দন ব্যতীত কিছুই করিতে পারিলেন না।

এই প্রকার অর্দ্ধবাহ্য দশায় লোকনাথের কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল যেন স্বপ্নদশায়। মহাপ্রভু সদা সর্বদাই তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। তাঁহার মন পরম

সুখের অভূতপূর্ব অনুভূতিতে নিমজ্জিত। একদিন মহাপ্রভু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া জানাইলেন যখন হইতে তিনি তাঁহার (মহাপ্রভুর) প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, এমনকি শুধু নাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়াই, সেই অবধি তাঁহার প্রতি তিনি স্নেহ- পরায়ণ। এখন তিনি চাহেন লোকনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানে জীবন অতিবাহিত করুন। এই আদেশ অতীব মৃদুভাবে কথিত হইলেও, লোকনাথের হৃদয়ে বজ্রের মত আঘাত করিল। মহাপ্রভু কেন তাঁহাকে নিজ আশ্রয় হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন, যখন তাঁহার অন্যান্যভক্তগণ সঙ্গেই রহিয়াছেন? তাঁহার আশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় তিনি যাইবেন? তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মধূলি ব্যতীত কেমন করিয়াই বা তিনি বাঁচিতে পারিবেন? বাক্যোচ্চারণে সক্ষম হইয়া তিনি প্রার্থনা জানাইলেন তাঁহাকে যেন তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলা না হয় এবং এমন স্থানে নির্বাসিত না করা হয় যেখানে তাঁহার পরিচালিত সংকীর্ত্তন ও তাঁহার মধুর বাণী শ্রবণ করিতে পারিবেন না। খুবই স্নেহ-সিক্ত স্বরে ও আচারে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে তিনিও যাঁহার তাঁহার জন্য এরূপ গভীর স্নেহ, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে, খুবই কষ্ট হইবে। ঘটনা এই যে এখন অগ্রহায়ণ মাস, মাঝে পৌষমাস, আগামী মাঘ মাসে তিনি 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করিবেন। সেই জন্য তিনি লোকনাথকে বলিয়াছেন তাঁহার অগ্রগামী দূত হইয়া বৃন্দাবনে চিরঘাটে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে। সে-সময় তিনি সেখানে গমন করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বৈষ্ণবগণও তাহার পশ্চাতে গমন করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব গৌরব হৃত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি যেখানে কৃষ্ণ বিভিন্ন ক্রীড়া করিয়াছিলেন সেইগুলিকে যতদূর সম্ভব পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাঁহার (মহাপ্রভুর) জন্য তাঁহাকে সেখানে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।

লোকনাথই ছিলেন প্রথম জন, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও মাত্র একদিন পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে লোকনাথ মহাপ্রভুর কি প্রকার প্রীতি ও স্নেহের পাত্র ছিলেন। লোকনাথের সে সাহস বা ইচ্ছা ছিল না যে, তিনি তাঁহার কথা অমান্য করিবেন। তিনি তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া অশ্রুতে সিঞ্চিত করিলেন ও বলিলেন, মহাপ্রভুর যখন ইচ্ছা তখন তিনি সানন্দে অঙ্গীকার করিতেছেন; তিনি প্রার্থনা জানাইলেন যে তাঁহাকে কি কি কর্ত্তব্য পালন করিতে

হইবে যেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তাহাতে মহাপ্রভু লোকনাথকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে বৃন্দাবনের সমস্ত ক্রীড়াস্থল ফুটিয়া উঠিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে তিনি যেন চিরঘাটের নিকট কদম্ব, বকুল ও তমাল বৃক্ষের ঘন কুঞ্জের তলে নিজ ভজন অনুশীলন করেন।

পরদিবস সকালে লোকনাথ মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিলেন এবং তাঁহার চরণদ্বয় নিজ বাহুদ্বারা ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। (মহাপ্রভুর নিকটতম পার্ষদগণের মধ্যে একজন) শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত নিজ শিষ্য ভূগর্ভ সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদায় কালীন এই দৃশ্য এমনই করুণ যে তাহাতে ভূগর্ভের হৃদয় বিগলিত হইল, যাঁহার অভিপ্রেত নয় যে শ্রীলোকনাথ একাকী গমন করেন। তিনি নিজে সহ যাত্রী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং নিজ গুরু গদাধরের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এক সম্মতিসূচক দৃষ্টি দিয়া মহাপ্রভু গদাধরের প্রতি তাকাইলেন, তখন গদাধর সানন্দে ভূগর্ভকে সম্মতি প্রদান করিলেন। এই দুই যুবক ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে প্রথম দল যাহারা বৃন্দাবন গমন করিলেন। এই যুবকদ্বয় মাতা-পিতা, গৃহ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, দেশ ও যথা সর্বস্বের প্রতি মোহ ত্যাগ করিয়া দুই মাসের পথ পদব্রজেই ও নিষ্কপর্দক অবস্থায়, ভিক্ষাদ্বারা দেহ ও আত্মাকে একত্র রাখিতে রাখিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বাংলার সীমান্তে রাজমহলে আসিলে ভাষার পার্থক্য প্রথম অনুভব করিলেন এবং সে স্থানের অধিবাসিগণের ঔদাসীন্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। রাজমহলের পর তাঁহারা তেজপুর, পূর্ণিয়া, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা হইয়া গোকুল-বৃন্দাবনে পৌছাইলেন। সে সময় বৃন্দাবন ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ও সর্বত্র ঝোপঝাড়। মন্দির ও বিগ্রহাদির প্রাক্তন সৌন্দর্য্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এমন কি স্থানীয় লোকজন সেই সমস্ত পবিত্র স্থানগুলির কথা ও ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী ছিল যমুনা নদী ও গোবর্দ্ধন পর্বত।

এই দুই নবীন তীর্থ যাত্রী সেই সমস্ত হিংস্র পশুপূর্ণ বন-জঙ্গল ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভাষা-সমস্যার জন্য খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হইল, এতদ্ব্যতীত সেখানকার অধিবাসিগণ নিজেদের আশ-পাশের বিষয়ও কিছুই জানিত না। তাঁহারা দুইজন কদম্ব কুঞ্জ সহ চিরঘাট খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না, বংশীবট, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতির কোন হদিশই

পাইলেন না। কি করিতে হইবে চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সমগ্র এলাকাময় চিৎকার করিয়া 'রাধা' ও 'কৃষ্ণের' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই তীর্থযাত্রী কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও হাস্য করেন, ঠিক উন্মত্তের মত, কারণ তাঁহারা ব্রজবাসী হিসাবে সকলের পদতলে পতিত হইতে লাগিলেন ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কোথায় কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে, আর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া সেই রজঃ মস্তকে ও চক্ষে প্রয়োগ করিয়া বলিলেন এই রজঃ অতি পবিত্র ও মানুষের হৃদয় পবিত্রকারী।

ইত্যবসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া দুই বৎসরের জন্য দক্ষিণদেশ যাত্রা করিলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে তিনি বৃন্দাবনে আসিলেন, তাহার পূর্বে রূপ ও সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ চারিভক্তের মধ্যে কেহই সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। লোকনাথ ও ভূগর্ভ মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে গমনের সংবাদ পাইয়া, তাঁহারা বিশেষতঃ লোকনাথ, খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন ও দুইজনেই দেশের দক্ষিণাংশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, ও সেই কারণে মহাপ্রভু দুইমাস কাল বৃন্দাবনে থাকার সময় তাঁহারা অনুপস্থিত ছিলেন। ফিরিয়া আসার পর লোকনাথের মন খুব হতাশাগ্রস্ত হইল। মহাপ্রভু এক স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, ''যদি তোমাদের সহিত আমার দেখা হইত তাহা হইলে আমার সন্ন্যাস বেশ দেখিয়া তোমরা দুঃখ পাইতে; সুতরাং তোমরা আমার পূর্বেকার বেশে (সুন্দর কেশরাজি-সহ) তোমরা আমার ধ্যান করিও।" লোকনাথ বুঝিতে পারিলেন কেন মহাপ্রভু সাক্ষাৎকার এড়াইয়া গেলেন। মহাপ্রভুর কম্বল সহ সন্ন্যাস বেশ কল্পনা করিয়া তিনি অতীব আঘাত পাইলেন।

এইবার নিজেকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের আশা ত্যাগ করিয়া মানসিক প্রস্তুতি লইলেন এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতে মনস্থ করিলেন। এইবার দুইজন কুঞ্জসহ চিরঘাট খুঁজিয়া বাহির করিলেন ও সেইখানেই আজীবন থাকিয়া গেলেন। দু' এক ঘন্টা বিশ্রাম বা নিদ্রার জন্য বাদ দিয়া দিবারাত্র তাঁহারা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অন্যের নিকট হইতে নিজেদেরকে দূরে রাখিয়া সর্বদাই ভজন করিতেন। কখন কখন লোকনাথ রাধার প্রিয়স্থান কিশোর কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন শ্রীরাধাবিনোদ তাঁহাকে আদেশ করিলেন তাঁহাদের (সেই বিগ্রহগুলির)

সেবার ভার নিজে গ্রহণ করিতে নিজ অযাচক বৃত্তি লঙ্ঘন না করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে তাহা দ্বারাই জাগ্রত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যেখানে তিনি বাস করিতেন সেইস্থানে এক বৃক্ষতলে যেখানে তিনি বৃষ্টিপাত কালে বা শীতকালে অবস্থান করিতেন সেই স্থানে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত। তিনি মূর্ত্তিগণকে এক ঝুলান কম্বলের মধ্যে রাখিয়া নিজ কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং বৃষ্টির সময়ে এক বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া এবং নিজে বৃষ্টির সময়ে পূর্বেকারমত ভিজিয়া ভিজিয়া কাটাইতে লাগিলেন। নিজে কোন শিষ্যগ্রহণ করেন নাই একমাত্র নরোত্তম ব্যতীত, এই নরোত্তম তাঁহার কৃপালাভ করিবার জন্য খুবই পীড়া পীড়ি করিতে থাকিলে ও তাঁহার (নরোত্তমের) চরম ভক্তিযুক্ত সেবা দেখিয়া একমাত্র তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল কেহ তাঁহাকে সাধু মনে করিতে পারে, তাই সেই সম্মান হইতে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখিতেন। তিনি এমনই বৈরাগী ছিলেন যে কেবল যখন কোনও বৈষ্ণব তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন অথবা যখন বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তনে মিলিত হইতেন সেই সময় গুলি ব্যতীত, সর্বদা নিজেকে একাকী রাখিতেন সদাই প্রচার ভয়ে তটস্থ থাকিয়া। এক সুবিজ্ঞাত ঘটনা দ্বারা তাঁহার চরিত্রের এই অংশটুকু বুঝা যাইতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখন আরম্ভ করিবার পূর্বে গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি ব্রজের গোস্বামিগণের ইচ্ছা পূরণের জন্য এই কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তিনি, লোকনাথের আশীর্বাদ লাভের জন্য আসিলে, তিনি এক পূর্বসর্ত্ত আরোপ করেন যে তাঁহার নাম ও কার্য্যাবলী ও জীবনযাত্রা প্রণালী যেন তাঁহার প্রস্তাবিত গ্রন্থের কোনও স্থানে উল্লেখ না থাকে। কবিরাজ গোস্বামী সেই সর্ত্ত মাথায় রাখিয়া মহাপ্রভুর তৎকালে প্রকট প্রাচীনতম ভক্তের আদেশ পালন করিয়া ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের কুত্রাপি শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নাম নাই, কেবলমাত্র এক গোষ্ঠীর মধ্যে নাম-মাত্র উল্লেখিত, কিন্তু বৈরাগ্যময় ভক্তির বিষয়ে বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া 'একটি প্রস্তর যেন না বলে কোথায় আমার শয়ন' এই নীতিটি একান্তভাবে তাঁহার উপর প্রযোজ্য ও মহাপ্রভুর তাঁহার মত কিছু কিছু আত্মবিলোপকারী ভক্তগণের উপর অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীপাট কলিকাতা হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে বরাহনগরের মালিপাড়ায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়া তাঁহার ভক্তিরসাপ্লুত কণ্ঠের ভাগবত-পাঠ-শ্রবণে অতিশয় উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি প্রদান করেন। যথা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-অন্ত্যখণ্ড ৫ম অধ্যায়ে—

"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে।।
শুনিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।
প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি, আর কাহারো মুখেতে।।
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য'।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য।।"

তাঁহার রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে শ্রীভাগবতাচার্য্য নিজেকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন—

"বন্দে নিত্যমনন্ত ভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্‌গুরুম্।
মদীশ্বর গদাধরং দ্বিজবরং ভৃতৈরূপাকৃতিম্।।"

—শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ অবলোকনপূর্বক ধীরেতর ব্যক্তিগণের আনন্দ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে মনোরম ভক্তিপ্রদায়িনী কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনরূপ পুণ্যগ্রন্থ রচনা করিবার জন্য নিত্য অনন্তভক্তি নিরত ভক্তপ্রিয় সদ্‌গুরু আমার ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের) একমাত্র ভৃত্যরূপাকৃতি ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ গদাধর পণ্ডিতকে আমি বন্দনা করি।

আবার প্রেমবিলাসের বর্ণনায় দেখা যায়, অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য 'ভাগবতাচার্য্য' —যাঁহার পূর্বনাম ছিল বড় শ্যামদাস। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। দিগ্বিজয়-

ব্যপদেশে শান্তিপুরে আগমন করিয়া শ্রীল অদ্বৈতাচার্যপ্রভুর সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতে পরম পণ্ডিত হইয়া 'ভাগবতাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। প্রেমবিলাসে আরও বলা হইয়াছে যে, শ্রীভাগবতাচার্য্য-প্রভু শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-প্রণেতা শ্রীগদাধর-শাখা শ্রীল ভাগবতাচার্য্যপ্রভু ব্রজে 'শ্বেতমঞ্জরী'-নামে খ্যাত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থের যে প্রথম নয়টি স্কন্ধ সংক্ষিপ্ত সার হইলেও মূল তাৎপর্য্য এরূপ দক্ষতার সহিত শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু এমনই দক্ষতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, তাহাতে সমগ্র স্কন্ধের শিক্ষাই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে —ইহা এক পরম আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভু 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে স্থানে স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার।
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার।।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্য-মূরতি।
প্রেম-ভক্তি দাতা প্রভু ভকতের গতি।।

(কৃঃ প্রেঃ ১০।১।৩০-৩১)

আরও দ্রষ্টব্য শ্লোক ১১।৫।৭০-৭৩, ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরই শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভু 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কলকাতার উত্তরে উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে বরাহনগরের মালীপাড়া পল্লীতে শ্রীভগবতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীপাটে তাঁহারই হস্তলিখিত পুঁথিখানি প্রদর্শন করানো হয়।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর

শ্রীবাস ঠাকুরের পত্নী শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল বৰ্দ্ধমান জেলার পূর্ব দিকে পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছী নামক একটি গ্রামে। এই মামগাছি গ্রামকে বলা হয় নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপ, গ্রামের প্রান্তেই ভাগীরথী নদী। কথিত হয় যে, ঠাকুর বৃন্দাবন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের সেবা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি নিত্য পূজিত হন। বৃন্দাবন দাসের বাল্যকালের বিচরণ ভূমি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীটিকেই দেখান হয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণীদেবীর এই মামগাছি গ্রামে বিবাহ হয়। শেষ বয়সে মালিনীদেবী নিজ পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশে কাহারও সহিত নারায়ণীদেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভেই শ্রীবৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন, বৃন্দাবনদাস নিজ পিতার নাম নিজ গ্রন্থে কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই; মুরারিগুপ্ত, কবি কর্ণপুর ও কবিরাজ গোস্বামীও উল্লেখ করেন নাই। যেহেতু নারায়ণী দেবী মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র, সেজন্য তাঁহার মহিমা বৰ্দ্ধনের জন্য শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের ৩।৬।২২১ এ উল্লেখ করিয়াছেন "সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ পাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত।।" "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধানের সঙ্কলয়িতা শ্রীহরিদাস দাস মহাশয় নারায়ণীদেবী প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, নারায়ণী দেবীর "স্বামীর নাম শ্রীবৈকুণ্ঠদাস বিপ্র। - - - বৃন্দাবন দাস যখন গর্ভে, সেই সময় শ্রীনারায়ণীর স্বামীর পরলোকগমন হয়।" আবার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রসঙ্গেও তিনি লিখিয়াছেন—বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতার নাম—বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র, মাতার নাম নারায়ণীদেবী। নারায়ণীদেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা।

ঠিক কোন সময়ে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা না গেলেও অনুমিত হয় যে, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সময়ে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসরের অধিক হইবে না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সর্বশেষ ভৃত্য (শিষ্য)। 'অবশেষ ভৃত্যতান বৃন্দাবনদাস। অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত।।'—৩।৬।২২১। ইহাতে বুঝা যায় বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে দীক্ষা দেওয়ার পর শ্রীনিত্যানন্দ বেশী দিন প্রকট ছিলেন না; থাকিলে তাঁহার আরও শিষ্য

হইত। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা দর্শন করেন নাই, তাহা তাঁহার লেখা হইতে সহজেই বুঝা যায়,—তিনি লিখিয়াছেন—"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে। হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে।। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখনে না হৈল। হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল।।" (১।৮।২৮৪, ২।৮।১৯৮)। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা দর্শনের কোনও আভাস তাঁহার লেখনীর মধ্যে নাই।

ঠাকুর মহাশয়ের সংসার পরিগ্রহের কোন কথা শুনা যায় না। অধিক সময় তিনি দেনুড়ে থাকিতেন। তাঁহার চারি শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামহরি নামক একটি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বীয় দেনুড়স্থিত সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেনুড়পাট বাটীতে অবস্থান করিয়া সেবা নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। জানা যায়, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় প্রতিভাসম্পন্ন ও বৈষ্ণবাচারে অবস্থিত ছিলেন ও গুরু-বৈষ্ণব বর্গের মহিমা প্রচারে চেষ্টিত ছিলেন। তিনি প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া পরমার্থবিরোধী স্মার্ত্ত সমাজের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রকটিত শুদ্ধভক্তি ধর্মপ্রচারে ঠাকুর মহাশয় ছিলেন সর্বোত্তম দিক্‌পাল। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লিখন-প্রণালী প্রাঞ্জল ও অতীব হৃদয়গ্রাহী। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র-বর্ণনায়, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকটকালীয় সামাজিক অবস্থা বর্ণনায়, তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের 'কালে ভদ্রে পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি নামগ্রহণ বর্ণনায়, শ্রীগৌর সুন্দরের ঐশ্বর্য ও মহিমা প্রভৃতি অঙ্কনে, শ্রীঠাকুর মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্যদ্রষ্টাগণ অলৌকিক প্রীতি লাভ করিবেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের দৈন্য ছিল অসাধারণ—তাহা অকপট ও ভক্তি হইতে উত্থিত। তাঁহার গ্রন্থে আত্ম পরিচয়ের কোনও প্রয়াসই দেখা যায় না। "বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান"—এখানে কেবল তাঁহার নামের উল্লেখ দেখা যায়। নারায়ণী দেবী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম 'নারায়ণী' অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'।। ২।২।৩১৮-১৯।।" কিন্তু নারায়ণীদেবী যে তাঁহার জননী তাহা বলেন নাই—যাহাতে আত্ম গরিমা প্রকাশ না পায়। শ্রীবাস পণ্ডিত যে নিজ খুল্লমাতামহ, তাহাও কোথাও তিনি বলেন নাই—যাহাতে আত্মমহিমা প্রকাশ না পায়। পূর্বে

উদ্ধৃত ৩।৬।১২১ পয়ারেও এই তাৎপর্য্য উক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, যে,—'আমার এমন কোনও যোগ্যতা বা সুকৃতি নাই, যাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে তাঁহার ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করিতে পারেন। কেবল মাত্র বৈষ্ণব মণ্ডলে প্রসিদ্ধা ও চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণীর গর্ভজাত বলিয়াই, আমার জননীর প্রতি প্রীতি ও কৃপা বশতঃই শ্রীনিত্যানন্দ আমার ন্যায় অধমকে তাঁহার ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি লিখিয়াছেন, "চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে শেষের (শেষরূপ নিত্যানন্দের) কৃপায়। যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়।।১।১।৬১।। চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি দেখি। তাঁহার কৃপায় যে বোলায়েন তাহা লিখি।। কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।। ১।১।৬৫-৬৬।।" চিত্তে শুদ্ধাভক্তির অসাধারণ আবির্ভাব না হইলে এইপ্রকার অসাধারণ অকপট দৈন্য কখনও সম্ভব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনদাসের মহিমা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল।।
চৈতন্য নিতাইয়ের যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা।।
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার।।
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহ তারিল সংসার।। (আদি ৮ম পঃ)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব সময় সম্বন্ধেও নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না, যদিও শ্রীহরিদাস দাস তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন—"১৫১১ শকে ইঁহার অন্তর্ধান হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন।"—কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র।

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহাকুমায় গুস্‌করা রেলস্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে কোগ্রামে রাঢ়ীয় বৈদ্য বংশে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর পিতা শ্রীকমলাকর দাস ও মাতা শ্রীমতী সদানন্দীকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতার একমাত্র পুত্র হওয়ায় তিনি অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়—শ্বশুরালয় আমেদপুর কাকুট গ্রামে। গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলেও বিষয় বিরক্ত লোচন দাস গৌর-ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথালাপে অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কথা শোনা যায়। শৈশবে বিবাহ হওয়ায় লোচন দাসের স্ত্রী নিজ মাতাপিতার নিকটেই থাকিতেন। কন্যার পিতামাতা লোচন দাসের বিষয় বৈরাগ্য শ্রবণ করিয়া ও এদিকে কন্যার বয়স বাড়িয়া যাওয়ায় খুব উদ্বিগ্ন বোধ করিলেন। তাঁহারা লোচন দাসের গুরুদেবের (শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের) নিকট আসিয়া সব নিবেদন করাতে তিনি লোচন দাসকে শ্বশুরালয়ে যাইতে আদেশ করিলেন। লোচন দাস দীর্ঘদিন শ্বশুরালয়ে না যাওয়া শ্বশুর গৃহ ঠিক করিতে না পারায় গ্রামের এক যুবতী মহিলাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সেই গৃহের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন.। পরে সেই গৃহে পৌঁছাইয়া বুঝিতে পারিলেন যাহাকে তিনি 'মা' সম্বোধন করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার 'স্ত্রী'। সেই হইতে লোচন দাস স্ত্রীকে 'স্ত্রী'রূপে না দেখিয়া 'জননী'রূপে দর্শন করতঃ বৈরাগ্যের সহিত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ভজনে কাটাইয়াছিলেন।

শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর লোচন দাসের প্রতি স্নেহাসিক্ত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষাদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে কীর্তন বিষয়ে শিক্ষাদান করিলেন। গুরুদেবের আদেশে তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পবিত্র চরিত্র ও লীলামৃত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রণয়ন করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গ্রন্থটিকে পূর্বে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে প্রণয়ন করা হইয়াছিল, পরে উহা পরিবর্তিত করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নামকরণ করেন। চৈতন্যমঙ্গলের সূত্রখণ্ডে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বন্দনাতে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন—

"বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবতগীতে।।"

পূর্ববঙ্গের পাঁচালী যথা লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান প্রভৃতির অনুকরণে শ্রীলোচনদাস ঠাকুর 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। পাঁচ প্রকার গীতিছন্দে পাঁচালী রচিত হয়। শ্রীআশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধানে লোচন দাস ঠাকুরকে বাংলার তথ্যভাষার সাহিত্য রচনার ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচিত হয় ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'প্রার্থনা', 'দুর্ল্লভসার', 'পদাবলী' (ধামালী), 'জগন্নাথবল্লভ নাটক', 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ'। শোনা যায় যে, গুস্‌করা স্টেশনের নিকট কাঁদড়া গ্রামে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর গৃহে লোচন দাস ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ আছে।

শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল যে, যেহেতু তিনি গুরুদেব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা তদ্রূপ বর্ণিত হয় নাই বলিয়া প্রভুর চরণে অপরাধ হইয়া থাকিতে পারে, সেই অপরাধ স্খালনের জন্য তিনি নিত্যানন্দের মহিমাসূচক কএকটি গীতি লিখিয়াছেন। গীতিগুলি ভক্তগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত। যথা—

"নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি............" ইত্যাদি
"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়" .... ইত্যাদি
"পরম করুণ পঁহু দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র......... ইত্যাদি।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী রচিত ভক্তিরত্নাকরে লোচন দাস ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রেঙা গ্রামের শ্রীনরহরি চক্রবর্তী, যিনি ঘনশ্যামদাস নামে প্রসিদ্ধ, ইঁহারা পৃথক ব্যক্তি।

এক শ্রেণীর অপসম্প্রদায় লোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে 'গৌরনাগরী' বাদের কথা আছে, এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরনাগরবাদকে নিন্দা করিয়াছেন। "গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে।"—চৈতন্যভাগবত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রীগৌরসুন্দর—রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয় জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং কৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয় চেষ্টাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রী দর্শনাদি দ্বারা 'লম্পটনাগরে'র বৃত্তির পরিচয় দেন নাই।"

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের তিরোধান হয় ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে। ঠাকুরের শ্রীপাটে তাঁহার ইষ্টক সমাধি আছে। বিশ্বকোষ মতে, শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জন্ম ১৪৪৫ শকাব্দে, তিরোভাব ১৫৩০ শকাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

যাঁহারা শ্রীচৈতন্য সাহিত্যের অনুরাগী তাঁহাদের নিকট এই সাধুটি সুপরিচিত। তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র সেই বিখ্যাত গ্রন্থকার, যাহা বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও উহা শ্রীচৈতন্যের ধর্মের এক ভাণ্ডার, সেই সঙ্গে তাঁহার উল্লাসময় অতি সুখকর প্রকাশ সমূহ ও দর্শন উহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সভ্যজগতের সকলভাষায় এই গ্রন্থটি অনুরাগের উপযোগী। দুই কি তিনটি ইংরাজী অনুবাদ আছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতাবলী' নামে শ্রীগীতা প্রেস প্রকাশিত একটি হিন্দী পুস্তকও আছে, সেইটি প্রতিটি লাইন মাফিক অনুবাদ না হইলেও সেই বিশাল গ্রন্থের অনেক তথ্যই সন্নিবেশিত আছে। এইটি ধরিয়া লওয়া উচিত নহে যে যেহেতু গ্রন্থটি বাংলাভাষায় রচিত, অতএব গ্রন্থকার সংস্কৃত পণ্ডিত নহেন। বিভিন্ন ছন্দে বহু স্তোত্রাদি তাঁহা দ্বারা রচিত ছাড়া, তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত পুস্তক "গোবিন্দলীলামৃতম" শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য সহ প্রেমক্রীড়া বর্ণনায় এক শ্রেষ্ঠ অবদান। যাঁহারা 'কৃষ্ণকর্ণামৃতম' এর টিকা, সারঙ্গরঙ্গদা টীকা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একদিকে তাঁহার পাণ্ডিত্য বিষয়ে নিশ্চিত হইবেন ও অপরদিকে প্রেমক্রীড়ার মাধুর্য্য বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি বিষয়েরও উপলব্ধি করিবেন।

তাঁহার পদবী 'কবিরাজ' হইতে ইহা যেন ধরিয়া লওয়া না হয় যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কারণ এই খেতাব বৃন্দাবনের অতীব পণ্ডিত গোস্বামীগণ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রতিভার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হইতে পারেন, কারণ তখনকার দিনে সাধারণতঃ অন্যকোন জাতি এত শিক্ষিত পণ্ডিত হইতে বা পুস্তক প্রণয়নে সক্ষম হইতেন না। তাহার বংশ পরিচয় কিছু জানা যায় না এবং তাঁহার মধ্যে স্বভাবজাত দৈন্যের জন্য তিনি উচ্চতম বর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মের কথা কোথাও প্রকাশ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, "আমি জগাই মাধাই (যাহাদিগকে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ ঘোরতম পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন) হইতেও পাপিষ্ঠ; আমি পুরীষের কীট হইতেও ঘৃণ্য; যে আমার নাম শুনে তাহার পুণ্যক্ষয় হয়; ও যে আমার নাম উচ্চারণ করে তাহার পাপ হয়।" এমন কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না যে তিনি গৃহস্থ ছিলেন কিনা, তবে অন্যান্য তথ্য প্রমাণাদি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি অবিবাহিত ছিলেন। যে যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন সেগুলি এবিষয়ে

কিছু বলে নাই। অবশ্য অন্যত্র পিতৃ পরিচয় বিষয়ে কিছু উল্লেখিত হইলেও তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না।

ভগবান শ্রীনিমানন্দের সমীপে নিজ দৈন্য ও বিনয়পূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতে গিয়া তাঁহার প্রাক্তন বসতিস্থল বিষয়ে এক ক্ষীণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, গৃহত্যাগ কালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর নামে এক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন, সেখানে তাঁহার সম্বন্ধের পরিচয় বহনকারী শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের এক মন্দির এখনও বর্ত্তমান। এক স্বপ্নে নিত্যানন্দের আদেশানুসারে তিনি ঝামটপুর ত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনি নিজের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু বিবরণ পেশ করিতেছি, একদিবস শ্রীল নিত্যানন্দের এক ভক্ত, নাম তাহার মীনকেতন রামদাস এক অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রণ ক্রমে গ্রন্থকারের গৃহে আসেন। অপার্থিব প্রেমের ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি অঙ্গনে উপবিষ্ট থাকেন, তখন সকল বৈষ্ণবগণ তাঁহার পদতলে অবনত মস্তক হন। নিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র তাঁহার দেহে বিকার দেখা দেয় যাহা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়। গুণার্ণব মিশ্র নামে পুরোহিত ছিলেন, তিনি বিগ্রহের পূজাদি করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের নামের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না, তাহাতে শ্রীরামদাস ক্ষুণ্ণ হন; তাহাতে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণদাসের ভ্রাতার এক বিতর্ক বাধে, যিনি নিত্যানন্দে বিশ্বাসের অভাব প্রদর্শন, তাহাতে সেই ভক্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণদাস ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া জানাইয়া দেন সেই ভক্তের প্রতি অশিষ্টতা প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ বলদেবের অবতার সেইহেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা ন্যূন মনে করা ঠিক নহে। একই রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ ভক্তগণকে ও দলবল লইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছেন এবং তাঁহার পরম মঙ্গলের জন্যে বৃন্দাবন গমন করিতে আদেশ দেন। যে নিত্যানন্দের দয়ার ফলে তিনি বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথদাস প্রভৃতি গোস্বামীবর্গের কৃপা লাভ করেন তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন, এহ গোস্বামীগণই তাঁহাকে ভক্তির দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ত্যাগী জীবন তাঁহাকে প্রভাবিত করে তাঁহার তো পূর্ব হইতেই সাংসারিক বন্ধনের প্রতি বিরাগ ছিলই। তিনি বলেন, তাঁহাদেরই কৃপার মাধ্যমে ভগবানের বিগ্রহের মধ্যে ভগবানকে দর্শনের এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, অনুরূপভাবে বিগ্রহগণের

মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীমদনগোপালের উপস্থিতি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রীনিত্যানন্দের করুণার কীর্ত্তন করেন, যদিও তাঁহার নিজমতে তিনি এক জঘন্য চরিত্রের, তথাপি সাংসারিক জীবনের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া তিনিই তাহাকে বৃন্দাবনে আনয়ন করিয়াছেন যাহাতে শ্রীগোবিন্দে তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শন লাভ হইয়াছে। পাঠকবর্গ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন তাঁহাকে মূর্ত্তি বলিয়া উপেক্ষা না করিতে, তাহাতে আমাদের নরকভোগ করিতে হইতে পারে।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সাধারণ ভাবে যে নামে তিনি পরিচিত, বৃন্দাবনের ভক্তগণকে তাঁহার প্রকৃত আত্মীয় স্বজন জ্ঞান করিতেন এবং তিনি শ্রীরূপের শ্রেষ্ঠতম ভক্ত অনুগামী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম তাঁহাকে ষড়্-গোস্বামীর পর উল্লাসভর আনন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যমণি মনে করিতেন এবং তিনি নিজেও তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষের দিনগুলির চরম মহাভাবের অবস্থার বিবরণগুলি যাহা তিনি নিজ চরিতামৃত গ্রন্থের শেষের দিকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেই উপকরণগুলি তাঁহার (রঘুনাথের) নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, অনান্য সব বিষয় বস্তুর ভিতর, এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাইবে যিনি প্রেমময় মাধুর্য্য (রস) এর মহত্ব (উৎকর্ষ) উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং অসাবধানী সাধারণ লোক সাধারণতঃ তাঁহার লিখিত বিষয় বস্তুকে ভুল বুঝিয়া ফলস্বরূপে নিজদিগের পারমার্থিক অধঃপতন ডাকিয়া আনেন।

শ্রীভট্টচৈতন্য দাস

এই সাধুজন পশ্চিমবঙ্গের এক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ভুক্ত; তাঁহার গ্রামের নাম 'চাখুন্দি' কণ্টকনগর বা প্রচলিত যাহা কাটোয়া নামে পরিচিত উহার সন্নিকটে; কাটোয়া বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলার এক মহকুমা শহর। প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ বয়সী হইলেও তাহার কোনও পুত্র সন্তানাদি হয় না; তথাপি তিনি হাসি খুশিতে দিনাতিপাত করিতেন ও ভগবান্ শ্রীহরির ভক্তিপূর্ণ সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, যখন দাবানলের মত খবর রটিয়া যায় যে, শ্রীগৌর সুন্দর যাঁহাকে তাঁহার ভক্তগণ ভগবানের অবতার বলিয়া মানে, তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া পাপমুক্ত ও পবিত্র হইবার সৌভাগ্য লাভের জন্য সেখানে সমবেত হয়। এই ব্রাহ্মণটি যিনি গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন তিনি তাহাদের মধ্যে ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষ তাঁহার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল, কিন্তু যখন জানিলেন যে তাঁহার সুন্দর কেশদাম মুণ্ডিত করিয়া ফেলা হইবে তখন তাহারা বিষণ্ণ হইল। এই দুঃখ এই গঙ্গাধরের মনকে প্রবলভাবে আঘাত করিল। সেই উদ্দেশ্যে যখন ক্ষৌরকার সেখানে উপস্থিত হইল সকলেই ফোঁপাইতে লাগিল ও কেহ কেহ মনের দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। ক্ষৌরকারও অন্তরের নিদারুণ যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্ষৌরযন্ত্রটি সঠিকভাবে চালাইতে পারিতেছিল না, পরন্তু বার বার মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইতে লাগিল। শেষে যখন সে মহাপ্রভুর মস্তকে হস্ত স্থাপন করে তখন তাহার চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বহিতে থাকে এবং তাহা দেখিয়া সেখানে দণ্ডায়মান স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অশ্রুপাত করিতে থাকে। এমন অবস্থায় কার্যটি সম্পাদন করিতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়, তখন জন সমষ্টির মধ্যে বিলাপের ক্রন্দন ধ্বনি উঠে, সেই সকল অশ্রুর ধারা ভূমিকে কর্দমাক্ত করিয়া তোলে, সকলেই কপালে করাঘাত করিতে থাকে ও জগতের সর্বকার্যের নিয়ন্তা বিধাতার কার্যের জন্য ধিক্কার দিতে থাকে। ইহাতে গঙ্গাধরের বুকে চরমতম আঘাত লাগে; তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন,তাহা এমনই গভীর যে তাঁহার জীবনের আশা পর্যন্ত নিরাশার কারণ হইয়া পড়ে। বহুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলে, তখন জানা গেল যে কেশবভারতী তাঁহাকে সন্ন্যাস নাম দিয়াছিলেন "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য", নামের শেষ

শব্দটি তাঁহার (গঙ্গাধরের) কর্ণে প্রবেশমাত্র তিনি পাগল হইয়া গেলেন ও সেই গঙ্গানদীর তীর বরাবর স্নানাহার ত্যাগ করিয়া অন্য কোনও শব্দ উচ্চারণ না করিয়া শুধু "চৈতন্য" "চৈতন্য" উচ্চারণ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহাকে নিজ গ্রামে চালিত করা হয়, সেখানেও তাঁহার আবিষ্টভাব বেশ কিছুদিন ছিল, সেই সময়কালে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকজন তাঁহাকে 'চৈতন্যদাস' নামে উল্লেখ করিতে থাকে, তাহারাই তাঁহার এই মূল নামটি প্রদান করে।

তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াসহ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান্ ভক্ত হইয়া পড়ে। এতদিন তাঁহারা নিঃসন্তান আক্ষেপ শূন্য ভাবে কাটাইয়াছিলেন; এইবার ভগবৎ ইচ্ছায় তাঁহার একটি পুত্র সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছা অনুভব করিলেন ও স্ত্রীকে জানাইলেন কেন তিনি এপ্রকার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি (স্ত্রী) পরামর্শ দিলেন সত্বর শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র পুরীতে (নীলাচলে) তীর্থ যাত্রা করিতে, সেখানে মহাপ্রভু অবস্থান করিতেছেন ও সেখানে তাঁহার দর্শন লাভে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। তদনুসারে কালবিলম্ব না করিয়া শুভক্ষণে নীলাচল অভিমুখে রওনা হইলেন। এক রাত্রে, যাত্রাপথেই, গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন যে এতদিন যাবৎ তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ না করিয়াই বৃথা ব্যয় করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনের জন্য নিজেদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীচৈতন্য দাস (পূর্ব নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য) স্বপ্নে দর্শন করিলেন শ্রীকৃষ্ণের সম্মোহনকারীরূপ ও পীতবস্ত্র পরিহিত নীলনীরদ বর্ণ, ময়ূরপুচ্ছ সম্বলিত চূড়া, মুখে বংশী সহ যাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে মনোহর সুবর্ণকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব যাঁহার সুবর্ণময় কান্তি ও রক্তাভ পাড়যুক্ত নীলাভ বসন ও মনোমুগ্ধকর উল্লাসময় আচরণ, যাহা সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া একই আকৃতি কিন্তু মুণ্ডিত মস্তক ও হ্রস্বাকৃতি গৈরিক বসন, সন্ন্যাসীর দণ্ড ও কাষ্ঠনির্মিত কমণ্ডলু, যাহা আবার সহসা রূপান্তরিত হইয়া (শ্রীজগন্নাথদেবের) কৃষ্ণবর্ণ মস্তক, পদ্মবৎ আঁখিসকল ও সঙ্গে শ্রীবলরাম ও সুভদ্রা। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিদ্রা ভগ্ন হইল ও তিনি অস্থির হইয়া পড়িতে ধার্মিক পত্নী নানাভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইভাবে উদ্দীপিত হইয়া পুনরায় হাল্কা মনে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই নীলাচলে পৌঁছাইলেন, অতঃপর তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন

করিবার জন্য অতীব ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা মনের এই অবস্থায় শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহ দ্বারে পৌছাইলেন সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পূর্ব হইতেই তাঁহার মন বুঝিয়া ঠিক সময়ে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া সেখানে, উপস্থিত ছিলেন। ভগবানের (মহাপ্রভুর) অতীব মনোমুগ্ধকর রূপ দর্শনে স্বামী-স্ত্রী অতীব আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহার জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছিল ও অতীব শ্রদ্ধার উদ্রেককারী মহিমা প্রকাশিত হইতেছিল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এমনই চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা বিমোহিত হইয়া চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। কেহ যেন স্ব-স্বরে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথদেব তোমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন; তাঁহাকে দর্শন কর, তিনি তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন।" মহাপ্রভু নিজ সেবক গোবিন্দকে পথপ্রদর্শক-রূপে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন ও তিনিও সঙ্গীগণ সহ তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের পরমানন্দ ছিল সীমাহীন, তখন স্বামী-স্ত্রী সচল (মহাপ্রভু) ও অচল (শ্রীজগন্নাথ) উভয় ব্রহ্মকেই একই সঙ্গে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের দেহ-মন-প্রাণ ভগবান দ্বয়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া নিঃশব্দে স্তোত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু বাসায় আগমন করিলে ভক্তগণ গোবিন্দ আড়ালে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি যাঁহার (যে ব্রাহ্মণের) বাসনার কথা উল্লেখ করিলেন সেই ব্রাহ্মণের বাসনা কি। ঠিক সেই সময় মহাপ্রভু গোবিন্দকে ডাকিলেন ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে সেই ব্রাহ্মণ এক পুত্র সন্তানের কামনা লইয়া আসিয়াছে, আর জগন্নাথদেবও নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে তাঁহাদের শ্রীনিবাস নামে এক পুত্র সন্তান হইবে, সেই পুত্রের দ্বারা শ্রীরূপ সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-সকল প্রচার হইবে। রাত্রে চৈতন্যদেব স্বপ্নে দেখেন যে শ্রীজগন্নাথ আদেশ দিয়াছেন যে তিনি পুরী ত্যাগ করিয়া গৃহে যাত্রা করিবেন কারণ অবিলম্বে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইবে এবং সেই পুত্র এক অল্প বয়স হইতেই মহাপণ্ডিত ও ভক্ত হইবে। এই স্বর্গীয় বার্ত্তা পুণ্যবান্ ও পুণ্যবতী স্বামী-স্ত্রীকে আনন্দিত করিল যে ভগবান তাঁহাদের মনো- বাসনা পূর্ণ ও তাঁহার সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীজগন্নাথদেবকে ছাড়িয়া পুরী ত্যাগ করিতে হইবে এই ভাবনা তাঁহাদের অন্তরে বিষাদ সৃষ্টি করিল। শ্রীচৈতন্যদেব সহাস্যবদনে বলিলেন যে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাঁহার আদেশ যে

তাঁহারা অতি শীঘ্র নিজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিবে ও নিরন্তর শ্রীনাম জপে নিজদিগকে নিযুক্ত রাখিবে ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে সেই নাম প্রচার করিবে।

সুতরাং তাঁহারা ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ও গৃহে ফিরিয়া ভগবানদ্বয়ের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন, যাহার ফলে সেই গ্রামের অন্যান্য ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের নাম সঙ্কীর্ত্তন তাহাদের সকলের একটি নিয়মিত রীতি হইয়া উঠিল, যথাকালে সেই আদর্শ পুরুষ সকল গ্রামবাসিগণকে আনন্দ দান করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এমন কি যে সমস্ত গ্রামবাসিগণ কোন পুত্র সন্তান না হওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে বর্জন করিয়াছিলেন, তাহারাও তাঁহাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল ও অনুষ্ঠানের উপযোগী উপঢৌকনাদি আনিল। শিশুকাল হইতেই শ্রীনিবাস (পরবর্ত্তীকালে যাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীনিবাসাচার্য্য) মাতার নিকট হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ও মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তবৃন্দের প্রতি ভক্তি শিক্ষা করিল, আর পিতার নিকট হইতে মহাপ্রভু, তাঁহার ভক্তবৃন্দের ইতিহাস জানিয়া লইল এবং শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি গাঢ় অনুরাগ জানিয়া লইল। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচৈতন্যদাসের মত এমন একজন ঐকান্তিক সাধু ভক্ত ভক্তিমান মানুষের মধ্যে একজনরূপে সমকক্ষ হইবার যোগ্যপাত্র।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ

এই সাধুজন খুব শিশুকাল হইতেই শ্রীশ্রীচৈতন্যের ভগবত্তায় দৃঢ় বিশ্বাসী। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ শান্তিপুরে তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; শান্তিপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর হইতে দক্ষিণ দিকে মাত্রকয়েক মাইল দূরত্বে ও কলকাতা হইতে উত্তরদিকে পঞ্চান্ন মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে (পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রে) দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের শিক্ষা বিষয়ে সহজাত সঠিক ধারণা ছিল, যে ধর্ম তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা শ্রীঅদ্বৈত নিষ্ঠা সহকারে পালন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ১২। ৭৩-৭৪ এ উক্ত হইয়াছে যে 'যাঁহারা শ্রী অচ্যুতানন্দের মত স্বীকার করিয়াছেন তাহারা শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের পারমার্থিক মতবাদের অন্তর্গত ও মহাভাগবত। একমাত্র তাঁহারাই আচার্য্যের কৃপার পাত্র হইয়াছেন ও সহজেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন। শ্রীকবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশ' অনুসারে তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর সেই সমস্ত সমসাময়িক পার্ষদ ভক্তগণের মধ্যে একজন যিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ঐতিহাসিক খেতুরী মহোৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন যেখানে মহাপ্রভুর প্রায় সকল বৈষ্ণব-ভক্তগণ হাজির ছিলেন যদিও প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন।

যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরামাইয়ের মারফৎ শ্রীঅদ্বৈতের নিকট মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবান্ রূপে আত্মপ্রকাশের সংবাদ আসিল সেই সময় আমরা দেখি শ্রীঅচ্যুতানন্দ এক অতি অল্প বয়স্ক শিশু মাত্র। মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে নিজ আত্মপ্রকাশের কথা জানাইতে বলিয়া দিয়াছিলেন, ''যাঁহার জন্য তুমি বহু পূজা-অর্চনা করিয়াছিলে, বহু অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলে, বহু উপবাস করিয়াছিলে সেই ভগবান্ স্বয়ং তোমার জন্য আসিয়া ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন —এখানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন কর।'' রামাইয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন; অতঃপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বার বার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ''অহো আমি তাঁহাকে তাঁহার বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আনাইয়াছি?'' এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সাশ্রুনয়নে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। অচ্যুতের মাতা সীতাদেবী ও তাঁহার শিশুপুত্র আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগলেন, শিশুর মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। কিছুকাল

পরেও মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ সহ সেখানে আগমন করিলেও তাঁহাকে নত হইতে দেখা গিয়াছে; কারণ শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর বাসস্থলী শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর হইতে বহুদিন অনুপস্থিত ছিলেন তখনও অচ্যুত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসীতাদেবী আনন্দে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, যখন তিনি দেখেন তাঁহার পিতা মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছেন যে সময়ে তিনি জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ে কিছু আলোচনাদির পর মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপথ যাজন করিতেছেন।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ ও কিছু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বা বঙ্গের উত্তর পশ্চিমে রাঢ় দেশে যাত্রা ব্যাপদেশে অনভ্যস্ত লোকজনের মধ্যে হরিনাম বিতরণ করিতে করিতে যাওয়ার সময় যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অগণিত জন সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের স্থানে পৌছান সে সময় আমাদের সাধু শ্রীঅচ্যুত উলঙ্গ শিশু ধূলি ধূসরিত দেহে ও সহাস্য বদনে আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রাথমিক জীবনী লেখক শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাঁহার বিবরণ দিতে গিয়া বর্ণনা দিয়াছেন তাঁহার (অচ্যুতের) দেহে এক পারমার্থিক জ্যোতি নির্গত হইতেছিল, যেন শৈশব হতেই যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানরূপে অচিন্ত্যনীয় শক্তি প্রদত্ত। মহাপ্রভু সেই ধূলিধূসরিত দেহ সহ তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তিনি যেন তামাসাচ্ছলে বলিলেন, 'অচ্যুত, আচার্য আমার পিতা, অতএব তুমি আমি দুই ভাই।' অচ্যুত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আপনি কতিপয় ভাগ্যবানগণের বান্ধব; কিন্তু বেদে উক্ত আছে আপনি সকলের পিতা। চতুষ্পার্শস্থ ভক্তগণ বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন অচ্যুতের এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া "কথাগুলি কখনও এক শিশুর হইতে পারে না; সম্ভবতঃ কোনও মহাত্মা শ্রীআচার্যের পুত্র রূপে আসিয়াছেন।"

অন্য এক সময় মহাপ্রভুর শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সঙ্গে বহু অনুচরবর্গ থাকায় শ্রীবৃন্দাবন গমনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়া নিজ স্থায়ী বাসস্থান নীলাচল (পুরী) গমনের পথে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আলয়ে গমন করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পূর্বে সেখানে এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। ঘটনাক্রমে এক সৎ-সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা জানাইয়া রাত্রের আহারের জন্য মহাপ্রসাদ নিবেদন করেন। অতিথি প্রথমে তাঁহার একটি সমস্যার সমাধান চাহিয়া প্রশ্ন করেন। "শ্রীকেশব ভারতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কে?" শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতেই কাটোয়ায় সন্ন্যাস

গ্রহণ করেন। এই প্রশ্নের উত্তর পারমার্থিক দিক হইতে অথবা জাগতিক দিক হইতে পারে। শ্রীঅদ্বৈত প্রশ্নটির ভাবের দিকটি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদিও ভগবানের কোনও মাতা-পিতা হইতে পারে না যেহেতু তিনি অজ। তথাপি তাঁহাকে দেবকী-নন্দন বলা হয় (অর্থাৎ দেবকীর পুত্র); পারমার্থিক ভাবে তাঁহার কোনও গুরু নাই; তথাপি বাস্তবে যাহা ঘটিয়াছে লোকে তাহাই বলিয়া থাকে। সুতরাং পারমার্থিক দিক্‌টির বিষয়ে অতিথিকে প্রথমে বলিবার প্রয়োজন নাই, প্রথমতঃ বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দেওয়া যাউক। এই প্রকার চিন্তা করে শ্রীঅদ্বৈত উত্তর দিলেন, "এই প্রশ্ন আপনি কেন করছেন যখন সকলেই জানে কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু?" এই কথা উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচ বৎসর বয়সী উলঙ্গ শিশু ধূলি ধূসরিত দেহে অচ্যুতানন্দ পিতার নিকট দৌঁড়াইয়া আসিয়া প্রতিবাদ সূচক ঈষৎ সহাস্য বদনে বলিলেন, "হে পিতঃ! এ আপনি কি বলিলেন? আপনার কি এই ধারণা যে শ্রীচৈতন্যের গুরু থাকিতে পারে? আপনি আমার পিতা যাঁর নিকট হইতে যথাযথ শিক্ষাদি পাইতে পারি; তাহা হইলে আমার শিক্ষাগুরু হইয়া অন্য কথা বলিতেছেন কি করিয়া?" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত পরম সুখ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমার পিতা আর আমি তোমার পুত্র; আমাকে যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছ। আমি একটা অপরাধ করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করিয়া দিও। আমি কথা দিতেছি যাহা বলিলাম এরূপ আর বলিব না।" নিজ প্রশংসা শুনিয়া শ্রীঅচ্যুত মহাশয় লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিলেন। আর সেই সন্ন্যাসী তাঁহার পদপ্রান্তে সটান পড়িয়া গেলেন ও বলিলেন,—"যেমন পিতা, তেমনই পুত্র। অত্যন্ত অচিন্ত্যনীয় ও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐশী শক্তি বিনা অন্য কিছু নহে; নচেৎ একটি শিশুর পক্ষে এই প্রকার বলা কি সম্ভব? অতীব শুভক্ষণে আমি শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আসিয়াছিলাম কারণ এমন এক গৌরবান্বিত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিতে পারিলাম।" পুনরায় তিনি পিতা ও পুত্র উভয়কেই দণ্ডবৎ জানাইয়া উচ্চঃস্বরে হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মন্তব্য করিয়াছেন যে অদ্বৈত একান্তভাবে শ্রীচৈতন্য চরণাশ্রয় করিয়াছেন তাঁহার যোগ্য পুত্রই অচ্যুত। পুত্রের এহেন গৌরবময় চরিত্র দেখিয়া তাহাকে কোলে করিয়াই অশ্রু বিসর্জ্জন

করিতে করিতে আনন্দের আতিশয্যে পুত্রের দেহের ধূলা নিজ দেহে লেপন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে কোলে লইয়াই আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—শ্রীচৈতন্যের নিত্য পার্ষদ আমার গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। এমন ভাবে নিবিষ্ট থাকা কালে মহাপ্রভু যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া রামকেলি হইতে অদ্বৈতের গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র অদ্বৈত সাষ্টাঙ্গ পতিত হইলেন উচ্চঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে, প্রেমের আতিশয্যে নিজেকে ভুলিয়া গেলেন। সেখানে সমবেত মহিলাগণসহ সকলেই আনন্দে উচ্চরবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। অচ্যুতও শ্রীচৈতন্যচরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। পূর্বেকার মত মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া প্রেমাশ্রু দ্বারা বালকের ধূলিমলিন দেহ ধৌত করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে নামিতে না দিয়া নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। ভক্তগণও অচ্যুতের প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অচ্যুতও এইভাবে তাঁহাদের নিকট অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া গেলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রাণস্বরূপ হইলেন ও গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে শ্রীঅচ্যুত পরবর্ত্তী জীবন মহাপ্রভুর ছত্রছায়ায় নীলাচলে অতিবাহিত করেন এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাকে জগন্নাথের রথযাত্রাকালে মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তগণসহ নৃত্য করিতেও দেখা যায়। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ও তাঁহার গুরু শ্রীগদাধর পণ্ডিতের তিরোভাবের পর এবং অন্যান্য কিছু ভক্তবৃন্দের নির্যাণপ্রাপ্তির পর তিনি শান্তিপুরে আসিয়া পিতা শ্রীঅদ্বৈতের আনুগত্যে ভ্রাতৃবৃন্দ কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালসহ মহাপ্রভুর মিশনের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করেন। শ্রীঅদ্বৈতের বংশের অপর যে সকল ভ্রাতা মহাপ্রভুর অনুগামী ছিলেন না তাঁহাদিগ হইতে বংশটি নামিয়া আসে। যখন নরোত্তম ঠাকুর নীলাচলে গমনের পথে তিন চারিদিনের জন্য শান্তিপুরে আগমন করেন সে সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অপ্রকট হওয়ায় তিনি শ্রীঅচ্যুতের সহিত মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করেন। যখন শ্রী অচ্যুতানন্দ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের বিখ্যাত খেতুরী মহোৎসব উপলক্ষ্যে সেখানে আগমন করেন তখন সকল বৈষ্ণবগণ খুব শ্রদ্ধাসহ তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে তিনি অতীব উচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু

"…. বীরচন্দ্র-গোসাঞির চরণ শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১১।১২)

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব তিথি কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে। তিনি সঙ্কর্ষণের পয়োব্ধিশায়ী ব্যূহ, তৎস্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈষ্ণবাভিমান করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীবসুধাদেবীকে অবলম্বন করিয়া বীরচন্দ্রপ্রভুর আবির্ভাব। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীবলদেব অভিন্ন। শ্রীবলদেবের অংশ বৈকুণ্ঠের মহাসঙ্কর্ষণের তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, যিনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের পালন-কর্ত্তা ও প্রতিটি জীবের অন্তর্য্যামীপুরুষ অনিরুদ্ধ, তিনিই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের ন্যায় শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর তিনটি শক্তি—শ্রীমতী, শ্রীনারায়ণী ও লীলাশক্তি। তাঁহার প্রথমা শক্তি শ্রীমতী, হুগলী জেলার ঝামটপুর নিবাসী শ্রীযদুনাথাচার্য্য ও বিদ্যুন্মালাকে (অথবা লক্ষ্মীকে) অবলম্বন করিয়া আবির্ভূতা। তাঁহাদের দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীকে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে সম্প্রদান করেন।

মাতার অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাওয়ার পথে খেতরি গ্রামে কয়েক দিন সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব করিবার পর তথায় পৌঁছাইলে তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য ব্রজের মহান্ত গোস্বামিগণ আগমন করেন, যথা—শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীঅনন্তাচার্য্য, শ্রীহরিদাস পণ্ডিত, শ্রীমদন গোপালদেবের সেবায়েত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীনাথ অধিকারী, শ্রীমধু পণ্ডিত, তাঁর সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীগোপীনথের পূজারী শ্রীভবানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর, তাঁর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভৃতি।

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমতিক্রমে শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু দ্বাদশ বন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শন কালে যে অদ্ভুত প্রেম প্রকাশ করেন, তাহা দর্শনে সর্বত্রই তাঁহার যশ প্রচারিত হয়। কিছুদিন ব্রজধাম দর্শনান্তে তিনি গৌড়দেশে ফিরিয়া আসেন।

গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—এই তিনজন তাঁহার শিষ্য হইলেও পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ বর্দ্ধমান জেলার মানকরের নিকট লতাগ্রামে, মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গণেশপুরে ও কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শুদ্ধ বটব্যাল।

খড়দহস্থিত প্রাচীন শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আনীত প্রস্তরখণ্ড হইতে তিনটী বিগ্রহ—শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীনন্দদুলাল জীউ প্রকটিত হন। প্রস্তরখণ্ডটি যে ঘাটে আসিয়া ছিল, সেই ঘাটের নাম শ্যামসুন্দর ঘাট। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব বীরচন্দ্রপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর সময় দেড় মন ধান্যের চাউল ও তৎপরিমাণ অন্যান্য উপকরণ সহ ভোগের ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীজ্ঞান দাস

শ্রীজ্ঞান দাস বীরভূম জেলার কাঁদড়া গ্রামে আনুমানিক ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

"রাঢ় দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়।।"

—ভক্তিরত্নাকর

আজও কাঁদড়াগ্রামে জ্ঞানদাসের ঠাকুর বাড়ী আছে। তিনি নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবামাতার শিষ্য ছিলেন।" পদসমুদ্র নির্যাস তত্ত্বের সংগ্রহকর্ত্তা বাবা আইল মনোহর দাস শ্রীজ্ঞান দাসের মিত্র ছিলেন। এই মনোহর দাসও শ্রীজাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন।

শ্রীনরোত্তম-বিলাসে—

শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞান দাস, মনোহর।।

'মনোহর' বলিতে পূর্বোক্ত মনোহর দাস বুঝিতে হইবে। শ্রীজ্ঞান দাস বিবাহ করেন নাই। তাঁহার জ্ঞাতি বংশধরগণ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামে আছেন। তিনি (জ্ঞানদাস) রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ও মনোহর দাস শ্রীজাহ্নবা মাতার সহিত খেতরী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। চৈঃ চঃ আঃ ১১।৫২ শ্লোকে তাঁহাকে (শ্রীজ্ঞানদাসকে) প্রভু নিত্যানন্দের গণ সকলের মধ্যে উল্লেখিত আছে, প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় কাঁদড়াগ্রামে তাঁহার নামে সংকীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

শ্রীজ্ঞানদাস কবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন; তাঁহার পদকীর্ত্তন অতি সরস ও হৃদয়গ্রাহী। উদাহরণ স্বরূপ—'হোরি লীলা' বিষয়ে—

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে।।
ডারত ফাগু দুহুঁ জন সঙ্গে।
সেবাইতে দুহুঁ রূপ মুরুছে অলঙ্গে।।
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মাল করু গান।।

চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুই অঙ্গে কোই কোই দেও ত জারি।।
বিগলিত অরুণ বসন দুহু গায়।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোবে তায়।।
হেম মরকতে জনু জড়িত পঞার।
তাহে বেচল গজ মোহিম হার।।
দোলাপরি দুই নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয়ে আশ।।

"বিরহ" বিষয়ে—

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহু অতি হৃদয় পাষাণ।।
সো ধনি বিরহ বিষাদে।
খোয়ল কুল মরিয়াদে।।
জীবন তনু ছিল শেষ।
সেই রহত অবলেশ।।
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ।।
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তান গদ্ গদ্ ভাষ।।
উঠিতে শকতি নাই তার।
জীবৎ মানয়ে ভার।
চৌদশি চাঁদ সমান।
মলিন না ধরল বয়ান।।
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরি করু কি উপায়।।
জ্ঞান দাস কহ রোষ।
তিরি বধ লাগব তোয়।।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম এক বিরাট ধনী পিতার রাজকুমার পুত্ররূপে উত্তরবঙ্গে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক স্বীকৃত চির কুমার, বাল্যকাল হইতেই অতীব ভক্তিপ্রবণ এবং তিনি শ্রীভগবানের চরণ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন, পিতা ও পিতৃব্যের অনুপস্থিতিতে অতি ভক্তিমতী মাতার অনুমতিক্রমে।

তাঁহার জন্মগ্রহণের বহু পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভাবী জন্মস্থানের (খেতুরী) দিকে মুখ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে সময় মহাপ্রভুর অনুগামীগণ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ ভক্ত।

তীর্থযাত্রাকালে বৃন্দাবনে পৌঁছিলে তিনি ব্রজের প্রবীণ গোস্বামীগণের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন—ষড়্‌-গোস্বামীগণের মধ্যে তৎকালে জীবিত তিন জনের, যথা,শ্রীগোপাল ভট্ট,শ্রীজীব ও শ্রীদাস রঘুনাথ। তিনি মধ্যযুগীয় মূল প্রেমধর্ম প্রচারকগণের তিন জনের একজন ছিলেন, যাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ধারায় নামসঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে প্রচার করিয়াছিলেন; অপর দুইজন ছিলেন শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীর আনুগত্যে ষড় গোস্বামী-বর্গের নিবন্ধাদির উপর গভীর অনুশীলনের জন্য ও তাঁহাদের ভক্তিভাবের জন্য তাঁহাদিগকে সেই শিক্ষা অনুসারে ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য ভার দেওয়া হয়, এই জন্য এক সিন্দুকে ভরিয়া সুরক্ষিত এক শকটে গ্রন্থাদি সঙ্গে দিয়া দেওয়া হয়। পথে সেই শকটটি লুট হইয়া যায়। শ্রীনিবাস গ্রন্থগুলি উদ্ধার করেন। ইত্যবসারে নরোত্তম গৌড়ে (বঙ্গে) ভ্রমণ করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর-নবদ্বীপ দর্শন করেন; সেখানে মহাপ্রভুর কয়েক জন প্রাচীন অনুগামিগণের সহিত সাক্ষাৎকার হয়, যথা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, ঈশান, মুরারি, দামোদর, দাস গদাধর যাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের জন্য দুঃখে নিমগ্ন ছিলেন।

অতঃপর তিনি নীলাচল (পুরী) উদ্দেশে রওনা হন—যেখানে মহাপ্রভু নিজ সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন। সেখানে তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ, যথা শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের চরণে পতিত হন এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির, মহাপ্রভুর আবাসস্থল গম্ভীরা, গদাধর পণ্ডিতের গোপীনাথ

মন্দির প্রভৃতি দর্শন করেন। যাঁহাকে জন্মের পূর্বেই রামকেলি হইতে শ্রীচৈতন্যদেব আহ্বান করিয়াছিলেন সেই নরোত্তম ঠাকুর সর্বত্রই সমাদর লাভ করেন।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে নিজ দীক্ষা গুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মুর্ত্তি স্থাপনের জন্য। প্রসঙ্গক্রমে উক্ত গোস্বামী ঠাকুরের তীব্র বৈরাগ্যময় জীবনী আলোচনার জন্য এখানে কিঞ্চিৎ বিরতি দেওয়া হইল। তিনি বৃন্দাবনের নিকট কিশোরী কুণ্ডের পার্শ্বে বনজঙ্গলাকীর্ণ এক স্থানে এক বৃক্ষতলে বাস করিতেন, দিবারাত্র ভগবানের নামকীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকিতেন—এমন কি বর্ষা ও শীতের মধ্যেও উপরি আচ্ছাদন-বিহীন অবস্থায়, ছিন্ন শয্যাবরণী ও জীর্ণ অর্ধ বহির্বাস পরিধান করিয়া থাকিতেন। শ্রীরাধাবিনোদ শ্রীবিগ্রহ তাঁহার সেবা-পূজা গ্রহণ করিতে আসেন, তাঁহাকে বর্ষার সময় এক বৃক্ষ কোঠরে রাখা হইত এবং অপর সময়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে ঝোলান কম্বলের ব্যাগের ভিতর। এমন তীব্র বৈরাগ্য ভাবে নরোত্তম আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার নীতি ছিল তিনি কোন শিষ্য করিবেন না। তথাপি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কিছু সেবা দ্বারা নরোত্তম নিজেকে অঙ্গীকার করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুরুর ইচ্ছা অনুসারে শ্রীনরোত্তম নীলাচল হইতে উত্তরবঙ্গে খেতুরিতে নিজ গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই ৫ প্রস্থ্ রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ তৈয়ার রাখিলেন এবং এক অসাধারণ উপায়ে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহগণকে লাভ করিলেন। পূর্বরাত্রে এক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া পরদিন প্রাতে সন্নিহিত একগ্রামে গমন করিলেন এবং বিপ্রদাস নামে একজনের শস্যের গোলায় প্রবেশ করিতে চাহিলেন, সেই গোলায় প্রভুত পরিমাণ ধান্য সঞ্চিত ছিল। তাঁহাকে অতি বিনীতভাবে নিষেধ করা হইল, কারণ গোলাটি বিষাক্ত সর্পকূল দ্বারা অধিকৃত এবং তাহারা ভীতিপ্রদ হিস্ হিস্ শব্দ করিতেছিল। সাপুড়িয়াগণ তাহাদের সকল প্রকার কলা কৌশল মন্ত্র তন্ত্র প্রয়োগ করিয়াও উহাদিগকে তাড়াইতে পারে নাই। তথাপি নরোত্তম জোর করিতে যখন গোলার দ্বার উন্মুক্ত করা হইল তখন উপস্থিত সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া সর্পগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহগণ নিজ হইতে নরোত্তমের হস্তে সমাগত হইলেন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শুরু হইল।

তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা সন্তোষ দত্ত সমগ্র বিষয়ের অধিকারী হইয়া রাজা হইয়া বসিলেন এবং বহুপূর্বেই সংসার ত্যাগ করায় সেই সম্পত্তির উপর কোন দাবী না রাখায় তিনি (সন্তোষ) তাঁহার শিষ্য হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ

প্রচারক ছিলেন গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। এই ছয় প্রস্থ বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সন্তোষ দত্ত খুব জাঁকজমকপূর্ণ প্রস্তুতি ইত্যাদি করিয়া ছিলেন। বিগ্রহগণ যথা,—

"শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন,
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ।"

শ্রীনরোত্তমের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সকল শিষ্যই আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগমন করেন যথা নবদ্বীপ, উড়িষ্যা, খড়দহ (শ্রীনিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবা দেবী তাঁহার অনুগামিবর্গ সহ) এবং অন্যান্যগণ। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং অনুষ্ঠানটিও প্রকৃতপক্ষে বিশাল ও অভূতপূর্ব হইয়াছিল। যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর ও অন্যান্য পার্ষদ ভক্তগণ বহু পূর্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন—তাঁহারাও সকলে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন ও সঙ্কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করেন—ঠিক যেমনটি তাঁহারা পৃথিবীতে মহাপ্রভুর প্রকটকালে করিতেন। উপস্থিত সকল ভক্তগণ এমনই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে,তাঁহারা উপরোক্ত সকলের অন্তর্ধানের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তন মহোৎসবের পরই তাঁহারা সহসা অদৃশ্য হইয়া যান, ঠিক যেমন লাইনের সুইচ্ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সকলেই দুঃখাভিভূত হইলেন, তাহাতে অনুষ্ঠান পুনরায় আরম্ভ করিতে তাহাদের বেশ কিছু সময় লাগিয়া যায়।

শ্রীনরোত্তম ছিলেন এক মহান সঙ্গীত শিল্পী, তিনি সঙ্কীর্ত্তনে গরাণহাটি প্রথার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে ভক্তির প্রচারে সুবিধা হইত;তাঁহার রচিত কীর্ত্তন গ্রন্থ যথা,নামসঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ভক্তি মার্গের সকলকে প্রভাবিত করিয়াছিল। শ্রীনরোত্তম এমনই খ্যাতি লাভ করেন যে (তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়াও) সকলের মধ্যে তিনি "ঠাকুর মহাশয়" নামেই পরিচিত ছিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু

এই সাধুজন সেই তিনজনের গোষ্ঠীর একজন যাঁহাদিগকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল ও যাঁহারা সম্মিলিতভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অপর দুই জন শ্রীল নিবাস আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। এক্ষণে এই সাধু চরিত্রটির বিবৃতি আরম্ভ করা যাউক তাঁহার জন্ম হইতে। কিছু কিছু গ্রন্থে যথা 'শ্যামানন্দ- প্রকাশ' 'অভিরাম লীলামৃত', 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতিতে তাঁহার জীবনী বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব পুরুষের গৃহ বাংলাতে ছিল; কিন্তু তাঁহার পিতা উড়িষ্যার ধরেন্দ্রা বাহাদুরপুরের পূর্বদিকে দণ্ডেশ্বর গ্রামে বসতি পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার আরও ভ্রাতা ও ভগ্নী ছিল কিন্তু তাহারা সকলেই শিশুকালেই গত হয়, যে জন্য তাঁহার মাতা-পিতা প্রতিবেশী মহিলাগণের উপদেশানুসারে নাম রাখেন দুঃখী। তাঁহার জন্ম ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি অন্য বালকগণের সহিত মিশিতেন না, কিন্তু সময় অতিবাহিত করিতেন পড়াশুনায় ও ভক্তিমূলা অনুষ্ঠানাদিতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও তাঁহাদের অনুগামিগণের বিবরণাদি পাঠ করিতেন স্থানীয় বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্যান্য কিছু বিষয় অধ্যয়ন শেষ করেন ও নিজে সর্বদা শ্রীরাধা কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে ব্যাপৃত রাখিতেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও পার্ষদগণের চরিতকথাও শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেন। সে সময় তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইত। তাঁহার মাতা-পিতাও খুব ভক্তি ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাকে যোগ্য জ্ঞান করিয়া দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব করেন যদিও তখন তাঁহার বয়স ছিল অল্প। ইহার পূর্বে স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন এবং করজোড়ে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিতেন যে তাঁহার গুরুদেব শ্রীহৃদয়-চৈতন্য প্রভু গঙ্গা তীরবর্ত্তী কালনার নিকট অম্বিকায় তখন অবস্থান করিতেছেন। তিনি (গুরুদেব) ছিলেন গৌর-নিত্যানন্দের পার্ষদভক্ত শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। মাতা-পিতার নিকট প্রার্থনাপূর্বক তাঁহাদের অনুমতি লইয়া গঙ্গা স্নান উদ্দেশ্যে গমন-রত কিছু তীর্থযাত্রীগণের সহিত গুরুর চরণ দর্শনে গমন করিলেন।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের আশ্রমে গমন করিয়া মহাপ্রভু গমনোদ্যত হইলে পণ্ডিতের বিরহ বেদনা প্রশমিত করিবার জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নির্মিত শ্রীগৌর

নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন করিয়া দুঃখী প্রেমাচ্ছন্ন হইয়া অতীব আনন্দে অশ্রু-বিগলিত হইলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু অতীব মোহিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার সমস্ত পূর্ববর্ত্তী ইতিহাস জ্ঞাত হইলেন। পরম কৃপাময় হইয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন এবং দুঃখীর পরিবর্ত্তে নাম দিলেন 'কৃষ্ণদাস' ও তাঁহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। যাহা চাহিয়া ছিলেন তাহা পাইয়া কৃষ্ণদাস খুব সুখী হইলেন এবং গুরুকে সন্তুষ্ট রাখিয়া সবকিছু করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে সত্বর বৃন্দাবন যাত্রা করিতে বলিলেন। উল্লসিত হৃদয় হইয়া তিনি সেখানে অবস্থান করিয়া গুরু ও ভগবানকে মনের সুখে সেবা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগুরু অবশ্য প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও পুনরায় বিলম্ব না করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিতে বলিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কৃষ্ণদাস সে স্থান ত্যাগ করিলেন, তখন তাহার চক্ষুদ্বয় বাহিত অশ্রু দরবিগলিত ধারায় বহিতে লাগিল। যাইবার পথে তিনি নবদ্বীপ মায়াপুর ধাম দর্শন করিলেন ও ভগবানের ভক্তগণের বাসস্থানও দর্শন করিলেন। যতই সে সমস্ত দেখিতে থাকেন ততই তাঁহাদের বসবাসের স্থান গৌরমণ্ডল ছাড়িয়া যাইতে মন চাহিল না।

বৃন্দাবনে পৌঁছাইবার পর তাঁহার স্বভাব ও ভক্তির জন্য সকলের এবং শ্যাম-সুন্দরেরও (শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের) প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট আসিলে তাঁহাকে হার্দিক অভ্যর্থনা জানাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর একদিন পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন যে তাঁহারা সত্ত্বর এক নূতন বৈষ্ণব বন্ধু লাভ করিবেন। সেই দিনই এ পর্য্যন্ত যিনি দুঃখী কৃষ্ণদাস (সেই) শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীপাদের নিকট আগমন করিলেন এবং সেখানে তাঁহারা পরমানন্দে মিলিত হইলেন। গোস্বামীপাদ নিজেও তাঁহার মধ্যে ভক্তিভাব দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন; জিজ্ঞাসিত হইলে কৃষ্ণদাস পূর্ব ইতিহাস সবই অবগত হইলেন। শ্রীজীবপাদ তাঁহাদিগের তিনজনকে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয় নিজ প্রণীত গ্রন্থাদি হইতে রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট প্রভৃতির গ্রন্থাদি হইতে ভক্তির মধুর রস আস্বাদন করাইতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণদাস ভক্তিবাদ বিষয়ে অপর দুই জনের মত অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন।

শ্রীমতী রাধার দাসী হইবার প্রবণতা তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া শ্রীজীব তাঁহাকে সে জন্য মানসিক যোগ্যতা প্রদান করিলেন এবং তিনি শ্রীশ্যামসুন্দরকে তুষ্ট করিয়াছেন জানিয়া নাম দিলেন 'শ্যামানন্দ'। তিনিও শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের মত ব্রজের সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ গোস্বামীগণের ও সেখানকার সকল বৈষ্ণবগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

একদিন প্রত্যুষে শ্যামানন্দ বৃন্দাবনের রাসমণ্ডল পরিষ্কার করিবার সময় শ্রীরাধার চরণের একটি নূপুর প্রাপ্ত হইলেন। কপালে স্পর্শ করা হইলে সেই স্থানে নূপুরের একটি চিহ্ন হইয়া গেল একই আকার বিশিষ্ট। এই কারণে তাঁহার অনুগামিগণ রঙ্গীন খড়িমাটি দ্বারা একই আকার কপালে ধারণ করেন।

শ্রীজীবপাদের প্রশিক্ষণের ফলে শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন ও শাস্ত্র বিষয়ে, যাহা সাধারণতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে বিদিত, সুপণ্ডিত হইলেন এবং উল্লাসভরে ভাবাপন্ন ভক্তি বিষয়ে দক্ষতা সম্পন্ন হইলেন, তখন ব্রজগোস্বামিগণ শ্রীজীব গোস্বামীর প্রস্তাব আলোচনা করিয়া বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি সঙ্গে দিয়া বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি স্থাপন ও প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীলোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গোস্বামীবর্গ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সাফল্য কামনায় প্রত্যেকেই আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। এই পরিকল্পনার যিনি উদ্যোক্তা সেই শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজের অন্যান্য স্থান হইতে বৃন্দাবনে এই উদ্দেশ্যে আগত বৈষ্ণবগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তাঁহার আদেশে এক ভাগ্যবান্ বণিক সমস্ত ব্যয়ভার বহন এবং শকটসহ গ্রন্থগুলি লইবার মত এক জল-রোধক সিন্ধুকের ব্যবস্থা করিলেন, এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র, নিরাপত্তা রক্ষী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া মথুরা পর্য্যন্ত সেই শকটের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সশস্ত্র দেহ রক্ষীগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তালাবদ্ধ গ্রন্থাদি পূর্ণ সেই বিশাল সিন্ধুক সহ শকট লইয়া যে পথে মহাপ্রভু ও শ্রীসনাতন নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই পথের গ্রামবাসিগণ নিজেদের মধ্যে গুজব রটাইল যে সিন্ধুকটির

মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও বিরাট জমিদারের খুব মূল্যবান্ সম্পদাদি রহিয়াছে। যখন তাঁহারা বিহারের সীমানা অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিল বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের সেবায় নিযুক্ত ডাকাত দলের গণৎকার গণনা করিয়া জানিল যে সিন্ধুকটির ভিতর মূল্যবান্ সম্পদ আছে। বৈষ্ণবের দল ও তাঁহাদের সঙ্গীগণ এই প্রদেশে নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ঘুমাইতে লাগিলেন, সেই সময় মধ্যরাত্রিতে ডাকাতের দল শকট সহ সিন্ধুকটি চুরি করিয়া লইয়া রাজ প্রাসাদে লইয়া গেল। বীর হাম্বির সিন্ধুকের ভিতর গ্রন্থাদি দর্শন করিয়া নিজেকে বঞ্চিত বোধ করিলেন এবং গ্রন্থগুলির মালিকের সহিত মিলিত হইতে উদ্বিগ্ন হইলেন যাহাতে তিনি ক্ষমা প্রাপ্ত হন ও তাঁহার অনুমিত সেই সাধুর চরণে অপরাধের অমঙ্গল হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন।

ও দিকে তিন বৈষ্ণব প্রভু খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন ও হতাশা হইতে তাঁহাদের মনে জীবন ত্যাগের কথা উদয় হয়। অনেক খোঁজ খবর লইয়া শ্রীনিবাস জানিতে পারিলেন যে খুব সম্ভবতঃ সিন্ধুকটি রাজার প্রাসাদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। তিনি তখন শ্রীনরোত্তম ও শ্যামানন্দকে যথাক্রমে উত্তরবঙ্গে খেতুরীতে ও উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন। শুধুমাত্র গ্রন্থগুলিই উদ্ধার হইল না রাজা বীরহাম্বিরের নিকট হইতে উপরন্তু সেই রাজা শ্রীনিবাসের শিষ্য হইয়া মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম প্রচারের এক বড় পৃষ্ঠপোষক হইলেন। সংবাদটি শকট-চালক ও নিরাপত্তারক্ষীগণের মারফৎ শ্রীজীবপাদের নিকট প্রেরণ করা হইল এবং শ্রীনরোত্তম ও শ্যামানন্দও জানিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীনরোত্তমের সহিত কয়েক মাস খেতুরীতে অতিবাহিত করিয়া এবং বঙ্গদেশে অনেক ভক্তগণের স্থান দর্শন করিয়া এবং নিজগুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্যের অম্বিকা দর্শন করিয়া উড়িষ্যা পৌঁছাইলেন।

অতঃপর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর, শ্রীনিত্যানন্দের পদাঙ্কিত স্থানসমূহ (বঙ্গের গৌড়দেশে) দর্শন করিয়া নীলাচলে (পুরীতে) গমন করেন এবং ফিরিবার পথে উড়িষ্যার নৃহিংপুরে শ্যামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন; সে সময় উভয়ের সাক্ষাৎজনিত পরম আনন্দ পাইলেন ও পরে ছাড়াছাড়ি হইবার সময়ে হৃদয় বিদারক বেদনাও অনুভব করিলেন। অতঃপর শ্যামানন্দ পুরী গমন করিয়া সেখানকার ভক্তগণকে দর্শন করিলেন। অতঃপর তিনি বৃন্দাবন গমন করিয়া দেখিলেন শ্রীনিবাস পূর্বেই

শ্রীজীবপাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিয়া এক নিমন্ত্রণ পাইলেন, নরোত্তমের গুরু ব্রজবাসী শ্রীলোকনাথের আদেশ ক্রমে খেতুরীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষ্যে সেই বিখ্যাত উৎসবে যোগদানের জন্য। সেখানে তিনি যোগদান করিলেন; সেখানে যে অভূতপূর্ব জাঁকজমক হইয়াছিল তাহাতে পবিত্রতার কোন সীমা ছিল না যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজ পার্ষদগণ সহ, যাঁহারা সে সময় পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা, কিছু সময়ের জন্য সেই নৃত্যোৎসবে যোগদান করিয়া ছিলেন। খেতরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্যামানন্দ পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন এবং সেখানকার বৃদ্ধ অতীব গুণান্বিত গোস্বামিগণের নিকট হইতে আরও উৎসাহ লাভ করিয়া তিনি নিজ গুরুর স্থান অম্বিকা হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেখানে তিনি বহু স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার, অনেক ডাকাতকে একান্ত অনুরক্ত ভক্তে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তিনি 'রেনেটি' নামীয় এক বিশেষ সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। বিভিন্ন স্থানের ভিতর দিয়া প্রচারযাত্রা কালে তিনি সুবর্ণ রেখা নদীর (বর্ত্তমানে বিহারে) নিকট ঘাটশিলা ভ্রমণ করেন, সেখানে রণ্যানির রাজা অচ্যুতের পুত্র রসিক মুরারী অবস্থান করিতেন। সমগ্র পরিবারটি ভক্তি ভাবাপন্ন ছিল। রসিক এক সৎগুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তখন একদিন তিনি দৈববাণী প্রাপ্ত হইলেন যে শ্রীশ্যামানন্দ নামে এক সাধু তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবেন। তখন হইতে তিনি সর্বদা 'শ্যামানন্দ' নাম জপ করিতে থাকেন এক উদ্বেগে সজলনয়ন হইতেন। রাত্রির শেষে শ্যামানন্দ এক স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন। সকালে তিনি দেখিলেন কিছু-সংখ্যক শিষ্য সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেগে মত্ত হইয়া আসিতেছেন। রসিকানন্দ তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণতঃ হইলেন। তিনি কিছু প্রারম্ভিক কার্য্যাদি করিয়া তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি গুরুকে লইয়া রাজধানী রণ্যানিতে গমন করিলে অনেকলোক ও দামোদর নামে এক জন যোগ অভ্যাসকারী লোক দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্ত হইলেন; এই দামোদর ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইয়া অনুশোচনা করিয়া বলিয়া ছিলেন যে যোগের সাহায্যে মনের একাগ্রতা আনয়নের বৃথা চেষ্টায় তাঁহার সময় নষ্ট হইয়াছে।

শ্যামানন্দ আরও কয়েক জনকে শুদ্ধভক্তি পথে পরিবর্ত্তিত করিয়া উড়িষ্যা ও বাংলার সীমানার নিকট বঙ্গদেশের দিকে শ্রীগোপীবল্লভ পুরে শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইলেন ও রসিকানন্দকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিলেন, সেখানে তাঁহার অনুগামিগণ অদ্যপিও সেই বিগ্রহ যথাযথ ভাবে সেবা করিয়া যাইতেছেন, শ্যামানন্দ খুব সাফল্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করিতেছেন শুনিয়া বৃন্দাবন ও গৌড়ের ভক্তগণ খুব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহারই উদ্যমের মাধ্যমে উড়িষ্যা দাবী করে যে এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে বৃহত্তর সংখ্যক চৈতন্যের ধর্মের অনুগামী, যাহা অন্যত্র ততটা নহে।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডগ্রামে বৈদ্যকুলে পিতা খণ্ডবাসী ভক্ত শ্রীচিরঞ্জীব সেন ও মাতা শ্রীসুনন্দাদেবীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের আবির্ভাব। যিনি কৃষ্ণলীলায় করুণামঞ্জরী, তিনি রামচন্দ্র কবিরাজরূপে প্রকটিত। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ। শ্রীরামচন্দ্রের মাতামহের নাম শ্রীদামোদর কবিরাজ; ইনি শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পিতা অপ্রকট হওয়ার পর কুমারনগরে মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের গৃহে শ্রীরামচন্দ্র কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের ভজনস্থান তিলিয়া বুধুরী গ্রামে যাইয়া বাস করিলে সেই স্থানটি শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাটরূপেও প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জানাইয়াছেন ইনি আজন্ম সংসার-বিরাগী ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান হইতে দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিলেও কখনও সংসারাশ্রমে ছিলেন না। কথিত হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিয়া যাজিগ্রামের পথ দিয়া যাইবার কালে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিবার সময় শ্রীনিবাসাচার্য্যকে গৃহ-অলিন্দে বসিয়া হরিকথা পরিবেশন-রত দেখিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীরামচন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে দেখিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কি যেন অভিনব ভাবোদয় হইল। শ্রীআচার্য্য জানিতে পারিলেন—শ্রীরামচন্দ্র একজন যশস্বী চিকিৎসক ও কবি নৃপতি, নিবাস কুমারনগর।

শ্রীরামচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসা অবধি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। সমান উৎকণ্ঠা শ্রীআচার্য্যেরও মনে ছিল, তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন,—"জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।" (ভক্তিরত্নাকর ৮।৫৭৪)। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্নেহাসিক্ত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাঁহাকে "রাধাকৃষ্ণ" দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্যচরণে অবস্থান করিয়া গোস্বামী গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর তিনি যাজিগ্রাম হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সে সময় শাক্তগণ তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাহা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিত্য দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ ও হরিনাম জপাদি

করিতে করিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন। একদিবস শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ স্নানাদি করিয়া গৃহে গমন রত দেখিয়া শাক্তগণ বলিলেন, আপনি শিবপূজা না করিয়া গৃহে যাইতেছেন কেন? তোমার মাতামহ দামোদর কবিরাজ ত' শিবের পরম ভক্ত ছিলেন।

তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দিলেন,—শিব ও ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। সুতরাং কৃষ্ণকে পূজা করিলেই সকলেরই পূজা হয়; বৃক্ষের মূলে জল দিলে যেমন শাখা-পল্লব সহজেই পুষ্ট হয়। প্রহ্লাদ-ধ্রুব-বিভীষণ সকলেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, সেই জন্যই শ্রীশিব ও ব্রহ্মা তাঁহাদের প্রতি সহজেই সদয় ছিলেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বাণ প্রভৃতি হরি-বিদ্বেষী, কেবল শিবের ভক্ত ছিলেন। সেইজন্য স্বয়ং শিবই তাঁহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্রও বলেন,—ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিশ্ব সৃষ্টি ও শিব ভগবানের পাদোদক মস্তকে ধারণ- প্রভাবে জগতের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া স্মার্ত পণ্ডিতগণ নির্বাক হইলেন।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম ও গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শন লালসায় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের অনুমতিক্রমে তথায় গমন করিলেন। পথে গয়া, কাশী, প্রয়াগাদি তীর্থ হইয়া শ্রীমথুরায় আগমন করিয়া বিশ্রামঘাটে স্নান ও বিশ্রাম করিলেন। জন্মস্থানাদি দর্শনের পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। সে সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস ও শ্রীজীব গোস্বামীর অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদন-মোহন প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি দর্শন করিলেন। শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ প্রমুখ গোস্বামিপাদগণের শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামী অদ্ভুত কবিত্ব প্রতিভা দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিলেন। ইনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রচার ও ভজনের ইনি প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্মরণচমৎকার', 'স্মরণ-দর্পণ', 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা', 'শ্রীনিবাসাচার্য্যের জীবন-চরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রজে গোস্বামিগণের নিকটে অবস্থান করিয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহাদের আদেশ লইয়া পুনরায় গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, খড়দহ, অম্বিকা-কালনা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র

ভবনে আগমন করিয়া অতীব বৃদ্ধাবস্থায় অবস্থান-রত ঈশান ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলে তিনি প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের অতি প্রিয় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। আবার শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রকে প্রাণাধিক ভালোবাসিতেন। তিনি (ঠাকুর মহাশয়) তাঁহার রচিত 'প্রার্থনা' গীতিতে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন।

"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।"

কোন এক সময় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া খেতরিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রাজা নরসিংহ এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপ-নারায়ণ ছিলেন। এই ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বড়ই মর্মাহত হন। কুমারপুরের বাজারে আসিয়া তাঁহারা কুম্ভকার হইয়া হাঁড়ি-কলসীর দোকান ও তাম্বুলিকী হইয়া পান-সুপারির দোকান দিয়া বসিলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে আসিয়া শিষ্যগণকে হাঁড়ি ও পান-সুরারি ক্রয় করিতে পাঠাইলেন। কুম্ভকার ও তাম্বুলিকী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন। ক্রমে ছাত্রদিগের সহিত বাদ-বিবাদ হইতে থাকে। কুম্ভকারের ও তাম্বুলিকের অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ক্রমে সেখানে রূপ-নারায়ণ ও রাজা নরসিংহ আসিলেন। দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণও বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ভাগবত সিদ্ধান্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। অবশেষে রাজা তাঁহাদিগের পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য দাসানুদাস। স্মার্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইবার পর আর খেতরির দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। সে স্থান হইতে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে দুর্গাদেবী রাজা নরসিংহকে স্বপ্নে বলিলেন,—"রে নরসিংহ! তোরা নরোত্তমের চরণে ঘোর অপরাধ করিয়াছিস্। সেই বৈষ্ণব অপরাধের জন্য এই খড়্গ দ্বারা তোদের সকলকে খণ্ড খণ্ড করিব। যদি রক্ষা পাইতে চাস্, শীঘ্র নরোত্তমের পদাশ্রয় কর।" নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেবীর কথা স্মরণ করিয়া খেতরির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীরূপনারায়ণ পণ্ডিতও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন তিনিও খেতরীর দিকে যাত্রা করিলেন। রাজা ও রূপনারায়ণ খেতরিতে পৌঁছাইয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন

করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে আসিলেন। ঠাকুর মহাশয় নাম-ভজনে নিমগ্ন ছিলেন। সেবক রাজা ও পণ্ডিতের আগমন-সংবাদ ঠাকুর মহাশয়কে জানাইলে তিনি বাহিরে আসিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেমময় অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়াই যেন তাঁহারা পবিত্র হইয়া গেলেন ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মহাশয় অতি দীনভাবে বলিলেন—আমি অধম, আপনারা উত্তম বিদ্যাবুদ্ধি ও রাজ্যৈশ্বর্য্যবান্। আপনাদিগের কি সেবা করিতে পারি? রাজা ও পণ্ডিত ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্যোক্তিতে বিগলিত হইয়া করজোড় করিয়া কৃপাপ্রার্থনা করিলেন ও দেবীর আদেশ জানাইলেন। ঠাকুর মহাশয়ও তাহাদিগকে কৃপাপূর্বক দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন।

তিনি বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আরিট্ গ্রামে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডে স্নানান্তে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে যখন দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করেন, তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কৃপায় অনেক পাপী, পাষণ্ডী উদ্ধার লাভ করে। খেতরির মহোৎসবে কবিরাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশ লইয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পুনরায় বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে অধিকাংশ গোস্বামী অপ্রকট হইয়া যাওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি শ্রীব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর শ্রীপাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে করিতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। পৌষী কৃষ্ণা তৃতীয়া তাঁহার নিত্যলীলা প্রবেশ তিথি। শ্রীনিবাসাচার্য্যের অন্তর্ধানের পর শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অপ্রকট হন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য শ্রীহরিরাম আচার্য্য। তিনি একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে এই মহান সাধুটি জনসমক্ষে উদিত হন ও দীর্ঘকাল পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে অস্তমিত হন। তাঁহার জন্ম উত্তরবঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশে)। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর জীবন আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত সেবায় পবিত্রতম জীবনযাপন করিতেন, তাত্ত্বিকভাবে এই উভয় বিগ্রহ একই অর্থাৎ উভয়েই ব্রজ (অর্থাৎ বৃন্দাবন ও তৎসন্নিহিত স্থান) যেখানে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল যাহার কেন্দ্রস্থল মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর। এই উভয় পবিত্রের মধ্যে পবিত্রতম স্থানে তাঁহাকে সমসাময়িক সাধুগণের মধ্যে প্রধানরূপে গণনা করা হইত, সেইজন্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণব সার্বভৌম ও সিদ্ধবাবাজী মহারাজ বলা হইত।

এই মহান সাধু শ্রীবৃন্দাবন হইতে কয়েক মাইল দূরে গোবর্দ্ধন পর্বতের নিকটস্থ শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রায় সময় অবস্থান করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দ্দেশ মত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আচরিত পথে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কখন কখন তিনি নবদ্বীপ মণ্ডলকে ব্রজ মণ্ডল হইতে অভেদ জানিয়া তাঁহাদিগের নিরন্তর ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত থাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেন। তাঁহার শেষ জীবনের দীর্ঘকাল অবশ্য (বর্তমান নবদ্বীপ শহর) কুলিয়ায় অতিবাহিত হয়, সেখানে তাঁহার অতি প্রাচীন 'ভজন কুটী' (অর্থাৎ আশ্রম) সারা বৎসর ধরিয়া বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের মনকে এক অতি পবিত্র স্থান রূপে আকৃষ্ট করে। নিজে নিরন্তর ভজন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের (মহাপ্রভু) ধ্যানে নিমজ্জিত ও তাঁহাদের নামকীর্ত্তনে নিমজ্জিত থাকিয়া সকলকে তাহাই করিতে শিক্ষা দিতেন ও উৎসাহিত করিতেন —কারণ মানুষের সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে ইহাই শ্রেষ্ঠতম উপায় যাহা দ্বারা সর্বোচ্চতম পরম সুখ লাভ হয়। পরবর্তীকালে (সার্ধ শতাব্দীর অধিক) বয়সের ভারে নত তাঁহাকে খর্বাকৃতি ও কুব্জ দেহ দেখাইত; কিন্তু যখন তিনি সংকীর্ত্তনের আনন্দে উল্লাসে মত্ত হইতেন, তখন তাঁহার দেহ পূর্ণ প্রসারিত হইয়া দীর্ঘদেহ হইত, তখন তাঁহার হস্তাঙ্গুলী সকল ঘরের ছাদ স্পর্শ করিত।

যখন তিনি তাঁহার মত অন্যান্য নৈষ্ঠিক পরমহংস বৈষ্ণবগণ সহ বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় চৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন

পশ্চিমবঙ্গের সেই কাটোয়ার এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোমুগ্ধকারী ভাগবত পাঠক কিছুদিনের জন্য সেস্থানে আসিয়াছিলেন, তিনি পেশাদারী পাঠকও বটেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণের জন্য শ্রোতাগণ সমবেত হন, তাঁহারা তাঁহার ব্যাখ্যা প্রণালী ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বাবাজী (সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী)ও ছিলেন। কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব সার্বভৌম জগন্নাথ দাস ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেই শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন নাই। তাহা দেখিয়া সেই পাঠক তাঁহার নিকটে আসিয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে অর্থ বা পুরস্কারের জন্য শ্রীভাগবত পাঠক বেশ্যাগণ অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও পাপী। যে পবিত্র গ্রন্থটি স্বয়ং ভগবৎ তুল্য সেই গ্রন্থের পেশাদারী পাঠক হইয়া অর্থোপার্জনের মত ভয়ানক পাপ আর নাই। ভগবান ও তাঁহার সম যথা পবিত্র গ্রন্থাদিকে অবলম্বন করিয়া অর্থ ও যশঃ লাভের চেষ্টা ভগবানের চরণে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এমনকি যাহারা এই সমস্ত পেশাদারী পাঠকের শ্রোতৃবর্গ তাহারাও সমভাবে পাপী যেমন এহেন দুষ্কর্মে সাহায্যকারীগণ। এই সমস্ত অপরাধী পাঠকগণ ও শ্রোতাগণ যে সমস্ত উল্লাস বা উচ্ছাস প্রদর্শন তাহা সবই মিথ্যা ও ভণ্ডামী, সে সবই লোক দেখান ও পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক। সেই পাঠক সুবুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীল জগন্নাথ দাসের এই সমস্ত ভৎর্সনাকে নিন্দাসূচক বা অবাঞ্ছিত মনে না করিয়া সেই মুহূর্তেই ভাগবত পাঠকে পণ্য করিয়া পেশাকে ত্যাগ করিলেন, উপরন্তু সেই সাধুর সদয় ও করুণাপূর্ণ উপদেশকে নিজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সেই সাধুর কৃপায় ভবিষ্যতে সেই পাঠক এক সুভক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মধ্যে পাপ আর রহিল না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবনে সর্বপ্রথম শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত মিলিত হন, ১৮৮৫ সন হইতে তিনি প্রায়ই সেই সাধুর পারমার্থিক উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন এবং মনে হইল তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ স্মরণাতীত কাল হইতে। ১৮৯২ সনে তাঁহাদের মধ্যে এক সাক্ষাৎকার ঘটে আমলাজোড়ায় (পঃ বঙ্গে), সেখানে এক প্রপন্নাশ্রম (যাঁহারা ভগবানে নিবেদিতাত্মা তাঁহাদিগের হরিকথা শ্রবণের ও কীর্ত্তনের জন্য কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ লওয়া হইতেছিল। বাবাজী মহারাজের নেতৃত্বে বিশাল এক নগর-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সেই দেড় শতাধিক বৎসর বয়সী বৃদ্ধ

উল্লাস ভরে নৃত্য করিতে করিতে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ও অশ্রুজলে মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া বহুক্ষণ মূর্চ্ছাগত ছিলেন। অতঃপর ঠাকুর হরিকথা পরিবেশন কালে এই প্রকার কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বলেন, শেষে সেই সাধু সেই আশ্রম উন্মোচিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৯৩ সালে শ্রীজগন্নাথ অনুগামী সহ নিজ ভজন কুঠী হইতে গঙ্গার অপর পারে ঠাকুরের ভজনস্থান গোদ্রুমে সুরভি কুঞ্জে আগমন করেন, তখন সেই এলাকা প্রায় সকল সময় ব্যাপিয়া উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত থাকিত, তাহাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় কালীন দিনগুলির কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

তাহার পর হইতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় সময় বাবাজী মহারাজের নিকট আসিতেন ও বাবাজী মহারাজও গোদ্রুমে ঠাকুরের স্থানে ও কলকাতাতেও আসিতেন। অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন প্রকার প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রাদি, যথাঃ—ভক্তিরত্নাকর, প্রাচীন পরিসংখ্যান বিষয়ক ও স্থান বিবরণ সংক্রান্ত সরকারী মানচিত্র ও জেলাআদালতের নথিপত্রসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া এবং সেই প্রমাণ সমূহকে জেলা ও জেলার বাহিরের গণ্যমান্য ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ ও নবদ্বীপের নামকরা পণ্ডিতগণের এক সভায় পেশ করিয়া অনুমোদন করাইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিলেন, তখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন দিবসের সকালে এক সঙ্কীর্ত্তন দল লইয়া শ্রীজগন্নাথ দাসের নিকট গমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দলের সহিত মিলিত হইয়া, এই বৃদ্ধ বয়সেও পরিচালনা ও উৎসাহ উদ্দীপনা সহ সেই জন্মস্থানে (যোগপীঠে) উপনীত হইলেন এবং সেই সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে ঠিক স্থানটি যেখানে নিমাই (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভগবানের নিত্য পার্ষদ ভক্তের সহজাত অনুভূতি লইয়া নিজ দণ্ডদ্বারা স্থানটিকে একাধিকবার খুব জোরের সহিত আঘাত করিলেন যাহাতে সেখানে উপস্থিত লোকজনদের মনে কোন উঁকিমারা সমস্ত প্রকার সন্দেহ বিদূরিত হয়।

তাঁহার ভজন কুটি (আশ্রম) দর্শনে আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম জানাইয়া অনেক লোক প্রণামী স্বরূপ কিছু অর্থ সেখানে রাখিয়া যাইতেন। সেই গুলিকে একটি পাত্রের মধ্যে জমা করা হইত। তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ব্যক্তি মাঝে মাঝে তাহা গণনা করিতেন। যদি সে কোন কারণে তাহা হইতে কিছু লইয়া খরচ করিত, তৎক্ষণাৎবাবাজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেন মোট অর্থ হইতে

সেই পরিমাণ অর্থ কম হইতেছে কেন, যদিও অর্থ সমুদয় রাখা ও গণনার ব্যাপারে তাঁহার কোন ভূমিকা নাই। উপরন্তু তাঁহার চক্ষের ভ্রূদ্বয় জোড়া হইয়া যাওয়ায় চক্ষুদ্বয়কে আবৃত করিয়া রাখিতেন যে জন্য কিছু দেখিতে হইলে সেই আবরণটিকে তুলিয়া ধরিতে হইত। সেই সাধুর সহজাত অন্তর্দৃষ্টি আছে দেখিয়া পরিচর্য্যারত ব্যক্তিটি সেই অভ্যাস ত্যাগ করিল। বাবাজী মহারাজ যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই মত সেই অর্থ ব্যয় করিতেন।

একবার তিনি দুইশত টাকা খরচ করিয়া রসগোল্লা ক্রয় করিয়া সেইগুলি কুকুর ও গাভীগণের মধ্যে বিতরণ করেন; কিন্তু মেকী বাবাজীদের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না, তাহাদিগকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করিতেন; তাহাদের কাহাকেও আশ্রমে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

শাস্ত্রানুমোদিত ও গুরু পরম্পরা ক্রমে পালিত কোন বিধি কাহাকেও লঙ্ঘন করিতে দেখিলে তিনি অতীব রুষ্ট হইতেন। একদা এক স্বকথিত (ভণ্ড) বাবাজী নিজেকে স্বয়ং শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজীর শিষ্য বলিয়া চালাইয়া (জগন্নাথদাস) বাবাজীর সেবকের মারফত সংগৃহীত তাঁহার ব্যবহৃত এক কম্বলের দ্বারা গোপনাঙ্গ আবৃত করিয়া মহামন্ত্রের বিকল্প স্বরূপ এক অননুমোদিত মূল্যহীন বাজে ছড়া একদল বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে গান করিতে করিতে সেই বাবজী মহারাজের কুটীরের দিকে আসিতেছিল। সাধু মহাজন তাহা শ্রবণ করিবা মাত্র তাঁহার নিকটস্থ লোকজনকে সেই দলকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বলিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভক্তি ধর্মের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন এমনই কঠোর ও কোন প্রকার দুর্নীতিকে বাধা প্রদানের চেষ্টায় এমনই উৎসাহী ছিলেন।

পৃথিবীতে অবস্থানের শেষের দিকে তাঁহার সেবকের স্কন্ধে আরোহণ না করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে পারিতেন না, সেই সেবককে ভণ্ড বাবাজীগণের অসৎসঙ্গে পড়িয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে সাবধান করিতেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেও সঙ্কীর্তন চলাকালে তিন-চারি হস্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া লম্ফ প্রদান করিতেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত করিলেন যে ভক্তিমূলা ভাবাবেশে বৈষ্ণবগণ দৈহিক প্রতিবন্ধকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারে।

এই বৈষ্ণব সার্বভৌম এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিতেন না যে বৈষ্ণব সাধুগণকে দৈহিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইবে না এবং শুধু অলস ভাবে

মালিকা জপে ব্যাপৃত থাকিবার ভান করিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। সন্ন্যাসী হইতে আগত নবীনগণের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে তাহাদিগকে কৃষ্ণের ও তাঁহার প্রকৃত ভক্তগণের সেবার্থে পরিশ্রম করিয়া সব্জী উৎপাদন করাইতেন।

যখন জানিতে পারিলেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুত্র, যিনি পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে পরিচিত ও চৈতন্যমঠ সহ ভারতে ও ভারতের বাহিরে ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি দ্বাদশ বয়সেই জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তখন শ্রীল জগন্নাথ দাস তাহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব দিবস অনুসারে বর্ষ নিরূপণ করিয়া এমন এক বৈষ্ণব পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতে আদেশ দেন যাহাতে নাম, সপ্তাহের দিবসগুলি ও চান্দ্রদিবস গুলি চৈতন্যের মতবাদ অনুসারে গণনা হইবে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণের মধ্যে মহান্ বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবসের চান্দ্রদিবসগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলেন; শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সেই কার্য্যভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং প্রতি বৎসর 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা' নামে তাহা প্রকাশিত হয়; অদ্যপি শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতি বৎসর সেই পঞ্জিকা প্রকাশ করেন এবং মহাপ্রভুর অনুগামীগণ তাহা অনুসরণ করেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীবনের এক বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই নিবন্ধ শেষ করিব যাহাতে দেখানো হইয়াছে যে ভগবানের প্রতি তাঁহার প্রীতি সমান চক্ষে সকল প্রাণীকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে। খুব বড় একটি থালিতে করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিতে হইত, তাহা তিনি কয়েকটি কুকুর ছানা ও কুকুরকে লইয়া গ্রহণ করিতেন, তাহারা তাঁহার প্রেমের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইত, খাদ্য লইয়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামরি করিত না। সেই সাধু কাহাকেও ঘৃণা করিত না, যদিও গোঁড়া হিন্দু সমাজে কিছুটা অন্ততঃ অবজ্ঞা ছাড়া কুকুরকে দেখা হয় না ও তাহাদিগকে রন্ধনশালার ত্রি-সীমানায় আসিতে দেওয়া হয় না।

শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার মধ্যে ছাতড়া নামক গ্রামে ১২৯০ সালের ১১ই শ্রাবণ তারিখে প্রাতেঃ আটটার সময় মহানুভব কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, কৃষ্ণদাসের বাল্যকালেই সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হৃষিকেশে ভগবানের ভজনোদ্দেশ, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার প্রদত্ত নাম ইন্দ্রচন্দ্র। ইন্দ্রচন্দ্রের আর দুইটী ভ্রাতা ছিলেন এবং দুইটী ভগিনী বর্ত্তমান আছেন। বিনোদপুর নামক গ্রামে ইন্দ্রচন্দ্র মাতুলালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু পিতৃদেব গৃহত্যাগ করায় জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রচন্দ্র পাঠাভ্যাসে বঞ্চিত হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। পিতৃকুলচিত্ত ও নিজ সামান্য ব্যবসায়ের উপার্জ্জন দ্বারা ইন্দ্রচন্দ্র গৃহের ব্যয় নির্ব্বাহ ও মধ্যম ভ্রাতার শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় ভ্রাতাটি প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিয়া পরলোক গমন করেন। পিতার গৃহত্যাগ, ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সুচতুর ইন্দ্রচন্দ্রের সংসারের অকর্ম্মণ্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার উপলব্ধি হইল। তিনি শুদ্ধ পরমার্থপথের অনুসন্ধানে ব্রতী হইলেন। এই নিষ্কপট অনুসন্ধান ফলে তিনি জানিতে পারিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুই জীবের একমাত্র নিরুপাধিক কৃপার দাতা। সেই মহাবদান্যের আশ্রয়ে জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রয়ীতে যাঁহারা আবদ্ধ তাঁহাদের প্রাপত্য অবস্থায় অভাব দেখিবার চক্ষু মুমুক্ষুগণের বৃত্ত আছে। আবার মুমুক্ষুগণের ফল কামনা বা কৈতব শান্তিলাভ না হইলে কাহারও দেখিবার নয়ন উন্মীলিত হয় না। তদ্দেশ প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রণালীর স্থূলতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে তাঁহার চিত্ত পরমোচ্চ সোপানের যোগ্যতায় নীত হইল। তিনি এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হরিপ্রাণময় মহান্ত গুরুর পদাশ্রয়ের বাসনা করেন। ইন্দ্রচন্দ্র অপর দুই বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া পদব্রজে দুইবার শ্রীধাম নবদ্বীপ আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য ইন্দ্রচন্দ্রের বন্ধুদ্বয়ও সরলান্ত করণে মহান্তগুরুর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া ১৩১৪ সালে ও ১৩১৫ সালের প্রারম্ভে তাঁহারা পরমহংস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণু সেবা নিরত পাদপদ্ম দর্শন করেন। তাঁহার করুণাবলে ও উপদেশমতে ইন্দ্রচন্দ্র ও অপর দুই কৃষ্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচয় লাভ করেন। ইন্দ্রচন্দ্রের ভাবি কল্যাণ অবগত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

তাঁহাকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করেন। নির্বিঘ্নে কৃষ্ণভজন করাইবার উদ্দেশে ঠাকুর মহাশয়, ইন্দ্রচন্দ্রের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া ইন্দ্রচন্দ্রকে ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে পরমহংস্য সংস্কার প্রদান করেন। এই কাল হইতে ইন্দ্রচন্দ্র শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী নামে বৈষ্ণব জগতে পরিচিত ছিলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী ডোর কৌপীন লাভ করিয়া বিষয়ী ও বিষয় সমূহকে হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করিয়া ছিলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন। উচ্চঃ কীর্ত্তন করিলেও নির্বন্ধ করিয়া সংখ্যা নাম কীর্ত্তনেরই সম্মান করিতেন। এইরূপে কীর্ত্তন করিলে অনবধানের হস্ত হইতে জীবের ভজনের বাধা ঘটে না শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের এই উপদেশ কৃষ্ণদাসের হৃদয়দেশ অধিকার করে। কৃষ্ণদাসের মধুর কণ্ঠে গীত সংখ্যান্বিত কৃষ্ণনাম যাঁহাদের কর্ণ পবিত্র করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে সাধুমুখোচ্চারিত সুমধুর হরে কৃষ্ণ নামের সহিত প্রাকৃত কৃষ্ণনামের পার্থক্য আসল ও নকল বস্তুর মধ্যে ভেদের সহিত উপমেয়। ১৩১৬ সালের প্রারম্ভে বাবাজী মহাশয় শ্রীআচার্য্য প্রভু ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে শ্রীক্ষেত্রে প্রেরিত হন। সেখানে তিনি দেড় বৎসর কাল ক্ষেত্রবাসী ছিলেন। শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর এতাদৃশ হার্দ্দী করুণা যে কোন পার্থিব বিষয়ীর সঙ্গ কৃষ্ণদাসের হৃদয়কে কলুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। বিষয়ী ভেকধারীর ন্যায় তিনি কোন দিন বিষয়ীর নিমন্ত্রণ বা দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই। মাধুকরী বৃত্তিতেও বিষয়ী পুঞ্জের অল্প বিস্তর বিষয়ী বীজ আছে জানিয়া অবৈষ্ণবের নিকট হইতে কোন বস্তু ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। নিমন্ত্রণ রত বেশধারী উদাসীনগণ যে রূপ দক্ষিণা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যমদণ্ড্য হন, পঙ্গ প্রভৃতি দলবদ্ধ ক্রিয়ার আবাহন করেন, অবৈষ্ণব সমাজের গৃহব্রতগণ হইতে মাধুকরী প্রভৃতি বৃত্তির গ্রহণ প্রশংসা করেন তাদৃশ ভ্রম কখনই বাবাজী মহাশয়কে স্পর্শ করে নাই। শ্রীগৌরহরি একদিন বাবাজী মহাশয়কে পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রাকৃত ভক্তবেশধারী কপট উদাসীনকে তাঁহার নিকট শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে কপটভক্ত সমাজে মিশিতে পরামর্শ দেয় এবং পদব্রজে বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার লোভ প্রদর্শন করে। আরোও বলে যে সম্প্রদায় পরিচর্যা বা গুরুদেবের আশ্রম রক্ষা প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভক্তি কৃত্যও কৃষ্ণদাসের নিজ বিরূপ বিষয়ের অন্যতম। কিন্তু শ্রীগৌরহরির

শুদ্ধকৃপাবলে যখন কৃষ্ণদাস বুঝিলেন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শুদ্ধ বৈভব বিলোপকারী ফল্গু- বৈরাগ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর বা নিজ ফল ভোগপর পদব্রজে ভৌমযাত্রা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক জীবের ভোগপর উন্নতি বিধানকারী কর্মসমূহ, বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা নামক অঙ্গের বিরোধী এবং শ্রীগুরুদেবের সেবা অপর প্রাকৃত বস্তু সেবার সহিত তুল্য নহে, তখনই নির্বোধ কপট বৈষ্ণবের কাপট্যের মূল্য নাই জানিতে পারিলেন। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিয়াও তদুদ্দেশে আলোকচিত্র মূর্ত্তির সেবানুষ্ঠান কৃষ্ণদাসের ক্ষেত্রকৃত্যের অন্যতমতা লাভ করিয়াছিল। শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া একনিষ্ঠ হইয়া বাবাজী মহাশয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট কালাবধি তাঁহার অহর্নিশ ষষ্ঠিদণ্ডকাল সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলে জীব যে রূপ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ সেবায় নিজ শুদ্ধ সত্ত্ববৃত্তির নিয়োগ করেন তাহার সম্পূর্ণ আদর্শ স্বীকার করিয়া আচার্য্য প্রভুকেই সর্ব্বভক্তিমতাং গুরু জানিয়া তাঁহার সেবাই কৃষ্ণ ভক্তির আকর জগৎকে দেখাইলেন। এই সেবাই বীজস্বরূপে বাবাজী মহাশয়ের ভক্তিলতাকে আজ রাধাকুণ্ডতটস্থিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জের অধীশ্বর এবং নিজাধীশ্বরীর চরণ সেবা কুঞ্জের নিত্য পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল। এবং এই সেবাই শ্রীঠাকুরের আশ্রিত অপর ভজনশীল ভক্তদিগের প্রতি কৃষ্ণদাসের অপ্রাকৃত স্নেহের ও তাঁহাদের প্রকৃত কল্যাণের উপায়স্বরূপ দয়ার মূর্ত্তিরূপে হৃদয়ে দেখা দিল। শ্রীঠাকুরের অপ্রকট কালে তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্যোচিত ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম অনুকম্পিত জনের নিশ্চয় কৃত্য সমূহ শ্রীল কৃষ্ণদাসের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঠাকুরের প্রকট কালীয় সেবাফলে কৃষ্ণদাসের অল্প বিদ্যা নদী প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি-রসসমুদ্র শ্রীমদ্ভাগবতে পারঙ্গত করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট জীবন তাঁহাতে দৃষ্ট হয় এবং ভাগবতোচিত হরিসেবা ফলে তিনি আজ শ্রীরূপানুগ ভক্ত শ্রেণীতে অধিকার লাভ করিলেন। গুরুকৃপায় তিনি বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের সূক্ষ্ম পরিচয় বুঝিতেন সম্ভোগবাদের হেয়ত্ব ভক্তে সৃষ্ট হইলে তিনি আতঙ্কিত হইতেন, কর্ম্মীর ভোগপিপাসার রস সম্ভোগেচ্ছা ভক্তির বিরোধী, জ্ঞানীর ত্যাগ পিপাসার হরিনামের ফল শমন দমন প্রভৃতি মুমুক্ষুর বাণীর হেয়তা ভক্তির বিরোধী, মিছা-ভক্তের প্রতিষ্ঠাশাসূত্রে গুর্বভিমান ও ভক্তিপ্রচার ভক্তির অনুশীলনে বিরোধী, ক্রমপন্থা ছাড়িয়া হঠাৎ রসলাভ বা প্রেমপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা, জগতে বিদ্যা অর্থ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অর্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা নিজ ভোগ বা জড়শরীরের সম্পর্কিত

ব্যক্তিগণের উদ্দেশে তাহাদের নিয়োগে ভক্তির ন্যূনতা প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত সমূহে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল কিন্তু ভক্ত সেই গুণগুলি অন্তরে জানিয়া অধিকারী না দেখিলে ব্যক্ত করিতেন না। তিনি কাহারও মনে কোন ক্লেশজনক অপ্রিয় বাক্য কোন দিন বলেন নাই। কাহাকেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করেন নাই বা কাহারও শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান পর্যন্ত করেন নাই। আবার শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি দিব্যসূরিগণের অসংখ্য অনুকম্পিত ব্যক্তি দেখিয়া ও তাদৃশ সঙ্গ তাঁহাদের ভাল হয় নাই এরূপ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের তাহাই কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন।

[তাঁহার অপ্রকটের পর স্মৃতিচারণবাসরে শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতীর প্রতিবেদন]

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয় সেবক শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী বিগত ১০ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৯১৫ সালে কৃষ্ণচতুর্থী দিবসে বেলা দুইটায় ভৌমলোক ত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রভুপাদের শ্রীচরণ কমলোদ্দেশে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ঠাকুরের অনুগত মণ্ডলীর দুঃখ ভাষায় বর্ণনীয় নহে। শ্রীল কৃষ্ণদাসের পরমপবিত্র গুরু সেবাময় আদর্শ জীবনের সৌন্দর্য দ্রষ্টামাত্রেই অভিনব আনন্দ লাভ করিতেন। শ্রীঠাকুরের অভাব জনিত দুঃখভার শুদ্ধ ভক্ত জগৎ কৃষ্ণদাসের প্রসন্ন সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়াই কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতেন। আজ, সেই যাযাবরের নির্যাণে তাঁহাদের হৃদয়ের ক্লেশ একমাত্র শ্রীগৌরহরিই বুঝিতে পারিতেছেন। কৃষ্ণদাস যে লোকে গিয়াছেন তাহাই রূপানুগভক্তগণের সেব্য গোলোকের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ। আমাদের সহিত এই ভক্তপ্রবরের ২০শে ভাদ্র তারিখে শেষ সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি শারীরিক অসুখের কথা জানাইলেন। তাঁহার ন্যায় আত্মীয়জনের ক্লেশের কথা সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা অন্যত্র চলিয়া আসি। বাবাজী মহাশয় স্বীয় জন্মস্থানে পিতামাতার সমক্ষে তাঁহাদের প্রদত্ত শরীর তাঁহাদের নিকট রাখিয়া অষ্টাবিংশ বর্ষ দ্বিমাস পূর্ণ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয়ের সপ্তবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইবার দিবসে তাঁহার প্রভু তাঁহার নিকট হইতে অপ্রকট হন। ভক্ত ঠিক এক বর্ষ দুইমাস পরে স্বীয় প্রভুর সমীপে গেলেন। শরীর ত্যাগ করিবার পূর্বে এই কথা প্রকাশ করেন যে তাঁহার কলেবরের অবশেষাংশ যেন শ্রীধামে প্রেরিত হয় এবং তাঁহার সম্পর্কিত কোন কৃত্যে বিষয়ীর কোন অর্থ যেন কোনপ্রকারে কোনদিন গৃহীত না হয়।

বাবাজী মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীল নরোত্তম দাস যতিবর। শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি অনুষ্ঠান স্বানন্দসুখদ কৃষ্ণে একাদশী দিবসে শ্রীঠাকুরের সমাধির সন্নিহিত প্রদেশে পারমহংস্য বিধানুসারে সম্পন্ন করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাসের কথা কীর্ত্তন করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমাদের জীবন ধন্য হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস, তুমি আজ নিত্যধামে, আমরা তোমার সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া জড়শুদ্ধিতে ও প্রপঞ্চে। তুমি আজ কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য, আমরা বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া অধন্য। তোমার প্রকটকালে তোমার আন্তরিক স্নেহ যেমন আমাদের ভক্তিপথের সোপান ছিল এখনও যেন তোমার তাদৃশ নিত্য অহৈতুকী কৃপা আমাদের ন্যায় হরিবিমুখ জীবে থাকে। তোমার জনক ধন্য ও গর্ভধারিণী ধন্যা। তাঁহারা তোমার ন্যায় শুদ্ধ হরিজন বৈষ্ণবের পিতামাতা তাঁহাদের গৃহধর্মও ধন্য, অন্যের হরিবিমুখ সন্ন্যাসধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার জন্ম ও অপ্রকটস্থান তোমার জন্যই ধন্য হইয়াছে।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীনীলাচল-ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকট বড়দাণ্ডের উপর 'নারায়ণ ছাতা' ভবনে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দের) ৬ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে ৩-৩০ ঘটিকায় মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে মহাপুরুষের সর্ব (৩২) লক্ষণ সমন্বিত একশিশু শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীভগবতীর চতুর্থ সন্তানরূপে আবির্ভূত হন। শিশুর দিব্য অঙ্গে স্বাভাবিকভবে উপবীত লক্ষিত হয়। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক রক্ষিত প্রেমসম্পত্তিসহ তাঁহারই আবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুরে শুভাগমনপূর্বক আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তদীয় শাখাসমূহে সেই প্রেমামৃত স্থাপনপূর্বক জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে পরিবেশনার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। বিমলাদেবীর প্রসাদ দ্বারা শিশুর অন্নপ্রাশন হওয়ায় নাম রাখা হয় বিমলাপ্রসাদ।

তাঁহার আবির্ভাবের ছয়মাস পরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রথ বড়দাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকা কালে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে শ্রীভগবতীদেবী শিশুকে লইয়া রথে উপস্থিত হইলে শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মের দিকে হস্তপ্রসারণ করিলে শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে একটি মালা শিশুর মস্তকে পতিত হয়। পূজারী পাণ্ডাগণ ভবিষ্যৎ-বাণী করিলেন যে কালে এই শিশু এক মহাপুরুষ হইবে। শিশু বিমলাপ্রসাদ গভীর তন্ময়তা সহকারে আদর্শ পিতৃদেব শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখে ভাগবত-বাণী শ্রবণ করিতেন। গৃহে বসিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্য আলোচনার পরিবর্তে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও বিবিধ দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, অথচ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। গণিত, জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্ত্রে বালকের ব্যুৎপত্তি দর্শনে ঐ ঐ শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ বিস্মিত হইতেন ও কেহ বিচারে অগ্রসর হইলে সকলেই পরাজিত হইতেন। বিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় শ্রীরামপুর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি বিক্রিন্তি (Bicanto)-নামক এক প্রকার সহজ লিখন প্রণালী (Short hand) আবিষ্কার করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

গণিত, জ্যোতিষ ও পরমার্থশাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত প্রচারে তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধাদির মধ্যে, বিচারদক্ষতা দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'সিদ্ধান্তসরস্বতী' উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমতিক্রমে শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাঘমাসে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে ভাগবতী-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষাকালে তাঁহার নাম হইল—"শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস।"

বৈষ্ণবানুগত্য ব্যতীত তীর্থভ্রমণে দেশভ্রমণ জনিত পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়। অতএব শ্রীল সরস্বতীঠাকুর প্রণয়ীভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে কাশী, প্রয়াগাদি অনেক তীর্থ দর্শন করেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে গয়া দর্শন পূর্বক ঐ সকল স্থানের যে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন তাঁহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৎকৃত অনুভাষ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণব-পরিভাষার বিবৃতি, বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বৈষ্ণবাচার্যগণের গ্রন্থাবলীর পরিচয়, বৈষ্ণবতীর্থ সমূহের বিবরণ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত পারিভাষিক, দার্শনিক ও কঠিন শব্দ সমূহের আকর-নির্ণয়সহ অর্থ, তাৎপর্য্য সম্বলিত বৈষ্ণব-কোষ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ শহরের 'হরিবোল কুটীর'-এর অধুনা স্বধামগত শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় এই বৈষ্ণবমঞ্জুষার উপকরণগুলি সম্পাদনায় অতীব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ও 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' প্রণয়নে ব্রতী হন ও সম্পাদনা করেন।

শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া শতকোটি মহামন্ত্র জপ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। বঙ্গদেশের আচার্য্য সন্তানগণ স্মার্ত্ত জাতিবাদ লইয়া বৈষ্ণব-গণকে অবজ্ঞা ও নির্যাতন করিতেছিল। এই জন্য মেদিনীপুরে 'বালীঘাই'-নামক স্থানে একটি বিরাট সভার আয়োজন হয়। সভায় শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন দাস গোস্বামী ও গোপীবল্লভ-পুরের পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের আহ্বানে শ্রীসরস্বতী ঠাকুরও উপস্থিত হন। স্মার্ত্তপণ্ডিত নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে বক্তব্য রাখার পর শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহা শ্রবণ

করিয়া স্মার্ত্ত আচার্য্যসন্তানগণ ও ব্রাহ্মণগণ মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হন। সকলেই ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবগণের মহিমা উপলব্ধি করিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে কাশিম বাজারের মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর ভবনে যে বৃহৎ বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন হয়, তথায় শ্রীসরস্বতী ঠাকুর চারিদিন যাবৎ শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু তথায় তথাকথিত প্রাকৃত সহজিয়াগণের সমাবেশ ও কেবলমাত্র লোকদেখানো ভাব দেখিয়া তিনি চারিদিন কিছু ভোজন করেন নাই। চারিদিন উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী জানিতে পারিয়া মায়াপুরে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন ও অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তিনি জানাইয়াছিলেন— অভক্তি বিচার পর বারোয়ারী স্থানে ভোজন করিতে নাই।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ শ্রীগৌর আবির্ভাব দিবসে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১৩২৪ বঙ্গাব্দ ১৩ই চৈত্র) শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্বক শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে অভিহিত হন। একই দিনে শ্রীচৈতন্যমঠকে মিশনের প্রধান কার্য্যালয় করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ এই হিসাবে যে, এই সন্ন্যাস গ্রহণ প্রথা নিজে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তীকালে শিষ্যগণের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারী কার্য্যকলাপ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে।

বৃহত্তর জনসাধারণকে প্রভুপাদের মুখে অসমোর্দ্ধ তেজঃসম্পন্ন শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের সুযোগ দানের জন্য শ্রীকুঞ্জবাবুর ইচ্ছার অনুমোদনক্রমে সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার কলিকাতায় কেন্দ্র স্থাপন করেন ১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই শাখা চৈতন্যধর্ম প্রচারের অতি উত্তমকেন্দ্র হইয়া উঠে। শাখাটির নাম দেওয়া হয় 'ভক্তিবিনোদ আসন'; শহরের ও অন্যান্য স্থানের অতীব উচ্চস্তরের বিদ্বৎমণ্ডলী ও পণ্ডিতমণ্ডলী প্রভুপাদ পরিবেশিত হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন। অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীমতিলাল ঘোষ, 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের বক্তৃতাবলী প্রকাশ করিতেন। খুব অল্পকালের মধ্যে কয়েক জন উচ্চশিক্ষিত যুবক প্রভুপাদের আহ্বানে সাড়া দিয়া মিশনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীগণ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শন ও শ্রীগৌড়ীয় দর্শনকে পৃথিবীর অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করিয়া সারা ভারতময় সারাবৎসর ধরিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। উন্মুক্ত মহতীসভায় বক্তৃতা, বিশাল সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চলিতে লাগিল। ঘরোয়া আলোচনাসভা, পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতিও চলিতে থাকে। ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ, ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিস্বরূপ পর্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যস্বামী মহারাজ প্রমুখ বাগ্মী প্রবক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বহু বৃটিশ গভর্ণর, ভারতের ভাইসরয় শ্রীবন মহারাজের বক্তৃতায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এই বন মহারাজ প্রেরিত হন লণ্ডনে ও ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য স্থানে। ২০শে জুলাই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বন মহারাজ শ্রোতা হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাণীকে পাইয়াছিলেন। বিভিন্ন বৃটিশ ও জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তিনি বক্তৃতা দেন।

এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের কয়েকটি স্থানে ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বহু প্রকাশনা ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনটি মাসিক, দুইটি পাক্ষিক একটি সাপ্তাহিক ও একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, হিন্দি, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে সকল ভাষাভাষীদের জন্য জানাইবার ও জানিবার সুযোগ ছিল। শ্রীচৈতন্যমঠকে প্রধান কার্য্যালয়রূপে ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণকে (যিনি পরবর্ত্তীকালে শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ হইয়াছিলেন) মিশনের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া সকল কার্য্যকলাপ পরিচালনা করিতেন। এই কুঞ্জবাবু নিরন্তর ও অক্লান্ত শুদ্ধসেবা দ্বারা সরস্বতী ঠাকুরের অপর স্বরূপ হইয়া উঠেন ও তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া প্রভুপাদ কিছু করিতেন না।

শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল নিজে আচরণ করিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করা। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ বর্জনই বৈষ্ণবধর্মের পতনের একটি কারণ। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যতক্ষণ না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর, ষড়্‌গোস্বামী-বর্গের ও তাঁহাদের একনিষ্ঠ অনুগামীগণের আচরিত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম সঠিকভাবে তুলিয়া না ধরা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই এই ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাইতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মানুরাগীগণকে জাতিভেদ প্রথার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমপ্রথার উৎস ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে ইহা কোনও আকস্মিক পরিস্থিতি নহে যাহা দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, না শূদ্র তাহা বিচারের মাপকাঠি হইবে। শাস্ত্রের অনুশাসনের উপর বিশ্বাসী হিসাবে তিনি মানিতেন যে প্রত্যেক মনুষ্যেরই ভগবানকে পূজার অধিকার আছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে দীক্ষিত হইতে হইবে ও আনুষঙ্গিকভাবে উপবীত ধারণ করিতে হয়। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বংশানুক্রমিক গুরু গ্রহণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া বলিয়াছিলেন এই প্রথা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের অবনমনের একটি কারণ। এই প্রকার গুরুর শিষ্যগণ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পৃষ্ঠপোষককেই স্বীকার করেন, তাহাতে পারমার্থিক মঙ্গল কিছু হয় না।

শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব ও সারা ভারতের সকল বৈষ্ণব মঠের প্রতিভূগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীসরস্বতী ঠাকুর নিজে ভারতে সকল প্রদেশে প্রচার যাত্রা আরম্ভ করেন। তাঁহাকে গৌড়ীয়-'সম্প্রদায় রক্ষক' বলা হইত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৪ তারিখে বক্তৃতায় তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইত ও নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিত।

দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক প্রচার যাত্রা কালে দার্শনিক ও ধর্মীয়গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেন, যথা 'মধ্ববিজয়', ব্রহ্মসূত্রের উপর মধ্বটীকা 'পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্য', এক প্রস্থ (সেট) পঞ্চতন্ত্র সাহিত্য, মায়াবাদ খণ্ডন, তত্ত্ব-বিবেক, গীতাভাষ্য, জয়তীর্থের 'ন্যায়সুধা', ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত। শেষের এই গ্রন্থ দুইটি প্রভুপাদের কাছে মায়াবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-স্বরূপ ছিল। এইগুলি ব্যতীত রামানুজীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী, বেদান্তের উপর 'শ্রীভাষ্য', রামানুজীয় জীবনী 'প্রপন্নামৃত' ও অন্যান্য সম্প্রদায়-প্রকাশিত ইতিহাস, সাহিত্য সংক্রান্ত তথ্যাদিও সংগ্রহ করেন। চারি সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ে তিনি ছিলেন জীবন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

যে পঞ্চরাত্রকে শ্রীরামানুজসম্প্রদায় তাঁহাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অনুসরণ করেন, প্রভুপাদই সর্বপ্রথম সেই পঞ্চরাত্র সাহিত্যের সংগ্রহ ও প্রচার করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা প্রথা অনুসরণ ও প্রবর্ত্তন করেন —নিজের ও শিষ্যগণের মধ্যে।

তাঁহার মিশনারী কার্য্যকলাপ আরম্ভ হইয়াছিল শ্রীমায়াপুরের এক ক্ষুদ্র কুটীরে ও গুটিকয়েক শিষ্যবর্গ লইয়া; শ্রীমায়াপুরকে তিনি এক ক্ষুদ্র মন্দির নগরীতে পরিণত করিয়াছেন—যাহার মধ্যে আছে অনেক গবেষণামূলক কার্য্যের বিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রচারকগণের প্রশিক্ষণকেন্দ্র; এই স্থানের হৃতগৌরব উদ্ধারের ফলে সারা দেশের তীর্থযাত্রীরা এখানে সমবেত হন।

কলিকাতায় বাগবাজারে নব উদ্‌ঘাটিত গৌড়ীয় মঠে ১৯৩১ সালে তিনি এক অভূতপূর্ব ও বিশাল আস্তিক্যবাদমূলক-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ এই প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করিয়া মন্তব্য করেন ভগবৎবিশ্বাস-মূলক এই প্রদর্শনী যাহা পূর্বে অনুমানও করা যায় নাই, তাহা এই বস্তুবাদের যুগেও গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রকার প্রদর্শনী শ্রীমায়াপুরে, ঢাকায়, পাটনায়, কটকে, কুরুক্ষেত্রে ও অনান্য স্থানেও আয়োজিত হয়।

সারা ভারতে প্রভুপাদ মঠাদি স্থাপন ও শ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানগুলিতে চরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া সকলের জন্য পারমার্থিক বার্ত্তা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। গোস্বামীশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এবং শ্রীমধ্ব ও শ্রীসম্প্রদায়-বিষয়ক ২০০ এর অধিক মূল-গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের উপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ন্যস্ত অসমাপ্ত কার্য্যের ভার নিজ স্কন্ধে তিনি তুলিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার ও আচরণের জন্য তিনি যে সকল পন্থা অনুসরণ করিতেন, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

১। ভক্তিসাহিত্য বিতরণ ও জনপ্রিয় করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে, শ্রীমায়াপুরে, কলিকাতায় ও কটকে ছাপাখানা স্থাপন করেন।

২। ভক্তিমূলক কয়েকটি মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক মোট ৭ খানি পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন।

৩। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব সাধুগণের জীবনী ও শিক্ষা এবং উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে উপদেশাদি উদ্ধৃতি সমেত চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন।

৪। দ্বারে দ্বারে গ্রামে গ্রামে ও ঘরোয়া আলোচনা সভার মাধ্যমে প্রচার কার্য্য।

৫। প্রতি কেন্দ্রে ধর্মীয় উৎসবাদির আয়োজন।

৬। বৈষ্ণবস্মৃতিগুলিকে প্রবর্ত্তন ও জনপ্রিয় করিবার মানসে শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস', শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' প্রকাশ।

৭। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা ব্যবস্থা ও ভগবান বিষ্ণুর পূজার অধিকার প্রদান করার ব্যবস্থা।

৮। বৈষ্ণব শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি প্রকাশ করেন শ্রীজীবগোস্বামী লিখিত সংস্কৃত 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' ওই ব্যাকরণ পঠনের জন্য সংস্কৃত আকাদেমি স্থাপন ও (উপাধি-'ব্যাকরণ তীর্থ') ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা।

৯। সংস্কৃত আকাদেমি বা ভাগবত পাঠশালা বা পরাবিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন ও দক্ষিণ ভারতের উডুপী হইতে দক্ষ পণ্ডিত আনাইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দর্শনশিক্ষার ব্যবস্থাদি করেন।

১০। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর)"-নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা তরুণগণের মধ্যে প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন ও পরবর্ত্তীকালে একটি জুনিয়র বেসিক স্কুলও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নামে স্থাপিত হয়।

১১। প্রাচীন ও অবহেলিত মন্দির ও ধর্ম্মীয় স্থানগুলিকে সংস্কার ও অধিকতর উন্নীত করিবার জন্য এবং সারাভারতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্থানগুলি আবিষ্কারপূর্বক তথায় পাদ-পীঠাদি ও মন্দিরাদি স্থাপনের ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগী হয়েন।

১২। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রবর্ত্তিত 'বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা' পুনরুজ্জীবিত করেন।

১৩। নিজ শিষ্যগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন —অবশ্য সব কিছুই ভগবৎ-উন্মুখী।

শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সারা পৃথিবীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে খুব জনপ্রিয় করিয়া তোলেন, যাহার ফলস্বরূপ এখন সারা পৃথিবীতে শত শত গৌড়ীয়

মঠ ও পূজা-পাঠাদির স্থান আছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে এক মহান সাধু বলিয়া সম্মানিত করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মন্তব্য করেন,—'সরস্বতী ঠাকুরের মত এক মহানপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া সত্যই আমি ধন্য, আমার বিশ্বাস তিনি একাই সারা পৃথিবীতে ভক্তিধর্ম প্রচার করিবেন।' ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর মতো মহান্ নেতৃবর্গও তাঁহার নিকট আসিয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এমন কোনও প্রচারকের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যিনি নিজ জীবনে এইরূপ ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে পারিয়াছেন।

১লা জানুয়ারী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তিরোভাব-লীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ

১৯ চৈত্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দে, ইংরাজী ২ এপ্রিল ১৮৯৪ সোমবার, বৈষ্ণব পিতা শ্রীরাইচরণ দাসের আত্মজ শ্রীকুঞ্জবিহারী আবির্ভূত হন যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার কালিয়া থানার অন্তর্গত চাঁচুড়ি-পুরুলিয়া গ্রামে। পিতৃদত্ত নাম উমাপতি, তাঁহারা দুই ভাই, কনিষ্ঠ শ্রীগণপতি। পঞ্চম বয়সে পদার্পণ কালে শুভদিনে তাঁহার হাতে খড়ি হয় গৃহদেবতা শ্রীগৌরনিতাই ও শ্রীগিরিধারীর সমক্ষে।

১৯১১ সালে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া উমাপতি আসেন কলিকাতায় কলেজে ভর্ত্তির উদ্দেশ্যে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে পিতৃদেবের দেহাবসান হওয়ায় কলেজে পড়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধা মাতার সেবা-শুশ্রূষা ও গৃহকর্ম দেখাশোনার জন্য সংসারের ভার লইতে হয়; সেই সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পড়াশুনার দিকে নজর দিতে হয়। ডাকবিভাগে অফিস এ্যাসিস্‌টেণ্টের-পদে এক চাকুরী গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব মাতা-পিতার গৃহে পালিত উমাপতি নিরামিষ আহার, বৈষ্ণব তিথ্যাদি পালন, সকাল সন্ধ্যা হরিনাম, তুলসীতে জল দান প্রভৃতি বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলেন; সদ্‌গুরু লাভের উদ্দেশ্যে পাহাড়ীবাবা, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি স্থানে ঘোরাঘুরি করিয়া প্রকৃত ভগবদ্ভজনের সন্ধান পাইলেন না। এক নিকট আত্মীয়ের পরামর্শে তিনি নবদ্বীপে আসিলেন, সেখানে তাঁহার পূর্বপরিচিত শ্রীসখীচরণ রায়ের পরিচিত এক গোসাঞির গৃহে উঠিলেন। কিন্তু গোসাঞির গৃহে আমিষ আহারের ব্যবস্থা দেখিয়া, তথা হইতে চলিয়া আসিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনে আসেন। তখন ইংরাজী ১৯১৪ সাল। বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত দাস (প্রভুপাদ)। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পরবর্ত্তী ফাল্গুন পূর্ণিমার উৎসবে (১৯১৫ সালে) তিনি শ্রীমায়াপুরে আসেন। ব্রজপত্তনে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সে সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ।।" প্রভৃতি পয়ার সমূহ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন; বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে অকপট, নির্মল চরিত্রবান, শাস্ত্রজ্ঞ আছেন প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অধিকতর জানিতে আগ্রহী হইয়া উঠিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উত্থান একাদশী দিবসে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কোলদ্বীপে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন; তাঁহার দর্শনে আসিয়া তিনি দ্বিতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন এবং দুই দিন পরে শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে দুই ঘন্টা হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া এমনই আকৃষ্ট হয়েন যে তিনি দুইমাস ছুটি লইয়া আসিয়া একান্তভাবে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ গ্রহণ করিতে থাকেন। ভক্ত ভাগবতগণের উজ্জ্বল চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যখন তুলনামূলক-ভাবে কৃষ্ণভক্ত অসদ্‌গণের বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করিতেছিলেন সেই সময় কুঞ্জবিহারীবাবু (উমাপতি) যাঁহাদিগকে মহাপুরুষ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মহাপূরুষ ত' দূরের কথা, কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত পর্য্যায়ে পর্য্যন্ত স্থান পাইবার অযোগ্য লক্ষ্য করিয়া প্রথমতঃ তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিবার অভিলাষ করেন; কিন্তু শ্রীপরমানন্দ প্রভুর অনুরোধে আরও কয়েক দিন থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণের পর এমনই শ্রদ্ধান্বিত হয়েন যে, শ্রীল প্রভুপাদের চরণে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে দীক্ষালাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তি তাঁহাতে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হওয়ায় তিনি উল্লাসভরে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে প্রার্থনা জানাইলেন—"প্রভুপাদ! এইস্থানে আসিয়া কয়জন লোক আপনার এই অসমোর্দ্ধ-তেজঃসম্পন্ন শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য পাইবেন? সুতরাং কলিকাতায় আপনার অবস্থানে ব্যবস্থা হইলে বিভিন্ন স্থানের শ্রদ্ধালু জনগণ আপনার হরিকথা শ্রবণে ধন্য হইবেন।"

প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পরেশনাথ মন্দিরের নিকট ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন-রোডস্থ বাটীটি মাসিক ৫০ টাকায় ভাড়া লইয়া তথায় 'ভক্তিবিনোদ আসন' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্বল্পবেতনের সরকারী চাকুরিয়া শ্রীকুঞ্জবিহারী বাবু শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচারের জন্য সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গুরুসেবা-বুদ্ধি ও হৃদয়ে হরিকথা প্রচারের এক অতুলনীয় উৎসাহের ফলে প্রকাশিত হইল এক অমূল্যরত্নের খনি এবং তাহাই হইল—শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের মহাযজ্ঞপীঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপনের সর্বপ্রথম ভিত্তি। ঋণ করিয়াও গুরুসেবার ও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের যে উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ আসনেই সর্বপ্রথম 'শ্রীগৌড়ীয় মঠ' স্থাপিত হয় ও তাহা শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রথম শাখা। এই স্থানেই প্রবর্ত্তিত হয় সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র 'গৌড়ীয়'—প্রবর্ত্তক শ্রীল প্রভুপাদ। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্নের সম্পাদনায়।

অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষের শ্রীব্যাসপূজার প্রত্যভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-সম্বন্ধে স্বয়ং বলিয়াছিলেন—"যাঁহার অনুপম সেবাপ্রবৃত্তি নরলোকে দুর্লভ, যিনি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটদিবসে তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ-রূপে নয়নপথে দর্শন দিয়া পরে আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ দেন নাই, তিনি সকল সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমার শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ 'কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হউক' এই ব্যাক্যের সর্বতোভাবে সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহারই কুঞ্জে বিহারের জন্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক-সম্প্রদায় ধাম-সহ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই একটি চেষ্টা—এ বৎসরের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়; উহা "গৌড়ীয়মঠ-প্রদর্শনী"-নামে ত্রিগুণতাড়িত জনগণের জন্য অর্চামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ..... সেই অকৃত্রিম স্নেহবিগ্রহের শাখা-প্রশাখা-সূত্রে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা শ্রবণ-কীর্ত্তন-বারিতে সিঞ্চিত হইয়া যে কুঞ্জ স্থাপন করিবে, সেই কুঞ্জেই কুঞ্জবিহারী "দীব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ"-শ্লোকোক্ত শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধরের সহিত "তামালিভিঃ পরিবৃত ইদমেব যাচে"-এই সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমের প্রকট করাইবেন। সেই স্নেহবিগ্রহের ধামের "কুকুর" হইতে পারিলে আমার জীবন ধন্য জ্ঞান করিব।"

পুনশ্চঃ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ রবিবার সন্ধ্যায় স্বধামগত শ্রেষ্ঠার্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন-বিরহ স্মৃতি সভায় শ্রীল প্রভুপাদ নিজ প্রকটলীলায় শেষবক্তৃতায় আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী পরবিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর আনুগত্যেই সকল মঙ্গল হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য সর্বসমক্ষে বলিয়াছেন,—শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রচুর পরিমাণে জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলে তাঁহাদেরও প্রচুর মঙ্গল হইবে।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের অণুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্যমের দ্বারা কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

১। আচার্য্যত্রিক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্পাদক, হইতেছেন মূল স্তম্ভ।

২। তিনি গৌড়ীয় মঠ সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ও সমৃদ্ধির কারণ।

৩। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদি শিল্পী।

৪। তিনি গৌড়ীয় মঠের পরমভাগবত ভক্তচূড়ামণিরূপ মূল্যবান কণ্ঠহারের মধ্যমণি।

৫। তিনি শ্রীগুরুদেবের আদর্শসেবার মূর্ত্ত প্রতীক ও শ্রীগুরুদেবের প্রেষ্ঠমূর্ত্তি।

৬। যে সব ধর্মপ্রবক্তা শ্রীগুরুসেবা বিষয়ে উপদেশাদি দান করেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অগ্রণী এবং সহনশীলতা ও অধ্যবসায়ের মুকুটমণি।

৭। শ্রীগুরু ও শ্রীহরির পারমার্থিক সেবার জন্য সমগ্র জগতের লোককে আহ্বানের প্রভাতী ঘণ্টা স্বরূপ ভাগবত প্রহরী।

৮। তিনি সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধুবর।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খৃঃ (বৃহস্পতিবার) শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের দিবস যে সকল কথা Guiding Principle-স্বরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত হইল; —

"Form a Governing body of 10 to 12 persons for Management of Mission work but Kunja Babu will manage so long as he lives.

Kunja Babu's sympathy for me brought me in connection with so many persons. His intelligence excelled all. His sympathy for me knows no bound.

I advise you (Kunja Babu) to be courageous and callous, as I am callous to all. This should be your guiding principle.

I told the other day and again I say Kunja Babu should be respected by all as long as he lives.

Not to quarrel with one another.

বাসুদেব যেন কিছু কথা লেখালেখি করে। সুন্দরানন্দও প্রোফেসার বাবুকে যেন সাহায্য করে।"

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের অল্প দিনের মধ্যে ক্ষমতা দখলের বিবাদ এমন পর্য্যায় চলিয়া যায় যে, কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হওয়ার ফলে মঠ ভাগাভাগি করিয়া নিষ্পত্তি হয়। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, মঠের প্রধান কার্য্যালয়—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান, মায়াপুরস্থ সমগ্র মঠের এবং আরও অনেকগুলি মঠের দখল লাভ করেন। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের সভাপতি-আচার্য্য হয়েন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে দখল পাওয়ার পর তাঁহাকে খুব দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। সে সময়কার তাঁহার মনোভাব একটি পত্রে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'১৯৩৭ সালে আমার গুরুদেব প্রভুপাদের অপ্রকটের পর, শ্রীচৈতন্যমঠ রক্ষার জন্য আমি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, তথাপি আমি প্রশান্ত। আমার জীবনটাই এক বিরামবিহীন সংগ্রাম। শ্রীগুরুদেবের মহান শিক্ষাগুলি প্রচারের জন্য ও শ্রীচৈতন্যমঠের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে এতই নিবিড়ভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, যে আমার মাথায় অন্য কোন চিন্তা লওয়া সম্ভব ছিল না, তা' সে যেমনই হউক না কেন, একমাত্র তাঁহার সেবা ব্যতীত। আমার নিজের উপর নির্ভর করিবার মত যথেষ্ট সাহস আছে এবং তাঁহারই কৃপায় যে কোনও বিপদে ও সকল সময়ে তাঁহার কৃপাই আমি লক্ষ্য করি।' দখল পাওয়ার পরবর্ত্তী গৌরজয়ন্তী দিবসে অর্থাৎ ২৫ মার্চ ১৯৪৮ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; নাম হয় ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ।

যেখানেই ধর্মসভা আহ্বান করা হইত, সেইখানেই শ্রীল তীর্থ মহারাজ বক্তা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে আয়োজিত দেশপ্রিয় পার্ক ময়দানে এক বিরাট জনসভায় দুই লক্ষাধিক জন সমাগম হয়, তাহাতে শ্রীল তীর্থ মহারাজ যখন বক্তব্য রাখার জন্য দণ্ডায়মান হন, তখন সমুদ্রতুল্য জনতার মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। কলিকাতায় থাকাকালীন তিনি সূর্য্যোদয়কাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত হরিকথা পরিবেশনে নিযুক্ত থাকিতেন, ক্লান্তি দেখা যাইত না তাঁহার মধ্যে। তিনি বলিতেন,—'যদি আমি এক টাকাও দান পাই, তাহার মধ্যে বারআনা আমি প্রচার ও প্রকাশনার কার্য্যে ব্যয় করি ও চারিআনা মঠ পরিচালন কাজে। আমার ব্রহ্মচারীরা মনপ্রাণ দিয়া ধর্মপ্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং এই কার্য্যেই তাঁহারা উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সেবাভার গ্রহণের পর শ্রীমায়াপুর হইতে

মাসিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়', কলিকাতা হইতে হিন্দি 'গৌড়ীয়', মাদ্রাজ হইতে ইংরাজী 'গৌড়ীয়', গুন্টুর হইতে তেলেগুভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতে থাকে। মঠের বহুল পরিমাণ প্রকাশনার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠে 'নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'-এর পুনঃ প্রচলন করেন। তাহাতেও যথেষ্ট না হওয়ায় কলিকাতায় আরও একটি প্রেস চালু করা হয়। মাদ্রাজ হইতেও ইংরাজী ও স্থানীয় ভাষায় বহু গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হইতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতে যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানেই জনসাধারণ আন্তরিকতা-সহ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেখানেই গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিবার জন্য, কিন্তু যথোপযুক্ত লোকবল অভাবে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে গুন্টুরে একটি মঠ স্থাপিত হয়।

শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির স্থাপনের পর তাঁহারই সম্মুখে 'শ্যামকুণ্ড' খনন করান। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য শ্রীবাস অঙ্গনে অদ্বৈত আচার্য্য ভবনের সন্নিকটে গদাধরের মন্দির স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সরকারের সহায়তায় শ্রীধাম মায়াপুরে আসার পথের প্রায় ৮ মাইল রাস্তাটি পাকা করাইয়া লয়েন। ১৫ জুলাই ১৯৫১ খৃঃ শ্রীল তীর্থ মহারাজ পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধিসংলগ্ন স্থানে শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫১ খৃঃ তিনি রামানন্দ গৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে একটি সুন্দর মঠ থাকা সত্ত্বেও শ্রীল তীর্থ মহারাজ বৃন্দাবনে একটি মঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি গৌড়ীয় সারস্বত আশ্রমের শ্রীমদ্ বি. এস. সিদ্ধান্তী মহারাজের নিকট হইতে বৃন্দাবনের মঠটি প্রাপ্ত হইয়া ১.৬.১৯৬০ খৃঃ সেই মঠের এক দলিল সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ডায়মণ্ডহারবারে শ্রীচৈতন্যমঠের এক শাখামঠ স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবনের শ্রীরাধাবিনোদ জীউ মন্দির ও পশ্চিমবঙ্গে বসিরহাটের শ্রীগৌড়ীয় মঠটিও শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা হিসাবে যুক্ত হয়।

মাদ্রাজের গৌড়ীয় মঠটি শহরের মধ্যে এক দর্শনীয় ধর্মীয় কেন্দ্র এবং ইহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ২২ জুলাই ১৯৫৬ সালে ২৯/এ/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোডেতে একটি মঠ স্থাপিত করিবার পরবর্ত্তীকালে ২৯শে জুন, ১৯৬৪

সালে শ্রীল তীর্থ মহারাজের এক মহান কীর্ত্তি 'শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট' স্থাপন।

সাধারণভাবে বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বাণী বহুলভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্বপ্রথম অনুভব করেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচার-যাত্রার ঠিক প্রাক্কালে এক স্বপ্নে দেখেন যে, এক বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে এবং সেখানে তাঁহার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ এক বিশাল গ্রন্থাগার কক্ষে গবেষণাকারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত রহিয়াছেন। ১৫ জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে ৭০-বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬ এ যে জমিটি পাওয়া গেল তাহা ১৪ মার্চ ১৯৫৮ সালে রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর, ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ এস্. রাধাকৃষ্ণাণ এক বিশাল সমাবেশে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কালে বলেন—"যে ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তি-প্রস্তর আমি স্থাপন করতে চলেছি, সেই প্রতিষ্ঠান আবহমান কাল হইতে প্রাপ্ত আমাদের ঐতিহ্য যাহার ব্যাখ্যাতা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাহা সংরক্ষণের চেষ্টা করিবে—সেই সকল সত্য, যাহা আমাদের টিকিয়া থাকিতে হইলে যে নূতন পৃথিবীর বুনিয়াদ রচনা করিবে, তাহা অবশ্যই এই জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই আমার প্রত্যাশা যে, এই ইন্‌ষ্টিটিউট নিত্য সত্য ও প্রেমের বাণী ছড়াইয়া দিবে।"

২৯ জুন, ১৯৬৪ সালে এই শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি ডঃ এস্. রাধাকৃষ্ণাণ বলেন—"যে কোনও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট যদি ধর্মকে সম্মানার্হ, মর্য্যাদাযুক্ত ও সংস্কৃতিবান লোকের দ্বারা অনুশীলিত হওয়ার মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে প্রকৃত ধর্ম্ম কি। এই তিনটিকে স্থির করিতেই হইবে"—বক্তৃতার পর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে তিনি এই ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্বোধন করেন।

শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ভারতের অনেকগুলি স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পূর্বে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনটি উল্লেখযোগ্য স্থানে যথা—তিরুপতি, শ্রীরঙ্গম ও শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ের মূলকেন্দ্র উডুপীতে পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা পূরণের জন্য ১৯৫৮ ও ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে শ্রীরঙ্গমে ও তিরুপতিতে তিনি সেই সেই মঠকর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশিত স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন স্থাপন করেন।

অসংখ্য সংস্থা হইতে তাঁহাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়; কয়েকটি উল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে, যথা—২রা আগষ্ট ১৯৫৫, মাদ্রাজ পৌরসভা; উডুপী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল—৭ নভেম্বর, ১৯৫৭; তঞ্জোর মিউনিসিপ্যালিটি —২৭ অক্টোবর ১৯৫৬; কুম্ভকোনম্—২৬ অক্টোবর, ১৯৫৭; মাদুরাই—৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬; গুন্টুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল—১৫ জানুযারী, ১৯৫৯; মহীশূর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল—৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯; বিজয়ওয়াড়া—২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯; এতদ্ব্যতীত উত্তর ভারতে কানপুরে, সীতাপুরে, পোরবন্দরে প্রভৃতি স্থানেও নাগরিক সম্বর্ধনা জানান হয়।

১৯৬০ সালে ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীসহ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করেন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. কামরাজ ও লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডঃ পি. ভি. চেরিয়নসহ অন্যান্যেরাও আসিয়াছিলেন।

১৩ই আগষ্ট ১৯৬০, মাদ্রাজ কেন্দ্র হইতে শ্রীল তীর্থ মহারাজের এক বেতারভাষণ সম্প্রচারিত হয়।

২৩, ২৪, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১তে শ্রীগৌড়ীয় মঠ মাদ্রাজে আয়োজিত হয় 'সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন'; এই সম্মেলন বর্ত্তমানযুগে বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। ভারতের বিভিন্ন মুখ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্বন্ধে আদান প্রদানের সুযোগ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। মূল চারি সম্প্রদায় (যথা শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক) আচার্য্যদেব শ্রীতীর্থ মহারাজকে এক প্রকৃত বান্ধব, ভ্রাতা, অভিভাবক, নির্ভীক-প্রচারক ও বৈষ্ণবদর্শনে মর্য্যাদা ও গৌরবের ধ্বজাধারী বলিয়া অভিহিত করেন; অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন বল্লভী, স্বামী নারায়ণ, রামানুজীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ও। সকল সম্প্রদায়ের প্রধানগণ এই অনবদ্য সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীল তীর্থ মহারাজকে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডঃ পি.ভি. রাজা মান্নার সম্মেলন উপলক্ষ্যে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন—যাহা ১৭ দিন পর্য্যন্ত উন্মুক্ত ছিল এবং যাহা তিন লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ করেন। ১২০ পৃষ্ঠার একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মঠের সুবর্ণজয়ন্তী

(৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ মার্চ ১৯৬৯)

আচার্য্যপাদ শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ স্বীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদুকা শিরে বহন করিয়া ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ খৃঃ শ্রীব্যাসপূজা দিবসে এক ঐতিহ্যময়ী শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ ভজন, ভগবৎ-কথাদি পরিবেশিত হয়। তৎপরবর্ত্তীতে শোভাযাত্রাসহকারে নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন দশ সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ। ২রা হইতে ৪ঠা মার্চ পর্য্যন্ত সর্ব-ভারতীয়-ধর্ম-সম্মেলনে ভারতের বিভিন্নাংশ হইতে আগত দশ সহস্রাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিকবৃন্দ বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী, বহু বিচারপতি প্রমুখ বহু জ্ঞানীগুণীজন বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশন এই সবের তথ্য সংগ্রহ করেন।

সমাগত অতিথিবর্গকে স্বাগত জানাইয়া শ্রীল তীর্থ মহারাজ বলেন,—'শ্রীগুরুদেব ১৯১৮ সালে অনধিক ২৫ জন বিশ্বস্ত শিষ্যবর্গকে লইয়া এই স্থান হইতেই তাঁহার মিশনারী জীবন আরম্ভ করেন ও ৬৪টিরও অধিক মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করেন সারা ভারতময় ও বিদেশে—কুরুক্ষেত্র হইতে মাদ্রাজ, বোম্বাই হইতে পুরী শত শত শিক্ষিত যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মিশনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই স্থান হইতেই বাণী প্রেরিত হইয়াছে সারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিশ্বের সর্বত্র।'

সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত ভাগবত প্রদর্শনী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রতিষ্ঠাতার শতবার্ষিকী

এক বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠান সূচীর পরিকল্পনা লইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার তদনীন্তন রাজ্যপাল শ্রী বি. ডি. জাট্টি—মায়াপুরে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ সালে।

একটি স্পেশাল ট্রেনে এক সর্বভারতীয় প্রচার-তথা-তীর্থভ্রমণের আয়োজন করা হয়; পাঁচ শতাধিক ভক্তগণকে লইয়া চারিধামসহ সারা ভারতের শহর ও

নগর ভ্রমণ, —যাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি দর্শন, সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে প্রচার; সময় লাগিয়াছিল পূর্ণ চারি মাস।

উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রী বি.ডি. জাট্টি কর্ত্তৃক নিজ রাজভবনে (ভুবনেশ্বরে) যে অভ্যর্থনা জানান হইয়াছিল, যে সাদর ও হার্দিকসম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পুরীর বেদভবনে, যে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন মাদ্রাজ, মাদুরাই ও বাঙ্গালোরের নাগরিকবৃন্দ,—তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীল তীর্থ মহারাজের নিয়ামকত্বে কলিকাতায় কালীঘাট পার্কে এক বিরাট পারমার্থিক প্রদর্শনী ও নিখিল ভারত সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ হইতে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭৪। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস। ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে ভারতের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি শ্রীগোপাল স্বরূপ পাঠক মহাশয় প্যাণ্ডেলে 'অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধর্মীয় সম্মেলন' উদ্বোধন করেন। সভার সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে উত্তর-প্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ দাস এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র।

শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ স্থির করেন যে, সারাদেশে যতগুলি গৌড়ীয় মঠ আছেন সেগুলির প্রত্যেকটিতে বৎসরে অন্ততঃ একবার পরিদর্শন করিবেন ও বড় বড় সভা করিয়া উৎসবাদিও করিবেন। সম্বৎসর ধরিয়াই দলে দলে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুদূরতম গ্রামে গ্রামেও পাঠাইবেন। তিনি বর্ত্তমান দিনের পৃথিবীর আন্দোলনকে খুব গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিতেন। লোকজন রাজনৈতিক জগতে ডুবিয়া আছে। এমনই দয়ার্দ্র তিনি যে বড় রাজনৈতিক প্রধানগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহতী সভাদি অনুষ্ঠিত করিতেন এবং সেই সময় তাঁহাদের শত শত অনুগামীগণও আসিয়াছেন; সে সময় তিনি খুব দক্ষতার সহিত সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে যদি ভারতকে বাঁচিতে হয় তবে তাহার হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, তবে তাহা জড়-জাগতিক সমৃদ্ধির দ্বারা নহে, পরন্তু অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলনের সাহায্যে। তিনি বলেন,—'জাতির মৃত্যু সেই দিনই ঘনাইয়া আসিবে যে দিন পারমার্থিকতার বিলোপ-হইয়া জড়বাদ বৃদ্ধি পাইবে।' তাঁহার ধারণা

এই যে ধর্মীয় ক্ষেত্র হইতে রাজনৈতিক জনগণকে বাদ দিলে হইবে না; পরন্তু আমাদের দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে যথাযথভাব নির্দেশাদি দিতে হইবে, যাহার সুদৃঢ়ভিত্তির উপর আমাদের জাতিকে গঠন করিতে হইবে।

পুরীতে পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের উদ্বোধন কালে ইমার মঠের মহান্ত শ্রীমদ্ গদাধর রামানুজ দাস, দেওঘর বালানন্দ মঠের মহান্ত শ্রীমোহনানন্দ মহারাজ, শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী জি. সি. পারিগা, এস্. ডি. ও. শ্রীসত্যবাদী পাণ্ডা, সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপট্টনায়েক, ময়ূরভঞ্জের প্রাক্তনমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাধর মহান্ত, আমেরিকার মিঃ সান্‌লুলু ও আমেরিকার দার্শনিক পি. এল. পিয়াং প্রমুখ শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম বিষয়ে তাঁহার কাছে শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৯৫২ সালে ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণান্তর তিনি সীতাপুরে খুব জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর আসেন এলাহাবাদে। ১৯৫৩ তে তিনি ছিলেন মাদ্রাজে। পুনরায় ১৯৫৪তে এখানে আসার সময় হিন্দুগণ, ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি, 'ফেলোশিপ অপ ফেথস্'-এর সম্পাদক মি. এস্. এম. ফসিল তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী বিষয়ে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

১৯৫৫ সালে শ্রীল তীর্থ মহারাজ উত্তরভারত পরিভ্রমণকালে সীতাপুরে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি হলে 'ভাগবতধর্ম' সম্বন্ধে ১৯, ২০, ২১ এপ্রিল বক্তব্য রাখেন। গোণ্ডা শহরে হনুমান মন্দিরে ২৪, ২৫, ২৬ এপ্রিল সেখানকার থমসন ইন্দার কলেজে বক্তৃতা দেন। ১০ মে কান্দিতে ৭ দিন অবস্থানের পর, ১১ ও ১২ তারিখে বহরমপুরে এক মহতী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ৯ সেপ্টেম্বর, কলিকাতার ২০৬ বিধান সরণীতে উইমেন্স কলেজে অধ্যাপক ও ছাত্রীগণের সমক্ষে বক্তব্য রাখেন। ১৬ অক্টোবর কলিকাতার চারুচন্দ্র কলেজে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি. সি. সেনের সভাপতিত্বে এক সভায় বক্তৃতা করেন। ১০ অক্টোবর (১৯৫৫) ঢাকা মঠে আসিয়া পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন ও অন্য দুই মন্ত্রী শ্রীবসন্ত কুমার দাস ও মধুসূদন সরকার আসিয়া মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে 'সর্বভারতীয় সর্বধর্ম সম্মেলনে' সারা ভারত হইতে আগত দশ সহস্রাধিক জন সমক্ষে শ্রীল তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা দেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের রজতজয়ন্তী

১৯৫৬ সালে মাদ্রাজ মঠ রজতজয়ন্তী পালন করেন। অনুষ্ঠান-সূচী ছিল ৭ দিন মাদ্রাজে ও ৭ দিন শ্রীরঙ্গম ও মাদুরাইতে। মাদ্রাজ অনুষ্ঠানের পর শ্রীল মহারাজ শ্রীরঙ্গমে যান। মিউনিসিপ্যাল হলে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক স্বাগত ভাষণ প্রদান করা হয়। মাদুরাইতে শ্রীআচার্য্যদেবকে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে এক স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হয়। বিখ্যাত মীণাক্ষিমন্দিরে পূর্ণকুম্ভ ও বেদমন্ত্র উচ্চারণসহ মন্দির দ্বারে পুরোহিতগণ তাঁহাকে স্বাগত জানান। স্বর্ণদণ্ড হস্তে ও কারুকার্য্য শোভিত ভেলভেটের ছত্রসহ দ্বারে বহু সুসজ্জিত মানুষ দণ্ডায়মান ছিলেন; দ্বারে দুইটি সুসজ্জিত হস্তীও ছিল তাহারা শুণ্ড উত্তোলন ও শব্দ সহকারে মহারাজকে অভিবাদন জানায়। বিশেষ সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ মহারাজের মস্তকে এক রেশমী বস্ত্র বাঁধিয়া দেন প্রধান পুরোহিত।

শ্রীল মহারাজ ৩১ অক্টোবর হইতে ১৬ নভেম্বর ১৯৫৬ পর্য্যন্ত একটি বৃহৎ দল সহ সীতাপুর, গোণ্ডা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, নৈমিষারণ্য পর্য্যটনকালে সর্বত্রই শত-সহস্র জন সমক্ষে বক্তব্য রাখেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ রাধাকমল মুখার্জী শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বাগত জানাইয়া বলেন যে—

"উত্তরপ্রদেশ বাংলার শ্রীচৈতন্যদেবের আন্দোলনের কাছে দুইটি বিষয়ে ঋণী, যে আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা শ্রীল তীর্থ মহারাজ। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুগামীগণ লোক-বিস্মৃত বৃন্দাবনের স্থানটি উদ্ধার করিয়া তাহার পবিত্রতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ব্রজভূমি সর্বভারত হইতে আগত ভক্ত তীর্থযাত্রীগণের এক জনপ্রিয় স্থান। দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীতে একটা পারমার্থিক পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা জানিয়েছে। ভগবান ও মানুষের মধ্যে প্রেম-লীলা ভগবৎ সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে প্রেমকে উন্নত বৈষ্ণবদর্শনের পটভূমিকায় স্থাপিত করিয়াছে এবং যাহা শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।"

ঐ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে উত্তর ভারতে রামানুজসম্প্রদায়ের একটি বৃহৎকেন্দ্র বেরিলীতে ১১ তারিখে এক সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বক্তৃতা দেন; ১৩ তারিখে বেরিলী কলেজে ও ১৪ তারিখে ডঃ পি. এন. গুহের বাসভবনে এক বিশাল জনসমক্ষে ও ১৫ তারিখে ডঃ এস্. এন. চ্যাটার্জীর বাসভবনে ও ১৬ তারিখে রোটারী ক্লাবের এক সভায় বক্তৃতা দেন।

১৯৫৭ সালে দক্ষিণদেশে প্রচার-তথা-তীর্থযাত্রার প্রাকালে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এক বাণী প্রচার করেন।

আমার লক্ষ্য

'জীবনে আমার লক্ষ্য মানুষের শুদ্ধ-স্বচ্ছ হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করা; ভগবানকে শুধু ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা শিক্ষাদানের জন্য নয়, পরন্তু মায়ার-সম্বন্ধশূন্য শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণযুক্ত ভক্তিদ্বারা, পাপ ও কলঙ্কপূর্ণ অশুদ্ধহৃদয়ে ভগবানের পূজায় আমি বিশ্বাসী নই। জন্ম ও উচ্চ-পদ-নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের পূজায় মৌলিক অধিকার আছে। কিন্তু পূজা শুদ্ধ হইতে হইবে, নচেৎ তাহাতে ভগবান্ অসন্তুষ্ট হন। ধর্মীয় শিক্ষকবৃন্দ আমরা, মানুষকে হৃদয়ে ও মনে বিশুদ্ধ করি, কারণ এই অবস্থাটিই ভগবানের পূজার পূর্ব-সর্ত্ত। মানুষের পারমার্থিকশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে আমাদিগকে প্রকৃত আচার্য্যের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে; তাহাদিগকে উপলব্ধি করাইতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদিগের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে ও চিন্তায় বিশুদ্ধি আনিতে সক্ষম হইতেছি, ততক্ষণ আমরা সামাজিক জীবন বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না।'

প্রচার যাত্রাকালে মাদ্রাজ শহরে রাজ্যপাল ডঃ পি. ভি. রাজামান্নারের সভাপতিত্বে তাঁহাকে এক মনোজ্ঞ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়; প্রধান অতিথি ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রী পি. রাজাগোপালন। এই পর্য্যটনকালে শ্রীপেরাম্বদুর, কাঞ্চীভরম, মনুকান্তকম, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোনম্, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম্, রামেশ্বরম্, মাদুরাই, ত্রিবান্দ্রম্, কেপ, উডুপি, তিরুপতি প্রভৃতি কেন্দ্রগুলিতেও যাওয়া হইয়াছিল।

৭ই নভেম্বর ১৯৫৭ সালে উডুপীতে সেই স্থানের চেয়ারম্যান শ্রী কে. কে. পাই শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজকে এক নাগরিক-সম্বর্ধনা জ্ঞাপনকালে বলেন যে,—"শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের অনুরাগীবৃন্দ এই দেশ উডুপীর সর্বত্র ছড়াইয়া আছেন। যে জ্ঞানের আলোক তিনি প্রায়ঃ সাতশতাব্দী পূর্বে প্রজ্বলিত করিয়াছেন তাহা এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। এই আলোকে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের তদানীন্তন এক উচ্চতম পর্যায়ের সন্ন্যাসী শ্রীসোদি মঠের পূজ্যপাদ শ্রীল ভাদিরাজা তীর্থ স্বামীর সঙ্গে পারমার্থিক ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেন। সেই হইতে গৌড়ীয় মঠের ও উডুপীর আস্থা মঠের স্বামীজিগণের মধ্যে যোগাযোগ রাখা হইয়াছে।" সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ

বলেন,—"আমি যথাসর্বস্ব স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত করিয়াছি, সেই জন্য আমি মনে করি, যে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা ও আতিথেয়তা আমাদিগকে দেখানো হইয়াছে তাহা দ্বারা আপনারা তাঁহাকেই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। উড়ুপীর সহিত আমাদের দীর্ঘকালের যোগাযোগ এক ইতিহাস। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল মধ্ব-সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমগুরুদেব বিশেষ প্রেমভক্তির আদি শিল্পী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই বিপ্রলম্ভভাবে প্রেমভক্তির প্রধান প্রচারক ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। আমাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একাধিকবার উড়ুপী দর্শনে আসেন ও এখানকার (মধ্ব-সম্প্রদায়ের) সাহিত্যাদি সংগ্রহ করেন এবং এখানকার এক স্বামীজিকে মধ্ব-দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য আমাদের প্রধান মঠ শ্রীমায়াপুরে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন।"

২০ শে নভেম্বর ১৯৫৮ সালে শ্রীল মহারাজকে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরে রেল ষ্টেশনে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়।

৬ই ডিসেম্বর কানপুর রেলষ্টশনে এক বিশাল জনতা শ্রীল মহারাজকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। প্রয়াগে নারায়ণমন্দিরে সনাতনধর্ম কলেজে, বার এসোসিয়েশনে ও দ্বারকাধীশ মন্দিরে তিনি বক্তব্য রাখেন।

২০ তারিখে যাত্রীসহ তিনি বিজয়ওয়াড়া পৌছান। ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৯ সালে বিজয়ওয়াড়ার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন ডাঃ জে. দক্ষিণমূর্ত্তি—মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান।

কলিকাতায় শ্রীচৈতন্যজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক বিশাল সমাবেশে ২৬ মার্চ, ১৯৫৯ সালে প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ হয়। তাহাতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীল আচার্য্যদেব; যে কমিটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক তাহার সভাপতি পঃ বঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পি. সি. সেন ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন কলিকাতার মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন।

এতদ্ ব্যতীত শ্রীল মহারাজ নিজ সঙ্গীগণসহ নিম্নলিখিত স্থানসমূহে গমন ও প্রচার-বক্তৃতা করেন।

১লা এপ্রিল ১৯৫৯ লক্ষৌতে ও ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাবে, ২ তারিখে সৎসঙ্গ ভবন তালতোত্রতে, ৩ তারিখে রাণীলীলা রামকুমার ভার্গবের রাজপ্রাসাদে মহারাজ বক্তব্য রাখেন। ১৯শে আগষ্ট ১৯৫৯ আসেন কোয়েম্বাটুরে; সেখানে

৩০ তারিখে বহুদর্শনার্থীকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। কোয়েম্বাটুর হইতে তিনি দলবলসহ যান মহীশূরে। সেখানে তাঁহাকে এক নাগরিকসম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ৬ই নভেম্বর তাঁহারা আসেন দেরাদুনে, তথা হইতে বেরিলী। ২২শে নভেম্বরে কানপুরে আচার্য্যদেবকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানানো হয় রেলষ্টেশনে। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীল আচার্য্যদেবকে নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীসনাতনধর্ম হলে —যেখানে তিনি এক পক্ষকাল অবস্থান করেন ও বক্তৃতা দেন— ১। ক্রাইষ্টচার্চ কলেজে, ২। ডি. এ. ভি. কলেজে, ৩। সনাতনধর্ম কলেজে, ৪। ল' কলেজে, ৫। বাগলা বিল্ডিং-এ, ৬। মরুপনগরে, ৭। অশোকনগরে, ৮। জ্যোতিব্রহ্ম আশ্রমে ও ৯। হরিসভাতে—যাহার ফলে সারা শহরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ আসিয়া ২৮ ও ২৯ নভেম্বর বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলন (কলিকাতায়)

এই সম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেবকে উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় রন্‌জি (ইনডোর) ষ্টেডিয়ামে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সালে; ৮ দিন যাবৎ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সারা পৃথিবী হইতে আগত প্রায় আট হাজার প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন।

এপ্রিল ১৯৬২ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা সারস্বত গৌড়ীয় মঠে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৫ই এপ্রিল আচার্য্যদেব হরিদ্বারে আসেন; ৮ তারিখে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ বি. রামকৃষ্ণ রাও আসিয়া প্রদর্শনীটি দর্শন করেন।

১৬ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে বৃন্দাবনের রাধারমণ-ঘেরায় এক মহতীসভায় তিনি পৌরোহিত্য করেন; বৃন্দাবনের বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায় সভায় যোগদান করেন।

উড়ুপীর পেজাওয়ার স্বামীজিকে ৫ই এপ্রিল কলিকাতার শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী। পরের দিন স্বামীজি শ্রীমায়াপুরে আগমন করিয়া সাশ্রুনয়নে বলেন,—'আমি এক স্বর্গীয় ভূমিতে এসেছি; স্থানটি দর্শন করে আমার তীর্থযাত্রা পূর্ণ হ'ল। যে অনুপ্রেরণা লাভ করলাম, তা' দিয়ে এক নূতন মিশন স্থাপনের স্বপ্ন দেখছি। ভারতের যত তীর্থক্ষেত্র আমি দেখেছি, কোথাও এইপ্রকার স্বর্গীয় আবহাওয়া ও পরিবেশ দর্শন করি নাই।'

শ্রীচৈতন্যমঠের স্মারক হিসাবে মাদ্রাজে শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৩ই আগষ্ট হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে এক অনুষ্ঠানসূচীতে প্রায় দশ লক্ষাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

যদিও বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল যাইতেছিল না, তথাপি প্রভূত উদ্দীপনা ও মিশনারী উদ্যোগহেতু ১৯৭৬-এ কভুরে রামানন্দ গৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন ৪২ জন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীসহ। এখানে পৌছান ১৪ই জুলাই ১৯৭৬ সালে ও ১৫ তারিখে শ্রীচৈতন্য চরণ-চিহ্ন স্থানে রায় রামানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কভুর আসা অবধি অগণিত ও অন্তহীন ভক্তগণের স্রোত আসিতে থাকেন এবং তিনিও হরিকথা পরিবেশন করিয়া যাইতে থাকেন। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া সেই চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া বৈকালের দিকে অসুস্থ হইয়া পড়েন ও তাঁহার ব্যক্তিগত চিকিৎসক যত্ন লইতে থাকেন। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়।

সেই হইতে প্রায় দুই মাস কাল অতিক্রান্ত হইল যেন এক উত্তাল সমুদ্রের মাঝখানে একটি জাহাজ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ওলট-পালট্ খাইতেছে; অবশেষে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ বেলা ৩-২০ মিঃ উজ্জ্বল কিরণদায়ী উল্কা এই প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত জগতে চলিয়া গেলেন।

পবিত্রদেহটিকে শ্রীমায়াপুরে লইয়া যাওয়া হইল; যে স্থানে তিনি নিজ শ্রীগুরুদেবের সহিত প্রথম মিলিত হন, সেইস্থানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়, যাহাতে তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য সারা ভারতের সর্বত্রই শোক প্রকাশ করা হয়। তন্মধ্যে আছেন—সংবাদ পত্রগুলি, জনসভা, শত শত পত্র ও টেলিগ্রাম, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালগণ, বিচারপতিগণ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও মহামান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি। বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবর্গ, মঠ-প্রধানগণ, সম্প্রদায় প্রধানগণ প্রভৃতি ব্যক্তিগতভাবে আসিয়া শোক প্রকাশ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। দেশের প্রায় সর্বত্রই শোকসভা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন সংবাদ পত্রগুলি ব্যতীত 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীতীর্থ মহারাজ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি নথিভুক্ত করা হয়।

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রেষ্ঠজন শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের অতীব প্রিয়শিষ্য শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবস্থল পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত নিত্যানন্দপুরের বলগোনা গ্রামের নিকটবর্তী উষাগ্রামে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর পরদিবস নন্দোৎসব দিবসে। পিতামহ শ্রীবিহারীলাল ব্যানার্জী ও পিতামহী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পুত্র সন্তান শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী। শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী মহাশয়ের সহধর্মিনী শ্রীমতী বীণারাণী ব্যানার্জী। শ্রীকালীপদ বাবুর তিনপুত্র প্রহ্লাদ, সুবল ও নন্দদুলাল ও দুই যমজ কন্যা এক্কারী ও হারা— যাঁহারা উভয়েই শ্রীনন্দদুলালের বয়োজ্যেষ্ঠা। শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজের পিতৃদত্ত নামই শ্রীনন্দদুলাল, মতান্তরে শ্রীপ্রফুল্ল ব্যানার্জী এবং "নন্দদুলাল" তাঁহার গুরুদেব প্রদত্ত ব্রহ্মচারী নাম। পিতামহ শ্রীবিহারীলাল বাবু ছিলেন এক অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। শ্রীনন্দদুলালের পিতা শ্রীকালীপদ বাবু ছিলেন এক স্বাধীনচেতা প্রকৃতির, যিনি কাহারও নিকট মাথা নত করিতেন না, কিন্তু গৃহদেবতা নারায়ণ ও রাধাগোপাল বিগ্রহগণের সেবায় সদা নিযুক্ত; তিনি স্বহস্তে গোপালের ভোগরন্ধন, সেবাপূজায় নিজেকে সদাই ব্যস্ত রাখিতেন। পুত্রকন্যাগণ পিতাকে একটু ভীতির চক্ষেই দেখিতেন, সাংসারিক জীবনে তিনি যত কঠোর ছিলেন, পারমার্থিক জীবনে ততটাই সরল। হরিনামে তাঁহার অগাধ নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, গ্রামে হরিনামের দল আসিলে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া রাস্তায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন।

এক অনাড়ম্বর গ্রাম্য পরিবেশে শ্রীনন্দদুলালের শৈশব অতিবাহিত হয়। প্রথমে উষা ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় ও বাল্যে আরুয়ার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মতান্তরে শুশুম দীঘি হাইস্কুল) হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ধমান রাজকলেজে বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। স্নাতকে সংস্কৃত অনার্স লইয়া পড়িতেন এবং ব্যাকরণে আদ্য, মধ্য ও উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তাঁহার 'বেদান্ত' পড়িবার ইচ্ছা ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠকালীন কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সহশিক্ষা তাঁহার ভাল লাগে নাই।

বাল্যকাল হইতেই তিনি গো-সেবায় খুব প্রীতি লাভ করিতেন। পড়াশুনা করা সত্ত্বেও কৃষিকার্য দেখাশোনা ও গো-সেবা লইয়াই তাঁহার দিন কাটিত; এই গো-সেবা প্রীতি তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অটুট ছিল। নন্দদুলালও পিতার মত খুব ভগবদ্ভক্ত ছিলেন ও ঠাকুর ঘরে পূজা করিতে বসিয়া কি সব বলিতেন ও ক্রন্দন করিতেন। একাদশ-দ্বাদশ বৎসর বয়সের স্মৃতিচারণ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, দু-এক জন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী তাঁহাদের গৃহে সমাগত হইলে, পিতা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক হইয়াও পথের ধূলার উপরেই সাষ্টাঙ্গ প্রণতঃ হইয়া পড়েন ও যে পিতা সকলকে পদধূলি দানে অভ্যস্ত, তিনিই সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণের পদধূলি গ্রহণে উদ্যোগী হন। মাতা গোঁড়া হিন্দুঘরের গৃহিণী হইয়াও যিনি কখনও পথে নামেন না, তিনিও সে সময় গৃহদেবতার ভোগ-রন্ধনে নিযুক্তা থাকিলেও পথে নামিয়া সকলকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করেন। এই সব দেখিয়া কোন এক অজানা কারণে নন্দদুলালের চক্ষে জল আসে; সেই সময়েই তিনি মাতার নিকট বলিয়া বসেন যে, তিনিও সন্ন্যাসী হইতে চাহেন।

সেই সন্ন্যাসীগণের সহিত দুইটি প্রতিকৃতি—একটি গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গিরিধারী, উপরটি চেয়ারে উপবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান তাঁহারই প্রেষ্ঠজন কুঞ্জদা। কি এক অজ্ঞাতকারণে বালক নন্দদুলালের মধ্যে উদয় হয় 'আমার দুর্ভাগ্য যে, সে সময় আমার জন্ম হয় নাই, হইলে দর্শন পাইতাম'; আরও প্রার্থনা করেন যে, আমি কি আপনার (প্রভুপাদের) প্রেষ্ঠজন শ্রীকুঞ্জদার চরণকমলে নিজেকে সমর্পণ করিতে পারিব না!'

তাঁহাদিগের গৃহে সমাগত সেই সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবৃন্দ গ্রামবাসিগণের উদ্দেশ্যে প্রচার-কার্য্যাদি সমাপনান্তে অন্যত্র গমনের প্রাক্কালে সেই সন্ন্যাসী মহারাজদের একজন পিতাকে একখানি "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ উপহার দেন। পিতা সেই গ্রন্থটিকে গৃহদেবতার ঘরে সযত্নে রক্ষা করেন, তিনি কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিতেন না, যদিও নিজে প্রত্যহ ঐ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করিতেন। নন্দদুলালও কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে গৃহদেবতার ঘরের বাহিরে বসিয়া তাহা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন।

কিন্তু নন্দদুলালের উপনয়ন সংস্কারের পর তিনি তিন দিন গৃহে আবদ্ধ থাকাকালীন "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পঠনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি

নিজেও বলিয়াছেন—"আমার জীবনের প্রথম হইতেই শ্রীচরিতামৃত, বিশেষতঃ হরিদাস ঠাকুর ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনী আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই রকম ত্যাগের জীবন গড়ে তোলার জন্য ছোটবেলা থেকে আমি এই জীবনী পুনঃ পুনঃ পাঠ করি ও এই গ্রন্থটি আমি সম্পূর্ণ মুখস্থ করিয়াছিলাম। আজও এই গ্রন্থটি পড়ি এবং প্রত্যেক বারই নূতন কিছু আবিষ্কার করি ও আনন্দ পাই।" গৃহদেবতার পূজা ও চরিতামৃত পাঠ তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। তিনি জানাইয়াছেন, হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী পঠনে তিনি এমনি আকৃষ্ট হন যে, শ্রীহরিদাসের উক্তি "খণ্ড খণ্ড হই যায় যদি প্রাণ। তথাপি বদনে আমি না ছাড়িব হরিনাম।।" —তাঁহাকে অতীব মুগ্ধ করে। প্রসঙ্গতঃ এই অপতিতভাবে হরিনামে নিষ্ঠা তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইয়াছে, যাহার ফলে তাঁহার জীবনে অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব হইয়াছে ও শেষ দিন পর্যন্ত কেহই তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করাইতে পারে নাই। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপর উক্তি—

"হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন।।
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১।৩৩-৩৪)

—তাঁহাকে এমন প্রভাবিত করিয়াছিল যে, তিনি উহা কাগজে লিখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। ইতঃপূর্বে মাতার মুখে রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও প্রহ্লাদের কাহিনী শুনিয়া জানাইয়াছিলেন যে, একাদশী দিবসে অথবা ভগবানের আবির্ভাব দিবসে কেহ উপবাস করিলে ভগবানের দর্শন লাভের সুকৃতি সঞ্চিত হয়; তাহাতে তিনি মাতার নিকট আব্দার করেন, তিনিও মাতার সহিত একাদশী তিথি পালন করিবেন—তাহাতে মাতা সন্তুষ্ট হন। ইহা হইতে স্পষ্ট হয়, বংশটি বৈষ্ণব-আচারে অনুরাগী।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠ করিতেন, তাহার ফলে তাঁহার উপর উহার চরিত্রগুলির প্রভাব পড়ে। "মামুলি মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করায় আমার মন সায় দিত না, বিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বোধ করে কত প্রীতির সহিত সেবা করতাম এবং কেন জানি না তখন থেকে চক্ষের জলে বুক

ভেসে যেত। নিজে নিজে ঠাকুর সম্বন্ধে গান রচনা করে ঠাকুরকে ডাকতাম। প্রথম থেকে ভোগের প্রসাদকে অমৃত বোধ হ'ত। মা আমাকে ভক্তিপথে প্রচুর সাহায্য করতেন।" শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন (গৌড়ীয় ৪৯।৪ সংখ্যা)— "যাহাদের ভগবানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, তাহাদের বৈধী ভক্তির কঠোরতার আবশ্যকতা হয় না।" তিনি হা-হুতাশা করিতে থাকিতেন—'কোথায় সেই বিগ্রহ, যাঁহার জন্য এই হৃদয়মন্দির রচিত ?' রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে থাকেন, আমি কি চিরতরে পরিত্যক্ত ? আমার হৃদয়ে কি আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে না' সহসা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলে দেখেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান সন্ন্যাসী, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে তিনি অদৃশ্য হইয়া যান। জাগ্রত হইলে বুঝিতে পারেন, উহা স্বপ্ন। একবার নয়, বহুবার এইরূপ দর্শন ঘটিয়াছিল। একদিন দেখেন তিনি ঐ সন্ন্যাসীকে এক ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে অনুসরণ করিতেছেন। পরক্ষণেই নিজেকে বিছানায় শায়িত দেখেন।

শ্রীনন্দদুলাল আবাল্য খুব অতিথি সেবা-পরায়ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব আগমন করিলে তাঁহাদিগকে খুব যত্ন করিতেন। অতিথিগণের জন্য একটি ঘর করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা অদ্যপি বিদ্যমান; তাহা ছাড়া পূর্বতন গোয়াল ঘরটিও এখনও আছে। পাড়াতে একটি হরিমণ্ডপ তৈরী করাইয়া সকলকে লইয়া নগর-সঙ্কীর্তন করিতেন। নিজ তত্ত্বাবধানে একটি শিবতলা করিয়াছিলেন। গ্রামে জন্মাষ্টমী, দোল উৎসব প্রভৃতিও নিজ উদ্যোগী হইয়া করিতেন। আবাল্য শ্রীপ্রহ্লাদের ("কৌমারাৎ আচরেৎ ধর্ম্মঃ") শিক্ষায় দীক্ষিত—ধর্মীয় অনুশীলনকেই অবশ্য কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—হরিভজনে এ জগৎ সংসারে কোন আপন ব্যক্তি সাহায্য করিবে না, একাই পথ চলিতে হইবে। তাই শাস্ত্র কঠোর ভাষায় বলিয়াছেন—"স্বজনাখ্য দস্যু"।

শ্রীনন্দদুলালের পূর্বাশ্রমে যে যে গুণগুলি পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি সকলই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অধিকতর ব্যাপক ভাবে উন্মেষিত হয়। যথা—

১। সাধু-বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি,

২। গো-জাতির প্রতি প্রীতি ও সেবা-সৌষ্ঠব,

৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি গাঢ় অনুরাগ ও উহাকে স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়া জ্ঞান ও শ্রদ্ধা-ভক্তি,

৪। পূজা-অর্চনের প্রতি আকর্ষণ ও গৃহ-দেবতা ব্যতীত দোল-জন্মাষ্টমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী প্রভৃতির নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠান ও পালন,

৫। সাংগঠনিক প্রতিভা—অতিথিগণের জন্য গৃহ নির্মাণ, শিবতলা-হরিমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা,

৬। গীত-কীর্তন রচনাদির অদম্য প্রবণতা,

৭। সংস্কৃত ভাষায় প্রতি অনুরাগ,

৮। প্রবল বৈরাগ্য ঃ হরিদাস ঠাকুর, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত্র অনুসরণে নিজ জীবনে প্রতিফলন,

৯। শ্রীগুরুচরণে নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গী-করণ—শ্রীল গুরুদেবের অতীব স্নেহাস্পদ হওন।

১০। আশৈশব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ।

যদিও তিনি ছিলেন মূলতঃ ভজনানন্দী, তথাপি গুরুদেবের আদেশ পালনে যে সাংগঠনিক প্রতিভা তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারই গুরুদেবের লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি মাধ্যমে জানা গিয়াছে যে, সেগুলি "ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে", "সে ধরণের কার্য্য কেহ পূর্বে দেখাইতে পারে নাই", "সেগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে", ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। যে কারণে তাঁহারই গুরুদেবের এক গুরুভ্রাতা বাগ্মীপ্রবর, সাংগঠনিক প্রতিভাসম্পন্ন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ব্যক্তিত্ব শ্রীল ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত ১৪-১০-১৯৭৮ খৃঃ এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন,—" .... একটা কথা তোমায় পুনঃ পুনঃ জানাই যে, আমি তোমাকে হৃদয় হতে স্নেহ করি এবং তোমার বহুমুখী গুণেরও আন্তরিক আদর করি। .... "

পরবর্তী জীবনে আরও যে প্রতিভা, দক্ষতা, পাণ্ডিত্য তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

(ক) ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রণীত বহু সংখ্যক ধর্মীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ

(খ) কবিতা ও কীর্তন রচনার প্রতিভা,

(গ) গভীর শাস্ত্রজ্ঞান যাহা দ্বারা যে কোন শ্রেণীর বা পদের অতীব জটিল প্রশ্নাদির সন্তোষজনক সমাধান ও অপরের ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাদির খণ্ডন,

(ঘ) অতীব নির্ভীকতা,

(ঙ) আশ্রিত ও অনুরাগিজনের প্রতি উল্লেখযোগ্য স্নেহশীলতা,

(চ) অসাধারণ ক্ষমাগুণ, ইত্যাদি।

অবশেষে ১৯৫০ সালে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য না করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চাষের জমির উপর দিয়া দৌড়াইতে থাকেন, সহসা সম্মুখে এক উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলেন—সেই একই মহাপুরুষ। এক আম্রকুঞ্জে সবুজ ঘাসের উপর ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া জানিতে পারিলেন তিনি অজানা গন্তব্য স্থানের খুব নিকটবর্ত্তী। সেই অজানার পথে পুনরায় যাত্রা করিয়া দেখিলেন সন্ধ্যা নাগাদ এক নগরের নিকট ঘোটক-বাহিত এক ঝট্‌কায় তিন-চারিজন সন্ন্যাসী যাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে তিনি চিনিতে পারিলেন—যিনি তাঁহাকে এই পথ ধরিয়া আসিতে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইলেন, আমরা শ্রীমায়াপুর হইতে আসিতেছি, স্থানটি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান; যেখানে আমাদের আশ্রম আছে। ইচ্ছা হইলে সেখানে যাইতে পার, কিছু খুচরা পয়সা সঙ্গে রাখ। তিনি তাহা লইলেন না। তাঁহারা বলিলেন—আমাদের ট্রেনের সময় হইয়াছে। তোমার সহিত মায়াপুরে আবার দেখা হইবে। নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে মনে মনে বলিলেন, 'কি মূর্খ আমি? কারণ, যাঁহাকে আমি অন্বেষণ করিতেছি, যিনি হইবেন আমার (পারমার্থিক) পথ-প্রদর্শক, তিনি আমাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারিলাম না, সে জন্য আমাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গেলেন।'

অতঃপর নৌকায় গঙ্গা পার হইতে হইবে। ঘাটিহার বিনা পয়সায় পার করিতে রাজী হইল না। দূরে বসিয়া খুব চিন্তিত হইলেন। কোন এক আগন্তুক নদী পার হইতে তাঁহার সহায় হইলেন। কিছু দূর যাইতে তিনি মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে পৌঁছাইলেন। সেখানে এক সাধু তাঁহাকে প্রধান কার্যালয় শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠাইয়া দেন।

পরদিবস মঙ্গলারতির পূর্ব্বে সাধুবর্গকে দেখিয়া তাঁহার ১১/১২ বৎসর বয়সের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠে, মনে পড়িল ইঁহারাই তখন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। আরও মন পড়িল প্রভুপাদ ও তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের নিকট আকুল প্রার্থনার কথা, মনে পড়িল পূর্ব্বদৃষ্ট সেই দিব্যমূর্ত্তি যিনি ষ্টেশনের নিকট তাঁহার দর্শনপথে আসিয়াছিলেন। পার্থক্য কেবল আলেখ্যে দৃষ্ট প্রভুপাদের পার্শ্বে

দণ্ডায়মান তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ও কৃষ্ণকেশের পরিপাটি, আর অপরটি ত্রিদণ্ডিস্বামী, মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বসন ও হস্তে ত্রিদণ্ড।

তাঁহার নবজীবনের সূত্রপাতের সূচনা হইল। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানাইয়াছেন যে, "প্রথমবার মায়াপুরে আসি ১৯৫০ সালে। আমি যখন মায়াপুরে এলাম, তখন মঠের আচার্য ও সভাপতির দেখা না পেয়ে চলে গেলাম রামকৃষ্ণ মিশনে। দ্বিতীয়বার মায়াপুরে আসি ১৯৫১ সালের শেষের দিকে। আমার গুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উপর দীর্ঘ দশ মাস ধরে আমার জন্য ক্লাস নিতেন। এরপর ১৯৫২ সালে আমাকে পাঠানো হল মাদ্রাজে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনী আমার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।......... ভারতবর্ষে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেক ঋষি, সন্ন্যাসী, গভর্নর, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু আমার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের মত ভক্তিমান, বাস্তববাদী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ কাউকে দেখলাম না। তিনি এমন একটা শব্দ ব্যবহার করেন নি, যেটা অপ্রাসঙ্গিক বলে বাদ দিতে হবে। তাঁর জীবন ছিল ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। কোথাও এক সেকেণ্ড দেরি করে যেতেন না বা এক সেকেণ্ড বেশী কথা বলতেন না। আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত দিনে ৮/১০ ঘণ্টা গ্রন্থাদি নিয়ে আলোচনায় কাটাতেন। গুরুদেবের কাছ থেকে আমি যে প্রেরণা পেয়েছি, আর কাহারও কাছে তা' পাই নি।"

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী ছিলেন আজন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। মহাপ্রভু নির্দেশিত প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। মধ্যরাত্রি হইতে সকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম করা ছিল তাঁহার দৈনন্দিন ব্যাপার এবং প্রত্যহ মঙ্গলারতি দর্শন ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়ম। তাঁহার জপ-বলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, যে ভাবে তিনি বহু বহু বিপর্য্যয়ের হাত হইতে নিজেকে ও মঠকে রক্ষা করিয়াছেন— যদ্যপি গুরুস্থানীয়, গুরুভ্রাতা স্থানীয়, শিষ্য ও শিষ্য-স্থানীয়গণের কৃত বিভিন্ন উপদ্রব হইতে দেখা যায় যে, তাঁহারা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কেহই তাঁহাকে দমাইতে পারে না। সকল সময়েই তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি মামলা-মোকদ্দমা ঝুলিয়া থাকিলেও একটিতেও কেহ তাঁহাকে হার স্বীকার করাইতে পারে নাই। শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ যে "অমৃতের সন্ধানে" গ্রন্থটিকে 'নিজ আর্ত আত্মার

কৃষ্ণানুসন্ধান' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানাইয়াছেন—'যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-উদ্যানে 'ভক্তিলতার বীজ' অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িতে লাগিল। আর্তি সহকারে জানাইলেন, ''কাহার লাগিয়া এ হৃদয় সিংহাসন করেছি সাজন, এ মন্দির রহিবে কি গো দেবতা প্রতিষ্ঠাবিহীন?'' এইরূপ বহু কবিতা রচনা করিয়া তাহাই দেবতাকে পুষ্পরূপে নিবেদন করিতেন। দিবারাত্রি এক ভাবের মধ্যে কাটিত। ভাবের ঘোরে প্রত্যক্ষ করেন, ''এক সন্ন্যাসী ঠাকুর কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আসিতেছেন, নিকটে পাইয়া চরণ স্পর্শ করিতে গেলে তিনি অন্তর্হিত হন ও ভাব সমাধি ভঙ্গ হইয়া যায়। পরপর বেশ কয়েকবার এইরূপ দর্শন ঘটে। কোন একদিন দেখেন সেই সন্নাসীর ইঙ্গিত লাভ করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছেন। তখনও পর্য্যন্ত তিনি নিজের ভবিষ্যতের পথটি ধারণায় আনিতে পারেন নাই। সে জন্য অজানার উদ্দেশ্যে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেন।

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের প্রকৃত (সিদ্ধ) স্বরূপের পরিচয় প্রকাশ করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিত ০৮.০১.১৯২১ তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন,—''শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কোন এক অনিপুণা গোপললনাকে 'নয়নমণিমঞ্জরী' বলিয়া ডাকেন এবং সর্বদা নিজের কাছে রাখিতে চাহেন, কিন্তু সেই মূঢ়া পতিবঞ্চনা কার্য্যে অসমর্থা বলিয়া নানাপ্রকার বাহ্যকৃত্যে সময় যাপন করে, কিন্তু পরম সুশোভন 'বিমলমঞ্জরী' বিনোদিনীর সঙ্গ বিমুখা হইয়া নয়নমণির সঙ্গ দূরে বর্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং নয়নমণি বার্ষভানবীর অন্বেষণ যাহাতে একান্ত মনে যত্ন করিতে পারেন, উহাও বিমলমঞ্জরীর কৃত্য।'' [উল্লেখ করা যাইতেছে যে, শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (যাঁহার পরবর্তীকালে সন্ন্যাস নাম হয়—শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ) যখন নিজ গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে কিছু না জানাইয়া ১৮-৫-১৯২০ তারিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বসোরা চলিয়া গিয়াছিলেন, সে সময় অতীব দুঃখ প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উভয়ের সিদ্ধ-স্বরূপের প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ তাঁহার ''হে কৃষ্ণ! বেদে কি তোমার স্থান নাই?'' গ্রন্থে যে মাধবীর চরিত্রটি 'সাধন ও ভজন কৌশল' পথের দিগ্‌দর্শন করিতে যাইয়া অঙ্কণ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছেন—''মাধবী বাগিচা হইতে বিভিন্ন রঙের পুষ্পাদি চয়ন করিয়া (নিজ

গুরুরূপা সখী) বিমলমঞ্জরীকে প্রদান করিলে, তিনি দুটি মালা গাঁথিয়া (তদীয় গুরুরূপা সখী) নয়নমণি-মঞ্জরীকে প্রদান করিলেন। নয়নমণি মঞ্জরী সেই মালিকাদ্বয় শ্রীরূপমঞ্জরীকে হস্তান্তরিত করিলে রূপমঞ্জরী ললিতা সখীর নির্দেশ মত শ্রীরাধাগোবিন্দের গলে পরাইয়া দেন। কুঞ্জভঙ্গ লীলাবসানান্তে রাধাগোবিন্দ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর নয়নমণি মঞ্জরী শ্রীমতীর অনুগমনের পূর্বে বিমলমঞ্জরীকে নির্দেশ দেন—রাধাকুণ্ডে গমন করিয়া রাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলার কুসুম শয্যা সাজাইবার জন্য। বিমল মঞ্জরী যাইবার কালে মাধবীকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। গমনপথে পৌর্ণমাসীদেবীকে প্রণাম জানাইতেই পৌর্ণমাসীদেবী উভয়কেই বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। মৃদু হাস্য সহকারে তিনি বলেন, 'স্নেহের বিমলা, এই মাত্রই বৃন্দাদেবী আগমন করিবেন, তুমি তাঁহার সহিত রাধাকুণ্ডে নির্দেশ মত কুঞ্জ সাজাইবে, আর এই শিশু মাধবীকে আমার কাছে রেখে দেব যাতে ভবিষ্যতে সে তোমার উপযুক্ত সহায়ক হয়— সেই অনুরূপ সেবা পরিপাটি শিক্ষা দেব।'

অল্প দিনে মাধবী তাঁহার নিকট ধ্রুবপদ তালে যে নৃত্য কীর্তন করিল, তাহাতে স্বয়ং পৌর্ণমাসীও মুগ্ধ। তিনি বুঝিলেন এই নৃত্য-কীর্তন রাধাগোবিন্দের খুবই আনন্দ প্রদায়ক হইবে।

অতঃপর পৌর্ণমাসীদেবী অপর একটি রহস্য মাধবীকে জানাইলেন। তিনি বলেন, 'স্নেহের মাধবী! তুমি এই নৃত্য-কীর্তন দ্বারা মাধুর্য্যলীলবিগ্রহ রাধা-গোবিন্দের আনন্দ বিধান করিবে। আবার ঐ মাধুর্য্যবিগ্রহ রাধাগোবিন্দই ঔদার্য্য-বিগ্রহ রসরাজ মহাভাব এক স্বরূপত্ব লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নিত্য বিরাজিত। সেই ঔদার্য্য-বিগ্রহের আবির্ভাব কালেই তাঁহার কোন এক প্রিয়সখীর কৃপায় অভিষিক্ত হইয়া তুমি তোমার এই নিত্যমঞ্জরীত্ব লাভ করিয়াছ, তাঁহার সেবাও করিতে হইবে, তবে যেহেতু সেখানে তিনি নিজেকে নাগর-রূপে প্রকাশ করেন নাই, অতএব তোমাকেও পুরুষরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি বালিকা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তোমার পিতামাতা তোমাকে 'মধু' বলিয়া ডাকিতেন। সুতরাং তাহারও তাৎপর্য আছে। সুতরাং আমার বরে তুমি গৌরাঙ্গলীলায় তোমার নিত্যস্বরূপে মধুরূপেই পরিচিত থাকিবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোলোকে ভিন্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেন, সেই গোলোকই এই ভূলোকে যথাক্রমে প্রকটিত ব্রজধাম ও শ্বেতদ্বীপ শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর রূপে প্রকটিত।

পরক্ষণের মাধবী দেখে সে শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জন লীলায় যোগদান করিয়া (মধুরূপে) ভক্তদিগের সহিত মন্দিরপ্রাঙ্গন মার্জন, জল দ্বারা ধৌতকরণ প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত। অতঃপর নৃসিংহ মন্দিরে গমন করিয়া অদ্বৈত-তনয় গোপালের সহিত তাল মিলাইয়া ধ্রুবপদ তালে নৃত্যকীর্তন করিল, তাহাতে স্বরূপ-দামোদর সহ মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। আবার পরদিবস রথযাত্রায় মহাপ্রভুর নির্দেশে অপূর্ব নৃত্যগীত আরম্ভ করে, তাহাতে জগন্নাথ সহ সকলে প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। পরক্ষণেই সে দেখে শ্রীমায়াপুরে অপূর্ব ফুল-বাগিচায় কর্মে নিযুক্ত।

দার্শনিক নন্দদুলাল

যে সমস্ত গ্রন্থাদি তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, হরিকথা পরিবেশন কালে, তীর্থযাত্রাকালে প্রভৃতিতে সর্বত্রই তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষিত হইয়াছে। গৃহত্যাগ করিবার পর মায়াপুরে পৌঁছাইবার পূর্বে নিষ্কপর্দক নন্দদুলাল গঙ্গাপার হইতে সমস্যায় পড়েন, তাঁহার ভাবী পারমার্থিক গুরু কিছু দিতে চাহিলেও তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। সেই সময় গঙ্গাকে তাঁহার বিরজা নদীরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তাঁহার উপলব্ধি 'তীর্থযাত্রার মূল উদ্দেশ্য আত্মকল্যাণ, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা নহে'। তীর্থযাত্রা করিতে করিতে প্রকৃতির রূপ দেখিয়া মনে হইয়াছিল—প্রকৃতিদেবী সর্বরূপ লইয়া পূজারিণীর বেশ ধারণ করিয়া আছেন। বদ্রীনারায়ণ যাত্রার প্রাক্কালে ঝড়বৃষ্টি তাঁহার মনে হইয়াছিল কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় ঝড়-বৃষ্টির কথা। যাত্রাকালে অলকানন্দার কল কল শব্দ, হিমালয়ের শীতল হাওয়া, চারিদিকে জলপ্রপাতের ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ প্রভৃতিতে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি ব্যক্ত করেন নিজগুরুদেবকে লিখিত একপত্রে, যথা—"বরফাবৃত হিমালয়ের চূড়ায় প্রাতঃসূর্যের আলো ঝিক্‌ ঝিক্‌ করতে দেখলাম, তখন আমার মনে জাগলো হয়তো তপ্তকাঞ্চন গান্ধর্বিকা তাঁর সেই অপ্রাকৃত রূপ নিয়ে আমার নয়নপথে আবির্ভূত হবেন, যে পিপাসা নিয়ে এই অধম দাসের তীর্থযাত্রা পরিভ্রমণ। ...... ভক্তপ্রবর কেদারনাথজীর আশীর্বাদে অভিষিক্ত হলেই তবে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এবং আত্মার আত্মরতি ভাব নিয়েই তাঁহার সেবা পেতে পারি, অনুরূপ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তিনি আমার অজ্ঞান চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা কৃষ্ণে অবিষ্ট করেছেন তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় গান্ধর্বিকার আপনজন প্রকৃত গান্ধর্বিকার

স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। .... এই পিপাসা নিয়েই আমরা অমৃতসাগরে ডুব দেওয়ার জন্য মহাপ্রয়াণের পথে।" (লক্ষ্যণীয় যে, তিনি যে ভাবে 'আত্মার ভাবে' নিরন্তর মগ্ন থাকেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।) মন্দাকিনীর ধারা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীতে ভক্তিদেবীর প্রবাহ। কিঞ্চিৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলে কোন এক অজ্ঞাত জগৎ হইতে কোন এক দিব্যপুরুষ কি এক বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া অন্তর্হিত হন। তথাপি পুনর্মিলনের আশা তিনি রাখেন। বিষ্ণুপ্রয়াগে ধৌলি নদী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে যে জলতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে নিজেকে একাকী পাইয়া জল তরঙ্গের তালে তালে হৃদয়ে তরঙ্গকে মিলিত করাইয়া সুস্বরে কীর্তন কালে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, অবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রেমদাতা নিতাই নৃত্যকীর্তন রত। বদ্রীনাথের পদপ্রান্তে প্রবাহিতা যে অলকানন্দা তাহা শুষ্ক হৃদয়ের প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত করে। তাঁহার মনে জাগে পূজারিণীর বেশে পুষ্পচয়ণ করিয়া যত্নের সহিত মালা গাঁথিয়া বুক ভরা হাসি লইয়া আশাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে কখন প্রাণনাথের কোন এক প্রিয়জনের হস্তে সেই মালা অর্পণ করিয়া ও সেই মালা প্রাণনাথ গ্রহণ করিলে নিজেকে ধন্য বোধ করিবেন। ভক্তপ্রবর উদ্ধব ও নারদ সেবিত বদ্রীনাথ শ্রীমূর্তি কি ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণ না মাধুর্য্যলীলা বিগ্রহ? এই প্রশ্ন তাঁহার মনকে আলোড়িত করে, তথাপি নিজ দৈন্য প্রকাশ করিয়া তাহা আলোচনা হইতে বিরত হন। ভক্ত উদ্ধব ব্রজের গুল্মলতারূপে জন্মলাভে অভিলাষী হইলেও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে প্রেরণ করেন শ্রীবদ্রীনাথে, যেখানে তিনি নিত্যকাল এক রহস্যময় সেবায় আছেন। উপরন্তু এখানেই রসিক চূড়ামণি শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদ ঋষির নিকট হইতে ভাগবত রস পান করিয়া বদ্রীনাথের অনতিদূরে সাম্যপ্রাসে ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ভক্তি রস পিপাসা মিটাইবার তাগিদে এক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় বদ্রীর আকর্ষণে সেই পথে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, গভীর অন্ধকার হইতে নিভৃত স্থানের রত্ন আহরণ বা অতল সমুদ্রের ভিতর হইতে রত্ন আহরণ। মে মাসে যাত্রাকালে বিন্ধ্যপর্বতে লম্বমান বৃক্ষগুলি সঞ্জীবিত থাকিতে দেখিয়া মনে হয়, ভক্তিকে সঞ্জীবিত করিবার মত একটু সরস মাটি পাইলেই গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাকে যে সম্বল করিতে পারিয়াছে, তাহার যোগ-ক্ষেম ভগবান্ নিজে বহন করেন। বদ্রীনাথের যাত্রা যেখানে হইতে শুরু, তাহার নাম হরিদ্বার অর্থাৎ শিবজীর স্থান। শিবজীর অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের কৃপায় অভিষিক্ত হইয়াই ভক্তি-মন্দাকিনীতে একবার

স্নান করিতে পারিলেই শ্রীহরিতে অনুরাগ জাগে। ভগবানের লীলা স্মরণ করিতে করিতে চলার ফলে এই দ্বিতীয়বারের কেদারবদ্রী গমনে তাঁহার উপলব্ধি হইল বিপ্রলম্ভ ভাবের প্রকাশ হইলেন এই বদ্রীনাথের শ্রীবিগ্রহ—যে জন্য ইহারই অনতিদূরে সাম্যপ্রাসে শ্রীব্যাসদেব নিজ হৃদয়-পিপাসা মিটাইতে পারিয়াছিলেন ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অপর এক উপলব্ধি ঃ পূর্বে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের মধ্যে ৪৫ কিমি এরও কম দূরত্ব ছিল, এখন মাঝে নীলকণ্ঠ পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া জাগায় দূরত্ব প্রায় ২০০ কিমি; ইহার কারণ পূর্বযুগে ভক্তগণ এই কেদারনাথ পাহাড়ে আসিতেন, তাঁহাকে গুরুরূপে দর্শন করিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ লইয়াই বদ্রীনাথজীর দর্শন করা সম্ভব,—সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য। কিন্তু কলিযুগে মায়াবাদ বা জ্ঞানবাদের প্রখরতার দিব্যজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দর্শকেরা "সোঽহম্", "শিবোঽহম্" এই ধ্বনি দিতে থাকিলে বৈষ্ণবপ্রবর কেদারনাথজী তাঁহার বঞ্চনাত্মক মোহিনীরূপ লইয়া এখানে বর্তমান রহিলেন। আর ঐ "শিবোঽহম্" ধ্বনি যাহাতে বদ্রীনাথের ভক্তগণের কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য নীলকণ্ঠ পাহাড়রূপে প্রকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুইয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান, তাহাই সৃষ্টি করিলেন।

এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত উত্থাপন ও পেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি লিপিলব্ধ কৃত ভাবরাজ্যের কথাগুলি হইতে স্পষ্টীকৃত হয় যে, তিনি সর্বদাই ভাবরাজ্যেই বিচরণ করেন।

মিশনারী কার্য্যকলাপ

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ নিজগুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে ২৫ জুলাই ১৯৭০ সালে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন—'মিশনারী কাজে আমার কোন দিন interest ছিল না, আজও নাই।' সেই পত্রের উত্তরে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ২৬ জুলাই ১৯৭০ এর পত্রে লিখিয়াছিলেন—"যতি মহারাজ, 'এই বিচার ঠিক হইল না' ইত্যাদি বলিয়া অনেক বুঝাইয়াছিলেন। 'অমৃতের সন্ধানে' গ্রন্থে জানাইয়াছেন,—"আমার পারমার্থিক জীবনধারা আত্মানুশীলনে personal আদর্শের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মিশনারী ভাবধারা খাপ খেয়ে চলতে পারে না। আজও মিশনের চরম

জটিলতার মধ্যে মিশনারী life-এর সঙ্গে নিজের personal ভজন life-এর সংঘাত ঘটে, তখনই এই 'অমৃতের সন্ধানে' গ্রন্থটির পরিকল্পনা রূপ নেয়। এই গ্রন্থটি আমার আত্মার কৃষ্ণানুশীলন।"

এতদ্ সত্ত্বেও শ্রীগুরুদেবের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মিশনারী কার্য্যকলাপে যে অসাধারণ দক্ষতা, সাংগঠনিক শক্তির বহুমুখী ও অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন, তাহা শুধু ইতিহাস সৃষ্টি করে নাই উপরন্তু পূর্বের সকল record অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহা তাঁহার গুরুদেব শতমুখে (লিখিত ভাবে) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ তাঁহার গুরুদেব কর্তৃক ১৯৫২ সালে মাদ্রাজে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং নিজ কর্মদক্ষতা গুণে অচিরেই সে মঠের সেক্রেটারী পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২২-১১-১৯৫৭ তারিখের এক পত্রে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ জানাইয়াছিলেন—"দক্ষিণদেশে আমাদের প্রচার কার্য্য যে ভাবে organise করিয়াছে, তাহা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ...... এই সেবা আদর্শের কথা চিরকাল গৌড়ীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"

হরি-ভক্তি-সাধন প্রণালীর যাহাতে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারীর মনে সহসা উদয় হয় সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠাধীশগণকে একত্রিত করিয়া এক সর্বভারতীয় ভিত্তিক 'অল্ ইণ্ডিয়া বৈষ্ণব কন্‌ফারেন্স্' অনুষ্ঠিত করার বাসনা; তাহাতে তাঁহার গুরুমহারাজ সানন্দে অনুমোদন ও আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন। এই বৈষ্ণব কন্‌ফারেন্স্ শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারীর Brain child. তিনি পর পর চারবার তাহা অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রথম বারের অনুষ্ঠানে তাঁহার সঙ্গে পাইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারীকে (যিনি পরবর্তীকালে শ্রীভক্তিশরণ নারায়ণ মহারাজ হইয়াছিলেন) ও তাঁহাকে এই কার্যে সহায়তা করিবার জন্য বিদ্যাসাগর পণ্ডিত কে. এস. ভি. শাস্ত্রী মহাশয়কে। এই পণ্ডিতজীকে লইয়া সারা ভারত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল সম্প্রদায়ের সহিত যোগাযোগ করেন ও তাঁহারা সকলে সানন্দে সহযোগিতাও করিয়াছিলেন। এই সম্মেলন অপূর্ব সাফল্য লাভ করে। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬১ খৃঃ হইতে চারি দিবস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; এই সম্বন্ধে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ জানাইয়াছিলেন—'এই সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠানটি এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।'

শ্রীচৈতন্যমঠের সুবর্ণ জয়ন্তী (০৭.০২.১৯৬৯ হইতে ০৭.০৩.১৯৬৯ খৃঃ) উৎসবের প্রাক্কালে নন্দদুলালকে (০৭-১২-১৯৬৮) এক পত্রে লিখিয়াছিলেন— "তোমার নৈতিক বলের অসাধারণ উদ্যম, সাহস ও পারমার্থিক শক্তির জন্য শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংই তোমাকে তোমার জীবনের সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতেছেন।"

১৪.০৮.১৯৬০ তারিখে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মাদ্রাজ মঠে আনাইয়া উৎসব করিয়াছিলেন। ২৮.১২.১৯৬৮ তারিখে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণকে কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আনাইয়াছিলেন। পুনরায় রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁহাকেই ২৯.০৬.১৯৬৪ তারিখে এই ইন্‌স্টিটিউটের উদ্বোধনের জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন আয়োজিত হয় ২৮.০৮.১৯৬৪ হইতে ৩১.০৮.১৯৬৪ তারিখে। তৃতীয় সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ০১.০৯.১৯৭২ হইতে ০৫.০৯.১৯৭২ খৃঃ।

০৭.০২.১৯৬৯ হইতে ০৬.০৩.১৯৬৯ তারিখে শ্রীচৈতন্যমঠের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯.০৩.১৯৬৯ তারিখের এক পত্রে নন্দদুলালকে জানাইয়াছিলেন—"..... প্রচণ্ড ও দীর্ঘ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পর তুমি সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান অতীব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়াছ। ..... যে সেবা তুমি করিলে তাহা আমাদের প্রতিষ্ঠানে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিল। তোমার সেবার উদ্যমের কোন তুলনাও নাই, সীমা পরিসীমা নাই।"

১৩.০৭.১৯৭০ তারিখে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ জানাইয়াছিলেন— "শ্রীযতি মহারাজ, অত্যাশ্চর্যজনক পরিকল্পনা ও ভক্তিভাবে ভাবিত হইয়া তাহা রূপায়ণের প্রখর 'বুদ্ধিমত্তা', যাহা তোমার মধ্যে লক্ষ্য করিতেছি, তাহার সমান্তরাল আমি কিছু দেখি না এবং আমাদের মঠে সেই পরিমাণ উৎকর্ষতার পরিচয় দ্বিতীয় কাহারও মধ্যে পাই না। .... ভবিষ্যতে তোমার উপর মিশনের বিশাল দায়িত্বভার অর্পিত হইবে এবং ইহা নিশ্চিত জানিয়া রাখিবে যে, ইহা তোমার উপর প্রভুপাদের আশীর্বাদ; ইহা তোমাকে অবশ্যই শিরোধার্য্য করিতে হইবে ও অতীব যত্ন ও সাবধানতার সহিত চালাইয়া যাইতে হইবে। .... মিশনের ভবিষ্যতের জন্য আমি মূলতঃ তোমার উপরই আস্থা রাখি।"

নিজ গুরুদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়। অতীব দক্ষতা ও সাফল্যের সহিত তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের ও তদীয় শাখা গৌড়ীয় মঠগুলির সাধারণ সম্পাদক ও পরে আচার্যপদে বৃত হইয়া সেবাকার্য চালাইয়া গিয়াছেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

শ্রীল যতি গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ভুবনেশ্বরস্থ ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠে ১৯.১২.১৯৭১ হইতে ৩১.১২.১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত তৃতীয় সর্বভারতীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়। তৃতীয় সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ০১.০৯.১৯৭২ হইতে ০৫.০৯.১৯৭২ খৃঃ। (প্রথমটি ১৯৬১ ও দ্বিতীয়টি ১৯৬৪ তে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল)। প্রতিষ্ঠাতার শতবার্ষিকীর এক অঙ্গ হিসাবে ১৯৭৩ খৃঃ কলিকাতায় ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২২.০২.১৯৭৩ হইতে বৎসর ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ ট্রেনযোগে ০৭.০৫.১৯৭৩ হইতে ৩০.০৬.১৯৭৩ তারিখ পর্য্যন্ত ৫০০ যাত্রিসহ সারা ভারত তীর্থ যাত্রাকালে হাওড়া হইতে ছাড়িয়া ভুবনেশ্বর, পুরী, কভূর, গুণ্টুর, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, কন্যাকুমারী, শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চীভরম, মাদ্রাজ বীচ, বাঙ্গালোর, তিরুপতি, বোম্বাই, দ্বারকা, পোরবন্দর, প্রভাস তীর্থ, নাথদ্বার, উদয়পুর, পুষ্করতীর্থ, জয়পুর, আগ্রা, ব্রজমণ্ডল, মথুরা, দিল্লী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বদ্রীনাথ, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বারাণসী, গয়া ইত্যাদি স্থানসমূহে যাত্রা করা হয়। তীর্থযাত্রা চলাকালীন শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ০৩.০৬.১৯৭৩ তারিখে জানাইয়াছিলেন—"......যে মহাপুরুষের সেবার উদ্দেশ্যে তোমার এই বিশেষ ট্রেনযোগে তীর্থযাত্রা ও যাহা এক দুঃসাহসিক কাজ; সেই মহাপুরুষই তোমার উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। .... তোমার উদ্যম ও প্রচেষ্টা দেখিয়া অমি অতীব প্রীত। ঐশ্বরিক শক্তি তোমার চালিকাশক্তি।" কলিকাতার কালীঘাট পার্কে এক ধর্ম সম্মেলন হয় ২৩.১২.১৯৭৩ হইতে ০৪.০১.১৯৭৪ খৃঃ, যাহাতে অংশগ্রহণ করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জি. এস. পাঠক, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, কলকাতা হাইকোর্টের বহু বিচারপতি সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, দক্ষিণ ভারতের মাধ্ব ও শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ ও অন্যান্য অসংখ্য গুণীজন।

শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী মাদ্রাজ মঠের সেবকরূপে অবস্থানকালীন এই মঠের রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় ২৭.০৮.১৯৫৬ হইতে ০১.০৯.১৯৫৬ তারিখে।

শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীযতি মহারাজকে জানাইয়াছিলেন, —"যে সকল সেবা তুমি চালাইয়া যাইতেছ, তাহা আমার চিন্তাধারার সহিত একান্তভাবে এক।"

শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত 'বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন'-এ আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ ২১.০৪.১৯৮২ হইতে ২৫.০৪.১৯৮২ যে ভাষণগুলি প্রদান করেন, তাহা যোগদানকারী ২৯টি দেশ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইবার কালে উহাতে অংশগ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী বি. ডি. পাণ্ডে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ডঃ করণ সিং প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত নাগার্জুন বিশ্ববিদ্যালয়ে (১০.০৯.১৯৮৪), তেনালিতে গীতা ভবনে (১৫ হইতে ১৭.০৯.১৯৮৪), বেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে (২২ হইতে ২৪.০৯.১৯৮৪) প্রভৃতি বহু স্থানে আয়োজিত এই পঞ্চশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান হইবার পর সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় মায়াপুরে ২৫ হইতে ২৭ মার্চ ১৯৮৬ খৃঃ পর্য্যন্ত।

২২.০১.১৯৮৭ তারিখে রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং শ্রীযোগপীঠের নাট্য মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২৯.০৬.১৯৯০ হইতে ০৫.০৭.১৯৯০ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, ১২টি রাজ্যের ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮ জন অধ্যাপক, কলকাতা হাইকোর্টের ১৪ জন বিচারপতি, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড রামকিশান, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেন। শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের (১০.০৯.১৯৭৬ তারিখে) অপ্রকটের পর হইতে বন্ধ হইয়া যাওয়া "বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা" অনুষ্ঠিত হয় ০৯.০৩.১৯৯০ হইতে ১১.০৩.১৯৯০ পর্য্যন্ত।

১৫.০৪.১৯৯০ হইতে ২২.০৪.১৯৯০ অনুষ্ঠিত হয় সেকেন্দ্রাবাদ ও হায়দ্রাবাদে এক বিশাল সম্মেলন তাহাতে মূলতঃ যাঁহাদের ভূমিকা গ্রহণ তাহার বিবরণ "A Gospel of love extended to heart land of Deccan i.e., Secendrabad & Hydrabad"—দ্রষ্টব্য ইংরাজী The Gaudiya Vol. XXX II (পৃঃ ১০৩ হইতে ১১০)।

২৫.০৩.১৯৯৪ হইতে ২৮.০৩.১৯৯৪ শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা ও শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

চতুর্থ 'সর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয় শ্রীমায়াপুরে ২০.০৩. হইতে ২২.০৩.১৯৮৯ তারিখে।

প্রচারের দিক হইতে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"You have opened a new chapter in the annals of Gaudiya Vaishnavism. Srila Prabhupad guides you."

তিন দশকের অধিককাল দক্ষিণ ভারতের মঠগুলিতে অবস্থানের সুবাদে শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগে সমাজে এক সদুদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপনের শিক্ষা লাভ করেন। কি ভাবে সমাজে সহজ সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, তাহার প্রেরণা পাইয়াছিলেন ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী, শ্রী এম. অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীপ্রভুদাস পাটোয়ারী, শ্রীজ্ঞানী জৈল সিং, ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা, শ্রী বি. সত্যনারায়ণ রেড্ডি, কমরেড্ রামকিষাণ, শ্রী বি. ডি. জাট্টি, শ্রীবিশ্বনাথ দাস, হনুমান প্রসাদ পোদ্দার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত যোগাযোগের সুবাদে। যেহেতু তিনি ছিলেন 'অল ইণ্ডিয়া বৈষ্ণব সমাজম্ (রেজিঃ)-এর সাধারণ সম্পাদক, সে সুযোগে তাঁহার বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ হয়।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু সেমিনারে ও ধর্ম সম্মেলনে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত হন। বহু কলেজে সাংস্কৃতিক ও গবেষণা কেন্দ্র, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁহাকে আহ্বান জানানো হয় এবং ১৯৮২ সালে শ্রীলঙ্কায় 'বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে' অংশ গ্রহণের সুবাদে তিনি সংবাদ মাধ্যমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন; সেই সম্মেলনে যে বিষয়বস্তুর উপর তাঁহার বক্তৃতা শ্রীলঙ্কা ও তামিলনাড়ুর সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার লাভ করে সেইগুলি ছিল— 'বৈজ্ঞানিক জাতিপ্রথা', 'শ্রীমূর্ত্তি পূজা' ও 'হিন্দুগণ পৌত্তলিক নহেন'। তিনিই

সর্বপ্রথম শ্রীলঙ্কা-বেতারে ভাষণ দানের জন্য আহূত হন। দক্ষিণ ভারতের 'দি হিন্দু' ও 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তব্যগুলি প্রচার করিতেন।

শ্রীচৈতন্য-মঠাধীন সমস্ত মঠগুলিতে ব্যাপক সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন-মূলক কার্য্যকলাপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রচার কার্য ও গ্রন্থ প্রকাশন

১৯৫২ সাল হইতে দক্ষিণদেশে অবস্থানকালে শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী (অর্থাৎ যিনি পরবর্তীকালে শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ) যে ভাবে প্রচার-কার্য্য organise করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুরুমহারাজ কর্তৃক ১৯৫৭ সালেই উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৯৭৬ সাল পর্য্যন্ত প্রকটকালীন আরও যে সকাল প্রচারকার্য, অনুষ্ঠানাবলী প্রভৃতি সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেইগুলিও তাঁহার গুরুদেব শতমুখে শুধু প্রশংসাই করেন নাই, উপরন্তু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "এই প্রকার কার্য পূর্বে কখনও সম্পাদিত হয় নাই", "সেইগুলি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে", "সেই কার্যাবলী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে" ইত্যাদি মন্তব্যের মাধ্যমে। তাঁহার তিরোধানের পর আরও প্রায় দশ বৎসর প্রচার, উন্নয়ন ইত্যাদি কার্য স্তব্ধ হইয়া যাইবার পর ১৯৮৬ হইতে পুনরায় প্রবল উৎসাহে তাহাতে মনোনিবেশ করার ফলে যে সমস্ত কার্যাবলী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ প্রবল উদ্যমে তিরোধানের পূর্ব পর্য্যন্তও করিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ পেশ করা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নহে। তথাপি দিগ্‌দর্শনের জন্য কিছু কিছু অতি সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করা হইবে।

পূর্বেই জানানো হইয়াছে ১৯৮২ সালে শ্রীলঙ্কায় সম্মেলনে শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বের কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী উৎসবে ভারত সরকার একটি স্মারক ডাকটিকিট ১২.০৩.১৯৮৬ সালে প্রকাশ করেন এই উৎসব উপলক্ষ্যে। ৭ দিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ এক মেলার আয়োজন করে। এই পঞ্চশত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ২৫শে মার্চ ১৯৮৬ সালে অংশগ্রহণ করেন তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী।

১৬ই মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ ১৯৮৫ সালে মায়াপুরে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ সর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন। ১২.০২.১৯৯০ শ্রীব্যাসপূজার দিন সাধারণ সম্পাদক শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজকে শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়

মঠসমূহের ''আচার্য'' পদে বরণ করা হয়। ০৯.০৩.১৯৯০ ও ১০.০৩.১৯৯০ তারিখে 'বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা'র আয়োজন করা হয় (যাহা ১৯৭৬ সালে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের তিরোধানের পর হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল)।

২৭.০৩.১৯৯১ হইতে ৩১.০৩.১৯৯১ তারিখে বাঙ্গালোরের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আহূত হন। পুনরায় বাঙ্গালোরে ১৭.০৬ হইতে ২৩.০৬.১৯৯৪ যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাহাতে শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ ব্যতীত মাদ্রাজ, গুণ্টুর, কভূর হইতে ১২জন স্বামিজীর একটি দল অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলিতে এক এক দিন এক এক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা হয়। বাঙ্গালোর হইতে ২৪.০৬.১৯৯৪ তারিখে যাত্রা করিয়া পুনরায় যমজ শহর হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদে আসিয়া ২৭শে জুন পর্য্যন্ত কর্মসূচী পালিত হয়। ২৮ তারিখে ওয়ারাঙ্গলে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' বিষয়ে আরও এক সভা হয়। শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের বৎসর ব্যাপী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি কালীন অনুষ্ঠানটি হয় শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীযোগপীঠের প্রশস্ত নাট্য মন্দিরে ২৪.১০.১৯৯৪ হইতে ২৮.১০.১৯৯৪ পর্য্যন্ত যাহার মধ্যে ছিল 'জাতীয়, ধর্মীয় ও পারমার্থিক আলোচনা সভা'। এজন্য আমন্ত্রিত হন দেশের বিভিন্ন অধ্যাপক, দার্শনিক ও বৈষ্ণব শাস্ত্র বাখ্যাকারগণ, তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের লিখিত তথ্যভিত্তিক পত্রগুলি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা উদ্বোধনে আগমনের অনুমতি জ্ঞাপনের পরও আসিতে না পারায় উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রী বি. সত্যনারায়ণ রেড্ডি উদ্বোধন করেন, সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমুকুল গোপাল মুখার্জী। দিল্লী, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওসমানিয়া, উত্তরবঙ্গ, কলকাতা, যাদবপুর, কল্যাণী, বর্দ্ধমান, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত অধ্যাপকবৃন্দের পক্ষ হইতে খুব ভাল সাড়া পাওয়া যায়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন অধ্যাপক 'ভারত-ভারতী' নামে এক নাটক মঞ্চস্থ করেন। কলকাতার গিরিশ চন্দ্র নাট্য সংসদ মঞ্চস্থ করেন 'শ্রীচৈতন্যলীলা'। মঠাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ মায়াপুরকে গড়িয়া তোলার ব্যাপারে

শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের অবদানগুলি বিশেষভাবে তুলিয়া ধরেন।

নিয়মিতভাবে প্রচারের স্বার্থে শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ প্রতি বৎসর ভুবনেশ্বর, পুরী, বসিরহাট, শিলিগুড়ি, বাংলাদেশে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ভ্রমণ করিতেন।

১৯৯০ সালে আচার্য হওয়ার পর তাঁহাকে পূর্ণকুম্ভ সম্বর্ধনা জানানো হয় মাদ্রাজে। গুন্টুর বার এসোসিয়েশন এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রায়ই তিনি প্রচার ব্যাপদেশে গমন করিয়া থাকেন, যথা—২০০০, ২০০৮, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে।

কভূরে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠের ৭৫তম বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে যে মহতী অনুষ্ঠান হয়, তাহার উদ্বোধনী সভায় পৌরোহিত্যকালে শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন।

২৮.১১.২০০৮ হইতে ৩০.১১.২০০৮ তারিখে শিলিগুড়িতে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন'-এ যোগদান করিয়া শিলিগুড়ির নারায়ণপল্লীতে ও ২০১৬ সালে উত্তর বঙ্গ গৌড়ীয় মঠের শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ৫০০ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে 'People's Forum for Chaitanya Mahaprabhu' আয়োজিত পুরীর সাধাবালিতে (গুণ্ডিচা মন্দিরের সম্মুখে) সভায় সভাপতিত্ব করেন (২০১০)।

১৪ই জুলাই ২০১৫ সালে গোদাবরী-পুষ্কর উপলক্ষ্যে গোদাবরী আরতি ও স্বাগত সম্বর্ধনায় কভূরে যোগদান করেন।

মাদ্রাজে ত্রিশ বৎসরাধিক অবস্থানকালে যে সমস্ত গ্রন্থ তিনি ইংরাজীতে প্রণয়ন করেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

1. The Renaissance of Gaudiya Vaishnav Movement
2. Srimad Bhagabatam (in 6 Volumes)
3. Twelve Essential Upanishads

4. Three Apostles of Gaudiya Vaishnav Movement
5. Thus Spake Sri Chaitanya
6. Facets of Truth
7. Shandilya Bhakti Sutra
8. Naradiya Bhakti Sutra
9. Sanatan Dharma
10. Srimad Bhagabad-Arka-Marichimala
11. Gita Darshan as Bhakti Yoga
12. Jaiva Dharma
13. Ontological & Morphological Concepts of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu & His Mission
14. Sri Bhakti Sandarva (in press)
15. Brihat Bhagabatamritam

এতদ্ব্যতীত বাংলায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। উপনিষদের ইতিকথা

২। অমৃতের সন্ধানে

৩। হে কৃষ্ণ! বেদে কি তোমার স্থান নাই?

৪। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচল ও সুন্দরাচল লীলা লহরী

৫। গুরুপ্রেষ্ঠের অনুসন্ধানে

উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজের প্রতিটি গ্রন্থই ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় আছে।

এতদ্ব্যতীত ইংরাজী ও বাংলা 'The Gaudiya' ও 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় তাঁহার সম্পাদিত বহু প্রবন্ধাদি আছে, যাহা সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাবলী আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন।

তিরোধান

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করেন, মিশন পরিচালনা অপেক্ষা নিজ ভজন life-কেই আশৈশব গুরুত্ব দেন। 'অমৃতের সন্ধানে' গ্রন্থের মুখবন্ধে জানাইয়াছেন—"আমার পারমার্থিক জীবনধারা আত্মানুশীলনে personal আদর্শের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মিশনারী ভাবধারা খাপ খেয়ে চলতে পারে না। আজও মিশনের চরম জটিলতার মধ্যে মিশনারী life-এর সঙ্গে নিজের personal ভজন life-এর সংঘাত ঘটে, তখনই এই 'অমৃতের সন্ধানে' গ্রন্থটির পরিকল্পনার রূপ নেয়। এই গ্রন্থটি আমার আত্মার কৃষ্ণানুশীলন।" নিজ গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে ২৫.০৭.১৯৭০ সালে এক পত্রে জানাইয়াছিলেন,—'মিশনারী কাজে আমার কোন দিন interest ছিল না, আজও নাই।' সেই পত্রের উত্তরে শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ২৬.০৭.১৯৭০ তাহাকে জানাইয়াছিলেন,—"যতি মহারাজ, এই বিচারটা ঠিক হইল না" ইত্যাদি বলিয়া অনেক বুঝাইয়াছিলেন। বিরক্ত শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ শেষের দিকে নিজেকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া লইতেছিলেন, তাহারই সূত্রপাত করেন যে পদে তিনি ১৬.০৫.১৯৭৮ হইতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সাধারণ সম্পাদকের পদ শারীরিক কারণ দেখাইয়া ২৬.০৫.২০১৩ সালে ত্যাগ করেন। অবশেষে ১৮ জানুয়ারী, ২০১৮ সাল, বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রি ৩-৪৫ নাগাদ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রেষ্ঠজন শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের একান্ত প্রিয়শিষ্য শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি গোস্বামী মহারাজ সকলের অজ্ঞাতে নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণরত অবস্থায় নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগৎকে এক গভীর দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন। পরদিবস ১৯.০১.২০১৮ তারিখে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয় নিজ গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সমাধি মন্দিরের অতি সন্নিকটে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে। ঐ স্থানে প্রশস্ত নাট্য মন্দির সহ তাঁহার সমাধি মন্দিরও নির্মিত হইয়াছে।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ